১।	প্রতীক্ষায়	...	১
২।	ঘূর্ণি হাওয়া	...	৯৫
৩।	ব্রতচারিণী	...	১৭৫
৪।	আপ টু ডেট	...	৩৩১
৫।	প্রিয়ের উদ্দেশে	...	৩৩৮
৬।	ছায়ার মায়া	...	৩৪৩

প্রতীক্ষায়

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

প্রতীক্ষায়

১

শুনেছি আমার নিজের মা নাকি অভাগাকে জন্ম দিয়ে আর ফিরে তাকান নি; ছেলের চাঁদপানা মুখ দেখে যে জন্মটা সার্থক করে যাবেন, সে শুভ অবসর তাঁর অদৃষ্টে জোটে নি। আমাদের শাস্ত্রে বলে যে, ছেলের মুখ না দেখলে রৌরব নামক নরকে পচে মরতে হয়, আমার মা সেই নরকে পড়ে আছেন কি না, তাও আমি জানি নে। তবে সকলে যখন বলত—আহা! দশমাস দশদিন পেটে ধরলে, ছেলের মুখখানা দেখে যখন যেতে পারলে না, তখন নিশ্চয়ই নরকে পচে মরছে—এই কথাটা শুনলে মনে হত বটে, তিনি তাহলে নিশ্চয়ই নরকে বাস করছেন। তাঁকে সেই নরক হতে মুক্ত করতে গেলে আমাকেও সেখানে যেতে হয়; সত্য কথা বলতে দোষ তো নেই,—বাস্তবিক মাকে নরকমুক্ত করবার জন্যে সেখানে যেতে আমার মোটেই ইচ্ছে ছিল না।

সৎমায়ের ছিল একটী ছেলে, একটী মেয়ে। ছেলেটী আমার চেয়ে বছর দুয়ের ছোট, তার নাম ছিল নীলমণি। মেয়েটী তার চেয়ে আবার কিছু ছোট ছিল—তার নাম ছিল মুক্তি।

নীলমণি যে ছিল—সে প্রকৃতই নীলমণি। মাটিতে পা দিয়ে সে হেঁটে গেলে বুঝি তার মায়ের মনে ব্যথা লাগত। আমার উপর সেই ছেলের ভার পড়ল—সে একটু বড় হলে; অর্থাৎ যখন চাকরের হেঁপাজতে থাকতে সে আর চাইত না। সৎমা আজ্ঞা দিলেন—তাঁর সবে ধন নীলমণি যখন যে আজ্ঞা করবে, তাই যেন করা হয়।

সময় সময় বাবার উপরে খুব রাগ হত। তিনি তখন কাজ করতেন—দমদমা রেজিমেণ্টে; মাঝে মাঝে আসতেন বাড়ী। আমি অত লক্ষ্য না করলেও, ক্রমে যেন লক্ষ্য করতুম, বাবা আমার চেয়েও বেশী ভালবাসেন সবে ধন—নীলমণিটীকে, আমি যে নন্দ, সেই নন্দই হয়ে আছি—কৃষ্ণ হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না আমার।

তবুও আমি জোর করে বলতে পারি—পনের ষোল বছর বয়স পর্য্যন্ত খুবই ভাল ছিলাম। মা এদিকে যাই থাকুন, আমার লেখা-পড়ার দিকে নজরটা ছিল তাঁর খুব বেশী। একটু খেলা করবারও অবকাশ ছিল না আমার বিকেল ব্যতীত।

মাষ্টারের কাছে পড়তুম আমি আর নীলমণি। মুক্তিও বেণী ঝুলিয়ে একখানা ছবির বই নিয়ে এসে পাশে বসে অলৌকিক চীৎকারে বাড়ী কাঁপিয়ে দিত—নীলমণি সময় সময় তার চীৎকার সহ্য করতে না পেরে তাকে খুব ঘা কতক মার দিত যখন, তখন সে সানুনাসিক সুরে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ীর মধ্যে চলে যেত।

লেখা-পড়ার আড়ম্বরটা খুব বেশী ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু কাজে তার কতদূর হত, তা জানত শুধু মাষ্টার। নীলমণি দেখতে ছিল খুব সুশ্রী—কিন্তু মাথায় তার ছিল গোবর ভরা। একটী পড়া বুঝতে লাগত ঠিক তার ছ'টী ঘণ্টা আর অঙ্ক দিলেই নীলমণির হয়ে যেত,—বাঁ হাতটা গালে দিয়ে কনুইটী টেবিলে রেখে পেন্সিল বাগিয়ে ধরে ভাবত—কি করে মিলাবে অঙ্ক।

আমাদের মা"র প্রায় মাসে মাসেই বদল হতে লাগল। স্কুলের মাষ্টার নীলমণির অগাধ বুদ্ধির পরিচয় পেলেন ফার্ষ্ট বুকের প্রথম পাঠে; অথচ এ পড়া অনেকদিন আগেই সাঙ্গ করে আজ কাল সে রিডার পড়ছে। সে দিন তিনি কান ধরে তাকে একেবারে ক্লাষ্ট বেঞ্চে বসিয়ে দিলেন; সেদিন হতে তার নাম রইল ষ্টুপিড চন্দ্র রায়।

তার দুর্গতি দেখে আমার বুক থর থর করে কাঁপতে লাগল, আমার পড়াও যে বেশী দূর এগিয়েছিল, তা নয়; তার চেয়ে আমার যে বেশী দণ্ড পেতে হবে—তা বেশ জানতুম আমি। কিন্তু কি সৌভাগ্য আমার, সেদিন মাষ্টার আমার দিকে এলেন না।

বাড়ী এসেই ষ্টুপিড বাবু মায়ের কাছে গিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে দিলে; মা কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, ছেলে কান্না ব্যতীত আর কোন উত্তর

দিল না। মুক্তি তখন গম্ভীর মুখে বল্লে—বোধ হয় লাটিম হারিয়ে ফেলেছে, তাই কাঁদছে।

'হুঁ লাটিম হারিয়েছি বই কি—তুই না জেনে না শুনে কথা বলতে আসিস্ কেন'—বলতে বলতে সে মুক্তির গালে চড় বসিয়ে দিলে। মা বল্লেন—শুধু শুধু মারছিস ওকে অথচ ব্যাপারটা যে কি তাও বলবি নে—ওরে নন্দ। এদিকে আয় তো, কি হয়েছে রে।

আমি সামনে গিয়ে স্কুলের দুর্গতির কথা বল্লুম। নীলমণি কাঁদতে কাঁদতে বল্লে—মাষ্টার আমায় পড়ায় না বাড়ীতে, কেবল নন্দদাকে পড়ায়, তাই তো পড়া হয় না আমার।

শুধু এই কারণেই প্রায়ই মাষ্টার বদল হতে লাগল। কোন মাষ্টারের পড়াই স্কুলের উপযুক্ত হয় না। আমি সেদিন স্কুলে তার দুর্গতি দেখে খুব সাবধান হয়ে গেছলাম, আর কিছুতেই পড়ায় অবহেলা করতে পারলুম না।

দেখতে পেলুম মায়ের কঠোর দৃষ্টি পড়ে গেল। আজকাল আমার পড়াও দেখতে লাগলেন তিনি বাঘের মত চোখে। আমি বেশ বুঝতে পারলুম, আমি স্কুলে ভালো হচ্ছি, তাঁর ছেলে মন্দ হচ্ছে—এটা তাঁকে খুব বেশী করেই পীড়ন করতে লাগল। এখন যা,ত তাতে আমাকে পড়া হতে নিবৃত্ত করাই যেন তাঁর অভিপ্রেত হয়ে দাঁড়াল।

এদের মধ্যে যথার্থ কথা বলতে কি, মুক্তি আমায় খুব ভালো বাসত। সে নিজে যা ভাল খাবারটুকু পেত, আমায় লুকিয়ে এনে অর্দ্ধেক খাইয়ে যেত; সে সব খাবার আমি বোধ হয় চোখেও দেখিনি। আমার জন্যে সাধারণতঃ ঠাকুরের ডাল ভাতই বরাদ্দ থাকত, তার বেশী আমি কোন দিনই পেতুম না, কিন্তু মুক্তির মুখে শুনতে পেতুম, মা তাদের জন্যে নিজে ষ্টোভে কত কি রাঁধেন।

বলতে কি, এক এক সময় শুধু এই জন্যই খুব রাগ হত মায়ের উপর। নীলমণি আর মুক্তিই কি তাঁর যথাসর্ব্বস্ব, আমি কি নই কেউ? আমিও তো তাঁর ছেলেই, তবে এত প্রভেদ কেন? কিন্তু তবু বুঝতে পারতুম না কেন এ প্রভেদ?

২

আমার ক্লাসফ্রেণ্ডগুলি আমায় বিধিমতে সচেতন করিয়ে তুলবার চেষ্টা করত। প্রথম তাদের কাছ হতে খুব দূরে থাকতুম আমি, কিন্তু কখন কেমন করে যে আস্তে আস্তে তাদের সঙ্গে মিশে গেলুম, তা জানিনে।

দেখলুম তারা বেশ থাকে। আমিও অল্পদিনের মধ্যেই তাঁদের গুণগুলি সব আয়ত্ত করে নিলুম। তখন বাড়ীতে মাকে, আর স্কুলে মাষ্টারকে ফাঁকী দেওয়া আমার পক্ষে বড় কঠিন কাজ হল না।

সেদিন বড় মুস্কিলে পড়ে গিছলুম নীলমণিকে নিয়ে। সে হতভাগা ছেলে কিছুতেই আমার সঙ্গ ছাড়বে না—আমিও তার সঙ্গ ছাড়তে পারলে বাঁচি।

সে দিন আমাদের দলের ছেলেগুলি পরামর্শ করলে—আজ ভাই কুণ্ডুদের পুকুরে মাছ ধরতে যেতে হবে। আজ স্কুলে কেউ যাব না।

আমারই হল মহামুস্কিল। তারা যেন বাড়ীতে বলতে পারবে স্কুল বন্ধ, আর বাড়ীর কেউ তা জানতে পারলেও বেশী অনর্থ হবে না। আমার যে কিছুই করবার পথ নেই।

অগত্যা আস্তে আস্তে গিয়ে বিছানায় শুয়ে লেপটাকে টেনে বেশ করে গায় দিলুম। নীলমণি খানিক পরে এসে বল্লে নন্দদা, স্কুলে যাবে না—দশটা বেজে গেছে যে—

আমি যেমন জ্বরের ভানে গলার আওয়াজটা খুব ভারী করে বল্লুম—আমার বেজায় জ্বর এসেছে রে! আজ স্কুলে যেতে পারব না।

মুখখানা বিমর্ষ ভাবাপন্ন করে সে বল্লে,—বটে, দেখি গা?

সে নিরেট বোকা হলেও যে গা গরম ঠাণ্ডা বেশ বুঝতে পারবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; সেই জন্যে আমি লেপটা আরও টেনে নিয়ে চারিদিক বেশ সুরক্ষিত করে নিলুম, যেন কোন দিক সে আলগা করে আমার গায়ে হাত না দিতে পারে; তারপর তেমনি সুরে একটা নিংশ্বাস ফেলে বল্লুম—না ভাই—আমার বড় শীত করছে এখন।

সে জোর করে লেপটা সরিয়ে আমার গায়ে হাত দিয়ে বল্লে—বাঃ, এই যে তোমার গা ঠাণ্ডা।

রাগে গা জ্বলে যেতে লাগল; তবু খুব করুণ সুরে বল্লুম—সম্পূর্ণ জ্বরটা এখনও তো আটক করতে পারে নি আমায়। জ্বরটা চামড়ার ভিতরেই রয়েছে, বেরুতে পাচ্ছে না কেবল একটা প্রক্রিয়ার জন্যে। তোরা তো সে সব প্রক্রিয়া জানিস নে, কাজেই হুড় মুড় করে জ্বর আসে তোদের।

তার স্কুলে যাওয়া ঘুরে গেল; বই গুলি নীচে

ফেলে আমার পাশে বসে পড়ল, সাগ্রহে বল্লে—আমায় শিখিয়ে দাও না নন্দদা, চামড়ার তলায় কি করে জ্বরকে লুকিয়ে রাখা যায়। মা রোজ প্রায় আমার টেম্পারেচার নেবে—আর মাসের মধ্যে পঁচিশ দিন ভাত খেতে দেবে না, বলে—তোর অসুখ করেছে। আমায় বল না নন্দদা, তোমার পায়ে পড়ি—তা হলে মা আমার টেম্পারেচার আর জানতে পারবে না।

আমি বিরক্তির ভাব দেখিয়ে বল্লুম—এখন স্কুলে যা বাপু, ত্যক্ত করিসনে আমায়! আগে ভাল হয়ে উঠি, তখন শিখিয়ে দেব সে সব। যদি এই জ্বরটা ফুটে বেরুত, দেখতিস্ এতক্ষণ সাত ডিগ্রিতে দাঁড়িয়ে যেত, যদিও চামড়ার তলায় আটকে রেখেছি, তবু তার কষ্ট তো আছে।

নীলমণি বই গুলো তুলে নিয়ে বললে—তবে তুমি ভাল হও আগে, তার পরে বোলো।

সে স্কুলে চলে গেল।

চাকর এসে একবার খোঁজ নিয়ে গেল জ্বর হয়েছে। ক্রমে ক্রমে বেলা একটা বাজতে চলল—সকলেরই খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল। লেপ ফেলে উঠে বসলুম তখন,—উঃ!—ঘামে সারা গা ভিজে গেছে একেবারে। এই ভাদ্র মাসের অসহ্য গরমে ঠিক দুপুর বেলায় লেপ গায়ে দিয়ে পড়ে থাকা যদিও কোন ক্রমেই সুখকর নয়, কিন্তু বাধ্য হয়ে আমায় সে কষ্টও সহ্য করে থাকতে হয়েছিল।

এদিকে বেজায় খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে—চোখে চারিদিকে দেখছি যেন সর্ষে ফুল। পেট তো আমোদ ইয়ারকি চায় না, সে বেচারী সকাল বেলায় এক কাপ মাত্র চা আর একখানি বিস্কুট মাত্র পেয়েছিল, এখন বেজায় উপদ্রব আরম্ভ করে দিল। তাকে ঠাণ্ডা করবার কোনও উপায় দেখলুম না।

সেই সময় মুক্তি আস্তে আস্তে দরজার পাশ হতে মুখ বাড়িয়ে দেখলে, তার পরে বলে উঠল—জ্বর ছেড়েছে দাদা?

তাকে দেখে আমার দেহে প্রাণ এল; কারণ, আমি বেশ জানতুম তাকে বল্লেই সে এখনি আমার খাবার যোগাড় করে দিতে পারবে। তার আমি কথা শুনে মুখটা ভার করে বল্লুম—হ্যাঁ, জ্বর ছেড়েছে এখন, কিন্তু—।

মুক্তি ঘরে ঢুকে বললে—মাথা ধরা সারেনি বুঝি?

আমি বিষণ্ণ ভাবে বল্লুম—সে সব সেরে গেছে। আমায় কিছু খাওয়াতে পারবি এখন? খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে যে আমার।

মুক্তি বল্লে—তোমার জন্য সাগু দুধ রয়েছে—এনে দিতে বলব ঝিকে? তা এতক্ষণ বল্লেই হতো তো—।

সে যাবার উদ্যোগ করতেই আমি বাধা দিলুম। জ্বর করতে যদিও কোনই আপত্তি ছিল না আমার, কিন্তু এই সাগুটাকে বাস্তবিকই বড় ভয় করতুম আমি। এই সাগু খাওয়ার ভয়ে কতদিন যে সত্যি জ্বরকে লুকিয়ে ভাত খেয়েছি, তা আর বল্‌তে পারিনে। সাগুর নাম শুনলেই আমার পেটের মধ্যে যেন কেমন করে উঠত।

মুক্তি বিস্ময়ে তার বড় বড় চোখ দুটো আমার পানে স্থির করে রেখে বল্লে—বাঃ! খিদে পেয়েছে বলছ এদিকে, অথচ খাবেও না কিছু? তবে আর আমি কি করব?

আমি বল্লুম—আচ্ছা মুক্তি! তুই—ই বল দেখি একবার, সাগু কি খেতে পারা যায় কখনও? সত্যি কথা বলিস—।

মুক্তি মাথা নেড়ে বল্লে—তা তো পারাই যায় না কখনও, কিন্তু খেতেও তো হয়—তা দুধ দিয়ে না হয় নাই খাবে, লেবু দিয়ে খাও, বেশ লাগবে'খন।

আমি রাগ করে বল্লুম—যাঃ পোড়ার মুখী, তুই চলে যা এখান থেকে; আমি যেন সাগুই খেতে চেয়েছি ওর কাছে। সাগু খাওয়ার চেয়ে উপোস করে থাকব—তার আবার কি? তুই তো দিব্য করে খেয়ে এসেছিস—বেরো তুই, দরকার নেই তোকে।

মুক্তি মুখখানা কাঁচু মাচু করে বল্লে—তবে খিচুড়ী খাবে দাদা?

আমি অকস্মাৎ উৎসাহিত ভাবে বল্লুম—খিচুড়ী, তা খাব বৈ কি?

মুক্তি। অসুখের উপর খিচুড়ী খাবে—

আমি বল্লুম—আরে, তাতে আর কিছু হবে না। ওতো সাদা ভাত নয়, ও খিচুড়ী; ওতে কিছু হয় না। কিন্তু তুই পাবি কোথায়?

মুক্তি। আমাদের জন্যে হয়েছে। তুমি একটু শোও—আমি নিয়ে আসি এই বেলা।—মা এখনও ঘুমুচ্ছে—কিছু টের পাবে না।

সে চলে গেল; খানিক পরেই একখান থালায় করে খিচুড়ী নিয়ে এসে হাজির করলে।

আমি দ্বিরুক্তি না করে তখনই সবখানি সাবাড় করে দিলুম। বলব কি,—মুক্তির উপর আমার

স্নেহটা যেন শত ধারায় উথলে উঠল। বেচারা মুক্তি সহসা দাদার কাছ থেকে এতটা ধন্যবাদের কারণ খুঁজে না পেয়ে বিস্ময়ে শুধু তাকিয়ে রইল।

আমি একটা পান মুখে দিয়ে বললুম—লক্ষ্মী দিদি! একটা কাজ করবি? আমি এখন একটু বেড়াতে যাচ্ছি। তুই একটা চাবি এনে এ ঘরে দিয়ে যা—আমি তালা দিয়ে বেরুব। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে বলিস—আমি ঘরেই আছি। সকলে গোলমাল করে, বিরক্ত করে বলে,—যেন তুই-ই তালা দিয়ে গেছিস।

মুক্তি আশ্চর্য্যে বলিল—এত জ্বর হয়েছিল তোমার—এখনি বেড়াতে যেতে পারবে?

আমি বল্লুম—বেড়াতে, মানে একবার স্কুলে প্রেজেন্ট হওয়া চাই। সেই জন্যেই যেতে হবে—নইলে হয়তো মাষ্টার মনে করবে, বজ্জাতি করে স্কুলে যাই নি—তখন বেত লাগাবে—ফাইন করবে।

মুক্তি বললে—তবে যাও দাদা—

সে চাবি তালা এনে দিলে; দরজায় চাবি দিয়ে আমি দুর্গা দুর্গা বলে চললুম কুণ্ডুদের পুকুরে; জানতুম, আমার সঙ্গীরা সব সেখানে মাছ ধরতে বসে গেছে এতক্ষণ।

সেখানে গিয়ে দেখলুম বাস্তবিকই তাই—জলে চার ফেলে আট দশটা ছেলে হুইল ফেলে শকুনের মত তাকিয়ে আছে জলের দিকে। বলা বাহুল্য, আমার একটা হুইলও নিয়ে গেছল তারা।

অনেক সিগারেটও গিয়েছিল। যদিও আমি জীবনে কখন এই অপূর্ব্ব বস্তুটীকে ব্যবহার করি নি—তবু আজ ব্যবহার করতে হ'ল তাদের নেহাৎ অনুরোধে পড়ে। প্রথম একটা খেয়ে লোভটা এমন অসম্বরণীয় হয়ে পড়ল যে, এক প্যাকেট দেড় প্যাকেট শেষ করতে আধ ঘণ্টার বেশী সময় লাগল না।

হঠাৎ আমি চমকে উঠলুম—পেছনে 'নন্দদাদা' এই ডাকটা শুনে। আরাম করে তখন আর একটা সিগারেট টানতে টানতে বিশেষ নজর করেছি জলের পানে—বোধ হচ্ছিল যেন মাছ বেধেছে। হঠাৎ 'নন্দ দাদা'—ডাকটা শুনে ঘাড় ফিরালুম; হতভাগা নীলমণিটা স্কুলের ফেরত এখানেও এসে জুটেছে।

তাড়াতাড়ি মুখের সিগারেটটা ফেলে দিলুম। সে ষ্টুপিড এসে দাঁড়াল কাছে; সপ্রতিভভাবে জিজ্ঞাসা করলে—ও কি খাচ্ছিলে নন্দদা?

বিবর্ণ মুখে আমি বল্লুম—কোথায় আবার কি খাচ্ছিলুম? মুখে একটা খড় ছিল—সেইটেই ফেলে দিলুম।

নীলমণি বললে—জ্বর ছেড়েছে তোমার?

আমি করুণ ভাবে বললুম—কে জানে সম্পূর্ণ ছেড়েছে কি না? নেহাৎ এরা সব ছাড়লে না—তাই এলুম।

নীলমণি বললে—হেডমাষ্টার আজ খুব রেগেছেন তোমাদের ওপরে; বলেছেন, কাল তোমাদের সব কয়েকজনকে জব্দ করবেন তিনি। কে নাকি বলে দেছে, তোমরা সবাই মাছ ধরতে এসেছ—তিনিও আসছেন এখনি দেখতে।

কথাটা টেলিগ্রাফের মত ছড়িয়ে পড়ল—; তাড়াতাড়ি সকলে হুইল জড়িয়ে নিলে;—হতভাগা হুইল বাদ সাধল আমার বেলায়, ওদিকে হেড মাষ্টার আসছেন—মার খাবার ভয়ে কান্না আসছিল।

এই ছেলেদের মধ্যে—নরু ছিল সব চেয়ে বয়সে বড়, আর ভারী বুদ্ধিমান। যত নূতন রকম প্ল্যান আবিষ্কৃত হত তার মাথায়। আমি তখনও বিশেষ পরিচয় তার পাই নাই—ক্রমে ক্রমে জানতে পেরেছিলুম যথার্থ সে একটা মানুষ বটে।

আমায় কাঁদতে দেখে দয়া করে সে আমার হুইলটা জড়িয়ে দিয়ে নিজে সেটা নিলে—ততক্ষণে অন্য ছেলেরা পিটটান দে'ছে। নীলমণিও তাদের সঙ্গে চলে গে'ছে। নরু আমার হাত ধরে নিয়ে যেতে যেতে বললে—তোকে ওরা ফেলে যেতে পারলে—কিন্তু আমি কখখনো পারব না। যদিই ধরা পড়ি—না হয় সমান দুইজনে মার খাব—তার আবার কি?

৩

বাড়ী এসেই দেখি মহা হুলুস্থুল কাণ্ড পড়ে গেছে। নীলমণি এসেই মাকে বলে দেছে আমি মাছ ধরতে গিছলুম, আবার সিগারেট খাচ্ছিলুম,—মা তাই শুনে একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠেছেন।

অনেক গালাগালি সহ্য করে নিজের ঘরে চুপ করে পড়ে থাকলুম। মুক্তিটাও এমনি যে, সেদিন আর মোটেই সে এদিকে এলো না।

পরদিন স্কুলে যাব কি না—কেবল সেই ভাবনাটাই আমার মনের মধ্যে জাগছিল। স্কুলে না গেলেও রক্ষা নাই, বাড়ীতেও যে লাঞ্ছনা গঞ্জনা, এর চেয়ে হেড মাষ্টারের দুই চার ঘা বেত সহ্য করা ভালো।

সে দিন নীলমণি আমার কাছে শু'তে আসল না দেখেই জানতে পারলুম—মা এই বয়াটে বাঁদরের সঙ্গে মিশতে তাঁর ছেলেকে বারণ করে দে'ছেন।

পরদিন সকালে মাষ্টার এলেন পড়াতে—নীলমণি অন্য অন্য দিন আমায় ডাকত, আজ সে ডাকলে না দেখে আমিও পড়তে গেলুম না। চুপ করে ঘরে বসে রইলুম।

বেলা নটার সময় চাকর খাবার জন্যে ডাকতে এল—তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলুম। মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল ঘোর অভিমান। সৎমা কিনা, তাই একবারও খোঁজ নিতে পারলে না আমার খাওয়া হয়েছে কি না—?

না খেয়েই বই নিয়ে চললুম স্কুলে——

নরুদের বাড়ীর সামনে দিয়ে যাবার রাস্তা। দেখলুম নরুও তখন বই নিয়ে বাড়ী হতে বেরুচ্ছে।

নরু যদিও বয়সে আমার চেয়ে তিন চার বছরের বড় হবে, তবুও সে পড়ত আমারই সঙ্গে থার্ড ক্লাসে। আমি দেখেছিলুম—আমি যখন ফোর্থ ক্লাসে ভর্ত্তি হই, তখনও সে ছিল থার্ড ক্লাসে, আজও সেই থার্ড ক্লাস ছাড়িয়ে সে উঠতে পারেনি। কেউ যদি বলত—বুড়ো ছেলে আজও থার্ড ক্লাসের গণ্ডী পেরিয়ে বের হতে পারলে না—তার উত্তরে সে শুধু হাসতো।

নরু আমায় দেখে বললে—কিরে,—স্কুলে যাচ্ছিস নাকি? আমার সঙ্গে চল।—বুঝেছিস নন্দ, আমি তোর সঙ্গে থাকলে, হেড মাষ্টার কিছু বলতে পারবে নাকো তোকে।

আমি বললুম—কেন?

সে একটু হেসে বললে—সে একটা কারণ আছে; যখন সামনে দেখতে পাবি—তখন জানতে পারবি—এখন বলে কি হবে তোকে? চল তো আমার সঙ্গে।

আমার কাছে এসে—মুখের পানে চেয়ে সে বলে উঠল—হ্যাঁরে নন্দা, তোর মুখখানা অমন শুক্‌নো দেখাচ্ছে কেন রে?

আমি কথা না বলে মুখখানা অন্যদিকে ফিরালুম; আমার চোখ তখন ভ'রে এসেছিল জলে, পাছে সে দেখতে পায় শুধু সেই জন্যে।

নরু বোধ হয় বুঝতে পারলে তা; তাই সে জিজ্ঞাসা করলে—তুই বুঝি খাসনি কিছু?

আমি মাথা নেড়ে জানালুম খেয়েছি।

সন্দেহের ভাবে নরু বললে—কখখনো খাস নি; দেখি, মুখ ফিরা আমার দিকে—

আমি মুখ ফিরালুম না দেখে তার সন্দেহ সত্যে পরিণত হল, সে তখন বললে—কাল রাতেও খেতে পাসনি কিছু?

আমি আর গোপন করা অসম্ভব দেখে বললুম—না।

সে বিস্ময়ে বললে—কেউ খেতে বলে নি?

আমি বললুম—আমার কি মা আছে যে—বলতে বলতে উচ্ছ্বসিত ভাবে হঠাৎ কেঁদে উঠলুম।

নরু দয়ার্দ্রভাবে বললে—আয় আমাদের বাড়ী—আমি মাকে বলব তোকে খাওয়াতে।

আমি মাথা নেড়ে বললুম—না—।

নরু একটু কঠিন স্বরে বললে—না কি? খেতেই হবে তোকে, তুই খাবনা বললে ছাড়বে কে? আমি বলছি তোকে খেতেই হবে আমাদের বাড়ী।

তার কথার উপর কথা বলতে সাহস ছিল না আমার। কাল যে সে অন্য সকলের মত আমায় ফেলে পালায়নি,—মার খাবার খুব আশঙ্কা থাকলেও সে যে বীরের মত আমার পাশে পাশে অগ্রসর হয়েছিল, তার সেই অপূর্ব্ব মহানুভবতা আমায় খুব নত করে ফেলেছিল তার কাছে। আমি বেশ অনুভব করতে পারছিলুম, তার নিশ্চয়ই কোনও অলৌকিক শক্তি আছে, যার জোরে সে সকলের হৃদয়ই নত করে ফেলতে পারে নিজের কাছে। শুধু সেই অনুভবের বলে জানতে পেরেছিলুম আমি, দুর্দ্দান্ত হেডমাষ্টারও তার কাছে দন্তস্ফুট করতে. পারবেন না।

আমায় চুপ করে ভাবতে দেখে নরু তেমনি কঠোর স্বরেই বললে—তুই যাবি কি না নন্দা, বল দেখি?

আমি কলের পুতুলের মতই বললুম—যাব।

তবে আয়,—বলে সে আমার হাত ধরে টানতে টানতে একেবারে তাদের বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গেল। আমি কখনও আসিনি তাদের বাড়ীর মধ্যে, কাজেই সঙ্কোচ ও লজ্জায় আমার দুটো পা জড়িয়ে যেতে লাগল।

একটা ঘরের মধ্যে একটী মেয়েলোক কি করছিলেন,—নরু তাঁকে দেখেই বলে উঠলো—মা, দুটো ভাত দাও তো একে; এ ছোঁড়া না খেয়ে ইস্কুলে চলে যাচ্ছে বলে ধরে এনেছি। কাল রাত হতে খায়নি কিছু। শুক্‌নো মুখ দেখে, এত যে জিজ্ঞাসা করছি—তা যদি বলে কোনও কথা।

তার মা ঘর হতে বেরিয়ে এসে বললেন—এটী কার ছেলে?

নরু উত্তর দিলে—সূর্য্যনারাণ রায়ের ছেলে। চেনো না নাকি তুমি?

নরুর মা বললেন—তোমার মত তো আমি আজও সকলকে চিনে বসিনি—। যাই হোক—এসো বাবা—খেয়ে নাও।

মায়ের স্নেহ পাই নি কখনও, সুতরাং জানিও না মাতৃস্নেহ কাকে বলে। কিন্তু নরুর মায়ের স্নেহপূর্ণ কথাগুলি শুনে, আমার প্রাণের মধ্যে এতক্ষণ যে জ্বালা দিচ্ছিল—সেটা যেন জুড়িয়ে গেল। কবিত্বটা এখন যেমন ফুটেছে, তখন তা ফোটে নি তো; কাজেই বলতে পারলুম না—জ্বলন্ত আগুনে জল পড়লে তা যেমন জুড়িয়ে যায়—তেমনি ভাবে জুড়িয়ে গেল। তখন ভাবলুম, ঠাণ্ডা হলুম—ই মাত্র।

তিনি আমার পাতের কাছে বসে জোর করে খাওয়াতে লাগলেন—পাছে আমি লজ্জা করি—এ জন্যেই তিনি বেশী রকম জোর করতে লাগলেও।

সেই সময়ে মুক্তির মত একটী মেয়ে সেখানে এসে দাঁড়াল। তখন সৌন্দর্য্য-বোধ না থাকলেও এটুকু জ্ঞান হল যে, মেয়েটী ভারী সুন্দরী। সে খানিক অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে তার পরে বললে—এ কে দাদা?

নরু বললে—তোর বর! বিয়ে কর'বি শান্তি?

আমি চকিতে মাথা তুলে একবার শান্তির পানে তাকিয়ে দেখলুম তার সুগৌর মুখখানা লাল গোলাপের মত রং ফলিয়ে দিলে নরুর সামান্য এই একটী কথায়; সে সলজ্জে বলে উঠল—যাও—তুমি বড় দুষ্টু, দাদা!

আমি মুখ খুব নীচু করে সপাসপ ভাত খেয়ে নিলুম। নরু আমার পানে তাকিয়ে সকৌতুকে বললে—কিরে নন্দা, বি'য়ে ক'রবি শান্তিকে? যদিও তোরা রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আর আমরা বারেন্দ্র শ্রেণীর, তা আমরা সে সব মানব না; বিয়ে দিয়ে দেব—যদি রাজি হোস তুই—।

তার মা ধমক দিয়ে বললেন—যাঃ, কি বলছিস ঠিক নেই তার। যার তার সঙ্গে ওই রকম ফষ্টিনষ্টি করতে যাস বলেই তো তোর মান থাকে না।

নরু তৎক্ষণাৎ বলে উঠল—হ্যাঁ মা—ফষ্টিনষ্টি কাকে বলে?

মা মুখের হাসিটা চাপা দিয়ে বললেন—জানিনে বাপু, বকাস নে আর। ইস্কুলের বেলা হয়ে গেল—যা এখন।

আঁচিয়ে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালুম আমি; খানিক পরেই নরু দিব্য করে সেজে দুটী পান নিয়ে বেরিয়ে এল—আমায় বললে—এই, পান খাবি?

আমার পেট যদিও ঠাণ্ডা হয়েছিল—কিন্তু স্কুলের ভাবনাটা বেজায় আঁকড়িয়ে ধরেছিল। মুখখানা খুব গম্ভীর করে বল্লুম—না ভাই; ইস্কুলে একদিন পান খেয়ে গিয়েছিলুম, মাষ্টার সেদিন তিন হাত মেপে নাকে খৎ দিইয়েছিল। আর কখনও ইস্কুলে যাব না পান খেয়ে।

নরু হেসেই আটখানা, বললে—আরে, তোকে যেমন বোকা পায় সব, তেমনি অত্যাচারও করে যায় অবাধে তোর ওপরে। আমি রোজ পান খেয়ে যাই যে, আমায় কিছু বলতে কারও ক্ষমতা নেই। পয়সা দিয়ে ইস্কুলে পড়ি বাবা,—যার অমনি বড় মুখের কথা নয়। যাই হোক—খা একটা পান,—এই দেখ কেমন গোলাপী সুর্ত্তি যোগাড় করেছি,—এমন খাসা গন্ধ এর যে, প্রাণটা যেন কোন্ হুরীর রাজ্যে বেড়াতে চলে যায়।

আমি তবুও যখন নিতে রাজি হলুম না, তখন সে নিজেই পান দু'টো তার সেই গোলাপী সুর্ত্তি দিয়ে মুখে দিলে। সে বেশ গল্প ক'রতে ক'রতে চ'লল—সামনে মাথার ওপর যে ঝুলছে তার সুশাণিত ছোরা,—তা সে মোটেই কেয়ারে আনলে না।

স্কুলে পৌছে দেখলুম—সাড়ে দশটার বেল কখন পড়ে গেছে, ঘণ্টার কাঁটা এগারটার কাছে গিয়ে পৌচেছে। একে কালকের প্রহারের ভয়, তারপরে এই অতিরিক্ত লেটএ স্কুলে আসা—জানিনে কি হবে আজ? আমার প্রাণ তো কাঁপতে লাগল থর থর করে—চেয়ারে উপবিষ্ট কৃতান্তসম হেডমাষ্টারের পানে তাকিয়ে।

হেডমাষ্টার মহাশয়ের চেহারাটা ছিল কি রকম? সাবিত্রী-সত্যবানের ছবিতে দেখা গেছে যে কালান্তক যম দণ্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—সেই তাঁরই মত অবিকল। চোখ দুটো ছিল তাঁর বেজায় ছোট—তেমনি দিনরাতই লাল রঙ্গে রঞ্জিত হয়ে থাকত। এক জোড়া কাঁটার মত তীক্ষ্ণ গোঁফ তাঁর মুখখানিতে বেশ সৌন্দর্য্য দান করেছিল। নাকটি ছিল বোধ হয় গাল হতে এক আঙ্গুল উচ্চে—ঠোঁট দুটি ছিল নিগ্রোদের মত মোটা কালো এবং উল্টানো গোছের। গালের অস্থি দুদিকে উঁচু হয়ে উঠেছে। কপালখানা ছিল ঠিক গড়ের মাঠ—তার উপর ছোট ছোট করে ছাঁটা চুলগুলো,—একটু ছোটখাট টাকও পড়েছিল তাতে। যখন

রাগতেন তিনি, তখন সেই ঝাঁটার মত গোঁফ উঁচু হয়ে উঠত আরও—সেই ছোট ছোট চোখ ঘুরত চারিদিকে, দাঁতগুলি করত ভীষণ শব্দ,—তখন তাঁর নাম যে করালীচরণ—ঠিক তার মিল—চেহারায় মিলিয়ে নেওয়া যেত।

তখন দোষী ছেলেদের দণ্ড দেওয়া হচ্ছিল। পাঁচ বেত হতে দশ বেত—আর তিন হাত মেপে নাকে খৎ দেওয়া,—এই ছিল শাস্তি। বেচারী ছেলেরা—যখন সেকেণ্ড মাষ্টার নাম উচ্চারণ করছেন,—সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে—বেত খাচ্ছে —নাকে খৎ দিচ্ছে—চোখ মুছতে মুছতে তেমনই কলের পুতুলের মতই নিজেদের স্থানে গিয়ে বসছে।

এমনি করে আটটি ছেলের পর, আমার নাম উচ্চারিত হল—সঙ্গে সঙ্গে আমার যেন মূর্চ্ছাভাব এসে উপস্থিত হল।

নরু আমায় পেছনে ঠেলে দিয়ে বীরত্বের সঙ্গে এগিয়ে গেল; মাথাটা বেশ কায়দার সঙ্গে নুইয়ে স্পষ্ট বললে—স্যার নন্দর কোনও দোষ নেই; দোষ আমার, কারণ আমিই ওকে জোর করে টেনে নিয়ে গিছলুম। ওর কাল যদিও জ্বর হয়েছিল, তবু ছেলে মানুষ কিনা; আমার জেদে পড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। ওর দণ্ডটা আমাকে দিতে বলুন—।

হেডমাষ্টার গর্জ্জিয়ে উঠলেন—কিন্তু বীর নরু সম্পূর্ণ অবিচল। সে কিছুতেই সেকেণ্ড মাষ্টারের ক্রসে দমে পড়ল না।

সেকেণ্ড মাষ্টার আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে হেড মাষ্টারের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। নরু আমার পানে তাকিয়ে চোখের ইঙ্গিতে সাবধান করে দিলে।

হেডমাষ্টার গর্জ্জন স্বরে বললেন—এই শুয়ার, তুই নিজে গিছলি, না নরু তোকে জোর করে নিয়ে গিছল?

আমি তখন রীতিমত কান্না সুরু করে দেছি; সেকেণ্ড মাষ্টার নরম সুরে বললেন—বল, কিছু ভয় নেই তোমার—।

আমি দুইহাতে চোখ মুছতে মুছতে বললুম— জোর করে নিয়ে—

কথাটা আটকে গেল—আর শেষ না করে, অবিশ্রান্ত কাঁদতে লাগলুম। সেকেণ্ড মাষ্টার হেড-মাষ্টারকে বলে দিলেন, এই নরু ছোঁড়া ভারী বদমায়েস। এ সকল কাজেই হাত দিতে যায়। গ্রামের মধ্যে একে না চেনে—এমন লোকই নাই। স্কুলের ভাল ছেলেদের মাথা খাচ্ছে এই নরু ছোঁড়া। এটাকে বিশেষভাবে শুদ্ধ না করলে স্কুলের ভালো বলে যে নামটা আছে, তা ঘুচে যাবে; কোন ছেলেই ভাল হতে পারবে না।

হেডমাষ্টার গোঙানো স্বরে আদেশ দিলেন— একে পনের বেত পুরস্কার দাও, আর ছয় হাত মেপে নাকে খৎ দিক; আর প্রতিজ্ঞা করুক এমন কাজ কখনও করবে না—

থার্ড মাষ্টার বেত নিয়ে অগ্রসর হইলেন। আমি বিস্মিতভাবে তাকিয়ে দেখলুম, নরু অবলীলাক্রমে—অমন যে বেতের কঠিন ঘা পনরটা—সহ্য করে গেল; ছয় হাত মেপে নাকে খৎ দিতেও সে কোন আপত্তি করলে না।

বেত খাওয়া শেষ হলে সে জল খাবার জন্যে বাইরে গেল। আমি আমার সিটে বসতে গিয়ে জানালা দিয়ে চকিতের মত একবার বাইরের পানে তাকিয়ে দেখলুম, সে হাসিতে একেবারে ভরে উঠেছে; এমন প্রসন্ন মুখখানা তার, যেন কিছুই হয় নি।

৪

বাস্তবিক নরুর অসাধারণ বীরত্বগুলি আমাকে অত্যন্ত নত করে ফেলেছিল তার পানে। আমি সেই স্কুলের মারের দিন হতে তাকে দেখছিলুম দেবতার মত চোখে। আমার নিজের শক্তিটা তাকে দিয়ে আমি দাঁড়িয়েছিলুম সম্পূর্ণ নির্ভর করে তার উপরে। আমার যা আলাদা একটা শক্তি আছে—তা আমি ক্রমে ক্রমে একেবারেই ভুলে গেলুম। সে আমায় চালাচ্ছে, আমি চলছি, ক্রমে ক্রমে এই ভাবটাই হৃদয়ে আমার বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়াল।

দুর্গাপূজা উপলক্ষে গ্রামে খুব কোলাহল পড়ে গেল। জমীদার-বাড়ীতে কলকাতা হতে থিয়েটারের দল এসে পড়ল।

নরু বললে—নন্দা, থিয়েটার দেখতে যাবি?

ভাবলুম একবার বলি—যাব না। কিন্তু নরুর শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতেও আমার সাহস হয় না। বল্লুম—দেখি, যদি পারি, তবে যাবখন।

নরু বলে উঠল—যদি পারি—এর মানে কি? কথা অমন দু রকম করে বলতে নেই। একেবারে যা মন হয় স্পষ্ট বলে ফেলতে হয়—যদি টদি গুলো আমি একদম পচন্দ করিনে জানিস তো।

আমি এবার সকল বাধা ঠেলে ফেলে বল্লুম— যাব।

তবে আমি রাত্রে এসে একটা হুইস্‌ল্‌ দেব—তুই ঘুমিয়ে পড়িসনে যেন—সাবধান—তা হলে আর যেতে পাবি নে, এমন সুন্দর থিয়েটার আর দেখতে পাবি নে।

সে চলে গেল।

আমি ভাবতে লাগলুম। থিয়েটার যে দেখতে যাব, সে সাহস মোটেই হচ্ছিল না আমার মনে। বাবা রয়েছেন বাড়ী, যদি তিনি জানতে পারেন, তা হলে যে কি অবস্থা হবে আমার, সেটা মনে মনে অনুভব করে আমি বিষম উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলুম।

কিন্তু নরুর কঠোর আদেশ লঙ্ঘন করতেও মোটে সাহস হয় না যে—। সে যে কতদূর ক্ষমতাশালী তা আমি বেশ জেনে ছিলুম। আমি জেগে থাকতে যে তার আদেশ অবহেলা করব, এমন শক্তিই নেই আমার; তাই কেবল করজোড়ে নিদ্রাদেবীর কাছে প্রার্থনা করতে লাগলুম; হে দেবি। এসো তুমি আমার চোখে, আমায় ছেয়ে ফেলে দাও তোমার অমোঘ শক্তির দ্বারা; আমার জেগে যেন থাকতে না হয়।

জমীদার-বাড়ী বাজতে লাগল বাজনা, তার দিকে কাণ পেতে রইলুম; মাথার মধ্যে অবিরত করছিল ঝম্ ঝম্ ঝম্; তার তালে তালে আমার হৃদয়বীণাও ঝঙ্কার দিতে লাগল ঝম্ ঝম্ ঝম্; আমার প্রতি রক্ত বিন্দু তালে তালে উচ্ছ্বসিত হতে লাগল ঝম্ ঝম্ ঝম্। সেই অবিশ্রান্ত ঝম্ ঝমের মধ্যে থাকতে থাকতে আমার সর্ব্বেন্দ্রিয় যেন অবশ হয়ে গেল; বিধিমতে চেষ্টা করলুম সে অবশতাকে তাড়াবার জন্যে, কিন্তু—না। ক্রমাগত সেই অবশতা আমায় নিদ্রার মোহিনী মাখা কোলের কাছে অগ্রসর করে দিলে। মনে এক একবার অনুভব করতে পারছি—নিজকে জাগরিত করবার চেষ্টা করলুম কিন্তু আর পারলুম না; নিজের শক্তিকে পরের পায়ে নিবেদন করে কখন যে সুষুপ্তির কোলে ঢলে পড়লুম, তা মোটেই জানতে পারলুম না।

তখন কত রাত জানিনে—কোন অদৃশ্য শক্তির দ্বারা চালিত হয়ে হঠাৎ জেগে ধড় ফড় করে উঠে বসলুম বিছানার উপরে; স্পষ্ট যেন মনে হল আমার, কোথা হতে কার হুইসল কাণে এসে বাজলো,—কে যেন ডাকলে—নন্দা।

ঘরের আলো তখন নিভে গেছে; নিঝুম রাত, অবিরত কেবল ভীষণ নিস্তব্ধতাসূচক সোঁ সোঁ শব্দ কাণে ঢেলে দিচ্ছে। সেই অন্ধকারে আমি নিজেকেই নিজে হারিয়ে ফেলেছি—; কেবল আবিলতা মাখা চোখে—শুষ্ক জীবনের অসাড়তা দূর করবার জন্যে ডাকতে লাগলুম, কোথায়—তুমি কোথায়? ওগো অজ্ঞাত—অথচ চিরপরিচিত বন্ধু—কোথায় আছ তুমি? এই অসীম অনন্ত অন্ধকারের মাঝে আমি যে তোমার নাগাল পাচ্ছিনে।

আবার সেই ঝম্ ঝম্—নিথর রজনীর তালে তালে এবার আমার নীরব ইন্দ্রিয়গুলি সঞ্জীবিত হয়ে আমার বক্ষে আঘাত করে ঝঙ্কৃত করে দিতে লাগল—ঝম্ ঝম্ ঝম্। আমি প্রাণপণে তাকাবার চেষ্টা করলুম, প্রাণপণে উঠবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু অবশ কায়ে পড়ে গেলুম আবার বিছানার উপরে—তারপর কখন আবার নিদ্রা এসে কোমল কোলে তুলে নিলে আমায়।

যখন ঘুম ভাঙ্গল—তাকিয়ে দেখলুম তখন,—জানালার ফাঁক দিয়ে সোণার বরণ প্রভাত আলো ঝিকমিকিয়ে ঘরের মেঝের পরে খেলা করছে,—তারই একটু অরুণরেখা কোনখান হতে বিক্ষিপ্ত হয়ে এসে পড়েছে আমার মুখের পরে। বাইরে আমার ঘরের জানালা পাশে যে কুল গাছটী ছিল—তারই ডালে বসে একটা দোয়েল মধুর সুরে শিস্ দিচ্ছে।

পাখীটি গান গায় রোজ ওই গাছটির পরে—, বুঝি আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিতেই সে আসে। অন্য দিন তার এ প্রভাতী তান শুনলে আমার মনটা কি এক অজানা আনন্দে ভরে উঠত; কিন্তু আজ কে জানে কেন,—এর গান শুনে আমার দু চোখ ভরে জল এল। মনে হল, আমার জীবন পূর্ণ হয়নি। আমি তাকে পূর্ণ করবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করছি সত্য, কিন্তু তার একপাশে একটু যে অপূর্ণতা থেকে গিছল, তার দিকে লক্ষ্য করিনি আমি, সেই ছোট অপূর্ণতাটা এখন রাক্ষসের মতই বিশাল ক্ষুধা নিয়ে আমার বুকখানা দখল করে বসে কেবল হাহাকারে উচ্ছ্বসিত করে তুলছে।

কাল রাতে সে এসেছিল,—আমায় ডেকেছিল, কেবল এই কথাটাই ঘুরে ফিরে বাজতে লাগল আমার মনে; সে আমার জন্যে এই গভীর নিশীথকেও গ্রাহের মধ্যে আনে নি,—সব অগ্রাহ্য করেও সে এসেছিল আমার কাছে,—আমি তাকে এমনি আঁধার রাতে একলা পথে ফিরিয়ে দিলুম? কত আশা নিয়ে এসেছিল সে, শেষ হতাশ নিশ্বাস ফেলে ফিরতে হল তাকে?

বিছানা হতে উঠে মুখহাত ধুয়ে চা খেতে বাবার পাশে গিয়ে বসলুম। বাবা এলে পরে মা

আমায় আর ঘৃণা দেখাতে পারতেন না—; তখন তাঁর সবে ধন নীলমণি—আর মেয়েটাকে খাওয়ালেই চলে না। বাবার ডাইনে খাবার কি বসবার জায়গা আমার, বাঁয়ে নীলমণির। মা এ সময় ভালো খাবারটা করে লুকিয়ে তাদের খাওয়াতে পারতেন না—সবটুকুই সকলকে পরিবেশন করে দিতে হত সমান ভাবে।

মা নীলমণিকে খুব ভালোবাসলেও, বাবা যে ভালবাসতেন আমায় খুব বেশী, তা আমি বেশ বুঝতুম। বাবা আমায় মায়ের অজ্ঞাতে লুকিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন—হ্যাঁরে নন্দা! নীলমণির মা তোকে কেমন ভালোবাসেন?

মনে করতুম সত্যি কথাই বলি; কিন্তু তবু বলতে পারতুম না, বলতুম—যেমন নীলমণিকে ভালোবাসেন, তেমনি আমাকেও ভালোবাসেন।

বাবা এ কথা শুনে ভারি খুসি হয়ে উঠতেন।

চা খেতে খেতে বাবা আমার পানে তাকিয়ে চিন্তিতভাবে বললেন—তুই এত রোগা হয়ে যাচ্ছিস কেন রে নন্দা? তেমন সুন্দর মুখখানা এখন হয়েছে কি—গায়ের রঙই বা এত কালো হয়েছে কেন? সতের আঠার বছর বয়স হল, এখন কোথায় হবি বেশ নাদুস-নুদুস মতন, তা না হয়ে হচ্ছিস যেন একটা কাঠের মতন।

মা বললেন—এবার নন্দার একটা বিয়ে দাও; বউমার মুখ দেখে প্রাণটা জুড়িয়ে যাক আমার।

প্রাণটা তাঁর যে কতকটা জুড়াবে, তা আমি বেশ বুঝতে পারলেও, কথা বললুম না।

তাড়াতাড়ি করে চা খেয়ে নিয়ে ঠাকুর দেখবার নাম করে বেরিয়ে পড়লুম আমি। বরাবর দাঁড়ালুম গিয়ে নরুদের বাড়ীর সামনের পথে। প্রাণের মধ্যে যে অব্যক্ত যন্ত্রণা একটা অনুভব করছিলুম—তা ফুটে বলবার কথা নয়।

প্রায় পনের মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার পরে দেখতে পেলুম তার বোনকে; সে তখন কোঁকড়া কোঁকড়া কালো চুলগুলি এলিয়ে দিয়ে—ভালো কাপড় জামা পরে ঠাকুর দেখতে যাবার জন্যে বেরুচ্ছিল।

আমি সেই দিন হতে প্রায়ই তাদের বাড়ী যেতুম—তার মাকে মা বলে ডাকতুম, সুতরাং শান্তির সঙ্গে আলাপও হয়ে গিছল বেশ। সে যদিও আগে বিশেষ লজ্জা করে চলত আমায়, কিন্তু এদানীং কথা বলতে মোটেই বাধত না তার।

তাকে আমার বেশ লাগত। যদিও তার বয়েস হয়েছিল বার তের, তবু তার ভাবটা ছিল ঠিক ছেলেমানুষের মত। আমাদের দেশের ছেলেতে মেয়েতে তুলনা করলে আজও আমি অবাক হয়ে যাই। যে বয়সে আমরা পথে পথে খেলে বেড়াই, সেই বয়সেই মেয়েরা যেন পাকা গিন্নি হয়ে পড়ে। সমান বয়সী একটী ছেলেকে তারা ছোট চোখেই দেখে যায়; এর কারণ ছেলেটীর ক্রীড়াবস্থা, আর তার—গৃহিণী অবস্থা।

শান্তির এ ভাব মোটেই ছিল না। সে ঠিক আমাদের মত কোমরে কাপড় জড়িয়ে সমান ব্যাটবল ফুটবল খেলতে আসত। তার দাদা তাকে রীতিমত একটা ছোটখাট মল্ল করে তুলেছিল। তার মনটাও ছিল খুব ছেলেমানুষের মতই, তার বয়সী মেয়েরা যেমন অকালে প্রবীণত্ব হঠাৎ লাভ করে সংসারে আপনাদের জন্যে স্বতন্ত্র একটি স্থান গড়ে নেয়, এ সে রকম নিতে পারে নি।

তার মা নাকি শাসন করতে যেতেন তাকে, কিন্তু নরু এমন সব দৃষ্টান্ত দেখিয়ে দিত আমাদের দেশের মেয়েদের দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে, যে মা আর কথা বলতে পারতেন না। বাপ থাকলে নরুর এ জারিজুরী কখনও যে খাটত না—এটা নিশ্চয়ই সত্য কথা।

আমাকে দেখেই সে ঠিক দাঁড়াল এসে আমার সামনে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার সর্ব্বাবয়ব দেখতে দেখতে বললে, তুমি আর মোটে এসোনা যে বড়—

আমি একটু থেমে বললুম, কেন প্রায়ই তো আসি আমি।

ঠোঁটটা ফুলিয়ে সে বললে—ইস—বল না কেন তার চেয়ে পতি ঘণ্টাতেই আসি আমি? বাবা গো বাবা—পুরুষ মানুষগুলো এত মিছে কথাও বলতে পারে।

সে চলে যাচ্ছিল দারুণ ঘৃণাভরে, আমি বাধা দিয়ে বললুম—শান্তি তোমার দাদা কোথায়?

শান্তি উত্তর দিল—সে এখনও পড়ে ঘুমুচ্ছে। কাল সারারাত ধরে থিয়েটার দেখে এসেছে, আমি যাওয়ার জন্যে এত জেদ করলুম—বলে অসুখ হবে। উঃ! অসুখের ভয়ে তো মরে গেলুম আমি। না হয় নাই দেখলুম থিয়েটার—বয়েই গেল তাতে।

আমি বললুম—তোমার দাদাকে ডেকে দেবে শান্তি?

শান্তি মাথা নেড়ে বললে—উঁহুঃ, তা পারব না আমি—দাদা এখনি চড়ের চোটে ঠিক করে দেবে আমায়। তোমার মার খাওয়ার ভয় না থাকে, ডাকতে পার তুমি নিজেই গিয়ে—

বলে সে চলে গেল, আর দাঁড়াল না। আমি খানিক একদৃষ্টে তার পানে তাকিয়ে রইলুম। নরু যেমন বীরত্বে অদ্বিতীয় ছিল, তার বোনটিও তেমনি ছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না। এরা দুটি ভাইবোনে আমায় এমন করে আকর্ষণ করে ফেলেছিল যে, আমার ক্ষমতা ছিল না যে তাদের সে ডোর ছিঁড়ে ফেলতে পারি।

খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে আমি নরুদের বাইরের ঘরের বারেণ্ডায় উঠে বসলুম। হঠাৎ সেই সময় নরু সেই ঘরের দরজা খুলে বেরুল।

আমায় এ ভাবে বসে থাকতে দেখে একটা যে বিস্ময়ভাব প্রকাশ করা কি কিছু—কিছুই করলে না সে, যেন আগেই সে জানত আমি আসব এমনি ভাবে, বললে—এসেছিস তুই,—বোস আমি আসছি।

মুখহাত ধুয়ে সে যখন আমার পাশে এসে বসল, তখন তার মুখখানার পানে তাকিয়েই আমার প্রাণটা কাঁপতে লাগল। সে কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে কঠোর সুরে বললে—কি রে, কাল একটা হুইস্‌লের জায়গায় সাত আটটা দিলুম, তবু এলি নে যে বড়?

আমি দোষীর মত শুষ্কমুখে বললাম,—ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

সে বলে উঠল—তবে তো বড্ড মাথা কিনেছিলি আমার। তোর মুখ দেখতেও যেন রাগ হচ্ছে আমার। শুধু তোকে কলকাতার থিয়েটার দেখাব বলেই অতরাত্রে বন-জঙ্গল ভেঙ্গে গেলুম তোদের বাড়ী;—নচেৎ যাবার কি দায় ছিল আমার। এই গোটা কত ষ্টেশন বাদে কলকাতায় গিয়ে পড়লেই কত থিয়েটার দেখতে পাব আমি।

আমি মুখখানা নিচু করে রইলুম—দেখলুম যে আমার নরম ভাব দেখে নিজেও নরম হয়ে গেল। আমার পিঠ চাপড়ে বললে—আচ্ছা—আচ্ছা যা! একবারই না হয় ভুল করে ফেলেছিস, আর যেন এ রকম ভুল করিস নে।

আমার বুক হতে মস্ত ভার একটা বোঝা নেবে গেল। নরু আমায় আদেশ দিলে ঠাকুর দেখতে যেতে, আমিও তার আদেশ মাথায় করে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

৫

তিনটী বছর পরে নরু আর আমি এক সঙ্গেই ফার্ষ্ট ক্লাসে উঠলুম।

লোকে অনেক চেষ্টা করিয়াছিল আমায় নরুর কাছ ছাড়া করবার জন্যে—কিন্তু নরু কিছুতেই আমায় মুক্তি দিতে চায় না। লোকে ঠাট্টা করত—কার্ত্তিকের বাহন যেমন ময়ূর—রামের বাহন হনুমান, নরুর বাহন তেমনি নন্দা।

নীলমণি আমার কাছ হতে মায়ের শাসনে অনেকটা দূরে চলে গিছল। সম্প্রতি মুক্তির বিয়ের জন্যে আমাদের বাড়ীতে খুব ধুম পড়ে গিছল।

শান্তি যদিও ছিল মুক্তির বয়সী—সেও এই পনের বছরে পড়েছে, তবুও তার বিয়ের কথায় নরুর সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখা যেত। সে মনে করত আজও শান্তির বিয়ের উপযুক্ত বয়েস হয় নি।

সেদিন আমার সঙ্গে তার বেধে গিছল তর্ক। আমি সকাল বেলায় তাদের বাড়ী গিছলুম মুক্তির বিয়ের জন্যে নিমন্ত্রণ করতে, নরু তখন বাড়ীর মধ্যে খুব ঝগড়া বাধিয়ে দিছল। আমি চুপ করে বারেণ্ডায় দাঁড়িয়ে ঝগড়া শুনতে চেষ্টা করলুম। বুঝলুম তার মায়ের সঙ্গে ঝগড়া হচ্ছে।

সেই সময় শান্তি আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বাইরে আসছিল; আমায় দেখেই হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল—অন্য দিনের মত সেদিন কলহাস্যের সঙ্গে আমার সম্বর্দ্ধনা করলে না—কেবল কাঁদতেই লাগল। বলব কি, তার এমন করে কান্না দেখে আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। সে যে এমন করে মেয়েদের মতই কাঁদতে পারে, সে ধারণা আমি কখনও করি নি। জোরের সঙ্গে যেখানে সে জয়লাভ করে, সেখানে কেঁদে আজ তাকে পরাজয়ের দারুণ অপমান মাথায় করে নিতে দেখলে—বাস্তবিকই বিস্ময় হয় বটে। তার মধ্যে যে মেয়েদের মতই কোমল একটী নারী-হৃদয় লুকিয়ে রয়েছে, সেটা তার পরুষ ভাব বাইরে প্রকাশ হতে দেয়নি। সাধারণ মেয়েদের মতই তার প্রাণটাও যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে—তা আমি আজ এই প্রথম জানতে পারলুম।

আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলুম—তার খুব কাছেই সে দাঁড়িয়ে ছিল; সাহস করে আমি নিজেই বললুম—তুমি কাঁদছ যে শান্তি, কি হয়েছে তোমার?

হঠাৎ সে উচ্ছ্বসিত ভাবে বলে উঠল—যাও,

তুমি কথা বলতে এসো না আমার সঙ্গে; তোমার জন্যেই তো——।

বলতে বলতে দারুণ বিরাগ ভরে—যেমন অকস্মাৎ এসে সে দাঁড়িয়েছিল আমার সামনে,—তেমনি অকস্মাৎ চোখের পলকে সে অন্তর্দ্ধান হয়ে গেল।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম শুধু।

তার চরিত্রটা আমার কাছে লাগত বড় অস্বাভাবিক। আজ তিন বৎসর ধরে প্রত্যহই দেখছি আমি তাকে, তবু আমি তাকে ভাল করে চিনতে পারলুম না।

আমি বুঝতে পারতুম সে চায় জয়ী হতে, পরাজিতের বোঝা মাথায় নিতে চায় না সে। আমি নিজেই তাকে জয়ী হবার অবকাশ দিছলুম, তার কাছে পরাজয়ের বোঝা ঘাড়ে নিয়েও বড় আনন্দ হত আমার। আমার এ রকম পরাজিতের ভাবটাও তার কাছে বড় অসহ্য হয়ে উঠত—সে তাই এক এক সময় কঠোর বাক্যবাণে আমার হৃদয়কে বিদ্ধ করে দিতেও ছাড়ত না। তার নিষ্ঠুর কথাগুলো আমার প্রাণে আঘাত করত এমন ভাবে, যে আমি তখন যেন মুহ্যমান হয়ে পড়তুম। সময় সময় নিজেকে যখন জাগিয়ে তুলতে যেতুম, তখনি আবার কাণে ভেসে আসত তার মিষ্ট কথা, চোখের সামনে ভাসত তার সুন্দর মুখের চিরমিষ্ট মধুর হাসি; আমার হৃদয় আবার নুইয়ে লুটিয়ে পড়ত তার স্থলপদ্ম-সন্নিভ পায়ের তলায়। আর জাগতে ইচ্ছে হত না, মনে হত, এমনি ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই জীবন আমার কেটে যাক, আর যেন জীবন-নিশা'র অবসান না হয় আমার।

বাস্তবিক সে ছিল আমার কাছে কবির স্বপ্ন সমান,—আমার মনে হত, সে জড়িয়ে আছে একটা সূতা দিয়ে আমার জীবনটাকে, সে সূতা এমন শক্ত যে ছিঁড়িতে যাওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য। তিলে তিলে আমার জীবনটা সে গ্রাস করে বসেছিল।

যখন আমি নিজের স্বপ্নে ভোর হয়ে গিছলুম, তখন ভুলে গিছলুম—আমার বাইরে আছে বিশাল জগৎ, তার সঙ্গে প্রতিনিয়ত সম্পর্ক রাখতে হচ্ছে আমার। হঠাৎ সে জ্ঞান ফিরে এল নরুর কথায়, সে কঠোর সুরে বলছে—তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার।

আমি হঠাৎ চমকে উঠলুম; তার মুখের পানে তাকিয়ে দেখলুম—একটা বিভীষিকা বিরাজ করছে সেই মুখখানাতে; তার এমনতর মুখ কখনও যে চোখে পড়েছে আমার, তা মোটেই মনে হয় না।

আমি যে বিস্মিতভাবে তাকিয়ে আছি তার পানে, নরু সে দিকে মোটে কেয়ারই করলে না;—সে আমার পাশে একখানা টুল টেনে নিয়ে বসে পড়ল; আমার পানে তাকিয়ে বললে—বস এখানে।

আমি সুবোধ ছেলেটীর মত তার পাশে বসে পড়লুম। সে খানিক এদিক ওদিক চাইতে লাগল—তারপর হঠাৎ আমার পানে তাকিয়ে বললে—তুই দেবতা মানিস নন্দ'?

এমন আশ্চর্য্য প্রশ্ন এটা—আর এমন জায়গায় উক্ত হল, যে হঠাৎ উত্তর দেওয়াই মুস্কিল। আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়ে তার পানে তাকিয়ে রইলুম, এ প্রশ্নটীর উত্তর যে কি দেব, তা কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারছিলুম না।

নরু কড়াস্বরে বললে—হাঁ করে তাকিয়ে আছিস যে, বল না কি তোর মনের ভাব? গরুর মত কেবল খেতে আর বেড়াতে শিখেছিস হতভাগা কোথাকার, কোন একটা আইডিয়া যদি তোর থাকে।

কথা শেষ করেই সে পকেট হতে একটা বিড়ি বার করে খস করে দেশালাই জ্বেলে ধরিয়ে নিলে; তারপর প্রাণপণে একটা টানে তার প্রায় সবটা ছাই করে ফেল্লে—লালরঙের চোখ দুটো বিস্ফারিত কণ্ঠে আমার পানে চাইলে—কি! এখনও বুদ্ধিটা আসে নি মাথায়?

আমি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে অ্যাঁ উঁ করতেই সে অস্বাভাবিক রেগে উঠল; আর একটা অসম্পূর্ণ টানে বিড়িটাকে সাবাড় করে ফেলে সে উঠে পড়ল। ঘৃণাপূর্ণ সুরে বলে উঠল—তোর মত সেন্সলেস্ ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাই হয়েছে আমার মত লোকের অনুচিত। যাই হোক—যা তুই, ঘরের ছেলে—ঘরে ফিরে যা; আমি তোকে মুক্তি দিচ্ছি।

তার কাছ হতে মুক্তি নেওয়া আর মৃত্যুকে বরণ করা—এ দুই-ই আমার কাছে সমান এখন। আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলুম—কি বললে তুমি, তা বুঝতেই পারলুম না, তবে উত্তর দেব কি?

নরু বসে বললে—সত্যি বুঝতে পারিস-নি তুই? তবে শোন বলি সব। এই মাত্র যার সঙ্গে আমার খুব ঝগড়া বেধেছিল, তা বোধ হয় শুনেছিস?

আমি মাথা নেড়ে বললুম—আমি তো এই মাত্র সবে এলুম।

নরু খুব খুসীর ভাবে আর একটা বিড়ি ধরালে—আমাকেও একটা দয়া করে দিলে। এটা তার অপূর্ব্ব দয়াশীলতার লক্ষণ বলে জ্ঞান করে তাড়াতাড়ি সেটা নিলুম আমি।

নরু গলাটা খুব গম্ভীর করে বললে—দেখ নন্দা! মেয়ে জাতটাই এমন বদ, তা আর বলব কি? তা হোকগে, যাক আমার মা, তা বলে কি অন্যায় কথাটাও তাঁর মাথা পেতে নিতে হবে নাকি? তিনি যদি একটা অন্যায় কাজে হাত দিতে বলেন আমাদের, আমরা জেনে শুনে হাজার হাজার বই পড়ে, জ্ঞান লাভ করে, কেন তা মাথা পেতে নিতে যাব? তোর মত কি নন্দা?

আমি বললুম—তা তো ঠিক কথাই।

বলেই হঠাৎ যেন চমকে উঠলুম। বছর চারেক আগে আমি কি ছিলুম, আর আজ কি হয়েছি—এই কথাটাই এসে যেন হঠাৎ আহত করে গেল আমায়। আমি নিজেও কি বুঝতে পারছিলুম না তা? নরু যে আমার বন্ধুরূপে আমার সর্ব্বনাশ করছে; তা বেশ জানতে পেরেছিলুম, কিন্তু জানলেও আমার ঘরে যাবার ক্ষমতা কোথায়? তার সঙ্গে পড়ে নিজেকে নিজে কলঙ্কিত করে ফেলেছি, এই কথাটা যখনি ভেসে উঠত আমার মনে, তখনি যেন আমি কোথা হতে কোন অতল গর্ত্তে পড়ে গিয়ে হাঁফিয়ে উঠতুম। মায়ের কথা কেন মাথা পেতে নেব—এ কথাটায় সম্মতি দিয়েই হঠাৎ মনে হয়ে গেল—সেই মা, যিনি গর্ভযন্ত্রণা সহ্য করেছেন—নিজের বুক হতে রক্ত টেনে এনে আমাদের মুখে ধরেছেন—জগৎ চিনিয়ে দিয়েছেন। যাঁর কথা হতে কথা বলতে শিখেছি, যাঁর চোখ দিয়ে স্বভাবের সৌন্দর্য্য—জগৎ দেখতে শিখেছি, যাঁর কাণ দিয়ে কথা শুনতে শিখেছি—তাঁকে আজ সামান্য বইয়ের বিদ্যার বলে অবমাননা করতেও সঙ্কুচিত হচ্ছিনে আমরা। হা রে পিশাচ সন্তান! এই তোর বিদ্যাবুদ্ধির অহঙ্কার? হা অভাগিনী মা; এই তোমার বুকভরা স্নেহ ঢেলে দিয়ে মানুষ করা সন্তানের কথা?

নরু আনন্দে গর্ব্বে ফুলে উঠে বললে—দেবতা আর দেবতা। মা সব তাইতে ওজর করে দেবতার। বল দেখি নন্দা! কতকগুলো মাটী আর খড় দিয়ে গড়ানো পুতুল, সেটা নাকি হয় দেবতা—? অমন দেবতাকে আমি জুতো দিয়ে উল্‌টিয়ে ফেলে দি—ওই পচা পানাভরা পুকুরটার মধ্যে। আজ খুব বলেছি কিন্তু রে—মা কিন্তু কাঁদছে বড়। তা কাঁদলে আর আমি করব কি? আমি মানব না অমন দেবতা—যা শুধু মাটী খড় দিয়ে তৈরী,—আমি মানব না ও সব পুরাণ শাস্ত্র, যা কেবল কতকগুলো লোকে গাঁজা খেয়ে নেশার ঝোঁকে স্বপ্ন দেখে বর্ণনা করে গেছে। আচ্ছা বল দেখি নন্দা! আমরা যখন সিদ্ধি খাই, কেমন স্বর্গের ছবিগুলো চোখে ভেসে ওঠে; আমরা যদি বই লিখতে পারতুম, তা হ'লে এমন করে এঁকে দিতুম—স্বর্গ আর নরকের ছবি, যা পড়লে মানুষ একেবারে আত্মহারা হ'য়ে যেত; প্রতি বইখানা সাত টাকার কমে বিক্রী হত না, তুই সত্যি করে বল দেখি—মানিস কি এই শাস্ত্র-টাস্ত্র গুলো, আর ওই দেবতাগুলোকে? আমি মাথা নেড়ে বলে উঠলুম—কখনো না।

মনে একটা আঘাত এসে লাগল বটে—কিন্তু সেদিকে মোটেই কেয়ার করলুম না। নতুন নতুন তর্কের দ্বারা নরু তখনি জলদ-গম্ভীর স্বরে প্রমাণ করে দিলে—দেবতা নেই—ধর্ম্মশাস্ত্রগুলো অসার। আমি চুপ্ করে তার প্রমাণগুলো মেনে নিলুম। নরু বললে—শান্তির বিয়ের জন্যে হ'য়েছে আমার বেজায় ভাবনা। আমার খুব ইচ্ছা বুঝলি নন্দা,—যাতে তোর সঙ্গে তার বিয়েটা হয়—।

"আমার সঙ্গে?"—হঠাৎ আমি চম্‌কে উঠলুম, যা অতি সহজেই পড়ে গেল নরুর চোখে, সে বিস্ময়ের ভাবে বললে—কি রে, এতটা চম্‌কে উঠলি যে, শান্তিকে বুঝি পছন্দ হয় না তোর?

আমি বললুম—তোমরা বারেন্দ্র—আমরা রাঢ়ী, সে কথাটা ভুলে যাচ্ছ নাকি? জানোই তো—আজও আমাদের দেশে রাঢ়ী-বারেন্দ্রে বিয়ে হয়নি।

খুব উত্তেজিত ভাবে নরু সামনের বেঞ্চে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে বলে উঠল—তা জানি আমি, জানি বলেই রাঢ়ী বারেন্দ্র বিয়ে দিতে চাই। না হয় হিন্দু সমাজ নাই নেবে আমাদের, বয়ে গেল তাতে।

কিন্তু তার বয়ে গেল—আমার কিছুতেই বয়ে যেতে পারে না। আমার বাপ আছেন—মা যদিও সৎমা—তবু মা তিনি—ভাই বোন সবাই আছে। আমি মাথা নিচু করে ভাবতে লাগলুম।

যদিও শান্তিকে বড় ভালবাসি আমি, কিন্তু তাকে পাবার আশা রেখে তো ভাল বাসিনি। প্রথম যেদিন সে প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোর মতই

তার অনুপম সৌন্দর্য্য বিকাশ করে, আমার প্রাণের তারে সাড়া দিয়ে এসে দাঁড়াল আমার সামনে—সেইদিন তখন হতেই জেনে রেখেছি—তাকে চোখে দেখবার অধিকার শুধু আছে মাত্র আমার। তাকে পাওয়ার আশা করা আমার কাছে মরীচিকাবৎ। আমি যতই ভালোবাসি না কেন তাকে, তবু সে আমার হতে পারবে না, কারণ আমাদের মাঝে রয়েছে রাঢ়ী-বারেন্দ্রের প্রভেদ। বুঝি যুগান্তেও এ প্রভেদ এমনি ভাবে থেকে যাবে।

আমি আস্তে আস্তে মাথা উঁচু করতেই দেখলুম, নরু বাঘের মতই তাকিয়ে আছে আমার পানে; আমায় মাথা তুলতে দেখেই সে বললে—কি চাস তুই বল এখনও; তোর কথামত কাজ হবে, সেটা জেনে রাখিস। এখন কেবল তোর একটা কথার পরে শান্তির ভবিষ্যৎ জীবনটা নির্ভর করছে। তা বলে তুই মনে ভাবিস নে নন্দা, তোকে পেয়ে আমার বোন সম্মানিত হবে;—তোকে সম্মানিত করবার জন্যই আমি শান্তিকে দিতে চাচ্ছি তোকে, তা জেনে রাখিস। শুধু তোকে ভালবাসি, সেই খাতিরেই।

তার এই সুদীর্ঘ লেকচার তত কাণে এল না আমার; আমি তখন ভাবছিলুম—আকাশ আর পাতাল। নরু আমার ভাবনা দেখে বললে—কি ভাবছিস বল দেখি? তুই যে মেয়েমানুষের মতন ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে বসে গেলি দেখছি। যে পুরুষ হবে—সে অতীত ভবিষ্যৎ কিছু দেখবে না, দেখবে শুধু বর্ত্তমানটা। আমি—বুঝলি, দেখিস কি করব? নিজে আমি ইণ্টার ম্যারেজের পক্ষপাতী—তোর মত ওল্‌ড এটিকেট নিয়ে বসে থাকব না দেখে নিস তা। তুই একটা ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে—বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের মেয়েকে বিয়ে করতে ভয় পাচ্ছিস, আমি বিয়ে করব লো কাস্টের মধ্যে—যাদের ঘৃণা করে মুখ ফিরিয়ে চলে যাস তোরা।

আমি থেকে থেকে বললুম—বাঃ! তুমি ভাবতেও দেবে না?

নরু বললে—যা বসে বসে ভাবগে যা। কিন্তু বেশী দেরী করিস নে যেন; সাত্তদিনের মধ্যেই উত্তর দিতে হবে তোকে। শান্তি বড় হয়ে উঠেছে, আর তো রাখতে পারছি নে তাকে—।

সাতদিনের অবকাশ পেয়ে আমি হাঁফ ছেড়ে বেঁচে গেলুম। মনে হল—যমরাজার কাছ হতে কয়েকদিনের জন্যে মুক্তি পেয়ে গেলুম। এর মধ্যে যদি এমন কোনও একটা অনৈসর্গিক ঘটনা ঘটে যায়,—যাতে আমার সঙ্গে শান্তির বিয়ের কথাটা উলটে যায়। তাকে ভালবাসা সহজ—কিন্তু গ্রহণ করা বড় কঠিন। ভালোবাসাটা আজকালের দিনে তো কঠিন কাজ নয়, পথে ঘাটে ভালোবাসার মত মানুষ যথেষ্ট আছে। মুসলমানীকেও যে কত হিন্দু ভালোবেসে থাকে, তা বলে তাকে জীবনের সহচারিণী করিবার উপযুক্ত বলে হয়তো মনে করতে পারে না।

নিমন্ত্রণের কার্ড দিয়ে বিদায় হলুম আমি;—পিছন হতে নরু ডেকে বললে,—মনে রাখিস—ঠিক সাতদিন! আজ সোমবার, এর পরের সোমবারে ঠিক তোর মনের কথা আমি চাই—ই।

আমি তখন পালাতে পারলে বাঁচি; ঘাড় ফিরিয়ে বললুম,—তাই—তাই হবে।

দ্রুতপদে তাদের বাড়ী ছেড়ে পথে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

৬

বাবা বাড়ী এসেছেন—আমাদের আত্মীয় আত্মীয়া যে যেখানে ছিল, সকলেই এসেছেন আমাদের বাড়ী। মায়ের একটি ছোট ভাই—তাঁর মা—তাঁরাও এসেছেন।

ভাইটির নাম ছিল রমেন কি রমেশ জানিনে, সকলে ডাকত তাঁকে রমুবাবু বলে। রমুবাবুর মুখে অবিরত খই ফুটত, মানুষে যে এত বকতে পারে—তা কখনও জানতুম না আমি।

রমুবাবু আমায় মোটেই দেখতে পারতেন না—বোধ হয়, তাঁর ভাগিনেয়ের অংশীদার বলে, কিন্তু এটা তাঁর ভাবা উচিত ছিল খুব, আগে তাঁর ভাগিনেয় এসেছিল কি আগে আমি এসেছিলুম।

বাবা দিনরাতই কাজে ব্যতিব্যস্ত—চাকরগুলো কোথায় ঠিক নেই তার। রমুবাবু বাবার বিছানাটায় পড়ে মোটা তাকিয়াটা দখল করে বসেছেন। নীলমণি তাঁর কাছে বসে আপনার অসীম বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিতে ব্যতিব্যস্ত। আমি নিমন্ত্রণের কার্ডগুলিতে ঠিকানা লিখছিলুম।

রমুবাবু—একবার কলকেটাতে হাত দিয়ে দেখলেন, আগুন নিভে গেছে। তামাকের জন্যে প্রাণটা তাঁর বড় তৃষিত হয়ে উঠেছিল,—কয়েকবার 'তামাক দিয়ে যা রে' বলে হাঁক পাড়লেন, কিন্তু বিয়ে-বাড়ীর কাজ, কোথায় কে আছে ঠিক নেই তার, কাজেই কেউ এল না তাঁকে তামাক দিতে।

নিরুপায় ভাবে নীলমণির পানে তাকিয়ে তিনি

মিষ্ট কথায় বললেন,—বাবা নিলু! এক ছিলিম তামাক সেজে খাওয়াতে পার?

নীলমণি একেবারে সাত হাত চমকে উঠে বলে উঠল—ওরে বাপরে, তামাক সাজব আমি? আমি কি তামাক সাজতে জানি?

মামা করুণস্বরে বললেন—আমি শিখিয়ে দিচ্ছি বাবা! এই এমনি করে কলকেটা ধরে—ঠিকরে একটা—।

বাধা দিয়ে নীলমণি বললে—ঠিকরে আবার কাকে বলে?

রমুবাবু বললেন—এই একটা ইঁটের টুকরো—কি মাটীর ঢেলা যাই হোক—

নীলমণি হাতখানা তুলে পাঁচটা আঙুল দিয়ে দেখালে, এই এত বড়?

রামুবাবু বললেন—ওরে বাস রে! যত বড় কলকে নয়, তত বড় ঠিকরে দেখাচ্ছিস যে তুই? এই এতটুকু ঠিকরে লাগবে এতে; তারপরে এতটুকু তামাক নিয়ে বেশ করে গুঁড়িয়ে দিয়ে, একটু টিপে, তার উপরে খানকয়েক টিকে আগুন দিয়ে—।

নীলমণি দারুণ অবজ্ঞা ভরে উত্তর দিলে—ও সব আমি পারব না মামা। আমি কখনো তামাক সাজিনি—আজ সাজতে যাব তোমার জন্যে? বাবা—যখন চাকর না থাকে, নিজে সেজে খায়, তবু আমায় বলে না—নীলু এক ছিলিম তামাক সাজ।

রমুবাবু খানিক হাঁ করে গুণধর ভাগনের পানে তাকিয়ে রইলেন। আমি আড়ে আড়ে তাকাচ্ছিলুম, আর হাসিতে আমার সারা বুকটা ভরে উঠছিল। বিস্ময়টুকু বেশ মানিয়েছিল তাঁর মুখে। তাঁর মুখখানা ছিল সম্পূর্ণ গোলাকার—চাঁদের মত গোল মুখ যাকে বলে তাই। চোখ দুটীও ছিল বেশ গোল সাইজের—আরো মানিয়েছিল তা সেই গোল মুখে। বেশী বর্ণনায় দরকার নেই; এক কথায় এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে—যে তাঁর পা হতে মাথা পর্য্যন্ত সবই গোল। তাঁর চেহারাটায় এমন অসাধারণ গোলত্ব ছিল, লোকে দেখেই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত; তারপর যখন বুদ্ধির গোলত্বের পরিচয় পাওয়া যেত, তখন লোকে তাঁকে জু-গার্ডেনে রাখবার পক্ষে উপযুক্ত জীব বলেই মনে করত। সেই গোল মুখে যে গোঁফজোড়াটা গজিয়েছিল, তা আবার বর্ত্তমান ফ্যাসানের উপযুক্ত করে দুইদিকে একেবারে চেঁচে ফেলা দেওয়া—অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য।

নীলমণি তখন লাফাতে লাফাতে মামাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে গেল—তখন আমি খুব মনোযোগের সঙ্গে ঠিকানা লিখিতে লাগলুম খুব ক্ষিপ্রহস্তে, আর মাথা কি মুখ একটু ঘুরালুম না। ভাবলুম এবার তো জেনারেলের অর্ডার সাপ্লাই করতে হবে আমাকেই,—গভীর মনোযোগের চিহ্ন দেখলে যদি সাহস করে কিছু না বলেন।

খানিকক্ষণ কেটে গেল—তখনও জেনারেলের অর্ডার না পেয়ে আস্তে আস্তে ঘাড়টা ফিরিয়ে দেখলুম, তিনি কলকেটা হাতে নিয়ে পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় বসে আছেন। তাঁর ভাগনে যে তাঁকে এমন অবহেলা করে যেতে পারে, এটাই লেগেছিল তাঁর মনের মধ্যে খুব বেশী রকম।

আমি তাঁর পানে তাকাতেই তিনিও তাকালেন; কলকেটা গড়গড়ায় রেখে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন,—এখানে আসাই হয়েছে ঝকমারী; যেখানে তামাক একছিলিম পাওয়া যায় না, সেখানে আবার ভদ্রলোকে আসে কখনও।

তাঁর মনের উদ্দেশ্য যা,—তা আমার মত চালাক ছেলের বুঝতে একটুও দেরী হল না। কিন্তু তাঁর এই কথা শুনেও ভদ্রলোকের সম্মান রক্ষার্থ আমি উঠলুম না; তিনি আমার সঙ্গে বড় একটা কথা বলতেন না, তবে আমিই বা যেচে কেন কথা বলতে যাব—কেনই বা চাকরের মত তামাক সাজতে যাব?

তিনি দেখলেন, আমি তেমনই স্থিরভাবে বসে রইলুম, তখন আবার আপনা আপনিই যেন বলতে লাগলেন,—ছোট লোক—ছোট লোক; যদি সব ভদ্রবংশে জন্ম নিত, ভদ্রলোকের মত ব্যবহার শিখত। ছোট বংশে জন্ম, কাজেই ভদ্রতার জানবে কি? দিদির কপাল, তাই এমন ছোট লোকের ঘরে পড়েছে।

আমার ভেতরে যে একটা শান্তভাব ছিল, সেটা সরে গিয়ে উদ্ধত ভাবটাকে এগিয়ে দিলে;—আমি কলমটা ইঙ্ক ষ্টানডে ফেলে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ফিরে চাইলুম;—কি মশায়! কেবল ছোট লোক ছোট লোক করছেন কাকে? ছোটলোকের বাড়ী এসে রাজার মত গদীতে আছেন বসে—সেটা বুঝলেন না? সাবধান বলছি, অমন ছোটলোক ছোটলোক করবেন না।

তিনি আমার উদ্ধত ভাব দেখেই থতমত খেয়ে গেলেন; নরম সুরে বললেন—তোমাকে বলছে কে হে?

আমি বল্লুম—আমাকে বলছেন না তো কি?

আমার বাবাকে বললেই আমাকে বলা হল, তা জানেন? আপনার বাবাকে যদি গাল দি আমি —চুপ করে কি থাকতে পারেন আপনি?

রমুবাবু মেয়েদের ভঙ্গীতে গালে হাত দিয়ে—গোল গোল চক্ষু দুইটী ঘুরিয়ে বললেন—ধান ভানতে এলো শিবের গীত। তোমার কথাগুলো বেজায় অসম্মানকর। সভ্য সমাজে এমন ভাবে কথা বললে—এক গালে চুণ—এক গালে কালি দিয়ে বিদায় করত তোমায়। এখন হতে রীতিমত শিক্ষা না করলে, তোমার ভবিষ্যৎ জীবনটা ভারী খারাপ হয়ে যাবে।

আমার মুখে আসছিল হাসি, অতি কষ্টে হাসি চেপে বল্লুম—তা হয় যদি হবে—তাতে আর কি হবে মশায়? আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে চলতে হবে না তো আপনাকে। যা হবার হবে অদৃষ্ট ভেবে কে কবে চলে বলুন দেখি?

রমুবাবু পাঁচ মিনিটকাল অতি কষ্টে মুখ বুজিয়ে বসে থাকলেন, তারপর নেহাৎ আর থাকতে না পেরে নিজেই কলকে নিয়ে উঠলেন। আমার পানে তাকিয়ে বললেন—যাই হোক বাপু! দয়া করে না হয় বলে দাও কোথায় আছে টিকে তামাক।

আমি গভীর মনোযোগের সঙ্গে লিখতে লিখতে বল্লুম—দেখুন, খুঁজে নিন গে; কোথায় টিকে—কোথায় তামাক, ঈশ্বরের ইচ্ছায় সে সব খোঁজ রাখবার সময় হয়নি এখনও আমার।

রমুবাবু রাগে গর গর করতে লাগলেন; কি যে করবেন, তা ভেবে ঠিক করতে পারলেন না। রাগে তাঁর গোল গোল চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠছিল। তাঁর আবার বেশী রাগলে পরে কথা বার হত না—তো তো করতেই দিন চলে যেত। তাঁর রাগত ভাব দেখে আমি কলমটা রেখে স্বগত ভাবে অথচ বেশ জোরের সঙ্গে বলতে বলতে বেরুলুম—রাগ যে করবে, ঘরের ভাত না হয় বেশী করে খাবে সে; পরের তাতে বয়ে যাবে।

বাইরে এসে চলে যেতে জানালার পাশ হতে দেখলুম, তিনি কলকে হাতে নিয়ে রাগে আত্মহারা হয়ে তেমনি ভাবেই বসে আছেন। আমি একেবারে সেখান হতে চম্পট দিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলুম।

তখন মেয়েদের নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা হচ্ছে। পাঁচ ছয়টি বর্ষীয়সী বিধবা বেশ সভ্য ধরণে সেজে দাঁড়িয়েছেন নিমন্ত্রণ করতে যাবার জন্যে। মা আর ও-বাড়ার ঠাকুমা—নিমন্ত্রণ করতে হবে যে যে পাড়ায়—এক একজনের উপর ভার দিচ্ছেন।

বামুন-পাড়ায় যে সব বাড়ী নিমন্ত্রণ করা হল, নরুদের বাড়ীও তার মধ্যে একটী। কিন্তু যিনি যে পাড়ায় নিমন্ত্রণের ভার নিতে অগ্রসর হয়েছেন, সেই বর্ষীয়সী টেনার পিসীমা হঠাৎ বেঁকে বসলেন। তিনি তামাক পোড়ার কৌটাটী সযত্নে খুলে—এক টিপ কালোগুঁড়ো নিয়ে দুইপাটী দাঁতে বেশ করে ঘসতে ঘসতে বললেন,—আমি তবে ও-পাড়ায় নেমতন্ন করতে পারব না।

মা—ঠাকুরমার পানে তাকিয়ে বললেন,—শরৎ সান্ন্যালের বাড়ীটা বাদ দিতে হবে। তুমি তো গাঁয়ে থাক না খুড়ি-মা;—গাঁয়ের কথাও জানো না সেই জন্যে। ওরা বরাবরই প্রায় একঘরে মতন হয়ে আছে। তবু যাও বা লোকে লুকিয়ে নেমতন্ন করত, সমাজকে না জানিয়ে, এখন তাও বন্ধ হয়ে গেছে।

ঠাকুরমা দুইটী চোখ বিস্ময়ে উজ্জ্বল করে বললেন,—কেন গা বউ-মা? ওরা লোক তো খুবই ভালো।

টেনার পিসী একটু মুখ মুচকে হেসে বললে,—বড্ড ভালো লোক মা, বড্ড ভালো লোক। ওই শরতা সান্ন্যাল ছিল পুলিসের দারোগা,—বউ নিয়ে যেখানে সেখানে ঘুরেছে; ওর কি জাত ধর্ম্ম কিছু আছে আর? তখন কত লোকে বলেছিল, 'তুমি পুরুষ মানুষ—যেখানে খুসী যাও গে, বউ নিয়ে কি দেশ বিদেশে ঘুরতে আছে?' সেই হতেই গাঁয়ে একটা সাড়া পড়ে গেছে—ওদের জাতটা ঠিক নেই। এই যে বিধবা মাগী রয়েছে,—জ্বর হলে ডাক্তারী ওষুধ—আর ওই যে কি নামটা বলে মা—ছোঁড়া না গোঁড়া—

মা বলে দিলেন—সোডা ওয়াটার।

মাথাটা দুলিয়ে টেনার পিসী বলে উঠলেন—ঠিক ঠিক! ওই নামই বটে। তা হ্যাঁ গা! ওর কি বাঙ্গলা নাম নাই কিছু? ও ইংরিজি ফিংরিজি-গুলো সহজে বেরোয় না মুখ দিয়ে। যাই হোক, ওই গুলো খায় যে ক্যাঁৎ ক্যাঁৎ করে, দেখলে যেন জ্বর আসে। বিধবা মাগী; মরবার কি এতও ভয় প্রাণে? মুরগির ওই বিলিতি চব্বিগুলো না খেলে মানুষ কি আর বাঁচে না গা? তারপরে, ওই যে ধেড়ে ছেলে মেয়ে দুটো আছে, ওদুটোতো আস্তো খিরিষ্টেন। ছেলেটার এমন মুখ যে বলব কি? যাকে যা না বলবার তাই বলে বসে। যা পায় তাই গেলে রাক্কসের মত। সেদিন আমাদের টেনা বললে কি জানো? নরু নাকি—কি উইলসন

সাহেব আছে, তার দোকানে গিয়ে খানা খায়। ঘেন্নায় মরি তখন এ কথা শুনে। আবার বলে কি-- দেবতা টেবতা মিছে কথা, খড় আর মাটী বই কিছু নেই। ওই যে বুড়ো হাতীর মত মেয়েটা আছে, পায়ে পরে আবার ছেলেদের মত জুতো ইষ্টাকিং। মেয়ে আবার সাহেবদের মত ক্যাচ ক্যাচ করে ইংরিজি বলে। মা—মা—মা! কোথায় যাব—কোথায় যাব? ওদের বাড়ী নেমতন্ন করলে কেউ আসবে না তোমাদের বাড়ী খেতে, এ আমি স্পষ্ট বলে দিলুম। ওরা আমাদের সমাজ হতে বাইরে গেছে।

ঠাকুরমা মাথা নেড়ে বলে উঠলেন—তবে থাক বাছা থাক! ওদের বাড়ী বাদ দিয়ে আর সব বাড়ী নেমতন্ন করে এস গে।

প্রসন্ন মনে হেলে দুলে টেনার পিসী চলে গেলেন। মা ঠাকুরমার পানে তাকিয়ে বললেন,—আজ কাল তোমাদের নন্দারও দেখছি ওদের বাড়ীর দিকে ভারী টান। দু-তিন দিন ওদের বাড়ী খেয়ে এসেছে। একথা আমি কাউকে বলিনি। বলব আর কি? নিজের ঘরের ছেলে—ফেলা যাবে না তো আর; কাজেই সব সয়েও থাকতে হয়।

ঠাকুরমা বললেন—তা তো ঠিকই। ওই যে কথায় বলে না—নিজের ঘরের কলঙ্ক—নিজেদের হাঁড়ি চাপা দিয়ে ঢেকে ফেলতে হয়, যেন ধোঁয়াটা উঠে আকাশ না ছাইতে পারে।

আমি থামের আড়াল হতে আস্তে আস্তে সরে যাবার উদ্যোগ করছিলুম—হঠাৎ ঠাকুরমার চোখে ধরা পড়ে গেলুম। ডাকলেন—শুনে যা নন্দা।

বিষম বিপদ দেখে আমি ব্যস্ততার সঙ্গে বললুম,—বাবা ডাকছেন,—শুনে আসি আগে—বলেই পিঠটান দিলুম।

৭

নিমন্ত্রিতগণে সারা বাড়ীটা ভরে গেল। আমি তখন তাদের সম্বর্দ্ধনার দায়িত্ব মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে। দুশ্চিন্তায় আমার মুখে হাসি ফুটতে পারছিল না।

আমি কিছু না শুনে বোকার মতন আগেই গিয়ে নিমন্ত্রণ করে এসেছি নরুকে। সেও হয় তো জানে না, নিশ্চয়ই আসবেখন বন্ধুর অনুরোধে তার বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। সে আসলে পরে যে কি অনর্থ হবে, তা আমি বেশ বুঝতে পারছিলুম। নিজের পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করেছি না জানতে পেরে, যতই সেটা ভাবছিলুম, ততই মনটা যেন দমে যেতে লাগল। নিজেকে নিজের কুঠারাঘাতে জর্জ্জরীভূত করে ফেললুম।

মনে মনে কেবল তখন প্রার্থনা করেছি, হে ঠাকুর! যদি তুমি সত্যি হও, তবে নরু যেন না আসে—এইটা করে আমার মনে বিশ্বাস জাগিয়ে তোলো। আমায় অপমানের দারুণ নিপীড়ন হতে রক্ষা কর।

নিমন্ত্রিতেরা তখন সব সুগন্ধি অম্বুরীতামাক, যা বাবা গয়া হতে অনেক দামে মেয়ের বিয়েতে এনেছিলেন, তাই ভস্মে পরিণত করছিলেন, আর নানা রং-বেরংয়ের মজাদারী গল্পে বিয়ে-বাড়ী হাসিতে উচ্ছ্বসিত করে তুলছিলেন। তাঁরা যে কি কথা বলছিলেন—যা এত হাস্যকর, সেটা প্রথম আমার কাণে বাজেনি; তারপর যখন ফিরলুম, দেখলুম তাঁদের হাসির বিষয় নরু—আর শান্তি—।

ভদ্রলোকের মজলিসে যে ভদ্রলোকের মেয়ের চরিত্র এমন ভাবে সমালোচিত হতে পারে, তা আমি জানতুম না। আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম এই দেখে যে, নিষ্কলঙ্কা শান্তির দেবী-চরিত্রে তাঁরা অযথা কলঙ্কার্পণ করে—অতি ঘৃণিতভাবে তাকে অঙ্কিত করে, হাসি-তামাসা করতে লাগলেন। ঘৃণায় আমার সারা বুকটা ভরে উঠল; মনে ভাবলুম এঁরাই আবার ভদ্রলোক? এঁরাই শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, দেশের সুসন্তান নামে পরিচিত হতে চান! মেয়েদের মত যাঁরা পরের সমালোচনা—বিশেষ মেয়েদের সমালোচনা করেন, তাঁদের আমি কিছুতেই ভদ্রলোক বলে ভাবতে পারব না।

এঁদের দৃষ্টান্ত দেখেই আবার এঁদের ছেলেরা নিজেদের গঠন করে তুলবে। মেয়েদের কথা ছেড়ে দেই; তারা হাজার লেখা-পড়া শিখলে, হাজার জ্ঞানবতী হলেও, ঈর্ষা আর পরচর্চ্চা করাটাকে কিছুতেই ত্যাগ করতে পারে না। তা সেটা হতেও পারে কতকটা বটে। কারণ, হিন্দু সমাজের মধ্যে সেটা নিশ্চয়ই হতে পারে। কেন না বাইরে যাদের অধিকার নেই, সংসারের কাজকর্ম্মগুলো সেরে নিয়ে যারা দিন কাটাবে, পরচর্চ্চা আর নিন্দাটা হচ্ছে তাঁদের চাটনি। যেমন খুব বেশী খেতে খেতে জিভটা অসাড় হয়ে এলে একটু অম্বল খেয়ে জিভটাকে কার্য্যের উপযোগী করে নেওয়া হয়, তেমনি গৃহকর্ম্মে অথবা লেখাপড়া করতে করতেও মনটা যখন অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তখন পরনিন্দা করে মনটাকে সচেতন করিয়ে নেওয়া হয়।

সেটা যেন মেয়েদের পক্ষে, কিন্তু পুরুষ যারা, যাদের সামনে কাজ, পেছনে কাজ,—বাইরের দশটা কাজে যাদের মাথা ঘামাতে হবে, তারাও যে মাঝে মাঝে মেয়েদের চর্চ্চা করে প্রফুল্লিত হন—এটা বড় অস্বাভাবিক বলে ঠেকে না কি? পুরুষ থাকবে পুরুষের মত, মেয়েরা কি করছে না করছে, তা সমালোচনা করতে যাবে কেন তারা? যাদের নজর বেশী উঁচু, গোঁড়া হিন্দু যাঁরা, পর্দ্দাপ্রথা যাঁদের চোখে খুব ভালো, মেয়েরা যাতে খাঁচায় ঢেকে রাখা পাখীর মত থাকতে পারে সেই বিষয়ে লক্ষ্য যাঁদের, তাঁরা নিজের অন্তঃপুর শাসন করে রাখুন, তা হলেই তো ফুরিয়ে গেল।

আমার ভয় হচ্ছিল, পাছে নরু এমন সময় এসে পড়ে। সে যে মানুষ তার প্রকৃতি খুব ভালো চিনেছিলুম আমি; সে যে তার বোনের নিন্দা মোটেই সহ্য করতে পারবে না, তা বেশ জানা কথা।

দেবতা তাঁর সত্যতা সম্বন্ধে নিদর্শন দিলেন না আমায়, কারণ ঠিক এই সময়ে নরুর মূর্ত্তিটা চোখের সামনে ভেসে উঠল আমার। আমি তখন একেবারে বসে পড়লুম তাকে দেখে। আস্তে আস্তে পালাবার উদ্যোগ করতেই সে হাসিমুখে বললে—কি রে নন্দা! বর এসেছে নাকি?

তার গলার আওয়াজটা ছিল গম্ভীর;—যা হাজার লোকের মাঝে—উক্ত হলেও সহজে চেনা যেত। তার সেই ভারী গলার আওয়াজ শুনবামাত্র তার বোনের সমালোচনা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। অনিমন্ত্রিতকে বিবাহসভায় যেচে নিমন্ত্রণ নিতে আসতে দেখে সবাই বিস্ময়ে চেয়ে রইল।

আমি কোনমতে উত্তর দিলুম—হ্যাঁ এসেছে।

বলেই পিঠটান দিলুম, সে ঘুরে ঘুরে চারিদিকে বেড়াতে লাগল। আমি আর সেদিকেও গেলুম না।

আমাদের দেশের প্রথা, বিয়ের আগেই নিমন্ত্রিত লোকদের বরযাত্রীদের খাইয়ে দেওয়া।

জায়গা যখন হয়ে গেল, তখন বাবা বললেন—নন্দা! ওঁদের সব ডেকে নিয়ে আয় খাবার জন্যে।

আমার তখন কথা বলবার শক্তি রুদ্ধ হয়ে এসেছিল। আমি সেখান হতে পালিয়ে একটা ঘরে গিয়ে বসলুম। সেখান হতে খাবার জায়গাটা বেশ দেখা যায়।

বাবা তাঁর গুণধর ছেলের কাজ দেখে—রেগে গিয়ে নিজেই তাঁদের ডাকলেন। তাঁরা এসে আসনে বসলেন।

হঠাৎ একটা গোলমাল আমার কাণে ভেসে এল, আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দেখলুম, অনেক পাতে লুচি পড়েছে, কিন্তু সকলেই আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন—কেবল একটা লাইনের মাঝামাঝি জায়গায় বসে আছে নরু। বিস্ময়ে সেও আত্মহারা হয়ে তাকিয়ে আছে। বাবা সামনে নতমুখে দাঁড়িয়ে।

আমার ইচ্ছা হতে লাগল, এই মুহূর্ত্তে পৃথিবী যদি সীতার মত গ্রাস করেন আমায়, আমি সকল বিপদ হতে পরিত্রাণ পাই। ওদিকে নরু, এদিকে সমাজ—আমার বাপ! আমি দাঁড়িয়ে আছি মাঝখানে—দুই হাতে দুইজনকে ধরে। কি দারুণ লজ্জায় যে বাবার মাথা নুইয়ে পড়েছে—তা আমি বেশ বুঝলুম। ঘৃণায়—লজ্জায়—আমার চোখে যেন জল আসতে লাগল। আমি জানালার কাছ হতে সরে গিয়া বিছানায় শুয়ে পড়লুম।

হঠাৎ শুনলুম সব গণ্ডগোল থেমে গেল। একটা ভারী মোটা গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। এ গলাটা আমাদের প্রতিবেশী ঠাকুরদার। তিনি নরুর পানে লক্ষ্য করে বলছেন—নরু! অন্য জায়গায় তোমার জায়গা করে দিচ্ছি—ওখান হতে উঠে এস তুমি।

নরুর গলার স্বর পেলুম; সে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলছে—কেন মশাই! এখানে বসলে কোনও ক্ষতি হবার কারণ তো দেখছি নে! আমিও বামন বই মুচি কি মুসলমান নই—যে জাত যাবে।

বহুকণ্ঠে একটা অস্ফুট গুঞ্জন শব্দ ভেসে উঠল; ঠাকুরদাদা সবাইকে থামিয়ে বললেন,—এঁরা কেউ তোমার সঙ্গে এক লাইনে বসে খেতে রাজী নন।

আমি আস্তে আস্তে উঠে আবার জানালার কাছে দাঁড়ালুম। দেখলুম এই কথাটা শুনবামাত্র নরু আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল; তার সুগৌর মুখখানা ঘোর আরক্তিম হয়ে উঠল; চোখ দুইটা এত অস্বাভাবিক দীপ্ত হয়ে উঠল যে, দেখলে ভয় হয়। আমি লুকিয়ে দেখছিলুম যদিও, তবুও এত ভয় হচ্ছিল আমার, যে বুকের মধ্যে গুর গুর করতে লাগিল, পা দুইটা ঠক ঠক করে কাঁপছিল।

নরু দীপ্তভাবে বলে উঠল,—আমি সমাজ-পরিত্যক্ত হয়েছি কেন, তা জানতে পারি কি?

ঠাকুরদা বললেন—নিশ্চয়ই পার; তোমাদের খৃষ্টানী আচার ব্যবহারই তোমাদের সমাজচ্যুতির প্রধান কারণ।

নরু গম্ভীরভাবে বললে—বেশ! আপনারা

আমায় না নিতে চান, তাতে আমার এমন কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না। কিন্তু আমার যে খৃষ্টানী আচারের কথা উল্লেখ করছেন, আমি মনের মধ্যে কথাগুলো চেপে রাখিনে বলে জানতে পেরেছেন। যদি আমি প্রকাশ্যে গলাবাজী করে জানাতুম—আমি হিন্দু, অথচ যদি লুকিয়ে মুরগীর যুগ—ডিমের কালিয়া খেতুম, তা হলে দোষ হত না। লোকে সেটা জানলেও আমার মুখের জোরের প্রকাশ করতে পারত না। এই যে এত ভদ্রলোক রয়েছেন এখানে, কার কথা আমি কি না জানি বলুন দেখি? ওই যে মহাকুলীন মুখুয্যে মশায় রয়েছেন, সেদিন আবদাল্লা কি নিয়ে এল ওঁর বাড়ী—জানতে পারি কি তা? ওই যে গাঙ্গুলী মশাই রয়েছেন, ওঁর ভাইপো বিলাত হতে ফিরে এসে গোটা দশেক টাকা ব্যয় করে একটা প্রায়শ্চিত্ত করে সমাজে উঠলেন; আপনারা সবাই তাঁর সঙ্গে বসে খেলেন, দেখুন গিয়ে তাঁর কলকাতার বাড়ীর রান্নাঘরে, তাঁর মুসলমান কুক কি রাঁধছে। যাক! বেশী কিছু বলব না আমি,—তবে এটুকু জেনে রাখবেন, মনের ভাবটা মনে না চেপে রেখে প্রকাশ করে আর বালিকা বোনের ছোটবেলায় একটা অক্ষমের হাতে না দিয়ে বয়স্থা আর শিক্ষিতা করে রেখে আমি মুসলমান পদবাচ্যও হই তাও ভালো আমার। বাঘ যে, তার বাঘের বেশে থাকাই ভালো, লোকে সাবধান হতে পারে; কিন্তু বাঘ যে মেষের পোষাকে সেজে মানুষের মাঝে বেড়াবে, আর অসাবধানে যে থাকবে, তার ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খাবে—তা আমি মোটেই পছন্দ করি নে।

বলতে বলতে সে সেস্থান ত্যাগ করলে। আমি এসে তখন দরজার কাছে দাঁড়ালুম; হঠাৎ সেই সময় আবার তার গলা এসে কাণে বাজল—এই—নন্দবাবু কোথায় রে?

চাকরটা বুঝি বলে দিলে; আমি আবার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছি তাড়াতাড়ি, ঠিক সেই সময় নরু আমার হাতে হাত চেপে ধরলে। আমার প্রাণ একেবারে শুকিয়ে গেল; আমি যেন কি রকম হয়ে গিয়ে মাটীর পানে তাকিয়ে রইলুম, তার পানে আর চাইতে পারলুম না।

নন্দা! তুই বড় খারাপ কাজ করেছিস। যা হোক, আর সে জন্যে বলে তোকে কি করব? কিন্তু আজ বড় অপমান সহ্য করেই যেতে হল আমাকে, তা আর তুই জানবি কি?

তার গলার স্বরটা বড় কোমল; আমি সাহস করে তার পানে তাকালুম,—বল্লুম, মাপ কর ভাই; বাস্তবিক আমি জানতুম না এমন ব্যাপার হবে। সব কথা যখন শুনতে পেলুম, তখন একবার ভাবলুম তোমায় বারণ করে আসি আসতে, কিন্তু সময় পেলুম না মোটেই। নরু বললে—যাক গে সে সব কথা—তার আর কি হবে? আমি তো হিন্দু-ই নই—তবে ভয়ের কারণটা কি? যে সমাজে এত গ্লানি—এত কুৎসা, না থাকলুম তাতে; অন্য সমাজ ঢের আছে। আমি যা করব, তা আমিই জানছি। নন্দা! মনে আছে আজ সকালের কথা? আমার বুক কেঁপে উঠল, মুখখানা বিবর্ণ করে শুষ্ককণ্ঠে উত্তর দিলুম আছে।

নরু আমার কাঁধে হাত রেখে খুব নরম সুরে বললে—দেখিস ভাই! বিশ্বাসহন্তা হস নে যেন। আমায় সকলে ত্যাগ করুক, তাতে আমার অণুমাত্র দুঃখ নেই; কেবল তোকে আপনার করে নিতে চাই আমি। আমি সবাইকে ত্যাগ করে, তোর উপরে নির্ভর করে দাঁড়াব—তুই শুধু আমার কাছে আয়। ঠিক সাত দিন; এই সাত দিন আমি অপেক্ষা করব তোর—তারপরে তোর হাতে শান্তিকে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়ে চলে যাব আমি আমার ভাগ্য খুঁজতে। মাও থাকবেন শান্তির কাছে। আমার মনের ইচ্ছে যেন বিফলে না যায় নন্দা।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে চলে গেল; আমি যেন পুতুলের মতই দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলুম সেই দিকে, যে পথ দিয়ে সে চলে গেল।

৮

সাতটা দিন বই তো নয়; ঘুরে যেতে মোটেই দেরী হল না তার। আমার ভাবনার শেষ না হতে হতেই জলের মত সাতটা দিন অনন্তে মিলিয়ে গেল।

আমার মনে জাগছিল নরুর ভয়ানক মুখখানা। যদিও সে দেখতে খুব সুন্দরপুরুষ ছিল, তবু এখন কি হয়েছে আমার, তার সেই সুন্দর মুখখানার প্রতি তাকাতেই বেজায় ভয় লাগত। তার বড় বড় চোখ দুটোই ছিল বিশেষ লক্ষ্য করবার জিনিস তার মুখের মধ্যে। সেই দুটো চোখ যখন দীপ্ত করে সে কারও মুখের পানে তাকায়, হোক না সে তার চেয়ে বয়সে বড়, তবু তাকে একটা মোহের

ভাব ছেয়ে ফেলত; তার কাছে নুইয়ে পড়তেই হত তাকে।

যে দিন হতে শান্তির সঙ্গে আমার বিয়ের জন্যে সে বিধিমত চেষ্টা করছে, সেই দিন হতেই আমি দেখেছি তাকে রক্তপিপাসু বাঘের মত। তার কাছে যেতে—তার কথা শুনতে যেন ভয়ে প্রাণ কেঁপে উঠছে আমার।

সাতদিনের মধ্যে আমি আর মোটে বাড়ীর বার হলুম না। যে দিন নরুদের বাড়ী গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলার কথা, তার পরেও দুটো দিন নিজের বাড়ীতে কনফাইন হয়ে কাটালুম। মনে ভয় বিষম জাগছিল, সে যদি জিজ্ঞাসা করে কি বলব তাকে, কেমন করে তার দেওয়া দান, সেই ফুটন্ত বেল ফুলটিকে পদদলিত করে চলে যাব আমি? যে ফোটা ফুলটীর পানে—লোকে ফিরে ফিরে চায়, যার একটু সুগন্ধ পেলে লোকের প্রাণ বিভোর হয়ে ওঠে, সেই ফুলটীকে বক্ষে রাখবার অধিকার পেয়েও আমায় নিজেকে নিজে বঞ্চিত করতে হচ্ছে।

মা আমায় একেবারে গৃহ-কোটরবাসী হতে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন; বললেন কি রে! নরুদের বাড়ী যাবি নে আর?

কথাটায় বিলক্ষণ শ্লেষের ভাব মিশ্রিত ছিল, অনুভব করতে পেরে, আমার রক্ত হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল। অতি কষ্টে নিজেকে কতকটা ঠাণ্ডা করে শান্তভাবে বল্লুম,—না।

মার কথাটা আমায় কেবল আঘাত করতে লাগল; তাই আমি উঠে পড়লুম। জুতা পায়ে দিয়ে, গায়ে জামাটা জড়িয়ে বার হয়ে পড়লুম আজ বার দিন পরে বাড়ী হতে।

যাচ্ছিলুম পথ দিয়ে, হঠাৎ নরুদের লালরঙের বাড়ীখানা নজরে পড়তেই আমার গতিরোধ হয়ে গেল; আমি আস্তে আস্তে সেদিক হতে ফিরে গিয়ে বসলুম—গ্রাম্য দীঘির পাড়ে একটা কাটা গাছের উপর।

তখন বেলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, সূর্য্যদেব পাটে বসেছেন—তারই আরক্তিম আভাটা চারিদিকে রক্তিম হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। পূর্ব্ব-দিককার আকাশ জুড়ে ভেসে উঠেছিল খুব কালো একখানা বড় সাইজের মেঘ। একদিকে অস্তগামী সূর্য্যের অনুপম সৌন্দর্য্য,—অন্যদিকে নিকষ কালোমেঘের বাহার। কোনটা দেখতে মন যায়—আলো না আঁধার?

দীঘির কালোজল অশান্ত ছেলে-মেয়েদের পদতাড়নায় ফেনিয়ে উঠেছে,—জলের তরঙ্গগুলো কাঁপতে কাঁপতে বহু দূরে গিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। গ্রামের অনেক মেয়ে এ সময় ঘাটে আসে, কাপড় কাচতে। কলসীগুলি কালো জলে সোণার মত বরণ ঝকিয়ে দিচ্ছে।

আমি বাস্তবিক সেদিকে লক্ষ্যই করি নি; আপন মনে একবার তাকাচ্ছি সূর্য্যের লোহিত ছটার দিকে, একবার তাকাচ্ছি কালো মেঘখানার দিকে। ফাল্গুনের মৃদুল হাওয়া পাশের ছোট ছোট গাছগুলিকে নুইয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে ঝর ঝর করে।

জলের দিকে তাকিয়ে দেখলুম—ঘড়া বুকে দিয়ে দুটী তিনটী মেয়ে অনেক দূর জলে গিয়ে পড়েছে—একটী প্রৌঢ়া ঘাট হতে কাংস্যকণ্ঠে চীৎকার করে বলছেন—ওলো ছুঁড়িরা!—ফিরে আয়—ফিরে আয়। অবিয়ত মেয়ে,—কোথায় যাচ্ছিস বল দেখি? ডুবে মরিস্ যদি, আর বিয়েই হবে না।

ঘাটে মহা হাসির রোল পড়ে গেল! আমিও হাসি সামলাতে পারলুম না।

হঠাৎ পেছন হতে একটা কর্কশ কণ্ঠ শুনতে পেলুম—এই যে তুই,—আমি সারাদেশ খুঁজেও দেখা পাইনি তোর।

আমি চমকে উঠলুম এত যে, মানুষ সামনে ভূত দেখলেও ততদূর চমকে ওঠে না। মাথাটা এত হেঁট হয়ে পড়ল যে, প্রায় হাঁটুর সঙ্গে এক হয় আর কি?

নরু আমার পাশে বসল; আড়ে আড়ে তাকিয়ে দেখলুম, সে বাঘের মত আমার পানে তাকিয়ে আছে। আমার বুক তখন এত দুর দুর করছিল যে, নিজের কাণেই শুনতে পাচ্ছিলুম আমি তা। হেডমাষ্টারকে যতটা ভয় করি, তার চেয়ে বেশী ভয় হয়েছিল আমার, নরুকে আমার পাশে বসতে দেখে।

সে বললে—সাত দিনের জায়গায় বার দিন করেছিস। খুব যা হোক সত্যবাদী তুই। ঠিক ঠিক কথা রেখে চলতে শিখেছিস বটে; তোর মনের ভাব যা স্পষ্ট বলে ফেল না কেন? আমি জোর করে তোর কাছ হতে কথা নিতে চাচ্ছি নে,—তোর যেটা অভিপ্রায়, মাত্র সেইটেই বলে ফেল না অসঙ্কোচে।

অসঙ্কোচে কথা বলা যে কি মুস্কিল, তা বেশ জানছিলুম আমি;—কি যে বলব, তা কিছু ভেবে ঠিক করতে পারছিলুম না। আমি নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলুম জলের দিকে।

ধীরে ধীরে সূর্য্যদেব তখন অস্তাচলে লুকিয়ে গেল। অল্পে অল্পে অন্ধকার এসে গাছের পাতার মাঝে মাঝে জমাট বাঁধতে লাগল। নরু বললে—বলই না কেন, কি তোমার কথাটা? মুখের কথাটা খসালেও কি দোষ হয় নাকি? তুমি শান্তিকে বিয়ে করতে চাও না তবে?'

আমি তেমনি মুখ নীচু করেই বলে ফেললুম—না। কেন না—বাঘের মত গরজে উঠে সে উঠে দাঁড়াল;—বলে উঠল, বস কারো আর কথায় দরকার নেই; যা বলেছিস্ ওইটুকুই যথেষ্ট। মিছে দোষ কাটানোর জন্যে কতকগুলো ভূমিকা আনবার দরকার নেই কিছু। যা হোক্, খুব চোখ ফুটিয়ে দিয়েছিস তুই, খুব আক্কেল করে দিয়েছিস তুই আমার। বাস্তবিক নন্দা! আমি ভাবতুম, মানুষকে চিনবার ক্ষমতা আমার আছে; সেই অন্ধ-বিশ্বাসেই থাবতুম। আমি ভাবতুম, আমি মানুষের এমন একটা তারে আঘাত করতে পারি, যাতে সহজেই তার হৃদয়-বীণা ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে। আজ আমার সে অন্ধবিশ্বাস দূর করতে পারলুম তোর চরিত্র দেখে। আমি ভেবেছিলুম—তোকে বড় আপনার, খুব ভুল হতে রক্ষা করেছিস আমায়।

অনুতাপে আমার হৃদয় ভরে উঠল; আমি অতি কষ্টে গলা ঝেড়ে ফেলে বল্লুম—তুমি ভাই যদি—

নরু বললে—চুপ! কোন কথা শুনতে চাই নে আমি। আমি যে চিনতে পেরেছি তোকে, এই ভালো। নিজেকে বাড়াবার চেষ্টা করিস নে—কমিয়ে ফেল। বেশ বুঝেছি এখন আমি, সেদিন তোর বোনের বিয়েতে শুধু অপমান করবার জন্যেই নিমন্ত্রণ করেছিলি আমায়। আমি হস্তীমূর্খ, তাই অত অপমানের পরেও ভেবেছিলুম, তুই নির্দ্দোষী—তুই না জানতে পেরে আমায় নিমন্ত্রণ করে ফেলেছিস। আমি যদি চালাক হতুম, বেশ বুঝতে পারতুম, এতে তোর যথেষ্ট বদমায়েসী বুদ্ধি ব্যয় করতে হয়েছে—যার দ্বারা আমাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারিস।

বিবর্ণ মুখে আমি বলতে গেলুম—মাইরি;—আমি—

সঙ্গে সঙ্গে সে প্রচণ্ড তাড়া দিয়ে বলে উঠল—আবার? ফের কথা বলতে আসছিস নন্দা? আরে! তাই কি ভেবেছিস তুই, তুই বিয়ে না করলে কেউ আমার বোনকে বিয়ে করবে না? তোরা আমায় হিন্দু-সমাজ হতে বের করে দিলেই, আমি অমনি সুবোধ ছেলেটীর মত বার হয়ে যাব? আমার যখন ইচ্ছা হবে, একটী কথায় তোদের সমাজের মুখে লাথি মেরে চলে যাব। যদি যথার্থ বাপের ছেলে হই আমি, তবে তোদেরই হিন্দুবংশের শ্রেষ্ঠ চূড়া কুলীনের হাতে বোনকে দেব। এমন কত লোক আছে, যারা আমার বোনকে বিয়ে করতে পারলে, নিজেকে ধন্য জ্ঞান করে। আমি তাদের হাতেও দেব না ওকে; কুলীনের সঙ্গে যাতে তার বিয়ে দিতে পারি—আজ হতে তারই প্রাণপণ চেষ্টা করব। আমায় চিনিস নি তুই, রাগলে আমি কারও নই; তা হোক না মা—হোক না বোন—ডু অর ডাই—এই আমার কথা। বুড়োই হোক, শ্মশানযাত্রী হোক, আমি তার হাতে শান্তিকে দিয়ে দেখাব তোদের।

গর্ব্বিতভাবে সে চলে গেল। আমি দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা রেখে চুপ করে বসে রইলুম। মনে মনে বুঝলুম, সে যা বলেছে, তাই করবে নিশ্চয়ই। কারও অনুরোধ রাখতে সে বাধ্য নয়। তার মত একগুঁয়ে স্বভাব বড় একটা কারও দেখা যায় না—এজন্যে হেডমাষ্টার তার নাম রেখেছিলেন—অবষ্টিনেট বাবু।

সে নিজের জেদ বজায় রাখতে শান্তিকে যার তার হাতে অর্পণ করবে, এই কথাটাই কেবল মনে হতে লাগল আমার। সে তো বুঝতে পারলে না—আমার ক্ষমতা কিছু নেই। মাথার উপরে বাপ কি অন্য কেউ পুরুষ না থাকাতে তার স্বভাব অমন ভাবে গঠিত হয়েছে, আমার মাথার উপর যে বাবা আছেন। আমি যদি আজ বয়সে বৃদ্ধও হতুম, তাও বাবার অমতে কিছুই করবার ক্ষমতা থাকত না আমার।

শান্তির মুখখানা মনে করে আমার বুকটা ফেটে যেতে লাগল। নরু বুঝবে কি শান্তি আমার কে? আমার তরুণ চোখের সামনে কি স্বর্গের সুষমা বিকাশ করে দেছে সে? আমার হৃদয়ের মাঝে কি মহা জাগরণ বহন করে এনে ফেলেছে সে? আমার হৃদয়বীণা বেজেছে যে তারই করস্পর্শে, আমার হৃদয়নিকুঞ্জে ফুলগুলি ফুটে উঠেছে যে তারই মোহমাখা নিশ্বাসে।

হঠাৎ আমার খুব কাছে—"ক্যা হুয়া—হুক্কা হু" শব্দটা বহুকণ্ঠে মিলিত হয়ে গগন কাঁপিয়ে তুললে। আমি এত চমকে উঠলুম যে, কাঠ হতে পড়ে যাই আর কি? সামলে নিয়ে উঠে পড়লুম। দেখলুম তখন—মাথার উপরে সেই মেঘখানা এমন

করে সারা আকাশটা ব্যেপে গেছে যে তিলার্দ্ধ স্থান নেই। যতখানি অন্ধকার হওয়া সম্ভব,—তার চেয়ে বেশী অন্ধকার ঝরে পড়েছে তার গা হতে পৃথিবীর উপরে। মাঝে মাঝে চিকমিকিয়ে চোক ঝলসে ছুটে যাচ্ছে তড়িৎ রেখা, দূর বনানীর মাঝখান হতে বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ ভেসে আসছে।

আমি বাড়ী যাওয়ার জন্যে অগ্রসর হলুম। সে আবার তেমনি রাস্তা; কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু, তাতে আবার ঘাট হতে ফিরে যাবার সময় কোন মেয়ে ঘড়া নিয়ে বোধ হয় আছাড় খেয়েছিলেন, সেই জলটা পড়ে পেছল হয়ে আছে। অন্ধকারে—বৃষ্টিতে ভিজিবার ভয়ে ছুটতে গিয়ে আমিও সেখানে রীতিমত একটা আছাড় খেয়ে পড়লুম।

এদিকে ভয়ও লাগছে বেজায় শুধু বৃষ্টির জন্যে নয়। ভূতের ভয়টা ছেলেবেলায় ছিল বেজায়; বড় হয়ে একটুখানি কমলেও, আজ এই নির্জন ঘাটের পথে অন্ধকারে সে কথাটা বেশ মনে হয়ে গেল। অদূরে আবার শ্মশানটাও রয়েছে।

পড়ে গিয়ে খানিকটে নড়তে পারিনে;—মনে হল আমার পাশেই ভীষণাকার একটা ভূত দাঁড়িয়ে ঠোঁট নেড়ে কি বলছে। রাম রাম করতে করতে আমি উদ্ধশ্বাসে ছুটলুম—ভূতটাও যেন তার উল্টো পা দুখানা খুব তাড়াতাড়ি ফেলে আমার পিছন পিছন ছুটল।

খানিকদূর এসেই জেলেদের বাড়ী। বারাণ্ডায় তাদের রান্না হচ্ছে, দরজা জেলে মেঘেঢাকা আকাশের তলে উঠোনে তার স্বহস্ত রচিত বাঁশের মাচায় শুয়ে গুন্ গুন্ করে নীলকণ্ঠের গান গাচ্ছে; তার ছেলে-মেয়েগুলো উনোনের চারিদিকে ঘিরে বসেছে ভাতের জন্যে। তাদের মা আর খানিক তাদের ভুলিয়ে রাখবার জন্যে—"এক যে রাজা, তারা দুয়ো সুয়ো, দুই রাণী ছিল" বলে একটা আশ্চর্য্য গল্প ফেঁদে বসেছে।

আমি সেখানে একটু দাঁড়ালুম। তখন একবার পেছন পানে চেয়ে দেখলুম, ভূতও নেই—কিছুই নেই। মনে একটু লজ্জা হল বলে, আর তাদের ডাকলুম না, আস্তে আস্তে চললুম নিজেদের বাড়ীর দিকে।

তখন দুই এক ফোঁটা করে বৃষ্টি পড়ছে। আমি তখন আবার ছুটতে আরম্ভ করলুম। নিজেদের বাড়ীতে পা দিয়েছি, আর মুষলধারে বৃষ্টি এসে পড়ল।

নীলমণি তখন মাষ্টারের কাছে পড়তে বসেছে। রমুবাবু পাশে একখানা চেয়ারে বসে দুই হাত টেবলে রেখে হাঁ করে তাকিয়ে আছেন ভাগ্নের পড়ার দিকে।

আমি ঘরে ঢুকতেই নীলমণি পড়া থামিয়ে বললে—নন্দদা! আজ যাওয়া হয়েছিল কোথায়?

আমি নিজের নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসে বইখানা টেনে নিয়ে খুলতে খুলতে বললুম—যেখানে যাই না কেন—তোর কি?

নীলমণি কায়দার সঙ্গে ঘাড় কাৎ করে হেসে বললে—আমার আবার কি? বাবা আচ্ছা মজা আজ দেখাবেন তোমায়, দেখোখন সে ক্যাইসান চিজ—

কথাটা শেষ করেই সে মাষ্টারের পানে ফিরল। রমুবাবু তাঁর মূলার মত সাদা দাঁত বের করে হি হি করে হাসতে লাগলেন; মাষ্টার মণি দত্ত—তারও গুম্ফহীন মুখে একটু হাসির রেখা ফুটে উঠল। রাগে আমার সমস্ত গা জ্বলতে লাগল। আমি সে ভাবটা যথাসাধ্য লুকিয়ে রেখে প্রশান্তভাবে বললুম—বাবা মজা দেখাবেন কেন?

নীলমণি মুখভঙ্গী করে বললে আহা হা! জানেন না যেন। ওসব কথা বলতে আমারই লজ্জা হয়—।

আমি বললুম—তবু শোনাই যাক না কেন? তোমার লজ্জাটাকে একটু খানির জন্যে না হয় বাক্সে বন্ধ কর।

মণি মাষ্টার বললেন—সে সব কথা ছোট ভাইয়ের মুখে না শোনাই ভালো, তুমি নরুর বোনের লাভার এই কথাটা—

আমি অকস্মাৎ আপনহারা হয়ে গরজে উঠলুম, কে এ কথা বলে।

মণি মাষ্টার উত্তর দিলে তা আমি কি জানি! বলেই সে ছাত্রের দিকে ফিরে তাকে অঙ্ক দিতে লাগল। রমুবাবুর হাসির মাত্রাটা আর এক গ্রেট ছাপিয়ে উঠল; আর সহ্য করতে না পেরে আমি বল্লুম, আপনার অসভ্য দাঁতগুলোকে ঢাকুন আপনি। আপনার দাঁত দেখলে গা জ্বলে যায় আমার।

রমুবাবু তাড়াতাড়ি হাত দুখানা মুখে চাপা দিলেন। সেই সময় বাবা নিজের ঘর হতে ডাক দিলেন নন্দা—!

আমার প্রাণ চমকে উঠল। জগতের মধ্যে ভয় করতুম আমি তিনটী লোককে। তিনটী

লোক যথাক্রমে বাবা—নরু আর হেড-মাষ্টার করালী বাবু। বাবার ডাক শুনবামাত্র আমি তাড়াতাড়ি বার হয়ে পড়লুম।

বাবার ঘরে বাবা শুধু একা বসে তামাক খাচ্ছিলেন। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। বাবা অনেকক্ষণ নীরবে তামাক খেতে লাগলেন; তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন হ্যাঁরে! তুই কি মুখ ডুবাবি একেবারে আমার? তুই নাকি নরুর বোনকে বিয়ে করতে চেয়েছিস? দেখ! সত্যি যা তাই বলবি আমার কাছে, আমি তোর বাপ, জানিস তো জগতে আর কেউ নেই তোর, শুধু আছি আমি। সকলে তোকে হিংসে করে, ঘৃণা করে, আমি সে সব হতে আড়াল করে রেখেছি তোকে বুক দিয়ে। আমার কাছে মাতৃস্নেহ পিতৃস্নেহ সবই পাচ্ছিস তুই। সাবধান; কোন কথাই লুকিয়ে রাখতে চাস নে যেন। যদিও তুই কুড়ি বছরের হয়েছিস, তবু মনে কর, আজও তুই তেমনি ছেলে মানুষ; সেই ছেলে মানুষের মত করে বলে যা আমায় সব কথা।

তাঁর কণ্ঠে যে কোমলতার আভাস ফুটে বেরুচ্ছিল, তা বেশ জানতে পারলুম আমি। নীলমণির চেয়েও তিনি আমায় বেশী ভালোবাসেন শুধু আমার মা নেই বলে। এজন্যে মা, নীলমণি কি রমুবাবু সবাই আমায় বেশী রকম ঘৃণা করতেন।

বাবার কথা শুনে আমি অকপটে সব কথা খুলে বললুম। আজকে যা যা হয়েছিল সব কথা বলে আমার দেরী হওয়ার কারণ দেখিয়ে দিলুম।

দেখলুম—বাবার চোখ দুটি সজল হয়ে এল; তিনি আমার মাথায় হাত রাখলেন—কি বিড় বিড় করে বল্লেন যে তা—বুঝতে পারলুম না আমি। তারপর গভীর স্বরে বললেন, নন্দা! তোকে আর বেশী বলব কি? তুই যে ত্যাগ স্বীকার করে এসেছিস, অন্য কেউ বোধ হয় পারত না—তা। আজকাল ছেলেরা বাপ মাকে কি ধর্ম্মকে মোটেই কেয়ারে আনে না।

রুদ্ধ কণ্ঠে আমি বল্লুম—দেবতাকে আমিও বিশ্বাস করতে পারি নে যে মোটেই বাবা—।

বাবা বললেন ক্রমে ক্রমে বিশ্বাস আপনিই আসবে। জোর করে বিশ্বাস করাতে চাইনি আমি। যখন নিজে বুঝতে পারিবি ঈশ্বরের কাজ তখন নিজেকেই নুইয়ে ফেলতে হবে তাঁর পায়ের তলে তোকে। যা এখন পড়তে—একজামিন আসছে—কাল বুঝি ফাইনাল হবে আরম্ভ?

হ্যাঁ—বলে আমি বেরিয়ে এলুম।

৯

নির্ব্বিঘ্নে একজামিন দিয়ে ফিরে এলুম বাড়ী। মা না জানলেও বাবা দেবতার কাছে মেনেছিলেন, আমি যদি পাশ করতে পারি, তা হলে তিনি পনের টাকার পূজো দেবেন। মা যদি শুনতেন বাবার মানসিকটা, তা হ'লে অনর্থক এত টাকা ব্যয় করা হবে কেন বলে নিশ্চয়ই ঘোর আপত্তি তুলে বসতেন।

ফিরে দেখলুম, মুক্তি শ্বশুর বাড়ী হতে ফিরে এসেছে। তার স্বামী সুধীর আজ সন্ধ্যা আটটার ট্রেণে আসবেন। তাঁকে আনতে যেতে হবে আবার আমাদেরই—।

বাবা বললেন তোরা দুটী ভাই গিয়ে সুধীরকে নিয়ে আসিস। শুনেই মা একেবারে লাফিয়ে উঠলেন; তা কখন হবে না। নন্দার সঙ্গে আমার নীলুকে কখন যেতে দেব না আমি—নন্দা একা যাক না কেন?

বাবা চটে গেলেন, বললেন—কেন, নন্দার সঙ্গে নীলু গেলে কি হবে? তোমার ছেলে কি হারিয়ে যাবে নাকি?

মা বললেন—নন্দার যে চরিত্তির খারাপ হয়ে গেছে।

বাবা বললেন—হ্যাঁ গেছে? সে একেবারে বদ ছেলে হয়ে গেছে? তোমার ছেলে কারও সঙ্গে মেশে না—কিছু করে না;—যাদের সঙ্গে বেড়ায়, তারা সবাই একেবারে দেব-চরিত্র—না? নন্দার সঙ্গে মিশতে দেবে না? তবে আমিও কেন যেতে দেব নন্দাকে—এই রাত্রে অন্ধকারে তোমার জামাইকে আনতে? ওর মা নেই—কিন্তু আমি তো মরি নি আজও।

মা বিরাগভরে বললেন, না হয় নাই দেবে যেতে; জামাই তো আমার একার নয় যে দায়িত্ব হবে আমার? নতুন জামাই আসছে এখন,—না গেলে ষ্টেশনে আনতে নিন্দে হবে তোমারি, আমার কি হবে? আমাকে কেউ তো চিনবে না আর।

বাবা কোন মতে উচ্ছ্বসিত রাগটা চেপে বললেন 'তবু তুমি নীলুকে পাঠাবে না।'

মা দৃঢ়ভাবে উত্তর দিলেন—না—।

বাবা আর রাগটাকে সামলাতে পারলেন না, গর্জ্জে উঠে বললেন—তবে রাখ গে যাও তোমার ছেলেকে বাক্সে বন্ধ করে। ও তোমার নিজস্ব করা ছেলে হল, নন্দা তোমার কেউ নয়! তবে আজ হ'তে নন্দা হোক কেবল আমারই। নন্দা তোমাদের সম্পর্কে আর থাকবে না। আমি আজ-কালই উইল করে দিয়ে যাব—সব দিয়ে যাব নন্দাকে, তোমাদের থাকতে হবে তার হাত-তোলা খেয়ে, এমনি বন্দোবস্ত করে দিয়ে যাব আমি। মাও তেমনি রেগে বললেন—কখনও না। নন্দার হাত-তোলা খেয়ে জীবন ধারণ করব, তেমন মেয়েই নই আমি। ভিক্ষে করে খাব সেও ভালো—

বাবা বললেন—তাই করো, ভিক্ষে করেই খেও তুমি।

মা চোখ মুছতে মুছতে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। বাবা আমাকে ডাকলেন। আমি পাশের ঘর হতে ঝগড়া শুনছিলুম, আমায় নিয়ে এমনি ঝগড়া প্রায়ই হত বাবার। মা যত বিদ্বেষ করতেন আমায, বাবা তত বুকের মধ্যে টেনে নিতেন।

আমি কাছে আসবামাত্র তিনি বললেন—এবার তোকে আমি নিয়ে যাব নন্দা। যাবি আমার সঙ্গে?

আমি বললুম—যাব।

বাবা বললেন—আজকের দিনটা যেমন তেমন করে মানটা রক্ষা করে আয়। যা তুই গাড়ী নিয়ে ষ্টেশনে। রাত্রের অন্ধকারে, সহুরে ছেলে, পাড়াগাঁয়ের পথে হাঁটতে পারবে না। যদিও গরুর গাড়ী, তা আর কি করব? ঘোড়ার গাড়ী কি পাল্কী তো সকল পাড়াগাঁয়ে থাকে না। বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলিস। তা হলে যা এইবেলা—খানিক বাদেই ট্রেণ আসবে—এদিকে সন্ধ্যা হয়ে এল।

আমি তখনি বেরুলুম। ষ্টেশনে যথেষ্ট গাড়ী থাকে, সে জন্যে আমার বেশী মাথা ঘামাতে হল না।

নরুদের বাড়ীর সামনে দিয়ে যেতে যেতে দেখলুম—তাদের বাড়ীতে অন্ধকার রাজত্ব করছে। উপরে বা নীচে, কোথাও আলোর রেখাটুকু মাত্র নেই। নরু তো ফাইনাল একজামিন দিয়ে এসেছে কাল আমার সঙ্গে, আজ তারা গেল কোথায়? কারও গলার আওয়াজও তো পাওয়া যাচ্ছে না।

খানিক পথের উপর দাঁড়িয়ে রইলুম; তারপর আস্তে আস্তে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ষ্টেশনের দিকে চল্লুম।

পথে হঠাৎ দেখা হল, নরুদের বাড়ীর ঝি মহিমের দিদির সঙ্গে। সে আমাকে সেই স্বল্পান্ধকারে দেখেই চিনে ফেললে—বললে—কোথায় যাচ্ছেন দাদাবাবু?

আমি বললুম—আমাদের নতুন জামাইকে আনতে যাচ্ছি ষ্টেশনে।

সে বললে—আপনি আর আসেন না যে এঁদের বাড়ী?

আমি সে কথা উল্‌টে বল্লুম—এঁরা সব কোথায় গেলেন?

সে বললে—কি জানি? কাল সন্ধ্যাবেলায় নরুবাবু ফিরে এলেন, এসেই আমায় বললেন—আমরা মাসখানেকের জন্যে অন্য দেশে যাব। যখন ফিরব, আবার কাজে লেগো, কাল হতে আর এসো না। আমি রাত্রের কাজগুলো করে দিয়ে, অনেক রাত্রে বাড়ী এলুম। একটুখানি কথা কাণে এল, শুনলুম—তাঁরা যাচ্ছেন শান্তিদিদির বিয়ে দিতে—নরুবাবু কোথায় নাকি সম্বন্ধ করে এসেছেন। আমি যখন বাড়ী আসি, তখন দেখলুম, শান্তিদিদি দক্ষিণের ঘরের বারাণ্ডায় অন্ধকারে একলা বসে, খুব কাঁদছে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"কেন কাঁদছ?" তাতে সে শুধু বললে—"আমি বিয়ে করব না, তবু এরা জোর করে আমার বিয়ে দেবে।" আজ সকালে ওদের বাড়ী গিয়ে কাউকেই আর দেখতে পেলুম না।

আমি উদাসভাবে বল্লুম—তা হলে বিয়ে হয়ে গেলে পরে আবার আসবে।

বলে আমি সটান চল্লুম ষ্টেশনের দিকে। মনটা এত খারাপ হয়ে গেল, যা বলতে পারা যায় না। অভাগিনী শান্তি; কি কুক্ষণেই সে জন্মগ্রহণ করেছিল—কি কুক্ষণেই নরু তাকে ঠাট্টার ভাবে বলেছিল—শান্তি, একে বিয়ে করবি?

চকিতে মনে ভেসে উঠল,—সেদিনকার তার সেই রোদনস্ফীত মুখখানা। সে বলতে গিছল—শুধু তোমার জন্যেই তো—বলতে বলতে সে চলে গেল, আর তার কথা শুনতে পেলুম না। আমার জন্যেই কি সে বিয়ে করতে নারাজ?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়ে চলে গেল; আমার চোখে জল আসছিল—আমি তাকালুম—মাথার পরে নীলাকাশের পানে, —ভগবান! শান্তিকে শান্তি দাও, আমাকেও শান্তি দাও। বাবার উপযুক্ত ছেলে যেন হতে পারি; আমা হতে বাবার মুখ যেন না নুইয়ে পড়ে।

সন্ধ্যাতারাটী সামনে জ্বলছিল তখন উজ্জ্বল-ভাবে। মনে হল—আমার প্রার্থনা সমাপ্তে সেটী যেন দপ করে বেশী রকম জ্বলে উঠল। প্রাণে নিদারুণ জ্বালা বহন করে পৌছালুম ষ্টেশনে।

তখনও ট্রেণ আসবার দেরী ছিল। প্লাটফর্ম্মের উপর পদচারণা করতে করতে ভাবতে লাগলুম নরুদের কথা। যতই তাদের কথা ভাবতে লাগলুম, ততই যেন মনটা বিষাদে ভরে উঠতে লাগল।

খানিক পরেই হুস হুস করে ট্রেণ এসে পড়ল। নূতন জামাই সুধীর একটা গ্লাডষ্টোন ব্যাগ হাতে নিয়ে সেকেণ্ড ক্লাস হতে নেমে পড়ল। তাকে দেখেই আমি আগে গাড়ী বলতে গেলুম—কেন না—যদি গাড়ী এসে চলে যায়।

ফিরে এসে দেখি—বেচারা সুধীর বিস্ময়ে গুম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে নাকি ষ্টেশনে বাবুদের কাছে জিজ্ঞাসা করেছে, এখানকার পথে আলো আছে কিনা,—বাঘ আছে কিনা, —চোর ডাকাতের ভয় এখানে কি রকম? সকল প্রশ্নগুলির যে উত্তর সে পেয়েছে, তাতেই তার প্রাণ একেবারে বসে গেছে। সে বেচারা কলকাতার মানুষ—পাড়াগাঁ যে কেমন পদার্থ, বইতে পড়া ভিন্ন জানে না। বিয়ের সময় এসেছিল বটে, তা তখন কত আলো, বাজী, মানুষ, বাজনা। পাড়াগাঁয়ে পড়েছিল তখন জাগরণের পালা, ঘুমিয়ে তো কেউ ছিল না। এমনি সময়ে যেই মাত্র আমি পিছন হতে তার পিঠে একটা চড় মেরে বলেছি—কি মশায়, ভালো তো?—

সেই মুহূর্ত্তে সে এত অধিক পরিমাণে চমকে সাদা হয়ে গেল যে, হঠাৎ আমার মনে হয়ে গেল, এর বোধ হয় ফিট আছে,—আচমকা কিছু দেখলেই বুঝি আজকালকার মেয়েদের মত—চোখ কপালে তুলে হাত পা খেঁচতে থাকে।

যখন সে মাটীতে পড়েও গেল না, শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল, তখন ভাবলুম—তার ভয় হয়েছে। তাই বল্লুম চিন্‌তে পারছেন না—মশায়, আপনি যে আমার ভগ্নিপতি হন। বিয়ের দিন দেখেন নি আমায়? আমি নিয়ে যেতে এসেছি আপনাকে আসুন।

আমার কথা শুনে বেচারা ভগ্নিপতির যে বিশ্বাস হল না সেটা বেশ বোঝা গেল। সে বল্লে কই মশাই, আপনাকে ত আমি দেখি নি।

শালাত্বটা এত সহজে সে ছেড়ে দিতে চায় দেখে আমার রাগ হয়ে গেল। এমন কে বোকা আছে—যে তার শালা হতে চায় স্বেচ্ছায়? আমি কিছুতেই যখন বিশ্বাস করাতে পারলুম না, তখন বল্লুম, তবে থাকুন সারারাত ষ্টেশনে পড়ে; বাবার যেমন কাজ ছিল না—তাই একটা মুর্খের হাতে মুক্তিকে দিতে গেছেন।

সুধীর একটু এগিয়ে এসে বললে—রাগ করবেন না মশায়—আজ কাল দিনটা বড় সন্দেহজনক।

আমি রাগ করে বল্লুম—তা বলে মনে করবেন না কেউ আপনাকে নিজের ভগ্নিপতি বলে বাড়ী নিয়ে যাবে! আপনার ভয় হচ্ছে—ঘড়ী, চেন, আংটী—পাছে এই পাড়াগাঁয় চোরে নেয়?

অপ্রস্তুত হয়ে জামাইচন্দ্র বললে—না না, চলুন চলুন।

দুজনে এসে গাড়ীতে উঠলুম। গরুর গাড়ী দেখে তার মুখ খানা ভার হয়ে এসেছিল—অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে উঠালুম তাকে। গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকিয়ে দিলে।

ঝমাৎ ঝমাৎ করতে করতে পাড়াগাঁয়ে উঁচু নীচু রাস্তার উপর দিয়ে গজেন্দ্র গমনে গাড়ী চলতে লাগল। ছইয়ের অন্য দিকে ঘেরা থাকলেও মাঝে মাঝে ফাঁক ছিল তার! জামাইবাবু সেইখান দিয়ে বাইরের অন্ধকারাবৃত জঙ্গলগুলো দেখেছিল—আর লুকিয়ে বোধ হয় গায়ত্রী জপ করছিল।

আমি মাঝামাঝি এসে গম্ভীর বদনে গাড়োয়ানকে গাড়ী থামাতে বল্লুম; তারপর জামায়ের পানে চেয়ে খুব মোটা গলায় বল্লুম, দেখ! তুমি যা ভাবছিলে তা আমি নই। আমি এখানকার প্রসিদ্ধ ডাকাত রতন দাসের দলের লোক—ভালো চাও—যা আছে আমার কাছে দাও, নইলে—জানছ তো—কি করব আমরা? রতনদাস ডাকাত কল্পিত হলেও সুধীর জেনে নিলে সত্যি। সে একেবারে হুমড়ী খেয়ে সামনে পড়ে গেল। তার ভয় দেখে এত হাসি আসছিল আমার, যে হাসি চাপতে কাসিকে টেনে এনে অনর্থক কণ্ঠ বেচারাকে বিপদগ্রস্ত করে তুলতে হল।

সুধীর উঠে বসল—তারপর সাহসীভাবে বললে, —আমি বিলক্ষণ কুস্তীবাজ মানুষ—কত লোককে ঘাল করে দেছি জানো?

গাড়োয়ান একটা বিকট হুঙ্কার ছেড়ে উঠল; সঙ্গে সঙ্গে কুস্তীবাজ বীরপুরুষটী বালকের মত কেঁদে উঠলেন; ওগো পায় পড়ি তোমাদের ও সব মিছে কথা। আমি কখনও কুস্তী করি নি। বুকের হাড়

ভেঙে যাবে বলে আমার বাবা মা—কুণ্ঠী করতে দেন নি। এই নাও যা আছে আমার সব দিচ্ছি, আমায় প্রাণে মের না বাবা!

কাঁদতে কাঁদতে সে আংটী, চেন, ঘড়ী খুলে আমার হাতে দিলে। পকেটে ছিল একশ টাকার নোট একখানা, সেখানাও আমাদের দিলে।

আমাকে শ্বশুর-বাড়ী পৌঁছে দাও—ঈশ্বরের দিব্যি করে বলছি, এ কথা কাউকে বলব না।

আমি বল্লুম—ঠিক কথা তো। তুমি ব্রাহ্মণ, আমিও ব্রাহ্মণ, আমার পৈতে ছুঁয়ে বল—

সে কম্পিত হাতে আমার পৈতেটা চেপে ধরলে; যদিও তার মুখ দেখা যাচ্ছিল না, তবু তার কম্পিত হাতখানা ধরেই আমি বেশ বুঝতে পারলুম—কি রকম হয়েছে তার মুখখানা এ সময়ে।

গাড়ীখানা গিয়ে থামল আমাদের বাড়ীর কাছে। আমি বল্লুম—এই তোমার শ্বশুর-বাড়ী।

সে প্রথমটা বিশ্বাস করলে না, ভাবলে শ্বশুর-বাড়ী বলে আমি বুঝি তাকে ডাকাতের আড্ডায় এনে ফেললুম। তারপর মুখ বাড়িয়ে সে যখন চিনতে পারলে, তখন নেমে পড়ল। আমিও নামলুম—বলে দিলুম—যাও এখন; কিন্তু সাবধান প্রতিজ্ঞা মনে থাকে যেন।

খুব থাকবে—বলে সে বাইরের ঘরে গিয়ে তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়ল; আমিও দ্রুতপদে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে মুক্তিকে চুপি চুপি সব কথা বলে চেন, ঘড়ী, আংটী দিলুম। বল্লুম, আমি লুকিয়ে দেখব—সে কি বলে—যখন—তুই জিজ্ঞাসা করবি। একটা জানালার বেল খুলে রাখিস।

সে খুব হাসতে লাগল তার স্বামীর অগাধ বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে।

১০

রাত্রে যখন খাওয়ার সময় হল, জায়গা করে চাকর এল আমায় ডাকতে; আমি বল্লুম আমার বড় মাথা ধরেছে; ভাত আজ খাব না; বাবাকে বলগে যা—কিছু খাবার টাবার যা হয় বন্দোবস্ত করে দেন যেন।

সে চলে গেল। বাস্তবিক কথাটা বলতে কি, আজ এই মাথাধরা ব্যাপারটা মোটেই আমার কাছে এগোয় নি। হঠাৎ সুধীরের সামনে গিয়ে অকালে রসভঙ্গ করতে কোন মতেই রাজি ছিলুম না আমি। তা এতে একদিনের রাত্রের্ খাওয়াটা না হয় নষ্টই হল, তাতে আর কি?

ঠিক এমনি সময়ে খড়মের খট খট শব্দ শোনা গেল; বেশ বুঝলুম, বাবা ব্যস্ত ভাবে আসছেন—ছেলের মাথা ধরেছে শুনে। আমি অমনি তাড়াতাড়ি রুমালখানা মাথায় বেঁধে বিছানাটায় শুয়ে পড়লুম। বাবা এসে দাঁড়ালেন—হ্যাঁরে! তোর নাকি অসুখ করেছে নন্দা?

আমি উঠে বসলুম—বল্লুম, না অসুখ করে নি তো; মাথাটা বেজায় ধরেছে কিনা তাই;—একটু শুয়ে আছি।

বাবার মনে বুঝি বিশ্বাস হল না তা; মায়ের মতন মন তাঁর সদা ব্যগ্র আমার জন্যে; তিনি আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখে বললেন—তা আজ আর কিছু খাস নে—শুয়ে থাক চুপ করে—সেরে যাবেখন। বলে দি তোর মাকে, ষ্টোভে খানকতক লুচি আর একটু তরকারী করে দিক, তাই খেয়ে থাক, কাল শরীরটা বেশ ঝনঝনে হয়ে যাবে।

তিনি চলে গেলেন; আমি শুনতে পেলুম তিনি মাকে বলে দিলেন লুচি তরকারী করবার জন্যে। অন্য দিন হলে মা নিশ্চয়ই তুমুল ঝগড়া করে বসতেন, আজ নেহাৎ জামাই আছে কি না, কাজেই কথা বলতে পারলেন না আর।

আহারান্তে সকলে যে যার ঘরে চলে গেল। বাবা আমার কাছে এসে আবার গা দেখলেন—তারপর বললেন—আমি না হয় তোর এখানে শুয়ে থাকি। শরীর বড় খারাপ—একা শুয়ে থাকবি, যদি কোন দরকার পড়ে?

আমি ব্যস্তভাবে বল্লুম, না বাবা আপনার থাকবার কোন দরকার নেই। এই তো বারাণ্ডায় রামচরণ শুয়ে থাকে, বামন ঠাকুর শুয়ে থাকে, যদি কোন দরকার পড়ে, তাদেরই ডাকবখন।

সেই সময় মুক্তি থালায় করে লুচি আলুর দম—খানিকটা দুধ নিয়ে এসে হাজির করলে। ঝি এসে জায়গা করে দিলে। বাবা বললেন, তবে তুই খা—আমি যাই।

আমি বল্লুম, হ্যাঁ যান—অনর্থক কেন কষ্ট পাচ্ছেন আর এখান থেকে।

বাবা চলে গেলেন। আমি মাথার রুমাল খুলে হাসিমুখে আসনে বসে আহারে মনোনিবেশ কল্লুম। মুক্তি হাসতে হাসতে বললে—তোমায় কখনও চিনতে পারবে না, বড়দা, তা আমি এক কলমে লিখে দিতে পারি। দেখ তুমি বরং কাল সকালে।

আমি বল্লুম—তুই আর দাঁড়িয়ে আছিস কেন—পান দিয়ে চলে যা। একটা বেল খুলে রাখিস—আমি শুনব কিন্তু—কি বলে সেই অগাধ-বুদ্ধিমান মশায়। এম্, এ, পড়েছে না ছাই, বিদ্যে থাকলে হবে কি—বুদ্ধি নেই মোটে—সাহসও নেই।

মুক্তি হাসতে হাসতে চলে গেল। আমি তাড়াতাড়ি করে খাওয়া শেষ করে, পান দুটো নিয়ে ঘর হতে বেরুলুম। বারাণ্ডায় চাকরটা বসে বসে খইনি ডলছিল আর গুণ গুণ করে গান গাচ্ছিল। আমায় বেরুতে দেখে সে কি বিস্ফারিত চোখে চাইলে। আমি বল্লুম—খবরদার গোলমাল করিস নে যেন। আমি এখনি ফিরে আসছি উপর থেকে।

আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে উপরে গেলুম; মা তখন শুয়েছেন। মুক্তির ঘরের চারিদিককার জানালাগুলো খোলা ছিল। আমি একটা জানালার পাশে চুপ করে দাঁড়ালুম।

মুখখানা বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল সুধীরের। সে জানালার দিকে মুখ করে বসেছিল, মুক্তি জানালার খুব কাছে পেছন ফিরে বসেছিল জানালার দিকে। দেওয়ালে জ্বলছিল একটা আলো—তাতে আমি সমস্ত দেখতে পাচ্ছিলুম।

মুক্তি জানালায় একটা খট খট শব্দ শুনেই বুঝতে পারলে, তার গুণধর ভাইটী হাজির হয়েছে; সে পানের পিক ফেলবার ছুতায় জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমাকে দেখেই হেসে ফেললে! আমি চোখ পাকিয়ে তাকে জানালুম, এ রকম হাসা বড় অন্যায় তার; এতে পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েটের মনে সন্দেহ হবার কথা।

মুক্তি নিজের জায়গাটীতে বসে হঠাৎ বললে—তুমি হেঁটে আসতে পারলে এই অন্ধকার পথ চিনে?

সুধীর একখানা কি বই পড়ছিল; হঠাৎ চমকে উঠল; তখনি নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—না। একা তো আসি নি। ষ্টেশন হতে একটা কুলী এনেছিলুম। কি করে চিনব নচেৎ তোমাদের বাড়ী। যে জঙ্গল—আর যে অন্ধকার।

মুক্তি মুখখানা খুব গম্ভীর করে বললে, যাই হোক, পথে যে কোন বিপদ হয়নি, এই সুখের কথা। ভাগ্যে তোমার সঙ্গে কিছু ছিল না। এই ধর, যদি থাকত তোমার সঙ্গে আংটী ঘড়ী কি চেন—

দেখলুম সুধীরের মুখখানা সাদা হয়ে গেল; রুদ্ধশ্বাসে সে বললে—কি হত তাহলে?

বললে—যে ডাকাতের ভয় এখানে, তা আর কি বলব। সে দিন এখানকার জমীদার-বাবুর জামাই এই আটটার ট্রেণে এসেছিলেন কলকাতা হতে। তিনি ষ্টেশনে ছিলেন, সেই সময় একটা ভদ্রলোক, মুখে এই মোটা গোঁফ—এই মোটা নাক—বড় ষণ্ডা চেহারা,—গিয়ে তাঁকে পরিচয় দিলে—আমি তোমার শালা। জামাইবাবু চিনতে পারেন নি, কাজেই তার গাড়ীতে উঠে আসছিলেন। পথের মাঝে সেই লোকটী আংটী, চেন, ঘড়ি, নগদ প্রায় হাজার খানেক টাকা সব নিয়ে তাঁকে দিয়ে যায় তাঁর শ্বশুর-বাড়ী। ভদ্রলোক না পারেন লজ্জায় বলতে কারও কাছে, না পারেন কিছু করতে—এমন অবস্থা হয়েছিল তাঁর যা বলা যায় না।

সুধীরের মুখখানা এমন হয়ে গিছল এই কথা শুনতে শুনতে যে, তার আর বর্ণনা করা যায় না। আমার হাসি চাপাই দায় হয়ে উঠল—কোনক্রমে মুখের মধ্যে রুমাল গুঁজে আমি দুপ দাপ শব্দে পিঠটান দিলুম। তখনি সশব্দে মুক্তির ঘরের সব জানালা বন্ধ হতে লাগল; বেশ বুঝলুম, সুধীর ভেবেছে ডাকাত বুঝি এখানেও অনুসরণ করেছে তার, তাই বিষম ভয়ে সে নিজেই সব জানালা বন্ধ করছে।

নিজের ঘরে এসে আমি দরজা বন্ধ করে, হাসির ফোয়ারা খুলে দিলুম। এঁরাই আবার সহুরে চালাক চতুর ছেলে বলে পরিচয় দেন,—অথচ বিদ্যা ধরা পড়ে যায় পাড়াগাঁয়ের ছেলের কাছে। বদমায়েসী বুদ্ধিটা খেলে যত পাড়াগাঁয়ের ছেলেদের মাথায়, ততটা সহুরেদের মাথায় খেলে না নিশ্চয়ই। যদিও ম্যালেরিয়ায় বাংলার পাড়াগাঁগুলোকে জরাজীর্ণ করে ফেলেছে, ছেলেগুলির হাত পা সরু, মাথা মোটা, পেট মোটা—তাতে আবার নীলরঙের শির ওঠা, কিন্তু তাই যে বুদ্ধির জাহাজ। বুদ্ধি ঠাসা আছে ওই মোটা মাথায় আর মোট। পেটে। তার মানেও আছে। জ্বরে ভুগে ভুগে বেচারীরা দৌড়াদৌড়ি করতে পায় না কিনা, বসে বসে আর করে কি—? মাথায় যত আজগুবি প্ল্যান ফাঁদিয়ে বসে।

পরদিন ঘুম ভাঙ্গতে বেলা হয়ে গেল। আজ মণিমাষ্টার এসেছিলেন। নিয়মিত সাতটার সময়ে। আমার ঘরটা ছিল আমাদের রিডিং রুম। নীলমণি আমায় ডাকতে আসছিল, কিন্তু বাবা তাকে নিষেধ করে দিলেন আমায় জাগাতে।

আমি ঘুম হতে উঠে বাইরে আসতেই বাবাকে দেখতে পেলুম বৈঠকখানা ঘরে বসে থাকতে। আমায় দেখেই তিনি বলে উঠলেন—কেমন আছিস রে? শরীরটা ভালো বলে ঠেকছে কি?

আমি বল্লুম—এখন বেশ আছি আমি।

সুধীর তখন নীলমণির সঙ্গে গল্প করতে করতে উপর হতে নীচে নেমে আসছিল। আমি তাকে অভিবাদন করে বল্লুম—ভালো আছেন তো সুধীর বাবু?

সুধীর উত্তর দিলে, হ্যাঁ—আপনি ভালো আছেন এখন? কাল মনে বল্লুম, আপনার সঙ্গে আলাপ করব, তা আপনার অসুখ হয়েছে শুনে—ভারী দুঃখিত হয়ে পড়েছিলুম।

সে বাবার কাছে চলে গেল—আমি উপরে মুক্তির কাছে গেলুম। দুজনে যখন সুধীরের মূর্খতা নিয়ে খুব হাসছি, সেই সময় মা আড়ালে দাঁড়িয়ে থেকে ব্যাপারটা কতক শুনে একেবারে অগ্নি অবতার হয়ে ঢুকে পড়লেন ঘরে—

ও মা মা—ছি ছি ছি। কোথা যাব আমি? লোকে শুনলে বলবে কি একথা? নন্দা! অধঃপাতে নিজে গেছিস যা,—গোষ্ঠীশুদ্ধ কি বলে জড়াচ্ছিস তুই? সুধীর যদি না বোঝে তোদের ঠাট্টা—ভাববে, আমরাই বুঝি পরামর্শ দিয়ে এই কাজ করিয়েছি। আর মুক্তি! তুই কোন লজ্জায় নিলি ও সব? দে বলছি—ফেলে দে নন্দার কাছে, যা খুসী ওর করুকগে যাক। তুই কেন জড়িয়ে মরছিস হতভাগী?

মুক্তি থতমত খেয়ে বললে—তাতে কি হয়েছে আর? একটু ঠাট্টা করলেই অমনি সত্য বলে জানবে আর কি? তোমার যেমন আজগুবি কথা। যাও তুমি, কেউ তো ডাকছে না তোমায় পরামর্শ দিতে; আমাদের যা খুসী তাই করব।

মা বললেন,—কর গে যা—মরবি তুই-ই—তা আমি এক কথায় বলে দিচ্ছি।

মুক্তি বললে,—তা মরি মরব—তোমার ভয় নেই সে জন্যে।

মা আমাকে গালাগালি দিতে দিতে চলে গেলেন। আমি মুক্তিকে বল্লুম—আজ তুই সব কথাগুলো বলে—সুধীরের জিনিষ ফিরিয়ে দিস মুক্তি। আমাকেও ডাকিস—আমিও বলব।

সেদিন দুপুরবেলায় আমি নিজের ঘরে শুয়ে একখানা মাসিক পত্র পড়ছি, সেই সময় ঝি এসে খবর দিলে মুক্তি আমায় ডাকছে। আমি তখনি বার হলুম; বুঝলুম, এবার আমাকে দরকার পড়েছে তার।

উপরের ঘরে দেখলুম, সুধীর বিস্ময়ে আত্মহারা-প্রায় বসে আছে—আর মুক্তি হেসে মরছে। আমায় দেখেই সে মাথায় একটু ঘোমটা টেনে সরে গেল।

আমি হাসতে হাসতে বল্লুম—কি মশায়।—এত সাহস আপনার—কেঁদেই ভাসালেন ডাকাতের নাম শুনে? মানুষ একটু জোরের পরিচয়ও দেয় তো; কি বলে আপনি সবগুলো দিলেন বলুন দেখি?

সুধীর লজ্জায় মুখখানা লাল করে বলে উঠল,—যথেষ্ট হয়েছে মহাশয়। আপনি আমাকে যে ঠকান ঠকিয়েছেন, এ রকম যে কেউ পারবে না, তা আমি বলে দিচ্ছি।

আমি মুক্তির পানে চেয়ে বল্লুম—দে সেগুলো এখন সুধীরকে। যা হোক ধর্ম্মটা খুব মানেন দেখছি—বলেন নি তবু—এইটুকুই আশ্চর্য্যের কথা।

আমি নীচে চলে গেলুম।

১১

বাবা যে ছুটী নিয়েছিলেন তিন মাসের, তা ফুরিয়ে গেল। এই সময়ে একজামিনের ফল বার হল; দেখলুম আমি ফাষ্ট-ডিভিসানে স্কলারসিপ পেয়ে পাস হয়ে গেয়েছি।

আনন্দে আমার বুকটা ফুলে উঠল; আমি নরুর নাম খুঁজতে লাগলুম। অনেক খুঁজলুম, কিন্তু তার নাম কোথাও দেখলুম না, তখন বেশ জানতে পাল্লুম, সে নিশ্চয়ই ফেল হয়েছে।

এই সময়ে নীলমণি কাগজখানা টেনে নিয়ে দেখতে লাগল; প্রথম লাইনটা দেখেই সে বলে উঠল, এই যে নরু ফাষ্ট স্কলারসিপ পেয়ে গেছে দেখছি।

আমি দেখলুম, বাস্তবিকই সেই হয়েছে সকলের ফাষ্ট স্কলারসিপ হোল্ডার। সে স্কলারসিপ পেয়েছে মাসিক ২৫৲ পঁচিশ টাকা হিসাবে, আমার মাত্র ১০৲ টাকা।

আমার বুকটা যেন কেমন দমে গেল; মনের মধ্যে জ্বালাপূর্ণ আনন্দ অনুভব করতে লাগলুম।

মণিমাষ্টার কাগজখানা দেখতে দেখতে গম্ভীর মুখে বললে—নরু বজ্জাত ছেলে বটে, কিন্তু তার

ব্রেণ আছে; অন্যদিকে সে হাজার বজ্জাতি করে বেড়ালেও মনটা রাখতে পেরেছে পড়ার দিকে।

বাবা যখন শুনলেন আমি স্কলারসিপ পেয়ে পাশ হয়েছি, তখনি গ্রামের সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরে—১৫৲ টাকার জায়গায় কুড়ি টাকার পূজা দিয়ে পাঠালেন। বাড়ীতে মহাভোজের আয়োজন হতে লাগল। আজ মার জ্বালাকর কথাগুলোও তার কাছে মধুমাখা বোধ হচ্ছিল। সংসার লাগছিল তাঁর কাছে তখন বড় সুন্দর, ছেলের একজামিনের সাফল্যে।

ঠিক সেই দিনেই রমুবাবু বেড়াতে এলেন বোনের বাড়ীতে। তিনি প্রায়ই আসতেন বেড়াতে। বাবা তাঁকে তত পছন্দ করতেন না। রমুবাবু আসতেন যে কেন তা আমিও বুঝতে পেরেছিলুম। বাবা যে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে রমুবাবুকে দেখতেন, আমি আবার তার চেয়েও কড়াভাবে তাঁর সমালোচনা করতুম। তিনি ছিলেন ভারী স্বার্থপরায়ণ লোক; বোনের অর্থ অবাধে নিতে কোনই আপত্তি ছিল না তাঁর। বোনও স্বামীকে লুকিয়ে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করতেন ভাইটিকে।

রমুবাবু এসেই বাড়ীতে বিরাট ভোজের আয়োজন দেখে অবাক হয়ে গেলেন। তিনি নীলমণিকে কাছে ডেকে বললেন—নীলু! ব্যাপার খানা কি রে? আজ এত ফলার লেগেছে কেন লুচির?

নীলমণি অবজ্ঞাভরে উত্তর দিলে—জান না? বাবার ছেলের আজ শ্রাদ্ধ হচ্ছে যে।

স্থূলবুদ্ধি রমুবাবু আশ্চর্য্যভাবে বললেন,—কার—নন্দার? ছোঁড়াটা মরেছে বুঝি? কবে মরল রে?

আমি যে পাশের ঘরেই ছিলুম,—তা কেউ জানতে পারে নি, কাজেই তারা অবাধে নিজের নিজের মনের কথা বলে যাচ্ছিল।

নীলমণি মুখ বিকৃত করে বললে,—মরেছে কে বল্লে?

রমুবাবু আকাশ হতে পড়ে বলে উঠলেন,—এই তো তুই-ই বল্লি তার শ্রাদ্ধ হচ্ছে।

নীলমণি বললে,—জাননা কি শ্রাদ্ধ? নন্দবাবু একজামিনে স্কলারসিপ পেয়ে পাস হয়েছেন, বাবা তাই ভোজ দিচ্ছেন দু'শো টাকা খরচ করে। সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরে গেছে পঞ্চাশ টাকার পূজো—

রমুবাবু ছোট গোল চোখ দুটি বিস্ফারিত করে এমন ভাবে চাইলেন তার দিকে যে, তাই দেখে ঘরের মধ্যে হাসতে হাসতে আমার বুকে ব্যথা ধরে গেল।

নীলমণি খুব রাগতভাবে বললে,—তুমি একটা মস্ত বড় ষ্টুপিড্, মামা; কোন কথা বুঝতে পার না।

রমুবাবু মাথা চুলকাতে চুলকাতে উপরে চলে গেলেন। আমি তখন ঘরের ভেতর থেকে বার হয়ে বল্লুম,—আমি পাস হয়েছি বলে কি তোমার রাগ হচ্ছে নীলমণি?

নীলমণি সচকিতভাবে বলে উঠল,—বাঃ! সে কি কথা?

আমি বিষণ্নভাবে বল্লুম,—ঢাকা দিতে চাচ্ছ কেন আর? আমি তো সব কথাই শুনতে পেয়েছি তোমাদের। বাবা আমার জন্যে অনর্থক খরচ করছেন, এতে তোমাদের রাগ হচ্ছে। তা আমি যাচ্ছি বাবার কাছে বলতে, কেন তিনি অনর্থক এত টাকা খরচ কচ্ছেন আমার জন্যে।

নীলমণি অবজ্ঞাভরে ঘাড় নেড়ে বললে,—বল গে যাও, তোমার মত বাবাকে ভয় করে চলিনে আমি। বাবার হুকুম শোনে কে? ভারী তো বাবা—তার আবার কথা। উঃ!—ভয়ে তো মরে গেলুম আমি; যাই বাক্সের মধ্যে লুকাই গে।

তার অবজ্ঞার ভাবটা দেখে মনটা এত খারাপ হয়ে গেল, যে বলতে পারা যায় না। আমি খানিক দাঁড়িয়ে রইলুম সেখানে, তারপরে আস্তে আস্তে নিজের ঘরে ঢুকে পড়লুম।

নিদারুণ অভিমানে হৃদয় আমার পূর্ণ হয়ে উঠল; আর তিলার্দ্ধ এদের কাছে থাকতে ইচ্ছা হচ্ছিল না আমার। এরা আমায় দূরে দূরে রাখতে চেষ্টা করছে, আমি তা জেনেও ভুলে যাই, তারা আমার আপন ভাই, বোন, মা নয়; ভুলে গিয়ে আবার যাই তাদের কাছে দাঁড়াতে। নীলমণি মায়ের দৃষ্টান্তটা সম্পূর্ণ গ্রহণ করেছে। বরাবর সে দেখতে পারে না আমায়। তখন দুইজনে যে ঝগড়া বিবাদ হত, তার মধ্যে বিষয়-সম্পত্তির নাম গন্ধ ছিল না; তখন ঝগড়া হত খেলার জিনিষ নিয়ে। আজকাল নীলমণি সংসারটা বেশী চিনেছে; তার মাতৃবংশ তাকে বুঝিয়ে দেছে, আমি তার পিতার অগাধ বিষয়ের অর্দ্ধেক সম্পত্তির অধিকারী। তারপর যেদিন বাবা মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে বলেছিলেন, আমার সব সম্পত্তি নন্দর নামে উইল করে দিয়ে যাব, সেইদিন হতে মা আর নীলমণি আমায় আর দুই চোখ দিয়ে আদতে দেখতে পাচ্ছিলেন না।

বাবা আমায় ডেকে নিয়ে গিয়ে সকলকে প্রণাম

করতে বললেন। সকলেই যখন মুক্তকণ্ঠে আমাকে আশীর্ব্বাদ করতে লাগলেন, তখন নীলমণির চোখ দুটো জ্বলতে লাগল।

সেইদিন সন্ধ্যার সময়ে আমি বেড়াতে গিছলুম ষ্টেশনের দিকে। সেদিনও নরুদের বাড়ীর দিকে চোখ পড়ল। দেখলুম, আজ তাদের ঘরের দরজা খোলা—কিন্তু কারও সাড়া-শব্দ নেই। সেদিকে আর না তাকিয়ে আমি বেড়াতে চলে গেলুম।

যখন ফিরে আসছিলুম—তখন দেখলুম—তাদের বাড়ীতে প্রতি ঘরে আলো জ্বলছে।

আকাশে সেদিন পূর্ণিমার চাঁদ হাসছে—বিমল কিরণদানে ধরাবক্ষকে ছেয়ে ফেলেছে। নরুদের বাড়ীর পাশে পাঁচীল দেওয়া ঘেরা হেনা গাছটি বাইরে এসে পড়েছে, তাতে থরে থরে ফুল ফুটে বাতাসে সুগন্ধ বিকীর্ণ করে দিচ্ছে।

বাইরের ঘরে হার্মোনিয়াম বাজছিল—হঠাৎ—থেমে গেল। আমি বেশ বুঝলুম, নরু অজ্ঞাতবাস হতে ফিরে এসেছে, শান্তি এসেছে কি? মনটা হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল; আবার তখনি তাকে দমন করে ফেল্লুম—কেন সে এমন অবাধ্যতা করে? হয় তো বিয়ে হয়ে গেছে তার, সে পরস্ত্রী—তার কথা এখন মনে ভাবলেও পাপ।

আমি যে আপনহারা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে, তা ভুলে গিছলুম। একে আমার নামের সঙ্গে শান্তির নাম মিশে গিয়ে এখানকার লোকদের কৌতুহল বেশ জাগিয়ে তুলেছিল, মাঝে সেটা চাপা পড়ে গেলেও, আজ যদি কেউ আমায় জ্যোৎস্না-মাখা রাতে দেখতে পায় এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে, তা হলে নিশ্চয়ই যে সেই চাপাপড়া কথাটা আবার মাথা তুলে উঠবে, তা আমি একেবারেই ভুলে গিছলুম।

হঠাৎ চমকে উঠলুম, দেখলুম আমার সামনে একটী মনুষ্য মূর্ত্তি। সে যে কোথা হতে এসে দাঁড়াল সামনে আমার, তা ভেবে ঠিক করতে পাল্লুম না। জ্যোৎস্নামণ্ডিত সেই সুদীর্ঘ লোকটীর পানে তাকিয়েই—আমার পা হতে মাথা পর্য্যন্ত যেন বিদ্যুৎ চমকে গেল—আমার বুকের মধ্যে কাঁপতে লাগল; আমি দেখলুম সে দীর্ঘাকার মূর্ত্তিটা নরু বই আর কেউ নয়।

মুহুর্ত্তে যেন প্রস্ফুট চাঁদের আলো নিভে এল আমার চোখে; হেনার গন্ধটা বিশ্রী বোধ হতে লাগল, সামনের গাছটায় বসে যে পাপিয়াটা গান করছিল, যার সুর এতক্ষণ মধুময় হয়ে কাণে আসছিল আমার, সেই সুরটাই এখন বিষমাখা হয়ে অসীম যন্ত্রণা দিতে লাগল আমাকে।

নরু আমাকে এমন ভাবে চেয়ে থাকতে দেখে, ধীরে-সুস্থে একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে বললে—কি রে নন্দা। আছিস কেমন?

আমি নিজের ভাবটা সামলে নিয়ে বল্লুম—ভালো আছি।

নরু বললে—একজামিনে স্কলারসিপ পেয়েছিস দেখলুম। আজ নাকি খুব ভোজ চলেছে তোদের বাড়ী? বাবা! যার ঘাড়ে উঠে এণ্ট্রান্স বৈতরণী পার হয়ে গেলি, তাকে দিলি শুধু দুটো শুকনো কলার খোসা—আর শূন্য এঁটো পাতা?

আমি লজ্জায় মাথা তুলতে পারছিলুম না; তারপর বল্লুম—রাত হয়েছে বাড়ী যাই।

নরু বললে,—কতকাল পরে দেখা হল—চিরকালের বন্ধুত্ব ভুলে—দুটো কথা জিজ্ঞাসা করতে না করতেই আরম্ভ করলি বাড়ী যাই, বাড়ী যাই। দু দণ্ড আলাপ করলে কি জাত যাবে নাকি তোর?

আমি অপ্রস্তুত ভাবে বল্লুম,—জাত যাবে কেন?

সে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে—পূর্ব্বকারটা ফেলে দিয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করতে করতে বললে,—আরে, বাপু! মিছে কথাগুলো কেন আর বলছিস অনর্থক? তোরা হচ্ছিস সব গোঁড়া হিন্দু—কথায় কথায় জাত যায় তোদের। যাই হোক—জিজ্ঞাসাও তো করলিনে কোথায় গিয়েছিলুম আমি? কি অবস্থায় এই তিনটে মাস কাটিয়ে এলুম। ভারী আত্মম্ভরী লোক তুই—তা ছোটবেলা হতে বেশ বুঝে নিয়েছি আমি তোকে। আয় এখন আমাদের বাড়ী, এক কাপ চা খেতে বোধ হয় কোনও আপত্তি হবে না এখন তোর?

আমি বল্লুম,—বিলক্ষণ! আপত্তি আবার কিসের?

নরু চটপট বললে,—কে জানে ভাই! যদি এখন খৃষ্টান কি ব্রাহ্ম বলে ঘৃণা করে দূরে সরে যাস। আজকাল শুচিতাটা কিছু অতিরিক্ত রকম জড়িয়ে ধরেছে কি না তোদের, কাজেই আমায় আগে জিজ্ঞাসা করে নিতে হয়।

তার কথাগুলো আগেকার মত হলেও, তার মধ্যে এমন একটা কাঁটা ছিল, যা সূচের মতই বিঁধতে লাগল আমার বুকের মধ্যে। সে যেমন সহজ ভাবে মিশে গেল আবার আমার সঙ্গে, আমি কিছুতেই মিশতে পারছিলুম না তেমন করে।

কথা বলতে গিয়েও যে গলা আমার কাঁপছিল, তা বেশ বুঝতে পারছিলুম আমি।

নরু আমার হাত ধরে টানতে টানতে তাদের বৈঠকখানা ঘরে নিয়ে গেল।

সেই ঘরে টেবিলের ধারে একখানা আরাম কুর্সিতে বসেছিলেন, একটী জরাজীর্ণ বৃদ্ধ। মাথাটী তাঁর সমস্তই প্রায় কেশশূন্য, কেবল একটী একহাত প্রমাণ লম্বা শিখা বর্ত্তমান রয়েছে; সেটীও বয়সের জন্যে সাদা হয়ে গেছে। তাঁর চোখ দুটী একেবারে কোটরে লুক্কায়িত—তার উপরে তেমনি সাদা ভ্রূ যুগল শোভা পাচ্ছে। হাত দুখানি এত স্বাভাবিক লম্বা—যে হঠাৎ দেখলে উল্লুক বলেই জ্ঞান হয়। সমস্ত গায় ভরা সাদা সাদা লোম;—বুকে তেমনি সাদা কাঁথার মত চুল। মুখে দাড়ী বা গোঁফ কিছুই ছিল না। গায়ের রংটী তেমন মসমসে কালো—তার উপরে সাদা পৈতাগাছাটা বেশ মানিয়েছিল কিন্তু।

টেবিলের উপর তাঁর সামনে পড়েছিল, শরৎ চাটুর্য্যের চন্দ্রনাথ নামে বইখানা। দেখে আমার গা জ্বলে উঠল। এই সত্তর আশী বছরের বুড়ো, এ সব বই কি পড়া মানায় একে? এ বুড়ো এখন পড়বে গীতা—বেদ প্রভৃতি; তা না পড়ছে যত নভেল, যার সৌন্দর্য্য বুঝবার ক্ষমতা মোটেই নেই তার।

আমি বেশ বুঝতে পাল্লুম, ঘরের মধ্যে আর একজন ছিল; যার হাতের হার্ম্মোনিয়াম বাজান এইমাত্র পথে শুনতে পেয়েছিলুম আমি। আমাদের আসতে দেখে, সে চকিতে উধাও হয়ে গেছে; কিন্তু তার গায়ের এসেন্সের সুমধুর গন্ধটা এখনও এখনকার বাতাসের সঙ্গে খেলে বেড়াচ্ছে। তার পরিত্যক্ত সেই মিষ্ট গন্ধটা আমার প্রাণে পশে মুহূর্ত্তে কেমন একটা আবেগমাখা অলসতা এনে ফেললে; আমি নরুর অলক্ষ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে, মনের ভারটা একটু হাল্কা করে ফেল্লুম।

নরু আমাকে বসিয়ে রেখে, বাড়ীর ভিতর দিককার দরজার ইসক্রিনটা সরিয়ে উচ্চকণ্ঠে বললে, —চা তৈয়ার করতে বলে দাও মা। তারপর মুখটা ফিরিয়ে সেই বুড়োর পানে তাকিয়ে বললে, আপনি খাবেন মুখুয্যে মশায়?

মুখুয্যে মশাই মাথাটা বাঁ-দিকে হেলিয়ে ছোট ছোট চোখ দুটী বুজিয়ে, সেই পোড়ারমুখে হাসির লহর উঠিয়ে বললেন, যদি তোমার বোন করে দেয়, তবে খাব।

নরুও হাসিমুখে বললে,—শান্তিই করে দেবে। মা ওসব করতে যান না।

আমার বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ ক'রতে লাগল। এই বুড়োটা যে করে শান্তির নামটা মুখে আনলে,—তাতে মনে হয় যেন শান্তি এর কেউ হয়? তবে কি—তবে কি এই শান্তির স্বামী?

না—না! তা কেন হবে? বোধ হয় সম্পর্কে ঠাকুরদাদা হবে—তাই ঠাট্টা করেছে। এমন ত্রিকেলে বুড়ো, এই কি কখনও স্বর্গের সুন্দরী শান্তির স্বামী হতে পারে?

খানিকক্ষণ নানা দেশের নানা গল্প চলতে লাগল; হঠাৎ ভারী ইস্ক্রিনটা কেঁপে উঠল; সঙ্গে সঙ্গে ভারী কোমল একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—দাদা—!

নরু বললে,—তুই নিয়ে আয় না। এখানে নন্দা বই আর কেউ নেই—তাকে দেখে আর লজ্জা ক'রতে হবে না তোকে।

ঝি তিনটে কাপ নিয়ে টেবিলে রাখল; পেছনে পেছনে শান্তি খুব নরম ভাবে এসে আপন মনে চা তিনটে কাপে ঢেলে দিলে।

আমি একবার মাত্র তার মুখের পানে চেয়েই আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। মাত্র তিনটী মাস তাকে দেখিনি আমি, এই তিন মাসে তার এত পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে, যা চোখে প'ড়লে বাস্তবিকই বিস্ময় চেপে রাখা দায় হয়ে ওঠে। তার সে দম্ভপূর্ণ মুখ কোথায়? মুখে এমন একটা বেদনা আঁকা,—যেটা চকিতে আমার মনটাকে বিষাদপূর্ণ করে ফেলল। মাথায় তার অল্প কাপড়—সেফটীপিন দিয়ে চুলের সঙ্গে আঁটা রয়েছে।

সে কোনদিকেই তাকালে না—নিজের মনে কাজ ক'রছিল। আমি তার শুভ্র হাত দু'খানির পানে তাকালুম,—তারপর মুখ তুলে তাকালুম মুখুয্যে মশায়ের দিকে। দেখলুম, তাঁর চোখ দু'টো বিস্ফারিত হয়ে ন্যস্ত আছে শান্তির অনিন্দ্য-সুন্দর মুখখানার পানে! সে চোখ দেখে আমার মনের মধ্যে কেমন করতে লাগল। এতো স্নেহপূর্ণ চোখ নয়, এ যে লালসাময় দৃষ্টি।

নরু বললে,—নিন মুখুয্যে মশাই—খেয়ে নিন।

আমি তখন আমার কাপটা মুখে ধরেছি। মুখুয্যে মশায় নিজের কাপটা মুখে ধরেই—উ হু হু করেই জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটতে লাগলেন। নরু ব্যস্তভাবে বললে,—মুখ পুড়িয়ে ফেললেন? আহা!

ভদ্রলোকের কখনও খাওয়া অভ্যেস নেই;—শান্তি! কেন ওঁরটা একটু জুড়িয়ে দিলি নে বল দেখি?

মুখুয্যে মশাই বললেন,—তা হোক—তা হোক। ভবিষ্যতে মুখ-অগ্নি করবে তো ওই—ই, তা না হয় আজই মুখ-অগ্নিটা করে ফেললে।

আমার মাথার মধ্যে শতবজ্র গরজে উঠল,—কাপ শুদ্ধ হাতখানা থর থর করে কেঁপে উঠল; পাছে পড়ে যায় সেটা, তাই নামালুম সেটা টেবিলের উপর। মুখুয্যে মশায় শান্তির পানে প্রেমপূর্ণ চোখে চেয়ে বললেন,—যাও তুমি—একটু চিনি দিয়ে যাও, মিষ্টিটা বড় কম হয়েছে। তোমার হাতের মিষ্টি লাগা চাই সব জিনিষ—মিষ্টি কম হলে—

শান্তি খানিকটে চিনি তাঁর কাপে ফেলে দিয়ে চলে গেল। সে যখন মুখ ফিরিয়া চলে যায়,—তখন তার বুক্ষায়ত ছুটী চোখের দৃষ্টি পড়েছিল আমার মুখের পানে, আমি দেখলুম যেন জলে ভরে উঠেছে সে চোখ ছুটী। এ কি আমার মনের ভ্রম—না সত্য?

চা খেয়ে আমি বিদায় নিলুম।

১২

কি জানি কেন, সেদিন আমার কি হয়ে গেল; থেকে থেকে মেয়েদের মত যেন কি এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় আমার বুকটা ফেটে যেতে লাগল। মনের মধ্যে কে যেন ডেকে বললে,—এখন বৃথা তোমার অনুশোচনা। কিন্তু শান্তি তোমাকেই স্বামীরূপে পাবার প্রত্যাশা করেছিল।

আমি সেই অজ্ঞাত বক্তাকে বুঝালুম,—হাঁ, করেছিল বটে, কিন্তু আগে আমার বাবা—তারপরে—সে। অবশ্য আমিও এমন কিছু গোঁড়া হিন্দু নই,—সমাজ ত্যাগ করতে আমার কিছু বাধে না,—কিন্তু বাবাকে তো ত্যাগ করতে পারব না। আমার বাবা আগে, না—শান্তি আগে?

সেই অজ্ঞাত বক্তা যেন বললে,—তাই তো ভালো; তবে কেন আজ শান্তিকে দেখে এই অজ্ঞান যন্ত্রণায় জ্বলে ম'রছ। যে খুসি সে তার স্বামী হোক না কেন—তাতে তোমার কি? তুমি যখন তার আশাই ত্যাগ করেছ, অনর্থক তখন তার মন্দ অদৃষ্ট ভেবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবার কোনও কারণ নেই তোমার।

আমি বল্লুম,—ঠিক তাই বটে।

কিন্তু তবু দীর্ঘশ্বাস রোধ করতে পাল্লুম না; তবু সে যন্ত্রণার হাত হতে নিস্তার পেলুম না।

রাত্রে যখন বাড়ীর সকলেই ঘুমিয়ে পড়ল,—তখনও আমি জেগে ভাবছি কেবল শান্তির কথা। বিছানায় আর শুয়ে থাকতে পাল্লুম না—উঠে খোলা জানালায় গিয়ে দাঁড়ালুম।

জানালার নীচেই আমার নিজের হাতে গড়া বাগানখানি। কত জায়গা হতে ফুলের গাছ চেয়ে—না পেলে চুরী করেও এনে লাগিয়েছি এই বাগানে। বেলফুলগুলি চাঁদের আলোয় ফুটে উঠে অনুপম শোভা বিকাশ করছিল। মাঝখানে একটা লেডী ফ্লাওয়ারের কুঞ্জ;—তাতে বহু ফুল থরে থরে ফুটে উঠে ছল।

মুক্ত জানালাপথে ঠাণ্ডাবাতাস এসে গরম মাথাটা ঠাণ্ডা করতে লাগল। তখন ভাবলুম, দূর ছাই! আর শান্তির কথা ভাবব না। সে তো পরস্ত্রী,—তবে কেন ভাবছি?

তখনি মনে হল—বৈজ্ঞানিকেরা বলেন,—প্রত্যেক মানুষের দেহে ইলেক্‌ট্রিসিটি আছে—যার জন্যে মাতা বহু দূরস্থিত পুত্রের মঙ্গলামঙ্গল জানতে পারেন,—স্বামী—স্ত্রী পরস্পরের ভালো মন্দ বুঝতে পারে। সেই সিটিটা ছুইটা মনে একই চিন্তা জাগিয়ে তোলে। দূরের ব্যবধান তাদের কাছে কিছুই নয়। হয় তো শান্তি এতক্ষণ আমায় ভাবছে, তাই তার আরাধনা আমার মনের শান্তিনাশ করে আমাকেও ভাবিয়ে তুলেছে। এটা তো আর অস্বাভাবিক নয়।

এটা'কেও এক রকম মেসমেরিজম বলা যায়।

আমি ভাবতে লাগলুম,—সেই জরাজীর্ণ বুড়ো, তাকে কি করে শান্তি বিয়ে করলে? এ বিয়ে হবার আগে সে গলায় দড়ি দিয়ে, না হয় আফিং খেয়ে মরলেও তো পারত। তা না করে, —এই পলে পলে বিষ খাবার কি কারণ ছিল তার?

আমার দেয়ালের ক্লকটাতে বারটা বেজে গেল। রাত্রি সোঁ সোঁ করছিল। এমন নিস্তব্ধ চারিদিক—যে দেখতে ইচ্ছে করে। ঘুমে ঢলেপড়া গ্রামখানির সৌন্দর্য্য, খানিক চোখ ভরে দেখে আমি বিছানায় শুয়ে পড়লুম।

তারই চিন্তা করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লুম, তা জানি নে। সকালে ঘুম হতে উঠেই, লুকিং গ্লাসের কাছে দাঁড়িয়ে নিজের মুখখানা দেখেই শিউরে উঠলুম। এ রকম মুখ হয়েছে আমার, যা দেখলেই সকলের মনে সন্দেহ জেগে উঠবে।

চাকরটা এসে খোলা জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে আমায় দেখলে; তারপর বললে,—বাবু আপনাকে ডাকছেন——

আমি বল্লুম,—যাচ্ছি।

ঘড়ির পানে তাকিয়ে দেখলুম, আটটা বেজে গেছে। দরজা খুলে বার হয়ে আগে চোখে মুখে জল দিয়েই, বাবার কাছে গেলুম। বাবা আমায় দেখেই বলে উঠলেন,—তোর মুখ অমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন রে নন্দ?

আমি সে কথার উত্তর না দিয়ে বল্লুম—আমায় কি ডাকছেন আপনি?

বাবা বললেন,—হ্যাঁ,—তোর চেহারা হঠাৎ এমন হল কেন?

আমি বল্লুম,—শরীরটা ভালো লাগছে না তেমন।

বাবা অস্থিরভাবে রমুবাবুর পানে তাকিয়ে বললেন,—এই দেখ ব্যাপারখানা। আমি মনে করছি আজই বিকেলে নিয়ে যাব ওকে কলকাতায় কলেজে ভর্ত্তি করে দিতে, অসুখ করেই বুঝি ব'সল। যাও তো ভাই। তোমার দিদির কাছ হতে কুইনাইন টিউবটা এনে দাও তো আমায়—তিনটে পিল খাইয়ে দি এখনি।

আমার প্রাণ শুকিয়ে গেল কুইনাইন খাবার নামে; শুষ্কস্বরে বল্লুম,—না—আমার জ্বর হয় নি তো——

বাবা বললেন,—তা না হোক,—কুইনাইনটা খা; ওতে ভালো হবে বই মন্দ হবে না তো—আর সর্দ্দি-টর্দ্দি যা থাকে শুকিয়ে যাবে। আর দেখ ভাই রমু! মুক্তিকে বল গে যাও, একটু নুন চা করে দিতে নন্দাকে, তাতে যেন খানিকটে আদা ফেলে দেয়। এ ছেলে নিয়ে হয়েছে আমারই মুস্কিল। কেউ তো আর দেখবে না আমি ছাড়া—

তিনি আমার পিঠে হাত বলিয়ে দিতে দিতে সস্নেহনেত্রে চেয়ে বললেন,—কি চেহারাই হয়েছে একেবারে? কাঁচা সোণার মতই রং—নীলমণির গায়ের রংও হেরে যায় নন্দার কাছে, সেই রং যেন কালো হয়ে গেছে। বড় বড় চোখ—বসে গেছে—গাল দুটো শুকিয়ে গিয়ে নাকটা উঁচু হয়েছে। আমার বোধ হয়, রোজই জ্বর হয় তোর? বল দেখি সত্যি করে আমায়?—শীত করে কি রোজ?

আমি মাথা নেড়ে বল্লুম,—না। জ্বর হবে কেন?

বাবা বিরক্তভাবে বললেন,—নিশ্চয়ই তোর জ্বর হয়। ভাত খেতে দেব না—ওষুধ খেতে দেব, সেই ভয়ে লুকিয়ে রাখিস্ আমার কাছে। আমি কলকাতায় গিয়ে বড় ডাক্তার দিয়ে দেখাব তোকে —তারা যে মত দেবে, ঠিক সেই অনুসারে চলতে হবে তোকে।

রমুবাবু চলে গেলেন; খানিক পরেই কুইনাইনের টিউব এনে হাজির করলেন। চাকরটা বাবার আদেশ মত এক গ্লাস জল এনে চৌকীর উপরে রাখলে।

কুইনাইনের তেতোটা অনুভব করে আমার গা শির শির করতে লাগল; কিন্তু, এ আর কেউ নয়, বাবা; যমের কাছ হতে পরিত্রাণ পাওয়া গেলেও, বাবার কাছ হতে কিছুতেই পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না।

আমি বল্লুম,—শুধু পেটে কুইনাইন খাব—তাতে যদি——

বাবা বললেন,—চা করতে বলেছ রমু?

রমুবাবু মাথা কাৎ করে বললেন,—চা আনছে।

একটু পরেই মুক্তি চা নিয়ে এসে হাজির করলে। বাবার হুকুমে মিষ্টি চায়ের পরিবর্ত্তে আদা আর নুন গোলা চা গিলতে হল আমায়, প্রথম চুমুকটা দিয়ে আড়ে আড়ে তাকিয়ে দেখি, বাবা তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। তিনি মনে করতেন, আমি আজও ছোট খোকাটি রয়েছি, তাই শাসন করতেন তেমনি ভাবে; আমিও নীলমণির মত সে শাসন মাথা নাড়া দিয়ে না ঝেড়ে ফেলে, মাথায় তুলে নিতুম।

চা খেতে এত দেরী কচ্ছিস কেন রে? অন্যদিন তো এক চুমুকেই এক কাপ চা উজাড় করে ফেলিস। পিল খেতে হবে বলে বুঝি—এ রকম কচ্ছিস্?

আমি বল্লুম,—বড় নুন হয়েছে—

বাবা বলিলেন,—তা হোক, খেয়ে ফেলে দে। পেটে গেলেই উপকার দেবে'খন।

দায়ে পড়ে চা টুকু তিনটে কুইনাইন পিল দিয়ে গিলতে হল আমায়। মুখটা বিষম তেতো হয়ে গেল। বাবা তখন ধীরভাবে তাকিয়াটায় হেলান দিয়ে তামাক টানতে টানতে বললেন, যা এখন তোর কাপড়-চোপড়গুলো সব গুছিয়ে ফেল দিকি। আজ পাঁচটার ট্রেণে কলকাতায় যেতে হবে আমাদের।

মুক্তি বিমর্ষভাবে নিজেই এসে আমার কাপড়-জামা সব একটা ট্রাঙ্কে গুছিয়ে দিতে লাগল।

আমি বল্লুম,—আমি যাব বলে তোর কি কষ্ট হচ্ছে মুক্তি?

মুক্তির চোখে জল আসছিল—সে খুব কষ্টে চোখের জল সামলে নিয়ে বললে,—কষ্ট হবে কেন? তুমি পড়তে যাচ্ছ—ভালোই তো।

আমি তার ভাবীগলা—আর চোখের ভাব দেখেই বুঝতে পাল্লুম, তার আনন্দ কতদূর হচ্ছে! মা এসে বারাণ্ডা হতে উঁকি দিয়ে দেখে ডাকলেন,—মুক্তি! এখানে কচ্ছিস কি? ও ঘরে চল একবার।

মুক্তি বললে,—কেন—কি দরকার ও ঘরে?

মা চটে উঠে বললেন,—সব কথায় কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি তোকে, দরকার আছে আমার।

মুক্তি আমার একখানা কাপড় বেশ করে কুঁচিয়ে দিতে দিতে আমার পানে তাকিয়ে বললে,—এই কাপড়খানা পরে যাবে তো দাদা? এখানা থাক তবে বাইরে।

আমি তার হাত হতে কাপড়খানা নিয়ে বল্লুম,—তুই যা মুক্তি—মা ডাকছেন; তাঁর কথা অবহেলা করতে নেই।

মুক্তি মায়ের প্রতি দারুণ অবহেলা দেখিয়ে বললে,—আমি কখনও যাব না তোমার বাক্স না গুছিয়ে।

মা দাঁতের উপর দাঁত রেখে গর্জ্জন করে বললেন,—আঃ পোড়ারমুখী!—কি করব যে তোকে নিয়ে তা আর বুঝতে পারি নে। আমার এমন পোড়াকপাল, যেমন স্বামী—তেমনি হয়েছে মেয়ে। নিজের ভাই রইল পড়ে—

মুক্তি বলে উঠল,—বড়দা বুঝি নিজের ভাই নন?

মা। হ্যাঁ, লো হ্যাঁ,—তবু যদি ভালো ব্যবহার ক'রত। রাগে গা জলে যায় আমার তোর কাণ্ড দেখে। সাত গাছা খ্যাংরা নিয়ে ঝাড়তে ইচ্ছে করে তোকে আমার। নীলু আমার ভেসে গেল—আদুরে নন্দগোপাল হল ওর দাদা? আপদ তুই, দূর হয়ে যা শ্বশুরবাড়ী,—তোকে ভাতকাপড় দিয়ে মানুষ করা—আর কালসাপকে দুধকলা দিয়ে পোষা, দুই-ই এক সমান। ও মা মা! পেটের কাঁটা যার শত্রু—তার সুখ কি আছে সংসারে? এ যে গেলাও যায় না—উগরানোও যায় না।

আমি মুক্তির হাত ধরে তাকে উঠিয়ে দিলুম। যা ভাই যা! কেন বকুনি খাচ্ছিস অনর্থক আমার জন্যে?

মুক্তি গজ গজ করতে করতে দরজার সামনে দণ্ডায়মানা মাকে এক ধাক্কায় দেওয়ালের উপর ফেলে, দ্রুতপদে চলে গেল। মা আঘাত পেলেন কি না, জানিনে; কিন্তু তিনি বিষম চীৎকারে সমস্ত বাড়ীখানা কাঁপিয়ে তুললেন,—দস্যি মেয়ে—দস্যি মেয়ে;—খেয়ে খেয়ে গায়ে হাতীর জোর হয়েছে। দূর হোক—দূর হোক—মরুক এখনি—মরুক এখনি।

তিনি চলে গেলেন, আমি নিজেই বাক্স গুছিয়ে নিলুম।

বাড়ী হতে যে চলে যাব—এতে আমার আনন্দ হচ্ছিল। এখানে থাকতে মোটেই আমার ইচ্ছে কচ্ছিল না। এখানকার অশান্তি কোলাহলে আমার প্রাণ হাঁফিয়ে উ'ঠছিল।

আরও একটা বিশেষ মুক্তির আনন্দ আমি অনুভব করছিলুম—শান্তির জন্যে এখানে থাকতে আর মোটেই ইচ্ছে কচ্ছিল না। এখানে থাকলেই আমার নরুর সঙ্গে দেখা হবে, নরু আমায় টেনে নিয়ে যাবে তাদের বাড়ী; সেখানে সেই ঠাকুরদার বয়সী শান্তির স্বামীকে বারবার দেখলে কিছুতেই আমার ধৈর্য্য থাকবে না। শান্তির সেই কাতরতা-মাখা মুখখানা কিছুতেই আমি আর দেখতে পারব না। এখানে সেই আগুনের মত চিন্তা অবিরত দহন কচ্ছে আমায়; দূরে গেলে পাঁচটা দেখলে শুনলে তাকে নিশ্চয়ই ভুলতে পারব।

রমুবাবুর মুখখানা বড় প্রফুল্ল। তাঁর বিষমবিঘ্ন ছিলুম আমি, আমার জন্যে তিনি চাকর ঝির উপর অবধি ক্ষমতা চালাতে পারতেন না, একটু সঙ্কুচিত-ভাবে চল'তে হতো তাঁকে। আজ আমি চলে যাচ্ছি—আনন্দে প্রাণটা তাঁর ভরে উঠল—সে আনন্দটা তাঁর চোখে মুখে বেশ ফুটে উঠেছিল।

আমি খুব বিরাগের ভাবে দেখেছিলুম তাঁকে। নীলমণির মুখটাও বেশ প্রফুল্ল ভাবের। আমি কোনদিকেই অত মনোযোগ দিচ্ছিলুম না।

বেলা যখন চারটে বাজল—তখন বাবা মাকে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বেশ করে উপদেশ দিয়ে, নীলমণিকে মনোযোগ দিয়ে পড়তে বলে, আমায় নিয়ে গাড়ীতে উঠলেন।

তিনি আমায় সামনে বসাতে চাইলেন, কিন্তু আমি বসলুম ছইয়ের ভেতরে। আমার ভয় হচ্ছিল—পাছে সামনে বসলে নরুর সঙ্গে দেখা হয়, এই ভেবে।

বাবা হুঁকোটা নিয়ে তামাক টানছিলেন।

আমি পেছন হতে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগলুম। নন্দদের বাড়ীর সামনে গাড়ী আসছে দেখলুম, —মুখুর্য্যে মশায়—একটা ঘোড়ায় বসে সিগারেট খাচ্ছেন—নন্দ তাঁর পাশে ঝুঁকে পড়ে কি বলছে।

আমি সরে এসে বসলুম।

১৩

কলকাতায় গিয়ে পৌঁছেই বাবা একখানা গাড়ী করলেন। কোথায় যে যাব, তা জানেন তিনিই; আমি তার কিছুই জানতুম না। তিনি কোচম্যানকে বলে দিলেন—আহেরীটোলায় চল।

আমি এর আগে কলকাতা কখনও দেখিনি; আজ এই নতুন দেশ দেখে একেবারে তাজ্জব বনে গেলুম।

আমি বাবাকে বল্লুম,—আমি কোথায় থাকব বাবা?

বাবা উত্তর দিলেন, আমার বন্ধু, তিনি এখানে কাজ করেন; তিনিই বলেছেন তোমায় রাখবেন। বোর্ডিংয়ে রাখতে পারতুম তোমায়, কিন্তু আমার মন মানবে না তাতে। একটা কোন নির্দ্দিষ্ট জায়গায় রাখলে পরে মনটা আমার ঠাণ্ডা থাকবে; তোমার অসুখবিসুখ হলেও আমায় ভাবতে হবে না আর।

আহিরীটোলায় নেমে পড়লুম। বাবা গাড়ীর ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সামনের হলদে রংয়ের বাড়ীটায় প্রবেশ করলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গেলুম।

একটী ভদ্রলোক তক্তাপোষে বসে চোখে চশমা এঁটে কি পড়ছিলেন। শুনলুম, ইনিই বাড়ীর কর্ত্তা, বাবার সঙ্গে তাঁর সব কথাবার্ত্তা কি হল, আমি অত কাণই দিলুম না তাতে।

একটী যুবক এসে ঘরে ঢুকলেন। তাঁর চোখে সোনার চশমা, কালো জামার পকেটে সোনার ঘড়ি—মোটা চেনটা বুকে ঝুলছে; আঙ্গুলে হীরের আংটী ঝক্ ঝক্ করছে।

শুনলুম, ইনি এই বৃদ্ধ কর্ত্তার একটী মাত্র ছেলে; এঁর নাম প্রমোদকুমার। সম্প্রতি প্রেসিডেন্সী হতে বি, এ, পাস দেওয়ার জন্যে পাঁচবার প্রাণান্তক চেষ্টা করাতেও নিষ্ফল হয়ে, মনের রাগে কলেজ ত্যাগ করে বাড়ীতে এসে বসেছেন। আজ দুইতিন বছর হল—এঁর বিয়ে হয়েছে। বউটী উপস্থিত পিত্রালয়েই আছে।

আমার সঙ্গে তিনি মুহূর্ত্তে আলাপ করে নিলেন; তারপর আমায় নিয়ে একেবারে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলেন।

তার দুইটি বোন—একটী বিধবা—বয়স মাত্র তের কি চৌদ্দ বছর হবে—সে এখানেই থাকে, আর একটী সধবা, সে থাকে শ্বশুরবাড়ী।

প্রমোদ আমায় নিয়ে তাঁর মার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। তাঁর মা খুব ভালোলোক ছিলেন—তিনি প্রথম দৃষ্টিতেই দেখলেন আমায় ছেলের মত চোখে, আমিও তেমনি মায়ের মত দেখতে লাগলুম তাঁকে।

রেখা মেয়েটী ছিল একেবারে শিশুর মত সরল। সে যে বিধবা—তা মোটেই কেয়ারে আনত না সে। এমন ভাবে যে তার মত দুর্ভাগিনী বালিকা হাসতে পারে—গল্প করতে পারে, পুতুলের বিয়ে দিতে পারে, তা আমি জানি নে। সেও খুব শীগগির আমায় সঙ্গে ভোড়দা সম্পর্কটা পাতিয়ে ফেললে। আমিও হাসিমুখে ধরা দিলুম তার কাছে।

তার মা হাসতে হাসতে বললেন,—বাবা; আমার এ মেয়েটী মাথা-পাগলা—ওর কথা কিছু ধরো না;—ওর কথার মোটে ঠিক নেই। কি বলে না বলে—কেউ বুঝতে পারে না।

এই সময়ে বাবা আমায় ডাকলেন; আমি বাইরে গেলুম। বাবা বললেন,—পছন্দ হয়েছে তোর এ বাড়ীটা?

আমি মাথা কাত করে বল্লুম,—হ্যাঁ।

বৃদ্ধ কর্ত্তা চন্দ্রনাথ বাবু হাসতে হাসতে বললেন,—ওহো! তুমি কি জান না,—আমার রেখার কথা মনে নেই তোমার? এখানে যে আসবে, সে কিছুতেই ছাড়াতে পারবে না তা। নন্দ! আমার রেখার সঙ্গে দেখা হয়েছে তো?

প্রমোদ বললে,—রেখা খুব আলাপ করে নেছে।

বাবা বললেন,—কাল সকালেই তোকে একবার মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাব—ভোরবেলা উঠিস্। সেখানে যেমন বেলা করে উঠতিস—এখন আর তত বেলা খবরদার করিস নে যেন।

প্রমোদ বললে, সে জন্যে ভয় নেই আপনার, আমি ঠিক জাগিয়ে দেব ওকে।

আমি বল্লুম,—মেডিক্যাল হসপিটালে যেতে হবে কেন আমায়?

বাবা—তোর রোজ অসুখ হয় কেন, তাই দেখাতে নিয়ে যাব।

আমি একটুখানি চুপ করে থেকে বল্লুম,—আমার জ্বর হয় না তো;—আপনি শুধু শুধু টাকা খরচ করবেন কেবল।

বাবা একটু বিরক্তভাবে বললেন,—টাকা যায় যাবে আমার, তোর তো যাবে না। আমার খুসী—আমি যদি দেদার টাকা খরচ করি এখন।

চন্দ্রনাথ বাবু বললেন—তোমার বাপের কথা শোন নন্দ, উনি যা বলছেন, তা তোমারই ভালোর জন্যে।

প্রমোদ আমাকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গেল।

সেদিন খাওয়া-দাওয়া সেরে তারই কাছে ঘুমালুম। পরদিন ভোর হতেই ঘুম ভেঙ্গে গেল বাবার ডাকে। তিনি তখনই মেডিক্যাল হসপিটালে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

চন্দ্রবাবু বললেন,—একটু পরেই যাবেন না হয়। জল খাবার খেয়ে যান—কত বেলা হবে ঠিক নেই তো।

জলখাবার খেয়ে বাবা আমাকে নিয়ে একখানা গাড়ী করে একেবারে মেডিক্যাল হসপিটালে গিয়ে উঠলেন। প্রতিবাদ করে আর কোনও ফল নেই দেখে, অগত্যা সকল অত্যাচারই মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত ছিলুম আমি।

ডাক্তার একজামিন করে দেখে, প্রেসক্রিপসান লিখে দিয়ে বিদায় করলেন। পথে আসতে বাবা একটা ডিস্পেন্সরি হতে ওষুধ কিনে সেখানেই এক ডোজ গিলিয়ে দিলেন।

বাড়ী ফিরে তিনি চন্দ্রনাথ বাবুর হাতে আমায় ওষুধ খাবার ভার দিলেন। সেইদিন তিনটার সময় তিনি তাঁর কর্ম্মস্থলে চলে গেলেন।

প্রমোদ আমায় প্রেসিডেন্সিতে ভর্ত্তি করে দিলে।

দু চার দিন থাকতে থাকতে আমার প্রথম সঙ্কোচটা বেশ কেটে গেল। আমি তখন সম্পূর্ণরূপে এদেরই বাড়ীর ছেলেরূপে গণ্য হয়ে গেলুম। এমন আদরযত্ন যে আমি জীবনে কখনও পাই নি, বাবার কাছ ছাড়া, তা বলাই বাহুল্য।

প্রমোদের মতটা ছিল ব্রাহ্ম ধরণের। আমি দেখতুম, প্রতি রবিবারে সে ব্রাহ্মসভায় যেত; প্রথমটা আমি যেতুম না, কিন্তু তারপরে সে যখন একদিন আমায় টেনে নিয়ে গেল, তারপরে যেতে আমার কোনই আপত্তি রইল না।

নরুর কথাগুলো বরাবরই আমার হৃদয়ে গাঁথা ছিল। তবে সে যে আগুনটা ধরিয়ে দিছিল—সেটা চাপা ছিল, কেউ ছিল না এমন যে সেটা ফুঁ দিয়ে ধরিয়ে দেয়। প্রমোদ মস্ত উৎসাহে আমার নতুন পথের গুরুপদ গ্রহণ করলে, আমিও তার প্রদর্শিত পথে পূর্ণ উদ্যমে চলতে লাগলুম।

চন্দ্রনাথ বাবু ছিলেন পুরো হিন্দু; ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী না জপলে তাঁর দিন যেত না। তাঁর গুণধর ছেলেটী গায়ত্রী মন্ত্র একেবারেই ভুলে গিছল। সে দিন আমার সঙ্গে তর্ক রেখে গায়ত্রী উচ্চারণ করতে গিয়ে—শুধু ওঁ—বলেই ছেড়ে দিলে।

সত্যি কথা বলতে কি—আমি গায়ত্রী জপতে ভুলতুম না। কেমন যে একটা জন্মগত সংস্কার—কিছুতেই ত্যাগ করতে পারা যায় না। মনে করি মাটীর পুতুলের কাছে মাথা নুইয়ে কি হবে? ঈশ্বর তো সব বস্তুর মধ্যেই বর্ত্তমান;—তিনি যে শুধু ওই খড়মাটী দিয়ে গড়া প্রতিমাটার মধ্যেই বর্ত্তমান থাকেন, তার কোন প্রমাণ নেই। মনে করি—প্রতিমা দেখলে কখনো মাথা নোয়াব না—তীব্রভাবে তার সমালোচনা করে এমন ভাবে চলে যাব অবহেলা করে, যাতে লোকে জানতে পারে—আমি প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধবাদী। কিন্তু তবু যে কি একটা জন্মগত সংস্কার, যার বলে হাত তুলে প্রমাণ না করলেও শূন্যে মাথাটা একটু সামনে নুইয়ে চোখটা অন্যের অলক্ষ্যেও একটু বুজতে হয়। আড়ালে তীব্র বিদ্রূপ করতে পারি কিন্তু সামনে—যদিও জানছি মাটীর পুতুল,—তবু তামাসা কি সমালোচনা করতে পারি নে। সামনে সেই মূর্ত্তিটা দেখলেই এমন একটা দীনতা এসে পড়ে যে, তখন বাক্যহারা হয়ে যাই; কেবল গভীর একটা ভাব-সমুদ্র আমার চারিদিকে বেড়ে গম্ গম্ করতে থাকে।

তবু প্রমোদ বা তার দলের ছেলেদের কাছে হটিনি। মুখে খুব আস্ফালন করি, আমি পুরো নাস্তিক। আমি ব্রাহ্মও নই—হিন্দুও নই—খৃষ্টানও নই। দেবতা যে আছে, তা মানতে আমি প্রস্তুতই নই মোটে। আমার এই অসম্পূর্ণ বিশ্বাসটা দূর করিবার জন্যে, আমার অন্ধকারাবৃত প্রাণটাকে আলোয় নিয়ে যাবার জন্যে পরম করুণাময় প্রমোদের প্রাণটা কেঁদে উঠেছিল; সে এখন যাতে হাতে আমায় ব্রাহ্মধর্ম্মে নিয়ে যাবার জন্যে খুব চেষ্টা কচ্ছিল। তার মনের ভাবটা বুঝতে পেরে আমি মনে মনে হাসতুম মাত্র।

মুক্তির পত্র একখানা পেলুম। সে লিখেছে

বাড়ীর সকলে ভালো আছে। মামাবাবু বাড়ীর গার্ড হয়ে এখানেই আছেন; তিনি খুব নবাবী চালে চলেছেন। নীলমণি দিন দিন বড় দুর্দ্দান্ত হয়ে উঠেছে। বাবা বড় বেশী পত্রাদি দেন না। খুব কম পত্র দেন। পূজোর সময়ে আমি যেন নিশ্চয়ই বাড়ী যাই, তাতে যেন বিন্দুমাত্র আপত্তি না করি।

আমি দেশ হতে আসবার সময় ভেবেছিলুম, আর দেশে ফিরব না। এই জন্মের মত দেশ হতে যাচ্ছি। কিন্তু কলকাতায় এসে কয়েকদিন থাকতে থাকতে মনের ভাবটা বদলে গেল; আবার সেই নিজের পুরানো দেশে—ফিরে যাওয়ার জন্যে প্রাণে একটা ব্যগ্র টান অনুভব করতে লাগলুম।

রেখার সেদিন কি একটা ব্রত ছিল, তার মা তাতে খুব উৎসাহ দিতেন। সেদিন তার পূজো করে দেবার জন্যে সে আমাকে ধরে বসল—ছোড়দা—আমার পূজো করে দাও।

আমি আকাশ হতে পড়লুম,—আমি কি পূজো জানি? মন্ত্রই জানি নে—কি করে পূজো করতে হয়, তাও জানি নে।

সে বিস্ফারিত চোখে বললে,—ইঃ—তা নাকি হয় কখনও? বামুন তুমি—পূজো আবার নাকি জান না?

আমি বরাবর বলতে লাগলুম, নিজের অজ্ঞতা জানিয়ে যখন পরিত্রাণের উপায় দেখলুম না কিছুতে, যখন প্রমোদের শরণাপন্ন হলুম।

প্রমোদ রেখার এই অসঙ্গত আবদার শুনে দুই চোখ পাকিয়ে লাল করে, একটা প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলে উঠল—যা যা! আর পূজো করতে হবে না। যত সব প্রেজুডিস এসে জুড়ে বসে বাড়ীটাকে, যত আমি দেখতে পারিনে এ সব, ততই ওরা যেন জোর করে করবে আরও।

রেখার প্রফুল্ল মুখখানা সান্ধ্য পদ্মের মতই এক নিমিষে ম্লান হয়ে গেল; তার চোখ দুটো জলে ভরে উঠল। সে খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল; তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে, আস্তে আস্তে চলে যাবার উদ্যোগ ক'রলে।

তার সরল বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়খানা, প্রমোদের কঠোর কথায় যে কি রকম আহত হয়েছিল, তা সহজেই বুঝতে পারলুম আমি, তাই তাড়াতাড়ি বললুম—চল রেখা—চল আমি পূজো করে দিচ্ছি তোমার। কিন্তু মন্ত্র যে জানিনে আমি—কি হবে তবে?

রেখার মুখখানা যত শীঘ্র মলিন হয়ে গিছল, তত শীঘ্র আবার দীপ্ত হয়ে উঠল; সে আমার হাতখানা চেপে ধরে প্রফুল্ল মুখে বললে—তা আমি সব বলে দেব'খন ছোড়দা। আমি মেয়েমানুষ—আর বিধবা কিনা—কিছু করবার অধিকার তো নেই আমার—

তার এই কথাটায় দেখলুম, প্রমোদের মুখে একটা কালো ছায়া এনে ফেললে; সে বিমর্ষভাবে খানিক ছোট বোনটীর অপাপবিদ্ধ পবিত্র সরল মুখখানার পানে চেয়ে রইল; তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে—দেখ দেখি নন্দ! নয় বছরের মেয়ে, বাবা আট বছরে গৌরী দান করেছিলেন,—নয় বছরে পড়তে পড়তেই বিধবা। এ অবস্থা দেখলে কি বুক ফেটে যায় না, আমাদের হিন্দু সমাজের নিষ্ঠুরাচরণের কথা ভাবলে? এই তের বছরের বালিকা—কি জানে? এর মধ্যে জগতের সব সাধ-আহ্লাদ ঘুচিয়ে থান পরে হাত খালি করে বসেছে। কি আর বলব? এই সব দেখে শুনেই আর হিন্দু বলে পরিচয় দিতে ইচ্ছে করে না। সেদিন যে সমাজের আচার্য্য আমাদের বললেন—"তোমাদের ঘরের মেয়েদের—জবাই করে সার তোমরা" সে কথা বড় মিছে নয়। এ নিষ্ঠুরাচার তো আমাদের দ্বারাই আরও চলন হচ্ছে সমাজে। আমরা যদি সুপ্রথা আনবার চেষ্টা করি, মেয়েদের সুখদুঃখের পানে তাকাই, নিশ্চয়ই তা হলে আমাদের ঘর পবিত্র আশীষে পূর্ণ হয়ে উঠবে। তোমার মতটা কি বল দেখি?

আমি বললুম—যারা ছোট বেলায় অজ্ঞানে বিধবা—তাদের—

প্রমোদ বাধা দিয়ে বলে উঠল—এর একটা কমিটি করা দরকার; আমাদের ক্লাবে এ কথাটা উঠাতে হবে আজ সন্ধ্যে বেলায়।

রেখা আমার হাত ধরে টানতে লাগল,—এস না ছোড়দা। পূজা না হলে জল খেতে পাব না আমি—বেলা এদিকে দশটা বেজে গেছে।

প্রমোদ তার পানে চেয়ে বললে পূজো করবি কার, রেখা?

রেখা উত্তর দিলে—দেবতার।

প্রমোদ—দেবতা তো তেত্রিশ কোটী রয়েছে। তার নাম তো আছে একটা।

রেখা অনিচ্ছার সঙ্গে বললে,—নারায়ণের।

প্রমোদ একটু হেসে বললে—কি হবে পূজো করে?

সে কথার উত্তর না দিয়ে রেখা আমার পানে চেয়ে বললে—তুমি তাহলে করবে না ছোড়দা? তা আমি যাই, না হয় ওই সামনের বোর্ডিংয়েও তো অনেক ছেলে আছে, বামুনও আছে নিশ্চয়, ভজনাকে পাঠিয়ে দি, সে ডেকে আনবে'খন একজনকে। তোমাদের মত, খৃষ্টান তো হয়নি আজও সবাই। না পুজো করে দিলেত বয়েই গেল। মরে তো যাবেই একদিন। দেখ তখন, নিজের দেবতা ত্যাগ করলে কেমন শাস্তি পেতে হয়।

রাগে ফুলতে ফুলতে সে চলে গেল। প্রমোদ হাসতে হাসতে বললে—যাও নন্দ; দাওগে যেমন তেমন ছুটো ফুল ফেলে পুতুলটার মাথায়; হাত ছুখানা ঘুরিয়ে চোখ বুজে একটু অনুস্বর বিসর্গ জুড়ে দাওগে, মনে করবে পুজো হয়ে গেল। ওর একটা উপায় আমি করবই, এ সব পৌত্তলিকের মধ্যে আর রাখব না ওকে। যদি যথার্থ শিক্ষা পায়, দেখবে, রেখা একদিন একটা যথার্থ মানুষ হয়ে পড়বে!

আমি রেখার সন্ধানে বার হয়ে দেখলুম, সে ভজনা নামধারী চাকরকে বোর্ডিংয়ে পাঠাচ্ছে। আমি অনেক কষ্টে তাকে নিবৃত্ত করে, স্নান করে, তার দেওয়া গরদের কাপড় খানা পরে বসলুম পুজো করতে। সে আমার পাশে বসে—আমার শুচিতাকে খুব বেশী রকম জাগিয়ে তুলে—একখানা কি বই হতে পূজা প্রণালী বলতে লাগল—আমি তার প্রদর্শিত নিয়মানুসারে পুজো করতে লাগলুম।

বসেছিলুম নাস্তিক ভাবেই, কিন্তু কখন যে মনটা চলে পড়ল সেদিকে জানতে পারলুম না। পুজো সেরে যখন উঠে দাঁড়ালুম, তখন বাস্তবিক মনে হল, আমি পবিত্র হয়ে গেছি। আর কোন অশুচি স্পর্শ করতে পারবে না আমাকে।

১৪

আমাদের যে ক্লাব ছিল—সেটার বর্ণনা করা যায় না। তার মেম্বাররা প্রত্যেকেই ছিলেন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন। যেখানটায় আমাদের ক্লাব ছিল, তার পাশেই ভদ্রলোকেরা সব থাকতেন। যে দিন আমাদের ক্লাবে কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন হত, সে দিন তাঁরা যে বিলক্ষণ বিরক্ত হতেন তার সন্দেহ নাই। আমাদের ক্লাবটাকে তাঁরা "হুক্কা হুয়ার সভা" এই নামে উল্লেখ করতেন। আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি, কেন তাঁরা এই নামটা বেছে বেছে নির্ব্বাচন করেছিলেন আমাদের ক্লাবের; কিছু দিন যাওয়া আসা করতেই বুঝতে পারলুম।

মেম্বর ছিলেন, ক্লাবের অনেকগুলি। সকলেই ক্লাবের কর্ত্তা ছিলেন, আর সকলেই এতে সন্তুষ্ট ছিলেন।

সে দিন সন্ধ্যা বেলায় প্রমোদ যখন এখানে জলদগম্ভীরকণ্ঠে হিন্দু সমাজের বিবাহের কষ্ট বর্ণনা করলে, তখন দেখলুম অনেক মেম্বরের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে পড়ল, সকলেই বললেন—আহা! তাই বটে।

কিন্তু আহা বলে সমবেদনা প্রকাশ করা যত সহজ, কাজে এগুনো বড় কঠিন। কয়েক জন মেম্বর ব্রাহ্ম ছিলেন, তাঁহারা পরম উৎসাহিত ভাবে ঘাড় ছুলিয়ে বলে উঠলেন—আর কেন—এখন জাগবার সময় হয়েছে তোমাদের—উঠে পড়—

অধিকাংশ মেম্বর ছিলেন হিন্দু; তাঁরা একটু দমে পড়লেন। একজন মাথাটায় হাত বুলিয়ে বললেন—বাস্তবিক জাগবার সময় হয়েছে বটে, জাগলেই হয়; কিন্তু তবু যে কেন শুয়ে আছি তাহাই বুঝতে পারিনে।

আর একজন মেম্বর তারস্বরে বলে উঠলেন—ওর মানে আছে। সকালে ঘুম ভাঙ্গলেও যেমন বিছানা হতে উঠতে আলস্য বোধ হয়, আড়ামোড়া দিতে, হাই তুলতে আরও আধঘণ্টা যেমন কেটে যায়, আমাদেরও হয়েছে তাই। জেগেছি বটে, কিন্তু ঘুমের ঘোরটা এখনও চোখে জড়িয়ে আছে; কেবল তারই জন্যে উঠতে দেরী হচ্ছে। কিন্তু এটা ঠিক কথা—উঠতেই হবে।

প্রমোদ গম্ভীর স্বরে বললে—উঠতেই হবে তা জানি। যে আলস্যটা জড়িয়ে আছে, সেটাকে শীগগির করে ঝেড়ে ফেলতে কতক্ষণ লাগে। আমরা এদিকে শিক্ষিত বলে অহঙ্কার করি, কিন্তু আমাদের সে গর্ব্বটা সাজে শুধু বাইরে, আমাদের অন্তঃপুরে যে নিজেদের বিকাশ করে তুলতে পারিনে—এটা কি কম বড় কথা? মেয়েদের শিক্ষার ভার বরাবর থেকে আসছে মেয়েদের হাতেই, যারা শিক্ষা নেবে, তাদের যোগ্যতা কতদূর তা না দেখেই আমরা শিক্ষয়িত্রীর পদে বরণ করি তাকে, মেয়েদের প্রথমটা যে গড়ে তুলতে হবে আমাদেরই, সেটা ভুলে যাই—। যাদের গ'ড়ব আমরা, তারাই

যথার্থ শিক্ষয়িত্রী পদবাচ্য হওয়ার উপযুক্ত হতে পারবে। যে আলস্যটার কথা বলা যাচ্ছে, সেটা ত্যাগ না করলে আমাদের সমাজ কিছুতেই উন্নতি লাভ করতে পারবে না।

একটী ব্রাহ্ম বন্ধু বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলে উঠ্‌লেন —ওহে! ছেড়ে দাও তোমাদের হিন্দুধর্ম্মের উন্নতির চেষ্টা করা। তোমাদের অন্তঃপুর যেদিন যথার্থ জ্ঞানের আলো দেখবে, সে দিনও আর আসছে না, তা ঠিক জেনে রেখ। তোমরা হাজার শিক্ষিত হও না কেন, তবু তোমরা যে অশিক্ষিত কুসংস্কারাবৃত অন্ধ-কূপের মানুষ, এ কথা যেখানেই যাওনা কেন শুনতে পাবে। সভ্য মাত্রেই দেখে হাসবে তোমাদের। সকলেই জানে তোমাদের অন্তঃপুর কেমন, সেখানে কি শিক্ষা যে বিরাজ করছে—তাও সবাই জানে। বাইরে হাজার লেক্‌চারই দাও, আর যাই কর, তোমাদের অন্তঃপুর কখনও আলোয় উজ্জ্বল হতে পারবে না তা' আমি স্পষ্ট বলে দিচ্ছি—

কথা শেষ করে তিনি একটা সোডার বোতল ভেঙ্গে খানিকটা সোডা এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেললেন। আমি দেখলুম হিন্দুদের অন্তঃপুরের কুসংস্কার আর অন্ধকার দেখে প্রাণটা তাঁর শুকিয়ে উঠেছিল—তাই তিনি তাড়াতাড়ি সরস করে ফেললেন তাকে।

হিন্দু বন্ধু একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন,—মাইরি! যা বলেছ, মিছে নয়। আমাদের বাড়ীটা এমন যে বলতে পারিনে, আমার একটী বিধবা পিসী আছেন—তিনি হচ্ছেন সকলের লিডার। তাঁর আদেশানুসারে বাড়ীটা এমন কঠোর ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছে, যে তার মধ্যে গেলেই প্রাণটা আমার হাঁপিয়ে ওঠে। সেদিন দেখলুম, পিসীর তো হয়েছে জ্বর—তার উপর পড়েছে একাদশী। জল-তৃষ্ণায় তিনি ছট্‌ফট্ করছেন—প্রায় খাবি খাচ্ছেন বললেই হয়; কেউ বাতাস দিচ্ছে—কেউ এর মধ্যেই হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ বলে অন্তিম বাক্য শুনাতে সুরু করে দেছে। পিসী তখন একেবারে উত্থানশক্তি-রহিত। আমি তখন নিজেকে ফুটিয়ে তুলতে গেলুম একটা গ্লাসে আইস ওয়াটার নিয়ে। পিসী তো নাকিসুরে কাঁদতে লাগলেন—ওরে আমায় জল দিসনে; আমিও বলি খেতেই হবে তোমায়। বাড়ীর সবাই তো আমার এই অলৌকিক কাণ্ড দেখে একেবারে আত্মহারা। এমন সময়, হতভাগা বাবা আপদ ফিরে এলেন হাইকোর্ট হতে; এসেই না এই ব্যাপার দেখে—ছাতা নিয়ে ছুটলেন আমার পেছনে বিধবার মুখে জল দিতে গেছি বলে। আমিও দেখলুম যখন—সৎকাজে গেলে পদে পদে বিঘ্ন, কোথা হতে বাবা এসেও বাদী হয়ে পড়ল, তখন সৎসাহসের পরিচয় দিলুম গ্লাস ফেলে লম্বা পায়ে ফুটপাতে এসে পড়ে। দৌড়ে এসে হাঁফিয়ে মরি আর কি? সেই হতে প্রতিজ্ঞা করেছি, আর আমাদের বাড়ীর ত্রিসীমানাতেও আমার উচ্চ জ্ঞানের পরিচয় দিতে যাব না।

চারিদিক হতে বিকট হাসি—আর ইয়া ইয়া শব্দে আমাদের ক্লাবরুমটা যেন ভেঙ্গে পড়ে আর কি—

প্রমোদ গম্ভীর ভাবে বললে—তবে তুমি হাল ছেড়ে দেছ একেবারে? এই ভয়ানক ব্যাপারের পরে আরও যেতে বল আমায়? বাবার চেহারা খানা যদি দেখতে তখন—ঠিক যেন—

আর একজন বাধা দিয়ে বললে—বাপের—চেহারা নিয়ে আর অত সমালোচনা করতে হবে না—।

প্রমোদ—তোমার মূর্খতাকে ধন্যবাদ দি। একবার এগিয়ে একটু গিয়ে, বাধা পেয়েই হাল ছেড়ে দিলে? আমাদের এই নূতন পথে দাঁড়াতে গেলে চাই সাহস, বল। একবার বাধা পেলুম বলে আর যে চেষ্টা করব না—তা নয়—আবার চেষ্টা করতে হবে, মরণ পর্য্যন্ত লড়তে হবে সমাজের সঙ্গে আমাদের। তোমাদের যা খুসী তাই কর গে; আমার যখন হৃদয় গলেছে, তখন দেখার আবার বিয়ে আমি দেবই। আমার বাপ মা যদি ত্যাগ করেন আমায়, তাতেও রাজী আছি আমি।

এ প্রসঙ্গ এখানেই শেষ হয়ে গেল, তারপর খানিক গান বাজনা হয়ে গেল, পরে রাত এগারটার সময় ক্লাব ভঙ্গ হল। মেম্বরেরা যে যার বাড়ীতে সব চললেন।

আমরা যখন আসছিলুম—তখন দেখলুম—ক্লাবরুমের পাশের বাড়ীর বারাণ্ডায় একটী বুড়ো ভদ্রলোক হুঁকো হাতে নিয়ে পদচারণা করছেন—আমাদের পানে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন—বাঁচলুম বাবা—। কি হুকা হুয়ার দলই জুটেছে। পাড়া-গাঁ ছেড়ে সহরে পালিয়ে এলুম, ভাবলুম বনজঙ্গল নেই, শেয়াল ডাকার হাত হতে পরিত্রাণ পাব; তা তো নয়। এখানে জুটেছে যত সব বয়াটে ছোঁড়ার দল, সন্ধ্যে থেকে চেঁচাবে কেবল "ইয়া ইয়া।"

আমার খুব হাসি আসছিল, কিন্তু প্রমোদের গম্ভীর মুখখানা দেখে আর হাসতে সাহস করলুম না।

দেখতে দেখতে পুজোর ছুটী এসে পড়ল। বাবার পত্র পেলুম, তাঁর ভারী অসুখ, সেই জন্যে তিনি তাঁর ম্যানেজারি কাজ হতে আবার তিন মাসের ছুটী নিয়ে বাড়ী আসছেন। আমি যেন কলেজ বন্ধ হলেই বাড়ী যাই।

বাড়ী যাবার জন্যে প্রাণটা আমার আনন্দে নাচছিল। যেদিন কলেজ বন্ধ হল, সেই দিনেই আমি বাক্স গুছিয়ে নিলুম। রেখা খুব উৎসাহ ভরে আমার কাজের অনেক সাহায্য করছিল।

আমি ঠিক জানছিলুম—প্রমোদ তার বিয়ে দেবার জন্যে খুব চেষ্টা করছে। একটী ব্রাহ্ম যুবক অনেক টাকার লোভে পড়ে তাকে বিয়ে ক'রতে সম্মত হয়েছিল। প্রমোদের বাপ ছিলেন একটী ছোট খাট জমীদার। তাঁর আয় বাৎসরিক চৌদ্দ পনের হাজার টাকা হবে। প্রমোদ তার বোনের বিয়ে উপলক্ষে এক বছরের আয়টা ব্যয় করবে বলে সঙ্কল্প করেছিল। কিন্তু এ কথা তার বাড়ীতে কেউই জানতে পারে নি। আর বাপ যে নিষ্ঠাবান হিন্দু, তিনি যে এই কথা শুনলেই যা কাছে থাকবে, তাই নিয়ে উঠবেন ছেলেকে মারতে, শুধু সেই ভেবেই প্রমোদ বাপের কাছে কোনও কথা বলতে পারে নি।

আমাকে দিয়ে চন্দ্রনাথ বাবুকে বলাবে বলে সে ভেবেছিল, কিন্তু আমি বিপদের গুরুত্ব অনুভব করে সে দিকে মোটেই ঘেঁসলুম না।

রেখা যখন আমার কাজে সাহায্য করছিল, সেই সময় হঠাৎ আমি বললুম—তুই যে বিধবা, তা তুই কেমন করে জানলি রেখা? বিয়ের কথা মনে আছে তোর?

রেখা বলে উঠল—বিয়ের কথা মনে নেই, কিন্তু মা যে বলেছে আমায়। আমার গয়না পরতে নেই —ভাল কাপড় জামা পরতে নেই, কোনও ভালো কাজে যেতে নেই।

আমি বল্লুম,—বিধবা কাকে বলে তা জানিস?

রেখা দুই চোখ বিস্ফারিত করে আমার পানে তাকালে; যেন এই সহজ জলের মত তরল কথাটা এমন গুরুভাবে বুঝে বলছি আমি, এই ভেবে সে বড় বিস্ময়ে ডুবে গেল; তার পরে বললে— বাঃ! তা আবার জানিনে নাকি? স্বামী মরে গেলেই বিধবা হয়ে যায়।

আমি যেন বুঝতে পেরে বললুম—ওঃ! তা জানিনে তো আমি। স্বামীকে তোর মনে আছে?

কোনও উত্তর না দিয়ে রেখা চলে গেল। আমি ভাবলুম, বুঝি সে কথাটা চাপা দেবার জন্যে লুকাল। কিন্তু খানিক পরেই সে ফিরে এসে আমার হাতে ছোট একখানা বাঁধান ছবি দিয়ে বলছে—এই দেখ ছোড়দা—আমার স্বামী, মা বলেছেন।

আমি দেখলুম সেটী একটী কিশোরের ফটো। এমন সুপুরুষ সে, যে তেমন দেখেছি বলে আর মনে হয় না আমার। রেখা বড় অভাগিনী; এমন স্বামী বড় তপস্যায় মেলে। তার কত জন্মের তপস্যায় পেয়েছিল একে, আবার হারিয়েও ফেলেছে।

আমি ফটোখানা দেখছি দেখে রেখা গর্ব্বপূর্ণ-স্বরে বললে—দেখলে ছোড়দা—কেমন সুন্দর আমার স্বামী?

আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, স্বর্গের দ্যুতি ফুটে উঠছে তার মুখে। এমন পবিত্রতা ও সরলতার, আশার ছবিখানি আমার সামনে ভেসে উঠেছে, যে আমার হৃদয়খানা একটা অভূতপূর্ব্ব পুলকে ভেসে উঠল তাই দেখে। একবার মনে ভেসে উঠল—ওগো স্বর্গের দেবী! তোমার রাজ্য ছেড়ে, কেন নেমে এলে এই পাপ-তাপ মাখা নরক সংসারে? এখানকার বাতাস যদিও এখনও গায়ে লাগেনি তোমার, কিন্তু যে দিন স্পর্শ করবে তোমায়, সেই দিনই তোমার মুক্তিদিন আসবে। তখন এ সংসারকে ধিক্কার দিয়ে চলে যাবে তুমি।

আস্তে আস্তে ফটোখানা দিয়ে দিলুম তাকে; সেখানা দেখতে দেখতে সে চলে গেল।

আমি বেশ বুঝলুম, প্রমোদের সঙ্কল্প কখনই কার্য্যে পরিণত হবে না। এই ধ্যাননিমগ্না দেবীকে তার সিংহাসন হতে টেনে ফেলে জাগিয়ে তোলা তার মত লোকের কাজ নয়।

১৫

বাড়ীতে এসে পৌঁছে, বাবার অবস্থা দেখে আর চোখের জল সামলাতে পাল্লুম না। তাঁর চেহারা ভয়ানক খারাপ হয়ে গেছে। জ্যৈষ্ঠ মাসে গেছেন তিনি, এই তিনটী মাসের মধ্যে তাঁর উদরী —তার সঙ্গে ক্রনিক-ফিবার এমন আটক করেছে তাঁকে, যে উত্থানশক্তি একেবারে রহিত হয়ে গেছে তাঁর।

আজ পাঁচদিন এসেছেন তিনি, শুনতে পেলুম। বাড়ীতে এসেছেন সেবার জন্যে—কিন্তু সেবা যে করবে—সেই মুক্তি এ মাসেব প্রথমেই শ্বশুরবাড়ী চলে গেছে। মায়ের মাথার ব্যারাম ছিল নাকি অনেকদিন আগে—মাঝে সেটা চাপা পড়ে গিছল, সম্প্রতি বাবার জন্যে ভাবতে ভাবতে এত বেশী হয়ে উঠেছে সেটা, যে তিনি উপর হতে নীচে নামতে পারেন না। বামুনঠাকুর তাঁর ভাত তরকারী দিয়ে আসে তাঁর ঘরে—সেইখানেই তিনি খান শোন; রমুবাবু তাঁকে অন্যমনস্ক রাখবার জন্যে লাইব্রেরী হতে নতুন নতুন বই এনে দিচ্ছেন।

নীলমণি বাইরে বাইরেই থাকে। আসছে অগ্রহায়ণ মাসে টেষ্ট একজামিন আসছে তার, সে এখন মহাব্যস্ত পড়বার জন্যে। হঠাৎ একজামিন দেওয়ার তাড়া এত পড়ে গেছে তার, যে বাবা ডাকলেও সে পড়া ছেড়ে উঠতে পারে না। বাবা প্রথম দুইদিন তাকে ডেকে—সে না আসায়—ও পড়ায় বাধা পড়ছে বলে বিরক্তি বোধ করায় আর তাকে ডেকে বিরক্ত করেন নি। আমি তাঁর কাছে গিয়ে বসতেই, তিনি আমার হাতখানা শুধু বুকের উপরে চেপে ধরলেন; তাঁর মুদিত চোখের কোণ দিয়ে শুধু জল গড়িয়ে পড়ল; আমি রুমালে তা মুছিয়ে দিলুম।

আমি বাড়ী আসতেই বাড়ীতে যেন জাগরণের পালা পড়ে গেল। রমুবাবু উপর হতে নেমে হাঁফাতে হাঁফাতে ঘরে ঢুকে পড়ে বললেন,—এখন কেমন আছেন আপনি?

বাবা একটু হাসলেন শুধু; আমি তার অর্থ বুঝলুম। আমরা কেউই যখন উত্তর দিলুম না, তখন রমুবাবু আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন। নীলমণি এসে থার্ম্মোমিটর দিয়ে তাঁর টেম্পারেচার নিতে গেল; বাবা তার হাত হতে থার্ম্মোমিটরটা নিয়ে টান দিয়ে দেয়ালের গাঁয়ে আছাড় মেরে ভেঙ্গে ফেললেন।

নীলমণি শক্ত হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল; তারপর অস্ফুট স্বরে বলতে বলতে বেরিয়ে গেল,—ওঃ! ভারি রাগ; ভয়ে মরে গেলুম আর কি? আমি বলে তাই সহ্য করছি,—অন্য ছেলে যদি হত, তা হলে——

বাবা হঠাৎ দুই কনুয়ের উপর ভর দিয়ে ঠেলে উঠে বসলেন; তীব্রদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন,—কিন্তু নীলমণি তখন অন্তর্দ্ধান হয়ে গেছে। বাবা শুয়ে পড়লেন—কোন কথাই আর বললেন না।

আমি তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলুম; হঠাৎ তিনি আমার পানে তাকিয়ে একমুখ হেসে বললেন,—ওঃ—তাই তো! তুই যে এসেছিস নন্দ, তা আমার মোটে মনেই ছিল না। তুই বুঝি এদের ভাব দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছিস? কিন্তু না! আশ্চর্য্যের কিছু কারণ নেই এতে—কারণ এ যে হবে, জানা কথাই তো। আমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করে এনে দেব, ওরা তার সদ্ব্যবহার করবে, বিনিময়ে দেবে, আমার রক্তের বিনিময়ে—জলন্ত আগুন। তোর চোখে জল কেন দেখতে পাচ্ছি? ছিঃ ছিঃ ছিঃ! মুছে ফেল শীগ্গির। তুই কঠিন ভাবে আমায় ঘিরে দাঁড়া নন্দ, আমি তোর পরে আমায় ন্যস্ত রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ি। ওরা যেন তোর কাতরতা না দেখতে পায়, ওরা যেন না হাসে।

আমি রুমাল দিয়ে চোখ মুছলুম। বাবা বললেন,—এখন যা তুই—স্নানাহার করে আয়—বেলা অনেক হয়ে গেছে।

আমি আস্তে আস্তে উঠে বাইরে এলুম। ঝি একটা কাঁচের বাটীতে করে একটু তেল এনে দিলে—তাই মেখে আমি চললুম দীঘিতে স্নান করতে।

নরুও ঠিক সেই সময়ে তেল মেখে—গামছাখানা গলায় জড়িয়ে স্নান করতে যাওয়ার জন্য বার হয়েছিল। আমায় দেখেই আনন্দে বলে উঠল,—এই যে তুই এসেছিস? আমিও এতদিন কলকাতায় কাজ কচ্ছিলুম—বোধ হয় সমস্ত কলকাতা সহরটা খুঁজেছি তোর জন্যে—কিছুতেই পাই নি তোকে। তুই ছিলি কোথায়?

সে বেশ পেয়ে বসল আমাকে; দুজনে গল্প করতে করতে ঘাটে গেলুম স্নান করতে।

ঘাটে ছিল একজন—যাকে দেখে আমার প্রাণ অকস্মাৎ চমকে উঠল। এ রকম জায়গায়, এ রকম ভাবে যে দেখতে পাব তাকে, তা আমি কখনই ভাবি নি। নরু বেশ লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়ল—আমি চুপ করে উপরে সেই চাতালে দাঁড়িয়ে রইলুম।

যে বসেছিল—সে আমাদের পায়ের শব্দ পেয়েই মুখ ফিরাল; আবার শান্তির সেই ব্যথাভরা মুখখানা ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে। নরু বললে,—এখানে তুই কি কচ্ছিস বসে?

শান্তি মাথায় কাপড় টেনে উঠে দাঁড়াল,—পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিঃশব্দে উঠে চ'ল,—আমি একপাশ কাটিয়ে দাঁড়ালুম—সে চলে গেল।

তার ভিজে কাপড়ের জলে তার ছোট ছোট পায়ের দাগগুলো সাদা সিঁড়িতে স্পষ্টভাবে এঁকে দিলে, আমি একদৃষ্টে সেই জলের দাগের পানে তাকিয়ে রইলুম।

নরু হাসিমুখে বললে,—আয় না—দাঁড়িয়ে আছিস যে? আমায় ভাই তাড়াতাড়ি যেতে হবে বাড়ীতে, রোগী আছে ঘরে—দেরী করবার যো নেই আদতে।

আমি জলে নেমে বল্লুম,—রোগীটী কে?

নরু বললে,—বুড়ো মুখুয্যে মশায়। আরে ভাই। তোদের সবার উপর রাগ করে বোনটাকে বিয়ে দিলুম ওই ত্রিকেলে বুড়োর সঙ্গে। বুড়োর ছেলে বউ সবই আছে, কেউ ভাত দেয় না—দেখেও না বুড়োকে। বুড়ো ছিল একেবারে মাটীতে মিশিয়ে; এমন সময় আমি প্রস্তাব কল্লুম বিয়ের। বুড়োও লাফিয়ে উঠল বিয়ে করবার জন্যে। কুল, শ্রেণী কিছু না দেখে বিয়ে করে বসল। বোনটার ইহ-পরকাল নষ্ট কল্লুম তোদের জন্যে। যাই হোক, সেজন্যে তো আসছে যাচ্ছে না কিছু; এখন বুড়োর আছে হাঁপানীর ব্যারাম, তার উপরে পরশু জ্বর হয়ে—আজ একেবারে ডবল নিউমোনিয়াতে দাঁড়িয়াছে। যাই হোক, শান্তি সেবা করছে খুব। মা তো জামাইয়ের কাছেও যান না,—কথাও বলেন না। শান্তি যেন হাতের উপর রেখেছে স্বামীকে। বিকেলে আসিস ভাই—একবার আধবার দেখা শোনা করিস। জানিসই তো, সময়ে সবাই সখা,—অসময়ে দেয় না দেখা, এ কথাটা? তুই যেন সে পথে যাস নে।

আমি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লুম,—আমার বাবারও তো খুব ব্যারাম; দেখি যদি আসতে পারি, তবেই আসতে পারব।

স্নান করে বাড়ী ফিরে গেলুম। যেতে যেতে মনের মধ্যে জাগতে লাগল শান্তির অপরিসীম স্বামী-ভক্তির কথা। সেই স্বামীকে যে কি করে ভক্তি কচ্ছে শান্তি, তাই ভাবতেই আমার ভারি আশ্চর্য্য বোধ হতে লাগল। একবার তার সেবাটা চোখে দেখবার জন্যে ভারি ইচ্ছা হতে লাগল। বাবা যদি বিকেলে বেড়াতে আসতে বলেন, তা হলে আসব একবার দেখতে, তাই ভেবে ঠিক কল্লুম।

আহারাদি সেরে আবার বসলুম বাবার কাছে। বাবা তখন ঘুমুচ্ছিলেন;—আমি ঘরে যেতেই তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি আমার পানে চেয়ে একটু হাসলেন, বললেন—তোর খাওয়া হয়ে গেছে নন্দা?

আমি বল্লুম,—হ্যাঁ—খেয়ে এসেছি।

বাবা বললেন,—কলকাতায় ছিলি কেমন? নিয়মিত ওষুধ খেতিস তো? তারা যত্ন করে?

আমি বল্লুম,—খুব যত্ন করে তারা। তাদের বাড়ীর ছেলেকেও যেমন চোখে দেখে, আমাকেও সেই চোখে দেখে। ওষুধ দিনকতক খেয়েছিলুম,—তার পরে ডাক্তার নিষেধ করার পর হতে আর খাইনি—

বাবা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন,—আপনার লোকের চেয়ে পর হাজার গুণে ভালো। এরা তোর নিজের লোক হয়ে যে দেখে না, তারা পর হয়ে তার চেয়ে বেশী যে ভালবাসে তোকে, এই আমার পরম সৌভাগ্য। সেখানেই থাকিস তুই; যদি আমি ভালো হয়ে উঠি, তবে যখন যখন বাড়ী আসব, তখনই আসিস তুই। অন্য সময়ে, আমি যখন না থাকব, তখন আসিস নে।

আমি চুপ করে বসে রইলুম।

বিকেল বেলায় বাবা বল্লেন, তুই সারাদিন আমার কাছে বসে আছিস নন্দা, যা এখন খানিকটে বেড়িয়ে আয়। সারাদিন মুখটি বুজে আমার কাছে বসে থাকলে অসুখ হতে পারে।

আমারও মনটা টানছিলো নরুদের বাড়ীর দিকে; তাই বাবা আদেশ দে'বা মাত্র সার্টটা গায় দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

নরু একা চুপ করে বসে সিগারেট ধ্বংস করছিল। আমায় দেখে বিপন্নভাবে বললে, এসেছিস নন্দা? বোস—

আমি তার পাশে বসে বল্লুম—তোমার ভগ্নিপতি কেমন আছেন?

নরু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, তাঁর অবস্থা বড় খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঁচানো যে যাবে, তা তো মোটেই বোধ হচ্ছে না। শান্তির অদৃষ্টটা নেহাৎ খারাপ; যাক তা ভেবে কি করব আর। এসো তুমি দেখবে যদি।

দরজার যে ইস্ক্রীনটা ছিল—সেইটা সরিয়ে সে আমাকে আগে ঢুকিয়ে দিলে—নিজে পেছনে পেছনে ঢুকল। শান্তি তখন ফোমেণ্টেশান করছে; আমাকে দেখেই মুখখানা সে নীচু করলে। তার স্বামী তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছেন। মৃত্যু তার করালছায়া বিস্তার করে দেছে সেই মুখখানার উপরে।

নরু আমায় বসিয়ে বললে—একটু বস নন্দা! আমি এক ছুটে গিয়ে ওষুধটা নিয়ে আসি ডিস্পেন্সারী হতে—

আমি ব্যস্ত হয়ে বল্লুম—আমিই নিয়ে আসছি।

নরু বললে—তোর দেরী হবে'খন! আমি যাব আর আসব, বোস না কেন একটু। শান্তি! তুই ততক্ষণ নন্দার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিস—আমি যতক্ষণ না ফিরি।

ওষুধের শিশি তুটো পকেটে ফেলে সে চলে গেল। আমি পাষাণ মূর্ত্তির মত চুপ করে বসে রইলুম। কোন দিকে যে আমার দৃষ্টি পড়ে রইল, তা আমি জানিনে। এমন একটা নিস্তব্ধতা এসে ক্রমাগত ছেয়ে ফেললে আমায়, যে আমার মনে হল বুঝি আমি কোন অজ্ঞাত স্বপ্নরাজ্যে গিয়ে পড়েছি। আমার মাথার মধ্যে ঝম্‌-ঝম করে কি এক অজ্ঞাত বাজনা বাজতে লাগল—ক্রমে চোখের সামনে হতে সব যেন বিলুপ্ত হয়ে গেল, আমি হতজ্ঞান ভাবে রইলুম। আমার জ্ঞান হতে বিলুপ্ত হয়ে গেল,—আমি কোথায় কি অবস্থায় বসে আছি।

হঠাৎ চমকে উঠলুম আমার পাশেই চুড়ীর ঠন্‌-ঠন শব্দ শুনে; কি এ—শান্তি আমার পাশে দাঁড়িয়ে এমন কামনাপূর্ণ চোখে চেয়ে আছে কেন আমার মুখ পানে!

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে সামনে একটা বিভীষিকা দেখলে মানুষ যেমন আঁৎকে ওঠে, আমিও তেমনি আঁৎকে উঠলুম। তার সেই চোখ তুটো আমার বুকের মধ্যে গিয়ে আগুনের মত জ্বলতে লাগল। আমি শঙ্কিত ভাবে চেয়ে রইলুম তবু তার সেই চোখের পানে। গল্পে পড়েছি আমেরিকাতে বড় বড় পাইথনগুলো যখন পড়ে থাকে—অসাধারণ স্থুলত্বের জন্যে নড়তে পারে না; ঘুরতে ঘুরতে যা এসে পড়ে ঠিক তার মুখের কাছে, সে তখন নিশ্চিন্তে বিনাক্লেশে গ্রাস করে তাকে। আমারও দশা হল তাই; পালাবার ইচ্ছা হচ্ছিল খুব মনের মধ্যে—মনে হচ্ছিল—নরকের বাতাস এসে আমার কপালে লেগে আমায় কলঙ্কিত করে দিলে; তবু জেনে শুনেও আমি পালাতে পারলুম না। মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় তার পানে চেয়ে রইলুম।

সে যে এক নিঃশ্বাসে কি কতগুলো কথা বলে গেল, আমি মোটেই বুঝতে পারলুম না—শুধু তেমনি ভাবেই চেয়ে রইলুম তার মুখের পানে।

আবার যখন তার কথা কাণে বাজল আমার—যখন দেখলুম, সে আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে আমার পা তুখানা বুকে চেপে ধরে—তার আবেগ মাখা চুম্বনে আর চোখের জলে ভরিয়ে দিয়ে বলতে লাগল—তুমি মুক্ত কর আমায়—ওগো! এ কারাগার হতে উদ্ধার করে নিয়ে চল আমায়; আমি স্বেচ্ছায় তোমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করছি—

তখন আমার মাথার মধ্যে শতবিদ্যুৎ হেনে গেল, শত বজ্র যেন গরজে উঠল। আমি তখন বুঝতে পারলুম—কি ভয়ানক কাণ্ড এটা। সামনে মৃতপ্রায় তার স্বামী—বৃদ্ধ হোন, স্থবির হোন—তবু তিনি স্বামী তার; তবু তার মহাকর্ত্তব্য আছে সেই স্বামীর প্রতি। আর সে কিনা এইভাবে অপর যুবকের কাছে প্রণয়-প্রার্থিনী হয়ে এসে দাঁড়াল? একি স্বপ্ন না সত্য? এই যে সৌন্দর্য্যের সাম্রাজ্ঞী শান্তি—এর অন্তর না জানি কি কালকূটে ভরা? তার একটু চিহ্ন—যা বেরিয়ে পড়েছে, তাই মাত্র আমি পেলুম; তার বোধ হয়, তার ভিতরটা যদি জগতের সামনে উন্মুক্ত করে দেওয়া যায়, তা হলে জগৎ একেবারে শুম্ভিত হয়ে যাবে। তার স্বামীকে যত্ন ভালবাসা সবই কি তবে ছলনা? ছি ছি! রমণী জাতটাই কি তবে এমনিই খারাপ?

আমি তার দৃঢ় আলিঙ্গন হতে পা তুখানাকে ছাড়িয়ে নিলুম; গম্ভীর স্বরে বল্লুম—কর্ত্তব্য তোমার সামনে শান্তি; ছেলে-মানুষি করো না আর। আমায় মজাবার চেষ্টা কর না, নিজেও এমন করে পাপে ডুবতে যেও না। আবেগের বশে বুঝতে পারছ না কি কাজ করতে অগ্রসর হয়েছ তুমি? এখনও বলছি, সাবধান হও—নিজেকে সংযত কর—

শান্তির নিটোল গোলাপী গণ্ড ভাসিয়ে দিয়ে অশ্রুধারা প্রবল বেগে ঝরে পড়তে লাগল। আমার বুকটা ফেটে যেতে লাগল তার অবস্থাটা দেখে। আমি রূঢ়কণ্ঠ নরম করে বল্লুম,—কেন এমন হয়ে পড়লে শান্তি? উনি যাই হোন তোমার স্বামী—

শান্তি চোখ মুছে ঘৃণাভরে বলে উঠল—স্বামী?

আমি বল্লুম—শাস্ত্রমতে- ধর্ম্মের চোখে তাই বই কি?

শান্তি আবেগে রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠল,—তুমি আমার স্বামী—ও আমার কেউ না। আমায় জোর করে বিয়ে করলেই কি আমি ওর স্ত্রী হব?

আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। শান্তি—এ সব কি বলছ? আমি খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বল্লুম—আবার আমার আসাই খুব

অন্যায় হয়েছে এখানে, যখন আমি জানতে পেরেছি তুমি আমায় ভালবাস। কিন্তু শুধু তোমার সেই ভালবাসার জন্যেই আসতে পেরেছিলুম—কেন না আমি জেনেছিলুম, তোমার ভালোবাসা—স্বর্গের দ্যুতির মতই পবিত্র; তা কখনও তোমায় কলঙ্কিত করে তুলতে পারবে না। এখন দেখেছি আমার সে বিশ্বাস সম্পূর্ণ অন্যপাত্রে ন্যস্ত হয়েছে। তোমার ভালবাসার দ্বারাই প্রতারিত হলে তুমি—আমার সে সরল বিশ্বাস,—যা অসীম ভক্তিকে আকর্ষণ করে এনেছিল তোমার পরে, তাও হারালে তুমি।

শান্তি আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল—আর্ত্তকণ্ঠে বলে উঠল—না না—তা যেন না হারাতে হয়; আমার অন্ধকারময় হৃদয়াকাশের মাঝে জ্বলুক তোমার ভালবাসারূপ সেই তারাটী উজ্জ্বল ভাবে; তাকে আকর্ষণ করে টেনে নিও না—টেনে নিও না।' তাহলে আমার আমিত্ব আর থাকবে না—আমি কোথায় চলে যাব ভাসতে ভাসতে, কূল আর পাব না।

হঠাৎ একটা গোঙান শব্দ কাণে এল। তাকিয়ে দেখলুম, মৃত্যুশয্যায় বৃদ্ধ চেয়ে আছেন তাঁর অবিশ্বাসিনী স্ত্রীর পানে, একটা ভীষণ যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠেছে তাঁর মুখে। হৃদয়ে যে যন্ত্রণাটা জেগেছিল; তারই স্বল্পাভাষ প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল তাঁর গোঙানী শব্দে।

আমি জোর করে পা ছাড়িয়ে নিয়ে, তাঁর পাশে বসে পড়লুম। দুই হাতে উন্মত্তের মত তাঁকে ঠেলা দিয়ে সচেতন করিয়ে দেবার জন্যে প্রচণ্ড ইচ্ছা হচ্ছিল;—আমি বলে উঠলুম,—মুখুর্য্যে মশায়—মুখুর্য্যে মশায়,—আমি অবিশ্বাসী বন্ধু নই নরু;—একবার বিশ্বাস করে চান।

মরণাহতের চোখ দুটো একবার জ্বলে উঠল মাত্র,—তারপরই সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

আমাকে কে যেন চাবুক বসাতে লাগল,—কে যেন আমার কাণে গরজে বলতে লাগল,—ওরে অবিশ্বাসী। জীবহত্যা করলি?

আমার চারিদিকে যেন সহস্রকণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগল,—অবিশ্বাসী—অবিশ্বাসী। চোখের সামনে সায়াহ্নের যেটুকু মলিন আলো ছিল, তাও যেন মিশিয়ে গেল; আমি দুই হাতে মাথা চেপে ধরে টলতে টলতে ঘর হতে বেরিয়ে পড়লুম।

সামনেই পড়ল নরু; সে দুই হাতে ওষুধ নিয়ে ত্রস্তপদে বাড়ী ফিরছে; আমায় দেখেই বলে উঠল,—যাচ্ছিস যে নন্দা?

মাপ কর,—আমি অবিশ্বাসী নই—

বলেই তার পাশ কাটিয়ে চলে এলুম আমি। আমার কথাটা শুনে তার মনের ভাব যে কি রকম হল,—কি রেখা যে তার মুখে ফুটে উঠল, তা দেখবার অবকাশ মোটেই হল না আমার। আমার কাণে শান্তির সেই কঠোর উক্তিগুলো বরাবর ধ্বনিত হচ্ছিল, চোখের সামনে ভাসছিল—তার হতভাগা স্বামীর মুখখানা। হতভাগা জেনেও যেতে পারলে না, তার স্ত্রী যার প্রণয় লাভাশায়—পায়ের তলে লুটিয়ে পড়ল—সে কি? আমি যে অবিশ্বাসী নই, এ প্রমাণ দিতে পাল্লুম না তাঁকে।

১৬

ছি ছি ছি! মেয়েদের মন কি এত হালকা? আমি যে কেবল তাই ভেবেই আশ্চর্য্য হচ্ছি,—সামনে স্বামী মৃত্যুশয্যায়, শান্তি কেমন করে আত্মপ্রকাশ করে ফেললে? তার কি একটুও বাধল না তেমন দীনভাবে আপনাকে লুটিয়ে ফেলতে পরের পায়ের তলায়?

এই সেই শান্তি—যার প্রতি কথায়, প্রতি পাদক্ষেপে দর্পের চিহ্ন প্রকাশ পেত—যে কিছুতেই নুইয়ে পড়তে চাইত না। এই সেই শান্তি—যার প্রতি কার্য্যে অহঙ্কারের ভাবটা উছলিয়ে পড়ত। আজ একি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন তার?

সত্যিই কি সে লুটিয়ে পড়েছিল আমার পায়ের তলায়, সত্যিই কি সে বলেছিল—মুক্ত কর—ওগো—মুক্ত কর আমায়, কেন তবু আমার মনে হচ্ছে—বুঝি সেটা স্বপ্ন দেখেছি;

সে তো স্বপ্ন নয়—সে জ্বলন্ত সত্য কথা। আমার কাছে আমি যেমন সত্যস্বরূপ প্রতীয়মান, তার কথা, তার কাজও তেমন জ্বলন্ত সত্যরূপে ফুটে উঠেছিল আমার সামনে।

ওরে অভাগিনী। এ কি করলি তুই? এমন পিশাচিনীরূপে কেন ফুটিয়ে তুললি নিজেকে আমার চোখের সামনে? তোর অনিন্দ্যরূপের আমি যে উপাসক; সেই রূপকে আমি যে দেবীরূপে সাজিয়ে তুলেছিলুম। এমন করে আমার সাজানো ফুলের বাগানকে বিষাক্ত নিঃশ্বাস দিয়ে পুড়িয়ে তুললি? অনিন্দ্য-ফুলগুলিকে ঝলসে তুললি রে?

নিস্তব্ধভাবে দুই জানুর মধ্যে মাথা রেখে আমি আমার ঘরে বসে পড়লুম। নৈরাশ্যে ও মনস্তাপে আমার হৃদয় যেন ছারখার হয়ে যাচ্ছিল পুড়ে।

আমি যে তাকে উচ্চ আদর্শে মহিমাযুক্ত করে স্বর্গে স্থাপন করেছিলুম,—আমারই অসাবধানে কেমন করে সে তার সিংহাসন হতে গড়িয়ে পড়ে গেল কাদামাখা এই পৃথিবীর মধ্যে? আমি তাকে স্থাপন করেছিলুম এমন জায়গায়, যেখানে সংসারের কোন আকর্ষণ তাকে টানতে না পারে, সংসারের বিষাক্ত বাতাস তাকে কলঙ্কিত না করতে পারে; কিন্তু সে যে আমার সে বাসনা ব্যর্থ করে, নিজেই এসে পড়ল সংসারের পঙ্কিলতার মাঝে।

বামন ঠাকুর এসে ডাকলে,—আপনাকে বাবু ডাকছেন।

হঠাৎ আমি চমকে উঠলুম। মনে হয়ে গেল, তার চিন্তা নিয়ে থাকলে আমার চলবে না। আমার সামনে পড়ে আছে কাজ, আমায় আমার কর্ত্তব্য পালন করে যেতে হবে এখন; এ রকম করে পরনারীর চিন্তা করতে করতে আমার মনুষ্যত্ব ক্রমে হারিয়ে ফেলছি যে। না—না! আর ভাবা হবে না তার কথা—কিছুতেই না, কিছুতেই না। সামনে যে বিস্তৃত পড়ে আছে আমার বাবার রোগশয্যা, অন্য কথা ভাববার অবকাশ কোথায় আমার?

মাথাটা তুলে দেখলুম, ষষ্ঠীর চাঁদ আকাশে হাসছে। দুটি একটি তারাও ভেসে উঠেছে অনন্ত নীলাকাশের গায়ে। একখানা সাদা মেঘ—ভাসতে ভাসতে চলে আসছে ক্রমাগত চাঁদের কাছে।

যাদের বাড়ী প্রতি বছর প্রতিমা আসে, তাদের বাড়ী বোধনের বাজনা বাজছে—সারা গ্রামখানি অভিনব অপূর্ব্ব এক পুলকধারায় অভিষিক্ত হয়ে পুলকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

আমার প্রাণে সে পুলকধারা আজ পশতে পারল না; আমি আস্তে আস্তে উঠে বাবার ঘরে গেলুম।

বাবা চুপ করে বিছানাটিতে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে আছেন। আমি যেতেই তিনি বললেন—বস নন্দা; সেই বিকালে গেছিস, আর কি একবার দেখতে নেই তোর কেমন আছি আমি?

অনুতপ্ত হয়ে আমি বল্লুম—আমি এখনি ফিরে এসেছি বেড়িয়ে বাবা। আমি তো যেতে চাইনি, আপনিই আমায় পাঠালেন।

বাবা আমার পিঠে হাত রেখে সস্নেহনেত্রে আমার পানে চেয়ে বললেন,—দেখ একটা কথা আমি ভাবছি।

আমি বল্লুম,—কি কথা বাবা?

বাবা—আমার মরতে এখন আর ইচ্ছে হচ্ছে না। তুই মনে ভাববি হয় তো—বুড়ো বাপটা মরলে অনেকটা নিষ্কৃতি পাবি। নীলমণিও তাই ভাবছে। কিন্তু দেখ, আমি ভেবে দেখলুম যদিও আমার মরণই ভালো, তবু আমার মরতে এখন ইচ্ছে করছে না। এর কারণ কেবল তুই। যদিও অন্য লোকের কাছে তোর বয়স হয়েছে, উপযুক্ত জ্ঞান হয়েছে, তবু আমার মনে হচ্ছে তুই এখনও ছেলেমানুষ, তোর কোনও জ্ঞান নেই। তোকে আর একটু বড় করে তোর বিয়েটা দিয়ে সংসারী করে রেখে যাব আমি, আমার তাই বড় ইচ্ছে করছে। না না নন্দা! কখনও মরব না আমি। এদের জন্যে আমার কিছু ভাবনা হচ্ছে না, যত ভাবছি তোর জন্যে। তুই কাল সকালের ট্রেণেই আমায় কলকাতায় নিয়ে চল—আমি সেখানে মেডিকেল হস্পিটালে না হয় থাকব—

উদ্ভাসিত হৃদয়ে আমি বলে উঠলুম,—হস্পিটালে কেন বাবা, একটা বাসা ভাড়া নিয়ে ডাক্তার দেখাবার ক্ষমতা কি নেই আপনার, আপনি কি ভূতের বেগার দিতে অর্থ উপার্জ্জন করেছেন, সে কি আপনার নয়?

বাবা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—যতদিন না উইল করতে পারব—ততদিন জোর কই আমার? ওরা যে দিতে চাচ্ছে না কিছু?

আমার মাথায় যেন আগুন জলে উঠল; বল্লুম—আমি যাচ্ছি এখনি মার কাছে, দেখি কেমন না দেন তিনি?

বলেই আমি ঘর হতে বেরিয়ে পড়লুম। বোধ হল, বাবা যেন ডাকলেন আমায়, কিন্তু রাগের মাথায় বাবার কথা আমি মোটে কেয়ারে আনলুম না।

উপরে মায়ের ঘরে উঁকি মেরে দেখলুম—মা কৌচে শুয়ে পড়ে আছেন; রমুবাবু একখানা আসনে বসে কি ভাবছেন, নীলমণি গম্ভীরভাবে বসে একখানা বইয়ের পাতা উল্টোচ্ছে।

আমি ঝড়ের মত একেবারে ঘরে ঢুকে পড়লুম—বলে উঠলুম—আমার এখনি হাজার টাকা চাই—

হঠাৎ কথাটা বলা খুব খাপছাড়া হয়ে পড়েছিল সন্দেহ নাই, মা ধড়ফড় করে উঠে বসলেন; নীলমণি বইখানা ঠেলে ফেলে তীক্ষ্ণ চোখে চাইলে আমার দিকে, রমুবাবু খুব বেশী রকম আত্মহারা হয়ে চেয়ে রইলেন।

মা বললেন,—কি বলছ—তোমার কথা বুঝতে

পারলুম না আমি কিছু, কথাটা এমন ভাবে বলেছ তুমি!

আমি বল্লুম—বাবার চিকিৎসা করাতে কলকাতায় নিয়ে যাব; হাজার খানেক টাকা দরকার—এখনি চাই;—কেন না কাল ভোরেই বাবাকে নিয়ে রওনা হব আমি।

নীলমণি বলে উঠল—উঃ—সুখ দেখে বাঁচিনে যে আর। দাও মা! সিন্দুক খুলে বের করে দাও একটা তোড়া—

মা তার মুখপানে চেয়ে তিরস্কারের স্বরে বলে উঠলেন—তুই চুপ কর নীলু। তারপর আমার পানে চেয়ে শান্তভাবে বললেন,—নিয়ে যাবে কলকাতায়, সে তো ভালো কথাই; কিন্তু হাজার টাকার দরকার কি?

আমার রাগ হচ্ছিল; তেমন ঝাঁজের সুরেই বললুম—হাজার টাকার গুরুত্বটা খুব অনুভব করতে পারছেন—কিন্তু ব্যারামের গুরুত্বটা মোটেই বুঝতে পারছেন না। যে ব্যারাম হয়েছে বাবার, তাতে কত যে হাজার টাকা লাগবে তার ঠিক আছে? যেখানে জীবন নিয়ে টানাটানি, সেখানে টাকার দিকে তাকাতে গেলে চলে না।

মা চুপ করে রইলেন,—রমুবাবু গলার মধ্যে একটা অস্বাভাবিক শব্দ করে বললেন—ঠিকই তো—বটেই তো। কিন্তু হা-জা-র টাকা;—না হয় একশ দুশই চাও—অত টাকা নিয়ে যাবে শুধু কতকগুলো ডাক্তারের পেট ভরাতে? এক এক দফে আসবেন—অমনি ভিজিটের টাকা আগে ফেলবে পকেটে,—তারপর একটু দেখবেন—ঘাড়টা নাড়বেন—চোখ দুটো এতখানি করে বলবেন—হুঁ—ভারি সিরিয়াস হয়ে পড়েছে বটে। যদি রোগটা হয় কম,—তাঁরা বলেন খুব বেশী। এটা ডাক্তারদের দস্তুর, কেন না—টাকা উপায়ের পন্থা তো সেইটেই বটে। আমাদের ওখানে একটা লোকের কাসতে গিয়ে গলা চিরে রক্ত বেরিয়েছিল, ডাক্তার অমনি বললেন, থাইসিস হয়েছে। আর একটা লোকের পেট ফেঁপে খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল, সে বেচারী ডাক্তারের কাছে দেখাতে গেছে, ডাক্তার একজামিন করে খুব গম্ভীরভাবে বললেন, পেটের মধ্যে ফোঁড়া উঠেছে। সে বেচারী তো কেঁদে মরুক, তারপরে—

মা ধমক দিয়ে বলে উঠলেন—থাম বলছি রমু,—নন্দা, তা হলে হাজার টাকাই লাগবে?

আমি বললুম—হ্যাঁ।

মা তখনি উঠে ড্রয়ার হতে চাবী নিয়ে আয়রণচেষ্টটা খুলে ফেলে, এক তাড়া নোট বার করে আমার সামনে ফেলে দিয়ে বললেন—গুণে নাও গে।

এত সহজে যে তিনি হাজার টাকা বার করবেন, তা আমি মোটে ধারণায় আনি নি। আমি ভেবেছিলুম—আমায় অনেক অপ্রীতিকর কথা বলে, তাঁকে আঘাত করে টাকা আদায় করতে হবে; সেই জন্যে সে কথাগুলোও এনেছিলুম বেশ শানিয়ে; কিন্তু তার আর একটাও দরকার হল না। আমি বিস্ময়ে একবার মার পাংশুবর্ণ মুখখানার পানে চাইলুম—; মনে হল আমার, যেন তিনি চোখের জল সামলাতে অসমর্থ হয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে পড়লেন। নীলমণির মুখখানা তখন কি ভয়ানক হয়ে উঠেছিল, তা বলতে পারিনে আমি। কোন দিকে আর না চেয়ে নোটগুলো নিয়ে আমি একেবারে বাবার কাছে এসে পড়লুম।

বাবা সব কথা শুনে একটুখানি স্তব্ধ হয়ে রইলেন, তারপর বললেন—ফিরিয়ে দিয়ে আয়—আমি যা দিয়েছি, তা আর এ জীবনে ফিরে নেব না।

আমি তাঁর সে কথা কাণে তুললুম না। তিনি বার বার আমায় বলতে লাগলেন—তাদের দয়ার দান আমি চাইনে নন্দ—চাইনে, তারা যে মনে করবে, তাদের দয়ায় জীবন আমি ফিরে পাব, সে ঘৃণিত জীবন ফিরে পেতে চাইনে আমি। ফেলে দিয়ে আয় তাদের জিনিষ—ফেলে দিয়ে আয়।

আমি বল্লুম,—আমারও তো অর্দ্ধেক স্বত্ব আছে বাবা। আমায় যা দেবেন—তারই থেকে নিচ্ছেন বলে বিবেচনা করুন।

বাবা চুপ করে রইলেন।

বাবার ঘরেই আমি নিজের শোবার বন্দোবস্ত ঠিক করে নিলুম; বাবা তাতে ঘোরতর আপত্তি করলেন,—তাঁর মত রোগীর ঘরে সুস্থ দেহীর থাকায় যে বিষম বাধা, সেইটাই বারংবার উল্লেখ করতে লাগলেন। এক রকম প্রায় জোর করেই আমায় ঘর হতে বার করে দিলেন। অগত্যা আমি নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লুম।

এতক্ষণ ভুলে গিছলুম শান্তির কথা—এখন আবার তার কথা জেগে উঠল আমার মনের মধ্যে; সে চিন্তাটাকে ডুবিয়ে ফেলবার জন্য এত চেষ্টা করলুম, কিন্তু সে সবই বৃথা হল আমার। কেবলই

আমার মনের মধ্যে জাগতে লাগল—সেই শান্তি—সে আজ এমন দাসী সাজে সাজল কি করে?

মৃতের সেই যন্ত্রণামাখা মুখখানা জেগে উঠল আমার মনের মধ্যে—আপনহারা—প্রায় আমি বলে উঠলুম—ক্ষমা কর, ওগো বিদেহী আত্মা—ক্ষমা কর আমায়।

ঘুমের আবেশ ধীরে ধীরে এসে আচ্ছন্ন করে ফেললে আমায়, তারই আবেশে অলস দেহে অলস মনে ঢলে পড়লুম।

হঠাৎ—কত রাত তখন জানিনে—ঘুম ভেঙ্গে গেল। মনে হল কে যেন ডাকছে আমায়—তার আকুল স্বর আমায় টেনে এনে ফেললে নিদ্রার কোমল কোল হতে কঠোরতার মাঝে; এই নিশীথ রাতে কে এমন গভীর রজনীর গভীরতা ভেদ করতে সাহস করলে কঠোর আঘাত দিয়ে?

এ কি শান্তির আহ্বান? সে কি তার আবেগ-মাখা কণ্ঠে তার ঘরের মাঝে, এই নিস্তব্ধ রাতে লুটিয়ে পড়ে ডাকছে আমায়; তার সেই আকুলতা কি সজাগ করে তুললে?

কিন্তু না। ওই যে কে আমায় ডাকছে,—নন্দা—নন্দা। এতো শান্তির গলা নয়—এ যে পুরুষের গলার স্বর। এ স্বরে ভয়—লজ্জা—ঔৎসুক্য—শোক—সবগুলিই মিশে আছে। আমারই জানলার পাশে—নীচের ফুলবাগান হতে সে আওয়াজটা ভেসে আসছে। কে এ, এমন গভীর রাতে ডাকছে আমায় এমন করে?

আমি এক লাফ দিয়ে বিছানা হতে নেমে পড়লুম; সেই স্বর আবার জানালায় আঘাত করে ডাকলে,—নন্দা—ঘুমিয়ে আছিস কি? একবার ওঠ ভাই—আমাদের সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।

এ যে নরুর গলা। আমার বুকটা হঠাৎ যেন দমে গেল; শান্তি কি আত্মহত্যা করেছে তবে? তাড়াতাড়ি জানালাটা খুলে ফেল্লুম;—ঘরে আলো জেলে, দেয়ালের ঘড়িটার পানে চেয়ে দেখলুম, সাড়ে তিনটে বেজে গেছে।

ঘরের আলো মুক্ত জানালাপথে বাগানে ছড়িয়ে পড়ল। আমি জানালার কাছে এসে বল্লুম,—নরু নাকি?

নরু সরে এসে বললে,—হ্যাঁ, আমিই বটে।

আমি বল্লুম,—কি হয়েছে?

আমাদের সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ হয়েছে নন্দা,—বলেই সে কপালে একটা চড় বসালে নিজের।

আমি রুদ্ধশ্বাসে বল্লুম,—সে কি?

নরু বললে, শীগ্‌গির আয় তুই, সব বলছি আমি।

আমি জানালা বন্ধ করে, দরজা দিয়ে বেরিয়ে শিকল দিলুম। চাকরটার ঘুম ভেঙ্গে গেল,—সে দুই হাতে চোখ মুছতে মুছতে উঠে বসে বিস্মিতভাবে বললে,—আপনি?

আমি বল্লুম,—আমি বাইরে যাচ্ছি,—আমার ঘরটা দেখিস, এখনি ফিরে আসছি।

গেটের দরজাটা খুলে বার হতেই দেখলুম, নরু সেখানে এসে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে একটা লণ্ঠন ছিল,—সেইটা সে উঁচু করাতে দেখলুম, তার মুখখানা বিবর্ণ আর বড় মলিন হয়ে গেছে।

আমার হাতখানা ধরেই বিনা বাক্যব্যয়ে পথে নেমে পড়ল সে—এক রকম প্রায় জোর করেই টেনে নিয়ে চলল আমায়; শান্তির অকাল-মৃত্যু কল্পনায় এনে আমি একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছিলুম, কোন কথা আর বলতে পাচ্ছিলুম না, সে-ও আর একটী কথা বললে না।

আকাশে তখন শেষ রাত্রের তারাগুলি খুব উজ্জ্বলভাবে জ্বলছিল; বড় তারাটা সামনে ধক্ ধক্ করছিল। অন্ধকার যেন অনেকটা পাতলা বলে ঠেকছিল। পথের পাশে একটা নারিকেল গাছে একটা পেঁচা গম্ভীর সুরে কি বলছিল। শেষ-রাতের বাতাসে গাছের পাতাগুলি ঝির ঝির করে কাঁপছিল।

উন্মাদের মত আমার পানে চেয়ে সে বললে, আমাদের বাড়ীতে কি? সেখানে কিছু নেই—শুধু মা পড়ে আছেন অজ্ঞান হয়ে উঠানে। সে রাক্ষসী পালিয়ে গেছে, মায়ের বুকে ছুরি মেরে সে এই রাতের অন্ধকারে কোথায় নিজেকে লুকিয়ে ফেলেছে। এসো; আমরা তাকে বার করব—দেখব কোথায়—কোন অজানা পথে—কোন অজানা লোকের সঙ্গে যাত্রা করেছে সে—কিসের জন্যে? আজ এই নিশীথের বুক চিরে, তাকে বার করবার প্রয়াস করব আমি। উঃ! এমন রাক্ষসী সে—এমন সর্ব্বনাশী সে; আমি তাকে খুন করব আজ। আমিই তাকে শিক্ষা দিছি, আমিই তাকে ফুটিয়ে তুলেছি অবিরাম স্নেহ ঢেলে, আবার আমিই তাকে ছিঁড়ে ফেলব আজ। কোথায় যাবে সে—

আমার চোখ এড়িয়ে? আয় নন্দ—ছুটে আয়—এই ট্রেণ যাবে কলকতায়—এই ট্রেণে সে যাবে।—আয় নন্দ! তুই ছুরি বসাস তার পিঠে, আমি বসাব বুকে। জগতে সে যেমন ভালোবাসত তোকে—আর যেমন ভয় আর ভক্তি করত আমাকে, তেমনি আমাদেরই হাতে আজ তার শেষ হয়ে যাক জীবনের।

আমার মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ চমকে গেল—আমি আর চলতে পারছিলুম না, কিন্তু নরু আমায় একটু দাঁড়াবার, একটা নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ দিল না; তেমনি করে হাত ধরে সে দ্রুতপদে ষ্টেশনে ছুটল।

আমরা যখন ষ্টেশনে গিয়ে পৌছালুম—তখন সবে মাত্র পূর্ব্ব দিকটা একটু রাঙা আভায় রঞ্জিত হয়ে উঠেছে—তারাগুলি যেন ম্লান হয়ে আসছে। ষ্টেশনে দুইটী ভদ্রলোক বসে গল্প করছেন, দুটো কুলী একখানা ট্রলিকে আগে পিছনে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাচ্ছে। নরু একবার দাঁড়াল;—বুঝি মুখের পৈশাচিক ভাবটাকে বদলে নিল—তারপর বললে—কলকাতার গাড়ী কখন আসবে মশায়, যেখানা কলকাতায় যাবে—?

একটী ভদ্রলোক গোঁফে তা দিয়ে বুকটা ফুলিয়ে মুখটা উঁচু করে বললেন—সে ট্রেণ মশায় আড়াইটাতে ছেড়ে যায়—সে চলে গেছে।

নরু যেন কি রকম হয়ে গেল—তার মুখে আর একটীও কথা বেরুল না! রাত যে ফুরিয়ে এসেছে, তা আর খেয়ালই ছিল না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আমার পানে তাকিয়ে বললে—তবে ফিরে চল নন্দা—আর কেন এখানে থাকা?

আমি এগিয়ে গিয়ে বল্লুম—দয়া করে বলবেন কি মশায় এখান হতে আড়াইটার ট্রেণে—কয়টী লোক কলকাতায় গেছে?

অপর ভদ্রলোকটী আমায় চিনতেন—তিনি মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ী যাওয়া আসা করতেন। তিনি আমায় দেখেই বলে উঠলেন—নন্দ যে; কি দরকার সে খোঁজ নিয়ে তোমার?

আমি তাঁকে দেখেই পিছু হটবার মতলবে ছিলুম; কিন্তু পারলুম না আর, কারণ নেহাৎ সামনা সামনি ধরা পড়ে গেছি।

আমি বল্লুম—আমার দরকার নেই, কিন্তু ওঁর দরকার আছে।

তিনি বললেন,—আড়াইটার ট্রেণে—একটী যুবক—তোমাদেরই মতন হবে,—একটী ঘোমটায় মুখ ঢাকা—মেয়েকে নিয়ে ইণ্টার ক্লাসে কলকাতায় গেছেন। শুনলুম, সেই মেয়েটী তাঁর স্ত্রী। যাই হোক—তোমাদের কি কিছু দরকার ছিল?

নরু তাড়াতাড়ি বলে উঠল,—কিছু না মশাই—কিছু না। আয় নন্দা—চলে আয়——

আমার হাত ধরে আবার সে ফিরল। তখন আকাশ বেশ ফর্সা হয়ে গেছে।

নিঃশব্দে সে নিজের বাড়ী ঢুকে পড়ল; আমার সঙ্গে আর একটীও কথা বললে না। খানিকক্ষণ সেই পথেই দাঁড়িয়ে থেকে, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বাড়ী ফিরে গেলুম।

১৭

সেই সকালের ট্রেণেই আমি বাবাকে নিয়ে কলকাতায় যাবার উদ্যোগ করতে লাগলুম। আর এখানে তিলার্দ্ধ থাকতে ইচ্ছে কচ্ছিল না আমার; বেশ জানছিলুম, শান্তির পলায়নবার্ত্তা এখনি ছড়িয়ে পড়বে চারিদিকে—আর যে সব কথা এখনি উচ্চারিত হবে—যা শুনলে আমার দহ্যমান বুকখানা আরও জ্বলবে।

যাওয়ার জন্যে সব উদ্যোগ হচ্ছে, এমন সময় তাই শুনতে পেয়ে ও-বাড়ীর ঠাকুরমা হাঁফাতে হাঁফাতে এসে পড়লেন বাবার কাছে—হ্যাগা ছেলে! তুমি নাকি এখনি কলকাতায় রওনা হচ্ছ? আজ যে সপ্তমী পুজো—

বাবা একটু হাসি দেখিয়ে বললেন,—আমার কাছে সপ্তমী অষ্টমী কি খুড়ীমা,—সবই সমান।

ঠাকুরমা বললেন,—আজ বেলা আটটা পর্য্যন্ত মঘানক্ষত্র রয়েছে যে। কথায় বলে,—"অশ্লেষা অমাবস্তে আর মঘা;—এ তিন নক্ষত্রে কোথাও যেও না বাবা"। হাজার খিরিষ্টেনই হোক—আর বেরাহ্মই হোক, এ তিনটে বেছে চলেই,—এমন সাংঘাতিক তিথি আর নেই। মাসের পয়লা দিনটা যদিও বলে আমাদের অগস্ত্য যাত্রার দিন—তবু তত ভয়ানক নয় সে দিনটা; কিন্তু এই যে তিন মেশা দিন, উঃ!—বাপরে; এর মত আর নেই-ই।

কথাটা বলেই তিনি একটী বিশাল উদাহরণ দিলেন। সে উদাহরণের যে কর্ত্তাটী তিনি—আমাদের বাঙ্গালী নন, বাঙ্গালী ঘেঁসা মুসলমানও নন—খাটি বিলিতি সাহেব, যার বাসস্থান খাস বিলাতে—যিনি বাঙ্গালার কোন তিথি নক্ষত্র জানতেন না। তিনি নাকি যখন জাহাজভরা

পণ্যদ্রব্য নিয়ে সমুদ্রে ওঠেন, তখন তাঁর কেরাণী বাঙ্গালী বাবুটী তাঁকে 'পই পই' করে হাতে ধরে নিষেধ করলে, "সাহেব! আজ মঘা—খবরদার যেন বেরিও না বাড়ী হতে", কিন্তু হাজার হোক সে সাহেব কিনা, তাই হেসে কথাটা উড়িয়ে দিলে—বল্লে—কাঁহা তোমার সে মুঘা—আমি কি তাকে কুচ ভয় করতা হ্যায়? (এখানটায় অপূর্ব্ব হিন্দিতেই উক্ত হয়েছিল বটে) তার পর সাহেব সুদূর সমুদ্রে গিয়ে মাহাত্ম্য বেশ করে জানতে পারলেন। তাঁর সব ডুবে গেল—তিনি তখন কেরাণী বাবুকে খোসামোদ করে বলতে লাগলেন—"বাবু! বোলাও তোমার মঘা বাবুকে; আমি তাকে দো রূপেয়া বকসিস দেব—বহুৎ খানা দেব—।" তখন কত পুজো-আস্থা করে, তবে মানে মানে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসলেন। সেই থেকে, সেই সাহেবই বলে গেছেন—মঘা বড় কম চিজ নয়—সে তাঁর মত একটী খাস বিলিতি সাহেবকেও বুঝিয়ে ছেড়েছে আচ্ছা করে।

আমি মুখ টিপে হাসছিলুম দেখে, ঠাকুরমা একেবারে চটে উঠলেন। এমন—বড় উদাহরণ—সায়েব যেটা সত্যি বলে মেনে গেছে, আমি কালা চামড়া ভেতো বাঙ্গালীর ছেলে হয়ে সেটাকে উড়িয়ে দিতে যাই—ওইটা বড় অসহ্য বলে বোধ হয়ে গেল তাঁর। তিনি হাত মুখ নেড়ে সবে মাত্র বলতে যাচ্ছিলেন—আরে তোরা জানিস কি—

সেই সময়ে বাবা হঠাৎ থামিয়ে দিলেন,—তাই হবে, খুড়িমা—তাই হবে। আমি আজকের দিনটা না হয় যাব না।

ঠাকুরমা প্রসন্নভাবে বলিলেন,—এই তো সহজ কথা;—এ কথাটা বললেই সহজেই মিটে যায় ল্যেঠা। তা না—উনি আবার কারদানি দেখাতে আসছেন যেন কত বড় লায়েক ছেলে একটা।

আমি বল্লুম—আমি তো কিছুই বলিনি ঠাকুরমা?

ঠাকুরমা। আরে, বলবি আবার কি? বলবার মত মুখ আছে কোথায় বল দেখি? এতো কালা বাঙ্গালীর কথা নয়, এ হচ্ছে খাঁটী আহেলে সাহেবের কথা; এতে কি মুখ নাড়বার যো রেখে গেছে সে কিছু? সায়েব যা বলে, তোরা মাথায় করে নিস সেটা, নিজের দেশের বড় বড় পণ্ডিতেরা যে মত দেয়, সেটা দিতে চাস উড়িয়ে; আমিও ওসব বেশ জানিরে বেশ জানি। তোরা সব হচ্ছিস সায়েবের ল্যেজধরা, তারা যা করবে—সেইটে খুব ভালো লাগে তোদের চোখে, অমনি সেটা মেনে নিল, নিজের দেশটা উড়ে যায় চলে।

আমি বল্লুম,—সেটা জান বলেই, ভাই সাহেবকে এনে দাঁড় করিয়েছে গল্পের নায়ক করে? জানছ যে আজকালকার ছেলে মেয়েরা নতুন শিক্ষা পেয়ে ও সব পুরানো এটিকেয়েট মোটেই পছন্দ করবে না,—সেইজন্য এক বেচারি সাহেবকে এনেছ; নইলে বাঙ্গালীকেই দাঁড় করিয়ে দিতে। তা বেশ হয়েছে গল্পটী,—শিক্ষিত যারা, তারা মাথা পেতে নিতে বাধ্য হবে; কেননা, এ তো কালা-বাঙ্গালীর কথা নয়, এ হচ্চে আহেলে সাহেবের কথা।

রাগে ঠাকুরমায়ের চোখ দুটো এতখানি হয়ে উঠল—গলার শিরগুলো ফুলে উঠল। বিষম বিভ্রাট দেখে বাবা বললেন—নন্দা! তুই জানিস নে কিছু না, তর্ক করতে যাস কেন? আমি জানি, সত্যিই সে সাহেব বলেছিল এমনি। সে সাহেবও বড় যে সে সাহেব নয় আমাদের বড় লাট বাহাদুর। সমুদ্রে জাহাজে করে এদেশ হতে চাল, ডাল—আরও অন্য অনেক জিনিষ নিয়ে বাণিজ্য করতে যাচ্ছিলেন—সেই সময়েই এই ব্যাপারটা ঘটেছিল! সে সব আমি বেশ জানি, তখন আমি কলকাতায় জেনারেল অ্যাসেম্বলীতে পড়ছিলুম যে।

ঠাকুরমার মুখখানা দীপ্ত হয়ে উঠল; তিনি আমার দিকে মুখটা ফিরিয়ে,—ঘাড়টা বাঁদিকে কাত করে, কুঞ্চিত ভ্রূ দুটী কপালের দিকে টেনে বললেন,—ওই দেখ; দেখলি তো? তোর বাবা সব জানে। তোরা জানিস কি? সে-দিনকার ছেলে তোরা, গলা টিপলে আজও মুখ দিয়ে দুধের গন্ধ বের হয়। দু-দিন সহরে গিয়ে থেকে, যে মস্ত লায়েক ছেলে হয়েছিস, সে মনে করিস নে। তা হ্যাঁ বাবা! বল না—সেই বড় লাট সায়েবের নামটা কি? লোককে বলতে হবে তো, নইলে তারা এই নন্দার মতই করবে ঠিক।

বাবা বেশ প্রশান্তমুখেই বললেন,—তাঁর নাম মিণ্টো সাহেব।

ঠাকুরমা নামটা বেশ মুখস্থ করে ফেলে বললেন,—যাই এখন তবে। তা—এই পুজোর কয়টাদিন থেকে যাওনা কেন?

বাবা বল্লেন,—না! আমায় ডাক্তার দেখাতে হবে সেখানে।

ঠাকুরমা বললেন,—তবে যাও কাল সকালে।

ভগবানের কাছে দিন রাত পেয়ারথনা করি, ঘরের ছেলে ভালো হয়ে ফিরে এসো আবার ঘরে। হ্যাঁ! সেই সায়েবটার নাম মিমেণ্ট, বললে না?

বাবা বললেন,—হ্যাঁ—মিমেণ্ট সায়েব—মস্ত বড় লাট।

ঠাকুরমা চলে গেলেন। বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,—কেন চটিয়ে দিস বল দেখি মানুষকে? সংসারে থাকতে হয় সকলের সঙ্গে সমান মিশে। যেখানে যেমন সাজে, সেখানে তেমনি করতে হয়। যেখানে লোকে আপনাকে খুব বড় বলে জানাতে ইচ্ছে করে, তাকে সেখানে তেমনি বড় করেই রাখতে হয়। যে যেমন কথা বলে—ঠিক তেমনি ভাবের কথাই বলবি তার সঙ্গে। এটা বুঝে রাখিস আর শিখে রাখিস—নিজের মত সকল জায়গায় প্রকাশ করে ফেলতে নেই; ওতে লোকে চটে ওঠে—শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। যে যা বলে শুনে যেতে হয় শুধু কাণ দিয়ে।

আমি আস্তে আস্তে উঠে বাইরের বারাণ্ডায় গিয়ে বসলুম। তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। দলে দলে লোকজন যাওয়া আসা করছে পথ দিয়ে; মেয়েরা কলসী নিয়ে দীঘিতে জল আনতে ও স্নান করতে যাচ্ছে।

আমি চুপ করে বসে রইলুম কাণ পেতে—শান্তির কথা কিছু শোনা যায় কি না।

কারও মুখে সে কথাটা না শুনতে পেয়ে, একটা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। মনে হল—তারা খৃষ্টান নামে অভিহিত হয়ে যে এদের কাছ হতে দূরে রয়েছে, সে খুবই ভালো হয়েছে; সেই জন্যই—কেউ তাদের কথা শুনলেও কাণ দেবে না।

কিন্তু খানিকক্ষণ পরেই আমার সে ভুলটা ভেঙ্গে গেল। সেই কথাটা এমন করে কানা ছাপিয়ে উঠল যে, তা এসে আমার পায়ের কাছে উছলে পড়তে লাগল। তখন দেখলুম, যে গম্ভীর-ভাবে যাবার সময় গিছল—ফিরবার সময় তার কথা আর ধরছে না মুখে; যে বিমর্ষভাবে গিছল, তার মুখখানা পৈশাচিক হাসির ছটায় ভরে উঠেছে। পুরুষেরা কায়দার হাসি হেসে, গম্ভীর গলায় বলতে বলতে যাচ্ছেন—এ তো হবেই; মেয়েদের ইংরাজি শেখানোর ফলই হচ্ছে এইপ আমাদের বাড়ীর মেয়েদের ভাগ্যে ইংরেজি শেখান হয় নি। যে বিকেলে স্বামী মরল, সেই রাতেই পালাল। যা হোক, শিক্ষিতা মেয়ের নাম রেখেছে বটে।

মেয়েরা হাত দুলাতে দুলাতে যাচ্ছিলেন—কেউ কেউ একেবারে আড়ষ্ট ভাবাপন্ন হয়ে গিছলেন। সকলেরই মুখে আজ এই কথা। মেয়েরা অনেকে আমার পানে তাকিয়ে—ঠেসমারা গোছের কথা বলতেও ছাড়লেন না।

নিরুপায় আমি—তাঁদের সঙ্গে ঝগড়া করা তো চলে না; আর ঝগড়া করতে গেলেও যে হার আমার অনিবার্য্য, তা নিশ্চিত। এঁদের আর কোনও গুণ থাক বা না থাক—ঝগড়া-বিদ্যায় যে বিশেষ পারদর্শিনী—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এটা জাতীয় স্বভাব। দেখা যায়—ছেলে মেয়ে একই সঙ্গে একই শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে, কিন্তু মেয়েটা কথায় যেমন পেকে উঠে, ছেলেটা কিছুতেই তত পাকতে পারে না। ছোট ছোট মেয়ে গুলি—যারা উলঙ্গ হয়ে বেড়াতেও দ্বিধাবোধ করে না, তারাও ঝগড়াটী করবে এমন হাত মুখ নেড়ে যে, দেখলে পরে আশ্চর্য্য হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়।

আমি ঘরে গিয়ে বসে রইলুম। যদিও আমি কিছুই জানি নে, তবুও আমাকে সকলে টেনে নিলে এর সঙ্গে। আমার নামের সঙ্গে শান্তির নামটা জড়িত হয়ে অনেকদিন আগে সুপ্ত গ্রামে যে একটা জাগরণের ভাব এনেছিল—মাঝে সেটা একেবারেই মিলিয়ে গিছল; আজ দেখলুম,—সে কথাটা আজ আবার মাথা তুলে বিরাট মূর্ত্তিতে দাঁড়িয়েছে।

দুপুর বেলায়—যখন পথ অনেকটা নির্জ্জন হয়ে এল, তখন আমি স্নান করতে গেলুম।

যখন স্নান করে ফিরে আসছি, তখন দেখলুম, নরু চুপ করে তাদের বাইরের বারাণ্ডায় বসে আছে। আমি তার সামনে পড়ব না ইচ্ছা করলেও—আমায় যেতে হবে তার সামনের পথ দিয়ে; কারণ আর পথ নেই।

নরু আমায় দেখেই গম্ভীরস্বরে ডাকলে,—নন্দা,—শুনে যা।

আমার এমন শক্তি ছিল না, যার বলে তার কথাটা অগ্রাহ্য করতে পারি। আমি মন্ত্রবলে আস্তে আস্তে তার নিকটস্থ হলুম।

সে বললে,—তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে আমার, কিন্তু তোর যে ভিজে কাপড়—বেশীক্ষণ থাকলে অসুখ করতে পারে, তাই আবার ভয় লাগছে আমার।

আমি বললুম,—আমার অত শীগ্‌গির অসুখ করে না। মনে নেই তোমার—এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা জলে

পড়ে থেকেছি, তবু একটুও মাথা ধরে নি একদিনও। বল—তোমার কি কথা আছে?

সে টুলখানা সরিয়ে দিয়ে বললে,—তবে বোস।

আমি বসলুম। সে বললে,—শুনেছিস,—লোকে কত কথা বলছে?

আমি মাথাটা একদিকে ঝুঁকিয়ে জানালুম, শুনেছি।

নরু বললে,—আবার তোদের মণি মাষ্টার আর নীলমণি এই পথ দিয়ে কি বলতে বলতে গেল জানিস? তারা বলে গেল, আমি ব্রাহ্মও নই, খৃষ্টানও নই, পুরো হিন্দু। বোনকে দিইছি বেশ্যাবৃত্তি করতে; পাছে তা কেউ জানতে পারে বলে, আমি হিন্দু নই বলে ভাণ করেছি; হিন্দু হলে লোকে আমাদের বাড়ী আসবে কি না, তাই; তুই নাকি শান্তির উপপতি ছিলি। বল দেখি নন্দা,—এ সব কি কথা? সে হতভাগিনী তো মরেছেই, কিন্তু মরবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও মেরে রেখে গেল যে।

সে মুখখানা অন্যদিকে ফিরালে। আমি দেখে একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম, তার চোখ জলে ভরে উঠেছে। আশ্চর্য্য ব্যাপারই বটে; কেন না,—শত সহস্র প্রহারে, উৎপীড়নে যে নরুর মুখ একটু মলিন হয় নি, আজ সেই নরুর চোখ কিনা জলে ভরে গেছে!

শান্তির উপর রাগে অভিমানে আমার হৃদয় ভরে উঠল। নরু আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে কঠোর সুরে বলে উঠল,—এতে আমার কি করা উচিত, তা জানিস নন্দা? যে সঙ্কল্প আমার মন হতে সরে গিছল,—তাকে আরও জাগিয়ে তুলব আমি। আমি যথার্থ ব্রাহ্ম হব, না হয় খৃষ্টান হব। যে ধর্ম্ম এমন কুৎসিৎ, এমন ঘৃণিত, কখনও আমি নেব না তাকে; আজ হতে আমি এর প্রধান শত্রু। তুই আসবি নন্দা?—আয় আমার পেছনে, আমি তোকে বুক দিয়ে রক্ষা করব। এবার আবার তোর কাছে প্রার্থী হয়েছি—কিন্তু মাঝে যে ছিল তাকে বিসর্জ্জন দিয়ে; এখন আছিস তুই আর আমি, মাঝে পাবকরূপিণী শান্তি আর নেই যে আমাদের বন্ধুত্বকে জালিয়ে তুলবে।

আমি নিস্তব্ধে বসে রইলুম,—তারপর মাথা উঁচু করে বল্লুম,—শান্তি নেই—আমার বাবা আছেন মাঝে। তিনি থাকতে আমি কোনদিকে যেতে পারব না, সেজন্যে আমায় মাপ কর।

নরু আমার পানে চাইলে; তারপর নরম সুরে বললে,—ঠিক! ভুলে গিয়েছিলুম আমি, তোর কর্ত্তব্য আছে। তোকে আমি মুক্তি দিলুম নন্দা! আজ মুখের মুক্তি নয়, প্রাণের সঙ্গে মুক্তি দিলুম তোকে। আমি তো চলে যাব, জন্মের মতই যাব, কিন্তু একটা ভার দেব তোকে। আমার মাকে দেখতে হবে। বল, এ ভার নিবি?

আমি রুদ্ধস্বরে বল্লুম,—তুমি কোথায় যাবে?

নরু বিকৃতমুখে বললে,—যেখানেই যাই না—শুনতে পাবি এর পরে। যদিও আমি ফিরে আসি—মা আর নেবেন না আমায়। আমি তাঁর কাছে এমন ঘৃণিতভাবে চিত্রিত হয়েছি যে, তাঁর কাছে যাবার ক্ষমতা আর নেই আমার। সব বুঝেছি, কিন্তু ফিরতে পাচ্ছি নে। যদিও জানছি মাকে সুখী করবার ক্ষমতা যথেষ্ট রয়েছে আমার, তবু আমি সেদিকে মন দিচ্ছি নে, ডুবেছি যদি—আরও ডুবব, তলিয়ে যাব; বাঁচি যদি বাঁচব—না হয় মরব; আমি আর ভয় করিনে কিছু। সমুদ্রের অতল জলের পরে বিছানা পেতেছে যে, সামান্য শিশিরে তার কি করতে পারবে আর? যাক সে সব কথা—বল, তুই যখন আসবি—দেখবি আমার মাকে? লোকনিন্দার ভয়ে পিছিয়ে যাবি নে? প্রতিজ্ঞা কর——

আমি ভিজে পৈতাগাছটায় হাত দিতেই, সে উন্মত্তের মত আমার হাত হতে পৈতা সরিয়ে ফেললে,—না। ও-সুতো ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করতে পারবি না। ও-সুতোর মান কি আছে আর? প্রাণের সঙ্গে আকাশের পানে চেয়ে বল, সেই হচ্ছে প্রকৃত প্রতিজ্ঞা। সুতো চিরকালই সুতো থাকবে—ওতে বিশেষত্ব কিছু নেই।

এই দেখ—এতদিন তবু ফেলে রেখেছিলুম কাঁধে সুতোগাছটা, কিন্তু আজ দূর করে ছিঁড়ে ফেলেছি।

চেয়ে দেখলুম, তার পৈতে নেই—সত্যিই সে ছিঁড়ে ফেলে দেছে। আমি উর্দ্ধপানে তাকিয়ে প্রতিজ্ঞা কল্লুম যখন, তখন সে একটু ঠাণ্ডা হল। তার মাথাটা যে অতিরিক্ত গরম হয়ে গেছে এ সব ভয়ানক আঘাতে, সে বিষয়ে তিলার্দ্ধ আমার সন্দেহ রইল না।

শান্তভাবে সে বললে,—যা তুই এখন—আর কোনও কথা বলবার নেই আমার। আমার যা বলবার ছিল, তা বলা হয়ে গেছে। আমি এখন নিশ্চিন্ত হয়ে গেলুম।

আমি উঠে দাঁড়ালুম—একবার বল্লুম,—শান্তি—

ভয়ানক চটে উঠে সে বলে উঠল,—বার বার তার নাম কচ্ছিস কেন বল দেখি তুই?

আমি বল্লুম,—না! তার খোঁজ নেবার কথাটা—

বাধা দিয়ে সে বললে,—সে তো মরেই গেছে, আর তার খোঁজ নেব কি? সে যদি বেঁচে থাকত, খোঁজ নিতুম তার। আমি নিজেই যে তাকে শ্মশানে শুইয়ে মুখে আগুন দিয়ে এসেছি।

আমি আর কথা না বলে, আস্তে আস্তে পিটটান দিলুম।

১৮

অষ্টমীর দিন সকালে যাওয়ার আয়োজন ঠিক করলুম।

আমি যখন তাড়াতাড়ি করে ভাত খেয়ে নিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে কাপড় জামা পরছি, তখন হঠাৎ নীলমণির কথা কাণে গেল; সে পাশের পড়বার ঘরে হাসছিল—আর কাকে উদ্দেশ করে বলছিল—এবার আপদ যাচ্ছেন বাবাকে নিয়ে; দেখি না, কেমন করে সারাতে পারে? বাবা যদি সারতে পারে কখনও, তবে আমি কাণ কেটে কুত্তার পায়ে দেব; আমার নামটাই উল্টে ফেলব। আমি বলছি, বাবার এই যাওয়াই শেষ যাওয়া।

আমার উৎসাহপূর্ণ মনটা ভারী দমে গেল; তাই ঝড়ের মত তার ঘরের সামনে গিয়েই কঠোরস্বরে ডাকলুম,—নীলু!

সে হঠাৎ চমকে উঠল। মণি মাষ্টার যে টেবিলের উপর দুখানা পা তুলে দিয়ে সিগারেট টানতে টানতে কৌতুকপূর্ণ হাসি হাসছিল, অমনি তার হাসিটা বন্ধ হয়ে গেল; সিগারেটটা চেয়ারের পেছনে ফেলে, চকিতে পা নামিয়ে নিয়ে এসেনসিয়ালটা টেনে নিয়ে ছাত্রকে ল্যাম্প অইল ও অইল ল্যামর ডিষ্টিংশানটা বুঝিয়ে দিতে লাগলেন।

আমি তেমনি রাগতভাবেই বল্লুম,—নীলু! বাবা মরলে পরে তুমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে কেন? মনে ভাবছ আমি কিছু জানতে পারি নি? তুমি বাবার চোখে ধূলো দিতে পারবে, কিন্তু আমার চোখে ধূলো দেওয়া বড় শক্ত; তুমি যে দিন দিন কেমন ছেলে তৈয়ার হচ্ছ—তা আমি জেনেছি। আমি নরুর সঙ্গে মিশে সিগারেট খেয়েছিলুম বলে, তুমি যাচ্ছে তাই কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছিলে, আর তুমি এই গণ্ডমূর্খ মাষ্টারের সঙ্গে মিশে, যা না তাই খাচ্ছ, যেখানে সেখানে যাওয়া আসা করছ। বাবা মরলে তোমার লাভটা হবে ভালো; বিষয় হাতে পেলে—ইয়ারকি চলবে মন্দ নয়।

নীলমণির বড় বড় চোখ দুটো লাল হয়ে উঠল—তার ঠোঁট দুখানা প্রবলবেগে কাঁপতে লাগল। উপস্থিত সংগ্রামে পরাজয় দেখেও আমি অন্যদিনের মত কাপুরুষতা দেখিয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন কল্লুম না। বীরের মত বুক ফুলিয়ে গাল খাবার জন্যে দাঁড়িয়ে রইলুম তার মুখের পানে চেয়ে।

মণি মাষ্টার এসেনসিয়ালটা দূরে টান মেরে ফেলে, বজ্রস্বরে বলে উঠল,—কি, আমি? আমি নীলুকে অধঃপাতে দিচ্ছি, এ কথা বলতে তুমি সাহস কর নন্দ?

আমি দৃঢ়স্বরে বললুম,—হ্যাঁ, সাহস করি। তুমি স্খলিত চরিত্র, বদমাইস মাতাল; তুমি নীলুকে সেই পথে নিয়ে যাচ্ছ। আমি জানতে পেরেছি অনেক দিন, কিন্তু বলবার দরকার নাই বলেই বলি নি কিছু। সাবধান—বলে দিচ্ছি, বাবার বিরুদ্ধে যদি একটা কথাও শুনতে পাই, তা হলে আমি—

বাধা দিয়ে রক্তমুখে গর্জ্জে নীলমণি বলে উঠল, কি করবে তুমি—জুতো মারবে নাকি?

আমি বল্লুম—মারব।

নীলমণি লাফ দিয়ে চেয়ার হতে উঠল,—কি শুয়ার! জুতো মারবি তুই, আমাকে? আয় না রাস্কেল—দেখাই কেমন মজা।

আমি বল্লুম,—তুই আয় না—তোকেও দেখাই কেমন মজা।

মণি মাষ্টার নীলমণিকে ধরে বসিয়ে বললে,—বস—বস। যাও নন্দ—মিছে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া কোর না;—ওতে কেবল শত্রুর মুখ হাসবে।

নীলমণি রাগে ফুলতে ফুলতে বললে,—খুব করব আমি মদ খাব—সিগারেট খাব; যা খুসী তাই করব—তুই বলবার কে? পয়সা তোর না তা জানিস? নিজে স্খলিত চরিত্র—বেইমান, বন্ধুর বাড়ী গিয়ে বন্ধুর সর্ব্বনাশ করেছিস। নিজে সরিয়ে দিয়েছিস শান্তিকে, ভালোমানুষ সেজে রয়েছিস এখানে। আমরা জানিনে কিছু—না মাষ্টার?

মাষ্টার চুপ করে রইল। আমি উত্তর দিতে যাচ্ছিলুম, সেই সময় বাবার ডাক শুনতে পেলুম ;— আমি তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে গেলুম। বাবা ক্ষীণস্বরে বললেন,—কার সঙ্গে ঝগড়া কচ্ছিলি নন্দা ?

আমি রাগের মাথায় সব কথা বলে ফেল্লুম। বাবা দুই হাতের উপর ভর দিয়ে, অতি কষ্টে উঠে বসলেন ; একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন,— চল নন্দা,—নিয়ে চল আমায় ; আর একটুও এখানে থাকতে চাই নে আমি। উঃ। এখানে থাকতে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

গাড়ী আসবামাত্র আমি চাকর ও ঠাকুরের সাহায্যে যখন বাবাকে ধরে উঠাচ্ছি, সেই সময় মা এসে দাঁড়ালেন।

বাবা তাঁর দিকে ফিরেও চাইলেন না,—আমি একটু থেমে বল্লুম,—বাবা! মা এসেছেন। আমি ভাবলুম, বুঝি বাবা দেখতে পান নি যে, মা এসেছেন।

বাবা মুখখানা বিকৃত করে বললেন,—আমায় শীগগির নিয়ে চল নন্দা! আমার বুকের মধ্যে বড় কেমন কচ্ছে।

তাঁর মন বুঝিতে পেরে, আমি তাঁকে গাড়ীতে বসিয়ে দিলুম। গাড়ী চলল, এমন নিদারুণ বিদ্বেষে বাবার বুকটা ভরে উঠেছিল, যে তিনি আর একটী বারও বাড়ীর পানে ফিরে চাইলেন না। আমি গাড়ীর পেছনে পেছনে চল্লুম।

আটটার ট্রেণ আসবার আগেই আমি বাবাকে বল্লুম,—বাবা রমুবাবু আসছেন।

রমুবাবু বাবার পাশে এসে দাঁড়ালেন, কিন্তু বাবা কথাও বললেন না। ট্রেণ আসলে আমরা ধরাধরি করে তাঁকে উঠালুম।

আগের দিন আমি টেলিগ্রাফ করেছিলুম, প্রমোদকে ষ্টেশনে থাকবার জন্যে। দেখলুম, সে একখানা পাল্কী নিয়ে রেখেছে।

তাদের বাড়ীতে রোগী রাখবার অসুবিধা হবে বলে, আমি আগে পত্র লিখে জানিয়েছিলুম তাকে একখানা বাড়ী ভাড়া করার কথা। এখন শুনলুম, সে তাদের সামনের বাড়ীটা ঠিক করে রেখেছে। বামন, চাকর যা যা বন্দোবস্ত করবার কথা আমি বলেছিলুম, সে সবই ঠিক হয়ে গেছে।

বাবাকে পাল্কীতে উঠিয়ে বরাবর উঠলুম গিয়ে সেই বাড়ীখানাতে।

প্রমোদ খুব তৎপরতার সঙ্গে বাবার বিছানাদি নিজের বাড়ী হতে এনে করে দিলে। রেখা সেই সঙ্গে এ বাড়ীতে চলে এল।

সে এসে যখন আমাকে প্রণাম করে দাঁড়াল, তখন আমি দেখলুম, তার মুখখানা ভারী বিমর্ষ হয়ে গেছে। তার বড় বড় কালো চোখ দুটী যেন জলে সর্ব্বদা ভাসছে। আমার মনে হঠাৎ একটা আঘাত লাগল ; মনে হল, রেখা বুঝি প্রমোদের কাছ হতে সেই নিদারুণ কথাটা শুনতে পেয়ে এই রকম হয়ে গেছে।

আমি সস্নেহে বল্লুম,—ভালো আছ রেখা ? তোমার বাবা, মা—সবাই ভালো আছেন তো ?

রেখা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে হঠাৎ কেঁদে ফেললে ; তার এ ভাব দেখে ভারী বিস্মিত হয়ে গেলুম আমি ; বল্লুম,—কাঁদছ কেন রেখা ? কি হয়েছে ?

রেখা ছোট শিশুর মত শুধু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। আমি এগিয়ে গিয়ে তার পাশে দাঁড়ালুম, কোমলস্বরে বল্লুম,—বাড়ীর সব ভালো আছেন তো ?

রেখা চোখ মুছতে মুছতে বললে,—বাবা তো নেই—।

তার বাবা নেই ? আমি যেন বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে রইলুম। এই তো সেদিন আমি দেখে গেছি তাঁকে, বেশ সবল সুস্থ দেহ ছিল তাঁর, কোনও অসুখের লক্ষণ তো ছিল না ; এই কয়দিনের মধ্যে কি হল তাঁর ?

খানিক চুপ করে থেকে, আমি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লুম,—কি হয়েছিল তাঁর ? কবে তিনি মারা গেছেন ?

বুকফাটা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রেখা বললে, —আজ পাঁচদিন হল কলেরা হয়ে মারা গেছেন তিনি।

প্রমোদের মুখে এর তো একটুও আভাস পাই নি। তার দিব্য হাসিভরা মুখ—বরং উৎসাহ যেন আরও একটু বেড়েছে তার। কে বলবে তাকে— তার পিতৃবিয়োগ হয়েছে ?

উঃ! বাপ মারা গেলে, ছেলে কেমন করে এমন স্ফুর্ত্তিতে বেড়ায় ? আমার যে বাপের ব্যারাম, আমার বুকে চাপা রয়েছে বিষম ভার, আমি কোনদিকেই আর মন দেবার অবকাশ পাচ্ছি নে। বাবা যদি মারা যান,—আমি কোথায় দাঁড়াব, কি ভাবে দিন আমার যাবে—আমার মনে জাগছে কেবল এই চিন্তা। উঃ! কি কঠিন হৃদয়ই প্রমোদের।

রেখার কথা ভেবে আমার বড় দুঃখ হতে লাগল। এবার যে প্রমোদ তার প্রতিজ্ঞা পালনে খুব তৎপর হবে, তা আমি বেশ জানলুম।

রেখাকে প্রবোধ দিয়ে বল্লুম,—বাপ মা তো সবার চিরদিন থাকেন না রেখা,—তাতে বেশী কাঁদতে নেই! তোমার বাপ বেশ ভালো গেছেন, তিনি যে রকম ধার্ম্মিক ছিলেন, নিশ্চয়ই স্বর্গে গেছেন।

রেখা ছোট শিশুর মত আমার হাত ধরে বললে,—হ্যাঁ ছোড়দা, সত্যি বাবা গেছেন স্বর্গে? একটু স্বর্গের কথা বলনা আমায়? আমায় কেউ সে কথা বলে না। বউদি এসেছেন,—তিনি স্বর্গ নরক শুনলে নাক সিঁটকান, আমি ভয়ে তাঁর কাছেও যাই নে। দাদার তো দেখা পাবার যো নেই। মা বেহুঁস ভাবে পড়ে আছেন, ডাকলেও একটা কথা বলেন না। তাই থাকতে না পেরে ছুটে এলুম তোমার কাছে। বল ছোড়দা, একটু স্বর্গের কথা বল আমায়; আমার প্রাণ বড় হু হু করছে বাবার জন্যে—

বলতে বলতে আবার তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। আমি ব্যথিতভাবে বল্লুম,—আমার বাবার কাছে চল, তিনি বেশ করে বলবেন তোমায়। আমি তো সব কথা জানি নে দিদি, সেজন্যে মাপ করতে হবে আমাকে তোমায়।

তাকে নিয়ে গেলুম বাবার কাছে। প্রমোদ তখন চলে গেছে, বাবা একলা শুয়ে আছেন। রেখা তাঁর পায়ে মাথা ঠেকাতেই তিনি শশব্যস্তে বলে উঠলেন,—এ মেয়েটী কে নন্দা?

আমি বল্লুম,—রেখা।

রেখা? বিস্ময়ে তিনি বললেন,—এমন চেহারা দেখাচ্ছে কেন মা তোমার?

আমি বল্লুম—চন্দ্রনাথ বাবু মারা গেছেন আজ পাঁচদিন হল, কেঁদে কেঁদে এমন চেহারা হয়ে গেছে।

বাবা আত্মহারা-প্রায় তাকিয়ে রইলেন। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লেন,—চন্দ্র চলে গেছে? তবে আমাকেও যেতে হবে। আমারও থাকলে চলবে না।

আমি রেখাকে তাঁর কাছে বসিয়ে রেখে চলে গেলুম ডাক্তার আনবার জন্যে।

কিন্তু বাবার চিকিৎসা আরম্ভ হল যখন, তখন শেষ সময় হয়ে এসেছে তাঁর। ডাক্তারেরা প্রায় এক রকম জবাবই দিয়ে দিলেন। আমার বুক কাঁপতে লাগল।

বাবা আমায় কাছে বসিয়ে বললেন,—নন্দা! আমি তো আর বাঁচব না—শীগ্‌গিরই যেতে হবে আমায়। এই বেলা উইলটা করে ফেলা যাক—নচেৎ যদি তারা কিছু না দেয় তোকে—

আমি বল্লুম,—এখনই উইল করবার দরকার কি বাবা?

বাবা একটু হেসে বললেন,—ওরে পাগল! বুঝিস নে কিছু। আমার শরীর বড়, খারাপ বলে ঠেকছে। আজ তিন চার দিন ধরে যে ডাক্তার দেখাচ্ছিস—এতে আমার অসুখ যেন আরও বেড়ে উঠেছে। আমি বাঁচব না যে এটা ঠিক কথা; যত শীগ্‌গির পারিস, এখন বিষয়ের নিষ্পত্তিটা করে ফেলে দে! কে জানে কখন ডাক আসবে, তখন সব চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়ে চলে যেতে হবে আমায়। সময় থাকতে কাজ কর, হারালে আর পাবিনে।

আমি প্রমোদকে ডাকবার জন্যে তাদের বাড়ীতে গেলুম। এ বাড়ীতে আগে যদিও আমার সকল সময় অবারিত দ্বার ছিল, কিন্তু প্রমোদের স্ত্রী এসেছি অবধি আমি মোটেই যাই নি। সেই জন্যে বাইরে দাঁড়িয়ে প্রমোদকে ডাকতে লাগলুম।

হঠাৎ বাড়ীর মধ্যে রেখার বুকফাটা কান্নার শব্দ শুনতে পেলুম। সে যেন আছড়িয়ে পড়ে কাঁদছে আর বলছে,—মাগো! আমায় একা ফেলে রেখে, তুমি কোথায় যাও মা?

আমি আর বাইরে থাকতে পাল্লুম না,—তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লুম,। দেখলুম,—উঠানে পড়ে আছেন রেখার মা, রেখা তার মায়ের মুখে গঙ্গাজল দিচ্ছে—আর মাঝে মাঝে আছড়ে পড়ে কেঁদে উঠছে। প্রমোদ একপাশে চুপ করে বসে পড়ে দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা রেখে কাঁদছে; তার স্ত্রী চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

আমায় দেখেই রেখা আমার পায়ের কাছে আছাড় খেয়ে পড়ল; কাঁদতে কাঁদতে বললে,—ছোড়দা!—আমার মাকে বাঁচাও—আমায় বাঁচাও। আমি তাকে টেনে উঠালুম। তার কান্না দেখে আমারও কান্না আসছিল, আমি আর কোনও মতে চোখের জল সামলাতে পাল্লুম না।

এর মধ্যে প্রমোদের স্ত্রী খুব শক্ত ছিল—তাই সকল দিক রক্ষা, সে প্রমোদকে উঠিয়ে দিলে—রেখাকে ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে তাকে প্রবোধ দিতে লাগল। প্রমোদ একটু শান্ত হয়ে, লোকজন ডেকে এনে মৃতদেহ নিয়ে চলল।

আমিও অগত্যা তাদের সঙ্গে গেলুম। আমাদের চাকরকে বলে গেলুম, সে যেন বাবার কাছে বসে থাকে, যে পর্য্যন্ত আমি না ফিরি।

১৯

ফিরে আসতে রাত প্রায় নয়টা বেজে গেল। তখন আমরা সবাই স্নান কল্লুম, কেবল প্রমোদের এত শোকের মধ্যে কুসংস্কার জ্ঞানটা খুব বেশী ছিল বলে, সে আর তার কয়েকটী বন্ধু স্নান করলে না। রেখার ভাবী স্বামীকে দেখতে পেলুম শ্মশানে। ভাবী শ্বাশুড়ী মারা গেছেন শুনে, সে বেচারী ছুটতে ছুটতে গিছল সেখানে।

ছেলেটী মন্দ ছিল না দেখতে; শুনলুম, তার নাম অমিয়কান্ত বোস। সে ফিপ্‌থইয়ারে পড়ছে। যদিও সে কায়স্থ এবং প্রমোদ ছিল ব্রাহ্মণ, তবু সমাজের উন্নতিকল্পে প্রমোদ এরই সঙ্গে বিয়ে দেবে বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল।

বাড়ী এসে কাপড় ছেড়ে তাড়াতাড়ি বাবার কাছে গেলুম। বাবা নিস্তব্ধ হয়ে পড়েছিলেন বিছানার পরে; আমায় দেখে বললেন,—সব শেষ হয়ে গেল?

আমি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বল্লুম,—হ্যাঁ।

বাবা একটুখানি চুপ করে থেকে, আস্তে আস্তে বললেন,—এমনি করেই সব ফুরিয়ে যায়, আর কিছুই থাকে না তাঁর নামটা ছাড়া।

আর কোন কথা সে রাত্রে শুনতে পেলুম না তাঁর মুখে। আমিও আর তাঁকে বিরক্ত কল্লুম না।

শেষ রাত্রের দিকে হঠাৎ একটা গোঙানো শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল আমার, বিস্ময়ে মনটা ভরে উঠল—কে এ শব্দ কচ্ছে?

আমি শুয়ে থাকতুম বাবার পাশে; ঘরে সারারাত আলো জ্বালা থাকত—কিন্তু খুব নরম ভাবে। তাড়াতাড়ি আলোটা বাড়িয়ে দিয়ে বাবার পাশে এসে দেখলুম, যা ভেবেছিলুম তাই-ই। বাবা আমার দুই চোখ কপালে তুলে কি রকম কচ্ছেন।

এতদিন যে বিপদ সামনে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যার পানে তাকিয়ে কেবল যুদ্ধ করেছি অদৃশ্য শক্তির সঙ্গে, আজ আমায় পরাজিত করে সেই মহাশক্তি মৃত্যুরূপে ঘিরে দাঁড়িয়েছে বাবাকে; আজ বাবার উপর আমার স্বত্ব লোপ করবার জন্যে সে প্রস্তুত হয়ে এসেছে, এমন কোনও ক্ষমতা নেই, যা দিয়ে তাকে দূরে তাড়িয়ে দিতে পারি।

হঠাৎ কেমন মুহ্যমান হয়ে পড়লুম আমি। বাবার পানে তাকিয়ে দেখলুম, তিনি কেবলই গোঙাচ্ছেন।

নিজের অবশতটাকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা কল্লুম আমি। না—না—এখন কিছুতেই আমার অভিভূত হয়ে থাকলে চলবে না। আমি বাবাকে একটা ধাক্কা দিয়ে তাঁকে জাগাবার চেষ্টা করে ডাকতে লাগলুম,—বাবা!—বাবা।

কোনও সাড়া নেই তাঁর।

আমি দরজা খুলে লাফ দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম; একবারে এসে দাঁড়ালুম প্রমোদের বাড়ীর নীচে। উপরের ঘরে প্রমোদ থাকত, আমি সেই ফুটপাথে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে তাকে ডাকতে লাগলুম।

খানিকক্ষণ পরেই প্রমোদ বেরিয়ে এল; বিস্মিতভাবে বললে—কি হয়েছে নন্দ?

আমি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলুম—বাবা কি রকম কচ্ছেন, একবার চল তুমি শীগ্‌গির।

প্রমোদ তখনি আমাদের বাড়ী এল। বাবাকে দেখে তার মুখখানা বিমর্ষ হয়ে গেল; আমার পানে তাকিয়ে রুদ্ধস্বরে সে বললে—আর মিছে চেষ্টা নন্দ, তোমার বাবা অনন্তের দিকে পা বাড়িয়েছেন।

আমি দুই হাতে মুখ ঢেকে বাবার পাশে বসে পড়লুম।

প্রমোদ তখনি আমার ঠাকুর ও চাকরকে জাগিয়ে, তার বন্ধুদের ডাকতে পাঠিয়ে দিলে। আমায় একটা ধাক্কা দিয়ে সে বললে,—তোমার এখন কাঁদলে চলবে না—ওঠ বলছি।

আমি চমকে উঠলুম; ভেবে দেখলুম, বাস্তবিকই এখন আমার কাঁদবার সময় নেই।

ধীরে ধীরে বাবার প্রাণবায়ু অনন্তে মিলিয়ে গেল। জগতের মধ্যে যা ছিল আমার আপনার, যে কোলটী ছিল আমার একায়ত্ত করা, সেটী অসীম অনন্ত অন্ধকারের মাঝে হারিয়ে ফেলে, দৃষ্টিহীনের মত দাঁড়িয়ে রইলুম আমি; আর কাঁদতেও ক্ষমতা তখন ছিল না আমার। শোক যে কি বস্তু, তা আমি এই প্রথম জানলুম আজ।

শ্মশানে যখন বাবার মুখে আগুন দিলুম, তখন আমি আত্মসম্বরণে অসমর্থ হয়ে কেঁদে উঠলুম। প্রমোদ আমায় প্রবোধ দিচ্ছিল নিজের অবস্থা দেখিয়ে। দেখতে দেখতে বাবার দেহ ছাই হয়ে গেল। সকলের অলক্ষ্যে চোখের জল ফেলে চিতা

ধুয়ে দিয়ে, স্নান করে সকলের সঙ্গে বাড়ী ফিরে এলুম।

সে দিন প্রমোদ তার বাড়ীতে আমায় ধরে নিয়ে গেল; রেখা আমার কাছে এসে আশ্রয় নিলে। তার কাছে আমার আমাকে লুকিয়ে রাখবার প্রয়াস করতে হল না—সেও যত কাঁদে, আমিও ততই কাঁদি। প্রমোদ আসছে সাড়া পেলেই দুজনেই মুছে ফেলি চোখের জল। আমার যত লজ্জা হয় তাদের ঠাট্টাকে, রেখা ভয় করে প্রমোদ আর তার স্ত্রীকে।

কয়েকদিন যখন কেটে গেল, আমি অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে, দেশে যাওয়ার প্রস্তাব কল্লুম। বাড়ীতে বাবার মৃত্যুর পরদিনই টেলিগ্রাম করেছিলুম। এখন তাঁর শ্রাদ্ধাদি সমাধা করতে দেশে যাবার বিশেষ প্রয়োজন।

প্রমোদ তখন বেশ ঠাণ্ডা হয়েছে। তার যে মা মরেছেন, তা কেউ জানতেও পারবে না তাকে দেখে। কেবল রেখার নীরব রোদনই মাঝে মাঝে বাড়ীটাকে নীরব গম্ভীরতায় ছেয়ে ফেলে।

আমি যে বাসা ভাড়া নিয়েছিলুম, তা ছেড়ে দিলুম। প্রমোদ বললে,—আর আই, এ, পড়বে না?

আমি একটী নিঃশ্বাস ফেলে বল্লুম,—ঠিক কি করে বলব। দেখি, যদি পড়বার মত সুবিধে পাই, তবে বোর্ডিংয়ে থেকে পড়ব।

রেখা শুধু চোখের জল ফেলতে লাগল। তার নীরব ব্যথা অনুভব করে আমার সারা বুকটা জুড়ে একটা হাহাকারের প্রবল ঝড় বইতে লাগল। আহা! কিছু জানে না সে; জলে ধোয়া যুঁই ফুলটির মতই সে নির্ম্মল পবিত্র, দেবতার চরণে দেবার উপযুক্ত। কে জানে, কত উৎপীড়ন সহ্য করতে হবে তাকে, কত বিপদের ধাক্কা তার সরল বিশ্বাসযুক্ত হৃদয়খানাকে আঘাত করে, চলে যাবে। হয় তো ঝড়ের বেগ সহ্য করতে পারবে না সে, হয় তো ভেঙ্গে পড়তে হবে তাকে।

আমি আদরের সুরে বল্লুম,—কাঁদছ কেন রেখা? যদিও মা বাপ দুই-ই গেছেন তোমার, কিন্তু তোমার দাদা আছেন, আর এক বোনও আছেন।

রেখা চোখ মুছে রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠল,—ওঃ! তুমি কি কিছুই জান না ছোড়দা? দাদা ব্রাহ্ম বলে সে দিদির শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা তাকে ছিনিয়ে নেছে একেবারে আমাদের কাছ হতে। সে একখানপত্র দেবারও অধিকার পায় না আর। আর দাদা বৌদির কথা বলছো? আমার দাদা ও বৌদিকে তা হলে আজও তুমি চেন নি ছোড়দা।

আমি যেন বিস্মিতভাবে বল্লুম,—কেন, তোমার দাদা ও বৌদি কি?

রেখা উত্তর দিলে,—ওরা যে ব্রাহ্ম; আমি কেমন করে থাকব ওদের কাছে? বৌদি আমার পূজো করা মোটে দেখতে পারে না। এতদিন বাবার ভয়ে দাদাও কিছু বলত না, কিন্তু এবারে আর আমার রক্ষে নেই।

আমি বল্লুম,—না—না! সে সব ভয় কর না তুমি। হাজার হোক তোমার দাদা তো বটে। বৌদি পর হতে পারে, দাদা কখনও পর হতে পারে না।

রেখা শুধু বললে, দেখ তুমি ছোড়দা, আমি আর কি বলব এখন?

আমি প্রমোদের কাছে রেখার কাছে বিদায় নিয়ে দেশের দিকে রওনা হয়ে গেলুম।

শিয়ালদহে এসেই হঠাৎ দেখা হয়ে গেল আমাদের গ্রামের একটী ছেলের সঙ্গে; সে পশ্চিমের এক রাজার ষ্টেটে কাজ কচ্ছিল।

আমায় দেখেই সে যেন হঠাৎ চমকে উঠল। সে ভাবটা যদিও চোখে পড়েছিল আমার, তবু অতটা মন না দিয়ে আমি এগিয়ে গিয়ে বল্লুম,—তুমি দেশে যাচ্ছ নাকি ভূপেন?

ভূপেন মুখখানা লাল করে বললে,—দেশে? না!—আমি এখন পশ্চিমে কাজ করছি—সেইখানেই যাব। আমাদের রাজা বাহাদুর এই ট্রেণে যাবেন—আমিও তাঁর জন্যে ট্রেণের কয়েকটি কামরা রিজার্ভ করতে এসেছি। তুমি কি দেশে যাচ্ছ নন্দ?

আমি উত্তর দিলুম,—হ্যাঁ।

সে অন্যদিকে সরে যাচ্ছিল আর কথা না বলে। আমি বাধা দিয়ে বল্লুম,—নরুর খবর কিছু জান?

সে ব্যস্তভাবে বলে উঠল,—বাঃ! আমি কি জানি তা? আমি কি বাংলায় থাকি যে দেশের লোকের কথাও শুনতে পাব কখনও? আমি আজ তিনবছর রয়েছি পশ্চিমরাজ্যে, সেখান হতে না পাই কোন খবর—না পাই কিছু। এই সবে শুনছি প্রথম দেশের কথা তোমার মুখে। নরু কোথায় গেছে?

আমি বিষণ্ণভাবে বল্লুম,—আমিও জানিনে

তা। বাবাকে নিয়ে এসেছিলুম প্রায় মাসখানেক হল এখানে, তারও দুদিন তিনদিন, আগে নরুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার।

সেই সময় দুখানি মোটরকার এসে কাছে দাঁড়াল। একখানি আগাগোড়া ঢাকা, আর একখানি সম্পূর্ণ খোলা। ভূপেন বলে উঠল,—ওই রাজা এসেছেন।

রাজা বাহাদুর নামলেন মোটর হতে। দেখলুম,—খুব কম বয়স তাঁর, দেখতেও ভারী সুপুরুষ তিনি। রাজাদের মনে যে ভারিত্ব থাকা সম্ভব ছিল তাঁর, মোটেই সেটা নেই। কথাগুলিও তাঁর খাঁটি বাংলা।

আমি কাছেই দাঁড়িয়ে দেখছিলুম রাজাটীকে; ভূপেন আমায় সেখানে থাকতে দেখে একটু বিরক্ত হল যেন বোধ হল; কিন্তু আমি সেদিকে মোটে তাকালুম না: রাজাকে দেখবার আগ্রহটা বেশী রকম জেগে উঠেছিল আমার মধ্যে।

রাজা বাহাদুর চারিদিকে পাদচারণা করে বেড়াচ্ছিলেন। কয়েকজন কর্ম্মচারীও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছিলেন তাঁর। যে মোটরখানি আগাগোড়া ঢাকা দেওয়া ছিল, তাতে যে রাজা বাহাদুরের স্ত্রী ছিলেন, তাতে একটুও সন্দেহ ছিল না। দুই তিনজন প্রহরী সেখানে পাহারা দিচ্ছিল।

আমি যে সময় আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ সেই সময় ভূপেনের অনিচ্ছাসূচক আহ্বান শুনতে পেলুম; ফিরে এসে দাঁড়ালুম, ভূপেন রাজা বাহাদুরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে।

দেখলুম, লোকটী আলাপ করতে অদ্বিতীয়। এমনভাবে আমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে নিলেন, যেন পূর্ব্ব হতে একটু জানাশোনা ছিল, এখন সেটা বেশী রকম ঝালিয়ে নেওয়া গেল।

শুনলুম, তিনি জন্মাবধি আছেন বাংলায়—মাঝে মাঝে বেড়াবার জন্যে তাঁর রাজ্যে যেতেন। এতদিন তাঁর বাপ বেঁচে ছিলেন, সেইজন্যে তাঁকে বন্দী হয়ে থাকতে হয় নি রাজ্যে। সম্প্রতি এক বছর হল, তাঁর পিতার মৃত্যু হওয়ায়, বছরে দু'বার করে যেতে হয় সেখানে।

আমার সঙ্গে তিনি বন্ধুত্বটা বেশ পাতিয়ে নিলেন। তারপর বারবার করে বলে দিলেন, যদি কোন দরকার পড়ে কখনও আমার, আমি যেন তাঁকে পত্র লিখি। তিনি অনেক কাজ দিতে পারবেন আশা করেন।

নিশ্চয়ই তিনি ভাবছিলেন, বাঙ্গালী যদি হাজার বড়লোক হয়, তবু তাকে চাকরী করে খেতে হবে। পরের দাসত্ব না করলে, বাঙ্গালীর জীবন যে কাটবেই না—এটা জানা কথা। আমাকেও যে চাকরী করতে হবে, এটা নিশ্চিত, সেইজন্যই তিনি এই কথা বলে দিলেন আমায়।

আমার সামনে একটা আশার আলো ফুটে উঠল। আমি তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হলুম।

তিনি যে ট্রেণে পশ্চিমে যাবেন, সেই ট্রেণখানা এসে পড়ল। রাজা বাহাদুর তাঁর এক আত্মীয়ের হাতে স্ত্রীলোকদের উঠিয়ে দেবার ভার দিয়ে নিজে ফাষ্ট ক্লাসে উঠে পড়লেন।

আমি সেই খানেই দাঁড়িয়ে দেখলুম—ঢাকা মোটরকারখানা আর একটু এগিয়ে গেল। মেয়েদের যে কামরাখানা রিজার্ভ করে নেওয়া হয়েছিল—ভূপেন তার দরজা খুলে দিয়ে সরে গেল। মোটরকার হতে দাসীশ্রেণীর দুইটী প্রৌঢ়া নামল, তাদের মাঝখানে একটী রমণী—বহু মূল্যবান শালে আপাদমস্তক ঢেকে ট্রেণে উঠে গেল। তাঁর শুধু পায়ের দিকটায় শাল নামতে পায় নি, কিন্তু পা দুটীতে ছিল জরির পম্পসু।

মোটরকার পেছনে সরে গেল—সেখান হতে লোকগুলি রাজা বাহাদুরের কাছে উঠল।

গাড়ীখানি একটু পরে আস্তে আস্তে চলতে লাগল। আমার পাশ দিয়ে যখন মেয়ে-গাড়ীখানা আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল, তখন হঠাৎ আমার দৃষ্টি পড়ল গাড়ীর মধ্যে।

আমি যেন লাফিয়ে উঠলুম;—একি! এ কার মুখ?—এ যে সেই শান্তি!—তারই মুখ এ যে।

ঝি দুটো তাকে বাতাস কচ্ছিল—শালখানা তার মাথা হতে খসে পড়েছিল; আমি স্পষ্ট চেয়ে দেখলুম, এ শান্তি বই আর কেউ নয়। সেও যেন তাকিয়েছিল আমার দিকে, তার মুখে যেন জয়ের হাসি ভেসে উঠেছিল।

এক মুহূর্ত্তের তরে মাত্র দেখতে পেলুম আমি। হুস হুস করে ট্রেণ বেরিয়ে গেল। আমি যেন বজ্রাহতের মতই তাকিয়ে রইলুম তবু সেইদিক পানে,—যদিও ট্রেণ আর দেখা যাচ্ছিল না।

সত্যিই কি শান্তি? সত্যিই কি সে সেই গভীর নিশীথে তার জন্মভূমি, তার স্নেহময়ী জননী, স্নেহময় ভাইকে ত্যাগ করে এসে রাজা বাহাদুরের বিলাসলক্ষ্মী হয়েছে? সেইদিনের তার সেই করুণ

আবেগমাখা বেদনার নিবেদন আমার পায়ের তলায়, সে সবই এমন কপটতার আবরণে আবরিত ?

কিন্তু শান্তি না হতেও তো পারে, কত লোক থাকে অন্য লোকের মত। আমি তো এক নিমেষ মাত্র দেখলুম এ রমণীকে, হয় তো একটু সৌসাদৃশ্য দেখেই ভেবেছি এ নিশ্চয়ই শান্তি। না,—এ কখনই শান্তি নয়। শান্তি যদি হত, তবে ভূপেন আমায় বলত, শান্তি পালিয়ে এসে এখানে আছে। ভূপেন তো শান্তিকে বেশই চেনে; আমার মত ভূপেনও নরুর একটী অনুগত ভক্ত ছিল বাল্যকালে; বড় হয়ে সে যদিও অনেকখানি দূরে সরে গিছল, তবু দেখাশুনা হলে চিনতে পারত।

অল্পে অল্পে আমার মনে বিশ্বাস ফিরে এল, এ কখনই শান্তি নয়। শান্তি আর যাই হোক, রাজা বাহাদুরের অন্তঃপুরিকার আসন গ্রহণ করতে কখনই পারবে না। আর বংশে শিক্ষায় জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ, রাজা বাহাদুর যে কুলত্যাগিনী যুবতীকে পবিত্রভাবে গ্রহণ করবেন, এমন লুকিয়ে নিয়ে যাবেন,—তা কখনই বিশ্বাস হয় না আমার।

টিকিটখানা করে ফেললুম। গাড়ী আসবামাত্র উঠে বসলুম। শান্তির চিন্তা মন হতে দূর হয়ে গেল, বাড়ীর চিন্তা এসে মনটাকে ছেয়ে ফেললে।

২০

যখন বাড়ী গিয়ে পৌঁছালুম—তখন সন্ধ্যা বেশ গাঢ় হয়ে এসেছে। অগ্রহায়ণের কুহেলিকাচ্ছন্ন আকাশ—তারাগুলি তত স্পষ্টরূপে ফুটে উঠতে পারে নি। শীত বেশ পড়ে গেছে—তাই গৃহস্থের গো-শালায় সাঁজাল দেওয়া হয়েছে, ধোঁয়াতে আকাশটা আরও একটু ভরিয়ে তুলেছে। অনেকের বাড়ীর উঠানে তুলসীতলায় যে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিছল, সে আলো এখন প্রায় নিভে এসেছে। দীঘির দিকে শ্মশান—যত রাজ্যের শৃগালের আড্ডা সেদিকে; তারা সব মনের আনন্দে প্রহর গণনা করে গেল।

পল্লীগ্রামের পথ,—তাতে শীতকাল,—প্রায় নিথর হয়ে এসেছে। গরমকালে পথে অনেক লোক দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু শীতকালে একটা কুকুরকেও দেখতে পাওয়া যায় না।

আমি একা পথ চলতে লাগলুম। হঠাৎ নরুদের বাড়ীর সামনে এসে আমি থমকে দাঁড়ালুম। একটা ঘরে খুব মৃদুভাবে আলো জ্বলছিল—বোধ হয় জানালা খোলা ছিল, তাই তার রেখাটা বাইরের খানিকটে জায়গা প্লাবিত করে ফেলেছিল।

বাড়ীতে কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। আমি ভাবতে লাগলুম,—নরু আমার হাতে তার মাকে দিয়ে চলে গেছে; নিশ্চয়ই তার মা একা এই বাড়ীতেই আছেন। আমি একবার যাব কি এখন—না, কাল সকালে যাব ?

কিন্তু সকালে আসতে পারি কি না পারি, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল। কালই বাবার শ্রাদ্ধের দিন, —তা আমার আগে অত মনে হয় নি, এখন মনে হয়ে গেল। কাল বোধ হয় আসতে পারব না, আজই যাওয়া যাক।

আমি আস্তে আস্তে এসে দরজার কাছে দাঁড়ালুম। বাইরের ঘরের দরজা বন্ধ দেখে, ঘুরে গিয়ে উঠানের দরজার কাছে থামলুম। এ দরজাটা বাইরে থেকেও যে সে খুলতে পারত। আমি এই দরজাটা খুলে উঠানে গিয়ে দাঁড়ালুম।

একটা ঘরের দরজা খোলা—সেই ঘরটীতে একটী ম্লানপ্রদীপ ম্লানরেখা বিকীর্ণ করে জ্বলছিল। আমি অনেকক্ষণ উঠানে দাঁড়িয়ে রইলুম—কারও সাড়াশব্দ যখন পেলুম না, তখন বারাণ্ডায় উঠলুম। দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলুম—একটী আসনে একটী রমণী ধ্যানমগ্নাভাবে বসে রয়েছেন। তাঁর চোখ দুটী মুদিত, সেই মুদিত চোখের কোণ দিয়ে ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে পড়ছে—উন্নতবক্ষ থর থর করে কাঁপছে; হাত দুখানা অঞ্জলিবদ্ধ,—তাও কাঁপছে সমান বুকের স্পন্দনে। ম্লান আলোক-রেখা তাঁর ম্লান মুখখানার পরে পড়েছিল। এমন গম্ভীর উদাস ভাব ফুটে উঠেছিল সেখানে, যে আমার কিছুতেই সাহস হচ্ছিল না, সে উদাস ভাবকে আঘাত করে জাগিয়ে তুলতে। মনে হচ্ছিল, যেমন ধ্যানমগ্ন হয়ে আছে সরল প্রকৃতিটা এখানে, তেমনি ধ্যানমগ্নই হয়ে থাক;—আমার কর্কশ হস্তের কঠিন স্পর্শে কর্কশতা ফুটাব না।

অনেকক্ষণ আমি বিভোর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম সেখানে। রাত বেশী হয়ে যাচ্ছে দেখে আর চুপ করে থাকতে পাল্লুম না। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে ঝুঁকে পড়ে ডাকলুম,—মা!

বিধবা হঠাৎ চমকে উঠলেন; তাঁর সেই চমক ভাবটা আমার বুকে প্রচণ্ড আঘাত করলে। আমি দেখলুম, তাঁর মুখখানা হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে গেল; তিনি ফিরে চাইলেন।

আমি দেখলুম তিনি আমায় নরু ভেবে সচকিত

হয়ে উঠেছেন; তাঁর সে ভাবটা দূর করে দেবার জন্যে আমি বল্লুম—মা—আমি নন্দ।

নন্দ? একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস তাঁর বুকখানাকে কাঁপিয়ে দিয়ে চলে গেল—তিনি অধীরভাবে দুই হাতে মুখ ঢাকলেন। আমি বুঝলুম, আমি যা অনুমান করেছিলুম তাই ঠিক; তিনি আমায় নরু মনে করেই চকিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর বুকটা বুঝি হঠাৎ আশায় পূরে উঠেছিল; যে মুহূর্ত্তে শুনলেন আমি নন্দ,—আমি নরু নই;—সেই মুহূর্ত্তে তিনি একেবারে বসে পড়লেন।

মাতৃ হৃদয়ের অসহ্য বেদনা আমি বেশ অনুভব করতে পারলুম যদিও, তবুও কোনও কথা বলতে পাল্লুম না। এমন বাণী খুঁজে পেলুম না আমি, যা দিয়ে স্নেহ-কাতর হৃদয়খানাকে তাঁর একটু শান্তি প্রদান করতে পারি। উচ্ছ্বসিত বুকে আমার বাজতে লাগল কেবল কথা—কিন্তু ঠোঁটে এল না। এ শোকের প্রতিমূর্ত্তি মা—সে সব কবিত্বের কথা এখানে খাটবে না।

দেখলুম, তিনি তখনি নিজেকে নিজে সামলে নিলেন। নিজের দুর্ব্বলতাকে নিজে ধিক্কার দিয়ে উঠে পড়লেন; আয় বাবা, আয়।

একখানা আসন তিনি পেতে দিলেন।

আমি জুতা পায় দিয়ে যেতে কুণ্ঠিত হয়ে পড়লুম। বল্লুম,—আমি এখানেই বসি মা,—রেল হতে এসেছি, কত মুচিমেথর সব ছুঁয়ে আসতে হয়েছে! তোমার ওই পবিত্র স্থানে এ অশুচি দেহ নিয়ে প্রবেশ করতে বড় ঘৃণা হচ্ছে আমার।

তিনি একটু ম্লান হাসলেন। না,—না,—তুই আয় নন্দ! আমার শুচিতা কিছুমাত্র নেই—আমার পবিত্রতা দূর হয়ে গেছে। তুই যদি খুব ঘৃণিত কাজও করে আসিস—আমি তোকে স্পর্শ করতে কুণ্ঠিত হব না। আয় বাবা,—এখানে আয়।

অগত্যা আমি জুতা খুলে রেখে, ঘরে গিয়ে বসলুম আসনে। বল্লুম,—আপনি ভালো আছেন মা?

তিনি বললেন,—হ্যাঁ বাবা!—খুব ভালো আছি। আমি ভালো থাকব না তো কে ভালো থাকবে বল দেখি?

আমি ব্যথিতভাবে বল্লুম,—নরু কোন খবর দেয় নি?

তিনি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন,—আমি কে তার, যে খবর দেবে আমায়? তারা দুটী ভাই বোন—কেউই আমার নয়। আমি তাদের মানুষ করতে গেলুম শিক্ষা দিয়ে,—তারা সে শিক্ষা পেয়েও চলে গেল অন্য পথে। যাক, তার আর কি করব আমি। বড় দুঃখ হয় বাবা,—তারা দুজনেই অধঃপাতে গেল, যাক—আমায় এমন করে পুড়ে মরতে রেখে গেল কেন? নরু কেন আমার বুকে একখানা ছুরি বসিয়ে রেখে গেল না? আমিও শান্তি পেতুম, তারও সকল জ্বালা ঘুচে যেত।

আমি চুপ করে বসে রইলুম। আর্দ্রকণ্ঠে তিনি বললেন—আমি মা—তারা হাজার কুকাজ করলেও, তবু আমি তাদের মা, তারা আমার সন্তান। তারা আমায় স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে চলে গেল, আমি এত কষ্ট—এত যন্ত্রণা পাচ্ছি, তবুও তো সুখী হতে পাচ্ছিনে। তবু যখন তখন দেবতার কাছে মাথা পাতছি,—"ঠাকুর! তুমি তো সব দেখছ; আমার ব্যথা যেন গায় তাদের না বাজে, আমার দীর্ঘশ্বাস যেন সামনে তাদের বাধা না এনে ফেলে। তারা যখন গেছেই চলে—তখন সুগম করে দাও তাদের পথ। তারা সামনে চলে যাক—যতদূর যেতে পারে যাক। পেছনে—যা তারা ফেলে রেখে গেছে, তার দিকে যেন না ফিরতে পারে আর। আমি তাদের আর তিলার্দ্ধ প্রত্যাশা করি নে, আমি তাদের কথা আর শুনতে চাই নে, তাদের মা ডাক যেন আর না শুনতে হয় আমায়। আমার স্নেহ তবু পাক তারা, যদিও তারা পায়ে দলে গেছে আমার বুক, কিন্তু তাদের স্নেহ যেন আমায় না পেতে হয় আর।

হৃদয়ের ভাবটাকে একটু সামলে নিয়ে তিনি বললেন,—তুই বুঝি বাড়ী যাস নি এখনও নন্দ? তোর বাবা কেমন আছেন?

আমি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বল্লুম,—বাবাকে নিমতলার শ্মশানে শুইয়ে রেখে এসেছি মা!—বাড়ী আসছি শ্রাদ্ধ করবার জন্যে।

তিনি বললেন,—কতটা মনে শান্তি পেয়েছিস এত ভেবে দেখ দেখি নন্দ? যদি তোর বাবা তোকে পায়ে দলে, নীলমণিকে বুকে তুলে নিত—কি জ্বালাই না দহন করত তোকে, কিন্তু এ যে বড় শান্তি—বড় শোকের মধ্যেও একটা সান্ত্বনার রেখা ভেসে উঠছে মনের মধ্যে, তোর বাবা কোথাও নেই, তাঁকে শ্মশানে শুইয়ে দিইছিস; যেখানে কেউ তাঁর উপর অধিকার স্থাপন করতে পারবে না। আঃ! আমি যদি তাদের দুটোকে শ্মশানে শুইয়ে দিতে

পারতুম, তা হলে কতদূর গভীর সান্ত্বনা পেতে পারতুম, এই ভেবে তারা কোথাও নেই, তারা আছে স্বর্গে, যেখানে একমাত্র প্রভু—যিনি পাঠিয়েছিলেন এখানে আবার ফিরিয়ে নিচ্ছেন—তিনি আছেন। ওরে নন্দ! সে বড় শাস্তি। জগতে কাউকে দিয়ে মন মানে না, মন মানে কেবল তাঁর পায়ের তলায় সঁপে দিয়ে।

আমি বল্লুম,—তাই মনে করুন না মা!——

দীপ্তভাবে তিনি বলে উঠলেন,—কেমন করে মনে করব তা? যদিও তাদের কথা মনে জাগছে আমার রাত দিন, কিন্তু কি জ্বালাকর ভাবে—তা কি তুই বুঝতে পারবি নন্দ? তাদের কথা মনে হলেই ভাবছি, আমি—মেয়েটা না জানি কি রাশি রাশি পাপই উপার্জ্জন করছে? ছেলেটা কি জানি কি হয়েছে—কি করছে? যত ভাবছি, তত আরও বুক আমার শুকিয়ে উঠছে। যদি এখনও শুনতে পাই, তারা নেই—মরে গেছে—উঃ! তা হলে কি শান্তিই না পাই আমি? আর যে কয়টা দিন বাঁচি, একবার ভগবানের পায় আত্ম-সমর্পণ করে কাটিয়ে যাই। এখন ডাকতে গিয়েও ডাকতে পারছি নে আমি। ভগবানকে মনে করতে গিয়ে মনে জেগে উঠছে, তাদের দু'খানা মুখ; সঙ্গে সঙ্গে ভাবছি তাদের পাপ কালিমাখা জীবনের কথা, হতাশ হয়ে অমনি ধুলায় লুটিয়ে পড়ছি আমি। বলতে পারিস নন্দা! মায়েরা কেন এ রকম যন্ত্রণা পায়? ছেলে-মেয়েরা যখন নিজেদের সুখের আশায় মাকে ত্যাগ করতে পারে, মা কেন তা পারে না? মায়ের দৃষ্টি কেন পড়ে থাকে ছেলে-মেয়েদের দিকে?

আমি বল্লুম,—আপনি এখানে এমন করে থাকলে পাগল হয়ে যাবেন মা! আমি আপনাকে নিয়ে যাব—যেখানেই আমি যাই না কেন? আমারও তো কেউ নাই মা,—আপনি আমার কাছে থাকবেন না কি?

তিনি একটু হাসলেন; তারপর বললেন,—সে তো বাবা অনেক দূরের কথা। দেখা যাক কি হয়। এখন তুমি বাড়ী যাও। আমার জন্যে কিছু ভাবনা নেই তোমার, এখনি পাগল হয়ে যাব না আমি। আমিও কঠোর হবার চেষ্টায় আছি। তারা যখন ত্যাগ করতে পারলে আমায়, তখন আমিও কি সেই কুলত্যাগিনী মেয়ে—ধর্ম্মত্যাগী ছেলের কথা ভুলতে পারব না?

রাত নয়টা বেজে গিছল—আমি তাঁর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে উঠে পড়লুম। তিনি আমায় আশীর্ব্বাদ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে এসে বাইরে দাঁড়ালেন।

আমি একবার পেছন ফিরে দেখলুম, শুভ্রবসনা নারীমূর্ত্তিটী তখনও দাঁড়িয়ে আছেন।

বেদনায় আমার বুকটা ফেটে যেতে লাগল। আমার মা নেই, কখনও মায়ের করুণা বুঝিনি, তাই একটু করুণা কোনও রমণীর কাছে পেলে আমার হৃদয়টা মাতৃভাবেই পূর্ণ হয়ে ওঠে। যাদের মা আছে, তারা কি? মায়ের স্নেহডোর ছিঁড়ে ফেলে তারা যে চলে যেতে পারে নিষ্ঠুরের মত—এইটাই না বড় আশ্চর্য্যের কথা!

বাড়ীর গেটের কাছে এসে দেখলুম, গেট বন্ধ রয়েছে। আমি চীৎকার করে চাকরটাকে ডাকতে লাগলুম।

প্রায় আধঘণ্টা চীৎকারের পর দেখলুম, রমুবাবু উপরের রেলিং ঘেরা বারাণ্ডায় লণ্ঠন নিয়ে এসে দাঁড়ালেন—খানিকক্ষণ জমাট বাঁধা অন্ধকারের পানে তাকিয়ে বললেন,—কে ডাকছ অমন ষাঁড়ের মত গলা ছেড়ে এই দুপুর রাতে?

আমার গা জ্বলে যেতে লাগল; রাগটা যদিও হয়ে গিছল খুব, তবু সেটা সামলে নিয়ে নরমসুরে বল্লুম,—আমি। দরজাটা খুলে দিন।

রমুবাবু যেন আকাশ হতে পড়লেন,—কে? নন্দ নাকি? এত রাতে ট্রেণ কি তোমার জন্যে গভর্ণর স্পেশাল করে দেছেন? ছ-টার গাড়ী বেরিয়েছে তো ঝিকিমিকি বেলা থাকতে।

আমি একটু রাগের সঙ্গে বল্লুম,—না মশায়,—আমার জন্যে গভর্ণর একটা স্পেশাল অ্যারোপ্লেনের বন্দোবস্ত করে দিছলেন, সেইটাতে করে আসা গেছে। নিন—এখন দরজাটা খুলে দেবেন?

রমুবাবু বিলক্ষণ চটে উঠে বললেন,—তোমার কথাগুলো বেজায় মানহানিকর—বেজায় লম্বা চওড়া—

আমি অধৈর্য্যভাবে বল্লুম,—না হয় তার জন্যে কোর্টে যাবেন, আদালত খোলা আছে—অটকাবে না কিছু। এখন দরজাটা খুলে দেবেন কি না বলুন;—শীতে এদিকে হাত পা কাঁপছে।

সেবার রমুবাবু ধীরভাবে বললেন,—বাপু—শীত সবারই। খাওয়া-দাওয়া সেরে, আরাম করে লেপের তলায় ঢুকে—এই শীতে কে বেরুতে চায় বল দেখি? আমি বলে বেরিয়েছি তাই—অন্য কোন শালা বেরুবে না;—এ আমি হাতে হাতে

লিখে দিতে পারি। যাই হোক, ষাঁড়ের মত চেঁচিও না আর, গাঁ জারি কোর না; আমি যাচ্ছি আস্তে আস্তে।

তাঁর কথাও যা, কাজও তাই। প্রায় সুদীর্ঘ তিন কোয়ার্টার লাগল তাঁর আস্তে আস্তে আসতে; তিনি দরজা খুলে দিয়েই যেন কত কাঁপছেন শীতে, এমনি ভাণ করে বললেন,—যাও,—দোর বন্ধ করে দিয়ে যাও;—আমি চল্লুম। ঘুমুচ্ছিলুম দিব্যি, এমন চীৎকার যে ঘুম ভেঙ্গে চোখ জ্বালা দিচ্ছে।

আমি বল্লুম,—তা আলোটা দিয়ে যান। কোথায় শোব আমি, সে বন্দোবস্ত ঠিক করে নেই দেখে শুনে।

বিকট মুখভঙ্গী করে রমুবাবু বললেন,—ওরে আমার বড় পিয়ারের নবাব সিরাজউদ্দৌলা রে? আলোটা দি আমি ওঁকে, অন্ধকারে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে গড়িয়ে পড়ে হাত পা ভেঙ্গে ছয়টা মাস পড়ে থাকি আমি।

আমি গম্ভীরভাবে বল্লুম,—বেশ তো মশাই! ছয়মাস বেশ ঘি রুটি খাঁটী ঘন দুধ খাবেন। পরের পয়সা বই তো নয়, গায়ে বাজবে না, নিজের পয়সা হলে মানুষ পিছিয়ে পড়ে বটে, পরের পয়সা—খাবেন ভালো—

রমুবাবু বললেন,—আরে ছোঁড়া—খাব তো ভালো—গায়ের ব্যথাগুলো—

আমি বল্লুম,—তা মশাই—কষ্ট না করলে কেষ্ট পাওয়া যায় না—তা তো জানেন। শুধু শুধু কে আপনাকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবে?

রমুবাবু মুখ বেকিয়ে বললেন,—যাও,—বকিওনা আর।

লণ্ঠন নিয়ে সিঁড়িতে উঠতে লাগলেন দেখে, আমি সন্ত্রস্ত হয়ে বল্লুম,—ও মশাই,—নিয়ে যাচ্ছেন যে তবু? অন্ধকারে কোথায় কি আছে—ঠিক পাব না আমি—দিয়ে যান।

রমুবাবু উঠতে উঠতে বললেন,—উঃ! ভারী আমার দায় পড়েছে। লাইব্রেরী হতে বই খানা এনেছি,—সন্ধ্যে হতে এতক্ষণে মোটে তিনটী পাতা পড়া হয়েছে আমার—এখন আলোটী দিয়ে ওঁকে, বসে থাকিগে যাই আমি।

বলতে বলতে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি সেই গভীর অন্ধকারে বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলুম। তারপরে চাকরটাকে ডাকতে লাগলুম।

সে চীৎকারে আবার রমুবাবুকে জ্বালাতন হয়ে উপরের বারণ্ডায় লণ্ঠন দিয়ে দাঁড়াতে দেখা গেল। কর্কশকণ্ঠে বললেন, এই শুয়ার,—ঘুমুতে দিবি কি না কাউকে? রাত দুপুরে এসে গাঁক গাঁক করে চেঁচাচ্ছে দেখ। নিকাল্‌লা আবি হিঁয়া সে—

আমার রক্ত গরম হয়ে উঠল। বল্লুম,—খুব করব চীৎকার করব; কারও বাবার বাড়ী নয় তো—

নীলমণির গলা শোনা গেল। সে বলছে,—আমার বাড়ী। মামা! ওই শুয়ারটার কান ধরে বার করে দিতে বল ভদুয়াকে।

রমুবাবু উপর হতে চীৎকার করতে লাগলেন,—এ ভদুয়া,—ভদুয়া জলদি উঠিয়ে—

ভদুয়া নামধারী চাকরটা কোথায় ঘুমুচ্ছিল; চোখ ডলতে ডলতে উঠে এল। আমি দেখলুম,—সে একটা নতুন পশ্চিমে জংলা ভূত।

রমুবাবু অপূর্ব্ব হিন্দীতে বললেন,—এই দেখিয়ে ভদুয়া! যদি এই বাবু আর ফের বক বক করকে চিল্লায়, তব উসকো কাণ পাকড়কে বাহার করকে দিও। আর যদি চুপ করকে থাকে, তব উসকো ঘর পর লে যাইও। বুঝতে পারা হ্যায় হাম্‌কা কথা?

আমি বল্লুম,—বাপু! আমি চেঁচাব না,—আমার ঘুমোবার মত একটা জায়গা দেখিয়ে দে।

ভদুয়া ল্যাম্প জ্বালিয়ে আমার ঘরে আমাকে নিয়ে গেল। আমি আমারই বিছানায়,—মাত্র একমাস পরে, নতুন অভ্যাগতরূপে অপূর্ব্ব সম্মান লাভ করে শুয়ে পড়লুম। ক্ষিদেয় যদিও পেট জ্বলছিল, কিন্তু আতিথেয়তার অপূর্ব্ব আয়োজন দেখে, উচ্চবাচ্য কিছু কল্লুম না আর। মনে হল, নতুন কর্ত্তা সব যেখানে, সেখানে ঢুকতে পেয়েছি, বিছানা পেয়েছি এই ঢের; খাবার কথা বলতে গেলেই এবার যে জুতো খেতে হবে সেটা ঠিক।

বাবা বাড়ী হতে যেতে যেতেই এরা যে এমন করে বাড়ীর উপর অধিকার স্থাপন করেছে, এই ভেবেই আমি বেজায় আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। আমারও যে অর্দ্ধেক অংশ আছে, তা যেন এরা মোটে কেয়ারেই আনছে না। ভালো! দেখা যাক, কতদূর কি হয়? আমি আমার অংশ কখনও ছাড়ব না,—চুল চিরে বাড়ী ভাগ করে নেব—।

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লুম।

২১

সকালবেলায় ঘুম ভেঙ্গে গেল ভদুয়ার চীৎকারে। বার হয়ে দেখি,—উঠানে বিরাট সভা বসে গেছে। নীলমণি স্নান করে গরদের কাপড়

পরে, শ্রাদ্ধের যোগাড় করতে ছুটোছুটি করছে। পুরুত জয়চাঁদ ভশ্চায মহা আড়ম্বরে মাঝখানে আসর জাঁকিয়ে বসেছেন। গ্রামের গণ্যমান্য ভদ্রলোকেরা এসে নানা রকমের—মোটা সরু তাকিয়ে ঠেস দিয়ে বসে—নানা রকমের হুঁকোয়—কলাপাতার নল করে তামাক টানছেন। যাঁরা বিধবা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণের মেয়ে, তাঁরা কেউ শ্রাদ্ধের যোগাড় করছেন, কেউ কেউ রান্নার যোগাড়ে বসে গেছেন। এক কথায় বলতে গেলে, শ্রাদ্ধ-বাড়ী, তা সেই শ্রাদ্ধ-বাড়ীই হয়ে পড়েছে বটে।

আমার উঠতে অনেক বেলা হয়ে গিছল,—বোধ হয় তখন সাড়ে আটটা হবে। আমার মাথার কাছে যে ক্লক ঘড়িটা ছিল আগে, অভ্যাসের বশে মাথা তুলে সেইদিকে তাকিয়ে দেখলুম, সেখানে ঘড়ি নেই। ঘড়ির ব্র্যাকেটটার উপরে দুটো তিনটে ব্র্যাণ্ডীর বোতল ও একটা বড় গ্লাস রয়েছে।

ঘাড় ফিরিয়ে চারিদিকটা দেখেই একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম আমি। সব পরিবর্ত্তন যে এ।

আমি বাইরে এসে দাঁড়াতেই চারিদিকে যেন একটা সাড়া পড়ে গেল: এরা কেউ যেন আমায় দেখবার প্রত্যাশা করেন নি, তাই হঠাৎ আমায় দেখেই বিস্ময় চকিত হয়ে উঠলেন।

ভশ্চায মশায় তখন একটিপ নস্য নিতে নিতে বলছিলেন,—তা হলে বাবা নিলু! এসে বসো এখন। আহা! এমন বাপও হারালে তুমি? তোমার বাবা যেন একটা দিকপাল ছিলেন, এমন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু যদি আজকাল দেখা যায় আর একটী। তিনি মারা যাওয়ায় আমাদের হিন্দু সমাজের যে কতদূর ক্ষতি হয়ে গেল, তা কেবল বুঝিতে পারছি আমরাই। আহা—হা! অমন মানুষ আর হবে না—আর হবে না। তা বাবা! তুমি হও তোমার বাবার মত; হিন্দুধর্ম্মকে জাগিয়ে তোলো—তোমার দাদার মতন নাস্তিক যে হবে না তুমি, তা তোমার ছোটবেলাতেই তোমার বাবাকে বলেছিলুম আমি। আঃ! কি খুসীই না হলেন তখন তিনি, তখনি আমায় কুড়িটী টাকা গুণে ফেলে দিলেন।

কথাগুলি শেষ করে তিনি হাঁচতে যাচ্ছিলেন। সবে মাত্র হ্যাঁচো করে একটা শব্দ হয়েছে, সেই সময় আমার দিকে চোখ পড়ল তাঁর, অমনি পতনোন্মুখ হাঁচিটা তাঁর বন্ধ হয়ে গেল। তিনি তেমনি হাঁ করে চোখ দুটো বিস্ফারিত করে আমার পানে তাকিয়ে রইলেন।

নীলমণি এসে সামনের আসনে বসল; আমার পানে একবার অবজ্ঞার ভাবে তাকিয়ে বললে,—নিন—আরম্ভ করুন; দেখছেন কি বলুন তো?

ভশ্চায মশাই বাঁ হাতে নাক ঝাড়তে গেলেন,—নাক থেকে খানিকটে জল গিয়ে যে নৈবেদ্যকে শ্রীযুক্ত করে তুলল, সেদিকে খেয়াল রইল না কারও।

আমি আশ্চর্য্য হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলুম। বড় ছেলে থাকতে যে ছোট ছেলে যায় শ্রাদ্ধ করতে, তা তো আমি কখনও শুনি নি। নীলমণিকে আমি এখানে উপস্থিত থাকতে ও শ্রাদ্ধের আসনে বসতে দেখে আমি নির্ব্বাকে শুধু তাকিয়ে রইলুম।

যখন দেখলুম ভশ্চায মশাই বেশ গড় গড় করে সংস্কৃত শ্লোকগুলো বলে যেতে লাগলেন, সঙ্গে সঙ্গে নীলমণিও আবৃত্তি করতে লাগল, তখন আর কিছুতেই আমি সহ্য করতে পাল্লুম না। একেবারে লাফ দিয়ে নেমে পড়লুম উঠানে—চীৎকার করে বল্লুম,—একি অন্যায় আপনাদের—একি কাণ্ড? আমি তো মরিনি এখনও যে নীল-মণি বাবার শ্রাদ্ধ করবে—?

বৃদ্ধ ঠাকুরদাদা—তাঁর বুক পর্য্যন্ত দোদুল্যমান সুচালো দাড়ী নাড়িয়ে বললেন,—বাধা দিও না—বাধা দিও না। করুন ভশ্চায মশাই—আপনার কাজ করিয়ে যান আপনি, থামছেন কেন? নীলু এদিকে কাণ দিও না—শুদ্ধমনে বাপের পরকালের কাজটা করে ফেলে দাও।

আমার মাথা হতে পা অবধি জ্বলে যেতে লাগল; তীক্ষ্নস্বরে বলে উঠলুম,—এ আপনাদের অন্যায় মশায়—

বাধা দিয়ে ঠাকুরদা বললেন, অন্যায়—আমাদের অন্যায়? কি লায়েক ছেলে হয়েছ তুমি যে, আমাদের ন্যায়-অন্যায় বিচার করতে পার, তোমার চেয়ে হাজার হাজার বিদ্বান লোক দেখেছি আমরা, আমাদের ন্যায়-অন্যায় বিচার করতে কেউ তারা সাহস করে নি, তুমি আসছো আমাদের ভুল ধরতে?

আমি বেগতিক দেখে একটু ঠাণ্ডাভাবে বল্লুম, —মাপ করবেন, আমি কি বলতে কি সব বলছি ঠিক নেই। তবে এটুকু তো বলতে পারি, আমি বাবার বড় ছেলে; বাবার শ্রাদ্ধ করবার ভার আমার উপরেই। আর বাবার ব্যারামের সময়, যখন কেউ এরা দেখেনি, তখন শ্রাদ্ধের অধিকারী কিছুতেই এরা হতে পারবে না। ওঠো নীলমণি!

বাবা—আমার হাতের জল নেবেন, তোমার মত কৃতঘ্ন ছেলের হাতে জল নেবেন না, যে জীবন্তে তাঁকে একদিনের তরেও সুখী করে নি, তাঁর জীবনকে আরো ঠেলে দেছে মৃত্যুর মুখে।

ঠাকুরমা তখন লুচি ভাজছিলেন,—এই ব্যাপার দেখে ডানহাতখানা আড়ষ্টভাবে উঁচু করে এসে দাঁড়ালেন সেখানে; তাঁর আঁচলের একটা কোণ কোমরে জড়ানো আছে, আর একটা কোণ মাথায় দেওয়া,—সেটা আবার ঝুলে পড়েছে নাকের উপরে। দুইদিকে দুইটা চোখ শুধু দেখা যাচ্ছে, নাকের চিহ্নটা লোপ পেয়ে গেছে। তামাকের ছাই না কি, মুখে দিয়ে ঠোঁট দুখানা কালো রং হয়ে গেছে।

তিনি এসেই বলে উঠলেন,—ওমা—মা; একি ব্যাষ্টক গো! শুভকাজে এ ব্যাষ্টক ছোঁড়া এসে জুটল কোথা হতে? হ্যাগা! তোমরা সব তো রয়েছো, একে কি তাড়িয়ে দিতে পারছ না? জলজ্যান্তো নারায়ণ রয়েছেন এখানে, আর এই খিরিষ্টেনটা পা দিতে সাহস করলে? আহা! বাছা নীলুর মুখখানা যে প্যাংশা হয়ে গেল দেখে শুনে—ওগো—দাও না ওকে দূর করে—বল না হেথা হতে চলে যেতে।

রামনাথ রায় এতক্ষণ প্রাণপণে হুঁকায় টান দিচ্ছিলেন; এখন হুঁকাটা কাছাকাছি একটা জায়গায় রাখতে যেতে, গণেশ বাবু নিলেন তাঁর হাত হতে। রামবাবু একটা হাই তুলে, আড়মোড়া দিয়ে বললেন,—ওহে ছোকরা! ভাল কথা শুনবে তো শোনো, তুমি যে বলছ কেবল আমি মরেছি কি বেঁচে আছি; কিন্তু আমরা দেখছি, বাস্তবিকই মরেছ তুমি; তুমি আর বেঁচে নেই।

বিস্ময়ের মধ্যেও আমার হাসি এল; কেন মশাই,—আমার দাহ হয়ে গেছে নাকি এর মধ্যে? মুখ-অগ্নিটা কে করলে—আপনি বুঝি?

খুব চটে উঠে রমুবাবু বলে উঠলেন, এঃ রাম রাম রাম! আজকালকার ছোকরাদের সঙ্গে কথা বলতে নেই। এদের সঙ্গে কথা বলতে যেতে হয় কাণ কেটে তবে। না জানে গুরুজনের মান রাখতে—না জানে কিছু; যা মুখে এল, তাই বলে গেল, একটু যদি হুঁস জ্ঞান থাকে।

ঠাকুরদাদা পাকা দাড়ীতে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন,—তাই ত! একদিন আমাদেরও তো' ওই দিন ছিল, কিন্তু মাথা তুলতুম না কখনও গুরুজনের সামনে। কেমন যে অভ্যাস ছিল, হায় রে সেকাল—হায় রে একাল—।

গভীর দুঃখে তাঁর মাথাটা নুইয়ে পড়ল, হঠাৎ লোকে দেখলে মনে ভাবৰে, তিনি বুঝি কেঁদেই ফেললেন।

ভগবান বাবু গোঁফে তা দিয়ে বললেন,—ও সব কথা থাক। ওহে নন্দ! শোন কথা, তোমার জাত গেছে, ধর্ম্মানুসারে তোমার শ্রাদ্ধ করবার অধিকার নেই;—সেই জন্তেই রমুবাবু বলেছেন মরেছ তুমি, আর বেঁচে নেই। আর গোলমাল কর না—যাও, আস্তে আস্তে সরে যাও এখান হতে।

আমি গম্ভীরভাবে বল্লুম,—আমার জাত গেল কি করে মশাই?

রমুবাবু বলে উঠলেন,—তা কি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে নাকি? নরুদের বাড়ীতে যাওয়া আসা করাটা কি কারও অজানা আছে? তুমি যে খাওয়া-দাওয়া করেছ তাদের বাড়ী, তাদের মেয়ে শান্তিকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে,—কে না জানে তা? বাপু! আর চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা কোর না—সরে যাও—আর বাধা দিও না শুভ কাজে।

আমি বল্লুম,—আমি শান্তিকে বিয়ে করতে চেয়েছিলুম?

চন্দ্র বাবু বলে উঠলেন,—নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই, সব শুনেছি আমরা। তারপর শান্তি যে সরে গেছে গাঁ হতে, এতেও হাত আছে তোমার; তারপর কাল রাতে যাওয়া হয়েছিল তাদের বাড়ী—মনে ভাবছ জানতে পারি নি আমরা? সব জেনেছি, আর জ্বালাতন কর না।

আমি আর একটিও কথা বল্লুম না,—ঘরের মধ্যে চলে গেলুম। ঘরে বসে বসেই দেখতে লাগলুম শ্রাদ্ধ শেষ হয়ে গেল; নিমন্ত্রিত গ্রামের সব মাতব্বর লোকেরা—ছেলেমেয়ে নিয়ে উঠান ও বারাণ্ডায় জুড়ে লুচির শ্রাদ্ধ করতে বসলেন। তাঁদের খাওয়া শেষ হলে, রমুবাবু দক্ষিণাস্বরূপ চার আনা করে পয়সা বিলালেন,—ধন্য ধন্য রব উঠে গেল চারিদিকে।

খাওয়া দাওয়া শেষ হতে বেলা তিনটে কি সাড়ে তিনটে বেজে গেল। আমি যে সেই ঘরটীতে অস্নাত অভুক্ত বসে রইলুম, কেউ একবার আমার দিকেও ফিরে তাকালে না। পুরুষেরা সব খেয়ে নিয়ে চলে গেলেন, তখন পাড়ার কয়েকটী মেয়ে এলেন খাবার জন্তে।

তাঁরা সব খেতে বসলেন। আমি ঘর হতে শুনতে লাগলুম, তাঁরা তীব্রভাবে আমার সমালোচনা করছেন। আমি চুপ করে শুনে গেলুম,—কোন উচ্চবাচ্য করলুম না।

বেলা প্রায় পাঁচটার সময় ভজন চাকরটা এসে বললে,—আপনি খাবেন চলুন—বুড়ীঠাকরুণ বলে দিলেন।

আমি সবেগে মাথা নেড়ে বল্লুম,—আমি খাব না।

সে চলে গেল; তখন আমি ঘর হতে বেরিয়ে চল্লুম নরুদের বাড়ী।

ঠাকুরমা পেছন হতে ডাকলেন,—খেয়ে যা নন্দা——

আমি মুখ ফিরিয়ে তীব্রস্বরে বল্লুম,—আমি নরুদের বাড়ী খেতে যাচ্ছি, নরুর মা আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন।

বলেই আমি খুব তাড়াতাড়ি চল্লুম।

তখন নরুর মা তাঁর ঘরের বারাণ্ডায় বসে, কালীর মা ঝিয়ের সঙ্গে গল্প করছিলেন; আমার মুখপানে তাকিয়ে বিস্মিতভাবে বললেন,—তোর মুখ এত খারাপ দেখাচ্ছে কেন রে নন্দা? অসুখ করেছে নাকি তোর?

আমি শুষ্কহাসি হেসে বল্লুম,—অসুখ হয় নি। হ্যাঁ মা,—আপনার হাড়িতে ভাত আছে কি?

ব্যস্তভাবে তিনি বললেন,—ভাতের খোঁজ নিচ্ছিস কেন? তুই কি আজ খাসনি নাকি?

আমি বারাণ্ডায় বসে বল্লম,—আমার বরাতে বাড়ীর খাওয়া উঠে গেছে। আপনার কাছে—আপনার প্রসাদ খেতে এসেছি। দিন আমায়—যা থাকে তাই খাব।

নরুর মা ভারি ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন,—তাই তো—তুই খাবি নন্দা? কিন্তু আমাকে সবাই যে একঘরে করে রেখেছে খৃষ্টান বলে, আমার ঘরে—আমার হাতে খাবি তুই—এতে যে জাত যাবে তোর।

আমি হাসলুম,—তাই কি মনে করেন মা—লোকে আমায় জাতিচ্যুত করে নি? আমি আজ ঘৃণিত, নিন্দিত, কুচরিত্র বলে খ্যাত হয়েছি গাঁয়ে—আর বাকিটা রয়েছে কি? আমি খাব মা আপনারই হাতে। আপনি যদি সত্যই খৃষ্টান হতেন, তাও আমি খেতুম—কোনও দ্বিধা করতুম না। দিন মা,—বড় ক্ষিদে পেয়েছে আমার।

নরুর মা প্রশান্তনেত্রে আমার পানে তাকিয়ে বললেন,—সত্যিই কি——

বাধা দিয়ে আমি বলে উঠলুম,—সত্যিই মা—সত্যি। আজ জগতের সবার কাছে অনাদর পেয়ে—এসেছি আপনার কাছে আদর কুড়ুতে। আপনার কেউ থেকেও নেই মা—আমারও তাই। আমায় মায়ের মত স্নেহমাখা আঁচলের তলায় লুকিয়ে ফেলুন মা—তারই জন্যে, সেই বিমল স্নেহাদরটুকু লাভ করবার জন্যেই ছুটে এসেছি আমি।

তিনি তাড়াতাড়ি উঠে জায়গা করে, থালায় করে ভাত বেড়ে আনলেন—আমি খেতে বসলুম।

কুণ্ঠিতভাবে তিনি বললেন,—ওকি নন্দ,—গণ্ডুস করলি নে?

আমি ততক্ষণে একগাল ভাত গিলে ফেলে বল্লুম,—সব বিসর্জ্জন দিলুম মা,—সব বিসর্জ্জন দিলুম। অনেক বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছিলুম, কিন্তু ঘরের অবহেলায় আমায় দূরে নিক্ষিপ্ত করলে। তারা যখন চিনতে পারলে না আমায়, আমি কেন চেনা দিতে যাব তাদের? আমার ব্রাহ্মণত্বকে ত্যাগ কল্লুম আমি—আর হিন্দু বলে পরিচয় দেব না।

নরুর মা একটু থেমে শুষ্কমুখে বললেন,—অমন কথা মুখেও আনিস নে বোকা। তোকে যদিও আজ চেনে নি তারা, তবু একদিন নিশ্চয়ই চিনবে তোকে। তোকে হিন্দু বলেই পরিচয় দিয়ে থাকতে হবে এখানে,—হিন্দু নস, এ কথা মুখে আনিস নে—মনেও করিস নে। ছি ছি ছি,—তোরা যে দিন দিন কি হচ্ছিস্—তাই আমি বুঝতে পারছি নে। আমায় যে লোকে একঘরে করেছে—তবে আমিও বলতে পারি, আমি হিন্দু নই? কিন্তু তা তো আমি বলি নি; তারা আমায় অস্পৃশ্য বলে যত দূরে সরিয়ে দিচ্ছে, আমি ততই আঁকড়ে ধরছি আমার ধর্ম্মকে।

আমি চুপ করে খেয়ে নিলুম। নরুর মা নিজেই উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করে ফেললেন। তখন বেশ সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল, তিনি ঘরে আলো দিলেন। তারপর আমাকে ঘরে বসিয়ে বললেন,—আজকে শ্রাদ্ধে কি হল বাবা?

আমি আগাগোড়া সব কথা খুলে বল্লুম। তাঁর মুখখানা ভারী গম্ভীর হয়ে গেল; তারপর বললেন,—বলতে দে নন্দ বলতে দে। ভগবান মুখ দেছেন কথা বলতে, আশাটা মিটিয়ে বলে নিক;

নচেৎ ক্ষোভ থেকে যাবে। বললেই তো আমাদের গা পচে যাবে না, শ্রাদ্ধ করতে দিলে না—তাতে কি হয়েছে? নিজে তুই যখন সময় পাবি, তখন করবি শ্রাদ্ধ।

আমি গম্ভীরভাবে বল্লুম,—হ্যাঃ! আবার আমি শ্রাদ্ধ করব?

নরুর মা বাধা দিয়ে বললেন,—অমন কথা বলিস নে পাগল, শ্রাদ্ধ করবি নে তো কি? মানুষ যদি হোস, তবে ওদের দেখিয়ে শ্রাদ্ধ করবি খুব জাঁক-জমক করে।

সেদিন অনেক রাত জেগে ভাবতে লাগলুম। এঁরা যখন আমায় বাপের শ্রাদ্ধ করবার অধিকার দিলেন না, তখন যে সম্পত্তির অধিকার দেবেন, তা তো আমার মনে হয় না।

আমার মনে হল, বাবা কিছুদিন আগে, নীলমণির চরিত্র খারাপ হয়ে যাচ্ছে দেখে, তাঁর মনের ইচ্ছাটা একটা কাগজে লিখেছেন। তাতে লেখা ছিল, যদি তাঁর কোন ছেলে খারাপ পথে যায়, স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে, তবে সে কিছুতেই তাঁর সম্পত্তি পাবার দাবী করতে পারবে না।

সে কাগজখানা তাঁর হাতবাক্সে পড়েছিল। যদিও সেটা নীলমণিকে উল্লেখ করে লেখা হয়েছিল, তবু সেটা খাটছে এখন আমার বেলায়। আমি বুঝলুম, নীলমণি আর রমুবাবু বেশ করে আটঘাট বেঁধে যুদ্ধে নেমেছে। তারা এখন সেই কাগজখানা হস্তগত করেছে নিশ্চয়, সেইজন্যে তারাই রটিয়েছে আমি স্বধর্ম্মত্যাগী, আমি স্খলিত-চরিত্র, তারই বলে বলীয়ান হয়ে তারা যুদ্ধে অগ্রসর হয়েছে।

বাবা কি জানতেন তাঁহার হাতের লেখা নীলমণিকে উদ্দেশ করে বলা সেই কাগজখানা আমারই বিরুদ্ধে বলবৎ প্রমাণ হয়ে দাঁড়াবে?

আমি সকল দিক ভেবে সে রাতটা যেমন তেমন করে কাটিয়ে দিয়ে—পরদিন সকালেই রাজা বাহাদুরের কাছে কর্ম্মপ্রার্থী হয়ে পত্র দিলুম। মনে ভাবলুম, বুঝি এই জন্যেই ভগবান ষ্টেশনে তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। এত শীগগির যে তাঁরই কাছে প্রার্থী হয়ে দাঁড়াতে হবে আমায়, তা কখনই ভাবি নি।

২২

কয়েকদিন পরে একদিন সকালে আমি নীলমণির সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বাড়ীতে গেলুম। শুনলুম নীলমণি তখন ঘুমুচ্ছে। মা—শ্রাদ্ধের পরদিনই বাপের বাড়ী চলে গেছেন—এখানে নীলমণির অভিভাবক রমুবাবু। কিন্তু তাঁকে রক্ষক না বলে ভক্ষকও বলা যায়।

আমি বাইরের ঘরের বারাণ্ডায় বসে থাকলুম। শীতের দিনে সকালে রোদটা গায়ে লাগে বড় তৃপ্তিকর হয়ে—হাজার জামা গায়ে থাকলেও তত তৃপ্তিকর ঠেকে না।

বামুনঠাকুর কাছে এসে দাঁড়াল, মৃদুস্বরে বললে,—বড়বাবু! আপনি কি আজ এখানে খাবেন?

আমি হাসিমুখে বল্লুম,—আমার কি এখানে খাবার আর পথ আছে ঠাকুর? বাবার সঙ্গে সঙ্গে এখানকার অধিকারও যে হারিয়ে ফেলেছি আমি, তা কি জাননা?

বিমর্ষমুখে সে বললে,—জেনেছি বড বাবু! আমিও এখানকার কাজ ছেড়ে দেব। ছোটবাবু মদ খান—যাচ্ছে তাই গালাগালি করেন; যাঁর নেমক খেয়েছি—যাঁর ছেলেকে কোলে করে মানুষ করেছি, তিনিই যখন চলে গেলেন, তখন সেই ছেলের কাছে যে জুতো খাব এখন, তা কিছুতেই পারব না। আপনি আমায় রাখবেন?

আমি বল্লুম,—আমি তোমায় কোথায় রাখব? আমার কি আছে কিছু? নিজেকেই এখন বোধ হয় চাকরী করে খেতে হবে—তোমায় রাখব কি করে?

সে চলে গেল। উপর হতে নীলমণির গালাগালি শোনা যাচ্ছিল—চাকরটাকে সে খুব গালাগালি কচ্ছিল।

খানিকক্ষণ পরে সে নেমে এল; হঠাৎ আমায় দেখেই তার মুখখানার ভাব বদলে গেল। সে চলে যায় দেখে আমি বল্লুম—দাঁড়াও নীলমণি! কথা আছে তোমার সঙ্গে—।

হঠাৎ মুখখানা ফিরিয়ে লাল হয়ে সে বলে উঠল,—আমার সঙ্গে কথা আছে,—তোমার?

আমি তার সে ভাব দেখেও দমে গেলুম না। বল্লুম,—হ্যাঁ, আমার।

সামনের বেঞ্চটায় রোদের দিকে পিছন ফিরে সে বসে পড়ল—আমার মুখের পানে দৃষ্টি স্থির রেখে বললে,—বল, কি কথা আছে? বেশীক্ষণ দেরী করতে পারব না আমি।

আমি বল্লুম,—দেরী করাব না। আমার

বিষয়—যা আমি ন্যায়ানুসারে—ধর্মানুসারে পাবার দাবী করতে পারি, তার কি ব্যবস্থা করছ?

মুখখানা খুব গম্ভীর করে নীলমণি বললে,—তুমি পাবে?

আমিও তেমনি গম্ভীরমুখে বল্লুম,—হ্যাঁ—আমিই পাব।

নীলমণি বললে,—শ্রাদ্ধ করবার অধিকারী হতে পারলে না, বিষয় পাবার অধিকার স্থাপন করতে এসেছ—একটুও লজ্জা হচ্ছে না তোমার?

আমি ধীরভাবে বল্লুম,—লজ্জা অনেকদিন ছেড়ে গেছে আমায়—তা তো জানতেই পারছ। অনর্থক কথা কাটাকাটি করা ভালোবাসিনে আমি, স্পষ্ট যা বলে দাও।

নীলমণি ভজনরামকে ডেকে বললে,—মামাবাবু আর মণিবাবুকে বোলাও জলদি।

দেখলুম, সে যেন হয়েছে সুভদ্রা—তার ডাইনে আছেন রমুবাবু জগন্নাথ হয়ে, বাঁয়ে আছেন মণি মাষ্টার বলরাম হয়ে। যোগ্যরূপে পূজো খেয়ে খেয়ে জগন্নাথ বলরামের পেট বেজায় বড় হয়ে গেছে।

বিলুপ্তপ্রায় গোঁফে তা দিতে দিতে মণি মাষ্টার এসে দাঁড়ালে, পেছনে পেছনে জগন্নাথ-দেবও কপালে হাত বুলাতে বুলাতে এসে হাজির হলেন।

মণি মাষ্টার বললে,—কি হে নীলমণি, ব্যাপারখানা কি?

দেখলুম, গুরু শিষ্য সম্পর্ক উঠে গেছে—আজকাল এরা সখের ইয়ারে পরিণত হয়েছে।

নীলমণি বললে,—ইনি এখন দাবী করতে এসেছেন আমার সম্পত্তি, বোঝ মাষ্টার, একবার; কোন্ সেন্স নিয়ে যে নিজের রাইট প্রতিপন্ন করতে এসেছে, আমি ভাবছি কেবল তাই।

রমুবাবু গলার মধ্যে একটা অব্যক্ত শব্দ করে, গোল চোখ দুটো বিস্ফারিত করে বললেন,—বাস্তবিক, সত্য নাকি?

মণি মাষ্টার গোঁফে আর একবার তা দিয়ে, বিজ্ঞভাবে মাথা দুলিয়ে বললে,—ওহে নন্দ! না বুঝে না সুঝে কোন কাজে ইণ্টারফিয়ার করতে আসতে নেই। এটা তোমার অন্যায় যে—কেন না, তোমার বাবা উইল করে গেছেন যা, তা তুমি নিশ্চয়ই জান বোধ হয়?

আমার মাথার আগুন জ্বলতে লাগল—। হায় হায়! উল্টো চাপ পড়ল কি না শেষ আমারই ঘাড়ে? বাবা লিখলেন নীলমণির বিষয়ে, আমার অদৃষ্টক্রমে সেটা এসে পড়ল আমারই ঘাড়ে।

আমি রুক্ষকণ্ঠে বল্লুম,—কই সে উইল—দেখি একবার।

তারা তিনজনে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করলে, তারপর নীলমণি বললে,—নিয়ে এস তো মামা—আমার হাতবাক্সে রয়েছে সে কাগজখানা।

মামা চলে গেলেন। আমি চুপ করে বসে রইলুম, মণি মাষ্টার যেন নিজের মনে, অথচ আমাকেই উদ্দেশ করে কি সব বলতে লাগল আমি সে সব কথা শুনেও শুনলুম না।

বৃহৎ দেহভারটী নিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে রমুবাবু কাগজখানা নিয়ে এলেন। আমি দেখলুম, বাস্তবিক সেই কাগজখানাই বটে।

নীলমণি আমার সামনে কাগজখানি মেলিয়ে দিয়ে দম্ভের স্বরে বললে,—দেখ,—বিশ্বাস যদি না হয় তোমার।

আমি মলিনমুখে নিশ্বাস ফেলে বল্লুম,—দেখেছি।

মণি মাষ্টার একটু হেসে বেশ মোলায়েমসুরে বললে—তোমার বাপ ছিলেন, প্রফিসিয়েণ্ট ম্যান যাকে বলে তাই; তিনি মুখে কিছু বলতেন না যদিও, লুকিয়ে লুকিয়ে কাজ বেশ গুছিয়ে রাখতেন। সব দিকেই তাঁর দৃষ্টিটা বেশ খেলত। এ উইলই বল আর যাই বল, লিখবার সময় আমাকে ও রমুবাবুকে সাক্ষী রেখেছিলেন। দেখ,—আমাদের নাম সাইন আছে উইটনেস বলে।

তার এই নিরেট মিথ্যেকথাগুলো আমার গায়ে যেন বিষমাখা কাঁটা বিঁধিয়ে দিচ্ছিল। তীব্রভাবে তাই বলে উঠলুম,—সব মিছে কথা তোমার। আমার বাবা যা ছিলেন, তা আমিই জানি; তোমারা কি জানবে? যাই হোক, চাই নে আমি এমন সম্পত্তি, আমার একটা পেট বই তো নয়, যেমন করে পারি চালিয়ে দেব। তোমাদের সম্পত্তি নিয়ে বড়লোক হব না আমি।

কথাগুলো শেষ করে আমি উঠে পড়লুম। পেছনে তাদের তিনজনের বিকট হাসি শুনতে পেলুম, আমি সে দিকে কাণও দিলুম না।

নরুর মা আমার ম্লানমুখ দেখে বললেন,—কিছু হল না বাবা?

আমি বল্লুম, আমি তো জেনেই গিয়েছিলুম মা কিছুই হবে না; তবুও যে অতক্ষণ ধৈর্য্য ধরে বসেছিলুম, এতে আমি নিজেকে নিজে ধন্যবাদ

দিচ্ছি। যাই হোক, রাজা বাহাদুরের পত্রখানা আসবার জন্যে আর কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে এখানে আমাকে, আর পনের কুড়ি দিন পরে আমি জন্মের মত এ গাঁ ছেড়ে চলে যাব। আপনিও তো যাবেন মা?

তিনি বললেন,—যদি বাসা পাওয়া যায় এখুনি, তা হলে যাব; নচেৎ তুই গিয়ে কয়েকদিন কাজ করে বাসা ঠিক করে এসে নিয়ে যাস আমায়। আমি যখন তোকে ছেলে বলেছি নন্দা, আর তুই যখন গালভরে মা বলে ডেকেছিস আমায়, আমার জন্যে কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিলি, অসীম অর্থ থেকেও যখন পথের ভিখারী হলি, তখন তোর কাছেই থাকতে হবে আমায়। তোকে ছেড়ে কোথাও থাকতে পারব না আমি, যখন তুই সম্পূর্ণ নির্ভর করে আমার বুকের তলায় এসে দাঁড়িয়েছিস।

আমার চোখে জল এল—অলক্ষ্যে চোখ মুছে দেখলুম, তিনিও চোখ মুছতে মুছতে রান্নাঘরে চলে গেলেন।

তাঁর মনে জাগছে কেবল সেই হতভাগা ছেলের আর হতভাগী মেয়ের কথা' আমার সঙ্গে সন্তান বলে কথা বলতে বলতে হঠাৎ তাঁর চোখের জল উছলে ওঠে, হঠাৎ যেন মাতৃহৃদয় বুকের আড়ালে লুটিয়ে পড়ে, সে আমি বেশ বুঝতে পাল্লুম। অভাগিনী মা—কেবল জ্বালা সহ্য করতেই এসেছ তুমি সংসারে।

বোধ হয় বার তের দিন পরে, রাজা বাহাদুরের একখানা পত্র পেলুম। তিনি পত্রপাঠ আমায় তাঁর বাংলা দেশের জমীদারীতে ম্যানেজারীপদে নিযুক্ত হতে বলেছেন। বাংলায় তাঁর অনেক জমি ইতস্ততঃ ছড়ান আছে, আমার সেগুলি দেখা-শোনা করতে হবে—আমাকে থাকতে হবে তাঁর বড় মহাল টেওটাতে।

মাকে (আর নরুর মা নামে তাঁকে বিশেষিত করবার দরকার নেই) পত্রখানা পড়িয়ে শুনালুম। মা খুব খুসী হয়ে উঠলেন; বললেন—তবে চল বাবা,—আমরা যাই সেখানে। এই যে তিনি লিখেছেন, সেখানে বাসা আছে।

আমি পত্রখানা সযত্নে রক্ষা করে বল্লুম,—পরশু দিন তবে যাবার সব ঠিক করি মা?

মা বললেন,—হ্যাঁ।

যাত্রার সব আয়োজন ঠিক করে নিলুম। মা তাঁর বড় সাধের ঘর-বাড়ী ফেলে রেখে গাড়ীতে উঠে বসলেন। আমি গাড়ীর সামনে বসলুম। মা একবার মুখটা বাড়িয়ে বাড়ীখানার পানে চাইলেন, চোখ দুটী তাঁর সজল হয়ে এল; তখনি তিনি তা মুছে ফেলে একটু হাসলেন, বললেন,—যার সব গেছে, তার কি সামান্য অস্থায়ী জিনিষ—বড় বাড়ীটার উপরও মায়া হয় নন্দা? বাড়ীটা ছেড়ে চলে যাচ্ছি, সেই মুক্তির আনন্দের মধ্যেও কেমন একটা বিষাদমাখা স্মৃতি এসে পড়েছে। সে স্মৃতি মনে ভাববি তুই—নরুর আর শান্তির, কিন্তু তা নয়। তাদের কথা ভুলবার জন্যেই প্রাণপণ চেষ্টা করছি আমি, তাদের স্মৃতি জাগাতে আর ইচ্ছে নেই আমার। এ স্মৃতি আমার দেব-প্রতিম স্বামীর—যিনি আমায় বলে গিছলেন—এই আমার বাস্তুভিটে, এতে যেন সন্ধ্যা পড়তে একটী দিনও বাদ না যায়; তা আমিও খুব কথা পালন করছি তাঁর। একটী আলো—যা জ্বালাতুম আমি;—যার মলিন একটু রেখার ধারায় সারা বাড়ীখানি সিক্ত হয়ে উঠত সন্ধ্যার সময় মুহূর্ত্তের তরে, তাও আজ একেবারে নিবিয়ে দিয়েই চল্লুম আমি।

আমি বল্লুম,—আপনার আলো পড়বে না বটে মা,—কিন্তু আকাশে যে তারাগুলি ফুটে ওঠে, তার স্নিগ্ধ ধারায় স্নাত হয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে আপনার বাড়ীখানি। আপনার দেওয়া আলোর ক্ষমতা কতটুকু; কতটুকুই বা জ্বলে থাকবার শক্তি আছে তার, কতখানিই বা প্লাবিত করে ফেলতে পারে সেই মৃদুরশ্মি রেখাটুকু? যে আলোর কণামাত্র পেয়ে আপনার হাতের আলো জ্বলে উদ্ভাসিত করে দিত সারা বাড়ীখানা, সেই আলোই জ্বলবে আপনার বাড়ীতে। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন, মা—আপনার ভাববার কোন কারণ নেই।

গাড়ী চলল ষ্টেশনে। মা শুধু চেয়েই রইলেন, আর একটীও কথা বললেন না।

২৩

বাড়ীখানি পেয়েছিলুম বেশ মনের মত; মাসে মাইনেও পেতে লাগলুম একশ' টাকা, বেশ দিনগুলো কেটে যেতে লাগল।

মাস দুইয়েক পরে একবার কলকাতায় আসতে হল আমাকে। সেই সময় একদিন প্রমোদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে তাদের বাড়ী চল্লুম।

তখন সবে সন্ধ্যার তরল অন্ধকারটা খুব চুপি

চুপি আকাশ হতে নেমে আসছে। পথে পথে এর মধ্যেই আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। প্রমোদের বাড়ী হতে হার্মোনিয়ামের মধুর স্বর—ততোধিক মধুর একটী কণ্ঠস্বরের সঙ্গে মিলে কাণে ভেসে আসছে।

তাদের বাড়ীর কাছে এসে দাঁড়ালুম ;—গানটা ভারী সুন্দর লাগছিল, কাণ পেতে খানিকক্ষণ শুনলুম। যখন গানটা থেমে গেল, তখন আমি বাইরের ঘরের দরজায় দাঁড়ালুম।

হঠাৎ দেখেই আমি চমকে উঠলুম! দেখলুম, প্রমোদের স্ত্রী হার্মোনিয়াম বাজিয়ে গান করছে—প্রমোদ টেবিলটার উপর দুই হাতের কনুই রেখে—হাত দুখানার উপর মুখখানা—রেখে বসে আছে। ঘরে অমিয়কান্ত আছে, আর দুই একটী বন্ধুও আছে। কেবল সেখানে নেই রেখা।

আমায় দেখেই অমিয় হঠাৎ চমকে উঠে বললে,—কে ও? তারপর চিনে বললে,—ওঃ, নন্দ বাবু যে! এস এস।

প্রমোদ মহা আনন্দে লাফ দিয়ে উঠে, আমার হাতখানা চেপে ধরলে—বেশ মজার মানুষ তো তুমি নন্দ! মানুষ যেখানে দুদিন থাকে, সেইখানেই কেমন একটা মায়া বসে যায় তার; কিন্তু এমন মানুষ যে তুমি, কতদিন আমাদের কাছে থেকেও এমন ভাবে গা ঢাকা দিলে, যে আমরা মনে ভাবলুম আর বুঝি তোমার দেখা পাওয়া যাবে না। এখান হতে গেছ সেই কার্ত্তিক মাসে—ফিরে এলে এই ফাল্গুন মাসে; ছিলে কোথায় এতদিন, শুনতে পাই কি তা?

আমি বল্লুম,—মনে করে একখানা পত্র দিতে পেরেছিলে?

প্রমোদ মাথা পেতে সেটা নিয়ে বললে,—আমার মোটেই সময় ছিল না,—যা হোক, আসলে যে দেখা দিলে এই সৌভাগ্য। বস এখন শোনা যাক তোমার এই কয়মাসের কথাগুলো।

আমি টেবিলের ধারে একখানা চেয়ার অধিকার করে বল্লুম,—এ কয়মাসের কথা—মাথা আর—মুণ্ডু!

প্রমোদ বললে,—এখন তা হলে দেশেই আছ?

আমি বল্লুম,—দেশে আর কই? সেখানকার সব সম্পর্ক তো উঠিয়ে দিয়েই চলে এসেছি আমি। এখন সম্প্রতি রাজা বিজয়চাঁদ সিংহের জমীদারী টেওটাতে ম্যানেজার হয়ে রয়েছি।

অমিয় বলে উঠল,—রাজা বিজয়চাঁদের? তিনি খুব ভালো লোক। বি, এ, পাশ একসঙ্গেই করেছিলুম আমরা, তারপর তিনি আর পড়েন নি। লোকটী ভারি মিশুক, আর ব্রাহ্মধর্ম্মের খুব উৎসাহদাতা। সে-বার আমাদের ব্রাহ্মমিশনে অনেক টাকা দেছেন তিনি, আরও কত জায়গায় কত টাকা দিচ্ছেন, তার ঠিক নেই। আমার সঙ্গে তাঁর ভারী বন্ধুত্ব আছে।

কথাটা শেষ করেই সে আর একটী বন্ধুর পানে তাকিয়ে বললে,—দেখেছ কুমুদ! কেমন সুন্দর চেহারা তাঁর? আর তাঁর এই নতুন স্ত্রীটিকে দেখেছ? মাইরি—এমন আইডিয়াল নেচার—তেমনি বিউটি আমি যে কখনও দেখেছি, তা বোধ হয় না। তেমনি সুন্দর গানও গায়——

কুমুদ মাথা নেড়ে উত্তর দিলে,—না—তবে আসছে বছরে বোধ হয় দেখতে পাব; কারণ রাজা বাহাদুর পুজোর দিকে নাকি আসবেন এ দেশে।

আমি তাহার সে সব কথায় কান না দিয়ে বল্লুম,—রেখা কোথায়?

প্রমোদ বিকৃত মুখে উত্তর দিলে,—বাস্তবিক ভাই নন্দ! বলব কি, তাকে নিয়ে ভারি বিপন্ন হয়ে পড়েছি আমি। তাকে কিছুতেই যদি আনতে পারি এ দিকে। দেখ গে যাও, সেই মিটমিটে আলোকে, সেই ঘরটাতে বসে আছে যেন জুজুবুড়িটী। এদিকে বেশ কাজকর্ম্ম করবে—কথা বলবে, যেই বলব চল সমাজে যাই—অমনি যে কি হয়ে যাবে ঠিক নেই। অমিয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবার কথা যেইমাত্র বলেছি, আর সে কি কান্না—যদি দেখতে, অবাক হয়ে যেতে একবারে; আরে গেল যা, আমরা চেষ্টা করছি যাতে ভালো হয় তার, সুখী হয় সে, তা না; সে বুঝছে সম্পূর্ণ উল্টো। আমরা যেন হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিতে যাচ্ছি, এমন ভাব করে—যেন আমাদের শত্রু ভেবেই খুব তফাতে থাকছে সে। এই খানিক আগে, বেশ বসেছিল এখানে, নিজের মনে বেশ হার্মোনিয়াম বাজাচ্ছিল, যেই আমি নিয়ে এসেছি বন্ধুদের, সেই যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল। অমিয় তার কাছে চেয়ারখানা সরিয়ে নিয়ে যেমন বসতে গেছে, আর বলব কি ভাই! এমনভাবে ছিটকে পড়ে উঠে গেল, যে লজ্জায় যেন মাথা কাটা গেল আমার। জ্যোতি এত করে বুঝাচ্ছে, শিখাতে যাচ্ছে, কিছুতেই তার শিক্ষা যদি গ্রহণ করে।

প্রমোদের স্ত্রীর নাম যে জ্যোতি, তা আমি জানতুম না। তিনি আমার পানে চেয়ে হাসিমুখে

বললেন,—এসো ঠাকুরপো। আমি তোমায় দেখাতে নিয়ে যেতে রাজি আছি। দেখবেখন, সে পেঁচার মত চুপটী করে বসে আছে একলাটী ঘরের মধ্যে।

প্রমোদ বললে,—যাওনা নন্দ!—

অগত্যা আমি উঠলুম;—প্রকাণ্ড হলটা পার হয়ে জ্যোতি বললেন,—দেখগে যাও, এই ঘরেই আছে সে বসে।

আমি দরজার উপর দাঁড়িয়ে দেখলুম, ঘরটা বড় অন্ধকার। মুখ ফিরিয়ে বল্লুম,—কই বউদি! ঘরে যে কেউ আছে, তা তো জানা যাচ্ছে না।

বউদি ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন,—ও যে পেঁচা, তা কি সাধে বলি আমি? মানুষ কি আলো, এ দুটো আদতেই দেখতে পারে না ও; থাকতে ভালবাসে নিরিবিলি একা অন্ধকারের মাঝে। যার কপালে সুখ নেই ঠাকুরপো, কেউ তাকে সুখ দিতে পারে, বল দেখি? ওর কপালে নেই অমন স্বামী, অমন ঘর। অমিয় কেমন ছেলে ভেবে দেখ তো? এম, এ, পাস দিয়ে বেরিয়েছে, কত বড় লোকের সুন্দরী মেয়ে সাধনা করছে তাকে, সে সব ঠেলে ফেলে—শুধু তোমার দাদার খাতিরে অমিয় এই বিধবা মেয়েকে বিয়ে করতে ঝুঁকে পড়েছে। কি রূপ আছে এর—বল তো? তাই তো বলছি—কপালে যার সুখ নেই—কেউ তাকে সুখ দিতে পারে না। তোমার দাদা এমন ভালো ভালো কাপড় জামা এনে দিলেন, পরিয়ে দিতে গেলুম, সে সব কিনা আছড়ে ফেলে বললে,—আমার এই থান কাপড়খানা তোমাদের ও কাপড়ের চেয়ে আমায় মানায় বেশী, এর দাম ওর চেয়ে হাজার গুণে বেশী; এই কথা বলে কিনা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। দেখ তো ঠাকুরপো! লক্ষ্মী ভাইটী আমার! তুমি যদি কোনও রকমে বশে আনতে পার একে। আমরা তো ভাই! হাল ছেড়ে দিইছি একেবারে। তোমার কথা নাকি খুব শোনে; লক্ষ্মী ভাইটী! যদি কায়দায় এনে ফেলতে পার, তবে তোমার বিয়ের ঘটকালি করে দেব আমি।

এই লোভজনক চারটা আমার সামনে ফেলে তিনি চলে গেলেন। আমার মুখে হাসি এল; ভাবলুম—চারটা অন্য ছেলের পক্ষে খুব লোভনীয় হলেও, আমার কাছে যে খুব হেয়জনক—তা বউদি জানেন না।

দরজার উপর দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ কাণ পেতে থাকলুম; মনে হল, ঘরে যেন কার দীর্ঘশ্বাসের শব্দ হচ্ছে। কে যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে—পাছে কেঁদে ওঠে, তাই মুখের মধ্যে আঁচলটাকে ভরে দিয়ে সেই উচ্ছ্বাসটাকে নাসাপথে কতকটা বার করে ফেলছে।

আমি নরমসুরে ডাকলুম,—রেখা—

উত্তর পেলুম না।

এবার ভাবলুম—বোধ হয় তার বউদি সঙ্গে আছেন আমার ভেবে,—তাঁর অতিরিক্ত স্নেহের ভয়েই সে আমার কথারও উত্তর দিচ্ছে না। নচেৎ সে যে আমার ডাক শুনেও এমন চুপ করে অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে বসে থাকবে, তা কিছুতেই বোধ হয় না।

আমি মৃদুসুরে বল্লুম—তোমার বউদি চলে গেছেন রেখা! ঈশ্বরের দিব্যি—আমার স্বর্গগত বাপের দিব্যি, আমি তোমায় নির্য্যাতন করতে আসি নি;—আমায় তোমার আগেকার সেই ছোড়দা বলেই মনে করো।

এবার তার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠের কথা শুনতে পেলুম, সত্যি ছোড়দা—সত্যি কথা বলছ তুমি? তুমি আমার সেই ছোড়দাই আছ, না এদের সঙ্গে মিশে প্রেত হয়ে আমার সাধনা ভঙ্গ করে দিতে এসেছ? আমি তোমার কথা মোটে বিশ্বাস করতে পাচ্ছিনে যে; জগৎকে বিশ্বাস করা আমি একেবারেই ভুলে গেছি যে।

তার গলার সুরটাও এমন করুণ হয়ে গেছল, শুনে আমার বড় ব্যথা বাজতে লাগল। আমি বল্লুম,—তুমি আমায় বিশ্বাস করে—আমার পাশে এসে দাঁড়াও রেখা; মনে ঠিক জেনো—আমি তোমার সেই আগেকার ছোড়দা।

দপ করে আলোটা জ্বলে উঠল। আমি তার উজ্জ্বল আলোতে রেখার পানে তাকিয়ে একেবারে বিস্মিত হয়ে গেলুম। এ কি সেই রেখা, যা'কে আমি কার্ত্তিক মাসে দেখে গেছলুম? তার বড় বড় ভাসা চোখ দুটো কোথায় চলে গেছে,—গাল দুটো শুকিয়ে গেছে—নাকটা খুব বড় দেখাচ্ছে। তার গলার হাড়গুলো এতখানি করে উঁচু হয়ে গেছে—রুক্ষ চুলগুলো মুখের পরে ছড়িয়ে পড়েছে। হাত, পা, মুখ, দেহ সবারই যেন পরিবর্ত্তন ঘটেছে তার। তার চোখের চাহনিটাও বদলে গেছে। সে সরল বিশ্বাসযুক্ত চাউনি আর নেই। সকলের পানে অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে, সেই চাউনিটাই যেন তার এখন নিজস্ব হয়ে গেছে।

রেখা আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল। আমার পা দুখানা জড়িয়ে ধরে নিরাশ্রিতার মতই এমন করে কাঁদতে লাগল, যে আমি কোনমতে নিজেকে থামিয়ে রাখতে পাল্লুম না; আমারও চোখ ফেটে দর দর ধারে জল ঝরে পড়তে লাগল তার পিঠের পরে।

জানালা দিয়ে বসন্তের মৃদুল বাতাস এসে দীপ-শিখাটীকে নাচাতে লাগল। আমার পায়ের তলায় পড়ে অভাগিনী বালিকা রেখা—আমার দৃষ্টি পড়ে আছে—দীপের পানে।

চকিতে মনে হল শান্তির কথা। শান্তি আর রেখাতে কত অন্তর। সে বয়ঃপ্রাপ্তা যুবতী—আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা—উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করেছে, তবু ভালোমন্দ বিচার করতে পারলে না। স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে গৃহত্যাগ করে পাপের পথে চলে গেল। আর রেখা? কি জানে সে, কিসের বয়স তার? কোন সময়ে বিয়ে হয়েছিল তার, স্বামীর কথাই আদতে মনে নেই। সে-ও তো আজকালকার শিক্ষাতেই শিক্ষিতা হয়েছে, বরং শান্তির চেয়ে তার শিক্ষা কত কম; তবু সে জড়িয়ে ধরে আছে সেই কথাটাকে—তার বিয়ে হয়েছিল। স্বামীকে সে দেখেনি জ্ঞান হয়ে, তবু তার সেই ফটোখানার সাহায্যে সে মূর্ত্তি হৃদয়ে এঁকে নেছে সে। তার ভাই ভাজ তাকে দুঃখের হাত হতে মুক্ত করবার জন্যে ব্যাকুল, কিন্তু সে সেই দুঃখকেই পরমশান্তিময় সুখরূপে আলিঙ্গন করে ধরেছে। সে এ দুঃখ হতে পরিত্রাণ পেতে চায় না। যাকে আমরা সুখ বলছি, তাকেই সে ভয়ানক দুঃখ রূপে জ্ঞান করে আত্মহারা হয়ে উঠেছে ভয়ে।

একটা শ্রদ্ধার ভাবে হৃদয় আমার পুরে উঠল; প্রমোদ আর তার স্ত্রীর মূর্ত্তিটা মুহূর্ত্তে আমার চোখে রাক্ষস ও রাক্ষসীরূপে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল। যদিও আমিও তাদের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলুম, কিন্তু আমার সে মত এমন স্থলে দিতে আমি কখনই রাজি ছিলুম না। যে যা নিয়ে সুখী হয়, তাই হোক না কেন? রেখা যদি তার পরলোকগত স্বামীর ছবিটা বুকে এঁকে নিয়ে পবিত্রা তাপসীমূর্ত্তিতে জীবন কাটাতে চায়, তাই থাকুক না সে? তাকে তার ধ্যান ভাঙ্গিয়ে জাগিয়ে তোলার মানে কি?

আমি তার হাতখানা ধরে টেনে তুল্লুম; সে বসে দুই হাতে কেবল তার অজস্র বহমান চোখের ধারা মুছতে লাগল। আলোটা আবার নিভে যাচ্ছিল, আমি সলিতাটা বাড়িয়ে দিলুম; তারপরে রুদ্ধকণ্ঠে ডাকলুম,—রেখা!

সে হঠাৎ বলে উঠল,—ছোড়দা!—আমায় নিয়ে যাবে?

বিস্ময়ে আত্মহারা হয়ে আমি বলে উঠলুম,—কোথায় নিয়ে যাব তোমায়?

রেখা চোখ থেকে হাত সরিয়ে বললে,—তোমার সঙ্গে; যেখানে তুমি থাক, সেইখানে আমিও থাকব। তুমিও তো আমার দাদা, তোমার কাছে থাকতে কিছু আপত্তি নেই আমার, চল ছোড়দা—আমি কিছুতেই এখানে আর থাকব না।

আমি বল্লুম,—তা যে বড় অসম্ভব কথা রেখা!

রেখা হঠাৎ যেন আকাশ হতে পড়ল;—অসম্ভব? কেন তা অসম্ভব হবে ছোড়দা?

আমি গম্ভীরভাবে বল্লুম,—তোমার দাদা না বললে, তুমি কোনমতেই যেতে পারবে না কোথাও—আমি তোমায় নিয়ে যাব কি করে?

উঃ! তা হলে আমায় এমনি যন্ত্রণাই সহ্য করতে হবে? ওগো মা গো!—তুমি কোথায় আছ—আমায় ডেকে নাও মা! আর যে আমি এ যন্ত্রণা সহ্য করতে পাচ্ছিনে।

বলতে বলতে বালিকা দুই হাতে মুখ ঢেকে সেখানে লুটিয়ে পড়ল। আমার কথা শুনে তার প্রাণটা যেমন আশার আনন্দে ভরে উঠেছিল, তেমনি নিরাশায় সে যেন দমে গেল একেবারে!

আমি তার পাশে বসে, তার হাত দুখানা মুখ হতে সরিয়ে দিয়ে আমার রুমালে তার চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে মৃদুকণ্ঠে বল্লুম,—লক্ষ্মী দিদি আমার—অত অধীর হচ্ছ কেন? আমি এখন মাসখানেক তো এখানেই থাকব। ওই তো হ্যারিসন রোডে রাজার বাড়ীতে রয়েছি আমি, বেশী দূর তো নয়। রোজ দুবেলা এসে তোমায় দেখে যাব। যদি প্রমোদ আরও বেশী বাড়াবাড়ি কিছু করে, তোমায় নিয়ে পালিয়ে যাব; সেখান হতে কখনো প্রমোদ তোমায় আনতে পারবে না।

রেখা উঠে বসল, তার মুখখানা দীপ্ত হয়ে উঠল;—সত্যি ছোড়দা,—সত্যি আমায় নিয়ে পালাবে? তবে এখনি নিয়ে চল না কেন?

আমি বল্লুম,—এখনও তো এরা অত্যাচার করে নি তোমার পরে দিদি!

অভিমানে রেখার ঠোঁট দুখানা ফুলে উঠল;—না! অত্যাচার করে নি বৈ কি? যদি তুমি সব দেখতে ছোড়দা, একদণ্ড আর আমায় রাখতে না

এখানে। আমি বিধবা—সে জ্ঞান কি আমার নেই নাকি! আমাকে ওরা ভালো কাপড়, জামা গয়না পরাতে আসে—জুতো পরাতে আসে। বল তো ছোড়দা! যে গরুর চামড়ার জুতো, ছুঁলে পরে নাইতে হয় আমাদের, সেই জুতো পায়ে দিতে পারি আমি? সেই সব পরিনি বলে কত কথা। দাদা বাড়ী আসতেই বউদি সব বলে দিলেন; দাদা একেবারে লাফিয়ে এলেন, যাচ্ছে তাই গালাগালি দিয়ে শেষ বললেন,—তোকে আমি মুসলমান কুকের হাতের রান্না মুরগী খাওয়াব, তবে আমার নাম প্রমোদ।—

বলতে বলতে রেখা উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে উঠল—বলত ছোড়দা! আমি বিধবা—আমাকে কিনা এই সব বলে, এতে কি থাকতে ইচ্ছে করে এখানে আর? আবার কে একটা লোক, কি নামটা তার—অমিয় না গমিয়—তাকে বলে আমায় বিয়ে করতে হবে? সে লোকটা রোজ যখন তখন আসে এ বাড়ীতে। আমার দেখে দেখে কেবল বুক কাঁপছে ছোড়দা। বেশীদিন যদি থাকতে হয় এখানে আমায়, আর এ সব কথা যদি শুনতে হয় আমাকে, নিশ্চয়ই আমি বিষ খেয়ে মরব। আমি এক শিশি বিষ লুকিয়ে রেখেছি—যদি কিছু বেগতিক দেখি, খেয়ে মরে যাব। মার কাছে—বাবার কাছে গিয়ে থাকব। সেখানে তো আর এ সব নেই।

আমি স্তম্ভিত হয়ে বল্লুম,—ছি রেখা! আত্মহত্যার কথা মুখেও এনো না। তুমি তো তোমার বাবার কাছে অনেক বই পড়েছ, জান তো আত্মহত্যা মহাপাপ। চিরকাল আত্মাটা তোমার কেঁদে কেঁদে বেড়াবে।

রেখা বললে,—ধর্ম্মরক্ষা করতে আত্মহত্যায় কখনও পাপ নেই ছোড়দা। আর যদিও পাপ হয়, হবে তা, তার আর কি করব আমি? বেঁচে থেকে তবু মুরগী খেতে, কি জুতো পায় দিতে পারব না আমি। বেশ তো মরে গিয়ে ভূত হব, তখন দাদাকে আর বউদিকে আচ্ছা করে মজা দেখাব আমি। দুইজনেরই ঘাড় মটকে দেব। সে ভূতের ব্যারাম, ভূত ভিন্ন তো কেউ ভাল করতে পারবে না; ডাক্তার দেখালে কি হবে? আমার যখন ইচ্ছে হবে ভালো করে দেব।

তার কথা শুনে হাসিও আসছিল—দুঃখও হচ্ছিল। বল্লুম,—দেখ রেখা! যাই ভাব না কেন তুমি ও সব কোন কাজের কথা নয়! ভূত হওয়া তো মুখের কথা নয়, যে মনে করলেই ভূত হবে। আমি যা বলছি শোনো; খবরদার বিষ খেওনা যেন। আমি বলছি বেশী বেগতিক দেখলে, আমি নিশ্চয়ই নিয়ে পালাব তোমায়।

রেখা সন্দেহের ভাবে বললে,—তাতেও যদি দাদা ধরে আনে?

আমি প্রবোধ দিয়ে বল্লুম,—ধরে আনবে কোথা হতে? আমরা কি এ মুল্লুকে থাকব যে ধরে আনবে? আমি তোমায় নিয়ে এমন জায়গায় যাব, তোমার দাদা সারাজীবন খোঁজ করলেও সেখানে সন্ধান পাবেন না আমাদের। তুমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে থাক।

আমি উঠলুম।

রেখা ব্যগ্রভাবে বললে,—রোজ আসবে তো ছোড়দা?

আমি বল্লুম,—হ্যাঁ রোজ আসব আমি।

বিদায় নিয়ে আমি বেরিয়ে গেলুম। বেশ বুঝলুম, আমার কথা শুনে তার অনেকটা ভরসা এসেছে।

কিন্তু আমার যে এখানে কোনও ক্ষমতাই খাটবে না। আমি যে পর—আমার অধিকার কি তাদের পরে? প্রমোদ যদি জোর করে তার বিয়ে দেয়, আমার তাতে বাধা দেবারও অধিকার নেই;—এমন দূরের মানুষ আমি।

নিরাশার ঝড় শুধু আহত করে যেতে লাগল আমার প্রাণটাকে। চোখে শুধু জল আসতে লাগল।

২৪

তারপর হতে রোজই আমি যাওয়া আসা করতে লাগলুম প্রমোদের বাড়ীতে। আমার কথায় রেখা আজকাল বেশ ঠাণ্ডা ভাবে চলছিল দেখে, বউদি আর প্রমোদ ভারী খুসী হয়ে উঠলেন আমার পরে। অমিয় যে কি উপহার দেবে আমায়, তাই ভেবে পাচ্ছিল না। সে আমায় শতশত বার ধন্যবাদ দিতে লাগল। রেখার মত দুর্দ্দান্ত মেয়েকে বশ করা যে যার তার কাজ নয়—তা সে হাজারবার বলতে লাগল। বনের বাঘ বশ করা সহজ, কিন্তু মানুষ বশ করা সহজ নয়।

এমনি করে বেশ কয়েকদিন কেটে গেল,

সেই সময় হঠাৎ আমার জ্বর হয়ে পড়ায়, আমি কয়েকদিন যেতে পাল্লুম না তাদের বাড়ী।

দশ বার দিন পরে আমি যেদিন অন্নপথ্য কল্লুম, সেইদিন মনে ভাবলুম রেখাকে একবার দেখে আসি। বাস্তবিক তার জন্যে প্রাণটা আমার সেই বেঘোর জ্বরের মধ্যেও ছটফট্ করত। জ্বরের ভুলের মধ্যে আমি সহস্রবার বোধ হয় রেখার নাম করে চীৎকার করে উঠতুম; আমি সচেতন হয়ে দেখতুম—কোথায় আমি পড়ে আছি।

এত যে ভালোবেসেছিলুম তাকে, সেটা কেবল তার অনিন্দ্য চরিত্রের জন্যে। তার সরল স্বভাব—আশ্চর্য্য পতিভক্তি আমায় খুব নুইয়ে ফেলেছিল তার পানে। তার নির্ভরতাই আমাকে খুব বেশী রকম আকৃষ্ট করে ফেলেছিল তার দিকে।

সে দিন কিন্তু মোটেই নড়বার মত ক্ষমতা ছিল না আমার। দশ বার দিন পরে—চারটী ভাত পেটে পড়ায়, শরীর যেন আরও বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

সারাদিনটা ঘুম কাটাবার জন্যে নানারকম বেরকমের বই নিয়ে বসে রইলুম। সন্ধ্যার একটু পরেই গিয়ে শুয়ে পড়লুম।

বেশ ঘুম এসেছে আমার—হঠাৎ জেগে উঠলুম চাকরটার চীৎকারে। লোকটা যে দশ বার দিন পরে আজ অন্নপথ্য ক'রে, সারাদিন ঘুমের মায়া কাটিয়ে, এখন একটু শুয়েছে, সে দিকে মুর্খটার আদৌ দৃষ্টি ছিল না।

বিরক্ত হয়ে পাশ ফিরে বল্লুম,—কি রে! চাস কি তুই?

সে একটু থতমত খেয়ে বললে,—আমি চাইনে কিছু ম্যানেজার বাবু! একটী ছোট মেয়ে ডাকছে আপনাকে—

ছোট মেয়ে ডাকছে আমাকে—অতিরিক্ত বিস্ময়ে মনটা ভরে উঠল আমার; বল্লুম,—কতটুকু মেয়ে?

সে হাত দিয়ে দেখালে—এই এতটুকু।

বিরক্ত হয়ে বল্লুম—বয়েস কত হবে?

বয়েসের কথা জিজ্ঞাসা করতেই সে বেচারী বিষম গোলে পড়ে গেল। তাই তো! বয়েস আবার যে বলতে হয়—তা কে জানে? যদি জানত সে, আমি আবার বয়েস তার জিজ্ঞাসা করব, তা হলে বোধ হয় জিজ্ঞাসা করে আসতো তাকে, কত বয়েস তার।

আমি ভেবে দেখলুম, যাদের নিজের বয়েস নিজেরাই হিসেব করে বলতে পারে না;—যাদের বয়েস কত জিজ্ঞাসা করলে, যে পঞ্চাশ বছরের বুড়ো, সে চট করে উত্তর দেবে,—আজ্ঞে, পাঁচ গণ্ডা তিনটে হবে, তারা যে অন্য লোকের বয়সের হিসাব দিতে পারবে—সেটা কিছুতেই হয় না। সে যে দেখিয়েছে,—"এই এত বড়", এটাতেই তার অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গেছে।

সে মাথা চুলকাতে সুরু করেছে দেখে, আমি তার হাত দিয়ে মেপে দেখাবার অনুযায়ী বয়েস ঠিক করে বল্লুম,—বার তের বছর বয়েস হবে কি?

হঠাৎ একটা বিষম দায় হতে উদ্ধার পেয়ে, সে সন্ত্রস্তে বলে উঠল—আজ্ঞে, ঠিক তাই, ওই রকমই হবে।

কে এ মেয়েটী—এই রাত্রে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে! আমি বল্লুম—সে কোথায়?

চাকরটা বললে,—সে মেয়েটী হঠাৎ এসেই বললে,—নন্দবাবু আছেন এখানে? আমি বল্লুম—আছেন। সে বললে—শীগ্‌গির তবে আমাকে নিয়ে চল তাঁর কাছে। আমি বল্লুম—তিনি ঘুমুচ্ছেন; এই কথা শুনে সে খুব কাঁদতে লাগল। আমি দেখলুম, সে ঠক ঠক করে কাঁপছে। তাকে একটা ঘরে বসিয়ে রেখে আপনাকে ডাকতে এসেছি।

তবে কি এ রেখা? সে বই আর কে চেনে আমায়? তবে বুঝি প্রমোদ আজ তার বিয়ে দেবার জন্য চেষ্টা করেছে, তাই সে পালিয়ে এসেছে তার ছোড়দার কাছে। আমি যে বলেছিলুম আমি তাকে রক্ষা করব—সেই কথাটাই মনে জেগে উঠেছে তার।

ব্যস্তভাবে বল্লুম,—চল আমাকে নিয়ে।

চাকরটা আমায় নিয়ে বসবার ঘরে গেল। আমি দেখলুম, রেখা চুপ করে বসে আছে টেবিলটাতে হেলান দিয়ে—তার দেহ ঠক ঠক করে কাঁপছে। আমার জুতোর শব্দ শুনেই সে চমকে ফিরে চাইলে, তার মুখখানা একেবারে সাদা হয়ে গেল; তখনি আমায় চিনতে পেরে, আনন্দে একটা অস্ফুট ধ্বনি করে, লাফিয়ে এসে আমার হাতখানা চেপে ধরলে।

উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত তার মুখখানার পানে চেয়ে আমি বল্লুম,—এ কি রেখা?

আমি পালিয়ে এসেছি ছোড়দা।

তার কথা শুনে আমি বল্লুম,—কেন তুমি পালিয়ে এলে?

রেখা বললে,—দাদা আজ আমার বিয়ে দেবেন, তাই শুনেই আমি পালিয়ে এসেছি। আজ তুমি আমায় না বাঁচালে আর কেউ বাঁচাতে পারবে না। আমি একমনে নারায়ণকে ডাকছি ছোড়দা, আজকের দিনে যদি তিনি আমায় বাঁচাতে পারেন, তবে জানব, তিনি সত্যি—তুমিও তাই জেন ছোড়দা। আর যদি না বাঁচাতে পারেন, তা হলে জানব, দেবতা নেই, ধর্ম্ম নেই। বাবা যে বলে গেছেন দেবতা আছে—স্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্য, সবই আছে, আজ যদি বাঁচি, তবে সে সব বিশ্বাস করব। যাক সে সব কথা ছোড়দা! তুমি এখনি চল আমায় নিয়ে তোমার সেই অজানা দেশে, যেখানে এরা কেউ আমার সন্ধান করতে পারবে না। আমায় লুকিয়ে ফেল ছোড়দা,—তোমার আড়াল দিয়ে লুকিয়ে ফেল আমায়।

আমি যেন কি রকম হয়ে গিয়ে, একখানা চেয়ারে বসে পড়লুম। কি যে বলব তাকে, তা কিছু ভেবে ঠিক করতে পারলুম না।

সেই সময় সেই চাকরটা এসে খবর দিলে, তিন চারজন বাবু একটা মোটরকারে করে এসেছেন, তাঁরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছেন ম্যানেজার বাবু।

রেখা শক্ত করে আমার হাতখানাকে চেপে ধরলে; তার মুখখানা ঠিক শবের মতই হয়ে গেল। আমি দেখলুম, সে এত কাঁপছে, যেন এখনি পড়ে যাবে। আমি বল্লুম,—এত কাঁপছ কেন দিদি? বস—ভয় নেই তোমার—

অস্ফুটস্বরে সে বলে উঠল,—ওই এসেছে দাদা আমায় নিতে। হা' নারায়ণ!—রক্ষা করতে পার লে না আমায়? আমার বিশ্বাসের কি এই প্রতিফল দিলে? ছোড়দা,—ছোড়দা! পায়ে পড়ি তোমার—লুকিয়ে ফেল আমায়, এখানেই কোথাও লুকিয়ে রেখে বলে দাও, রেখা আসে নি।

আমি কথা বলতে যাচ্ছিলুম—হঠাৎ শুনতে পেলুম, সেই ঘরের বারাণ্ডায় প্রমোদ ডাকছে,—নন্দ—

আমার গলা এড়িয়ে গেল; একটী কথা বলতে পাল্লুম না আমি। প্রমোদ অমিয়কে নিয়ে একেবারে ঘরে ঢুকে পড়ল।

আমার পানে তাকিয়ে কর্কশস্বরে প্রমোদ ডাকলে—নন্দ।

অভিভূত হয়ে পড়েছিলুম, প্রথম তার ডাকটা শুনে; এখন তার এই কর্কশ সুরটাই আমায় সচেতন করিয়ে দিলে। আমি তার পানে চেয়ে বল্লুম,—কি বলতে চাও তুমি?

প্রমোদ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে,—কি বলব তোমায়? কিন্তু রেখাকে আশ্রয় দেওয়া তোমার বড় অন্যায় কাজ হচ্ছে। জান তুমি—ও আমার বোন, ওর ভালোমন্দ আমার হাতে। আমি ওর যা করছি, তাতে হাত দিতে আসা ভারি অন্যায় কাজ হয়েছে তোমার।

আমার মধ্যে যে একটা শক্তি ছিল—সেটা হঠাৎ মাথা তুলে দাঁড়াল; আমি বলে উঠলুম,—"তুমি মনে করছ আমি রেখাকে আশ্রয় দিচ্ছি? তোমাদের বাড়ী কি হচ্ছে না হচ্ছে আমি কি জানি তার? এইমাত্র রেখা এসে দাঁড়িয়েছে, বিশ্বাস না হয়, জিজ্ঞাসা করতে পার আমার চাকরকে তুমি। তোমার বোন, তুমি যা খুশী করগে তার, আমায় কেন জড়িয়ে ফেল সব তার মধ্যে।"

প্রমোদ রেখার পানে তাকিয়ে বললে,—চলে আয় রেখা।

রেখা ম্লানভাবে আমার পানে চাইল। উঃ! কি করুণ সে দৃষ্টি তার, আজও যেন আমার বুকে বিঁধে রয়েছে। আমি তখন বল্লুম তাকে, "যাও দিদি,—যাও তোমার দাদার সঙ্গে। মিছে আমার কাছে এসেছ, আমার এমন কোনও শক্তি নেই, যা দিয়ে রক্ষা করতে পারি তোমায়। তোমার নারায়ণ যে, সেও তোমায় রক্ষা করতে পারলে না। যাও দিদি, মনে করগে নারায়ণ বলে কিছু নেই—দেবতা বা ধর্ম্ম বলে কিছু নেই; যদি থাকত, তবে তোমার ধর্ম্ম অবশ্যই রক্ষা হত।"

প্রমোদ আবার ডাকলে,—আয় বলছি।

ছায়ার মত রেখা তার অনুবর্ত্তিনী হল; আর একটা কথাও তার মুখে ফুটল না! শুধু তার যাবার সময় তার চোখের দুটি ফোঁটা জল পড়ল সাদা মার্ব্বেল পাথরের মেঝের উপরে; আমি তাকিয়ে রইলুম সেই দু ফোঁটা চোখের জলের পানে।

এই দু' ফোঁটা জল যে লক্ষ হীরার দামের চেয়েও বেশী। এ যে বড় পবিত্র—বড় মধুময়। সতীর চোখের জল জলতে লাগল—দপ দপ করে।

আমার প্রাণের মধ্যে কাঁদছিল; অতি কষ্টে নিজেকে দমন করে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লুম।

কোথায় দেবতা? দেবতা কি আছে? ও-সব

মিছে কথা, সব মিছে কথা। কে দেবতার উপরে বিশ্বাস রাখে? এই কথা শুনেও কি বিশ্বাস রাখতে চাও? রাখতে হয় তোমরা রাখ—কিন্তু আমি জন্মের মত বিশ্বাস আজ হারালুম।

ঘুমালুম বটে, কিন্তু সে বড় দুঃস্বপ্ন-বিজড়িত তন্দ্রা মাত্র। ভোরের আলোটা ধরণীর গায় ছড়িয়ে পড়বামাত্র, আমি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লুম। মুখ ধুয়ে তাড়'তাড়ি এক কাপ চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

যাব কোথায়? রেখাদের বাড়ী যাব কি? প্রমোদের কঠোর কথা, তেমনি কঠোর তখনকার মুখখানা মনে পড়লে যেতে ইচ্ছে হয় না আর; কিন্তু রেখা যে টানছে আমাকে। না! যেতেই হবে আমায়।

একখানা গাড়ী ভাড়া করে চল্লুম, তাদের বাড়ী হতে খানিকটা দূরে গাড়ী হতে নেবে, ভাড়া মিটিয়ে হেঁটে চল্লুম।

বিয়ে-বাড়ী এত নীরব কেন? বাইরে ফুলের মালা—রঙ্গিন ফানুষ, দেবদারু-পাতায় বিমণ্ডিত হয়ে দুলছে; কিন্তু কই! মানুষের সাড়াশব্দ তো পাচ্ছি নে কিছু? এতক্ষণ বাড়ী আনন্দ-কলরবে মুখরিত হবে—কিছুই যে নেই!

দরজা খোলাই ছিল; আস্তে আস্তে আমি বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লুম। ঝি কিম্বা চাকরগুলোকে পর্য্যন্ত দেখতে পেলুম না।

হলটা পেরিয়ে আসতেই হঠাৎ একটা দৃশ্য ভেসে উঠল আমার চোখে;—একি ভীষণ দৃশ্য? যা আমি আশাও করি নি, তাই আমায় দেখতে হল?

উঠানে বসে আছে গম্ভীরমুখে প্রমোদ—তার কোলে মাথা রেখে পড়ে আছে রেখা। তার চোখ দুটি মুদে আছে, যেন সে বড় ক্লেশে শান্তি পেয়ে, অঘোর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার পায়ের কাছে—তার উপরে মাথা রেখে পড়ে আছেন বউদি। স্থানটী এমন গম্ভীর আর পবিত্র, যে সেখানে পা দিতে ভয় লাগে, পাছে কোলাহল জেগে উঠে—সেখানকার গম্ভীরতা মাটি করে দেয়; পাছে কোন অপবিত্রতা এসে পড়ে—পবিত্রতাকে কলঙ্কিত করে ফেলে।

আমি নির্ব্বাক হয়ে চেয়ে রইলুম। একটা কথাও ফুটল না আমার মুখে—আর এক পা এগুতেও পাল্লুম না।

প্রমোদ চেয়ে আছে রেখার মুখপানে, তার চোখ দিয়ে এক একবার হুহু করে জল ঝরে পড়ছে রেখার দীপ্ত জ্যোতির্ম্ময় মুখখানার পরে, আবার তখনি তার চোখের জল একেবারে শুকিয়ে যাচ্ছিল।

দাসী আস্তে আস্তে পা টিপে হলে ঢুকতেই, আমায় দেখে চমকে উঠল,—নন্দবাবু!

তার কথাটা ধ্যানমগ্ন প্রমোদের কানে গিয়ে বাজল; সে মুখ তুলেই আমায় দেখতে পেলে—এস, নন্দ এস। তোমার আশ্রিতাকে তোমার আশ্রয় হতে ছিনিয়ে এনে সঁপে দিলুম ভগবানের কোলে। দেখ নন্দ! সোনার প্রতিমা ঘুমিয়ে পড়েছে—এ ঘুম ভাঙ্গাতে আর পারব না আমি।

আমি এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালুম। রেখার চিরঘুমন্ত শান্ত মুখখানার পানে চেয়ে আমি আর চোখের জল রাখতে পাল্লুম না।

সস্নেহে বোনটীর গায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে প্রমোদ রুদ্ধকণ্ঠে বললে,—বড় জ্বালাতন করেছি নন্দ—একদিনও অভাগিনী আমার তাড়নায়, মা বাপ মারা যাওয়া পর্য্যন্ত সুখে থাকতে পারে নি। আমি যে তারই সুখের জন্যে—তাকে সাজাতে গেছি, তার আবার বিয়ে দিতে এগিয়েছি, তা সে বুঝলে না। সে বরাবর যেমন জেনেছিল—আমি শুধু নির্য্যাতন করতেই আছি তাকে, তাই জেনে গেছে। আজ শান্ত হয়েছে মার কোলে গিয়ে। মা বাপের বড় আদরের মেয়ে ছিল কিনা—তাই তাঁরা ডেকে নিলেন তাঁকে, এই পাপিষ্ঠের হাত হতে উদ্ধার করবার জন্যে। আমি বিয়ের সব ঠিক করে, হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলুম এখানে, টলতে টলতে সে এল—তারপরে হঠাৎ পড়ে গেল—আর সাড়া পেলুম না, আমার হাত হতে উদ্ধার পেয়ে গেল। রেখা—রেখা—জানলিনে তুই, জেনে গেলিনে বোন, তোর মুখে হাসি ফোটাবার জন্যেই যে তোকে চোখের জলে ভাসিয়েছি আমি।

সে বোনের মুখের উপর নত হয়ে পড়ল; অজস্র চুম্বনে রেখার মৃত্যুম্লানান্ধকারযুক্ত শীতল ললাট ছেয়ে ফেলে দিলে। বউদি তেমনি ভাবেই পড়ে রইলেন। যদিও তিনি মনের কথা মুখে প্রকাশ করছিলেন না, তবু তাঁর গভীর বেদনা তাঁর নীরবতাই ব্যক্ত করে দিচ্ছিল।

আমি শ্রান্তভাবে রেখার পাশে বসে পড়লুম।

২৫

কত দিন চলে গেছে; কিন্তু রেখার সে স্মৃতিটা কিছুতেই ভুলতে পারি নি আমি। ধর্ম্মরক্ষার জন্যে ছোট একটি মেয়ের যে এতটা বল হতে পারে—এতটা কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে, তা আমি জানতুম না। শান্তি আমার সকল মেয়ে-জাতের উপর যে বিজাতীয় ঘৃণাটা উদ্দীপ্ত করে দিয়ে গিছল, রেখা সে ঘৃণা মুছিয়ে দিয়ে গেল। মেয়েদের মধ্যেও এমন মেয়ে ঢের আছে, মনে করেও আমার মনটা ঠাণ্ডা হল।

কিন্তু দেবতা বা ধর্ম্ম যে নেই—এ বিশ্বাসটা আমার মনে দৃঢ়মূল করে দিয়ে গেল সে। ফলে এই হল, আগে যে আমি কপট নাস্তিক সেজে বন্ধুদের কাছে বাহাদুরী নিতুম, এখন আমি মনে প্রাণে সেই নাস্তিক হয়ে পড়লুম। ভগবান বলে কেউ আছে, পরকাল বলে একটা যে স্বতন্ত্র স্থান আছে, তা একেবারেই ভুলে গেলুম আমি।

রাজা বাহাদুর আজ মাস দুই তিন কলকাতায় ফিরে এসেছেন, তিনি এই সময় তাঁর জমীদারী দেখতে এলেন। তিনদিন থাকলেন তিনি এখানে—তারপর চলে গেলেন। যাওয়ার সময় আমায় বারবার বলে গেলেন, তাঁর প্রাসাদে সম্প্রতি তাঁর বন্ধুদের একটি ভোজ দেবেন তিনি, আমি যেন হাজির হই সে সময়। অবশ্য তাঁর চাকররূপে নয়—বন্ধুরূপে।

মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে ঠিক ভোজের দিনই হাজির হলুম কলকাতায়, পুরো দেড় কি দুই বছর পরে কলকাতায় ফিরলুম আমি। রেখা যেদিন আত্মহত্যা করে, সেইদিনই বিকেলে আমি চলে গিছলুম, আর ফিরিনি কলকাতায়।

সেই ঘরটায় ঢুকেই আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল; মনে হল এইখানে সতীর চোখের দু'ফোঁটা জল পড়ে জলছিল ঠিক দু'টী মুক্তার মতই। এখনও যেন রেখা তার বিকীর্ণ হয়ে উঠছে, যদিও সে দু' ফোঁটা জল মিলিয়ে গেছে মেঝে হতে।

ঘরখানি বন্ধু-বান্ধবে ভরে গেছে। বড় গোলাকার টেবিলটার উপর গ্লাস ও ব্র্যাণ্ডীর বোতল শোভা পাচ্ছে। রাজা বাহাদুর যে মদ খেতেন, তা আমি জানতুম না; আজ তাঁর মুখে মদের গন্ধ পেয়ে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম।

দেখলুম, অমিয়ও নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছে। আমায় দেখে সে একেবারে লাফিয়ে উঠল, মহা অভ্যর্থনা করে চেয়ারে বসিয়ে, এক গ্লাস ব্রাণ্ডী ঢেলে আমার হাতে দিয়ে বললে,—রাজা বাহাদুরের আর মহারাণীর বিবাহের নিমন্ত্রণ পেয়েছি আজ আমরা,—তাঁদের হেলথের জন্যে বিনা বাক্যব্যয়ে গ্লাসটা কাবার করে ফেল তো বন্ধু!

আমি মহাবিপদে পড়ে গেলুম। যা জীবনে খাই নি, আজ যে সেটা কি করে খাব, তাই ভেবে ঠিক করতে পাচ্ছিলুম না আমি। আস্তে আস্তে গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বল্লুম,—আমায় মাপ করতে হবে অমিয় বাবু। রাজারাণীর হেলথ কামনা আমি সাদা চোখেই করছি, রাঙা চোখে না হয় নাই কল্লুম।

অমিয় বলে উঠল,—আরে ছিঃ! তাও কি হয় কখনও? তা হলে, এই যে এতগুলি শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক বসে আছেন, সবাই তোমার ভাবি নিন্দে করবেন।

আমি বল্লুম,—নিন্দে ঢের সহ্য করেছি অমিয় বাবু! না হয় আর একটু নিন্দেই সহ্য করব,—তাতে কিছু আসবে যাবে না আর। আপনি গ্লাসটা কাবার করুন।

রাজা বাহাদুর বললেন,—তা হবে না নন্দ বাবু, আপনাকে খেতেই হবে—আমি আপনাকে জোর করে খাওয়াব।

অমিয় বললে,—নন্দ বাবু আর সব রকমে ভালো, কিন্তু যত গোল বাধান যত সব সেকেলে মত নিয়ে। পাপ—পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম বেছে চলবে সেকেলে বুড়োরা—আমরা বাছব কেন? কবে মরব—ঠিক নেই তার, বেঁচে যে কদিন থাকা যায়, স্ফূর্ত্তি করে নেওয়া যাক; পেঁচার মত জীবন কাটাতে আমি একেবারেই নারাজ!

আমাদের দেশে একটা প্রবাদ কথা আছে,—"দিন আসে না ক্ষণ আসে।" আমার পক্ষেও খেটে গেল ঠিক সেটা। সকালে আজ ঘুম হতে উঠেছি যে কার মুখ দেখে, তা জানিনে। কেমন একটা দুর্ব্বলতা এসে আমায় ছেয়ে ফেললে, ভাবলুম,—সকলেই তো খায়, খেয়ে দেখি না কেন একবার, দোষ কি?

আমার মনের মধ্যে কে যেন আর্ত্তনাদ ছেড়ে কেঁদে উঠতে চাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে, আমি জোর করে পরিপূর্ণ গ্লাসটা শূন্য করে ফেল্লুম এক নিঃশ্বাসে।

এ কি নরকের জ্বালা? এ কি অব্যক্ত যন্ত্রণায়

বুক আমার ভরে উঠল? আমি কোথায়—স্বর্গে না নরকে?

আজ যেন স্বর্গ ও নরকের ছবিটা আবার ভেসে উঠল আমার মনে। মনে হল, আমি ছিলুম এতদিন নিষ্কলঙ্ক ভাবে, জগতের কোন পাপ আমায় স্পর্শ করতে পারে নি যেখানে; আজ আমি একেবারে সেখান হতে খসে পড়লুম নরকের মাঝে।

ওদিকে তখন মহা গণ্ডগোল বেধে গেছে। কয়েকটী বন্ধু মহা তর্ক লাগিয়ে দেছেন; চীৎকারের চোটে হলটা যেন ভেঙ্গে পড়বার মত হয়ে উঠেছে।

রাজা বাহাদুর বললেন,—ব্যাপার কি?

একজন সদর্পে বলে উঠলেন,—এস বন্ধু! তুমিই মীমাংসা করে দাও আমাদের ঝগড়াটা। আমি কত কষ্টে মার্শেলিস অধিকার করেছি—এখন ইনি বলছেন, আমি করেছি। আমার পক্ষে এই দুজন সেনাপতি দাঁড়ালেন দেখে—ইনি এখন থতমত খেয়ে আস্তে আস্তে বলছেন,—আর যা হোক তা হোক, কেউ জানতে যেন না পারে; আমি তোমায় পাঁচলাখ টাকা দিচ্ছি, নিয়ে আমার মাথায় এই জয়কিরীটটা বসিয়ে দিয়ে যাও।

রাজা বাহাদুরের মুখখানা হাসিতে ভরে উঠল; খুব কষ্টে হাসিটা সামলে বললেন,—বটে? তা পাঁচ লাখ টাকাও তো বড় কম নয়—ছেড়ে দাও না কেন বিজয়ীর গৌরবটা; পাঁচ লাখ টাকা নিয়ে, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।

বন্ধুটী কোমরে হাত দিয়ে, বীরের ভঙ্গীতে গোঁফে তা দিয়ে বললেন,—সে কি মশাই? সামান্য পাঁচ লাখ টাকার বিনিময়ে আমি ছেড়ে দেব এমন গৌরব? এতে দেশ বিদেশে আমার নাম বেরুবে কত? উঃ! নামই তো চায় লোকে, তুচ্ছ টাকা চায় কে?

রাজা বাহাদুর অপর বন্ধুর পানে চেয়ে বললেন,—কই হে! কোথায় তোমার পাঁচ লাখ টাকা—দেখাও দেখি!

সে ব্যক্তি আনন্দে গর্জ্জন করে পকেটে হাত দিলেন; তারপরে হাতখানা উঠিয়ে, চারিদিকে বোকার মত চেয়ে অস্ফুট স্বরে বললেন,—যুদ্ধ করতে করতে পড়ে গেছে কোথায়।

তবে রে শুয়ার, শুধু হাতে এসেছিলে তুমি নাম কিন্‌তে? বলতে বলতে মার্শেলিস বিজয়ী বন্ধু—সেই বন্ধুটীর গলা চেপে ধরলেন। দেখতে দেখতে রীতিমত ফাইট বেধে গেল সেখানে।

আমার তখন কাঁপুনি ধরেছিল। সেই অবস্থায় তাকিয়ে দেখলুম,—মার্শেলিস হয়েছে টেবিলটা। কয়েকজন সেনানী গৌরব-প্রফুল্ল মুখে মহা আরামে চেয়ার ছেড়ে টেবিলে উঠে বসে গাধার মত গলা ছেড়ে গান ধরলেন। একদিকে পটাপট মারামারির শব্দ—কেউ আর তা থামাতে পারে না।

অনেক কষ্টে রাজা বাহাদুরের কর্ম্মচারীরা বিজয়ী বীরকে সরিয়ে আনলে। বীরবর এঁটে কাপড় পরতে পরতে গর্জ্জে বলতে লাগলেন,—শুধু হাতে এসেছে গৌরব কিনতে? কি বলব—আমি যদি মদ না খেতুম আজ, ওখানে ওর বুকে ছোরা বসিয়ে দিতুম। একি! আমার ছোরা কই?

রাজা বাহাদুর তাড়াতাড়ি একটা ছড়ি নিয়ে তাঁর হাতে দিয়ে খুব বিনয়ের সুরে বললেন,—কমাণ্ডার সাহেব,—এই আপনার ছোরা।

বীরবর সেখানা কোমরে গুঁজে রেখে বললেন,—প্যাঙ্ক ইউ।

তিনি যুদ্ধে শ্রান্ত হয়ে একখানা কৌচে বিশ্রাম করতে বসেই নাক ডাকাতে আরম্ভ করলেন। পরাভূত বীর—গায়ে অপমানের ধূলো লেশমাত্র না মেখে, একটা চেয়ারে উঠে বসে চীৎকার করে গান ধরলেন,—গড সেভ আওয়ার নোবল কিং।

তাড়া দিয়ে অমিয় বলে উঠল,—চুপ কর। যারা মদ খেয়ে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারে না—তারা এই ছাই খেতে আসে কেন? নন্দ কেমন বেশ বসে আছে, যদিও নূতন সবে এক গ্লাস খেয়েছে।

কিন্তু আমার তখন নেশা হয়ে এসেছিল। ব্যাপারগুলো দেখতে দেখতে কখন যে আমি ঘুমিয়ে পড়লুম, তা জানিনে।

যখন ঘুম ভাঙ্গল—তখন হঠাৎ আমি চমকে উঠলুম। আমার মাথার মধ্যে তখনও যেন ঘুরছিল; তারই বলে আমায় আমি যেন কোন অজ্ঞাত স্বপ্নরাজ্যে এনে ফেললুম। সে রাজ্যে যেন শত সহস্র পারিজাত ফুটে উঠেছে, আমি যেন সেই অনুপমেয় অসীম সুগন্ধ-সাগরে সাঁতার দিয়ে বেড়াচ্ছি। সেখানে চাঁদ যেন সকল সময়েই আকাশে ভাসছে, তার অজস্র কিরণধারায় যেন সারা গা খানি আমার ভেসে গেছে।

এ কি স্বপ্ন না সত্য? আমার মনে হল, আমার মাথা যেন কার সুকোমল কোলের পরে ন্যস্ত; তার গরম চোখের জল যেন ঝরে পড়ছে আমার

কপালের পরে। সুষুপ্তির ঘোরে দেখলুম, সেই অজ্ঞাত রাজ্যের রাণী—এসে আমায় কোলে নিয়ে বসে আছে, তারই চোখের জল ঝরে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা করে; তারই অতি মৃদু—অতি কোমল কণ্ঠ যেন ভেসে এল—'কেন তুমি এ ছাই খেলে?—কেন তুমি দেবতার রাজ্য হতে দানবের রাজ্যে চলে এলে? আমি যে অতি দূরে বসেও তোমার পবিত্রতার কথা শুনে আনন্দে স্ফীত হয়ে উঠতুম। কেন তুমি আমায় সে আনন্দ-বিচ্যুত করলে?'

এ স্বরটা যেন আমার প্রাণে প্রাণে বিজড়িত। একি শান্তি? সেই কি তবে এখন আমার এই অজ্ঞাত স্বপ্ন-রাজ্যের আদর্শ রাণী?

হঠাৎ সে ঘুমের আবেশ ছেড়ে গেল আমার, হঠাৎ ধড়ফড় করে উঠে বসলুম আমি।

এ কি? সত্যই যে আমার মাথা কোলে নিয়ে বসেছিল একটী মেয়ে। আমায় উঠতে দেখে সেও সচকিতভাবে উঠে দাঁড়াল, তার মাথার কাপড়টা আরও নামিয়ে দিলে; তার বহুমূল্য কাপড় হতে গোলাপী আটোর গন্ধ নাড়া পেয়ে আরও বেশী করে ছড়িয়ে দিলে নিজেকে।

বিস্ময়ে আত্মহারা-প্রায় চেয়ে রইলুম—সেও তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। আমার মনে হল, সে যেন লুকিয়ে চুরি করতে এসে ধরা পড়ে গেছে, ভয়ে তার নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এসেছে, সে আর যেন পালাতে পথ পাচ্ছে না।

আমি বলে উঠলুম,—শান্তি—

হঠাৎ সে লুটিয়ে পড়ল সেখানে—দুই হাতে আহত বুকখানা তার চেপে ধরে; আর্ত্তকণ্ঠে বলে উঠল,—হ্যাঁ আমি, আমিই বটে। আর পাল্লুম না,—ওগো! আর নিজেকে গোপন করে রাখতে পাল্লুম না, তাই ধরা দিতে এসেছি। খুন করবে আমায়, খুন কর—ওগো আমায় খুন কর তুমি। এ রকম করে নিজেকে ঘৃণিতভাবে বহন করে বেড়ান বড় অসহ্য হয়ে উঠেছে আমার।

আমি যেন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে পড়লুম; কি বলব, কি করব, তা কিছুই ভেবে ঠিক করতে পাল্লুম না।

নিজের চোখকে—নিজের কাণকেও বিশ্বাস করতে পারছিলুম না আমি আর। সত্যিই কি এ শান্তি, না তার ছায়া মাত্র?

আমার মনে ভেসে উঠল আজ তিন বছর আগেকার সেই কথাগুলো, ঘৃণায় যেন হৃদয় আমার ভরে গেল। সেই মরণাহত বৃদ্ধের অস্ফুট গোঙানি যেন কাণে ভেসে এল আমার,—আমি দুই হাতে কাণ চেপে পেছনে সরে এলুম।

শান্তি আমার পানে চাইল—রুদ্ধকণ্ঠে বললে,—কেন তুমি মদ খেলে বল দেখি? তুমি তো জানোই, আজ এদের এখানে মদ খাওয়া হবে, কেন তা জেনে তখনি তুমি চলে গেলে না?

আমি দেখলুম, এখনও আমার উপরে অধিকার যেন তার সম্পূর্ণ, ঠিক তেমনি ভাবেই কথা বলছে সে। আমি উত্তর কল্লুম—আমার কথা ছেড়ে দাও। কিন্তু তুমি কি করলে—সেটা ভেবে দেখেছ কি? আমি পুরুষ, যদি মদ খাই—চরিত্র হারাই, আবার সমাজে স্থান হবে আমার, কিন্তু তোমার—

বাধা দিয়ে শান্তি বলে উঠল,—আমি তো চাইনে আর কিছু। ভুলে চলে এসেছি ঘর ছেড়ে, যখন ট্রেণে উঠলুম তখন জ্ঞান হল; তখন বোধ হয় লক্ষ বার ভুপেনের পায়ে ধরেছি,—ওগো! এখনও অন্ধকার আছে, আমায় নামিয়ে দাও; আমায় চলে যেতে দাও। আমার মা, ভাই, এখনও ঘুমুচ্ছে, আমায় সেই সুখময় স্থানে আবার যেতে দাও। কিন্তু আর যেতে পাল্লুম না, আর সে পবিত্র তীর্থ দেখবার অধিকার হল না আমার। উঃ! কি যন্ত্রণা যে, তা আর কি বলে জানাব তোমায়? না,—না, আমি আর বাঁচতে চাইনে—বাঁচার সাধ আমার মিটে গেছে।

আমি গম্ভীর স্বরে বল্লুম,—তাই বুঝি আমায় বলছ তোমায় খুন করতে। সব হয়েছে আমার তোমাদেরই জন্যে; সমাজচ্যুত হয়েছি, গ্রামচ্যুত হয়েছি, বাপের শ্রাদ্ধ করতে পাল্লুম না; অহিন্দু বলে বাবার অসীম সম্পত্তির পরে অধিকার স্থাপন করতে না পেরে, পরের দাসত্ব করেছি;—প্রভুর অনুমতিতে মদ খেতেও বাধ্য হয়েছি। সবই হয়েছে—বাকি আর কিছুই নেই; এখন কেবল নারীহত্যাটা বাকি—সেইটা করাও এবার, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসিতেও ঝুলি, বাস জীবনটাই শেষ করে ফেলি তোমার জন্যে, কেমন, এই ইচ্ছে তো তোমার?

মর্ম্মপীড়িত হয়ে সজল চোখে শান্তি বললে,—না! আর আমি তোমায় কিছু বলব না। মা কোথায়—দাদা কোথায়?

আমি বল্লুম,—সে খবরে তোমায় আর কোন দরকার নেই। তুমি বিলাসে গা ভাসাবে বলে এসেছ, তাই ভাসিয়েই যাও; আর তোমায় জাগতে

হবে না, আমি তোমার জাগবার পক্ষে সহায়তাও করব না।

শান্তি অধীরভাবে আমার পা দুখানা জড়িয়ে ধরল—অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল,—আমায় হাজার লাথি মার, তবু আমি তোমার পা ছাড়ব না।—সে কথা না শুনে।

আমি শশব্যস্তে বল্লুম—ছাড় শান্তি—পা আমার ছাড়। তুমি রাজার রাণী, আমি তোমার চাকর বই কেউ নই; কেউ যদি দেখে তোমায় আমার ঘরে, এখনি মহা অনর্থ ঘটে যাবে। ছেড়ে দাও —বলছি।

শান্তি তবু ছাড়ল না—আগে বল—

আমি বল্লুম,—তোমার দাদার খোঁজ আমি পাই নি। সে চিরকালের মত যাচ্ছি বলে কোথায় চলে গেছে!

শান্তি বললে,—আমার মা?

আমি বল্লুম,—আমার কাছে।

শান্তি আমার পা ছেড়ে দিয়ে উঠে বসল; একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে,—আমার মা কেমন আছেন?

আমি বল্লুম,—কেমন আছেন তিনি, সেটা নিজে অনুভব করতে পাচ্ছ না? তাঁর বুকে কি আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে এসেছ, তা বুঝতে পাচ্ছ নাকি? জেনে শুনে আর জিজ্ঞাসা করবার কারণ কি শান্তি?

আমার কথাটা বিলক্ষণ তীব্র হয়ে উঠেছিল সন্দেহ নেই। শান্তি মাথা নীচু করে শুধু চোখের জল ফেলতে লাগল। তার চোখের জল দেখে আমার মনটা একবার কোমল হচ্ছিল, আবার একবার খুব সপ্তমে চড়ে উঠেছিল।

খানিকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে উঠল; খুব নরমস্বরে বললে,—আমার কথা যেন বল না আমার মা'কে। আর আমি আসব না তোমার সামনে। তবু একটা কথা বলে দিচ্ছি, সাবধান! তুমি যেন আর মদ খেও না। মদ খাওয়ার ফল জান সবই—তবে কেন ও ছাই খাও? আমার মাথা খাও—

বাধা দিয়ে আমি বল্লুম,—তোমার মাথার আর কি দাম আছে শান্তি? তোমার মাথা তুমি নিজেই খেয়ে বসে আছ যে।

শান্তি আবার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে,—তাই বটে; তবে ঈশ্বরের দিব্যি কর—

আমার মুখে হাসি ফুটে উঠল; ঈশ্বর তুমি কি জাননা শান্তি আমি ঘোর নাস্তিক? ঈশ্বর আমি মোটেই মানি নে।

শান্তি যেন চমকে উঠল, ঈশ্বর মান না? কেন মান না?

আমি বল্লুম,—কেমন করে মানব? ঈশ্বর বলে কিছু কি আছে? ঈশ্বর যে আছে, সেটা সাফ মিছে কথা। ভেবে দেখ, ঈশ্বর যদি থাকত, তবে কখনও সেই রাতে তুমি অমন করে গৃহত্যাগ করতে পারতে না। তা হলে গৃহত্যাগ করবার সঙ্গে সঙ্গেই হয় আকাশে খুব মেঘ করে বাজ পড়ত তোমার মাথায়, নয় তোমার পায়ে সাপে কামড়াত। একটা না একটা বিঘ্ন নিশ্চয়ই ঘটে যেত, যাতে তুমি সেইখানেই মরে যেতে; তোমার পাপের কল্পনাটাও তোমার দেহের সঙ্গে সঙ্গে অবসান হয়ে যেত। যদি দেবতা থাকত—

এবার শান্তি বাধা দিয়ে বললে,—ঈশ্বর আছেন, নিশ্চয়ই আছেন; আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি তা। তুমি বলছ, যখন আমি গৃহত্যাগ করেছি, তখন কেন সে সময় আকাশ ভেঙ্গে বাজ পড়ে নি আমার মাথায়, সাপে কেন কামড়ায় নি আমার পায়? কিন্তু তখনই যদি মরতুম আমি, কেমন করে প্রায়শ্চিত্ত হত আমার পাপ-কল্পনার? আমি যে বিবাহিতা হয়েও অহরহঃ সেই পাপ-কল্পনাকে দোলা দিয়ে জাগিয়ে রেখেছিলুম,—যদিও জানতুম—আমার পক্ষে পরের চিন্তা করা বড় পাপের, তবু আমি ঘুম পাড়াতে পারি নি তাকে; তবু নিয়মিতভাবে তার উপযুক্ত আহার দানে বর্দ্ধিত করে তুলেছিলুম। সে পাপ কল্পনাগুলো কাজে ফলিয়ে দিয়ে, ভগবান তার মধ্যে থেকে সারা দিন রাত যে যন্ত্রণা দিচ্ছেন আমায়, তা আর তুমি জানবে কি? লোকে ভাবছে, আমি বড় সুখী; কিন্তু তা নই। এই আমার উপযুক্ত দণ্ড—এই আমার প্রায়শ্চিত্ত। আমি এতেই বুঝতে পাচ্ছি—ঈশ্বর আছেন; উপযুক্ত যার যখন যা দণ্ড, ঠিক তখন তেমনি দিচ্ছেন তাকে।

আমি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লুম,—যাও এখন তুমি,—রাত অনেক হয়ে গেছে।

আমার পায়ের কাছে একবার মাথা ছুঁইয়ে, সে খুব ধীরভাবে বেরিয়ে গেল।

আমার হৃদয়ের মধ্যে তখন এমন একটা আলোড়ন উপস্থিত হয়েছিল, যার ধাক্কা সামলাতে অনেকক্ষণ লাগল আমার।

শাস্তি আমার কে? সে আমার জীবনসর্ব্বস্ব। বাল্য-নয়নের সামনে সে যে মাধুরী ছড়িয়ে দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল, তিলে তিলে—দিনে দিনে সে মাধুরী আমায় এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছিল যে, আর কোনদিকে চাইবার যো আমার ছিল না। একে যে রূপের নেশা বলবে, তা নয়। রূপের নেশা শুধু চোখের সামনে বিকাশ করে লেগে থাকে, প্রাণের কাছে এগুতে তো সাহস হবে না তার। আমার এ নেশা যে প্রাণটাকে আমার জড়িয়ে ধরেছিল।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস আমার বুক কাঁপিয়ে চলে গেল। বাস্তবিক সে তো আমারই হতে পারত। শুধু আমার একটী কথার উপরে তার ভবিষ্যৎ জীবনটা ন্যস্ত ছিল। সেই তো আমার নামে কলঙ্ক রটল, সেই আমি না হিন্দু, না ব্রাহ্ম, না খৃষ্টান হলুম, সেই তো দেশ হতে চিরকালের মত চলে এলুম; তবে কেন তখন শাস্তিকে গ্রহণ করলুম না? তা হলে তো আজ সে এমন করে পাপের গভীর স্তরে ডুবে যেতে পারত না; বন্ধুদের কাছে ঝি চাকরের কাছে সে রাণীরূপে পরিচিতা হলেও, সে তো রাজার রক্ষিতা বই আর কেউ নয়। রাজা তো তাকে বিয়ে করেন নি!

নরুর কথাটা আজ বহুদিন পরে মনে পড়ল আমার—"দেখ নন্দা,—হাতে করে লক্ষ্মী দিতে চাইলুম তোকে, তুই তা হেলায় পায়ে ঠেললি সামান্য শ্রেণী বিচার করে; কিন্তু এর পর দেখবি কি হারালি তুই, তখন বাস্তবিক চোখে তোর জল আসবে।"

আজ ভেবে দেখলুম সত্যিই তার কথা। তখন আমি বাবার জন্যেই পেছিয়ে গেছলুম; কিন্তু আমি যদি তখন বাবার পায়ে জড়িয়ে ধরে কাঁদতুম—নিশ্চয়ই তিনি আমায় শাস্তিকে বিয়ে করতে অনুমতি দিতেন। আমার নিজের বুদ্ধির দোষেই আমি হারিয়েছি সব। কথায় যে বলে,—"হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে দেয়" আমার হয়েছে বাস্তবিকই তাই। আমি সামান্য কারণে শাস্তির আবেদন অগ্রাহ্য কল্লুম। সে তো আমারই জন্যে আজ দাঁড়িয়েছে এই পথে, এই কথাটা মনে করতেই আমার মনটা করুণায় আর্দ্র হয়ে গেল। আমিই তো তাকে ঠেলে দিয়েছি ফেলে, তাই তো সে ঠিকরে পড়ল এসে এই অসীমাবর্ত্তের মাঝে—যেখানে তাকে অতল জলে অনবরত ঘুরপাকই খেতে হবে; আর আসতে পারবে না সে। তিলার্দ্ধ বিশ্রামের অবকাশ পাবে না। পাপ তাকে আপনার ক্রীতদাসী করে নিতে পারলে শুধু আমারই জন্যে তো। আমি তাকে স্বর্গের দেবী সাজাতে পারতুম, আমিই তাকে নরকের প্রেতিনী সাজালুম।

নিজের উপরে অনর্থক রাগে আমি অধীর হয়ে পড়লুম। শাস্তির অশ্রুধারাসিক্ত মুখখানা আমার বুকের মধ্যে যে প্রলয়াগ্নি জ্বেলে দিয়ে গেল, তার দহনে আমি একেবারে অস্থির হয়ে পড়লুম।

এখনও তো শাস্তিকে সৎ উপদেশ দিয়ে ফিরাতে পারা যায়। এখনও মন তার নরম আছে, এর পরে এমন কঠোর হয়ে যাবে, যে তার কোনও রেখা পড়বে না। এখনও ঈশ্বর-প্রীতিতে ভরা আছে তার বুকখানা, এখনও ফিরিয়ে তাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া যায়, যেখানে পাপের বাতাস প্রবেশ করতে সক্ষম হয় না,—যেখানে বিরাজ করছে কেবল নিরমল শান্তিধারা।

কিন্তু আমারও তা হলে নাস্তিকের বেশ ত্যাগ করতে হবে। মনে না হোক, মুখেও আমায় নিজেকে ঈশ্বর-প্রেমিক বলে ব্যক্ত করতে হবে তার কাছে; আমাকে খুব সাবধান হতে হবে,—তবে যদি কোনও রকমে তাকে ফিরাতে পারি—তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে—হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারি তার মুখে।

২৬

নিজের কর্ম্মস্থলে ফিরে গেলুম। সেখানে আগেকার মতই কাজকর্ম্ম করতে লাগলুম,—মাকে শাস্তির কথা কিছুই বললুম না। ভাবলুম, যদি সময় হয় কখনও, যদি শাস্তি কখনও ফিরতে পারে, তবে একেবারে সঙ্গে করে এনে মায়ের সঙ্গে তার মিলন করিয়ে দেব।

গয়াতে রাজা বাহাদুরের বিস্তৃত জমীদারী ছিল। এই সময়ে সেখানকার জমী নিয়ে গোলমাল বাধ্‌ল, রাজা বাহাদুর আমায় লিখলেন,—আমি যেন পত্রপাঠ সেখানে যাই—একটুও দেরী করি নে।

পত্রপাঠ আমি প্রস্তুত হয়ে নিলুম। আমি গয়ায় যাচ্ছি শুনে, মা বিমর্ষভাবে বললেন,—আমারও যেতে বড় ইচ্ছে কচ্ছে বাবা। গদাধরের পাদপদ্মে মাথাটা একবার নুইয়ে আসতে পারলে, মনটা আমার বড় ঠাণ্ডা হয়। তাঁর শ্রাদ্ধ হয়েছে ওই সব কুলাঙ্গার ছেলেমেয়ের দ্বারা, আমি নিজে একবার পবিত্রভাবে শ্রাদ্ধটা করব, বড় ইচ্ছে আমার।

আমি তখনি রাজি হয়ে বল্লুম,—বেশ তো মা,—চলুন না। দুই মা ছেলেতে যাব—আপনি আপনার স্বামীর শ্রাদ্ধ করবেন, সে তো খুব ভালো কথাই; আমিও আমার বাপের শ্রাদ্ধ করে আসব সেখানে।

বিস্ময়ে মা বললেন,—তুই করবি?

আমি হেসে বল্লুম,—কেন মা,—নাস্তিকের কি বাবা মা থাকে না? আমি নিজের জন্যে নিজে অবিশ্বাস করব, কিন্তু বাপ মার জন্যে মাথা নোয়াতে হবে বাধ্য হয়ে আমাকে।

মা গম্ভীরমুখে বলিলেন,—তা সত্যি! ছেলে-মেয়ে যদি বিধর্ম্মী হয়ে যায়, তার বাপ মা মরেও সুখ পায় না। আমি মরলে পরে আমার শ্রাদ্ধ তুই ই করে দিস। কারণ—ছেলে-মেয়ে আমার কায়ছ যে মরা—তারা তো বেঁচে নেই।

তাঁর প্রতি কথাতেই ছেলে-মেয়ের কথা এসে পড়ে; এতেই বোঝা যায়, তিনি কতদূর ছেলেমেয়ের মায়া ত্যাগ করে দাঁড়াতে পেরেছেন। মাতৃহৃদয়টা যে আড়ালে সদাই হাহাকার করে ফিরছে, মাঝে মাঝে অসাবধানতা হেতু তারই একটু আভাস ফুটে পড়ে মুখে তাঁর।

আমি সে কথা চাপা দিয়ে বল্লুম,—আচ্ছা মা,—গয়ায় পিণ্ড দিলে কি হয়, বলতে পারেন?

মহা উৎসাহে তিনি সেই সব আখ্যান বলতে লাগলেন। সে সব বলতে গেলে, একখানা আলাদা বই হয়ে পড়ে। সে সব কথা শুনতে যাঁর আগ্রহ বেশী রকম হয়েছে, একালের সভ্যতার বেশী ধার ধারেন না, তাঁদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন।

নিয়মিত দিনে মাকে নিয়ে ট্রেণে উঠে পড়লুম।

কাটিহার হতেই গাড়ীতে অত্যন্ত হিন্দুস্থানীর ভিড় হতে লাগল, সে দিন আবার নাকি কি যোগ ছিল। থার্ডক্লাস নাকি একেবারে পুরে গিছল, তাই অনেকে দেড়া ভাড়া দিয়েও ইণ্টারক্লাসে উঠে পড়ল। মা, আমার কামরাতেই ছিলেন; দেখলুম, যখন তাঁকে সব পায়ের তলায় দলে মারবার যোগাড় করে ফেলেছে, তখন তাঁকে উদ্ধার করবার জন্যে আমি ব্যাকুল হয়ে পড়লুম।

মা তখন তাদের বিকট গায়ের গন্ধে নাকের পরে সমস্ত আঁচলটা চাপিয়ে দিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বলছেন,—নন্দা! বাঁচা আমায় বাবা! আমায় মেয়েদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে আয়—এখানে থাকলে মরে যাব আমি।

আমি বল্লুম,—তাই চলুন মা।

এর মধ্যে, আমি গায়ে পড়ে একটি ভেইয়ার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব পাতিয়ে নিলুম। আমার স্বদেশে, যদিও এ লোকটা আমার চাকর হয়ে থাকবার উপযুক্ত, কিন্তু সে অভিমান ট্রেণে মনে আনাও পাপ। এখানে তাকেই আমার খুব সম্মান দেখাতে হচ্ছে! এখানে বন্ধুত্ব পাতানো মানে জায়গা করে নেওয়া। তাকে খুব করে বলে গেলুম, যেন সে আমার জায়গায়টা দেখে, আমি আমার মাকে মেয়েদের গাড়ীতে রাখতে যাচ্ছি।

ভেইয়া তার ছাগলের মত দাড়ী নেড়ে—মুখ হতে অপূর্ব্ব সুগন্ধ ছড়িয়ে রাজি হয়ে গেল। আমি দেখতে দেখতে নামলুম—সে আমার জায়গা ও তার জায়গা—দুটো জুড়ে নিয়ে চৌদ্দ পোয়া হয়ে শুয়ে পড়ল।

মেয়েদের গাড়ীর কাছে গিয়ে দেখলুম, চাবী বন্ধ—চেঁচামেচি করে চাবী খোলাতে খোলাতে, ট্রেণ ছাড়িবার সময় হয়ে এল। তাড়াতাড়ি মাকে উঠিয়ে দিয়ে নিজের কামরায় লাফ দিয়ে উঠলুম, তখন ট্রেণ চলতে সুরু করেছে।

ট্রেণে উঠে দেখি—ভয়ানক কাণ্ড বেধে গেছে। বোধ হয়, পাঁচ মিনিটও আমি অনুপস্থিত ছিলুম না, এর মধ্যে কামরা একেবারে বোঝাই হয়ে গেছে। এক বাঙ্গালী সাহেব—চোখে সোণার চশমা—বুকে এতখানি মোটা সোণার চেন—হাতে ছড়ি, আঙ্গুলে হীরের আংটী—তিনি কয়েকটী সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে উঠে—চোখ পাকিয়ে মহা গালাগালি আরম্ভ করেছেন। তাঁর সঙ্গে একটি মেয়েলোক ছিলেন, তাঁর বেশ ঠিক মেমেদের মত।

আমার ভেইয়া কিন্তু তাঁর গর্জ্জনে একটুও দমে নি যদিও অন্য সব ভেইয়ারা ভয়ে জড়সড় হয়ে, এ ওর ঘাড়ে পড়ে মরছিল। সে কম্বলখানা আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে চুপ করে পড়ে ছিল, যেন সাহেব বাবুর কথা তার কাণেও যায় নি।

আমার কথা শুনবামাত্রই, ভেইয়া কম্বল ফেলে দিয়ে উঠে বসল। আমি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার সিগারেট-কেস খুলে তাকে একটা অত্যুৎকৃষ্ট হাভানা সিগার মন খুলে দান কল্লুম। ভেইয়া দুই একটা টান দিয়ে আকর্ণ দাঁত বার করে মুখামৃত আমার সারা মুখে ছড়িয়ে দিয়ে বললেন,—হ্যাঁ ভেইয়া! বড়ি ভালা চিজ—বহুৎ খাপসুরৎ; হাম কভি নেই এসা চিজ পায়া থা।

মনে মনে ভাবলুম,—এ চিজ তোমার বাবাও খায় নি, তুই তো ছেলেমানুষ।

সাহেব বাবুটী হা করে ভেইয়ার সিগার খাওয়া দেখছিলেন, এখন মুখ ফিরিয়ে খুব গরম সুরে বলে উঠলেন,—এখন যাই কোথা সঙ্গে মেয়েলোক নিয়ে? ইণ্টারক্লাসের টিকেট করেও বিপদ বড় কম নয়। শালা—ছাতুখোর মেড়ুয়াবাদিগুলো ইণ্টার ক্লাসটাও জুড়ে নেছে।

ভেইয়া আমার রুখে উঠল দেখছি,—এ সাব—শালা শালা মৎ করো।

আমি তখন আরাম করে সিগার টানতে টানতে সাহেব বাবুর মুখের পানে চাইলুম। হঠাৎ চমকে উঠলুম—এ যে আমার চেনা মুখ। যদিও চোখে চশমা লাগান, তবু এ মুখ দেখেই যে চিনতে পাল্লুম। নরুর মুখ কি কখনও ভুলতে পারি আমি?

আমি সিগারেটটা দূরে ফেলে ডাকলুম,—নরু যে——

সে বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে বলে উঠল,—নন্দা——

আমি একটু হেসে বল্লুম,—তাই বটে। আচ্ছা সাহেব সেজেছ যা হোক, হঠাৎ দেখে কিছুতেই চিনতে পারি নি আমি।

নরু তখন অসঙ্কোচে আমার গা ঘেঁসে বসে পড়ল, আমি নরম সুরে বল্লুম,—ইনি কে?

নরু বলে উঠল,—ওঃ—তাই তো—ইনি আমার স্ত্রী।

সে তার স্ত্রীকে আমার পরিচয় দিলে, তিনি মাথা নিচু করে আমায় অভিবাদন করলেন। তখন আমি উঠে আমার সামনের বেঞ্চ হতে লোকজন সরিয়ে দিয়ে তাঁর বসবার জায়গা করে দিলুম। তারপরে নিজের জায়গায় গিয়ে বসলুম। বল্লুম,—বিয়েটা হল, তা একবার জানাতেও পারলে না বাপু?

নরু একটু হাসলে; তারপর অকস্মাৎ গম্ভীর হয়ে বললে,—মা আছেন তোর সঙ্গে দেখলুম—না?

আমি বল্লুম,—হ্যাঁ।

নরু বললে,—তিনি আমার কথা বলেন কিছু? বোধ হয়, ভুলে গেছেন তোর যত্ন পেয়ে আমার কথা?

আমার হঠাৎ রাগ হয়ে উঠল; তাই দীপ্তভাবে বলে উঠলুম,—মায়ের মন তুমি বুঝবে কি নরু? পিশাচ সন্তান হয়ে জন্মিয়েছ, মাকে কেবল কাঁদাতেই এসেছ—কাঁদিয়েই যাও। আমি ঢের ঢের ছেলে দেখেছি, তোমার মত নিষ্ঠুর লোক কখন দেখি নি আমি। যার অমন দেবীর মতন মা, সে কেমন করে যে সেই মাকে কাঁদাতে পারে, এই ভেবেই আশ্চর্য্য হই। তোমার কার্য্যগুলোও সন্তানের উপযুক্ত নয়।

নরু খানিকক্ষণ গম্ভীরভাবে সিগার টানতে লাগল; তারপরে বললে,—আমি আগেই আমার জীবনযাত্রা ঠিক করে নিয়েছিলুম নন্দা, তাই তো তোর হাতে দিয়ে গিয়েছিলুম মায়ের ভার। আমি জানি আমার কাছে মা থেকে কখনও সুখী হতে পারবেন না।

আমি বল্লুম,—তুমি যাই হও না কেন, তোমার মা তোমার কাছে থাকতে পারুন বা নাই পারুন, তবু তোমার কর্ত্তব্য তো ছিল মায়ের পরে;—মাকে সংবাদ দিতে এত কি এসে গিছল তোমার? বাস্তবিক নরু, তোমার এই ব্যবহারে, যতখানি ভক্তি করতুম আমি তোমায়, ঠিক ততখানিই ঘৃণা করছি এখন। তোমার কাছে বসাও পাপ। যে এমন মায়ের চোখে জল বহাতে পারে, সে অপদার্থ সন্তান।

নরু বিমর্ষভাবে বললে,—আমি কি করব এখন, বল দেখি নন্দা; যা করেছি তা করেছি, আর তো হাত নেই তার; এখন কি করলে মার কাছে ক্ষমা পেতে পারি—বলে দেনা ভাই! আমি খৃষ্টান হয়েছি—খৃষ্টান বিয়ে করেছি শুনলেই তো তিনি আর কখনও মুখ দেখবেন না আমার।

আমি রাগভরে বল্লুম,—আর কোন ধর্ম্ম খুঁজে পেলে না—তাই একেবারে গণ্ডীর বাইরে পা দিতে গেছ? আমি আর কি বলব? যা খুসী তোমার কর গে যাও!

নরু কাতর হয়ে বললে,—তুই অত রাগছিস কেন বল দেখি?

আমি তেমনি চড়া গলায় বল্লুম,—না! ফুল দিয়ে এবার পুজো করবো তোমার বুট জুতোর উপরে।

নরু চুপ করে খানিক থেকে বললে,—তুই বুঝি গয়ায় যাচ্ছিস মাকে নিয়ে?

আমি বল্লুম,—হ্যাঁ।

সে আর একটাও কথা বললে না। পরের ষ্টেশন আসবামাত্র, সে তার স্ত্রীসহ নেমে গেল। আমি মুখ বাড়িয়ে দেখলুম, সে সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট নিয়ে সেকেণ্ড ক্লাসে উঠল।

ট্রেণ এসে ষ্টেশনে থামলে, মাকে নিয়ে আমি নেমে পড়লুম। যখন একখানা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে আমি মাকে উঠিয়ে দিয়ে নিজে উঠছি, সেই সময় দেখলুম, নরুও তার স্ত্রী এবং অন্যান্য সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে একখানা ফিটনে উঠে পড়ল! আমি কোচম্যানকে জিজ্ঞাসা করলুম,—ওই সাহেবটী কে?

সে উত্তর দিলে,—এখানকার ডাক্তার মিঃ ঘোষের জামাই। ওই মেয়েটী ডাক্তার ঘোষের একমাত্র মেয়ে।

শুনতে পেলুম,—নরু যদিও তেমন শিক্ষিত নয়, কিন্তু তার অত্যুৎকৃষ্ট চেহারার জোরে সে মিস ঘোষের স্বামী হতে পেরেছে।

পরদিন সকালেই মা স্নান করে পূজো করতে গেলেন, আমিও স্নান ক'রে তাঁর পরেই গেলুম।

যথাবিহিত শ্রাদ্ধ করে যখন আমরা বেরিয়ে আসছি, সেই সময় মা বললেন,—তুই একটু দাঁড়া নন্দা, আমি আসছি।

আমি দাঁড়িয়ে রইলুম, তিনি অন্যদিকে চলে গেলেন।

হঠাৎ তাঁর আর্ত্তকণ্ঠস্বর ভেসে এল,—নন্দা,—নন্দা!

আমি ছুটে গিয়ে দেখলুম, তিনি থর থর করে কাঁপছেন; তাঁর হাত হতে ফুল বেলপাতা সব পায়ের তলায় লুটাচ্ছে। তাঁর চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে, মুখখানা সাদা হয়ে গেছে।

আমি এত ডাকলুম তাঁকে, কিন্তু তাঁর কোন সাড়া পেলুম না; তখন তাঁর গায়ে একটা ধাক্কা দিলুম—মা, কি হয়েছে? অমন কচ্ছেন কেন বলুন দেখি?

মা আমার পানে চাইলেন—তাঁর চোখের সে ভাবটা মিলিয়ে গেল;—মুখের স্বাভাবিক রং ফিরে এল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন,—আমার পূজো করতে আসা ব্যর্থ হয়ে গেল রে নন্দা—ব্যর্থ হয়ে গেল। আমার বেলপাতা ফুল সব লুটিয়ে পড়ল মাটীতে, আমার সারাদেহটা অপবিত্র হয়ে গেল; চল, আবার স্নান করে আসতে হবে আমায়। পবিত্র না হয়ে পূজো করতে পাব না আমি।

আমি বিস্মিত হয়ে বললুম,—কেন মা,—কেন অপবিত্র হয়ে গেলেন আপনি। মা, দেখালেন,—ওই দেখ।

আমি তাকিয়ে দেখলুম—অদূরে দাঁড়িয়ে আছে নরু। অবমানিত মুখখানা লুকাবার জন্যে সে দুই হাতে মুখ ঢেকে রয়েছে।

ব্যাপারটা আমি একমুহূর্ত্তে বুঝে নিলুম। মা পূজো করতে যাচ্ছিলেন, নরু বুঝি সেই সময়ে এসে স্পর্শ করে প্রণাম করেছে তাঁকে!

মা রুদ্ধকণ্ঠে বললেন,—আমি তো দূর করে দিইছি ওদের চিন্তা আমার মন হতে, আবার কেন জাগিয়ে দিতে আসে ওরা? ওকে দূরে যেতে বল, নন্দা আমার কাছে যেন আর ও না আসে; আমি আর দেখতে চাইনে ওর মুখ।

নরু একটু এগিয়ে এল—মা তার দিকে পেছন ফিরে বলে উঠলেন,—নন্দা,—আবার কেন আসছে ও আমার কাছে?

রুদ্ধকণ্ঠে নরু ডাকলে,—মা,—যাই হই, আমি তোমার সন্তান; আমায় মাপ কর মা—

মা বলে উঠলেন,—কে আমার সন্তান? তুই? —দূর হয়ে যা আমার কাছ হতে। আমার ছেলে-মেয়ে মরে গেছে আজ তিন বছর আগে, আমি এইমাত্র তাদের শ্রাদ্ধ শেষ করলুম। ওরে প্রেতাত্মা! আমার নরুর মূর্ত্তি ধরে আমার কাছে এগুস নে আর। সরে যা—আমার পথ ছেড়ে দে —আমি চলে যাই।

নরুর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল; সে আমার পানে চেয়ে একবার মাত্র বললে,—নন্দা—

তার আকুল আবেগ আমার হৃদয়কে ঝঙ্কৃত করে তুললে; আমি আর থাকতে পারলুম না,—তার পক্ষ টেনে বললুম,—মা! চাও একবার নরুর পানে—

নন্দা! তুইও লাগলি আমার সঙ্গে? কেন আমায় টলাতে চেষ্টা করছিস? আমি হিন্দু, ব্রাহ্মণের বিধবা—আমার ছেলে যে, সে কখনও মাকে ছেড়ে খৃষ্টান হতে পারবে না। ওকি আমার ছেলে? ও যে নরুর প্রেতাত্মা।

নরু রুমালে চোখ মুছে ফেললে; আর্দ্রকণ্ঠে বললে,—তবে যাচ্ছি মা; আর তা হলে আসব না তোমার সামনে?

মা দৃঢ়স্বরে বললেন;—না! কখন না! যতদিন বেঁচে থাকবো আমি, ততদিন তোর নামও যেন না শুনতে পাই।

তাই ভালো। ছুঁয়ে তো দিয়েইছি মা, তবে আর একবার পায়ের ধূলোটা দাও আমায়।

তার কথা শুনে তীব্রকণ্ঠে মা বলে উঠলেন,—

না, আর আমায় স্পর্শ করতে পারবি নে। যা আমার সামনে থেকে।

নরু শক্ত কাঠের মত খানিক দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল কঠিন-হৃদয়া মায়ের পানে; তার চোখ দুটো আবার সজল হয়ে আসছিল, সে দুটো হাত কপালে ঠেকিয়ে বললে,—যাচ্ছি মা। তুমি প্রণাম নেবে না বললেও, আমি না প্রণাম করে থাকতে পারছি নে। আমার প্রণাম তোমার চরণ স্পর্শ করুক এখান হতে।

সে বেড়াতে এসেছিল বাইক নিয়ে;—বাইকখানা একটা গাছের গায়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। মায়ের পানে ফিরে চাইতে চাইতে সে বাইক করে চলে গেল।

মা একদৃষ্টে কোন অনির্দ্দিষ্টের পানে তাকিয়ে রইলেন; আমিও আর একটী কথা বলতে পারছিলুম না।

হঠাৎ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনে আমি সচকিতভাবে তাকালুম তাঁর দিকে। মা—আমার পানে শূন্যনয়নে তাকিয়ে বললেন,—হ্যাঁরে নন্দা! পৃথিবীটা কি ঘুরছে? এ কি মহা প্রলয় উপস্থিত হয়েছে নাকি রে? পৃথিবী এত কাঁপছে কেন?

দেখলুম, তাঁর দেহটাই ঠক ঠক করে কাঁপছে। আমি সভয়ে তাঁকে ধরলুম—কই মা।—পৃথিবী তো কাঁপছে না—ঘুরছে না তো। এত কাঁপছেন কেন মা?

মা হঠাৎ নিজেকে দমন করে ফেললেন। আবার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি বললেন,—চল, ফিরে যাই। আর পুজো করা হল না রে নন্দা—আর পুজো আমার ঠাকুর নিলেন না।

আমি বললুম,—কাল আবার এসে পুজো করবেন মা।

একটু মলিন হাসির রেখা ফুটে উঠল তাঁর মুখে—না রে! দেবতা আর নেবেন না পুজো আমার। তাঁর দরজা হতে ফিরিয়ে দিলেন আমায়;—যখন নিলেন না তিনি পুজো, আর আসব না নন্দা—আর আসব না পুজো করতে। ওগো ঠাকুর! এখান হতে প্রণাম আমার গ্রহণ কর।

সেখানে মাথা নুইয়ে তিনি উঠে পড়লেন। তখনও তাঁর দেহ কাঁপছিল। আমি বল্লুম,—চলুন মা,—ধরে নিয়ে যাই আপনাকে; পড়ে যাবেন আপনি যে—

মা একটু হাসলেন। পরে বললেন,—পড়ব না। আমি শক্ত—বড় শক্ত নন্দা!—দেখলিই তো এখনি; সন্তানের কান্নাতে মন যার গলল না—সে শক্ত নয় তো কি নরম?

তিনি জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিলেন।

২৭

বাড়ী এসেই মা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন; সেদিন আর সারাদিন তিনি উঠলেন না।

আমি জানতুম না যে, তিনি খান নি। রাত প্রায় দশটার সময় বাসায় ফিরে এসে দেখলুম—তখনও মা শুয়ে আছেন।

মনে সন্দেহ হওয়াতে রান্নাঘরে ঢুকে দেখলুম—যার ভাত যেমন রান্না—তেমনই পড়ে আছে। তাই দেখে আমি ঘরে এলুম। ডাকলুম,—মা!

দেওয়ালে আলোটা জ্বলছিল, তার আলোটা মার সাদা মুখখানার উপরে পড়েছিল। আমার ডাক শুনে তিনি তাকালেন; বললেন,—ফিরে এসেছিস নন্দ? বস একটুখানি আমার মাথার কাছে।

আমি তাঁর মাথার কাছে বসলুম, তাঁর কপালে হাত দিয়েই আমি চমকে উঠলুম! গা খুব গরম হয়ে উঠেছে।

আমি বল্লুম,—তোমার যে বড় জ্বর হয়েছে মা!

তিনি একটু হাসলেন। পরে বললেন,—এবার যাচ্ছি বাবা! পবিত্র পুণ্যতীর্থে দেহ রাখতে পারব বলে বড় আনন্দ হচ্ছে আমার মনে। তোকে বাবা অনেক ভুগালুম,—অনেক কষ্ট দিলুম তোকে।

আমি রুদ্ধস্বরে বল্লুম,—ও সব কি কথা বলছেন মা? আপনি আছেন বলেই আমি গৃহস্থ রয়েছি, নচেৎ আমার গৃহই বা কি, আর বনই বা কি? সবই যে আমার সমান মা!

মা বললেন,—তুই কি বিয়ে করবি নে নন্দা?

আমি বল্লুম,—না মা!

মা চোখ বুজিয়ে পড়ে থাকলেন।

তিন চার দিন কেটে গেল; জ্বর যখন তাঁর ছাড়ল না, তখন আমি ভারি উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লুম তাঁর জন্যে। বল্লুম,—ডাক্তার আনি মা?

মা বললেন,—কেন বাবা? আর কেন চিকিৎসা করতে চাচ্ছিস আমার? আমায় এখানে যেতে দেনা আস্তে আস্তে? এমন সুখের মরণ আর আমি পাব না! আমার

মনের বড় ইচ্ছে যে তীর্থে মরি আমি, আমার সে ইচ্ছে পূর্ণ হোক।

তাঁর কথা মোটে গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে, আমি ডাক্তার ডেকে আনলুম।

ডাক্তার প্রত্যহ আসতে লাগলেন—ওষুধও রীতিমত চলতে লাগল—এর মধ্যে থেকেই কেমন করে যে তাঁর ডবল নিউমোনিয়া হয়ে দাঁড়াল, তা কিছুই বুঝতে পাল্লুম না আমি।

ডাক্তার যেদিন সকালে এসে রোগিণীকে পরীক্ষা করে, মুখখানা বেশী রকম বিকৃত করে ফেললেন, সেদিন আমার সামনে বাস্তবিকই যেন পৃথিবীখানা ঘুরে উঠল।

মা পড়েছিলেন অজ্ঞান হয়ে। ডাক্তার চলে যাবার পরে হঠাৎ যেন তাঁর জ্ঞান ফিরে এল; বিস্ফারিত চোখে চারিদিকে চেয়ে ডাকলেন,—নরু! ডেকে নিয়ে আয় শান্তিকে; আমার দুই দিকে দুজন বস—দেখি তোদের আমি চোখ ভরে।

আমি ডাকলুম যখন তাঁকে, তখন তাঁর বাস্তব জ্ঞানটা ফিরে এল। বললেন,—কি রে নন্দা! ডাকছিস কেন?

আমি বল্লুম,—নরুকে একবার খবর দেই মা?

মা বিস্ফারিত চোখে বলে উঠলেন,—না—না! তাকে খবর দিতে পারবি না কখনও নন্দা। সে আমায় ছুঁয়ে কলঙ্কিত করে রেখে গেছে; এখন এই মরণকালে তার হাতের জলটা আর মুখে দেওয়াস নে আমায়!

আমি চুপ করে রইলুম। মা যখন ঘুমিয়ে পড়লেন, সেই সময় আমি চাকরটাকে পাঠিয়ে দিলুম, ডাক্তার ঘোষের কুঠীতে; বলে দিলুম,—নরুর মায়ের কঠিন ব্যারাম, বাঁচবার আশা নেই; যদি সে ইচ্ছে করে, তার শ্বশুর, ডাক্তার ঘোষকে যেন সঙ্গে নিয়ে এসে, তার মাকে দেখায়। তার নিজের যা কর্ত্তব্য, সেটা যদি ইচ্ছে করে সে, এই সময় এসে পালন করে যেতে পারে।

চাকর চলে গেল।

ঠিক সেই সময়ে টেলিগ্রাফ-পিয়ন এসে আমায় একখানা টেলিগ্রাম দিয়ে গেল।

কোথা হতে টেলিগ্রাম এল—ভাবতে ভাবতে সেখানা নিয়ে মায়ের কাছে এলুম। মা তখন ঘুমাচ্ছেন। টেলিগ্রাম খানার পানে চেয়ে ভাবলুম,—বোধ হয় রাজা বাহাদুরের কোনও বিশেষ দরকার পড়েছে, তাই তিনি যাবার জন্যে আমায় টেলিগ্রাফ করেছেন।

টেলিগ্রামখানা খুলে তাতে চোখ পড়তেই আমি একেবারে চমকে লাফিয়ে উঠলুম! হাত হতে কাগজখানা খসে পড়ে গেল। স্তব্ধ হয়ে আমি বসে থাকলুম।

আবার কাগজখানা তুলে নিলুম; আবার দেখলুম। এই তো সত্যি কথাই লেখা—এ তো মিছে নয়। তাতে লেখা আছে,—রাজা বাহাদুর হঠাৎ মারা গেছেন—টেলিগ্রাফ পাবামাত্র চলে এস।

এ টেলিগ্রাফ করেছে শান্তি; নিচে তার নাম সাইন রয়েছে।

আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। রাজা বাহাদুর হঠাৎ মারা গেলেন কি করে? তাঁর অমন হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, হঠাৎ মারা যাওয়ার তো কোনও কারণ নেই তাঁর।

শান্তি যে কি রকম ব্যস্ত হয়ে টেলিগ্রাফ করেছে আমায়, তা আমি বুঝতে পাল্লুম। সে রাণীরূপে পরিচিতা, অথচ রাজার বিবাহিতা স্ত্রী নয়, সে কথাটা এবার প্রকাশ হয়ে পড়বেই; তখন তাকে ন্যায্য অধিকারী রাজা বাহাদুরের ভ্রাতুষ্পুত্রকে সব ছেড়ে দিয়ে বেরুতে হবে সে বাড়ী থেকে। তার পরিচিতের মধ্যে আমি বই আর কেউ নেই তার, তাই সে আমার শরণাপন্ন হয়ে পড়েছে।

কতক্ষণ আমি যে এইভাবে বসেছিলুম, তা আমি জানি নে। হঠাৎ চেতনা ফিরে এল, গেটে একখানা ভারি গাড়ী দাঁড়াবার শব্দে, সঙ্গে সঙ্গে একটা ব্যগ্র-ব্যাকুল কণ্ঠ শোনা গেল, কইরে——কোন ঘরে আমার মা?

চাকরটা বললে, ওই ঘরে।

আমি টেলিগ্রাম খানা তাড়াতাড়ি পকেটে ফেলে বারাণ্ডায় এসে দাঁড়ালুম, নরু লাফ দিয়ে গাড়ী হতে নেমে পড়ল; তার শ্বশুর বেজায় মোটা মানুষ, তিনি খুব আস্তে আস্তে নামলেন।

নরু ব্যস্তভাবে আমার পাশে এসে দাঁড়াল,—কোথা রে নন্দা! মা কোথায়?

আমি বল্লুম,—একটু আস্তে কথা বল।

নরু বললে,—তিনি কি এখনও আমার উপর বিরূপ আছেন নন্দা?

আমি চুপ করে রইলুম।

নরু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে থমকে দাঁড়াল—তা হলে কেন আমায় ডাকলি নন্দা তাঁর অনভিমতে? এতে তাঁর আরও কষ্ট হতে পারে, তা বুঝলি নে?

আমি বল্লুম,—তবু ছেলের কর্ত্তব্য যা মায়ের মৃত্যুশয্যার পাশে, তাই করবার জন্যেই তোমায় ডেকেছি। এসো, তুমি আমাদের সঙ্গে।

নরু বললে,—কি ব্যারাম হয়েছে মায়ের?

আমি বল্লুম,—সেই দিন বাড়ী এসেই জ্বর হয়েছে তাঁর। আমি রীতিমত ডাক্তার দেখান সত্ত্বেও, এখন ডবল নিউমোনিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নরু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে,—আমি যাব না নন্দা। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দেখি মাকে, তুই আমার শ্বশুরকে নিয়ে ভালো করে দেখা আমার মাকে। যদি মাকে বাঁচিয়ে তুলতে পারিস নন্দা, তা হলে—বাস্তবিক ভাই, তোর কেনা গোলাম হয়ে থাকব আমি।

তার চোখ জলে ভরে এল; মুখখানা ফিরিয়ে নিয়ে রুমাল দিয়ে সে বর্ষণোন্মুখ চোখ মুছতে লাগল।

আমি তাকে ঘরে আনবার জন্যে এত টানাটানি করলুম, কিন্তু সে একেবারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ; বললে,—মা আদেশ না দিলে, আমি কখনও মার কাছে আর যাব না। মা যদি বলেন, তবে তাঁর সেবার অধিকারী হতে পারব আমি; তোর কথায় আমি মাতৃ আদেশ লঙ্ঘন করতে পারব না নন্দা। তিনি যখন বলেছেন দূরে থাকতে আমায়, তখন দূরেই থাকব আমি।

অগত্যা তাকে বাইরে রেখে, ডাক্তার ঘোষকে নিয়ে আমি রোগিণীকে দেখাতে গেলুম।

ডাক্তার ঘোষ যখন মায়ের বুক একজামিন কচ্ছিলেন, সেই সময়ে তাঁর জ্ঞান ফিরে এল; তিনি ডাকলেন,—নন্দা!—

"কেন মা"! বলে আমি তাঁর পাশে দাঁড়ালুম।

রুদ্ধকণ্ঠে তিনি বললেন,—বারণ কর—ওরে, বারণ কর কেন আমায় দেখছে এরা? আমি এখন মহাসমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে—তার ঢেউ আকর্ষণ কচ্ছে আমায়; আর কি তোরা ফিরাতে পারবি এখন? মিছে কেবল এত চেষ্টা কচ্ছিস কেন বল দেখি?

আমি বল্লুম,—আমার কর্ত্তব্য যে—তা নয় মা! আমি তো ছেড়েই দেছি। কিন্তু মা! এখন যার কর্ত্তব্য, সে যদি দেখায় এখন তোমায়—তাতে তো বাধা দিতে পারি নে আমি। সে জন্মের মত তোমার চিকিৎসা করিয়ে মনের ক্ষোভ মিটিয়ে নিচ্ছে, মিটিয়ে নিতে দাও তাকে তা।

মায়ের মুখখানা কেমন হয়ে গেল; হাঁপিয়ে উঠে তিনি বলে উঠলেন,—সে কে নন্দা?

তিনি বুঝতে পেরেছেন, তবু শুনতে চান কে সে? কে তার শেষজীবনের আশা মিটিয়ে দেখে নিতে এসেছে।

আমি বল্লুম,—নরু।

তিনি চোখ মুদলেন; আস্তে আস্তে বললেন,—আমি যে তাকে রাক্ষসীর মতই তাড়িয়ে দিলুম, সে অপমান ঝেড়ে ফেলেও আবার সে এসেছে?

আমি রুদ্ধস্বরে বলে উঠলুম,—আপনার কৃত অপমান তার কাছে প্রচুর স্নেহ।

মা চোখ খুললেন। বললেন,—কোথায় সে?

আমি বল্লুম,—পাছে আপনার কষ্ট হয় বেশী, সেই ভয়ে সে ঘরে আসতে পারছে না,—বাইরে বসে শুধু চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছে।

কাঁদছে—সে কাঁদছে? ডাক নন্দা—ডাক তাকে। এই তো শেষ হয়ে এসেছে আমার, একবার কথা বলে নেই। ডাক্তার বাবু, আর একজামিন করবেন না আমায়, ছেড়ে দিন এখন। আমার ছেলে এসেছে, তার সঙ্গে এইবেলা কথা বলে নেই।

আমি বললুম,—মা! ইনিই নরুর শ্বশুর।

মা মাথায় কাপড় টানতে যাচ্ছিলেন; মিঃ ঘোষ বললেন,—আমায় লজ্জা করবেন না। নরেন আমার সন্তান, আপনি তার মা—আমার ভাইয়ের মত চোখে দেখতে পারেন আপনি।

আমি নরুকে ডাকলুম; কম্পিতপদে আস্তে আস্তে সে ঢুকল এসে ঘরে, আমি তাকে ধরে এনে মায়ের কাছে বসালুম।

মা অতৃপ্তনয়নে তার মুখের পানে চেয়ে রইলেন, তাঁর দুই চোখের কোণ বয়ে অশ্রুধারা গড়াতে লাগল। নরু বালকের মত কাঁদতে কাঁদতে রুমাল দিয়ে মায়ের চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে ভগ্নস্বরে বললে,—কাঁদছ কেন মা?

মা বললেন—তুই কাঁদছিস কেন বাবা?

নরু বললে,—তুমি যে চলে যাচ্ছ মা। আজীবন তোমায় কেবল কাঁদিয়েই এলুম মা, হাসি দিতে পারলুম না মুখে তোমার, এই ভেবেই কাঁদছি আমি।

মা তার হাতখানা নিজের বুকের পরে রাখলেন; শান্তস্বরে বললেন,—ওরে পাগল! দুঃখ কি তুই দিইছিস আমায়? দুঃখ যা,—তা পাচ্ছি আমি নিজের কর্ম্মফলে। তোরা কেবল তার হেতু হয়েছিলি বই তো নয়। চোখ মোছ বাবা, চোখ মুছে ফেলে দে।

নরু চোখ মুছে ফেললে।

মা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন,—তোর দেখা পেলুম নরু, কিন্তু শান্তির কোনও সন্ধান পেলুম না।

আমি বললুম,—শান্তির সন্ধান আমি পেয়েছি মা!

সচকিতভাবে মাথা তুলে নরু আমার পানে তাকালে; মা ক্ষীণস্বরে বললেন,—কোথায় আছে সে?

আমি এক নিঃশ্বাসে শান্তির কথাগুলো সব বলে ফেললুম। শেষে বললুম,—আমায় মাপ করুন মা! আপনার সঙ্গে তার দেখা করিয়ে দিতে পারতুম আমি; কিন্তু যে ভাবে এখন আছে সে, তাতে আপনার মত পুণ্যবতী মায়ের গায়ে পাপের বাতাস লাগতে পারে। তাই ভেবেছিলুম আমি, তাকে পবিত্র ভাবেই আপনার কাছে নিয়ে যাব; কিন্তু আর দেখা করাতে পারলুম না মা! যখন সুসময় কাছে এল, তখন আপনি চললেন কোন মহাদেশে?

মা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন,—বেশ করেছিস নন্দা, আমায় তার সে কলঙ্কমাখা মুখ যে দেখাস নি তুই, তাতে আমি খুব কৃতজ্ঞ রইলুম তোর কাছে।

নরুর পানে তাকিয়ে বললেন,—আমার বড় দুঃখ হচ্ছে নরু, তোর হাতের দেওয়া পিণ্ড আমি পেলুম না; তোর হাতের জলও মুখে নিতে পারলুম না আমি।

ডাক্তার ঘোষ বিস্ময়ে বলে উঠলেন,—নরেনের হাতের জলও খাবেন না? জলে দোষ কি?

মা শুধু হাসলেন একটু—আপনি জানবেন কি তার? আজ সতের বছর ব্রহ্মচর্য্য পালন করে আসছি কঠোর ভাবে, আজ মুহূর্ত্তের ভুলে, এই সতের বছরের আরাধনার ফল হারাব? তিল তিল করে সঞ্চয় করেছি যা, একেবারে তা বিসর্জ্জন দেব? হিন্দুর ঘরের নিয়ম আপনি জানেন না, হিন্দু ব্রাহ্মণ-বিধবার ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা যে কি কঠোর, তাও আপনি কিছুই জানেন না।

নরু অধৈর্য্যভাবে বলে উঠল,—না হয় আমার হাতে নাই জল পেলে মা; নন্দাও তো তোমার ছেলে—সেই জল দিচ্ছে তো তোমায়।

মা আমার পানে সস্নেহে চাইলেন। বললেন,—নরু! নন্দা আমায় মা বলে ডেকে বাঁচিয়ে রেখেছে—নচেৎ এতদিন মরে যেতুম আমি। যেখানেই যেমন অবস্থায় থাক—নন্দাকে ভাইয়ের মত দেখিস; এই আমার শেষ কথা—মনে রাখিস।

তারপর মা চুপ করে ঘুমিয়ে পড়লেন।

ডাক্তার ঘোষ সে দিন আমার বাসাতেই রইলেন। নরুর স্ত্রীও বাইক নিয়ে হাজির হল শাশুড়ীকে দেখতে।

দেখলুম, বেশ স্ত্রী পেয়েছে নরু। অবশ্য মেয়েটি যে খুব সুন্দরী ছিল, তা নয়; কিন্তু খুব সরল আর উচ্চহৃদয় ছিল তার।

আমি তাকে একটু আলাপেই বেশ বুঝে নিলুম। সে মায়ের সেবার ভার নিজের হাতে তুলে নিলে। আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হলুম তার হাতে মায়ের ভার দিয়ে।

যে দুটো দিন মা বেঁচে রইলেন—বেশ সুখেই রইলেন। বৌটির স্নেহ তাঁকে খুব শান্তি দিতে পেরেছিল।

দুদিন বাদে ধীরে ধীরে মা চোখ মুদলেন, আর চাইলেন না।

মায়ের স্নেহ আমি কখনও পাই নি, নরুর মা নিজের মায়ের মত স্নেহভরা হৃদয় নিয়ে বুকের মাঝে টেনে নিছলেন আমায়; আমার প্রাণটা তখন জুড়িয়ে গিছল—যখন মা মায়ের মতই আমার সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন।

আজ নতুন করে মাতৃশোক আমার বুকে আঘাত করলে। আমি চুপ করে বসে রইলুম, আর একটী কথাও আমার মুখে ফুটল না। নরু অধীর হয়ে কাঁদছিল। সে যে তার মাকে চিনতে পারে নি, মায়ের চোখে আজীবন জলের ধারাই বইয়েছে, কখনও একটা ভালো কথা বলে নি—সেই কথাই তার মনে কেবল জাগছিল। বাস্তবিক—যখন মানুষ বেঁচে থাকে, আমরা তাকে চিনতে পারি নে, তাকে তখন উৎপীড়ন করি, কাঁদাই; কিন্তু যখন সে চিরকালের মত চোখের আড়াল হয়, যখন আর ক্ষমা চাইবার অবকাশ পাওয়া যায় না, তখন নিজের দেওয়া অত্যাচারগুলোর কথা মনে করে প্রাণে অপরিসীম যন্ত্রণা এসে উপস্থিত হয়। তখন মনে হয়, কেন অত্যাচার করেছি? কেন ভালো ব্যবহার করি নি।

মায়ের কাজ শেষ করতে হল আমায়, নরু বিধর্ম্মী বলে মা তাকে অগ্নি-কার্য্যাদি সমাধা করতে নিষেধ করে দিছলেন। সব শেষ হয়ে গেল, আমি কলকাতায় ফিরে যাবার জন্য সব বন্দোবস্ত করে নিলুম।

নরুকে বল্লুম,—শান্তিকে কি পাঠাব তোমার কাছে?

নরু ঘৃণার সুরে বলে উঠল,—তার নাম আর আমার কাছে বলিস নে নন্দা। নিজের পাপের ছবি দেখে—নিজেই শিউরে উঠছি আমি, আর তার ছবি দেখতে পারব না। সে যখন চলে গেছে, আর তার মুখ দেখব না। তার কপালে যা আছে, তাই হবে; তার কথা আর বলিসনে আমার সামনে। যদি সে আমার সামনে আসে, হয় তো রাগ সামলাতে না পেরে, তাকে খুন করে ফেলব আমি। জানিস তো, যে দিন পালায় সে, সে দিন কি খুন মাথায় চেপেছিল আমার? সে রাতের কথা জীবনে আমি ভুলতে পারব না। সন্ধ্যাবেলায় শবদাহ করতে গেলুম একা বয়ে নিয়ে—ফিরে এলুম—উঃ! কত রাত তখন। ঝাঁ ঝাঁ করে অন্ধকার ঝরে পড়ছে মাথায় পরে, মা পড়ে আছেন বারাণ্ডায়। কোনমতে চোখের জল সামলাতে সামলাতে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লুম। গভীর রাতে মায়ের ডাকে জ্ঞান ফিরে এল; দেখলুম, উন্মাদিনীর মতই তিনি কেবল ডাকছেন, "শান্তি—শান্তি"। তারপর তো সবই জানিস নন্দা। তার জন্যেই তো কত কথা শুনতে হল আমায়, তার জন্যেই তো লুপ্তপ্রায় ঘৃণা আমার হিন্দুধর্মের পরে আবার ঘুরে এল; যার ফলে এমন জায়গায় এসে পড়লুম আমি, যে মা আমার—শেষ সময়ে আমার হাতের জলও নিতে পারলেন না। তাকে বলিস নন্দা,—যত অনিষ্টের মূল হচ্ছে সে; তার জন্যেই সোণার সংসার করবেন বলে মা যে কত আশা করেছিলেন—তার বদলে পেলেন কেবল প্রাণে আঘাত; তাঁর সকল আশা চূর্ণ হয়ে গেল।

আমি বল্লুম,—কিন্তু তোমারও তো দোষ আছে।

নরু জোরের সঙ্গে বলে উঠল,—নিশ্চয়ই দোষ আছে। যাক, সে সব কথা আর তুলিস নে নন্দা! যা হবার তা তো হয়েই গেছে। আমি শুধু এইটে বলতে চাই, যদি দেশের লোক একটু সহানুভূতি দেখাত, তাদের মিছে হিন্দুত্বের অহঙ্কার একটু যদি সত্য হত, তা হলে বোধ হয় নিশ্চয়ই আমাদের জীবন অন্যদিকে ফিরত।

আমি আর কোনও কথা না বলে কলকাতায় রওনা হয়ে গেলুম।

২৮

তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে নেমে পড়ে, রাজা বাহাদুরের প্রাসাদ পানে চল্লুম।

হঠাৎ দেখলুম, ভূপেন ব্যস্তভাবে কোথায় যাচ্ছে। আমি তাকে ডাকতেই সে চমকে ফিরে তাকাল। আমি তার কাছে এসে বল্লুম,—রাজা বাহাদুর নাকি মারা গেছেন ভূপেন?

ভূপেন বিমর্ষভাবে বললে,—হ্যাঁ! হঠাৎ মারা যাওয়া। কেউ জানেও না যে, এমন ভাবে মারা পড়বেন।

আমি বল্লুম,—ডাক্তারেরা কি বললেন দেখে?

ভূপেন বললে,—রাজা বাহাদুরের বরাবরই হার্টের ব্যারাম ছিল। কেউ দেখে বুঝতে পারত না যে, তাঁর এ ব্যারাম আছে। এ তো আমাদের মত ঘরের ছেলে নয়, যে অস্থিচর্ম্ম সার হয়ে যাবে; এরা রাজার ছেলে, খুব ভালো খায়,—সেই জন্যে চেহারাখানা বেশ বাগিয়ে রেখেছিল। কিন্তু ডাক্তারেরা তাঁকে বলে দিয়েছিল, যেন তিনি কোনও অত্যাচার না করেন। কিন্তু রাজা বাহাদুর ইদানিং মদের মাত্রাটা বড় বাড়িয়ে তুলেছিলেন, তা তো তুমিও জান। যে দিন মারা যান, তার আগের দিন বেজায় মদ খান—বাস! বাছা আমোদ করতে গিয়ে হাত পা ছেড়ে ভবের পারে চলে গেলেন হিসেব দিতে।

আমি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বল্লুম,—লোকটী বড়ই ভালো ছিল কিন্তু। যাক, তাঁর ওয়ারিশ কি কেউ এসেছেন তাঁর দেশ হতে?

ভূপেন বললে,—আরে বাসরে! তা আর বলতে? যে দিন টেলিগ্রাফ গেছে, তার দুই তিনদিন পরেই তাঁর ভাইপো অজিত সিংহ এসে হাজির হয়েছেন। এ বেটা এমন লোক, কি বলব? এসেই মদের বোতল ও গ্লাস সব টান মেরে ডাষ্টবিনে ফেলে দেছে। গলায় করে ঝুলিয়ে গোটাকত কালো পাথর এনে ঠাকুর বলে—মহা ধুমধামে পুজো করতে আরম্ভ করেছে। রাজা বাহাদুরের কাছে থাকতুম আমরা কত আদরে, একটা কথাও বলতেন না তিনি—হাজার গাফলতি করলে কাজে; আর এ বেটা যেন কেউটে সাপের বাচ্ছা। সেদিন অসুখ করেছিল বলে, মিছে করে ছুটি চাইলুম, বেটা একেবারে তেলে বেগুনে জলে উঠে, চোখ লাল করে বলে উঠেছে,—"কেঁও? ক্যা বলতে

হেঁ? বোকার হুয়া আপকা? ঝুটমুট মৎ বলিয়ে হামরা পাস।" আমি দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম, শকুনের মত সব দিকে দৃষ্টি আছে; সেদিন আমার নিমন্ত্রণ ছিল, সেইজন্যে অসুখের ভাণ করে যে ছুটি চাচ্ছিলুম আমি, কেমন করে তাও বুঝতে পেরেছে।

আমি বল্লুম,—লোকটী তা হলে ভালো দেখছি।

বিস্ময়ে চোখ দুটো বিস্ফারিত করে ভূপেন বলে উঠল,—ভালো?

আমি বল্লুম,—নিশ্চয়ই। মদ খাওয়া কি অসার আমোদ-প্রমোদে কাল কাটানো সে পছন্দ করে না। এ রকম লোককে ভালো বলবনা তো কি?

ভূপেন বিরক্তভাবে বললে,—হ্যাঁ—ভালো হবে খুব তোমার কাছে। তুমি যেমন নিরামিষাশী—নতুন বাবুটীও তাই; মিলে যাবে ভালো তোমাদের মধ্যে।

আমি বল্লুম,—সে সব পরের কথা। এখন শাস্তি কেমন আছে—কোথায় আছে, সে খবর কিছু জান?

লাফিয়ে উঠে ভূপেন বললে,—শাস্তি! সে এর মধ্যে কোথা হতে আসবে? এ সব রাজ-রাজড়ার ব্যাপার—এর মধ্যে শাস্তি!—তুমি যেন ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছ নন্দ।

গম্ভীরভাবে আমি বল্লুম,—দেখ! যেন লাফিয়ে পড়ে যেও না। শাস্তির খবরটা যে তুমি খুব ভালোই জান, তা বেশ জানি আমি। আমার চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা বৃথা দাদা! শাস্তি নিজেই প্রকাশ হয়ে গেছে আমার সামনে। তাকে যে তুমিই এনে রাজার রাণী করে দিছলে, সে খবরও আমার কাছে অজানা নেই। ও সব বাজে ভণ্ডামী রেখে দিয়ে, আসল কথাটা বলে ফেল।

ভূপেন প্রথমটা কথা বলতে পারলে না; তারপরে বললে,—এখনও রাজবাড়ীতে আছে। আমার সঙ্গে তো দেখা হয় না তার, যে কোন কথা বলতে পারব। তুমি যখন শাস্তির পুরাতন বন্ধু একজন, তখন নিশ্চয়ই দেখা পাবে তার।

আমি আর কোন কথা না বলে চল্লুম।

রাজার প্রাসাদে এসে দেখলুম, বাস্তবিক ঢের পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে। বাড়ীর সেই চপলতাব্যঞ্জক ভাবটা কেটে গিয়ে, কেমন একটা গম্ভীরতায় ভরে গেছে।

অজিৎ সিংহ আমার পরিচয় নিয়ে ভারী খুসী হয়ে উঠলেন। শুনলুম, তিনি আগেই খোঁজ নিছলেন, তাঁর কাকার কর্ম্মচারীদের মধ্যে কে কে চরিত্রহীন মাতাল। আমার পরিচয় পেয়ে, আমার সম্বন্ধে নাকি খুব উঁচু কল্পনা করে রেখেছিলেন তিনি।

লোকটী বাস্তবিক হিন্দু যাকে বলে, তাই। কপালে ও নাকে এই লম্বা সাদা মাটীর রেখা, মাথায় এতখানি একটা টিকি। কথায় কথায় কেবল বলেন, —"সীতারাম,—সীতারাম;—হরিবল,—হরিবল।"

আমি তাঁকে বল্লুম,—রাজা বাহাদুরের রাণী নামে যে মেয়েলোকটী ছিলেন এখানে, তিনি কোথায়?

তিনি বললেন,—তিনি এখানেই আছেন। তিনি যাই হোন, যখন আমার কাকা নিজের স্ত্রী নামেই পরিচিতা করেছিলেন তাঁকে, তখন তিনি আমার মাতৃস্থানীয়া। তিনি আমার মায়ের মত যতকাল ইচ্ছে থাকতে পারবেন এখানে। যেমন আগেও তিনি সম্মান পেতেন, সে রকম সম্মান এখনও যাতে পেতে পারেন, সে দিকে খুব নজর আছে আমার ম্যানেজার বাবু। আমার বাড়ীর মেয়ে-ছেলেরা সবাই তাঁকে "রাণী মা" বলেই মান্য করে।

কৃতজ্ঞতায় হৃদয় আমার ভরে গেল; আমি বেশ বুঝলুম, তাঁর হৃদয় কতদূর মহৎ—কতদূর উচ্চ।

আমি বল্লুম, আমি রাণীর সঙ্গে একবার দেখা করব,—এতে আপনার অন্তঃপুরের সম্মানহানি হবে না; কারণ তিনি আমার এক-গ্রামবাসিনী ছিলেন এককালে। আপনি তাঁকে একবার খবর পাঠিয়ে দেন, আমি দেখা করতে এসেছি।

অজিৎ সিংহ বললেন,—আমি এখনই খবর দিচ্ছি।

তিনি চাকরকে ডেকে বলে দিলেন,—রাণীমার ঝিকে বলে দাও তাঁকে জানাতে, নন্দ বাবু দেখা করতে চান তাঁর সঙ্গে।

তাঁর এই সদয় ব্যবহারে আমি একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিতে যাচ্ছি দেখে, তিনি আমায় থামিয়ে দিলেন,—না নন্দ বাবু! আমায় ধন্যবাদ দেবার দরকার নেই আপনার। আমি আপনাকে বেশ চিনেছি বলেই, আপনাকে খুব বিশ্বাস করছি। আপনি এই পাশের ঘরে বসুন গিয়ে, তিনিও ওইখানেই দেখা করবেন আপনার সঙ্গে।

চাকরটা এসে আমায় ডেকে নিয়ে বসালে পাশের ঘরটায়। খানিকক্ষণ আমি বসে রইলুম সেখানে।

হঠাৎ দরজার কাছে পর্দ্দা কেঁপে উঠল। আমি দেখলুম, মূর্ত্তিমতী বিষণ্ণতার মতই শান্তি দরজার পরে দাঁড়িয়ে।

শান্তি ধীরভাবে এসে একখানা চেয়ারে বসল; মলিন দৃষ্টি আমার পরে রেখে বললে, আমার টেলিগ্রাফ পেয়েছিলে তুমি?

আমি বল্লুম—হ্যাঁ পেয়েছিলুম।

শান্তি বললে,—আজ চৌদ্দ পনের দিন হল টেলিগ্রাম করেছি আমি তোমায়, এত দেরী হল কেন?

মনে ভাবলুম,—কারণটা আর বলব না; কিন্তু পরক্ষণে ভাবলুম,—না—বলতে হবে আমায়। তবে একটু ধীরে-সুস্থে বলতে হবে সেটা, এত তাড়াতাড়ি বললে চলবে না।

বল্লুম,—বলছি সে সব। এখন তুমি এখানে আছ কেমন?

শান্তি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে,—এরা আমায় ঠিক মায়ের মত চোখে দেখে। অজিৎ সিং আমায় মা বলে ডাকেন, যত্নের একটুও ক্রটী নেই; কিন্তু তবু এখানে আর থাকতে পারছি না বলেই তোমায় ডেকেছি। আর কৃতজ্ঞতার শিকল নেই, সেই জন্যেই তোমায় অনুরোধ করছি, এখন কি মুক্ত করতে পারবে আমায়?

আমি বল্লুম,—রাণীর সুখ ছেড়ে দারিদ্র্যের মধ্যে যেতে পারবে এখন তুমি?

জোরের সঙ্গে সে বললে,—নিশ্চয়ই পারব। দারিদ্র্যই এখন হিতকর আমার কাছে। তুমি আমায় তার মাঝে নিয়ে যেতে পারবে বলেই, তোমার সাহায্য চেয়েছি আমি। তোমার কাছে নিরাশ হয়েই, রাগ করে এ পথে চলে এসেছি আমি; এখন হাত ধর আমার, পূর্ব্ব স্থানে নিয়ে যাও; পারবে না কি তুমি?

আমি বল্লুম,—যদি ত্যাগ স্বীকার করতে পার তুমি, তবে আমিই বা পারব না কেন তোমায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে? বিলাসব্যসন ছেড়ে দিয়ে চল শূন্য ঘরে ফিরে; সে ঘর যে হাহাকার করছে তোমা বিহনে।

শান্তি বললে,—আমি আজই যেতে প্রস্তুত। মা কি আছেন এখনও সেই ঘরটীতে? আমি গিয়ে পায়ে জড়িয়ে ধরলেও কি মাপ করবেন না তিনি আমায়? তিনি কি নেবেন না আমায় তাঁর বুকে তুলে? সেই নির্ম্মল পবিত্র ঘরখানিতে কি আর জায়গা হবে না আমার?

গম্ভীরমুখে আমি বল্লুম,—ঘরে স্থান পেতে পার শান্তি, কিন্তু মায়ের কোলের পরে অধিকার হারিয়েছ তুমি।

বিবর্ণমুখে শান্তি বলে উঠল,—কেন?

আমি বললুম,—তাঁর সাক্ষাৎ কেমন করে পাবে তুমি? আমি যে নিজের হাতে গয়াতে ছাই করে এলুম তাঁকে; এখন কার কাছে আর ক্ষমা চাইবে তুমি?

হঠাৎ শান্তি চেয়ার হতে গড়িয়ে নীচে পড়ে গেল; আমি এক মুহূর্ত্ত স্তম্ভিত হয়ে রইলুম, তারপরে তাড়াতাড়ি ধরে উঠাতে গিয়ে দেখি, সে মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়েছে।

আমি ব্যাকুল হয়ে তার ঝিকে ডাকবার জন্যে উঠেছি সবে, সেই সময়ে সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তাকালে, ধীরে ধীরে সে নিজেই উঠে বসল।

আমায় ব্যস্ত হতে দেখে সে বললে,—ভয় নেই—আমি মরব না। যারা মরণ চায় না, মরণ এগিয়ে যায় তাদেরই কাছে; কিন্তু যারা নিয়ত মরণ প্রার্থনা করে, মরণ যেন তীব্র উপহাস করবার জন্য আরও বেশী রকম উপেক্ষা করে দূরে সরে যায়। আমি যদি এখনই মরব, তবে আমার পাপের ফলগুলো ভোগ করবে কে?

চুপ করে সে বসে রইল; আমিও চুপ করে থাকলুম। খানিকক্ষণ পরে সে বললে,—দাদার খবর পেয়েছ কিছু?

আমি নরুর কথা সব বললুম তাকে; একটা নিঃশ্বাস ফেলে সে বললে,—যাক; দাদার সঙ্গে মায়ের যে দেখা হতে পেরেছে, মা যে শান্তি পেয়ে যেতে পেরেছেন, এই ভালো। দাদা আমায় ঘৃণা করেছেন বলছ, সে তো করবারই কথা। যে কাজ করেছি আমি, তাতে কারও কাছেই সহানুভূতি পাব না, সে বেশ জানি আমি।

সে উঠে দাঁড়াল; বললে,—আমি আজই যেতে চাই, নিয়ে যাবে আমায়?

আমি থতমত খেয়ে বললুম,—কোথায় যাবে তুমি?

সে ম্লান হেসে বললে,—ভয় নেই; তোমার কাছে থাকতে যাব না আমি। আমায় তুমি কাশীতে রেখে আসবে মাত্র। এই কাজটা নিশ্চয়ই করে দিতে হবে তোমায়। তার

আগে জন্মের মত একবার আমায় আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যেতে হবে, সেখানে একটীবার প্রাণ ভরে প্রণাম করে, কাশী যাব আমি; আর এ দেশে ফিরে আসব না।

আমি বল্লুম,—আজই তা হলে যেতে চাও তুমি?

শান্তি বললে,—হ্যাঁ,—আজই যেতে চাই আমি।

আমি বল্লুম,—বেশ! পাঁচটায় ট্রেণ আছে, সেই ট্রেণে চল। আমি চারটের সময় নিয়ে যাব তোমায় ষ্টেশনে; তুমি প্রস্তুত হয়ে থেক।

শান্তি একটা নিঃশ্বাস ফেলে, আস্তে আস্তে চলে গেল। তার কথা ভাবতে ভাবতে আমিও বার হয়ে পড়লুম।

২৯

অজিৎ সিংহ শুনলেন, শান্তি কাশী গিয়ে তপস্বিনীর মত জীবন কাটাতে মন করেছে; তাই শুনে তিনি ভারী খুসী হয়ে উঠলেন। তিনি তখনি শান্তির কাশীবাসের জন্যে মাসিক দেড়শো টাকা বৃত্তি স্থির করে দিলেন।

তাঁর মনটা যে খুব উচ্চ ধরণের, তা যতই তাঁকে দেখছিলুম, ততই বুঝতে পারছিলুম।

শান্তি এসে যখন মোটরকারে উঠে বসল, তখন তার বেশ দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। তার পরণে শুধু একখানা মোটা থান মাত্র, এবার যথার্থই সে ব্রতচারিণীর বেশ ধরেছে। আমি চলে যাবার পরেই, সে যে কখন তার সেই আজানুলম্বিত কালো কোঁকড়ান চুলের রাশি কেটে ফেলেছে, তা জানি নে।

অজিৎ সিংহের ছোট মেয়েটী তাকে মোটে ছাড়তেই চায় না। শুনলুম, এই কয়েকদিনের মধ্যে সে তার রাণী-দিদির এত অনুগত হয়ে পড়েছে যে, মায়ের কাছে পর্য্যন্ত যায় না। তার ঝি তাকে জোর করে শান্তির কোল হতে ছিনিয়ে নিলে, সে চীৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে ঝিয়ের সঙ্গে অন্তঃপুরে চলে গেল।

অজিৎ সিংহ মলিনমুখে মোটরকারের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন;—আপনার যখন যা অসুবিধা হবে মা, আপনি তখনি তা জানাবেন আমায়। মনে রাখবেন আমি আপনার ছেলে, আপনি আমার মা। দেড়শো' টাকা আপনার মাসিক বৃত্তি বন্দোবস্ত করা রইল, আর যদি আপনার কোন কারণে বেশী দরকার হয়—

বাধা দিয়ে শান্তি রুদ্ধকণ্ঠে বললে,—না বাবা, অতেতে আমার দরকার নেই, মাসিক ত্রিশটী টাকা হলেই আমার খুব সুখে দিন কেটে যাবে।

অজিৎ সিংহ বললেন,—না—মা!—মানের সঙ্গে থাকতে গেলে, তাতে চলবে না। আপনি যে আমার কাকার স্ত্রী, তাই সবাই জানে—সেই রকম ভাবেই চলতে হবে আপনাকে বাধ্য হয়ে। আপনি এখন ভিখারিণী সাজবার চেষ্টা করলেও, আমি যতদিন বেঁচে থাকব—কিছুতেই তা করতে পারবেন না। সেখানে আমাদের বাড়ী আছে, সেখানে রাণীর মতই থাকতে হবে আপনাকে; এই দেড়শো' টাকা বন্দোবস্ত রইল, আপনার পূজা ও দানের জন্যে।

শান্তির চোখ হতে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ল, সে নীরবে চোখ মুছতে লাগল। মোটরকার ষ্টেশনে চলল। অজিৎ সিংহ আমায় বার বার করে বলে দিলেন, যেন কাশীতে—তাঁর মায়ের উপযুক্ত ঝি ও চাকর যোগাড় করে দিয়ে আসি আমি; তাদের মাইনে ও খোরাক তিনি স্বতন্ত্র পাঠাবেন।

সারাপথ শান্তি একটাও কথা বললে না!

যখন দেশে এসে পৌছলুম, তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে, আকাশে লক্ষ লক্ষ তারা ঝিকমিকিয়ে ফুটে উঠেছে, শান্তি সেই দিক্‌পানে তাকিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে।

আমি বললুম,—কি ভাবছ শান্তি?

শান্তি উত্তর দিলে,—ভাবছি চার বছর আগেকার কথা। আচ্ছা নন্দ দা! যখন কিছু জানতুম না, তখন ছেলে-বুদ্ধিতে ভাবতুম, মানুষ মরে তারা হয়। তারা সারারাত আমাদের পাহারা দেয়। আমার বাবা মরে গিয়ে বড় নক্ষত্র হয়ে দেখছেন আমাদের, তাই আমরা আগে ভাবতুম; এখন কেন তা ভাবতে পারি নে বল দেখি?

আমি বললুম,—বিশ্বাস নেই।

শান্তি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে,—বাস্তবিকই তাই,—সেই বিশ্বাস হারিয়েছি বলেই সর্ব্বস্ব হারিয়েছি। যদি ছোটবেলার সেই বিশ্বাসটা থাকত,—আহা!—

বলেই সে থেমে গেল, তারপর বললে,—তা হলে আমি আজ ভাবতে পারতুম—ওই বড় তারাটীর পাশে যে ছোট তারাটী হাসছে, ওটী

আমার মা; সতী মরে স্বামীর সান্নিধ্য লাভ করেছেন। যাক; তাঁর সে সব কথা ভাবব না, —চল।

আমি বললুম,—গাড়ী করি, অনেক রাস্তা।

শান্তি একটু হেসে এগিয়ে পড়ল—এসো। হোক অনেক পথ, আমি হাঁটতে ভয় পাই নে।

নিস্তব্ধে দুজনে পথে চললুম। নিস্তব্ধ পল্লী-পথের দুইদিকে ঝোপগুলো সর্ব্বাঙ্গে গাঢ় অন্ধকারের ঢাকা দিয়ে, চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল।. পথ দিয়ে দুই একটা শৃগাল গম্ভীরভাবে আমাদের পানে চাইতে চাইতে চলে গেল, গোটাকতক কুকুর ঘেউ ঘেউ শব্দে নিস্তব্ধ পল্লীপথ মুখরিত করে, আমাদের পেছনে পেছনে আসতে লাগল।

শান্তি খানিকটে আগে খুব সাহস ক'রে চলছিল, নিজের বাড়ীর কাছে গিয়ে সে দাঁড়াল—চাবী দেওয়া আছে বুঝি?

আমি বল্লুম,—হ্যাঁ; তুমি একটু দাঁড়াও, আমি কালীর মাকে ডেকে আনি, তারই কাছে চাবী আছে।

শান্তি বারাণ্ডায় উঠে বসল; আমি চলে গেলুম। কালীর মায়ের বাড়ী পথের ধারেই, তাকে ডাকতেই সে একটা আলো আর চাবী নিয়ে বেরিয়ে এল।

বারাণ্ডায় শান্তিকে বসে থাকতে দেখে, সে প্রথমটা যেন থতমত খেয়ে গেল; তারপর দরজা খুলে দিয়ে সে বাড়ীর মধ্যে ঢুকল।

আজ সুদীর্ঘ চার বছর পরে, শান্তি তার নিজের ঘরে প্রবেশ করলে।

ঘরখানিতে কত যে ধুলো জমেছে, ঠিক নেই তার। দরজার উপর ঘরের কোণে মাকড়সারা দিব্য আরামে ঘর গড়ে বসে আছে, ঘরে বহুকাল পরে আলো দেখে, তারা যেন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

মায়ের আসনখানি তেমনি পাতা রয়েছে—বিছানাটী তেমনি করা রয়েছে। দেওয়ালে শান্তির বাপের আর মায়ের ফটোখানা তেমনিই টাঙান রয়েছে।

শান্তি আর রুদ্ধাবেগ চেপে রাখতে পারলে না; ফটোখানার পানে একবার চেয়েই—সে সেই বিছানার পরে লুটিয়ে পড়ে রুদ্ধ রোদন-উৎস খুলে দিলে তার,—মা গো! তোমার কুলত্যাগিনী—অভাগিনী মেয়ে ফিরে এসেছে বহুকাল পরে আবার তোমার ঘরে,—আজ কোথায় তুমি লুকিয়ে পড়লে? কোন অসীমের আড়ালে নিজেকে ঢেকেছ মা,—একটীবার সামনে আমার তোমার পুণ্যমাখা মূর্ত্তিটা ফুটিয়ে তোল গো!

তার আকুল রোদনে নিস্তব্ধ ঘরখানা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছিল, তার দীর্ঘশ্বাসের হাওয়াটা ঘুরে ফিরে ঘরখানাকে আহত করে যেতে লাগল।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে আমি ডাকলুম, —শান্তি!

শান্তি ঠাণ্ডা হয়ে উঠে চোখ মুছলে; বললে,—তুমি ওই ঘরে শোও গে—আমি এই ঘরে থাকব। না হয়, যাও তুমি তোমার বাড়ীতে।

আমি বল্লুম,—আমার বাড়ী তো নেই। তুমি তো জানই—খৃষ্টান বলে সবাই ত্যাগ করেছে আমায়।

শান্তি বললে,—তবে যাও ও-ঘরে।

আমি কালীর মায়ের আলো নিয়ে—পাশের ঘরটায় ঢুকে, যেমন তেমন করে বিছানা পেতে শুয়ে পড়লুম।

পরদিন সকালে উঠে—শান্তি যখন আমার সামনে এসে দাঁড়ালে, তখন তাকে দেখে আমি বিস্মিত হয়ে গেলুম! এক রাতের মধ্যেই তার এত পরিবর্ত্তন ঘটেছে,—এখন তাকে দেখলে চেনা দায়।

সে গম্ভীরভাবে বললে,—চল এখন কাশীতে।

আমি বল্লুম,—আমি একবার বাড়ীখানা দেখে আসি আমাদের। খেয়ে যেতে হবে তো;—কালীর মা বাজারটা করে এনে দিক, তিনটের ট্রেণে যাব।

আমি কালীর মাকে বাজার করতে বলে দিয়ে সে বাড়ী হতে বেরুলুম।

পথে পথে যেতে যার সঙ্গে দেখা হতে লাগল আমার,—সেই অবাক হয়ে তাকাতে লাগল আমার মুখের দিকে। আমি কোনও দিকে কেয়ার না করে বরাবর নিজেদের বাড়ীতে উঠে পড়লুম।

বাড়ীখানি তখন সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। আমি খানিকক্ষণ চুপ করে উঠানে দাঁড়িয়ে রইলুম, কাকে যে ডাকব—তাই ভেবে পাচ্ছিলুম না। হঠাৎ ওপরে কে যেন জানালাটা খুলে ফেললে; মুহূর্ত্তে মায়ের ম্লান মুখখানা আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল, আমি চীৎকার করে ডাকলুম,—মা!

তিনি বিস্ময়ে বলে উঠলেন,—কে রে,—কে ডাকলি আমায় মা বলে?

তারপর জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে বললেন,—কে? নন্দা এসেছিস? আয় বাবা—ওপরে আয়!

তাঁর কথায় ভারী একটা ব্যগ্র ভাব ফুটে উঠেছিল; যেন তিনি প্রতিদিন প্রতিক্ষণেই আমার আশাপথ তাকিয়ে আছেন। আমি একেবারে উপরে উঠে গেলুম—মা তখন বারাণ্ডায় এসে দাঁড়িয়েছেন।

আমি তাঁর পায়ে নত হয়ে পড়লুম,—তিনি আজ যেন প্রাণ খুলে আমায় আশীর্ব্বাদ করলেন! আজ তাঁর কথায় যে স্নেহের আভাস অনুমান কল্লুম আমি,—এমন জীবনে কখনও যে পাই নি, তা খুব সত্যি।

জিজ্ঞাসা কল্লুম,—নীলু কোথায় মা?

মা সবেগে বলে উঠলেন,—তার নাম আর আমার কাছে করিস নে নন্দা! সে আমার ছেলে নয়—মহাশত্রু। মদ খেয়ে দিন রাত বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে; বুঝাতে গেলে উল্টে আমাকে গালাগালি করে। তার মাতৃসেবার কেমন চিহ্ন দেখবি নন্দা? এই দেখ আমার সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করে একবার ভালো করে—

আমি বিস্ময়ে দেখলুম,—গায়ে তাঁর বেত্রাঘাতের দাগ, আমি বল্লুম,—একি মা?

জলন্ত একটা নিঃশ্বাস ফেলে মা বললেন,—এই—নন্দা,—এই সন্তানের উপযুক্ত কাজ। দেখছিস কি,—বড় আশা করে মানুষ করে তোলা সন্তানের দান? সন্তানের মুখের পানে চেয়ে,—সারা দিন রাত উৎকণ্ঠায় কাটানোর ফল দেখছিস কি নন্দা? আমার বুক ভেঙ্গে গেছে রে,—আর এক দণ্ড বাঁচতে সাধ নেই আমার। আত্মহত্যা করা মহাপাপ বলেই—এ শেষ বয়সে আর তা করতে পাচ্ছি নে নন্দা! চিরকালই তোকে অবহেলা করে এসেছি;—সন্তানের দাবী নিয়ে এসেছিলি আমার কাছে তুই,—আমি তোকে ফিরিয়ে দেছি;—এখন যে তোর কাছে কিছুই চাইবার প্রত্যাশা করতে পারিনে আমি।

আমি বলে উঠলুম,—না মা,—সবই প্রত্যাশা করতে পার তুমি। আমি তোমারই ছেলে মা,—আর কিছু নই। তুমি আমায় হাজার অবহেলা করলেও, আমি তোমাকে জেনেছি—চিরকালই তুমি আমার মা। তোমার যা ইচ্ছা মা,—বল তুমি তা আমায়,—প্রাণ দিয়েও পালন করব আমি তা।

মায়ের পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিলুম আমি। মা আমার মাথাটা বুকের মধ্যে টেনে নিলেন,—ঝর ঝর করে তাঁর চোখের জল ঝরে পড়তে লাগল আমার মাথার পরে।

মা বললেন,—তবে আমায় নিয়ে চল নন্দা,—আমি আর এ সংসারে থাকব না; আমায় কাশীতে পাঠিয়ে দিবি চল। আমার বুক একেবারে ভেঙ্গে গেছে,—আর আমি সহ্য করতে পাচ্ছি নে।

আমি বল্লুম,—তাই চল মা,—শান্তিও কাশীতে যাচ্ছে। সে এখন পবিত্রা হয়েছে,—সে তোমাকে পেলে আর কিছু চাইবে না। চল মা,—সেখানে রাজার বাড়ীতে থাকবে,—বেশ ভালো থাকবে,—আমি মাঝে মাঝে দেখে আসব।

মা বিস্মিতভাবে বললেন,—শান্তি!—তাকে পেলি কোথায়?

আমি সব কথা খুলে বল্লুম। মা বললেন,—তাই ভালো। আমি আর সে একত্রেই থাকব? তবে চল,—আজই আমি যাব।

আমি বললুম,—নীলু কোথায়?

মা বললেন,—নীচে পড়ে আছে।

আমি বললুম,—মামাবাবু—

মা ঘৃণাভরে উত্তর দিলেন,—সেও একটা অকাল-কুষ্মাণ্ড। তার অসৎ পরামর্শের জন্যেই তো নীলমণি আমার খারাপ হয়ে গেল।

আমি বললুম,—মুক্তি কেমন আছে?

মা বললেন,—সে ভালো আছে।

আমি মাকে সব গুছিয়ে নিতে বলে নীচে গেলুম। বৈঠকখানা ঘরে ঢুকতেই দেখলুম, নীলমণি বসে আয়নাতে মুখ দেখছে। রমুবাবু একটা খাটে পড়ে আছেন।

আমায় দেখেই নীলমণি তার লাল চোখ দুটো তুলে স্থির রাখলে আমার মুখপানে; রমুবাবু আড়ামোড়া দিয়ে উঠে বসলেন। বললেন,—কি বাবা! মাণিক-যোড়ে আসা হয়েছে যে এবারে? হারাণ মাণিক পেলে কোথায়?

আমি সে কথার উত্তর না দিয়ে বললুম, নীলমণি! মা তো আমার সঙ্গে কাশী যেতে চাচ্ছেন,—আমি তাঁকে নিয়ে যেতে এসেছি তাই—

বাধা দিয়ে নীলমণি বললে,—তা নিয়ে যাও এখুনি। ও বুড়ী আপনা আপনি মরলেই তো বাঁচি এখন। দিনরাত কেবল আসবে নাকে কাঁদতে—

আমি বললুম,—তিনি তো তোমারই ভালোর জন্যেই বলতে আসেন; এতে মায়ের গায়ে হাত তোলা কি উচিত হয়েছে তোমার? যে মা—দশমাস, দশদিন গর্ভ-যন্ত্রণা সহ্য করেছেন, তারপর তোমার জন্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যতাকে বলিদান দেছেন,—

তাঁর গায়ে হাত তোলা কতদূর পাপের কাজ হয়েছে তোমার—ভেবে দেখেছ কি তা? ছি—ছি! মনুষ্যত্বটা কি একেবারেই হারিয়েছ? ঢের ঢের মাতাল দেখেছি,—তোমার মত এমন বেহেড মাতাল—কখন কোথাও আমি দেখি নি কাউকে হতে।

নীলমণি মুখখানা বিকৃত করে বললে,—নাও—রেভারেণ্ড মশাই এলেন আমাকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে! ও সাহেব মশাই! আমি অমন ঢের শুনেছি লেকচার, আর আপনাকে বেশী ছড়াতে হবে না!

রমুবাবু চোখ বুজে দুলতে দুলতে বললেন,—বেণা বনে মুক্তো ছড়ান যাকে বলে—এ তাই! বেশ করেছে—নিজের মাকে নিজে মেরেছে,—পরের মাকে তো মারে নি। বুঝতুম, যদি হত তোমার মা,—তুমি তা হলে বলতে পারতে;—মায়ের চার্জ্জ আনতে পারতে কোর্টে। এ রকম পরের কথার কথা বলতে আসা—ভারি অন্যায়—ভারি অন্যায়।

আমি আর কোন কথা না বলে—বেরিয়ে এলুম।

শান্তি যখন শুনলে—মাও কাশী যাবেন, তখন সে ভারি খুশী হয়ে উঠল।

সেইদিনই আমি মা আর শান্তিকে নিয়ে কাশী রওনা হয়ে গেলুম।

সেখানে তাঁদের রেখে—সব বন্দোবস্ত ঠিক করে দিয়ে—ফিরে আসবার জন্য যখন আমি ট্রেণে উঠলুম,—তখন আমার বুক ফেটে কান্না আসছিল। মনে হল, আমার যা কিছু ছিল, আজ তা সব এই পুণ্যতীর্থে বিসর্জ্জন দিয়ে গেলুম। জগতে আর কিছুই আমার রইল না—এই কথাই ভাবতে আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে পড়ল।

ট্রেণ ছেড়ে দিলে—পুণ্যভূমি বারাণসীর শেষ রেখাটুকু আমার চোখের কোণ হতে মিলিয়ে গেল; সন্ধ্যার তরল অন্ধকারও আস্তে আস্তে সারা বিশ্ব-গায়ে ছড়িয়ে পড়ল, আমার হৃদয়ও সেই অন্ধকারে আপনাকে আপনি হারিয়ে ফেললে। চোখের পরে রুমালখানা চাপা দিয়ে—আমি শুয়ে পড়লুম।

যাও শান্তি,—আমার বাস্তব নয়নের সামনে লীলা খেলা সেরে সরে যাও তুমি পবিত্র বেশে—কিন্তু আমার মনে জাগিয়ে রেখে গেছ—তোমার সেই কিশোরী-মূর্ত্তি, তা আর মুছবে না—জীবনেও।

এর পর আর জীবনে কখনও তার সঙ্গে দেখা হবার অবকাশ পাই নি আমি;—কারণ কাশীতে যাবার প্রায় বছর খানেক পরেই, আমি মায়ের স্বাক্ষরিত একখানা টেলিগ্রাম পেলুম—শান্তি ইহকালের খেলা সেরে—বিশ্বদেবের চরণপ্রান্তে বিশ্রাম নিতে গেছে।

বহুকালের সে সব কথা—তারপরে কত বছর চলে গেছে; আজ আমি জরাজীর্ণ বৃদ্ধ—চলতে গেলে আমার চরণ ভেঙ্গে আসে। আজও আমার মনে ভাসছে শান্তির সেই মূর্ত্তি। আমার এই সুদীর্ঘ জীবনকালের মাঝে—তার মূর্ত্তি কখনও আর মলিন হল না;—তার সেই বিরহই যেন তাকে আরও উজ্জ্বল ভাবে জাগিয়ে তুলেছিল—আমার মধ্যে।

আমি ভাবি—সে যেখানেই যাক—যারই হোক, সে আমার,—সে আমার বই আর কারও নয়। আমাকেই পাবার জন্য পরজন্মে, সে কঠোর তপস্যা কচ্ছিল, আমিও আজীবন কাল তারই তপস্যা করে আসছি; যদিও আমি আগে পরজন্ম বিশ্বাস করতুম না—কিন্তু শান্তির বিয়োগে আমায় পরজন্মে আস্থা স্থাপন করিয়েছে। সে কোথাও নেই,—এ কথাটা ভাবতে বুক ফেটে যায়;—কিন্তু সে আছে আমার প্রত্যাশা করে পরজন্মের জন্যে,—এ কথাটা ভাবতে হৃদয় বড় পরিতৃপ্ত হয়। আমি এখন খুব আশা কচ্ছি—তাকে পাব আমি, পরজন্মে আবার আমাদের মিলন হবে।

পরলোকবাসিনী;—তুমিও বিশ্বাস কর—আবার আমরা মিলতে পারব। সেখানে আমাদের জাতি-ধর্ম্ম কিছুই বিচার নেই, সেখানে সব ধর্ম্ম এক হয়ে গেছে। জীবনের আর কয়টা গণা দিন কাটিয়ে দিয়ে যাব আমি তোমার কাছে।

তোমার ব্যগ্র আবেগ কমিয়ে দিক আমার দীর্ঘ দিনগুলি—যত পার সংক্ষিপ্ত কর—সরল কর, সুগম কর আমার পথ। আর বেশী দিন নয়—আমিও যাচ্ছি।

সমাপ্ত।

ঘূর্ণি হাওয়া

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

ঘূর্ণি হাওয়া

১

"আ মর, গলায় দড়ি, গলায় দড়ি! ওই সোয়ামীর আবার ঘর করিস্, ওরই আবার সেবা করিস্? যাই বলিস্ বাছা, আমি হ'লে কখনও অমন সোয়ামীর মুখই দেখতুম না, সেবা করা তো দূরের কথা। ওই যে লোকে কথায় বলে না—'যাকে লোকে বল্‌লে ছি, তার মনুষ্যত্ব রইল কি—' হেন লোক নেই যে না বিশুকে ছি ছি করছে। সত্যিই তো, লোকে বলবে নাই বা কেন, লোকের অপরাধটা কি? বলবার মত কাজ করলেই লোকে বলে থাকে। সেবার গাঁয়ের মধ্যে কি কাণ্ডটাই না করলে, লোকে সকালবেলা যার জন্যে ওর নাম করে না। তার পর দু'টি দিন যেতে না যেতে কি না এই কাণ্ড! মা গো—কি প্রবৃত্তি, গলায় এক-গাছা দড়িও কি জোটে না?"

যাহাকে উদ্দেশ করিয়া কাত্যায়নী এই কথাগুলা বলিয়া গেলেন, সে একটা উত্তরও দিল না, একটীবার মুখও তুলিল না। নীরবে নতমুখে সে বসিয়া রহিল। আর তাহার চোখের জল টপ্‌টপ্ করিয়া ঝরিয়া মাটিটাকেই ভিজাইয়া দিতে লাগিল মাত্র।

কি কথা বলিবে সে, কি লইয়া সে বিবাদ করিবে? একা কাত্যায়নীই নহেন, গ্রামের ছোট বড় সকলের মুখেই সে এই একই কথা শুনিতেছে।

স্বামী তাহার অসচ্চরিত্র, মাতাল; কিন্তু সে দোষ কি তাহার? লোকে তাহাকেই দোষ দেয়—সে যখন স্ত্রী হইয়াছে তখন স্বামীর চরিত্র সংশোধন করিবার ভার তাহার,—কেন সে তাহা করে নাই? বিশ্বপতি না কি প্রথমে বেশ ভালো ছেলেই ছিল, কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহাকে সে বিবাহ করিয়াছে, সেই পর্য্যন্ত সে অধঃপাতে গিয়াছে।

সে অনেকেরই মুখে শুনিতে পায়—আজ বিশ্বপতি যে মদকে পরমার্থ জ্ঞান করে, একদিন সে তাহাই অন্তরের সহিত ঘৃণা করিত। চরিত্রহীনকে সে কোন দিনই শ্রদ্ধার চোখে দেখিতে পারে নাই।

সে না কি কিছুতেই বিবাহ করিতে চাহে নাই, কেবলমাত্র মায়ের জিদে পড়িয়াই তাহাকে বিবাহ করিতে হইয়াছে। বিবাহের মাস তিনেক পরেই মা এই মেয়েটীর মাথায় সংসার ও ছেলের ভার চাপাইয়া নিজে অনন্ত পথের যাত্রী হইয়াছেন।

কল্যাণী বিবাহের সময় যে বিশ্বপতিকে দেখিতে পাইয়াছিল, আজ তাহার ছায়াই আছে মাত্র; আর আছে মুখে তাহার সেই মৃদু হাসিটুকু মাত্র, যাহা দেখিয়া তাহাকে চেনা যায়। দৈর্ঘ্যে সে তেমনই আছে, এদিকে এমন শীর্ণ হইয়া গেছে যে, তাহার হাড় কয়খানি গণিয়া লইতে পারা যায়। বড় বড় দুইটী চোখের নীচে কালি পড়িয়াছে, নাক ও গালের হাড় উঁচু হইয়াছে, মুখখানা লম্বা হইয়া গেছে। রাত্রি জাগরণ তাহার নিত্যকার ব্যাপার, নেশা না করিয়া সে একদিনও থাকিতে পারে না।

কল্যাণীর যখন বিবাহ হইয়াছিল, তখন সে নেহাৎ ছেলেমানুষ ছিল না। শৈশবে সে পিতা-মাতাকে হারাইয়াছিল,—মাসীর নিকটে সে লালিতা পালিতা হইয়াছিল। সেখানে সে নির্ব্বাকে শুধু সংসারের কাজই করিয়া যাইত, সকলেরই অত্যাচার পীড়ন সহ্য করিত। নিজের সত্ত্বা পর্য্যন্ত তাহার ধারণায় জাগে নাই।

বিশ্বপতির মা হঠাৎ একদিন এই মেয়েটীকেই পছন্দ করিয়া ফেলিলেন। কি দেখিয়া যে তাঁহার পছন্দ হইল, তাহা তিনিই জানেন। তিনি বিবাহের সমস্ত খরচপত্র দিয়া মেয়েটীকে নিজের ঘরে আনিলেন।

বিশ্বপতি প্রথম দুই একবার আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু তাহার সে আপত্তি টিঁকে নাই। মা তাহার কোন কথা শুনেন নাই,—জোর করিয়াই বলিয়াছিলেন তাহাকে বিবাহ করিতেই হইবে।

তখন কল্যাণীর বয়স ছিল সতের। অনাদরে, অযত্নে মাসীর বাড়ীতে সে বয়সের উপযুক্ত পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে নাই। তখন লোকে তাহাকে

দেখিয়া তের চৌদ্দ বৎসরের একটী মেয়ে বলিয়াই ভাবিয়া লইত। বিবাহ হইবার পর মাত্র এক বৎসরের মধ্যে সে এমনভাবে সকল দিকেই পুষ্টিলাভ করিল, যাহা দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

সে আজ পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের কথা। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যে মেয়েটী নববধূ হইয়া সসঙ্কোচে এই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই আজ গৃহিণী হইয়াছে।

এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে বিশ্বপতি এমন অধঃপতনের মধ্যে নামিয়া গিয়াছে, যেখান হইতে তাহাকে টানিয়া তোলা কল্যাণীর পক্ষে একেবারে দুঃসাধ্য।

কিন্তু তথাপি সে চেষ্টা করে নাই কি? সে অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, সবই ব্যর্থ হইয়া গেছে। সজল নয়নে সে যখন অনুরোধ করিত, "আর ও-সব ছাই-পাঁশ খেয়ো না, আমার মাথা খাও; এদিকে জমীজমা যা একটু আছে সবই গেল। এদিকে আর সব যে যায়—এসব একটু দেখ।" তখন বিশ্বপতি কেবল হাসিত, উত্তর দিত, "সব দিকেই আমার নজর আছে রাঙাবউ, ভেবনা কোন দিকে নজর দেই নে, কাজেই দশ ভূতে সব লুটে খাচ্ছে। বিষয়-সম্পত্তি জমীজমার দিকে একটা চোখ সদাই পড়ে আছে রাঙাবউ, বিশ্বপতি এমন নেশা করে না যাতে সব ঘুচাতে হবে।"

কিন্তু সে সর্ব্বদা একটা চোখ জমীজমার দিকে ফেলিয়া রাখিলেও, সংসারের আয় ক্রমেই কমিয়া যাইতে লাগিল। সব গিয়া আজ একটী কুড়ি বিঘা জমী ও একটী ফলের বাগানই মাত্র অবশিষ্ট পড়িয়া আছে। কল্যাণীর অলঙ্কারগুলির কিছুই আজ নাই। হাতে কেবল মাত্র দুইটী শাঁখা তাহার আয়ত রক্ষা করিতেছে।

পাড়ার বর্ষীয়সী মেয়েরা সদুঃখে বলিতেন, "গয়নাগুলো পর্য্যন্ত ওই হতভাগাটাকে ধরে দিলে বউমা, আখেরের কথাটা ভেবে দেখেছ কোন দিন? ও যে রকম লক্ষ্মীছাড়া, তাতে কিছু রাখবে না। এর পরে হয় তো গাছতলায় মালা হাতে বসতে হবে। একমুঠো ভাতের জন্যে এর পরে লোকের দোরে দোরে ঘুরতে হবে যে—"

কল্যাণী প্রায়ই জবাব দিত না। যদি কখনও জবাব দিত—বলিত "গয়নায় আমার দরকারই বা কি? যাঁর গয়না, তিনিই নিয়েছেন, ওতে আমার কথা বলবার—বাধা দেবারই বা অধিকার কোথায়?"

ভবিষ্যতে সত্যই ভিক্ষাপাত্র হাতে করিয়া গাছতলায় বসিতে হইবে কি না, লোকের দ্বারে দ্বারে একমুষ্টি ভাতের জন্য ঘুরিতে হইবে কি না, তাহা সে কোন দিনই ভাবে নাই। ভবিষ্যৎ ভবিষ্যতের তমোময় গর্ভেই নিহিত থাক, বর্ত্তমান লইয়াই জগৎ, বর্ত্তমান লইয়াই মানুষ বিব্রত, ভবিষ্যতের ভাবনা এখন ত বিতে গেলে চলে না।

যখন কল্যাণী শুনিতে পায় বিশ্বপতি বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভালো ছিল, বিবাহের পর হইতেই সে অধঃপাতে গিয়াছে; সে বিবাহ করিতে চায় নাই, মা জোর করিয়া তাহার বিবাহ দিয়াছেন, তখন সে কিছুতেই দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিতে পারে না। আকাশের পানে তাকাইয়া সজল-নয়নে ডাকিত— "তবে কেনই বা বিয়ে দিয়েছিলে মা, এ বিয়ে দেওয়ার কি দরকার ছিল, যা দেবতাকে পশু করে তুলেছে।"

কোন দিন সে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই—কি দুঃখে সে এমন করিয়া নিজেকে ধ্বংস করিল? এ কথা কতবার সে জিজ্ঞাসা করিবে ভাবিয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া থামিয়া গেছে। মনে হইয়াছে, কাহাকে সে জিজ্ঞাসা করিবে? সে একদিন যখন মানুষ ছিল, তখন জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর হয় তো পাইলেও পাওয়া যাইত। আজ সে বুদ্ধি, সে জ্ঞান ইহার যে নাই।

স্বামীর মাতাল অবস্থা সে জানে, চরিত্র-ভ্রংশের কথা সে জানে নাই। আজ কাত্যায়নী স্পষ্টই জানাইয়া দিয়া গেলেন, বিশ্বপতি কায়স্থের সন্তান, কিন্তু সে জানিয়া শুনিয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছে। অস্পৃশ্য বাগ্দী-বাড়ীতে সে দিন কাটাইয়া দেয়। তিনি নিজের চোখে তাহাকে জল খাইতে দেখিয়াছেন। বাগ্দীদের মেয়ে চন্দ্রাই ইহার মূল কারণ,—সেই মেয়েটীই কল্যাণীর স্বামীকে বিপথগামী করিয়াছে। চরিত্রহীনতার কথাটা ধ্বক করিয়া আসিয়া কল্যাণীর বুকে বাজিল।

আজ কয়েক দিন হইতে বিশ্বপতি সকাল সকাল সেই যে দুইটা ভাত মুখে দিয়া বাহির হয়, আর তাহার খোঁজ পাওয়া ভার হয়। আজ কয়দিন ধরিয়া রাত্রে সে বাড়ী থাকে না।

কল্যাণী জিজ্ঞাসা করে নাই—সে কোথায় যায়, বলিতে পারে নাই—রাত্রে একা থাকিতে ভয় করে। বাড়ীর চারি দিকে বাগান। লোকালয় দূরে থাকায়, সে চীৎকার করিলেও কেহ তাহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইবে না।

আজ কল্যাণীর চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। কাত্যায়নী চলিয়া গেলেও সে উঠিল না, ঘরের কোন কাজে হাত দিল না, যেমন বসিয়া ছিল তেমনই বসিয়া রহিল।

২

সন্ধ্যার মৃদু অন্ধকার ধীরে ধীরে ধরার বুকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

বৈশাখের রৌদ্রতপ্ত দুপুরের সেই ধরিত্রীর এখন আর এক মূর্ত্তি। কেহ দেখিয়া বলিতে পারিবে না—দুপুরে এই পৃথিবীই ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়াছিল।

গৃহস্থের বাড়ীতে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলিয়াছে। কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীগণ গলায় আঁচল জড়াইয়া তখনই সবে তুলসীতলা প্রদক্ষিণ সমাপনান্তে পরিবারের মঙ্গল কামনায় প্রণাম করিতেছেন। প্রায় প্রতি গৃহ হইতে শঙ্খধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে।

কল্যাণী তখনও বারাণ্ডায় চুপ করিয়া বসিয়া আছে। গৃহে এখনও সান্ধ্য প্রদীপ জ্বালে নাই, প্রাত্যহিক শঙ্খনিনাদ করে নাই,—স্বামী ফিরিবে বলিয়া অন্য দিনের মত সে জল, কাপড়, খড়মজোড়াটী ঠিক করিয়া রাখে নাই, আহার্য্য প্রস্তুত করিতেও যায় নাই।

বারাণ্ডার নীচে তাহারই স্বহস্ত-রোপিত কয়টী বেল ফুলের গাছে সাদা ফুলগুলি সান্ধ্য বাতাসের সুশীতল স্পর্শে কেবলমাত্র জাগিবার উদ্যোগ করিতেছিল,—মুদিত দলগুলি আস্তে আস্তে মেলিয়া দিতেছিল।

উঠানের দরজা ঠেলার শব্দ হইল। স্বল্প অন্ধকারের মধ্যে যে আসিয়া উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইল, তাহার পানে বারেক দৃষ্টিপাত করিয়াই কল্যাণী চিনিল এ কে।

বিশ্বপতি বড় ব্যস্তভাবেই বারাণ্ডায় উঠিয়া দাঁড়াইল, "তোমার চাবিটা একবার দাও তো রাঙাবউ, বিশেষ দরকার পড়েছে, এখনি না দিলে চলছে না।"

কল্যাণী নীরবে চাবির গোছা অঞ্চল হইতে খুলিয়া সামনে ফেলিয়া দিল। চাবির গোছাটা তাড়াতাড়ি কুড়াইয়া লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে গিয়া অন্ধকার দেখিয়া বিশ্বপতি থমকিয়া দাঁড়াইল, মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি, ঘরে এখনও সন্ধ্যে পড়ে নি?"

কল্যাণী উত্তর দিল না। বিশ্বপতি দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করিতেই সে জ্বলিয়া উঠিয়া একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বলিল, "না, জ্বালা হয় নি,—আমার সময় হয় নি, গরজ পড়ে নি বলে; তোমার দরকার থাকে তুমি জেলে নাও গিয়ে।"

কল্যাণীর মুখে এমন ধরণের কথা বিবাহ হইয়া অবধি আজ পাঁচ বৎসরের মধ্যে বিশ্বপতি শুনিতে পায় নাই। সে কতদিন মদ খাইয়া মাতলামি করিয়াছে, কতদিন নেশার ঝোঁকে আহার করিতে বসিয়া ভাত তরকারি পদাঘাতে দূর করিয়া দিয়া উঠিয়া গেছে,—কল্যাণী চিরকালের আদর্শ পতিব্রতা নারীর মতই প্রতি পদে তাহার দোষ ত্রুটী সারিয়া লইয়াছে,—কোন দিন তাহার সহিষ্ণুতা নষ্ট হয় নাই। সে যেন পৃথিবীর মতই পরম সহনশীলা। যত কিছু অত্যাচারই তাহার উপর দিয়া হইয়া যাক, সে নির্ব্বাক জড়ের মতই পড়িয়া থাকিবে, এই যেন তাহার চরিত্রের চিরন্তন রীতি।

আজ সেই সহনশীলা রমণীর মধ্যে এরূপ অসহিষ্ণুতা সত্যই বড় বিস্ময়কর বলিয়াই বোধ হইল, তাই বিশ্বপতি স্তম্ভিত হইয়া নির্ব্বাকে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার পরই সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "আলো জ্বালাটা এমন কিছু শক্ত নয় রাঙাবউ, ও কাজ আমি বেশ পারি। সব কাজই পারি—তবে হাতের কাছে সব জিনিস গুছানো পাই নে, এইটেই হয় মুস্কিল। তোমরাই না এমনি করে আমার মাথা খেয়েছ রাঙাবউ। নিজের ওপরে যদি কতকটা নির্ভর করতে আমায় ছেড়ে দিতে,—দেখতে, আমি সব পারতুম, এমন কি রেঁধে ভাত খাওয়া পর্য্যন্ত। কিন্তু ওই যে গোড়াতেই মুস্কিল বাধিয়েছিলেন আমার মা। এতটুকু বেলা হতে—এটা করিস নে, ওটা করতে নেই, এমনি করেই না তিনি আমায় অধঃপাতে দিয়ে গেছেন। তার পর এলে পরের মেয়ে তুমি, —তুমিও মার কাছ হতে সেবা করা ব্যাপারটা হাতে কাজে শিখে নিলে। আমার আর অপরাধ কি বল? না চাইতে হাতের কাছে সব জিনিস পেয়ে এমন বদ অভ্যেস হয়ে গেছে যে, নিজের কিছু করতে হবে ভাবতেও মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়। যাকগে, ঘরে আলো জ্বালা না হয় নাই রইল, সন্ধ্যেটা দিয়েছিলে তো?"

কঠিন সুরেই কল্যাণী বলিল, "না, দিই নি।"

এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বিশ্বপতি বলিল, "দাও নি? আমার ওপরে রাগ করে সন্ধ্যে বেলায় ভিটের সন্ধ্যেটা দিলে না রাঙাবউ?"

পরক্ষণেই সে আবার হাসিল, "আর পিতৃ-পুরুষের ভিটের কল্যাণ? যে গুণধর ছেলে জন্মেছি, তাঁদের মিথ্যি একধাপ করে নামিয়ে নরকের পথেই নিয়ে যাচ্ছি। ওপরে তুলবার যোগ্যতা তো আমার হলনা, আর হবেও না। শুনছো রাঙাবউ, তোমার ঘরে কোথায় কি আছে তা তো কিছুই জানি নে, জানবার দরকার হয় নি, সে সুযোগও দাও নি। দেশালাই কোথায় দেখে শুনে আলোটা একবার জ্বালিয়ে দিলে হতো। ওদিকে বড্ড দরকার, দাঁড়াবার যো নেই।"

কল্যাণী রাগ করিয়াই উঠিল, এবং স্বভাবের বিপরীত পদশব্দ করিয়াই ঘরের মধ্যে গিয়া কোথা হইতে দেশালাই বাহির করিয়া প্রদীপটা জ্বালিয়া দিল।

আশ্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিশ্বপতি বাক্স খুলিতে খুলিতে বলিল, "এই তো, ফুরিয়ে গেল লেঠা, এই আলোটা সন্ধ্যেবেলা জ্বাললেই বেশ হতো। দেখ দেখি অনর্থক বকতে গিয়ে কতটা দেরি হয়ে গেল! অথচ ওদের বলে এসেছি —এই আসছি—"

কল্যাণী বড় বড় দুইটী চোখ তুলিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্বামীর মুখের উপর রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাদের বলে এসেছিলে—চন্দ্রাকে?"

আচমকা চমকাইয়া বিবর্ণ হইয়া গিয়া বিশ্বপতি কল্যাণীর মুখের পানে তাকাইল। প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে সে চোখের দৃষ্টি সে দেখিতে না পাইলেও কণ্ঠস্বরে তাহা সে বেশই বুঝিতে পারিল।

বাক্স হইতে একখানা কাপড় তুলিয়া লইয়া সেখানা বগলে করিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। মৃদু হাসিয়া বলিল, "সত্যি, ঠিক তাই। এই জন্যেই আমি তোমার ভারি সুখ্যাতি করি রাঙাবউ, কি করে তুমি এত খবর যোগাড় কর? ওই গুণটী তোমার সত্যি বড় চমৎকার! মার কিন্তু এসব বালাই ছিল না। যাক, এও বোধ হয় শুনেছ— চন্দ্রার মায়ের ভারি অসুখ হয়েছিল, কিন্তু বেচারাকে দেখতে কেউ ছিল না। অগত্যা আমিই তার সেবা শুশ্রূষা করেছি, ওষুধপত্তর এনে নিয়ে খাইয়েছি। কিন্তু সব যত্ন মিথ্যে করে বেটি শেষটায় মরে বাঁচল। তা যাক, ওতে দুঃখ নেই, বুড়ো মানুষগুলো জগৎ হতে যত সরে যায়, ততই ভালো—বুঝলে? তোমার কপাল ভালো রাঙাবউ, মা বুড়ি বেশী দিন টেঁকল না। না হলে—বুঝলে, তোমার এমন গিন্নি হ'য়ে পাড়ায় পাড়ায় আমার খবর নেওয়া পোষাত না; তোমায় চিবিয়ে খেতো—" বলিতে বলিতে সে আবার অপর্য্যাপ্ত হাসিতে লাগিল।

কল্যাণী কি বলিতে গিয়া হঠাৎ চুপ করিয়া গেল। আস্তে আস্তে সে বাহিরে যাইতেছিল, বিশ্বপতি ডাকিল, "আহা, থামো রাঙাবউ, সত্যি যে রাগ করে চললে দেখছি। আসল কথা তো তবু এখনও বলি নি, এতেই তোমার এত রাগ হল? চন্দ্রার মা সেই ভোরে মারা গেছে, সন্ধ্যে হয়ে গেল, বেটা বাগ্দীরা কেউ আসে নি। এই দিনটা ওদের বাড়ী বাড়ী ঘুরেছি, খোসামোদের একশেষ করেছি। এখন ওদের কর্ত্তা বললে—'টাকা দাও, তবে মড়া তুলব।' সত্যি বল রাঙাবউ, আমার কি বাপ মা মরেছে যে তার জন্যে টাকা যোগাড় করতে হবে আমারই?"

কল্যাণী শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "সে কথা ঠিক। কিন্তু ওই কাপড়খানা আর বাক্সের কোণে যে দু'টো টাকা ছিল ও দু'টো নিলে কি জন্যে বল দেখি?"

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বিশ্বপতি বলিল, "তাও দেখেছ? বাবাঃ, তোমাদের মেয়ে জাতের চোখের সামনে কিছু এড়িয়ে যাওয়ার যো নেই। কত হাত-চালাকী করে টাকা দু'টো নিয়ে ট্যাঁকে গুঁজলুম, তাও কখন দেখে ফেলেছ? ভয় নেই গো, আজ মদ খাব না বলে প্রতিজ্ঞা করেছি। তবু তুমি নিশ্চয়ই মনে করছো টাকা কাপড় কি হবে। ওই যে বললুম, ছোটলোক বেটারা কিছুতেই আসে না, কাজেই তাদের তাড়ি খাওয়ানোর খরচ, আর তাদের মোড়লকে এই কাপড়খানা দিতে হবে, নইলে মড়া উঠবে না যে।"

প্রদীপের নির্ব্বাপিতপ্রায় সলিতা বাড়াইয়া দিতেই তাহার আলো দৃপ্ত ভাবে কল্যাণীর কঠিন মুখখানার উপর ছড়াইয়া পড়িল। বিশ্বপতি তাহার মুখের পানে তাকাইয়া স্তম্ভিত স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর হঠাৎ সকল সঙ্কোচ দূর করিয়াই বলিয়া উঠিল, "ছোটজাত আর কাকে বলে? সেই কাল রাতে চন্দ্রার মা মরেছে, আজ আবার রাত এলো, এখনও কি না মড়া উঠল না।"

কল্যাণী শক্ত সুরে বলিল, "তোমারই বা এত মাথাব্যথা কেন, দেশে কি আর কেউ নেই, কোনও লোক নেই?"

সবেগে মাথা নাড়িয়া বিশ্বপতি বলিল, "আরে, সে না থাকারই মধ্যে। এই যে কাল রাতে গাঁয়ে একটা লোক মরেছে, আজ সারাদিন সেই মড়া পড়ে আছে, কেউ একবার উঁকি দিয়ে দেখেছে? গাঁয়ে তো এ দিকে লোকের অভাব নেই,—গায়ে গায়ে বাড়ী, শত শত লোক,—কিন্তু কেউ কি একবার দেখলে?"

কল্যাণী হাসিতে গেল, হাসি ফুটিলও, কিন্তু বিকৃতভাবে। সে বলিল, "তা তো বটেই; কিন্তু কথাটা কি জানো? সবাই তো তোমার মত পরার্থপর হতে পারে নি যে, নিজের সংসার ভাসিয়ে দিয়ে, নিজের ঘরের পানে না তাকিয়ে, পরের কাজ করতে ছুটবে? তাও বুঝতুম যদি স্বজাত কি বামুন হ'তো; জাতে তো বাগ্দী, অস্পৃশ্য, যার ছায়া মাড়ালে স্নান করতে হয়—ছোঁওয়া তো দূরের কথা—"

বিস্ফারিত চোখের দৃষ্টি তাহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া বিশ্বপতি বলিল, "তুমি বলছ কি রাঙাবউ! দশজনের মত তুমিও এই কথা বললে? বাগ্দী অস্পৃশ্য, ওকে ছুঁয়ে স্নান করতে হয়, কাজেই ওর সেবা আর কেউ করবে না, কেউ ওকে দেখবে না? আচ্ছা, আমায় তুমি বলে বুঝিয়ে দাও দেখি,—যাদের আমরা ছোটজাত বলে দূরে রেখে চলি, যাদের ছুঁলে আমাদের স্নান করতে হয়, সত্যিকার চোখে দেখে বল দেখি তাদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ কিসে? তাদেরও যেমন দেহ আমাদেরও তেমনি, তাদেরও যেমন ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারের জ্ঞান আছে, আমাদেরও তাই আছে;—আমাদের যা আছে তাদেরও তাই আছে। তবু আমরা ভদ্রবংশে জন্মেছি, তাই আমরা ভদ্র, আর তারা নীচবংশে জন্মেছে বলেই নীচ—অস্পৃশ্য। আরও একটা মোটা কথা আছে—তারাও যেখান হতে এসেছে আমরাও সেখান হতে এসেছি, আবার যেতেও হবে আমাদের সেই একই জায়গায়,—বিচার হবে সেই একজনেরই কাছে। আর সবদিক ছেড়ে কেবল যদি এই দিকটাই ধর, তাই কি প্রচুর হবে না রাঙাবউ?"

কল্যাণী তাচ্ছিল্যের ভাবে মুখ বাঁকাইল, বলিল, "চিরকালের অস্পৃশ্য যারা, আজ তোমার বিচারে তারা হবে ভশ্চায্যি বামুন। এর পর আমার যেদিন অসুখ বিসুখ হবে, সেইদিন দু'টো ভাত রাঁধার জন্যে চন্দ্রাকেই ডেকে নিয়ে আসবে তো?"

বিশ্বপতি হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "তা যদি হয় তা হলেও মন্দ হয় না রাঙাবউ। জাতে বাগ্দী এই মাত্র ওর অপরাধ—নইলে আমি এ কথা জোর করে বলতে পারি, সে যেমন ভাবে থাকে, সে রকম ভাবে একজন বামন কায়স্থের ঘরের বিধবাও থাকতে পারে না।"

রাগে কল্যাণীর পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া যাইতেছিল, সে আর একটী কথাও না বলিয়া বারাণ্ডায় চলিয়া গেল।

পিছনে পিছনে ঘরের বাহিরে আসিয়া বিশ্বপতি বলিল, "তা হলে আমি চললুম রাঙাবউ। রাত্রে হয় তো ফিরতে পারবো না। কত রাত হবে কে জানে। এখন এ সব নিয়ে গিয়ে তাদের দিতে হবে। তার পর সব এসে মড়া তুলবে। হয় তো এগারটাই বেজে যাবে। তার পর সঙ্গে যদি না যাই, মড়াটাকে নদীর জলে ফেলে পালাবে। কাজেই বুঝতে পারছ আজ সারা রাতই শ্মশানে কাটবে।"

কি একটা কথা কল্যাণীর মুখে আসিয়াছিল, সে তাহা ফুটিতে দিল না। বারাণ্ডার ধারে দাঁড়াইয়া সে নক্ষত্র-শোভিত আকাশের পানে তাকাইয়া রহিল, স্বামীর দিকে আর ফিরিয়া চাহিল না।

দরজা পর্য্যন্ত গিয়া বিশ্বপতি আবার ফিরিয়া আসিল, "দেখ, নেহাতই যদি ভয় করে, না হয় বল, আমি সনাতনকে বলে যাই, সে রাত্রে এসে বারাণ্ডায় শোবে এখন।"

যে কথাটা কল্যাণী চাপিয়া গিয়াছিল, তাহা আর চাপা রহিল না; সে বলিল, "ভয় এতদিন হল না, আজকেই হবে, এমন ভয় আমার নেই। একা বাড়ীতে কেবল আজই থাকব না, এর আগেও কতগুলো রাত কাটিয়েছি, সে কথাটা বোধ হয় তোমার মাথায় আসে নি। সে সব রাতে সনাতন বা আর কেউ আমায় পাহারা দিতে তো আসে নি; আজও কারও দরকার নেই।"

খুব খুসি হইয়াই বিশ্বপতি বলিল, "বেশ—বেশ, তা হলে তো আর কথাই নেই। তবে আমি চললুম রাঙাবউ। কোন ভয় নেই—বুঝলে না? ভয় করলেই ভয় হয়। তুমি জোর করে থাকো—দেখো, যদি ভয় লাগে তবে আমার নামই বিশ্বপতি নয়। দরজাগুলো বন্ধ করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসো গিয়ে।"

পরম নিশ্চিন্ত ভাবেই সে চলিয়া গেল।

কল্যাণী কতক্ষণ দাঁতে নীচের ঠোঁটটা সজোরে চাপিয়া ধরিয়া উঠানের দরজাটার পানে তাকাইয়া রহিল। হঠাৎ তাহার বড় বড় দুইটী চোখ ছাপাইয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

৩

সনাতন আসিয়া ডাকিল—"দা-ঠাকুর, বাড়ী আছ নাকি ?"

কল্যাণী গৃহমধ্য হইতে উত্তর দিল, "তিনি বাড়ীতে নেই সনাতন, এই খানিক আগে কোথায় বেরিয়েছেন।"

সনাতন মাথার ঝুড়িটা বারাণ্ডায় নামাইয়া শ্রান্তভাবে বসিয়া পড়িল; গামছাখানা খুলিয়া লইয়া গায়ের ঘাম মুছিতে মুছিতে বলিল, "তুমিই একবার বেরিয়ে এসো মা-লক্ষ্মী; এই আম কয়টা এনেছি দা-ঠাকুরের জন্যে, একটা পাত্র এনে তাতে নাও দেখি।"

একটা ঝুড়ি বাহির করিয়া আনিয়া কল্যাণী বলিল, "অনর্থক নিত্যি তোমার আম বয়ে আনা সনাতন; যাঁর নাম করে তুমি নিয়ে এসো, তিনি যে কত খান, তা আমিই জানি। দিনরাত বাইরে বাইরেই থাকেন,—কদাচিৎ বাড়ীতে আসেন। তা সে এমন অবস্থায় থাকেন—কি খাচ্ছেন না খাচ্ছেন সে জ্ঞানই থাকে না।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে আমগুলি নিজের ঝুড়িতে তুলিতে লাগিল।

সনাতন মুখটা কাঁচুমাচু করিয়া বলিল, "বুঝি তো সবই মা-লক্ষ্মী, তবুও তো মন মানে না। দা-ঠাকুরকে গাছের জিনিস না দিলে যেন তৃপ্তি পাওয়া যায় না, নিজের মুখে তোলা যায় না। সেদিনে দা-ঠাকুর আমাদের বাড়ী গিয়ে এই নতুন হিমসাগর আমের ভারি প্রশংসা করেছিলেন, তাই আজ গাছ হতে পেড়েই আগে ওঁর জন্তে এনেছি।"

কল্যাণী আমের ঝুড়ি গৃহমধ্যে রাখিয়া আসিয়া বারাণ্ডায় বসিল, "বোস সনাতন, দু'টো কথাবার্ত্তা বলি। তোমার মেয়ের খবর পেয়েছ সনাতন? ভালো আছে তো সে? নাতি-নাতনী ভাল আছে?"

সনাতন উত্তর দিল, "তোমাদের মুখের আশীর্ব্বাদে মেয়ে-জামাই, নাতি-নাতনী সব ভাল আছে,—প্রায়ই ওদের খবর পাই। এইবার একবার ওদের নিয়ে আসব মনে করছি। দেখি, যদি এই হপ্তায় যেতে পারি ওদের ওখানে, একদিন ছুটি করে যাব।"

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কল্যাণী বলিল, "আমাদের বাগানটা কত টাকায় বিক্রী হয়েছে এ বছরে সনাতন?"

উৎফুল্ল মুখে সনাতন বলিল, "তা অনেক টাকায় হয়েছে মা, দা-ঠাকুর সে সব কথা কিছু বলেন নি বুঝি? এ অঞ্চলে এবার কোন গাছেই প্রায় আম হয় নি। কিন্তু তোমার কোন গাছেই আম বাদ যায় নি,—সব গাছেই কিছু না কিছু ফল হয়েছে। অন্য বছর ঐ বাগান পাঁচ সাত টাকায় বিক্রী হয় না,—এ বছর ষাট টাকায় বিক্রী হয়ে গেছে। তারা সব টাকা এখনও দেয় নি, অর্দ্ধেক দিয়েছে, অর্দ্ধেক পরে দেবে কথা আছে।"

কল্যাণী গোপনে একটা নিঃশ্বাস ফেলিল। স্বামী একটা কথাও তাহাকে বলে নাই,—একটী টাকাও সে দেখিতে পায় নাই। এ সব টাকা কোথায় গেল,—চন্দ্রার বাড়ী কি?

"আচ্ছা সনাতন, তোমার দা-ঠাকুর আজকাল এত বাইরে বাইরে থাকেন কেন বলতে পার? আজকাল রাত্রেও বড়-একটা বাড়ী আসেন না, অথচ—"

সনাতন বাধা দিয়া বলিল, "সে সব জানি মা, আমার কাছে কোন্ কথাই বা গোপন থাকে? দা-ঠাকুরের মত মানুষ গাঁয়ে আর একটী আছে—কেউ বলুক দেখি? কোথায় কার কি হয়েছে,—সারা দিন-রাত না খেয়ে না ঘুমিয়ে সেই রোগীর পাশে কাটিয়ে দিতেন। এই মাঝের বছর তিন-চার আর সে উৎসাহ ছিল না মা, হঠাৎ আবার ফিরেছে। কোথায় কে কোন্ বিপদে পড়েছে, সেই নিয়েই আবার ঘুরছেন। শুনলুম মহেশপুরে নাকি খুব মারধোর হাঙ্গামা চলেছে, দা-ঠাকুর নিশ্চয়ই সেখানে ছুটেছেন।"

আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া কল্যাণী বলিল, "মারধর কেন চলল সনাতন, কাদের সঙ্গে হল?"

সনাতন শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "যাদের সঙ্গে যাদের হয়, আর কার সঙ্গে হবে মা? বড়লোক চিরদিনই ধনগর্ব্বে অন্ধ হয়ে গরীবকে পীড়ন করে। গরীব যদি না সইতে পারে, তখনই মারধর চলে। এখানেও হয়েছে ঠিক তাই—প্রজারা জমীদারের বাকি খাজনা দিতে পারে নি, তাই জমীদারের হুকুমে ওদের সর্ব্বস্ব ক্রোক হয়ে যায়। প্রজারা

অনেক সইলেও আর সইতে পারছে না,—ক্ষেপে উঠে মারধর সুরু করে দিয়েছে।"

শঙ্কিত হইয়া উঠিয়া বিবর্ণমুখে কল্যাণী বলিল, "সেখানে—সেই বিপদের মধ্যে তোমার দা-ঠাকুর গেলেন,—কি হবে সনাতন? একে তো ও-মানুষ মোটেই সুবিধার নয়, একটু কিছুতেই ওঁর মাথা গরম হয়ে ওঠে। তাতে এই রকম ব্যাপারের মধ্যে গিয়ে পড়ে যদি আর একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসেন?"

সনাতন বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "সে ভয় করো না মা-লক্ষ্মী; পাঁচ ছয় বছর একত্রে বাস করেও তুমি দা ঠাকুরকে চিনতে পার নি, আমরা এতটুকু বেলা হতে দেখছি ওঁকে, সেই জন্যেই খুব চিনি। আজই না হয় সেয়ানা হয়ে, নেহাৎ ভদ্দর লোককে নাম ধরে ডাকতে নেই বলেই দা-ঠাকুর বলি, নইলে ও তো আমাদের চিরকালের বিশু, ওকে না চেনে কে? অমন একটী মানুষ এ অঞ্চলে নেই। কারও দুঃখ কষ্ট শুনলে পাগল হয়ে যান, কারও অন্যায় কোন দিন সইতে পারেন না। এই যে রামা বাগ্দীর মায়ের অমন ব্যায়রামটা হল, কেউ তাকে একটীবার চোখের দেখা দেখলে না। তখন এই দা-ঠাকুরই না ভিজিট দিয়ে পাঁচ-সাত দিন ডাক্তার এনেছে, ওষুধের দাম পথ্যি সব যুগিয়েছে। ঘরে তুমি মা-লক্ষ্মী দা-ঠাকুরকে যা খুসি বলতে পার, বাইরে আমরা তাঁকে দেবতা বলেই জানি।"

কল্যাণী মলিনমুখে বলিল, "কিন্তু অন্যায় সইতে পারেন না বলেই না ভয় পাচ্ছি সনাতন। ওখানে গিয়ে অন্যায় সইতে না পেরে হয় তো জমীদারের বিপক্ষে লাঠি ধরে দাঁড়াবেন।"

সনাতন বলিল, "সে গোল কাল মিটে গেছে মা-লক্ষ্মী। আজ তাদের নিজেদের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলেছে বটে, দুই পক্ষের কেউ সামনা-সামনি নেই যে মারামারি বাধবে। দা-ঠাকুর এখনই এলেন বলে, তোমার ভয়ের কোনও কারণ নেই।"

কল্যাণীকে সান্ত্বনা দিয়া সনাতন বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

উনানে তরকারী চড়ানো ছিল, কল্যাণী সেখানে আসিয়া বসিল, অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাব।

বেলা প্রায় বারোটার সময় বিশ্বপতি বড় শ্রান্তভাবে ফিরিয়া আসিল। সে জুতা যোড়াটা একপাশে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়াল হেলান দিয়া বসিয়া পড়িল। কল্যাণী তাড়াতাড়ি একখানা পাখা লইয়া আসিয়া বাতাস করিতে লাগিল।

তাহার হাত হইতে পাখাখানা কাড়িয়া লইয়া বিশ্বপতি মলিন হাসিয়া বলিল, "থাক, আর অতটা আদুরে দুলাল করে তুল না রাঙাবউ। অমনি করেই না সব রকমে আরও আমার মাথাটা খাচ্ছ, নিজের একটু হাত নাড়ার পর্য্যন্ত ক্ষমতা দিচ্ছ না। তুমি বস এখানে, আমি নিজে বাতাস খাচ্ছি।"

রুষ্ট হইয়া কল্যাণী বলিল, "বকো না বলছি, পাখা দাও, আমি বাতাস করি। এই রোদে তেতে-পুড়ে এলে, না হয় একটু বাতাসই করলুম, তাতেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না, তুমিও চিরকেলে আলসে কুড়ে হবে না।"

নিশ্চিন্তভাবে নিজেই পাখার বাতাস করিতে করিতে বিশ্বপতি বলিল, "তবে আসল কথা বলি রাঙাবউ—শোন—আমি এখন একটু একটু করে স্বাবলম্বী হ'তে চাই। বলা তো যায় না রাঙাবউ—যদি সেই দিনই আসে—যেমন করে আমায় ফেলে মা অনন্তের পথে যাত্রা করেছেন, তুমিও তেমনি করে হয় তো চলে যাবে। তখন কিন্তু আমি সেকালের সতীদের মত তোমার অনুগমন করতে চিতায় পুড়ে মরব না, বা আফিং খেয়ে আত্মহত্যা করব না—এ কথা ঠিক। আমায় যখন বেঁচে থাকতেই হবে, তখন কাজকর্ম্ম কিছু কিছু নিজের হাতে করার অভ্যেস রাখাটা কি ভালো নয় রাঙাবউ?"

সে প্রচুর হাসিতে লাগিল; কিন্তু কল্যাণীর মুখখানা রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সে একটী কথাও বলিল না।

বিশ্বপতি পাখা রাখিয়া উঠিতে উঠিতে বলিল, "ওই দেখ, অমনি তোমার রাগ হয়ে গেল। আরে বাপু,—ভালো কথাটা বললেও যদি রাগ কর, তবে আমি বেচারা যাই কোথায়? সত্যি কথা বল—তুমি যদি আজ না থাকো, আমায় কি একমুঠো ভাতের জন্যে লোকের দোরে দোরে ঘুরতে হবে না?"

রুদ্ধ রোষে ফুলিতে ফুলিতে চাপা স্বরে কল্যাণী বলিল, "ভয় নেই, যম আমার মত হতভাগীকে ছুঁতে পারবে না।"

বিশ্বপতি কথাটা মানিয়া লইল—"না ছুঁতে পারে, কিন্তু মানুষই যদি সে কাজটা করে?"

কল্যাণী গর্জ্জিতে লাগিল, একটী কথাও তাহার মুখে ফুটিল না।

বিশ্বপতি বলিল, "যাক গে, স্নানটা সেরে আসা যাক। পুকুরের জল বোধ হয় এতক্ষণ গরম হয়ে গেছে—না?"

কল্যাণী বাহির হইতেছিল, থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ঘরে জল আছে—দেব?"

"না থাক, পুকুরেই যাই।"

বলিয়া মাথায় একটু তৈল দিয়া গামছাখানা লইয়া বিশ্বপতি বাহির হইয়া গেল।

৪

আহারের স্থান করিয়া দিয়া কাপড় ও খড়ম যোড়াটী যথাস্থানে রাখিয়া কল্যাণী স্বামীর জন্য ভাত বাড়িতে রান্নাঘরে প্রবেশ করিল।

একটু পরেই বিশ্বপতি ফিরিয়া আসিল। ভিজা কাপড় ছাড়িয়া আহার করিতে বসিয়া গেল। কল্যাণী একখানা পাখা লইয়া নিকটে বসিয়া মাছি তাড়াইতে লাগিল।

আহার করিতে করিতে বিশ্বপতি একবার মুখ তুলিয়া কল্যাণীর বিমর্ষ অথচ গম্ভীর মুখখানার পানে তাকাইল, বলিল, "আমার কথা শুনে রাগ করেছ রাঙাবউ?"

কল্যাণী একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "না, রাগ করব কি জন্যে,—রাগ করার মত কি কাজ হয়েছে?"

মৃদু হাসিয়া বিশ্বপতি বলিল, "অত ভদ্রভাবে মিষ্ট কথা নাই বা বললে রাঙাবউ, ওর চেয়ে বরং খুব চেঁচিয়ে ঝগড়া করাও ভালো। যাক গিয়ে, ও-সব কথা আর না তোলাই ভালো—কি বল রাঙাবউ? এবার এসো—ঘর-কন্নার কথা দুটো বলা যাক—কেমন? আমায় একটা তরকারী রাঁধতে শিখিয়ে দেবে রাঙাবউ,—সেই যে মোচা দিয়ে কি একটা তরকারী করে—"

চকিতে কল্যাণীর মনে পড়িয়া গেল বিশ্বপতি মোচার ঘণ্ট বড় ভালবাসে, এবং কয়েক দিন পূর্ব্বে সে নিজের হাতে বাগান হইতে দুইটী মোচা কাটিয়া আনিয়াছিল এবং ইহার তরকারী খাইবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু নানা কারণে মনের অবস্থা খারাপ হইয়া যাওয়ায় কল্যাণীর এ তরকারী আর রন্ধন করা হয় নাই।

স্বামী হয় তো আজ আশা করিয়াছিল তাহার সে তরকারী হইয়াছে। থালার দিকে তাকাইয়া সে—কেন হয় নাই, সে কৈফিয়ৎ চাহিল না।

কল্যাণীর মুখখানা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। সে নতমুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বিশ্বপতি তাহার আরক্ত মুখের পানে চাহিয়া বেশ বুঝিতে পারিল সে লজ্জিতা হইয়াছে; সে প্রসঙ্গ আর না তুলিয়া সে বলিল, "কই, জিজ্ঞাসা তো করলে না—আজ সকালেই কোথায় গিয়েছিলুম, এত বেলা করে বাড়ী ফিরলুম কেন?"

একান্ত উদাস ভাবেই কল্যাণী উত্তর দিল, "জিজ্ঞাসা করবার দরকার নেই বলেই করি নি। এই যে নিত্যি এখানে যাও ওখানে যাও, কত রাতও এখানে ওখানে কাটিয়ে এসো, কোন দিন জিজ্ঞাসা করেছি কি? তুমি কোথায় গেছ, কেন গেছ? জানি জিজ্ঞাসা করলেও তার সত্যি উত্তর কখনও তুমি দেবে না, উল্টে প্রশ্ন তুলবে—সে কথা জিজ্ঞাসা করার কারণ কি।"

হাতের ভাত মাখা হঠাৎ স্থগিত রাখিয়া বিশ্বপতি সোজা হইয়া বসিয়া স্ত্রীর পানে তাকাইল।

কল্যাণী বলিল, "খেয়ে নাও, আবার চুপ করে বসে রইলে কেন?"

বিশ্বপতি বলিল, "একটা কথা বলে নেই আগে রাঙাবউ, তার পর খাচ্ছি। আচ্ছা, তুমি যে অত বড় অপবাদের বোঝা আমার মাথায় চাপালে,—সত্যি করে বল দেখি, তুমি কোন দিন জিজ্ঞাসা করেছ কি? আমার তো মনে পড়ে না, তুমি কোন দিন কোন কিছু জানতে চেয়েছ, আর আমি তার উত্তর দিই নি। তুমি নিজে কি রকম নির্লিপ্ত ভাবে থাকো, সেটা একবার ভেবে দেখ, তার পর আমায় দোষ দিয়ো।"

সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল দেখিয়া কল্যাণী ব্যস্ত হইয়া উঠিল, বলিল, "কথা রাখ, আগে খেয়ে নাও, তার পর কথাবার্ত্তা যা হয় বলো এখন।"

বিশ্বপতি আবার আহারে মন দিল।

কল্যাণী বলিল, "সনাতনের মুখে শুনলুম মহেশপুরে না কোথায় মারামারি হয়েছে—সেখানে গিয়েও বোধ হয় কর্ত্তৃত্ব করে এলে?"

হাসিমুখে বিশ্বপতি বলিল, "এই যে, সে খবরটাও রেখেছ দেখতে পাচ্ছি। কর্ত্তৃত্ব বিশেষ কিছুই করি নি। করবার যোগ্যতা হয় তো আছে, কিন্তু তা মানছে কে? তোমার স্বামীর অক্ষমতা তুমি যা জানো, দেশের আর দশজনেও তাই জানে। কাজেই তারা আমায় আমল দেবে কেন?"

দৃপ্ত হইয়া উঠিয়া কল্যাণী বলিল, "হ্যাঁ, সে যোগ্যতা তোমার বেশ আছে। তুচ্ছ ঘরের কাজে

তোমার যোগ্যতা না থাকলেও থাকতে পারে, —এ সব বিষয়ে কর্তৃত্ব করবার যোগ্যতা তোমার বেশ আছে। গেল বছর নবীন ভট্টাচার্য্যের পক্ষ নিয়ে গাঁয়ের পাঁচটা ছেলের সঙ্গে বাজারে মারামারি করে এসেছিলে, না; যার জন্যে শেষে পুলিশ পর্য্যন্ত এসেছিল?"

মুখখানা গম্ভীর করিয়া বিশ্বপতি বলিল, "বাঃ সে কথা এখনও ভোল নি দেখছি। কিন্তু সে কাজ করা যে অন্যায় হয় নি—একজন বুড়ো বামুনকে যারা অবশেষে বিদ্রূপ করেছিল, তাদের মারা যে অন্যায় নয়, বরং উচিতই হয়েছিল, এ কথা আজ স্বীকার না করলেও সে দিন তো অন্তরের সঙ্গে স্বীকার করেছিলে রাঙাবউ।"

কল্যাণীর মুখে বিশ্বের গাম্ভীর্য্য জমা হইয়াছিল, —সে নিস্তব্ধে অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া রহিল। বিশ্বপতি ততক্ষণে আহার শেষ করিয়া উঠিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, "ও সব ভেবে আর মাথা খারাপ কোর না, খেয়ে-দেয়ে নাও এখন। ভয় করো না, আজ আমি অন্যায়ের বিপক্ষে দাঁড়াই নি যাতে পুলিস আসবে। ওখানে দাঁড়ানোর যোগ্যতা আমার নেই, প্রতিপক্ষ খোদ জমীদার নিজে; দাঁত বসাতে গেলে সে দাঁতই ভেঙ্গে যাবে, রক্তপাত নিজেরই হবে, প্রতিপক্ষের গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগবে না।"

একলা ঘরে কল্যাণী ভাতের থালাটার পানে তাকাইয়া বসিয়া রহিল। তাহার চোখ দিয়া নিঃশব্দে কেবল অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

কি লোক, ইহাকে কোন মতে বিদ্ধ করা যায় না তো। ওই তো শেষের দিকে বলিয়াই গেল— অক্ষম যদি প্রাণপণ বসে দাঁত বসায় তাহাতে তাহার দাঁতই ভাঙ্গিয়া যায়, রক্তপাত হয়, প্রতিপক্ষের তাহাতে এতটুকু ক্ষতি হয় না।

মানুষটা সংসারে থাকিয়াও যেন নাই। এমন অনাসক্ত লোক সংসারে খুব কমই দেখা যায়। সংসারে যে আরও একটা মানুষ আছে, সে মানুষটা যে তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া বাঁচিয়া আছে, তাহা যেন কোন মতে উহাকে বিশ্বাস করান যাইবে না, ওই লোকটা সে কথা সম্পূর্ণ হাসিয়াই উড়াইয়া দিবে।

এমন লোকের উপর নির্ভর করিলেও সে নির্ভরতা স্থায়ী হয় না। ও যেন অনন্ত সমুদ্র, নিজের মনে গান গাহিয়া চলিয়াছে, উহার পাশে কূল আছে কি না, সে সন্ধান সে রাখে নাই।

ইহাকে যাহাই দাও, ও ফিরাইয়া দিয়া যাইবে, কিছুই লইবে না। লোকে জানে সবই, জানিয়াও এই সমুদ্রকে সব দিতে চায়, দেয়ও।

কল্যাণী চায় নির্ভর করিতে, কিন্তু সে তো আমল দেয় না। উহাকে কল্যাণী কত না কঠোর কথা বলিয়া থাকে কিন্তু ও যে সব হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। নিজের কাজে নিজেই সে ভুলিয়া রহিয়াছে,—সামনে যে পথ রহিয়াছে, তাহাই ধরিয়া সম্মুখের পানে দৃষ্টি রাখিয়া চলিয়াছে, পাশে কে আছে—পিছনে কে আছে; তাহা সে কোন দিন ফিরিয়া দেখে নাই।

আচমন সমাপনান্তে বিশ্বপতি বাহির হইতে ডাকিল, "আমি তা হলে বার হচ্ছি রাঙাবউ, ওদিকে আমার কাজ আছে। তুমি খেয়ে-দেয়ে নিয়ে বসো—"

আর্দ্র-কণ্ঠে কল্যাণী বলিল, "হবে এখন, তুমি তোমার কাজে এখন যাও, দেরী করো না।"

কণ্ঠস্বরে আর্দ্রতা স্পষ্ট অনুভব করিয়াই সন্দিগ্ধ মনে বিশ্বপতি দরজায় দাঁড়াইয়া ভিতর দিকে উঁকি দিল। তাহার আসিবার সাড়া পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই কল্যাণী চট করিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া নিজের জন্য ভাত বাড়িতে বসিল।

৫

সেদিন গ্রাম্য নদী ইচ্ছামতীর ঘাটে স্নান করিতে গিয়া সামনে চন্দ্রাকে দেখিয়াই কল্যাণী থমকিয়া দাঁড়াইল। চন্দ্রার পরণে সুন্দর একখানি কালা ফিতা-পেড়ে শাড়ী, দুই হাতে সবুজ রংয়ের রেশমী চুড়ি, গৌর বর্ণের উপর মানাইয়াছিল বেশ। একরাশ কালো কোঁকড়া চুল সমস্ত পিঠখানা ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। সেই কালো চুলের মাঝখানে তাহার সুন্দর মুখখানা সত্যই বড় সুন্দর দেখাইতেছিল।

সামনে যদি একখানা আয়না থাকিত, কল্যাণী চট করিয়া নিজের মুখখানা একবার দেখিয়া লইত। চন্দ্রার এই সৌন্দর্য্য সে সহ্য করিতে পারিতেছিল না। নীচ বাগ্দি-কন্যা, তাহার এত রূপ কেন?

অন্তরটা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাই মুখখানা অন্ধকার করিয়াই কল্যাণী এক পাশ দিয়া জলে নামিয়া গেল,—অতি সন্তর্পণে—যেন চন্দ্রার স্পর্শ

না লাগে। চন্দ্রা কাপড় কাচিতেছিল, জল ছিটকাইয়া কাছে পড়িতেই কল্যাণী কণ্ঠে বিষ ঢালিয়া দিয়া বলিল, "আ মর, চোখের মাথা তো এখন খাস নি চন্দ্রা! ঘাটে মানুষ রয়েছে দেখতে পাচ্ছিস নে? তুই জাতে বাগ্দী তা মনে আছে? তোর জল গায়ে লাগলে এই অবেলায় আবার আমায় নেয়ে মরতে হবে, সে খেয়ালটুকু আছে?"

তরুণী মেয়েটির মধ্যেও অনেকখানি দুষ্টামী ছিল। হয় তো সে সাবধান হইয়াই কাপড় কাচিত যদি কল্যাণী তাহার সমবয়স্কা না হইয়া বয়সে বড় হইত। সে অকুণ্ঠিত ভাবেই কাপড় আছাড় দিতে দিতে মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "তা কি করব বাপু, চোখের মাথা না খেলেও খেতে হয়েছে। তোমাদের ভদ্দর লোকের জ্বালায় তো ঘাটে কাপড় কাচবার যো নেই। যখনই কাপড় আনব—দেখব ঘাট-ভরা লোক, আর শুনব—ছুঁস নে, ছুঁস নে।"

বিকৃত মুখে কল্যাণী বলিল, "বলবে নাই বা কেন? তোরা জাতে বাগ্দী, তোদের ছুঁয়ে চান না করলে ঘরে যাওয়া তো চলে না। তোদের উচিত—নিত্যি যখন এত কাপড় কাচা—তখন আর একটা ঘাট করা। এক ঘাটে বামন কায়েতের সঙ্গে তোরাও আসবি,—তোদের তো মুস্কিল নয়, মুস্কিল হয় যে আমাদেরই।"

চন্দ্রা এবার স্পষ্টই হাসিয়া ফেলিল, "বেশ তো ঠাকরুণ, তোমরা সবাই মিলে একটা আলাদা ঘাট যদি করে দাও, আমাদেরও নিত্যি তোমাদের কথা শুনতে হয় না। দাদাবাবুকে বলব এখন—ওই পাশটা পরিষ্কার করে যদি একটা ঘাট করে দেন—"

দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া কল্যাণী বলিল, "কেন, দাদাবাবুর কি বাপ-মা মরা দায় পড়েছে যে, তোর জন্যে ঘাট তৈরী করে দিতে যাবে? আরও তো অন্য লোক আছে, তাদের দিয়ে করিয়ে নে গিয়ে।"

চন্দ্রা বলিল, "অন্য লোক আর কোথায় পাব গো ঠাকরুণ! দাদাবাবুই আসেন যান, নিত্যি বাজার-হাটও করে দেন, যা কাজ পড়ে তাও করে দেন। যাই বল ঠাকরুণ, দাদাবাবুর মত আর একটী পাওয়া দুষ্কর। কায়েতের ছেলে, তবু জাতের অহঙ্কার নেই। নিত্যি বাগ্দী বাড়ী যাওয়া আসা করেন। তোমাদের মত অত আচার-বিচার নেই। লোকের উপকার ওঁর মত অমন ভাবে আর কেউ করতে পারবে না, এ কথা সবাই বলবে। আমি তো ময়লা কাপড়েই থাকতুম, কেবল দাদাবাবুর বকুনিতেই না তিন দিন অন্তর কাপড় সেদ্ধ করতে হয়। উনি যে মোটেই ময়লা সইতে পারেন না। আজ গিয়ে বলব এখন, ঘাটে কাপড় কাচলে ঠাকরুণ বকেন, আলাদা ঘাট না করে দিলে কাপড় কাচা হবে না।"

দুষ্টামীভরা মুখে সে কল্যাণীর পানে তাকাইয়া রহিল।

কল্যাণী কথা বলিতে পারিল না। ক্রোধে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সে কেবল দুইটী চোখে অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। যদি সম্ভব হইত তাহা হইলে চোখের আগুনে সে এই অস্পৃশ্যা দুর্ভাগিনীকে দগ্ধ করিয়া ফেলিত।

চন্দ্রা বিনীতভাবে বলিল, "এখন আজ তো ওঠো ঠাকরুণ, কাপড়খানা আর একবার আছাড় দিতে দাও। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমার বাড়ীতে যাওয়া আসা করে বলে দাদাবাবুকে ঘেন্না কর না তো,—ঘরেদোরে উঠতে দাও তো?"

ঘৃণায় কল্যাণীর পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত শিরশির করিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি ঘড়াটা ডুবাইয়া লইয়া এক পাশ কাটাইয়া দ্রুতপদে উঠিয়া গেল। পিছনে অস্পৃশ্যা বাগ্দীর মেয়েটী যে প্রচুর হাসিয়া একেবারে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল, তাহা সে পিছন ফিরিয়াও দেখিল না।

বাড়ীতে ফিরিয়া ঘড়াটা দুম করিয়া বারাণ্ডায় নামাইয়া কাপড় ছাড়িয়া সে রান্নাঘরে প্রবেশ করিল।

তাহার মুখে বিজয়িনীর হাসি; নীচ বাগ্দিনী তাহাকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না, তাহাকে দশ কথা শুনাইয়া দিল।

তাহার স্বামী চন্দ্রার হাট-বাজার করিয়া দেয়, তাহার বাড়ীতে অনেক সময় কাটাইয়া দেয়। উঃ, এ কথাটা মনে করিতেও ঘৃণায় সমস্ত শরীর ও মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠে। মানুষের কি জঘন্য প্রবৃত্তি! ইহারা জাতিধর্ম্ম কিছুই মানে না!

ছিঃ, যে স্বামী বাগ্দীর বাড়ী যাতায়াত করে, নিজের জাতিধর্ম্ম যে বিসর্জ্জন দিয়াছে, তাহারই উচ্ছিষ্ট সে আহার করে। দেবতা ভাবিয়া সে কাহাকে অর্ঘ্য সাজাইয়া দিতেছে! না, এখন হইতে সে সতর্ক হইবে; স্বামী-সেবা সে করিবে, তাই বলিয়া নিজের ধর্ম্ম সে ঘুচাইবে না।

কিন্তু এ কল্পনাতেও সে চিত্তে শান্তি পাইল না। স্বামীকে জব্দ করিবার উপায় কি? এমন শাস্তি দেওয়া আবশ্যক, যাহা ওই নির্লিপ্ত লোকটীর মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথিয়া যায়; সে বুঝিতে পারে—অনুতাপ করে। মরিয়া তাহাকে জব্দ করিতে পারা যায়, কিন্তু সে যে অনুতাপ করিবে, তাহা তো কল্যাণী দেখিতে পাইবে না, তবে সেরূপ জব্দ করিয়া ফল কি?

দিন কয়েকের জন্য মাসীমার বাড়ী চলিয়া গেলে হয় না? মাসীমা সেবার তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য নিজের ছেলেকে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু সে যায় নাই। বিশ্বপতি তাহাকে যাইবার অনুমতি দিয়াছিল, কিন্তু তাহারই কষ্ট হইবে ভাবিয়াই কল্যাণী যায় নাই।

"বউদি, বাড়ী আছ নাকি?"

সমবয়স্কা রমা কখন বারাণ্ডায় উঠিয়াছিল, তাহা কল্যাণী জানিতেও পারে নাই। ডাক শুনিয়া সচেতন হইয়া সে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, আছি।"

ঘরের দরজায় উঁকি দিয়া রমা বলিল, "বাপ রে, এখন ওই অন্ধকার ঘরের মধ্যে বসে কি করছ ভাই?"

কল্যাণী বাহির হইয়া আসিল, একখানা পিঁড়ি পাতিয়া দিয়া শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "বসো ভাই।"

রমা পিঁড়িখানা সরাইয়া রাখিয়া মেঝেয় বসিয়া বলিল, "কখন এসেছি, ডেকে ডেকে ফিরে যাচ্ছিলুম। তার পর হঠাৎ রান্নাঘরের দরজা খোলা দেখে মনে হল ঘরেই আছ, কোথাও যাও নি। ওই অন্ধকার ঘরে চুপচাপ বসে কি করছিলে বল দেখি? কাজ যে কিছুই করছিলে না, তা দেখেই বুঝেছি।"

কল্যাণী বলিল, "কাজ ছিল না কি রকম? উনোন ধরানোর চেষ্টা করছিলুম। তার পর ভাত চড়াব, মসলা পিসব, তরকারী কুটব—"

বাধা দিয়া মুখ ঘুরাইয়া রমা বলিল, "ওগো হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি সব জানি, বুঝাচ্ছ কাকে? আর কেউ হলে তাকে যা তা বলে বুঝাতে পারতে। আমার চোখে ধুলো দেওয়া বড় সহজ কথা নয়। দাদার ব্যবহারের কথা ভাবছিলে,—না? কবে পুরী যাচ্ছেন সে সব কথা শুনেছ কিছু—বলেছেন?"

যেন আকাশ হইতে পড়িয়া কল্যাণী বলিল, "পুরী যাওয়া কি রকম?"

রমা বলিল, "আহা, যেন উনি কিছুই জানেন না? দাদা নন্দার সঙ্গে পুরী যাচ্ছে, এ কথা গাঁয়ের সকলেই শুনেছে,—শুনতে পাওনি শুধু তুমি; তাই নিরিবিলি অন্ধকার রান্নাঘরে একলা বসে ভাবছিলে আর চোখ মুচছিলে—না?"

কল্যাণী সগর্জ্জনে প্রতিবাদ করিল, "কক্ষণ না। আমার চোখের জল এত সস্তা নয় যে একটু আঘাত লেগেই ঝরে পড়বে রমা।"

রমা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "ভালো কথা, সে জন্যে তোমায় তো নিন্দে করছি নে ভাই বউ-দি; বরং প্রশংসাই করছি। কিন্তু সত্যি বল দেখি ভাই—দাদার এখনও কি ওই নন্দার আঁচল ধরে ওর পেছনে পেছনে বেড়ানো ভালো দেখায়? তুমি সে সব কথা শুনেছ—না?"

একেবারে মলিন হইয়া গিয়া কল্যাণী বলিল, "না, আমি কিছুই শুনি নি। তুমি একদিন কি সব বলবে বলেছিলে—"

রমা মাথাটা কাত করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, বলব ভেবেছিলুম; কিন্তু দরকার হয় নি বলেই বলি নি। ভেবেছিলুম, দাদা নিজের ভুল সামলাতে পেরেছেন। এখন দেখছি মাকাল ফলের গুণ পরীক্ষা ক'রে ঠকলেও পাখীরা ওর রং দেখেই ছুটে যায়। নন্দাকে দেখেছ কি বউ-দি? দাদা এককালে তাকেই বিয়ে করবার জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। নন্দাও কতদিন আমাদের সঙ্গে বলেছিল—সে দাদাকে ছাড়া আর কাউকেই বিয়ে করবে না,—তার জীবন পণ। কিন্তু বিয়ে হলো না,—নন্দার বাবা তাকে গরীবের হাতে দিতে রাজী হন নি। তাঁর তো ওই একটিমাত্র মেয়ে, তার ওপর মেয়ে সুন্দরী। কাজেই তিনি বড়ঘরে মেয়েকে দেওয়ার আশা করেছিলেন। হলও ঠিক তাই;—মেয়ের পেছনে তিনি অজস্র টাকা ঢাললেন, তার বিয়ে হল, জমীদারের একমাত্র শিক্ষিত ছেলের সঙ্গে, আর দাদার বিয়ে হয়ে গেল তোমার সঙ্গে।"

কল্যাণীর মনে হইল তাহার চোখের সামনে আজ পাঁচ বৎসর ধরিয়া যে কৃষ্ণ-যবনিকা পড়িয়া ছিল, তাহা হঠাৎ উঠিয়া গেল। কল্যাণী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল মাত্র।

একটু থামিয়া ক্ষীণকণ্ঠে সে বলিল, "নন্দাকে আমি দেখি নি, তবে সে যে খুব সুন্দরী, তা শুনেছি।"

রমা বলিল, "দেখবে কি করে? নন্দার বাবা এই রকম সব গোলমাল দেখে মেয়েকে নিয়ে কলকাতায় যান। সেখানেই বিয়ে হয়। তার পর তাঁরা আর দেশেই আসেন নি। নন্দার বাবা

যারা গেলে ওর মা এই এক বছর মাত্র দেশে ফিরেছেন। নন্দাও এই সবে দশ দিনের কড়ারে ছয় বছর পরে দেশে পা দিয়েছে।"

কল্যাণী একটুকরা হাসি শুষ্ক ওষ্ঠে ফুটাইয়া তুলিয়া বলিল, "কিন্তু সেই পুরানো পচা ভালোবাসাটা আজও ওদের দু'জনের কেউ ভুলতে পারে নি বলে মনে হয়—না ?"

রমা মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "দূর, তা কি ভোলা যায় ? ভালোবাসা জিনিসটা যদি অত অল্পেতেই মিলিয়ে যেত, তা হলে আর ভাবনা থাকত না,—কেউ আজ অতীতের কথা ভেবে চোখের জলও ফেলত না। সে জিনিসটা মনের অতল তলে চাপা থাকে। ওপরে হয় তো অনেক প্রলেপ পড়ে, কিন্তু হাজার প্রলেপ দিলেও ভেতরের সে জিনিস বিলীন হয় না। এই দেখ না—আমরা সবাই ভেবেছিলুম দাদা সে সব ভুলে গেছে। হয় তো দীর্ঘকালের অদর্শনে, মনে হয়েছিল, দাদা নন্দাকে ভুলে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য্য দেখ—যেই নন্দাকে দেখা—অমনি সব ঘুচে গিয়ে মনের মধ্যে জেগে উঠল একমাত্র নন্দাই। সেখানে আর কেউ নেই, —না তুমি, না দাদার আজকালের প্রিয়তমা চন্দ্রা—"

রমা প্রচুর হাসিতে লাগিল।

কল্যাণী হাসিল না, মুখখানা বড় গম্ভীর করিয়া সে অদূরে একটা গাছের সরু ডালে বসিয়া যে ছোট পাখীটী কত রকম ভঙ্গী করিয়া নাচিতেছিল, তাহারই পানে তাকাইয়া রহিল।

রমা বলিল, "দেখ না, নন্দা এসেই—আর কাউকে না—একেবারে দাদাকেই দিলে খবর। আর দাদা আমার সব ফেলে ভোঁ করে ছুটল তার কাছে। এ কয়টা দিন তাঁর চুলের আগা দেখতে পেয়েছ কি বউ-দি ?"

শুষ্ক হাসিয়া কল্যাণী বলিল, "হ্যাঁ, নেহাৎ স্বামীর কর্ত্তব্য পালন করতে স্ত্রীকে পাহারা দিতে, রাত এগারটায় এসে কয়েক ঘণ্টা নাক কান বুজে থেকে, ভোর পাঁচটা হতে না হতে চলে যান।"

রমা বলিল, "তা বুঝেছি।"

একটু সময় চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, "দাদা অন্ততঃ পক্ষে একবারও তোমায় বলবেন তিনি পুরী যাচ্ছেন। আমার কথা যদি শুনতে চাও—তাঁকে কিছুতেই যেতে দিয়ো না, তাতে তোমারই ভালো হবে। এখনও যদি ধরে রাখতে পারো। একবার এ বাঁধন কাটলে আর বাঁধন দিতে পারবে না—এ কথা ঠিক জেনে রেখো।"

কল্যাণী একটু হাসিল, আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "যে নিজেই পালাতে চায়, তাকে কেউ ধরে রাখতে পারে ভাই ? যে পিছল পথে পা দিয়ে নেমে চলেছে—সে সেই পিছলে যাওয়ার আরামটুকু ত্যাগ করতে চায় না, এই যা দুঃখ।"

সে নিস্তব্ধ হইয়া সামনের দিকে তাকাইয়া রহিল।

৬

সাত বৎসর পূর্ব্বেকার কথা, যেদিন বিশ্বপতি সত্যই নন্দাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল।

নন্দা রাখাল মিত্রের একমাত্র কন্যা। নন্দা ও বিশ্বপতি পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসিত,—তথাপি রাখাল মিত্র ইহাদের বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত হন নাই।

বিশ্বপতি শিক্ষিত নহে, তাহার অবস্থাও ভালো ছিল না। এরূপ পাত্র রাখাল মিত্র একমাত্র কন্যার জন্য নির্ব্বাচন করিতে পারেন নাই।

ব্যাপারটা যখন অনেক দূর গড়াইয়া গিয়াছিল, তখন অবস্থা গুরুতর দেখিয়া তিনি গ্রামের বাস তুলিয়া দিয়া, স্ত্রী-কন্যা লইয়া কলিকাতায় চলিয়া যান। তাহার পর হইতে বিশ্বপতির মুখের হাসি মিলাইয়া গিয়াছিল। ইহার পর নিতান্ত বাধ্য হইয়া কেবল মায়ের জিদে পড়িয়াই সে কল্যাণীকে বিবাহ করিয়াছিল।

মধ্যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল নন্দার বিবাহ হইয়া গেছে। তাহার পর এই দীর্ঘ সাত বৎসর পরে আবার উভয়ের দেখা হইয়াছে।

নন্দা প্রস্তাব করিল, "আমাদের সঙ্গে পুরী চল না বিশু-দা। যে চেহারা হয়েছে, এখানে থাকলে আর যে বাঁচতে হবে না, তা বেশ বুঝছি। আমরা ওখানে দু-তিন মাস থাকব। তুমিও যদি এই মাস দু-তিন ওখানে থাক, তোমার স্বাস্থ্য আবার ফিরে আসবে।"

বিশ্বপতি প্রথমটায় কোন উত্তরই দিতে পারে নাই। ধনীর গৃহের বধূ নন্দা বাল্যসঙ্গী বিশুদাকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়াই তাহার বিশ্বাস ছিল। নন্দা দশ দিনের জন্যে দেশের মাটীতে পা দিয়া আগেই যখন বিশুদাকে ডাকিয়া পাঠাইল, তখন, আনন্দে কি বিস্ময়ে কে জানে,

কি একটা ভাবে তাহার সারা অন্তর পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া নন্দার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল।

নন্দা বিস্ময়ে খানিক তাহার পানে তাকাইয়া থাকিয়া, তাহার পর হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিয়াছিল, "বউ যত্ন করে না বুঝি,—খেতেও দেয় না ?"

প্রথমেই এই প্রশ্ন শুনিয়া বিশ্বপতি তাহার বড় বড় চোখ দুইটী বিস্ফারিত করিয়া নির্ব্বাকে শুধু তাহার পানে তাকাইয়া ছিল। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "যত্ন করে না, খেতে দেয় না—কি করে জানলে ?"

স্পষ্টবাদিনী নন্দা উত্তর দিয়াছিল, "তোমার চেহারা দেখে। সাত বছর আগে যে বিশুদাকে দেখে গিয়েছিলুম, তার সঙ্গে তোমার চেহারার এতটুকু মিল নেই। তাতেই বুঝতে পারছি—যত্ন কেউ করে না, খেতেও পাও না।"

বিশ্বপতি মৃদু হাসিয়া বলিয়াছিল, "সে বেচারাকে সে দোষ দিয়ো না নন্দা, সে আমায় যত্নও করে, যা পায় খেতেও দেয়। গরীবের ঘরে রাবড়ী পোলাও তো জোটে না, শাক ভাতই খেতে হয়। চেহারা যদি ভালো থাকবার হতো ওতেই থাকত,—সে জন্যে তাকে দোষ দেওয়া চলে না। নিজের দোষে নিজের চেহারা নষ্ট করেছি, বউয়ের কোন দোষ নেই। বরং, এ কথা জোর করে বলতে পারি—সে আমায় এত যত্ন করে—হয় তো অনেক স্বামী, স্ত্রীর কাছে এমন যত্ন পায় না।"

নন্দার মুখখানা নিমেষে মলিন হইয়া গিয়াছিল। তাহার পরই সে হাসিয়া ফেলিয়া বলিয়াছিল, "উঃ, তুমি যে বউয়ের প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ হয়ে উঠলে বিশুদা। কিন্তু সত্যি করে বল দেখি, বউয়ে যত্ন করবে না তো কি পরে এসে যত্ন করবে ? বউয়ের কর্ত্তব্যই যে স্বামীকে যত্ন করা, সেবা করা।"

সেদিন এইখানেই কথাবার্ত্তা শেষ হইয়া গেল।

দু'দিন থাকিতে থাকিতে নন্দা লোকের মুখে শুনিতে পাইল, বিশ্বপতি নিজেই তাহার স্বাস্থ্য ও চরিত্র নষ্ট করিবার জন্য দায়ী,—সত্যই বেচারা বউটীর উপর এ জন্য দোষারোপ করা চলে না, আজ ছয় সাত বৎসর সে অধঃপাতে গিয়াছে। তাহাকে সৎপথে ফিরাইবার জন্য কল্যাণী বড় কম চেষ্টা করে নাই, কিন্তু তাহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গেছে।

ছয় সাত বৎসর!—নন্দা যেন চমকাইয়া উঠিয়াছিল। কোন্ সেই একটী দিনের অতীত স্মৃতি তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে গোপনে সে চোখের জল মুছিয়াছিল।

সে গোপনে বিশেষ ভাবে সন্ধান লইয়া জানিল, বিশুদার স্ত্রী নেহাৎ ভালো মানুষ। নহিলে এত দিন হয় তো স্বামীকে ফিরাইতে পারিত। চন্দ্রাকে লইয়া যে কেলেঙ্কারী কাণ্ড চলিয়াছে, সে কথাটাও নন্দার নিকট গোপন রহিল না। বিশুদার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া নন্দা সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

বিশ্বপতিকে পুরীতে লইয়া যাইবার কথা সে যখন আবার তুলিল, তখন বিশ্বপতি মাথা চুলকাইয়া বলিল, "সে কি করে হবে নন্দা, দুই একদিন নয়, একেবারে কয়েক মাসের জন্যে যাওয়া—"

নন্দা রাগ করিল, বলিল, "ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয় বিশুদা,—তোমারই বা যাওয়া না হবে কেন ? তোমার এমন কি বিষয়-সম্পত্তি আছে যা তুমি না থাকলে একেবারে লাটে উঠবে ? সম্পত্তির মধ্যে তো ওই কয়েক বিঘা জমী। সেও তো একজনের হাতে দিয়ে রেখেছ। কাজেই, ওর কথা ভাববার তোমার দরকার নেই। ও সব বাজে কথা রেখে দাও বিশুদা। আর সকলকে ওই সব যা তা কথা বলে বুঝাতে পারবে, আমায় পারবে না। তুমি সহজে না যেতে চাও, আমি তোমায় জোর করে নিয়ে যাব,—তোমায় না নিয়ে আমি যাচ্ছি নে।"

নিতান্ত নিরুপায় ভাবেই বিশ্বপতি বলিল, "বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করবার জন্যেই যে যেতে পারছিনে, তা নয় নন্দা, যেতে আমারও খুব ইচ্ছে আছে। তবে কি জানো—রাঙাবউ একেবারে একা থাকবে, ওকে দেখতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। একা মেয়ে মানুষ কি করে থাকবে, কেই বা ওকে দেখাশুনা করবে, আমি কেবল তাই ভাবছি।"

নন্দা অকস্মাৎ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, "থাক, অতটা ভালোবাসা আর নাই দেখালে বিশুদা, তবু যদি আমার কিছু শুনতে বাকি থাকত। এই যে শুনতে পাচ্ছি তুমি অনেক রাতই বাড়ী থাক না, মাসের মধ্যে পঁচিশ দিন তুমি বাড়ীতে খাও না,—সে সব দিন রাতগুলো কেমন করে তার কেটে গেছে, সেটা ভেবে দেখেছ কোন দিন ?"

বিশ্বপতি যেন সচেতন হইয়া উঠিল,—"কি রকম ? এ সব কথা তুমি কোথা হতে শুনলে বল দেখি, কে বললে ?"

নন্দা বলিল, "শুনেই বা লাভ কি? নাম করব কার, গাঁয়ের লোক সবাই এই এক কথাই বলছে। এখানে তুমি থাকলেও বউ যেমন থাকে, তুমি চলে গেলেও ঠিক তেমনি থাকবে। বরং পতিব্রতা মেয়েদের মত মনে করে শান্তি পাবে—সে কষ্ট পাক দুঃখ পাক—তার স্বামী তো ভালো আছে, তার স্বাস্থ্য তো ভাল আছে।"

বিশ্বপতি একটু হাসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু হাসি ফুটিল না, মুখখানাই কেবলমাত্র বিকৃত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "থাক, আর বলতে হবে না নন্দা, আমি তোমার সঙ্গেই যাব। তুমি কবে যাচ্ছো বল দেখি?"

নন্দা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "আজই রাত্রে রওনা হওয়ার জন্যে তাগাদা এসেছে। উনি হাওড়ায় এসে থাকবেন, আমরা এদিক হতে যাব, এই ব্যবস্থা করে পত্র দিয়েছেন। তুমি তা হলে আর দেরী করো না, বউকে দেখবার শোনবার জন্যে কাউকে ঠিক করে দিয়ে তোমার যা জিনিসপত্র নিয়ে এসো।"

বিশ্বপতি তথাপি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নন্দা জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কি,—আর কোন কথাবার্ত্তা আছে না কি?"

বিশ্বপতি মাথা নাড়িল।

নন্দা বলিল, "বুঝেছি, তোমার এ গাঁ ছেড়ে যেতে মন সরছে না। বলি, বউয়ের ওপর তো এতটুকু মায়াদয়া নেই শুনেছি, তবে কিসের মায়ায় যেতে চাচ্ছো না শুনি?"

বিশ্বপতি হাসিল, বলিল, "কি যে বল নন্দা—" সে হাসিল বটে, কিন্তু তাহার হাসিতে একটুকুও জোর ছিল না।

নন্দা বলিল, "তা হলে যাও, আর দেরী করো না। সনাতনকে বলে এসো—তুমি যে তিন মাস পুরীতে থাকবে, এই তিন মাস যেন সে তোমার বাড়ী, বউ চৌকী দেয়। তোমার বউকেও বেশ করে বুঝিয়ে বলে এসো—তোমার কোন ভয় নেই, এতে তোমার ভালোই হবে। আর যাওয়ার সময় বাগ্দি পাড়াটা ঘুরে যেয়ো একবার। ওদেরও তো একবার জানানো দরকার, নইলে সে বেচারারাই বা কি ভাববে।"

তাহার শ্লেষপূর্ণ কথাটা বিশ্বপতির বুকে বড় বেশী রকমই আঘাত দিল, তাহার সুগৌর মুখখানা আরক্ত হইয়া উঠিল। সে উষ্ণ স্বরে বলিল, "সেই সঙ্গে এ খবরটা তোমার পাওয়া উচিত ছিল নন্দা, —বাগ্দী-পাড়ায় যাকে খবর দেব, সে নেই,—আজ কয়দিন হল তোমারই কাকার সঙ্গে কলকাতায় চলে গেছে।"

নন্দা যেন আরামের একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "তাই না কি,—বাঁচলুম। আমার কাকার সঙ্গে সে যেখানে খুসি যাক, আমার তাতে এতটুকু আপত্তি নেই; কারণ, আমার কাকা বিপত্নীক, উনি গেলে ওঁর পেছনে কাঁদতে কেউ নেই। তিনি অধঃপাতে গেলেও কারও কিছু আসবে না যাবে না, ক্ষতি বৃদ্ধি তাতে কারও নেই। তোমার অধঃপাতে যাওয়ার সঙ্গে আমার কাকার অধঃপাতে যাওয়ার ঢের তফাৎ আছে, সেটা ভেবে দেখো। যাক, তোমার ঘাড় হতে যে পেত্নী নেমে গেছে, এর জন্যে আমি হরিলুট দেব।"

বিশ্বপতি মলিন হাসিয়া বাহির হইয়া গেল।

পথেই সনাতনের সঙ্গে দেখা। বিশ্বপতি তাহাকে জানাইল, সে মাস দুই তিনের জন্য পুরী যাইতেছে। এই দুই তিন মাস সনাতনকে তাহার বাড়ী দেখাশুনা করিতে হইবে।

সনাতন জিজ্ঞাসা করিল, "হঠাৎ যে পুরী চললেন, মানে?"

বিশ্বপতি উত্তর দিল, "মানে আর কি? ওরা যাচ্ছে, দয়া করে সঙ্গে নিচ্ছে,—ভাবলুম পরের দয়ায় এই সুযোগে যদি জগন্নাথ দর্শনটা হয়ে যায়, যাক না। বাড়ীর ভার কিন্তু তোমারই ওপরে থাকল সনাতন। সব যেন ঠিক থাকে দেখো। তোমার মা-লক্ষ্মীকে দেখাশোনা—"

সনাতন একটু হাসিল, বলিল, "সে কথা আমায় আর বলতে হবে না দা-ঠাকুর। এই যে প্রায়ই রাতে তুমি বাড়ী থাক না,—মা-লক্ষ্মী একা কি ওই বাড়ীতে থাকতে পারে,—কাজেই এই বুড়োকেই গিয়ে পাহারা দিতে হয়। যাক, কপালে যখন জুটল, ঠাকুর দর্শন করে এসো, আমি ওঁকে দেখাশোনা করব।"

নিশ্চিন্ত হইয়া বিশ্বপতি বাড়ী আসিল।

"কই গো রাঙাবউ, কোথায় গেলে? বাক্সের চাবিটা একবার দাও দেখি, বিশেষ দরকার।"

কল্যাণী রন্ধন গৃহ পরিষ্কার করিতেছিল, হাত ধুইয়া অঞ্চল হইতে চাবি খুলিয়া স্বামীর সামনে ফেলিয়া দিল।

বিশ্বপতি তাড়াতাড়ি বাক্স খুলিয়া কাপড় জামা বাছিতে লাগিল।

পার্শ্বেই দাঁড়াইয়াছিল কল্যাণী, শুষ্ক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "পুরী যাচ্ছো, ফিরবে কবে?"

বিস্মিত ভাবে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বিশ্বপতি জিজ্ঞাসা করিল, "জানলে কি করে?"

চোখ দুইটী জ্বালা করিতেছিল, তবু কল্যাণী হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "খবরটা আমায় কোন রকমে না জানানোই ইচ্ছে, তা আমি জানি। সারা গাঁয়ের লোক জানতে পারলে, আমি জানতে পারব না? যাক, ফিরছ কবে, এখানকার কি ব্যবস্থা করে রেখে যাচ্ছো?"

বিশ্বপতি বলিল, "ফিরতে বোধ হয় মাস দুই তিন দেরী হবে। এখানকার ব্যবস্থা ঠিক করেছি। সনাতন রয়েছে, তোমার কিছুমাত্র ভাবনা করতে হবে না। আমি হয় তো এর মধ্যেও ফিরে আসতে পারি। মহাপাপী লোক, শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে কি মন টিঁকে থাকবে? ওই জন্যেই না কোথাও যেতে পারিনে, গেলেও একদিনের বেশী দু'দিন থাকতে পারিনে।"

কথাগুলি বলিয়া সে প্রচুর হাসিতে লাগিল। তাহার সে হাসিতে কল্যাণীর গম্ভীর মুখখানা আরও গম্ভীর হইয়া উঠিল মাত্র।

ছোট স্যুট-কেসটার মধ্যে দু'খানা কাপড় জামা গুছাইয়া লইয়া বিশ্বপতি উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "তা হলে এখনই চললুম রাঙাবউ, ওদের ওখানেই খাওয়া দাওয়া হবে, নন্দা বলে দিয়েছে। সনাতন সন্ধ্যেবেলাই আসবে এখন, তোমার কোন ভয় ভাবনা নেই। নিশ্চিন্ত হয়ে থেকো, নিজের শরীরের দিকে নজর রেখো—বুঝলে?"

দুঃখের আবেগে কল্যাণীর সমস্ত অন্তর ভরিয়া উঠিয়াছিল। নিষ্ঠুর—বড় নিষ্ঠুর। সংসারী সে, তাহার সবই তো আছে, কাহার ডাকে সে একটী মুহূর্তে বাড়ী, ঘর, স্ত্রী, সব পিছনে ফেলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে! সে কে? সে তাহাকে কতখানি দিয়াছে?

আর কল্যাণী, সে স্বামীকে সর্ব্বস্ব দিয়া দাসীরও অধম হইয়া, কত দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া রহিয়াছে! তাহার কথা বিশ্বপতি একটীবার মনে করিল না, তাহার কষ্টের পানে একটী বার চোখ তুলিয়া চাহিল না।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কল্যাণী ভাবিল স্বামীর হৃদয়ে তাহার স্থান কোথায়? বিবাহ দুইটী মানুষকে একত্র করে, তাহাদের জীবন সুখময় করে বলিয়া যাহারা বিশ্বাস করে, তাহাদের সে ধারণা ভুল। বিশ্বপতির হৃদয় অন্যের অধিকৃত, সেখানে বিবাহিতা পত্নীর স্থান কোথায়?

স্বামীর পিছনে চলিতে চলিতে আর্দ্রকণ্ঠে সে বলিল, "তোমার শরীর মোটেই ভালো নয়, মাঝে মাঝে পত্র দিয়ে জানাতে পারবে কি কেমন আছ?"

চলিতে চলিতে বিশ্বপতি হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল। মুখখানা নত করিয়া পত্নীর মুখের পানে তাকাইয়া দেখিল, তাহার বড় বড় দুইটী চোখে জল টল টল করিতেছে।

কি মনে করিয়া সে চট করিয়া হাতখানা কল্যাণীর স্কন্ধে রাখিল। মুখখানা নত করিতেই কল্যাণীর ললাটে ঠেকিল। তখনই চমকাইয়া উঠিয়া দুই পা পিছনে সরিয়া গিয়া সে বলিল, "দেব বই কি, তুমিও দিয়ো।"

সে দ্রুতপদে চলিয়া যাইতে যাইতে একবার পিছন পানে তাকাইয়া দেখিল, কল্যাণী আড়ষ্ট ভাবে সেইখানেই দাঁড়াইয়া তাহার পানে তাকাইয়া আছে, —তাহার চক্ষু দিয়া নিঃশব্দে অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতেছে।

আনন্দপূর্ণ মনটা কি জানি কেন বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

৭

বড় দুঃখেও মানুষের হাসি আসে।

তাই প্রথম যেদিন নিশীথ রাত্রে বাড়ীর উঠানে কোথা হইতে গোটাকত ইঁট আসিয়া পড়িল, সেদিন কল্যাণী না হাসিয়া থাকিতে পারে নাই।

সনাতন ঘুম ভাঙ্গিয়াই লাঠি হাতে ছুটিয়াছিল। কিন্তু যাহারা ঢিল ছুড়িয়াছিল, তাহারা, তাহার যথাস্থানে পৌঁছিবার অনেক আগেই, অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া নিষ্ফল আক্রোশে ফুলিতে ফুলিতে সনাতন বলিল, "বুঝেছ মা-লক্ষ্মী, এ সব এই গাঁয়ের বদ ছোঁড়াদের কাজ। কেবল ওরা কেন, গাঁয়ের অনেক লোকই জানে দা'ঠাকুর পুরী গেছে, দুই তিন মাস বাড়ী আসবে না। ভাবছে—এই সময়ে একবার বীরত্ব দেখিয়ে নেওয়া যাক।"

কল্যাণী হাসিতেই সে একেবারে দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তীব্রস্বরে বলিল, "না, তুমি হেসো না মা, ওতে ছোটলোকগুলো প্রশ্রয় পেয়ে যায়। এটা হাসির কাজও নয়, কথাও নয়। আমি এর উপায় করব তবে আমার নাম সনাতন দাস।

কালই আমি এই সব বদ ছোঁড়াদের দেখে নেব। এই পাকা বাঁশের লাঠির ঘায়ে এক একটাকে কাবার করে দেব, জানাব,—সনাতন দাস বুড়ো হলেও তার বুকে সাহস আছে, হাতে জোর আছে।"

বাঁশের লাঠিটা সে দু-চারবার খুব জোরে মাটিতে আছড়াইল।

কথাটা শুনিয়া হাসি পায়। কিন্তু হাসিলে পাছে সনাতন আবার অতিরিক্ত রকম চটিয়া উঠে, তাই কল্যাণী হাসি সামলাইয়া গম্ভীর মুখে বলিল, "বুঝলুম তো সবই, কিন্তু কথা হচ্ছে কি—প্রকৃত দোষীকে পাবে তবে তো তাকে লাঠির ঘায়ে কাবার করবে। সত্যি, গাঁয়ে যত ছেলে আছে সবাই কিছু দোষী নয়,—আমার বাড়ী ঢিল ফেলতে সবাই আসে নি। ওদের মধ্যে দু-চারজন হয় তো এ কাজ করেছে, তুমি তাদের ধরবে কি করে?"

সনাতন ভাবিয়া দেখিল কথাটা সত্য। নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়া সে বলিল, "তাই তো! তবে?"

কল্যাণী বলিল, "একেবারে হাতে হাতে না ধরলে কিছুই করতে পারবে না। সন্দেহ করে তুমি ধরবে কাকে, লাঠি মারবে কার মাথায়?"

ইহার পর দুই তিন দিন সনাতন জাগিয়া পাহারা দিল। সে কয়দিন কোন উৎপাত হইল না, কাহারও সাড়া পাওয়া গেল না।

ঘাটে নরেনের স্ত্রী চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের বাড়ী না কি ঢিল পড়েছে ভাই?"

কল্যাণী গম্ভীর মুখে উত্তর দিল, "কই—না।"

সে বেচারা থতমত খাইয়া গেল।

সেদিন দুপুরে বেড়াইতে আসিয়া কাত্যায়নী বলিলেন, "কাজটা ভালো করনি বউ-মা,—ছেলেটাকে ওদের সঙ্গে কখনও পাঠাতে হয়? এই সামনে রথ আসছে,—লাখ লাখ যাত্রী সেখানে যাবে,—আর কি মড়কই না সেখানে ধরবে। এ সময় না কি কেউ কাউকে পুরীতে পাঠায়?"

শান্ত সুরেই কল্যাণী বলিল, "রথের সময়েই তো সকলে পুরী যায় জ্যেঠাইমা।"

জ্যেঠাইমা হাত নাড়িয়া বলিলেন, "তুমি আর বলো না বাছা। রথের সময় পুরীতে যায় কারা, যাদের আপনার বলতে কেউ নেই, কিম্বা যাদের পাঁচটা ছেলে পুলে আছে, নিজে গেলে বংশধ্বংস হবে না, তারাই যায়। বিশুর মত কয়টা ছেলে পুরী যায় বল দেখি?"

কল্যাণী বলিল, "ওঁরাও তো গেছেন, ওই নন্দা, তার মা, স্বামী—"

বিকৃত মুখে কাত্যায়নী বলিলেন, "জামাই কি সেখানে আছে গো, সে তো চলে এসেছে শুনেছি। সে হচ্ছে কাজের লোক, সে কি ওখানে বসে থাকতে পারে? আর নন্দা, মিত্রগিন্নির কথা বলছ,—ওরা মেয়েমানুষ, দুনিয়ার জঞ্জাল, ওরা সহজে মরছে না, সে তুমি ঠিক দেখে রেখো। পুরুষ যত মরে, হতভাগী মেয়েগুলো সে রকম মরে কি? মেয়েদের আমাদের দেশে যত বেশী দেখতে পাওয়া যায়, পুরুষ অত কই?"

কল্যাণী ইহার উত্তর দিতে গিয়া হঠাৎ নিজেকে সামলাইয়া লইল, দরকার নাই অনর্থক বিবাদে।

কাত্যায়নী বলিলেন, "তুমি বাছা আজকালকার মেয়ে হলেও স্বামীকে যে কি করে ঘরে আটক করে রাখতে হয় তা জানো না। বলি, তুমি যদি সে রকম মেয়ে হতে তা হলে কি বিশু আজ কোথায় হাড়ি-বাড়ী, বাগ্দি-বাড়ী, মুচি-বাড়ী ঘুরে বেড়াত, না এই নন্দার একটী কথায় ঘর পরিবার ফেলে এমনি করে দূর বিদেশে যেতে পারত? স্বামীকে ভালোর পথে আনা দূরে থাক, ওকে অধঃপাতের পথে আরও এগিয়ে তুমিই দিলে বাছা। নন্দার কথা দেশে জানে না কে? আগে তবু নরম-সরম ছিল, কথা বললে শুনতো, এখন একটা কথা বলতে গেলে সে দশটা কথা শুনিয়ে দেয়। ওই সেদিনে বললুম 'বাছা, নিজে যাবি যা, পরের ছেলেটাকে আরও অধঃপাতে দিতে আর কেন নিয়ে যাচ্ছিস, ওকে ছেড়ে দে।' তাতে হেসে বললে কি—'মার চেয়ে দরদী যে তাকে বলে ডান' তোমার নিজের চরকায় তেল দাও গে, আমার দিকে তাকিয়ে তোমার মাথা গরম করতে হবে না। শুনলে মা কথাগুলো? ও না হয় বড়লোকের মেয়েই হলো, বড় ঘরে না হয় বিয়েই হয়েছে। তা বলে এত দেমাক, এত অহঙ্কার, এ কি ধর্ম্মে সইবে?"

কল্যাণীর মুখে একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল।

সমস্ত দিনটা তবু যেমন-তেমন করিয়া কাটিয়া যায়,—রাত্রি হইলেই বিশ্বের ভাবনা সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বসে। বারাণ্ডায় পড়িয়া সনাতন দিব্য নাক ডাকাইয়া ঘুমায়, ঘরের মধ্যে কল্যাণী ছটফট করে।

আজ প্রায় এক মাস হইল বিশ্বপতি চলিয়া গেছে, এ পর্য্যন্ত একখানি পৌঁছা সংবাদ পর্য্যন্ত দেয় নাই। মানুষ এমনই করিয়া কি সব ভুলিয়া যায়,—কেবল সম্মুখ পানেই ছুটে, পিছন পানে ফিরিয়া চায় না?

সময় সময় মন বিদ্রোহী হইয়া উঠে। স্বামী স্ফুর্ত্তির জন্য চলিয়া গেছে,—আর সে তাহার স্মৃতিটুকু সম্বল করিয়া তাহার ভিটায় বাস করিবে কেন? কেবল বিবাহের দাবীটাই কি বড় হইল, সেই বন্ধনটাই শ্রেষ্ঠ, তাহারই বলে পুরুষ যত কিছু অত্যাচার অনাচার করিয়া যাইবে? অন্তরের বন্ধন যেখানে নাই, উপরের এই আলগা বন্ধন সেখানে কতক্ষণ অটুট হইয়া থাকিবে?

পাড়ার ছেলেগুলিও যেন বিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এতদিন বিশ্বপতি থাকিতে ইহারা কখনও চোখ তুলিয়া কল্যাণীর পানে তাকায় নাই, আজ বিশ্বপতি চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের চোখ কল্যাণীর উপর পড়িল।

অথচ এমন কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না, যাহা উপলক্ষ করিয়া তাহাদের বেশ দুইটা কড়া কথা শুনাইয়া দেওয়া যায়, অথবা সনাতনকে বলিয়া দিতে পারা যায়। তাহার বাড়ীর পাশ দিয়া অশ্রাব্য গান গাহিয়া চলিয়া যায়, কল্যাণী নীরবে শুনিয়া যায়, কথা বলিতে পারে না।

একদিন সনাতন নিজের কাণে শুনিয়া ছুটিয়া গিয়াছিল। ছেলেরাও জবাব দিয়াছিল—"তুমি চুপ করে থাকো সনাতন! আমরা পথ দিয়ে গান গেয়ে যাই, তাতে তোমাদের কিছু আসে যায় না। না শুনতে পারো, কাণ বন্ধ করে রাখ—ফুরিয়ে গেল।"

নিমাই ছেলেটী বরাবর এ বাড়ীতে যাওয়া-আসা করিত,—বিশ্বপতিকে সে দাদা বলিয়া ডাকিত,—এবং সেই জন্যই কল্যাণীকে সে বউদি বলিয়া ডাকিত। কল্যাণী কখনও তাহার সহিত কথা বলে নাই, অনেক সময় লুকাইয়া থাকিত।

বিশ্বপতির মনটা ছিল সাদা, সে স্ত্রীকে বলিত, "নিমাইকে দেখে অতটা লজ্জা করো না রাঙাবউ,—ওর মত পরোপকারী ছেলে পাওয়া দুর্ঘট! যে সব ছেলেরা বদমায়েসী করে ফেরে, নিমাই তাদের দলের নয়, এ আমি শপথ করে বলতে পারি।"

তথাপি কল্যাণী অবগুণ্ঠন খুলে নাই, কথাও বলে নাই। এই নিমাইয়ের মধ্যে সে কোন দিনই সন্দেহের লক্ষণ দেখিতে পায় নাই। এবার যেন তাহার একটু সন্দেহ হইল।

মাঝে কয়দিন সনাতনের জ্বর হইয়াছিল, তখন নিমাই অনবরত যাওয়া-আসা করিত, তদারক করিত, ঔষধ আনিয়া খাওয়াইত। ইহাতে কল্যাণী সত্যই যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিল, কৃতজ্ঞও হইয়াছিল বড় কম নয়।

স্বামী থাকতে সে কাহাকেও কোন দিন সন্দেহ করে নাই। এইবার প্রথম তাহার মনে হইল—না ডাকিতে নিমাই কেন আসিয়া সনাতনের শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিল?

আজকাল বাধ্য হইয়াই অবগুণ্ঠন খুলিতে হইয়াছে; তবু সে বড়-একটা কথা বলিতে চায় না।

নিমাই আজকাল অনেক জিনিষ আনিয়া দিতে সুরু করিয়াছে। প্রায়ই মাছ তরকারী চাকরের হাতে দিয়া পাঠাইয়া দেয়। সঙ্কুচিতা কল্যাণী একদিন সনাতনকে মাঝে রাখিয়া নিমাইকে শুনাইয়া বলিল, "নিমাই ঠাকুরপোকে বলে দাও সনাতন, আমি একলা মানুষ, এত মাছ তরকারীতে আমার কিছুমাত্র দরকার নেই। আমার যেমন করে দিন চলছে, এমনই চলবে, এ সব দেওয়ার দরকার নেই।"

এই সোজা কথাটাতেও নিমাই রাগ করিল, দুঃখ পাইল; বলিল, "এ অন্যায় কথা বউদি, সত্যি করে বল দেখি, বিশুদা থাকিতেও কি আমি জিনিষপত্র দিতুম না? আমি তো পয়সা দিয়ে কিনে কিছু দিচ্ছিনে, পুকুরের মাছ, বাগানের তরকারী পাঠিয়ে দেই। বরাবরই তো দিয়ে আসছি, কই,—বউদি তো কখনও কোন আপত্তি করেন নি, আজই যত আপত্তি তুলছেন।"

কল্যাণী একেবারেই এতটুকু হইয়া গেল। ইহার পর সে আর এ সম্বন্ধে একটী কথাও বলিতে পারে নাই।

নিমাই এ দেশের ছেলেদের নিন্দা করিত। এই সব ছেলেরা না পারে এমন কোন কাজ নাই। তা না হইবেই বা কেন? ইহারা কি শিক্ষা পাইয়াছে,—মেয়েদের যে সম্মানের চোখে দেখিতে হয়, তা কি ইহারা জানে? জন্ম হইতে এই দেশেই পড়িয়া আছে,—মেয়েদের ছোটবেলা হইতে নিতান্ত হেলার চোখেই দেখিয়া থাকে,—ভোগের বস্তু বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

নিমাই নিজে জীবনের বাইশটী বৎসর কলিকাতায় কাটাইয়া আজ মাত্র তিন বৎসর গ্রামে আসিয়া রহিয়াছে। গ্রামের ছেলেদের মধ্যে কাহারও সঙ্গে এখনও তাহার সম্প্রীতি হয় নাই। সে বি-এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। কাজেই, শিক্ষার গর্ব্ব তাহার মধ্যে বেশই আছে।

বলা বাহুল্য, নিমাই শীঘ্রই বেশ জাঁকাইয়া

বসিল; কল্যাণী ধারণায় আনিতে পারিল না—বাইশটা বৎসর, কলিকাতায় কাটাইয়া এবং বি-এ পর্য্যন্ত পড়িয়া নিমাইয়ের মন আজও তেমন হইতে পারে নাই, যাহাতে মেয়েদের মা-বোন ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। মুখে সে মেয়েদের মায়ের জাতি বলিয়া চরম সম্মান দেখাইলেও, অন্তরে তাহার অনেকখানি গলদ রহিয়া গেছে, এবং সেও মেয়েদের ভোগের বস্তু বলিয়াই মনে করে।

বাঘ কখনই নিজের স্বভাব ছাড়িতে পারে না। সে যতই ছদ্মবেশে থাক, ধার্ম্মিকের ভাণ করুক, উদর পূর্ণ করিয়া আহার করুক,—সময় পাইলেই সে শিকারের উপর লাফাইয়া পড়িবেই। গায়ের উপর মেষের আচ্ছাদন দিলেও সে মেষ হয় না,—তাহার মধ্যে হিংস্র জন্তুটী সর্ব্বদার জন্ম সচেতন হইয়াই থাকে। লাভের মধ্যে এই হয়—বাঘকে নিজ বেশে দেখিলে লোকে সাবধান হইতে পারে; কিন্তু মেষচর্ম্মাবৃত বাঘকে দেখিয়া কেহই সাবধান হইতে পারে না,—সেও নিজের ইচ্ছানুসারে নিজের হিংস্র প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া যায় মাত্র।

৮

ভাদ্রমাসের শেষে হঠাৎ একদিন সনাতনের মুখে কল্যাণী সংবাদ পাইল—বিশ্বপতির বড় অসুখ, তাহার না কি বাঁচিবার আশা নাই।

কল্যাণী কাঁদিবে না ভাবিয়াছিল, কিন্তু কোথা হইতে অজস্র চোখের জল অবাধ্য গতিতে নামিয়া আসিয়া তাহার বুক ভাসাইয়া দিয়া গেল।

মনে হইল—সে যাহাই করুক, যাহাই হোক, তবু সে কল্যাণীর স্বামী। আবার শুধু স্বামী হইলেই হইত না, কল্যাণী তাহাকে ভালোবাসে। স্বামীর ঠিকানা সে পাইয়াছিল, নিতান্ত রাগ করিয়াই সেও তাহাকে পত্র দেয় নাই। সে রাগটাও তো নিরর্থক নয়। তাহারও কি সেখানে পৌঁছাইয়া অন্ততঃপক্ষে একখানা পত্র দেওয়া উচিত ছিল না? সেই জ্যৈষ্ঠ মাসে সে গিয়াছে, ভাদ্রও প্রায় শেষ হইয়া আসিল, বাড়ী আসা দূরে থাক, একখানি পত্রও লেখার সময় তাহার হয় নাই।

কত দিন নিস্তব্ধ ঘরে বিছানায় শুইয়া পড়িয়া সে নির্জ্জলচক্ষে মনে মনে বলিয়াছে—এই কি ভালো কাজ? কত দিন সে অন্যমনস্ক ভাবে গুন গুন করিয়া গান গাহিয়াছে—

"সে কোথায় দূর বিদেশে হেসে কাটায় মধুরাতি।
হেথা যে বুকে আমার জ্বলে মরে আশা বাতি—
ভুলেছে সে,—তবু কেন তারে বাঁধি?"

পুঞ্জীভূত সকল রাগ দুঃখ অভিমান এই একটী সংবাদে আজ দূর হইয়া গেল। সে কি করিবে ভাবিয়া ঠিক করিতে না পারিয়া আকুলভাবে কাঁদিতে লাগিল।

সেখানে কে তাহাকে তেমন করিয়া দেখিবে? কল্যাণী যেমন ভাবে তাহার সেবাযত্ন করিতে পারিত, নন্দা তেমন করিতে পারিবে কি? না হয় সে বিশ্বপতিকে ভালোবাসে, বিশ্বপতি তাহাকে ভালবাসে; কিন্তু তবু তাহারা যখন সমাজে বাস করে, সমাজের আইন-কানুন মানিয়া দূরত্ব রক্ষা করিয়া তাহাদের চলিতেই হইবে। এ সময়ে যদি নন্দার স্বামী সেখানে থাকে, নন্দা তো বিশ্বপতির কাছে সর্ব্বদা থাকিতে পারিবে না।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা বিদ্যুৎ-চমকের মত তাহার মনে ভাসিয়া উঠিল। যদি বিশ্বপতির কিছু হয়, যদি সে ইহলোক ত্যাগ করে, যাইবে কার? নন্দার কতটুকু ক্ষতি হইবে? সে যেমন আছে তেমনই থাকিবে, তাহার নাম বাংলার অভাগিনীদের তালিকাভুক্ত হইবে না, সর্ব্বনাশ হইবে যে কল্যাণীর। সে রাগ করুক,—দূরে থাক, তবু কল্যাণী বিশ্বপতিকে ভালোবাসে, তাহার অকল্যাণ কল্পনায় কল্যাণীর অন্তর কাঁপিয়া উঠে।

তাহার সর্ব্বস্ব যায়, এ সংবাদ পাইয়া সে এখানে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে কি করিয়া? কিন্তু উপায় কই? সে সেখানে—সেই দূরদেশে যাইবেই বা কি করিয়া?

এতক্ষণ হয় তো সে বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে। তাহার পীড়িত শয্যাপার্শ্বে কেহ নাই, কেহ তাহার মাথার উপর স্নেহপূর্ণ হাতখানি রাখে নাই। কেহ তাহাকে দুইটা সান্ত্বনার কথা বলিতে নাই। সে একা বিছনায় পড়িয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে, হয় তো তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। উঃ, এ কল্পনাও যে অসহ্য—কল্যাণী যে আর থাকিতে পারে না।

সন্ধ্যার সময় নিমাই আসিবামাত্র সে তাহার সামনে আসিয়া পড়িল, উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া বলিল, "ঠাকুরপো, এ যাত্রা আমায় বাঁচাও, আমার ভাইয়ের কাজ কর। আমায় কালই তোমায় পুরী

নিয়ে যেতে হবে। ওঁর নাকি সেখানে বড্ড অসুখ, বাঁচবার কোনও আশা নেই।"

আজ এই প্রথম তাহার সঙ্কোচহীন কথাবার্ত্তা। বিপদে পড়িলে লজ্জা সঙ্কোচ কিছুই থাকে না।

নিমাই প্রবোধ দিয়া বলিল, "তা না হয় যাব, তার জন্যে তুমি এত কাঁদতে আরম্ভ করেছ কেন বৌদি?"

চোখ মুছিতে মুছিতে কল্যাণী রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "কান্না আসে না? সেখানে কেউ নেই,—কে তাঁকে দেখছে—সেবা করছে বল দেখি?"

বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

হঠাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া নিমাই বলিল, "ক্ষেপেছ বউদি, সেখানে নন্দা আছে তা জানো? সেবা করবার লোক যদি কেউ না থাকত, তোমায় নিশ্চয়ই যাওয়ার জন্যে খবর দিত। তা যখন দেয় নি, তখন জেনে রাখ, তোমার ও-সব মিথ্যে কল্পনা। নন্দা তাঁকে সে সব কষ্টের আভাসই পেতে দেয় নি, এ আমি ঠিক বলছি।"

সোজা কথাটা শুনিয়া কল্যাণী কেমন যেন হতভম্ব হইয়া গেল। তাহার অজ্ঞাতেই কখন তাহার চোখের জল শুকাইয়া গেল।

নিমাই গম্ভীর ভাবে বলিল, "তবু যেতে যখন চাচ্ছ, চল,—এর পর যে বলবে—ঠাকুর-পোকে এত করে বলা সত্ত্বেও সে নিয়ে গেল না—সেটী হবে না, অতবড় অপবাদটা আমি সইতে পারব না। আমি কালই তোমায় নিয়ে রওনা হব, গিয়ে তুমি নিজের চোখেই দেখতে পাবে বউদি—আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি কি না। গিয়ে দেখতে পাবে, বিশুদা দিব্যি আরামে শুয়ে থেকে নন্দার সেবা নিচ্ছেন, ভূপেনবাবুর চেয়েও সুখ-শান্তিতে আছেন, নন্দা দিন-রাত তাঁর পাশেই আছে। তুমি হঠাৎ গিয়ে পড়ে সেখানে একটা বিপ্লবই বাধিয়ে তুলবে মাত্র, ওঁদের নিরুপদ্রব শান্তি নষ্ট হবে, আর তাতে কেউই তোমার ওপর খুসি হবেন না, তোমার সতীধর্ম্মও সেখানে উপহাস্য হবে—এ আমি তোমায় লিখে দিচ্ছি।"

কল্যাণী মুখখানা অন্ধকার করিয়া বসিয়া রহিল।

নিমাই বলিল, "তা হলে তুমি তোমার কাপড় গুছিয়ে ঠিক করে রেখো, আমি কাল দুপুরের ট্রেণে তোমায় নিয়ে রওনা হব,—কেমন?"

কল্যাণী মাথা নাড়িল, শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "না থাক, আমি যাব না।"

একটু হাসিয়া নিমাই বলিল, "ওই তো তোমাদের মেয়েজাতির দোষ;—শোন যদি একটু কিছু হয়েছে অমনি ফেটে চৌচির হয়ে পড়। রাগ দুঃখ এখন শিকেয় তুলে রেখে দাও; যখন যাব বলেছ তখন চল একবার, নিজের চোখে সব একবার দেখে এসো বিশুদা কি ভাবে দিন কাটাচ্ছে।"

কল্যাণীর মুখখানা ক্রমেই নত হইয়া পড়িল। তাহারই স্বামীর সম্বন্ধে একজন অনাত্মীয় লোক যে এতগুলা কথা বলিল, তাহাতে সে একটী প্রতিবাদও করিতে পারিল না। করিবে কি করিয়া? সত্যই যে তাহার স্বামীর মধ্যে এমন কিছুই নাই, যাহা লইয়া তাহার পক্ষ হইয়া দুইটা কথা শুনাইয়া দিতে পারা যায়।

পরদিন নিমাই যখন একেবারে গাড়ী লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন সামনে একটী ছোট বাক্সে খানকতক কাপড় সাজাইয়া কল্যাণী স্তব্ধভাবে বসিয়া ছিল।

নিমাইকে দেখিয়াই সে বলিয়া উঠিল, "থাক ঠাকুরপো, আমি যাব না।"

নিমাই বলিল, "তা কি হয় বউদি? এখন সব ঠিক করে 'যাব না' বললে চলে না। আমি বাড়ীতে মাকে বলে এসেছি, গাড়ী পর্য্যন্ত সঙ্গে এনেছি, এখন আর ফিরে যাওয়া চলে না। চল, একবার না হয় চোখে দেখেই আসবে, সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রভুর দর্শনলাভও হবে। তোমাদের শাস্ত্রে মহাপ্রভুর দর্শন মহাপুণ্যের কাজ বলে—না? চল না, একঢিলে না হয় দুই পাখীই মেরে আসবে।"

বলিতে বলিতে সে হাসিতে লাগিল।

মনটা যদিও স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না, তথাপি কল্যাণী জোর করিয়া হাসিল, বলিল, "আমাদের শাস্ত্রে বলে,—তুমি কি আমাদের শাস্ত্র ছাড়া লোক?"

নিমাই বলিল, "নিশ্চয়ই। আমি কোন দিনই তোমাদের ওই ছত্রিশ কোটি দেবতাকে মানতে পারি নি, পারবও না। অনেক দিনই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছি বউদি, কেউ বশে আনতে পারে নি, আশা করি পারবেও না। এ একটা সৃষ্টিছাড়া লোক বউদি, কোন দিন ধর্ম্ম নামে জিনিষটার ওপর এতটুকু আস্থা হল না, যা শুনি তাইতেই যেন হাসি পায়। সত্যি কথা, ধর্ম্ম জিনিষটার অর্থ কোনদিনই আমি খুঁজে পাই নি। ধর্ম্ম অর্থ যা আমাদের ধারণ করে। তা হলে বলবে, ধর্ম্ম ছাড়লেই আমাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এ যেন একটা গাঁজাখোরের কথা—যে ধর্ম্মই আমাদের ধরে আছে।

অনেক নাস্তিকও তো আছে, যারা ধর্ম্ম জিনিসটাকে মোটেই মানে না। ওরা বেঁচে রইল কি করে বুঝাও।"

কল্যাণী শান্ত কণ্ঠে বলিল, "অত জ্ঞান পাই নি ঠাকুরপো, মোটামুটি জানি—যারা ধর্ম্ম ছাড়ে, জগতে দু'দিনের জন্মে তারা হেসে খেলে দিন কাটিয়ে গেলেও মরণের পরে তাদের নরকে যেতে হবে।"

নিমাই গম্ভীরমুখে বলিল, "ওই দেখ, গোড়াতেই একটা মস্ত বড় গলদ বাধিয়ে রেখেছ। স্বর্গ, নরক, ইহলোক, পরলোক, জন্মান্তর, এই রকম সব বড় বড় গালভরা নামগুলো মুখস্থ করে রেখেছ,—এগুলো সত্যিই আছে কি না, সে সম্বন্ধে কেউ খোঁজ করে প্রমাণ পেয়েছে? আমি সৎ কাজ করছি, অতএব স্বর্গ আমার; আর তুমি পাপ কাজ করছ, কাজেই নরক তোমার জন্মে নির্দ্দিষ্ট,—আগে ভেবে দেখ পাপ পুণ্য কাকে বলে, তার পর স্বর্গনরকের বিচার হবে। তুমি তোমার ছত্রিশ কোটী দেবতা মান, মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম কর, কাজেই স্বর্গে তোমার স্থান; আর আমি কিছু মানি নে, মানি শুধু আমার আত্মাকে, তাই আমি নাস্তিক, সেই জন্মেই আমায় যেতে হবে নরকে। বল দেখি, স্বর্গ কোন দিন দেখেছ, নরক নাম শুনেছ—চোখে দেখতে পেয়েছ? মরে কোথায় যাব তার ঠিক কেউ কোন দিন পায় নি, অথচ এতগুলি প্রাণ যে দেহপিঞ্জর ত্যাগ করে শূন্য-পথেই থেকে যাবে, সেকালের লোকেরা তা কল্পনাতেও আনতে পারে নি, তাই তারা মনগড়া দু'টো জায়গা রেখেছে। এ যুগের মানুষ যদি দেখেশুনে বুঝেসুঝেও তাই মানতে চায়, তাদের কি বলব বল দেখি?"

বিস্ময়ে দু'টি চোখ বিস্ফারিত করিয়া কল্যাণী নিমাইয়ের পানে তাকাইয়া রহিল। নিমাই দেবতা মানে না, তাহা সে জানে। কিন্তু সে যে স্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্য, ইহকাল, পরকাল সবই নিঃশেষে উড়াইয়া দিয়াছে, সে খবর সে পায় নাই। জগতে এমন লোকও আছে, যে কেবল প্রত্যক্ষ ইহলোকটাকেই মানিয়া যায়, বর্ত্তমানকেই শেষ বলিয়া জানে, ইহার পরে কি আছে তাহা দেখিতে চায় না, মানিতে চায় না?

নিমাই আর কোন কথা না বলিয়া নিজের হাতেই বাক্সটা বন্ধ করিয়া গাড়োয়ানকে বাক্স লইয়া যাইতে ডাকিল। সনাতনকে ডাকিয়া কিছু উপদেশ দিয়া কল্যাণীর পানে তাকাইয়া বলিল, "গাড়ীতে ওঠো, কথাবার্ত্তা বলতে বলতে যাওয়া যাবে এখন। এদিকে ট্রেণের সময় হয়ে এল, আর দেরী করলে চলবে না।"

কল্যাণী গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া বসিল, নিমাই সামনে বসিল।

সাদা কাশ ফুলে মাঠের অনেকখানি জায়গা ভরিয়া গিয়াছে, বাতাস আসিয়া তাহাদের পরশ করিয়া বুকে আনন্দের শিহরণ তুলিয়া পলাইতেছে। মাঝে মাঝে ধানের জমি সারি সারি চলিয়াছে। এই মাঠের ওপারে রেল ষ্টেশন।

শ্রান্ত নয়নে সবুজ মাঠের পানে তাকাইয়া কল্যাণী একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "অনেক কালের পর আজ ধানের জমি দেখতে পেলুম?"

এতক্ষণ সে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল বলিয়া নিমাইও কথা বলে নাই, এখন সেও কথা কহিল। বলিল, "তুমি যেখানে ছিলে, সেখানে বোধ হয় খুব ধানের জমি দেখতে পেতে বউদি?"

আর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কল্যাণী বলিল, "হ্যাঁ, তা পেতুম। আমার মাসীমার বাড়ী হতে খানিক দূরে সবুজ ধানের মাঠ দেখতে পাওয়া যেত। সেখানেও ভাদ্র আশ্বিন মাসে মাঠ ভরে এমনি কাশ ফুল ফুটত, বাতাস এসে তাদের বুকে ঢেউ দিয়ে যেত।"

নিমাই যেন কৌতুক অনুভব করিল, বলিল, "তুমিও এ সব ভাব? এ সব যে কবিদের কথা, তুমি পেলে কোথায়?"

লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিয়া কল্যাণী বলিল, "জানিনে কবিরা কি বলেন না বলেন। তবে আমি যে কবি নই, তা তো জানোই।"

নিমাই মাথা নাড়িয়া বলিল, "এ কাজের কথা নয়। কবিত্ব সবারই প্রাণে আছে,—কম আর বেশী, এই যা তফাৎ। যে চালনা করে ফুটিয়ে তুলবার, সেই হয় কবি। তা বলে যে বেচারা চালনা করতে পারে নি, সে অকবি হবে, এমন কথা আমি বলতে পারব না। সেই হিসাবে তুমিও কবি বউদি। এই দেখ না,—একটু কাজের ফাঁক পেয়েছ, তোমার কবিত্ব আবার জেগে উঠেছে।"

কল্যাণী পূর্ব্বকথার জের টানিয়া বলিল, "কারও বা জন্মান্তরের স্মৃতি অটুট থেকে ক্রমোন্নতি হতে হতে একটা জন্মে পূর্ণতা লাভ করে, এ কথা মানবে কি ঠাকুর-পো?"

নিমাই মাথা নাড়িল,—"না, আগেই বলেছি আমি জন্মান্তর মানি নে, কেন না, তার কোনও প্রমাণ আমি পাইনি। এই জন্যেই আমরা যা পাই তা চালনা করে বাড়াতে পারি, বিনা চালনায় তা ধ্বংস হয়ে যায়, এ কথা একটু আগেও বলেছি, এখনও বলছি। জন্মান্তর কথাটা বড় শান্তিপ্রদ, না বউদি? এ জন্মে মানুষ আশা করে অনেক, কিছুই পায় না। তাই সে এই ভেবে প্রাণে এতটুকু শান্তি আনতে চায়—পরজন্ম আছে; আর সেই জন্মে সে তার চাওয়ার ফল পাবেই।"

সে চুপ করিয়া গেল, কল্যাণীও নীরবে রহিল। তাহার এ সব প্রসঙ্গ যোটেই ভালো লাগিতেছিল না। নিমাই তাহার সম্মুখ হইতে সরিয়া গেলে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে।

সে গাড়ীর পিছন দিককার ছোট জানালাটি দিয়া বাহিরের পানে অন্যমনস্কভাবে তাকাইয়া রহিল। নিমাইও তাহাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া হাতের বইখানা খুলিয়া পড়িতে মন দিল।

৯

ট্রেণ পুরী ষ্টেশনে গিয়া পৌছিল। একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে কল্যাণীকে উঠাইয়া নিমাই নিজেও উঠিয়া বসিল।

সুটকেশটি ঠিক করিয়া রাখিতে রাখিতে সে মুখ তুলিয়া বলিল, "এলে, ভালোই হল বউদি, নিজের চোখে দেখে যা বিশ্বাস করতে পারবে, অন্য কেউ হাজার শপথ করে বললেও তা বিশ্বাস করবে না। আমি তোমার একটী কথায় কখনও এখানে আসতুম না, তবে কিনা এরপর বিশুদার কাছে গল্প করবে—আমি যেতে চেয়েছিলুম, ঠাকুরপোই আমায় নিয়ে গেল না। ভাবলুম, কেন নিমিত্তের ভাগি হয়ে থাকি, তোমায় একবার দেখিয়ে নিয়ে যাই বিশুদা কতখানি অযত্নে অনাদরে রয়েছে।"

স্বর্গদ্বারে নন্দা বাসা লইয়াছিল, এ ঠিকানা নিমাই পূর্ব্বেই যোগাড় করিয়াছিল।

দ্বারদেশে গাড়ী থামিবামাত্র দাসী-চাকরেরা সব ছুটিয়া আসিল।

দেশের কৈবর্ত্তদের ছেলে শ্রীরূপ দাস নন্দার সহিত আসিয়াছিল। ইহাকে কল্যাণী ছোট বেলা হইতে বেশ ভালোরূপেই চিনিত। প্রথমটায় সে আসিতে চাহে নাই, তাহার পর নেহাৎ কেবল জগন্নাথ দর্শনের প্রলোভনে সে চাকরী ফেলিয়া চলিয়া আসিয়াছে।

শ্রীরূপ হঠাৎ কল্যাণীকে নামিতে দেখিয়া একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। প্রথমটায় সে দুইটী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাকাইয়া রহিল; তাহার পর এক মুখ হাসিয়া মাথা নীচু করিয়া তাহার পায়ের ধূলো লইয়া মাথায় দিয়া বলিল, "মামীমা এসেছেন যে, মামাবাবুর অসুখের খবর পেয়েছেন বুঝি?"

কল্যাণী আশীর্ব্বাদ করিতে ভুলিয়া গেল, ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ, কেমন আছেন তিনি?"

শ্রীরূপ উত্তর দিল, "এখন একটু ভালো আছেন, জ্বর এখনও হয় সামান্য করে, ছেড়েও যায়। অন্য সব রোগ কমে গেছে, জীবনের ভয় আর নেই। ডাক্তারেরা আগে সাহস দেননি, এখন সাহস দিয়েছেন, বলেছেন আর দু চার দিন পরেই উঠে বেড়াবেন।"

আশ্বস্ত হইয়া কল্যাণী একটা হালকা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বাঁচালি খবরটা দিয়ে। অসুখের খবর পেয়ে মনের যে অবস্থা হয়েছিল তা বলা যায় না। জগন্নাথ তোর মামাবাবুকে ভালো করে দিন, ওঁকে নিয়ে যাওয়ার দিন আমি ঠাকুর দেখে পূজো দিয়ে যাব।"

পরম ভক্তি-ভরে সে হাত দু'খানি কপালে ছোঁয়াইল।

শ্রীরূপ উভয়কে ঘরে লইয়া গেল। নিমাইয়ের ভার আর একটী লোকের উপর দিয়া তাহাকে গোপনে ডাকিয়া বুঝাইয়া দিল—বাবুর যেন এতটুকু অযত্ন না হয়, তাহা হইলে মা আর আস্ত রাখিবেন না।

কল্যাণীকে লইয়া সে বরাবর উপরে চলিয়া গেল।

উপরের বড় দালানটার পাশে একটী ঘর; সামনা-সামনি তিনটী দরজায় নীল রংয়ের পর্দ্দা দুলিতেছিল। শ্রীরূপ চুপি চুপি বলিল, "এই ঘরে মামাবাবু আছেন, আমি গিয়ে আগে খবর দিই, আপনি একটু দাঁড়ান।"

ভিতরে নন্দা তখন ঔষধ খাওয়াইবার জন্য কখনও অনুনয় বিনয়, কখনও তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে, কিন্তু বিশ্বপতি অটুট অচল। সে এক গোঁ ধরিয়া আছে এখন কিছুতেই ঔষধ খাইব না, একটু পরে খাইবে।

শ্রীরূপ পরদা সরাইতেই কল্যাণীর দৃষ্টিতে পড়িল মূল্যবান খাটটীতে মূল্যবান শয্যার উপর শায়িত বিশ্বপতি, পার্শ্বে মেজার গ্লাসে ঔষধ লইয়া দাঁড়াইয়া নন্দা।

বুকের ভিতরটা কি রকম করিয়া উঠিল। সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইল, এ দৃশ্য যেন সে সহিতে পারিতেছিল না।

শ্রীরূপকে দাঁড়াইতে দেখিয়া নন্দা জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে, কি চাস্?"

শ্রীরূপ বলিল, "দেশ হতে মামীমা এসেছেন। তিনি কার মুখে মামাবাবুর অসুখের খবর পেয়ে—"

বিশ্বপতি দেয়ালের দিকে ফিরিয়া শুইয়াছিল, তাড়াতাড়ি এদিকে ফিরিল, রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল, "রাঙাবউ এসেছে?"

শ্রীরূপ উত্তর দিল, "আজ্ঞে।"

ঔষধের গ্লাসটা নামাইয়া রাখিয়া ব্যস্ত হইয়া নন্দা বলিল, "বউদি এসেছে,—কোথায় রে?"

শ্রীরূপ বলিল, "এই যে, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।"

নন্দা তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া গেল।

দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কল্যাণী। তাহার মুখখানা তখন মরার মতই মলিন হইয়া উঠিয়াছিল।

অপরিচিতা নন্দা আসিয়া তাঁহার হাত দু'খানা চাপিয়া ধরিল, "বেশ করেছ, তুমি এসেছ ভাই। বিশুদার অসুখের বাড়াবাড়ির সময় তোমার খবর দেওয়ার কথা বলেছিলুম, কিন্তু বিশুদা কিছুতেই খবর দিতে দিলেন না; বললেন— খবর দিয়ে অনর্থক মানুষটাকে ভাবিয়ে তোলা হবে; সে তো আসতে পারবে না, কেবল কেঁদে-কেটে অস্থির হবে। তার চেয়ে ভালো হয়ে উঠে একেবারে বাড়ী চলে যাব, তখন জানতে পারলেও কোন ক্ষতি হবে না। সত্যি ভাই, উনি খবর দিতে দিলেন না বলেই খবর পাঠাই নি, নইলে তোমার স্বামী, তুমি তাঁর স্ত্রী, তোমায় তাঁর এত ব্যারামের খবর না দিয়ে থাকতে পারি?"

নিছক ন্যাকামোপূর্ণ কথাগুলি কল্যাণীর অন্তরটাকে আরও বেশী জ্বালাইয়া দিল, মুখখানা তাহার বিকৃত হইয়া উঠিল, সে একবার একটু হাসিতে গেল, হাসি ফুটিল না।

নন্দা বলিল, "বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ভেতরে এসো ভাই, দেখবে চল।"

সে কল্যাণীকে এক রকম প্রায় টানিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেল।

"চেয়ে দেখ বিশুদা, কে এসেছে? বেশ মানুষ তো তুমি,—তুমিই না কত কথা বলেছিলে—বউদি নাকি তোমায় দেখতে পারে না, ভালো বাসে না। তাই তো বলি, এও কি একটা কথার মত কথা যে, স্ত্রী নাকি তার স্বামীকে দেখতে পারবে না, ভালো বাসবে না। যাই বল, তুমি যে পয়লা নম্বরের মিথ্যাবাদী, এ কথা হাজার বার বলব।"

বলিতে বলিতে সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বিশ্বপতি দেয়ালের দিকে ফিরিয়া শুইয়া ছিল, এ কথা শুনিয়া তাহার মুখের ভাব যে কিরূপ হইয়া গেল, তাহা কল্যাণী দেখিতে পাইল না। কল্যাণী একবার মাত্র চোখ তুলিয়া স্বামীর পানে তাকাইয়াই চোখ ফিরাইল।

নন্দা কলহাস্যের সঙ্গে বলিল, "বলি উত্তর দিচ্ছ না যে, একটা কথা বলবারও কি ইচ্ছে হচ্ছে না? সেদিন তর্ক করছিলে না ভারতে সতীর আদর্শ নেই, সীতা সাবিত্রীর কথা সব মিছে, কেবল কল্পনা মাত্র। দেখ দেখি, সত্যিই ভারতে সতী মেয়ে আছে কিনা, আজ সেটা মানতে পারবে কি?"

বিশ্বপতি উত্তর দিল না, এ দিকে ফিরিল না।

হার মানিয়া নন্দা বলিল, "থাক বাপু, তোমার সঙ্গে এখন আর কথা বলছিনে। এসো বউদি, বিশুদা খানিক শুয়ে থাক, তারপরে আসব এখন। এসো বউদি, আগে স্নান করে একটু জল খেয়ে এসে বসো, কাল সারারাত ট্রেণে কেটেছে, শরীর নিশ্চয়ই খারাপ হয়ে রয়েছে।"

কল্যাণীর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া চলিতে চলিতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল, "ওষুধটা খেয়ো বিশুদা, যেন ফেলে দিয়ে বলোনা— খেয়েছি।"

ঔষধ মাথার কাছে টিপয়ের উপর যেমন ছিল, তেমনই পড়িয়া রহিল, বিশ্বপতি যেমন শুইয়া ছিল, তেমনই শুইয়া রহিল, সে নড়িল না, এ দিকে ফিরিলও না।

ঘণ্টাখানেক পরে নন্দা কল্যাণীকে লইয়া আবার ফিরিয়া আসিল।

"আঃ পোড়াকপাল, কি রকম আক্কেল তোমার বিশুদা, এখনও ওষুধটা খাও নি। ও আজ বউদি এসেছে কি না, আমার হাতে খাবে কেন, এখন বউদির হাতেই খাবে তো। নাও ভাই বউদি, ও

ওষুধটা ফেলে দাও, আর এক দাগ ওষুধ ঢেলে খাইয়ে দিয়ো, দেরী করো না।”

সে মৃদু হাসিয়া বাহির হইয়া গেল।

কল্যাণী কতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কতবার নড়িল, কতবার তাহার চাবির শব্দ হইল, বিশ্বপতি সাড়া পাইয়াও ফিরিল না, জাগিয়া থাকিবার কোন চিহ্নও দেখা গেল না।

অনেকক্ষণ আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে আস্তে আস্তে অগ্রসর হইয়া স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইল; নীচু হইয়া হাতখানা স্বামীর কপালে রাখিয়া সে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—“আমি এসেছি বলে কি রাগ করেছ?”

বিশ্বপতি এ-পাশে ফিরিল, দুইটী চোখের দৃষ্টি স্ত্রীর মুখের উপর রাখিয়া রুক্ষকণ্ঠে বলিল, “একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি, তোমায় এখানে আসতে কে বলেছে রাঙা-বউ?”

তাহার মুখের পানে তাকাইয়া এবং তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া কল্যাণী স্তব্ধ হইয়া গেল।

কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে শুষ্ককণ্ঠে বলিল,—“কেউ আসতে বলে নি, আমি নিজেই এসেছি। এখানে আসায় তোমার কোনও ক্ষতি হয়েছে কি?”

বিশ্বপতি এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল, “হয়েছে বই কি। তোমার এখানে আসায় নন্দাকে কতটা অপদস্থ করা হয়েছে, সে কথাটা ভেবে দেখেছ কি? নন্দা তোমায় দেখে নিশ্চয়ই মনে করেছে—তুমি কোনক্রমে আমার অসুখের কথা শুনে মনে ভেবে নিয়েছ—আমার সেবাশুশ্রূষা হচ্ছে না, সেই জন্যেই ছুটে এসেছ। অথচ তুমি জানো না, স্বপ্নেও ধারণা করতে পারবে না, সে আমার কি রকম ভাবে সেবা করছে। এ রকম সেবা হয় তো তোমার কাছেও পেতুম না রাঙাবউ, কারণ সংসারের কাজ তোমায় করতেই হবে, কিন্তু তার কোন কাজ নেই।”

একটু থামিয়া দম লইয়া সে বলিল, “বুঝতে পারছি, আমার কথা শুনে তোমার মনে কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু কি করব,—অপ্রিয় সত্য আমায় প্রকাশ করতেই হবে, তোমার মনে কষ্ট হবে জেনেও। নন্দা তোমায় দেখে প্রচুর হাসছে, আমার ভার তোমার পরে ছেড়ে দিয়ে গেছে; ওর ওই হাসির তলায় যে কতখানি বেদনা জমে উঠেছে, সেটা অনুভব করবার শক্তি তোমার আছে কি?”

কল্যাণীর মুখখানা একেবারে পাংশু হইয়া গেল, সে আর চোখ তুলিয়া স্বামীর পানে চাইতে পারিল না; নতমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিশ্বপতি বলিল,—“আমার জন্যে তোমার এই ব্যগ্রতা, এই অসামান্য স্বামীভক্তি না দেখালেই ভাল হতো রাঙাবউ; নিজের নামটার আগে পতিব্রতা শব্দটা না জুড়ে দিলেও বিশেষ ক্ষতি হতো না। এর চেয়ে তুমি যদি ঘরের বউটি হয়ে সেইখানে সেই ঘরে বসে চোখের জলে মাটি ভিজিয়ে ফেলতে, আমার মতে সেইটাই হতো স্বামীভক্তির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। আমাদের মত ঘরের বউয়েদের স্বামীর বিদেশে ব্যারাম জেনে কয়জন ঘর ছেড়ে স্বামীকে দেখতে ছোটে বল দেখি? তারপর এসেছ কার সঙ্গে? ওর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি? একজন নিঃসম্পর্কীয় লোকের সঙ্গে আসা কি তোমার উচিত হয়েছে রাঙাবউ? সত্যিই সে কথা, এতে কেউ তোমার অসাধারণ স্বামীভক্তির কথা সগৌরবে বলে গেলেও, আমি কোনদিনই প্রশংসা করব না।”

কল্যাণী মুখ তুলিল, তাহার পাংশু মুখ তখন আবার স্বাভাবিক বর্ণ ধরিয়াছে।

যথাসাধ্য কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া সে বলিল, “কিন্তু ওখানেই বুঝতে ভুল করেছ! আমি সতী; স্বামীর'পরে আমার নিষ্ঠা আর ভক্তি আছে, এই কথাটাই লোক-সমাজে রাষ্ট্র করবার জন্যে আমি নিমাই ঠাকুরপোর সঙ্গে এখানে এতদূর চলে আসতুম না। সত্যি আগে বুঝতে পারি নি, এখানে পা দিয়েই বুঝতে পেরেছি কতটা বোকামীর কাজ করেছি! কিন্তু না, ভয় নেই, আমি এখানে থাকব না, তোমাদের সঙ্কুচিত বিব্রত করব না, আমি আজই যেমন এসেছি, তেমনই চলে যাব।”

সে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গিয়া বারাণ্ডায় দাঁড়াইল।

অদূরে ধূ ধূ করিতেছে বেলাভূমি। তাহার ও-পাশে অনন্ত জলরাশি গর্জ্জন করিয়া উচ্চ তরঙ্গ তুলিয়া আসিতেছে, বেলাভূমির বুকে আছাড় খাইয়া ফেনারাশি বুকে লইয়া সরিয়া যাইতেছে।

সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া কল্যাণীর চোখ দুইটী জ্বালা করিতে লাগিল।

তাহার পর হঠাৎ কখন দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, কখন তাহা চোখ ছাপাইয়া ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

১০

আজই কল্যাণী ফিরিয়া যাইতে চায় শুনিয়া নন্দা একেবাঁরে যেন আকাশ হইতে পড়িল—

"সে কি বউদি, এ কখনও হতে পারে? আজ এসে আজই তুমি চলে যেতে চাও, এ কি একটা কথার মত কথা?"

কল্যাণী শুষ্ক হাসিয়া জানাইল, সে স্বামীকে একবার মাত্র চোখের দেখা দেখিতে আসিয়াছিল। সে সাধ তাহার মিটিয়া গেছে, স্বামী অনেক ভালো আছেন দেখিয়া সে নিশ্চিন্ত হইয়াছে। আর এখানে থাকার কোন আবশ্যক তাহার নাই; ওদিকে বাড়ী ঘর সব পড়িয়া আছে, দেখিবার লোক কেহ নাই—ইত্যাদি—ইত্যাদি।

নন্দা রাগ করিল, মুখ ভার করিয়া বলিল, "বাড়ী ঘর করে করেই যে গেলে, বাড়ী ঘর তোমায় স্বর্গে দেবে, না? যেমন কর্ত্তা তেমনি গিন্নি; কর্ত্তা কি সহজে আসে,—ভাবলুম বুঝি কেঁদেই ফেলে। কথার মধ্যে কথাই ওই বাড়ী ঘর দেখবে কে, সব যাবে। বাবাঃ,—কিই বা ঘর? সব তো ভাঙ্গছে, চুরছে, ইঁট খসছে,—যেন সমস্ত বাড়ীই দাঁত বার করে হাসছে। সেই বাড়ীতে এমন সব দামী জিনিসপত্রও আছে, যা পথের ভিখারী পর্য্যন্ত পা দিয়ে ঠেলে চলে যায়।"

কল্যাণীর বড় বড় চোখ দুইটী একবার মাত্র দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, তাহার মুখখানা মুহূর্ত্তের জন্যই বিকৃত হইয়া উঠিল। তখনই সে মুখে হাসি ফুটাইয়া মিষ্ট সুরেই বলিল, "কিন্তু তাই আমার লাখটাকার জিনিস ভাই দিদি। গরীবের ঘরে জন্মেছি, সামান্য নুণ ভাত খেয়েই মানুষ হয়েছি। তার বেশী পাওয়ার কামনা যদি কোনদিন মাথা তুলে উঠতে চেয়েছে, আমি তাকে চেপে ধরেছি। নিজের খড়ের ঘরে নুণ-ভাত শাক-ভাত যা জোটে, তাই যে কোন লোকের মনুষ্যত্ব বজায় রাখতে যথেষ্ট বলেই মনে করি। বড়লোকের বাড়ী রোজ ষোড়শোপচারে খাওয়া আর দামী পালঙ্কে শুয়ে ঘুমানতে মানুষের হীনত্বের পরিচয়ই দিয়ে থাকে; সে রকম আরামপ্রিয় সুখী লোককে কেউ মানুষ বলে গণনা করে না।"

কল্যাণীর এই সুন্দর সত্য কথাগুলি নন্দার বুকের মধ্যে আঘাত দিল বেশ, মুখরা চপলা নন্দা একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গেল। কল্যাণীকে সে কৃপার চোখেই দেখিয়া আসিতেছে। সে বেশই জানে এ মেয়েটী কোনদিনই মাথা উঁচু করিতে পারিবে না। ইহাকে যতই কেন না আঘাত করিয়া যাও, এ মাথা নীচু করিয়াই থাকিবে, ফিরাইয়া আঘাত সে কোনদিনই দিতে পারিবে না। চিরদিন সে দূর্ব্বার মত মাটীর বুকেই থাকিবে, মানুষের পায়ের তলে দলিত পিষ্ট হইবে; সে যে আছে, তাহা কাহাকেও কোনদিন জানিতে দিবে না।

আজ নন্দা নিঃশব্দে কেবল তাহার পানে তাকাইয়া রহিল।

বাড়বানল জলেই দেখা যায়;—সে অনলে যে অনেক কিছুই ধ্বংস করিতে পারে, তাহা সে আগে জানে নাই, আজই জানিল।

নিমাই আহারান্তে নীচে একটী ঘরে বিশ্রাম করিতেছিল; ভিতরে যে এত কাণ্ড হইয়া গেছে, তাহা সে কিছুই জানিতে পারে নাই। কল্যাণী খোঁজ লইয়া যে ঘরে সে ছিল সেই ঘরে প্রবেশ করিল।

"শুয়ে পড়লে যে ঠাকুরপো? ওঠো, বিশ্রামের সময় তোমার নেই, এখনই রওনা হতে হবে, এখানে থাকার অধিকার-নেই, যাওয়ার হুকুম হয়েছে।"

আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া নিমাই উঠিয়া বসিল, জিজ্ঞাসা করিল, "বাঃ, আজ এসে পৌঁছেই চলে যেতে হবে, এ আশ্চর্য্য হুকুমটা কে দিলে শুনি? নন্দা বুঝি? রোসো, তার সঙ্গে দেখা করে আমি এ সম্বন্ধে বোঝাপড়া করে নিচ্ছি, এ সব তোমার কর্ম্ম নয় বউদি।"

অতি কষ্টে চোখের জল সামলাইয়া বিকৃত হাসির টুকরা একটু মুখের উপর টানিয়া আনিয়া কল্যাণী চাপা সুরে বলিল, "না, তার হুকুম শুনবার সৌভাগ্য এখনও আমার হয় নি, তবে এখানে একদিনের বেশী থাকতে গেলেই যে শুনতে হবে, তাতে সন্দেহ নেই। হুকুম সে দেয় নি। যার হুকুম দেওয়ার অধিকার আছে, আমার সেই মনিব আমায় চলে যাওয়ার আদেশ দিয়েছেন।"

নিমাই খানিকক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রহিল,—তাহার পর বলিল, "কে, বিশুদা বলেছে তোমায় আজই চলে যেতে হবে?"

কল্যাণী রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "তাই বই আর কি। তিনি স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন আমার এখানে আসাই অন্যায় হয়েছে। তেবে দেখলুম, তিনি যা বলেছেন তা অন্যায় নয়, সবই সত্যি। বুঝলে ঠাকুরপো, আমি এখনই চলে যেতে চাই, আর একটী ঘণ্টাও

এখানে থাকতে পারব না। তুমি ওঠ, একখানা গাড়ী নিয়ে এসো, একটুও দেরী করো না।"

নিমাই উঠিতে চাহে না; বলিল, "তুমি বড় অধৈর্য্য বউদি, আসতে যেমন—যেতেও ঠিক তেমনি। আমি আগেই বলেছিলুম না—, থাক সে কথা; কিন্তু কি যে তোমাদের কথাবার্ত্তা হল, যার জন্যে আর একটা ঘণ্টাও তুমি এ বাড়ীতে থাকবে না, সেটা জানতে পারলেও যে হতো।"

কল্যাণী কঠিন মুখে বলিল, "আসল কথা, তুমি এখন এমন আরাম ছেড়ে নড়তে চাও না—কেমন? কিন্তু শোন ঠাকুরপো, যদি তুমি না যাও, গাড়ী না ডাক, আমি একাই পায়ে হেঁটে চলে যাব, পথে কাউকে সঙ্গে নিয়ে ষ্টেশনে যাব, তোমার সাহায্যের কোনও দরকার হবে না; তুমি আমার যাওয়ার গাড়ীভাড়াটা দিয়ে দাও দেখি, তা হলেই যথেষ্ট দয়া মনে করব।"

ব্যাপারটা যে বিশেষ গুরুতর রকমই ঘটিয়াছে, তাহা বুঝিতে নিমাইয়ের বিলম্ব হইল না। সে উঠিয়া পড়িল, "গাড়ীর জন্যে ভাবনা নেই বউদি, আমি এখনই টাকা নিয়ে আসছি, কিন্তু ষ্টেশনে গিয়ে এখন বসেই থাকতে হবে; ট্রেণ তো এখন নেই, সেই সন্ধ্যায় ট্রেণ।"

কল্যাণী বলিল, "তা হোক, আমি সেখানে বসে থাকব, সেও আমার ভালো, আমি এখানে আর এক মিনিটও থাকব না"

ব্যাপারটা যে কি ঘটিয়াছে, তাহা নিমাই স্পষ্ট জানিতে না পারিলেও আন্দাজে কতকটা বুঝিল; সে উঠিয়া গায়ে জামা দিয়া গাড়ী ডাকিতে চলিয়া গেল।

উপর হইতে নন্দার কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতেছিল, "এ রকম করলে আমি কি করে পারব বল দেখি বিশুদা? সেই কখন হতে দুধটুকু খাওয়ার জন্যে সাধাসাধি করছি, কথা যেন কাণে যাচ্ছে না, ঘুমোনোর ভাণে আড়ষ্ট হয়ে চুপ করে পড়ে আছ। না বাপু, আমারই ঝকমারী হয়েছে তোমায় এখানে আনা, তার জন্যে এই নাক কাণ মলা খাচ্ছি। তুমি একটু ভালো হয়ে দু'দিন দু'টো ভাত খেয়ে বউদির সঙ্গে বাড়ী চলে যেয়ো, আমি আর যদি একদিন তোমায় এখানে থাকবার জন্যে অনুরোধ করি, তবে আমার নাম নন্দা নয়।"

কল্যাণী কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল।

অসীম অনন্ত ব্যবধান,—সে যাহাকে কাছে পাইতে চায়, সে দূর দূরই থাকিয়া যাইবে, কেহ কাহারও নাগাল জীবনে পাইবে না।

বিবাহ-বন্ধন—

আজ সে কথা মনে করিতেও হাসি পায়। লোকে বলে "সাত পাকের বিবাহ—চৌদ্দ পাকে খুলে না,—" এ কথা কি সত্য?

সাত পাক—সে একটা মিথ্যা আচার মাত্র; নারায়ণ—সাক্ষী গোপাল। সেই বিহাহের দিনে যাহারা উপস্থিত ছিল, আজ তাহারা কে কোথায়?

শুধু বুকটাই জ্বলিতে লাগিল, চোখে এক বিন্দু জল আসিল না। দরজাটা চাপিয়া ধরিয়া কল্যাণী শূন্য নয়নে কোন্‌দিক পানে তাকাইয়া রহিল কে জানে।

১১

গাড়ী আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল।

নন্দা উপরের বারাণ্ডা হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া নীচে নামিয়া আসিল।

"কাজটা ভালো হচ্ছে কি ভাই বউদি? এই আজই মাত্র এসে এতটুকু বিশ্রাম না করে অমনি চললে, এটা কি ভালো কাজ করছ? তোমার নিজের তরফ থেকে কোন কথা না থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু গৃহস্থের কল্যাণ-অকল্যাণটাও দেখা চাই তো?"

কল্যাণী বলিল, "আমার হঠাৎ আসা আর হঠাৎ চলে যাওয়ায় গৃহস্থের অকল্যাণ হবে না ভাই দিদিমণি, ভগবান তোমাদের মঙ্গলই করবেন। আমি একটা অশুভ গ্রহের মত হঠাৎ আকাশে উঠে পড়েছি; থাকলে বরং অনিষ্টই হবে, মিলিয়ে গেলে ইষ্ট ছাড়া অনিষ্ট হবে না।"

নন্দা বিমর্ষ মুখে খানিক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার পর বলিল, "তোমায় আমি আর রাখতে চাইনে বউদি, তোমার এ রকম মন নিয়ে এখানে থাকার চেয়ে চলে যাওয়াই ভালো। কিন্তু বিশুদার সঙ্গে একবার দেখা করে যাবে না?"

কল্যাণীর মুখখানা কঠিন হইয়া উঠিল, সে মাথা নাড়িল, বলিল, "দরকার দেখছি নে।"

এতটুকু আঘাত দেওয়ার প্রলোভন নন্দা এড়াইতে পারিল না, মৃদু হাসিয়া বলিল, "কিন্তু সেটা তো উচিত হবে না বউদি, সতী মেয়ের কাজ এ নয়। যে সতীর আদর্শ তোমায় বাংলার নাম-না-জানা একটী ছোট পল্লী হতে অপরিচিত

একটা পুরুষকে স্বামী রূপে এতদূরে এখানে টেনে এনেছে, তোমার এই কাজে সেই মহান আদর্শ খাটো হয়ে যাবে না কি ?"

কল্যাণী মুগ্ধ দুইটী চোখের দৃষ্টি নন্দার মুখের উপর স্থাপন করিল, বলিল, "না, আমার সে আদর্শকে আমি নিজের হাতে আছাড় দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলেছি। তার সেই গুঁড়োগুলো রেণু রেণু করে ধুলোর সাথে মিশিয়ে বাতাসের কোলে ছেড়ে দিয়েছি। আজ বুঝেছি, স্বপ্নেরও ভিত্তি চাই, নইলে তা গড়ে উঠতে পারে না, তার ছায়া মনে থাকে না। ভুল ততক্ষণই সত্যি বলে বোধ হয়, যতক্ষণ তার স্বরূপটা চোখে না পড়ে। সেই স্বরূপ যখন চোখে পড়ে, তখন তার দাম এক কাণ-কড়িও হয় না, এ কথা বোধ হয় মেনে নেবে। মেয়েরা যে আদর্শ নিয়ে চলবে, সে আদর্শ টি'কে থাকতে পারে কতক্ষণ? মেয়েরা যার পরে নির্ভর ক'রে তার আদর্শ অটুট রাখবার চেষ্টা করবে, সে যদি ভার নেওয়ার অনুপযুক্ত হয়, সে যদি ভেঙে পড়ে, যে ভর দিয়ে দাঁড়ায় তা'কেও পড়তে হবে। পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় না দিলে একটা আদর্শকে ঠিক রাখা চলে না, সে আদর্শ এমনই করে ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়, তার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাকে না। আমার কথা বলবে দিদিমণি? আজ দেখছি, ছায়াকে কায়া বলে ধরতে ছুটেছিলুম,—আজ দেখছি, সব মিথ্যে, আমার কিছু সার্থকতায় ভরে উঠতে পারলে না।"

তাহার কণ্ঠস্বর আবেগে কাঁপিতেছিল; পাছে সে দুর্ব্বলতা নন্দা বুঝিতে পারে, এই জন্যই সে তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

নন্দা বলিল, "ওটা ভাই তোমার মিথ্যে কল্পনা। পুরুষেরা শতকরা নব্বই জন উচ্ছৃঙ্খল হয়ে থাকে, কদাচিত যদি তোমার আদর্শ অনুযায়ী স্বামী দেখিতে পাওয়া যায়। যারা উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির হয়, তাদের স্ত্রীরা যে তোমার মত অধীর চঞ্চল হয়ে ওঠে না, এ কথা ঠিক। এই সব স্ত্রীরা তো তাদের স্বামী বেচারাদের তোমার মত সন্দেহের চোখে দেখে পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়ায় না? তারা সেদিকে চেয়েও দেখে না। পুরাণের কথা যদি তোলো, যাদের আদর্শ নিয়ে তোমরা চলছ, তাদের মধ্যেও ঠিক এই রকম ভাব ছিল বলেই না তারা আদর্শ সতী হতে পেরেছিল। বেদবতী কি করেছিলেন শুনি? তিনি স্বামীর বাসনা পূর্ণ করতে কুষ্ঠাক্রান্ত স্বামীকে কোলে নিয়ে লক্ষহীরার বাড়ী যান নি? তিনি কি ব্রাহ্মণের মেয়ে ব্রাহ্মণের স্ত্রী হয়ে পতিতা নারীর বাড়ীতে দাসীর কাজ করেন নি? রাবণ যে বহু নারীর স্বামী ছিলেন, তাই বলে মন্দোদরী তাঁকে ঘৃণা করেছিলেন? তাঁর পর হতে শ্রদ্ধা ভক্তি অন্তর্হিত হয়েছিল? হিন্দুর পরমদেবতা কৃষ্ণ কি করতেন শুনি? তাই বলে কি রাধিকা তাঁকে ঘৃণা করে ত্যাগ করেছিলেন?"

নন্দা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কল্যাণী গম্ভীর হইয়া বলিল, "ওইখানেই যে প্রকাণ্ড বড় ভুল হয়ে গেছে দিদি। আমরা—মেয়েরা যুগে যুগে পতিব্রতার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখতে এমনি করে নিজেদের সব রকমে হেয় করে রাখছি, নিজেদের সর্ব্বনাশ কর্‌ছি। ওদের হীন বাসনা তৃপ্তির জন্যে আমরাই নিজেদের সত্তা ভুলে পতিতার দুয়ারে হাত পেতে দাঁড়িয়েছি, স্বামীকে কোলে করে তার বাড়ীতে নিয়ে গেছি। নারীর অধঃপতন আর কাকে বলে? স্বামী অন্য কারও সঙ্গে বাস করছেন, আমি দাসীর মত তাঁর সেবা করব, সেই স্বামীকেই একমাত্র দেবতা জেনে পূজো করে যাব, তাঁর আদেশে আমি বেঁচে থাকব, মরব, কারণ আমি সতী, আমি পতিব্রতা; আমায় এ আদর্শ অটুট রাখতেই হবে। এমনি করে আমরাই না ওদের ধ্বংসের পথে অগ্রসর করে দিয়েছি, সহধর্ম্মিণী না হয়ে সহচারিণী হয়েছি, ওদের বাসনা কামনা বাড়িয়ে তুলেছি, নিজেদের সব দিক হতে গুটিয়ে এনে সতী নামটা নিয়ে জগতে নিজেদের প্রচার করে যাচ্ছি। শাস্ত্রের কথা তুলে রেখে দাও দিদি, ওই শাস্ত্রের অনুশাসনগুলো কেবল আমাদের জন্যেই নয় কি? পুরুষেরা এর একটাও কি মেনে চলে? ওই অনুশাসন—ওই চোখ-রাঙানীই না আমাদের এত তুচ্ছ, এত হেয় করে রেখেছে। স্বামী চোখের সামনে ব্যভিচার করবেন, আমাদের তা দেখে যেতে হবে, সয়ে যেতে হবে, তবু সেই স্বামীকেই দেবতা বলে পূজো করতে হবে, এরই নাম সতীত্ব, এরই নাম পাতিব্রত্য। তোমার ওই পচা শাস্ত্রের কথা তুলে রেখে দাও দিদি; চোখের সামনে যা অহরহ দেখতে পাচ্ছি, তার সত্যতা না মেনে নিয়ে, যা দেখিনি, তার সত্যতা প্রতিপন্ন করিবার মত শক্তি তোমার থাকতে পারে—আমার নেই।"

নন্দা কি বলিবে বলিয়া মুখ তুলিল, তাহার পরই হঠাৎ মুখ নামাইয়া চুপ করিয়াই রহিল।

কল্যাণী দুই পা অগ্রসর হইয়া গিয়া আবার

ফিরিয়া আসিল; বলিল, "কিন্তু তুমি আমার অপরাধ ক্ষমার চোখে দেখে যেয়ো ভাই দিদিমণি, মনে কোরো—মানুষ কোনক্রমে চোখ বুজে একটাই আঘাত সইতে পারে, কেননা তার আগে সে কোনও আঘাত পায় নি বলেই আঘাতের বেদনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হয়ে থাকে। বুকের একদিক ভাঙলে পরে সেই দিকটাতেই মানুষের চোখ পড়ে থাকে, কিন্তু যদি সব হাড়গুলোই তার ভেঙে যায়, সে কোন্‌দিকে তাকাবে, তা ভেবেই ঠিক করতে পারে না। একটা বিষ-ফোড়া উঠলে মানুষ তার দিকে নজর দেয়, তার ব্যথায় অধীর হয়ে ওঠে; কিন্তু যদি দেহে হাজারটা বিষফোড়া ওঠে, কোন্‌টা যে বেশী ব্যথা করছে, কোন্‌টা যে সে দেখবে, তা ভেবে ঠিক করতে পারে না। একটা ফোড়ায় সে হাজার রকম ওষুধ দিয়েছে। কিন্তু হাজার ফোড়ায় একটা ওষুধ লাগিয়েই সে তখন খুসি হয়ে থাকে, কারণ তখন তার খুসি না হওয়া ছাড়া আর উপায়ই থাকে না যে। তখন তার ইচ্ছা আসে না, প্রবৃত্তি জাগে না, দেহ মন একেবারেই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। মানুষ মাত্রেই যে এই একই ধারায় চলছে দিদি, কেবল একটীর কথাই তো হচ্ছে না যে তুমি কোনও প্রতিবাদ করবে।"

নন্দা ফস্ করিয়া বলিয়া বসিল, "একটু একটু করে ওষুধ লাগানোর চেয়ে সবগুলো যদি কেটে দেওয়া যায়—"

শিহরিয়া উঠিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কল্যাণী বলিল,—"ওই তো ভুল, বলা সহজ, করাই না কঠিন। বলি—সেই যে গভীর বেদনা—সেটাই বা সইবে কে দিদি? দেখ, মানুষ দেবতা নয়,—মানুষ মানুষই। তার দেহটা কি কি উপাদানে তৈরী তা জান তো? ছুরি চালানো দূরের কথা, তোমার গায়ে আমি স্‌্‌চ বিঁধিয়ে দিলে তুমি চমকে ওঠো কি না বল দেখি? ওই তো দিদি, দুর্ব্বলতা মানুষের যে ওইখানেই। সবাই তো পরমহংস হতে পারে না ভাই, সবাই কিছু বলতে পারে না—এ-গালে চড় মারলে ও-গাল ফিরিয়ে দেব। অতটা সহনশীলতা যে দিন পাব, সেদিন আর কাউকে শিষ্য করার আগে তোমায় দীক্ষা দেব, তা মনে করে রেখো।"

নন্দার গৌর মুখখানা কালো হইয়া গিয়াছিল; সে নীরবে কেবল অধর দংশন করিতে লাগিল। তাহার সম্মুখে কল্যাণী গিয়া গাড়ীতে উঠিল, নিমাই তাহার সম্মুখের আসন দখল করিয়া বসিল। তাহার পর গাড়ী চলিয়া গেল, তাহার শব্দটাও ক্রমে মিলাইয়া গেল। নন্দা তখনও চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কল্যাণীর কথাই ভাবিতেছিল।

হঠাৎ একসময় মুখ তুলিতেই দৃষ্টি পড়িল উপরের খোলা জানালাটার দিকে;—বিশ্বপতি সেই জানালার গরাদে ধরিয়া যে-পথে একটু আগে গাড়ীখানা চলিয়া গেছে, সেই পথের পানে আত্মহারার মতই তাকাইয়া আছে।

আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া নন্দা বলিল, "বিশুদা, দাঁড়িয়েছ একেবারে,—পড়ে যাবে যে এখনি।"

তাহার ব্যগ্রকণ্ঠের সুরেই বিশ্বপতির চেতনা ফিরিয়া আসিল, সে নীচে নন্দার পানে তাকাইল, একটু হাসির রেখা মাত্র তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল এবং সে জানালা ছাড়িয়া সরিয়া গেল।

১২

কল্যাণী গুম হইয়া ষ্টেশনে একখানা বেঞ্চে বসিয়া ছিল। পথে সে একেবারেই মুখ বন্ধ করিয়াছিল। নিমাই তাহার প্রকৃতি বেশ জানিত, সেই জন্যই সে তাহার সহিত একটীও কথা বলে নাই।

কিন্তু ট্রেণ আসিতে তখনও বহু বিলম্ব ছিল।

নিমাই খানিকটা এদিক-ওদিক ঘুরিয়া আসিয়া বলিল, "জগন্নাথের দরজায় এসে চোখ বুজেই ফিরলে বউদি, তাঁকে দেখে জন্ম সার্থক করে গেলে না? তোমাদের মেয়েদের মধ্যে এ-রকম ভাব হওয়াই যে আশ্চর্য্য,—শুনেছি জগন্নাথ দেখবার জন্যে তোমাদের মেয়েরাই স্বামী পুত্রের মায়া কাটিয়ে ছুটে আসত—এখনও আসে।"

শুষ্ক হাসিয়া কল্যাণী বলিল, "হ্যাঁ এখনও আসে, এ দৃশ্য আমাদের দেশে বিরল নয়। এখন ঠাকুর কোথায় দেখব ঠাকুর-পো, পাথরের দেবতার দরজা যে বন্ধ হয়ে গেছে।"

নিমাই বলিল, "চেষ্টা করলে খোলা পাওয়া যেত।"

কল্যাণী মুখ ফিরাইয়া বলিল, "দরকার নেই।"

নিমাই বলিল, "কেন? ডাকলে দরজা খুলবে না, না—তোমার প্রবৃত্তি নেই?"

কল্যাণী বলিল, "অনেক টাকা দিলে হয়তো দরজা খুলে দেখতে দিলেও দিতে পারে, কিন্তু প্রবৃত্তি আমার নেই। দরজার যতক্ষণ দাঁড়িয়ে

থাকতে হবে তার উপযুক্ত শক্তি আমার নেই ঠাকুর-পো, আমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, এখন বিশ্রাম চাই।"

একটু সময় নীরব থাকিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, "দেবতা সে দেবতাই। পাষাণের আবরণের মধ্যে যদি প্রাণ থাকে, ওই আবরণের বাইরের ডাক কি তা ভেদ করতে পারবে, সে প্রাণ কি বিগলিত করতে পারবে? জগন্নাথের পাথরের মূর্ত্তি দেখে পুজো দিয়ে আমি কতটুকু লাভ করব ঠাকুর-পো? নিজের ভালো—কিন্তু কোন্ সময়ের জন্যে চাইব? ইহকালের জন্যে, না পরকালের জন্যে ভাবব? ইহকালে যা পেলুম এই আমার পর্য্যাপ্ত পাওয়া। মুক্তকণ্ঠে বলছি, ঢের পেয়েছি, এর বেশী আরও যদি দিতে চাও—দাও, আমি সব বোঝা বইব, ভেঙ্গে পড়ব না। আর পরকাল? সত্যি বল দেখি ঠাকুর-পো, পরকাল আছে কি? চিরদিন বলে এসেছি পরকাল আছে, এ জন্মেই আমার সব কিছু ফুরিয়ে যাবে না, এর পরের জন্মে আমার এ জন্মের ব্যর্থতা সফলতায় ভরে যাবে। আজ এই মুহূর্ত্ত হতে জেনে নিলুম—মানুষের ইহজন্মই আছে, পরজন্ম নেই;—যে সেই পর-জন্মের আশায় দিন কাটিয়ে যেতে চায়, এ জন্মটাকে দুঃখের মধ্যে দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে পরজন্মের কল্পিত চিন্তায় প্রফুল্ল হয়ে ওঠে—সে মূর্খ, মহামূর্খ। স্বর্গ নরক মিছে কথা ঠাকুর-পো, স্বর্গ নরক নেই, দেবতা নেই, ওসব নিছক কল্পনামাত্র।"

সে চিরকাল একনিষ্ঠ ভাবে দেবসেবা করিয়া আসিয়াছে, স্বর্গ-নরকের পাপ-পুণ্যের হিসাব যে প্রাত্যহিক প্রতি মুহূর্ত্তে রাখিয়া আসিয়াছে, সে আজ বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়াছে। কালাপাহাড় একদিন একনিষ্ঠতার সঙ্গেই নিজের ধর্ম্মপালন করিয়া গিয়াছিল। সেদিন কেহই কল্পনা করিতে পারে নাই—স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-সন্তান একদিনে হঠাৎ কালাপাহাড় হইয়া যাইবে।

কল্যাণীও বড় আঘাতের বেদনা পাইয়াই জোর করিয়া বিশ্বাস করিতে চায়—বিশ্বাস করাইতে চায়, দেবতা নাই, মানুষের ইহকাল আছে পরকাল নাই, স্বর্গ-নরক, পাপ-পুণ্যের অস্তিত্ব সে আজ অস্বীকার করে।

নিমাই সত্যই একটু আঘাত পাইল; বলিল, "কিন্তু হঠাৎই এতটা নাস্তিক হয়ে উঠলে বউদি? তোমাদের শাস্ত্রে বলে—"

দৃপ্তকণ্ঠে কল্যাণী বলিয়া উঠিল, "হ্যা, আমাদের শাস্ত্র অনেক কথাই বলেছে, বলছেও, কিন্তু সে সবই কি মানুষে মেনে চলতে পারে ঠাকুর-পো? শাস্ত্র উপদেশ দেয়, অনেক নজিরই সে দেখিয়েছে। শুনেছি একজন লোকের কুষ্ঠব্যাধি হয়েছিল, তার পতিব্রতা স্ত্রী সেই স্বামীর পাপকামনা চরিতার্থ করবার জন্যে তাকে বুকে করে তুলে নিয়ে গণিকার বাড়ীও গিয়েছিল। আমাদের শাস্ত্র এই রকম লক্ষ লক্ষ দৃষ্টান্ত দিয়ে গেছে; কিন্তু সত্যি করে বল দেখি ঠাকুর-পো, বাস্তবে কয়টা মেয়ে এ-রকম করে পাতিব্রত্যের দৃষ্টান্ত মেনে চলতে পারে?"

নিমাই একটু ভাবিয়া বলিল, "কিন্তু আমার কি মনে হয় জানো বউদি, হয় তো সত্যই এ-রকম কিছু ঘটেছিল; নইলে শাস্ত্রকারেরা পুঁথির পাতে লিখে রেখে যেতে পারত না। মেয়েরা যে ভালো-বেসে সব কিছুই করতে পারে তা মানো তো? যে মেয়েটী তার কুষ্ঠাক্রান্ত স্বামীকে বুকে ধরে গণিকার বাড়ী নিয়ে গিয়েছিল, তার সেই প্রবৃত্তির মূলে গভীর ভালোবাসাই যে ছিল, এ-কথা অস্বীকার করা চলে না।"

কল্যাণী উত্তর না দিয়া অন্যদিকে তাকাইয়া রহিল।

আন্তরিক ভালোবাসা কথাটা হয় তো খুবই সত্য, কিন্তু এই প্রকৃত ভালোবাসাই যে নাই।

কল্যাণীও তো একদিন ভাবিয়াছিল, সে তাহার স্বামীকে আন্তরিক ভালোবাসে; তাহার এ ভালো-বাসা কোনোদিন শিথিল হইবে না বলিয়াই তাহার বিশ্বাস ছিল। আজ নিমাইয়ের কথায় অত্যন্ত সচকিত হইয়াই সে নিজের অন্তর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল, কিন্তু সেখানে প্রতিহিংসার দুর্দ্দমনীয় কামনা ছাড়া আর কিছুই নাই। আঘাত দিয়া সে আঘাত পাওয়ার বেদনা ভুলিতে চায়, ঘরের কোণে পড়িয়া মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে সে চায় না।

নিমাই টিকেট কাটিতে চলিয়া গেল।

খানিক পরে সে যখন ফিরিয়া আসিল কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিল, "কোথাকার টিকেট করলে ঠাকুর-পো?"

নিমাই বলিল, "উপস্থিত কলকাতার টিকেট করে আনলুম, তারপর ওখান হতে দেশের টিকেট করা যাবে।"

কল্যাণী মাথা নাড়িল, বলিল, "কিন্তু আমি তো আর দেশে ফিরব না, বাড়ীতে যাব না।"

নিমাই যেন আকাশ হইতে পড়িল, "বাড়ী যাবে না কি রকম?"

কল্যাণী অধর দংশন করিয়া বলিল, "বাড়ী যাব—কার বাড়ীতে আমি যাব—বাস করব বল দেখি? যে কেবলমাত্র আমায় বিয়ে করে আমার জীবনটা ব্যর্থতায় ভরে দিয়ে, স্ত্রীর কর্ত্তব্য পালন করতে রেখে নিজে সরে গেছে, তারই বাড়ীতে যাব? দিনের পর দিন তার ঘর বাড়ী পাহারা দেব, পরিষ্কার করব—একা দুঃখময় জীবনটা কাটিয়ে দেব—সে আমি পারব না, কিছুতেই না।"

নিমাই তাহার মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় থাকবে?"

কল্যাণী সোজা উত্তর দিল, "তোমার বাড়ীতে—"

"আমার বাড়ীতে—?"

নিমাইয়ের মুখখানা একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল, সে নিস্তব্ধে কেবল কল্যাণীর পানে তাকাইয়া রহিল।

কল্যাণী দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "এ কথা শুনে তোমারই বা এত ভয় হল কেন ঠাকুর-পো? তোমার বাড়ী আমি থাকতে চাচ্ছি শুনেই তোমার মুখখানা সাদা হয়ে গেল, এতে তোমার কিসে বাধছে বলতে পারো? কিন্তু এ কথা তো অস্বীকার করা চলবে না ঠাকুর-পো, তুমি দিনের মধ্যে বেশীর ভাগ সময় আমার কাছে থাকতে চাও, অনেক লোকে এ জন্যে তোমায় অনেক কথাই বলেছে; কিন্তু একটা কথাও তুমি কাণে নাওনি। এই যে বাড়ী ঘর মা ছেড়ে কেবল আমার সঙ্গলাভের জন্যই আমার সঙ্গে এসেছ, এ সত্য আজ তুমি অস্বীকার করতে চাইলেও, আমি তো তা মানব না ঠাকুর-পো। আমি যা লক্ষ্য করেছি, সেগুলো কি কেবল বাইরের, ওর মধ্যে তোমার অন্তরের আকর্ষণ এতটুকু নেই? আজ তোমার বাড়ীতে গিয়ে থাকতে চাই শুনে তুমি শিউরে উঠলে, কিন্তু সত্যি করে বল দেখি, তোমার অন্তরের অন্তরালে আমায় তোমার কাছে পাওয়ার কামনাটাই জাগছে নাকি?"

নিমাই স্তম্ভিতভাবে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল; ধীরকণ্ঠে বলিল, "হয়তো হয়েছিল বউদি, কিন্তু—"

কল্যাণী শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "হঠাৎ মনের ভাবটা বদলে গেছে—কেমন? নাঃ, দেখছি সত্যিই তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য আছে, যাতে অত বড় মহাপাপীর মনের গতিও বদলে যায়। একদিন যাকে নিজের কাছে পেতে চেয়েছিলে, আজ তাকে হাতের কাছে পেয়েও ঠেলে দিতে চাচ্ছো, এ কি কেবল তীর্থস্থানের মাহাত্ম্যেই নয় কি?"

নিমাই বলিল, "তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য আছে কি না তা জানি নে, তবে ম'নুষের মনে যে বিরাট দৌর্ব্বল্য আছে, এ কথা স্বীকার করব। তোমায় একদিন খুব কাছেই পেতে চেয়েছিলুম—সেদিন তোমায় পাওয়া দুষ্কর বলেই জানতুম। তবু বলি বউদি, কি রকম ভাবে যে পেতে চেয়েছিলুম, তা আমি আজও ভেবে ঠিক করতে পারি নি। তোমার কাছে যাওয়ার, তোমার কাছে থাকার, কথা বলার একটা অদম্য স্পৃহা আমার মধ্যে আছে,—হয়তো তোমায় পরস্ত্রী বলেও ভাবিনি, কেন না জয়ের নেশা মানুষকে পাগল করে। কিন্তু জয় যখন স্বতঃই হয়ে যায়, যুদ্ধের আয়োজনই হয় মাত্র, তখন মানুষ শক্তিহীন হয়ে পড়ে, আগেকার উদ্যম আর থাকে না, এ কথা তুমি মানবে তো বউদি।"

কল্যাণী বলিল, "বুঝেছি, উদ্যোগপর্ব্বেই জয়লাভ করেছ, তুমি তাই আজ উদ্যমহীন; তোমার মধ্যে আর স্পৃহা নেই, সেইজন্যেই তোমার বাড়ীতে তোমার কাছে আমায় রাখতে তুমি ভয় পাচ্ছ।"

নিমাই হাসিয়া বলিল, "ভয়? ভয় নয় তবে—"

কল্যাণী বলিল, "সংস্কারে বাধছে বল?"

নিমাই তাহার মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি আমায় পরীক্ষা করছো বউদি?"

বিস্মিত হইয়া গিয়া কল্যাণী বলিল, "কিসের পরীক্ষা তোমায় করব ঠাকুর-পো?"

নিমাই বলিল, "তুমি প্রথম হতেই আমার আচরণগুলো লক্ষ্য করেছ, আমার দৌর্ব্বল্য কোন্‌খানে তা তুমি সহজেই ধরতে পেরেছ, আর সেই ছিদ্রগুলো পেয়েই তুমি আজ একটা মতলব গড়ে তাতে সাহায্য করতে আমায় ধরেছ। কিন্তু বউদি, তোমার কথা তুমি বলেছ, আমার কথা এবার শোন। মানুষ ভালোবাসে হয় তো অনেককেই, অথচ অনেকেই প্রথমে বুঝতে পারে না সে কি রকম ভালোবাসে, তাদের ভালোবাসার পাত্র বা পাত্রীদের কি রকম ভাবে পেতে চায়। এর মীমাংসা হয় দিন কত পরে যখন ভালোবাসার তরলতা ঘুচে যায়, সেটা জমাট হয়ে আসে;—তখনই একটা সম্পর্ক গড়ে নেওয়ার জন্যে মানুষ অধীর হয়ে ওঠে। দেহের দাবীর কথা বলবে—

কিন্তু ও তো পুরানো হয়ে গেছে বউদি। মানুষ সৃষ্টির আদিম যুগ হতে দেহের উপর রাজত্ব করে আসছে, দেহের তৃপ্তিই একমাত্র কাম্য জিনিস বলে জানছে। আজও যদি আমরা তাদেরই মত কেবলমাত্র দেহ উপভোগ করাটাকেই একমাত্র কাম্য বলে সকলের উপরে স্থান দেই, তাহলে তার সঙ্গে সঙ্গে এটাও মেনে নিতে হবে—আজ সেই সব অসভ্যদের তুলনায় অনেক উপরে স্থান পেয়েও আমরা সভ্য শিক্ষিত নই, আমরা এক পা এগিয়ে যেতে পারি নি, ঠিক সেই জায়গাতেই রয়ে গেছি। চোখের সামনে যে সব নিকৃষ্ট প্রাণীদের দেখতে পাই—যারা কেবলমাত্র দৈহিক আকর্ষণে পরস্পরের কাছে আসে, আমরা নিজেদের ওদের চেয়ে মহৎ বলে ধারণা করলেও দেখতে পাই—ঠিক ওদেরই পর্য্যায়ে পড়ে আছি। ওদেরই মত আমাদের কাজ দৈহিক তৃপ্তিসাধন, বংশ-বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কিছুই নয়। সৃষ্টির আদিম যুগে যখন কেবল সৃষ্টির প্রয়োজন হয়েছিল, তখন এ আচরণ মন্দ চলে নি; কিন্তু আজ যখন আমরা দেখতে পাই—বংশ বৃদ্ধি করে কেবল পৃথিবীতে কতকগুলো দরিদ্র রুগ্ন পরিবারই রেখে যাচ্ছি, তখন সাবধান হওয়াই ভালো বই কি। তখন আমরা বেশী ভাবতে শিখি নি, ভবিষ্যতে আমাদের চোখ যায়নি, আমরা বর্ত্তমান জগৎটাকে মেনে চলতুম। দেহের সম্পর্ক ছাড়া আবার যে প্রীতিকর সম্পর্ক থাকতে পারে, সে কথা আজ যেমন জেনেছি, সেদিন জানি নি, সেদিন বুঝিনি উপভোগে আসক্তি, তৃষ্ণা কমে না, আরও বাড়ে। আজ আমায় সত্যিকার জয়লাভ করতে দাও বউদি, দৈহিক ঘৃণিত সম্পর্কের কথা ভুলে যেতে দাও; এসো—আমরা একটা নূতন সম্পর্ক সৃষ্টি করি। তুমি আমার মা হও, আমি মনে প্রাণে তোমার সন্তান হই। এতে তুমিও রক্ষা পাবে, আমিও পাব, আমরা পবিত্র নির্ম্মল যোজক। তুমি আমার বোন হও, আমি তোমার ভাই হই, নিঃসঙ্কোচে আমি তোমার পরিচয় সকলের কাছে দিয়ে তোমায় বাড়ী নিয়ে যাই। আমায় পরীক্ষা করছ কর, আশীর্ব্বাদ কর—যেন উত্তীর্ণ হতে পারি।"

কল্যাণী নির্ব্বাকে শুধু নিমাইয়ের পানে তাকাইয়া রহিল। কথা শেষ করিয়া একটী কোন কথা শুনিবার প্রত্যাশায় তাহার পানে তাকাইয়া রহিল, কিন্তু কল্যাণী উত্তর দিল না। নিমাইয়ের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে মাথা নীচু করিল।

সংশয়ে নিমাইয়ের বুক দুলিতেছিল—এ নারী কি চায়?

খানিক পরে কল্যাণী মুখ তুলিল, ধীরকণ্ঠে বলিল, "কলকাতায় চল ঠাকুরপো। তুমি আমার সঙ্গে যে সম্পর্কই পাতাও—জেনো—আমি ওখানেই থাকব—দেশে আর ফিরব না। উপস্থিত তোমার বাড়ীতে আমায় দু'দিনের জন্য স্থান দাও, তারপর নিজের জায়গা নিজে দেখে নেব।"

ট্রেণ আসিবার সময় হইয়াছিল, উভয়েই প্রস্তুত হইল।

১৩

দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে, কল্যাণী বা বিশ্বপতির কোনও উদ্দেশ নাই,—সনাতন ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

এদিকে কেমন করিয়া গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গেল—কল্যাণী নিমাইয়ের সহিত পুরীতে গিয়াছিল; কিন্তু সেখানে এক-রাত্রিও থাকে নাই; সে যেমন গিয়াছিল তেমনই ফিরিয়াছে; কোথায় গিয়াছে, সে সংবাদ কেহই জানে না।

কথাটা সনাতন বিশ্বাস করিতে পারে না।

এ কথা কখনও বিশ্বাস করিতে পারা যায়? গ্রামের লোকে কল্যাণীর পরিচয় পাইয়াছে কতটুকু? তাহারা কল্যাণীকে দেখিয়াছে মাত্র, আসল মানুষটাকে চিনিতে পারে নাই। তাহারা এ কথা বিশ্বাস করিবে; কেন না, প্রকৃতিই তাহাদের ঐরূপ। শূন্যে ছায়া গড়িয়া তাহাই লইয়া একটা বিরাট মূর্ত্তি কল্পনায় গড়িয়া তোলা লোকের স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাস, মিথ্যা কথা সাজাইয়া মালা গাঁথিতে তাহারা সিদ্ধহস্ত।

সনাতন কল্যাণীকে চেনে। কেবল বাহিরের মানুষটীর নয়, তাহার অন্তরে যে রহিয়াছে, তাহার পরিচয় সনাতন পাইয়াছে। সনাতন জানে কল্যাণী তেমন মেয়ে নয় যে, এত সহজে পথ হারাইয়া ফেলিবে।

শ্রীরূপ পুরী হইতে সম্প্রতি ফিরিয়া আসিয়াছে। সে-ই এই ব্যাপারটা গ্রামে রাষ্ট্র করিয়াছিল। একদিন পথ চলিতে তাহাকে দেখিতে পাইয়া সনাতন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—কথাটি কি বাস্তবিক? মা লক্ষ্মী কি ফিরিয়া আসিয়াছে, না বিশ্বপতির কাছেই আছে?

শ্রীরূপ জানাইল—সত্যই কল্যাণী যেদিন

পুরীতে গিয়াছিল, সেই দিনই বৈকালের দিকে চলিয়া আসিয়াছে। সে বাড়ীতে বড় জোর দুই তিন ঘণ্টা মাত্র ছিল। বাড়ীর ভিতর কি ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহা সে জানে না; তবে কল্যাণী হঠাৎ চলিয়া আসায় বাড়ীর সকলেই যেমন বিস্মিত হইয়াছিল, সেও তাহার চেয়ে বড় কম হয় নাই। কারণ অনুসন্ধান করিয়া গোপনে সে জানিতে পারিয়াছে, নিমাইবাবুর সঙ্গে বিশ্বপতিকে দেখিতে যাওয়ায় বিশ্বপতি মোটেই খুসি হইতে পারে নাই এবং সেইজন্যই সে কল্যাণীকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়াছে; নিমাইবাবুকেও অপমান করিতে ছাড়ে নাই। বিশ্বপতি কল্যাণীকে তৎক্ষণাৎ পুরী ত্যাগ করিবার আদেশ দিয়াছিল,—গ্রামের বাড়ীতে যেন না ফিরিয়া আসে, সেজন্য আদেশ দিয়াছিল। সেইজন্যই কল্যাণী গ্রামে ফিরে নাই, আর আসিবেও না।

সনাতন বহুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর কম্পিত শ্লথপদে বাড়ীর দিকে ফিরিল।

অভাগিনী নারী এমনই করিয়া না অত্যাচার লাঞ্ছনা সয়?

হতভাগ্য বিশ্বপতি,—

এমন রত্ন সে চিনিল না! কাচ লইয়া সে ভুলিয়া রহিল, মহামূল্য হীরক পদাঘাতে দূরে ফেলিয়া দিল!

নিমাইয়ের সঙ্গে সে পুরী গিয়াছে, এইমাত্র তাহার অপরাধ, এ ছাড়া আর কোন অপরাধ তো সে করে নাই! প্রিয়জন যদি দূরদেশে থাকিয়া সঙ্কটাপন্ন ব্যারামে পড়ে, কেহই স্থির থাকিতে পারে না।

বিশ্বপতি ধরিয়া লইয়াছে অন্য রকম। সে নিমাইকে অন্যরূপ ভাবিয়াছে, কল্যাণীকে ভুল বুঝিয়াছে। কল্যাণীর নির্ম্মল পবিত্র চরিত্রে সে কলঙ্কের রেখা আঁকিয়া দিয়াছে, স্পষ্টই অপমান করিয়াছে।

সে ধারণাও করিতে পারে নাই—স্বামীর সঙ্কটাপন্ন ব্যারামের খবর পাইয়া স্ত্রী হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাকে যে এ জন্য জবাবদিহী করিতে হইবে, তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই।

এমনই মিথ্যা সন্দেহ করিয়াই না পুরুষরা মেয়েদের ধ্বংসের পথে নামাইয়া দেয়, তাহাদের আত্মহত্যা করিবার প্রবৃত্তি জাগাইয়া দেয়? এই যে দারুণ অপমানে মর্ম্মাহতা কল্যাণী চলিয়া গেছে,—কে জানে সে কোথায়, কে জানে সে বাঁচিয়া আছে কি না? যদি আত্মহত্যা করিবার সাহস তাহার না হয়, তাহা হইলে তাহার পরিণাম কি হইবে, তাহা ভাবিতেও বৃদ্ধ সনাতন শিহরিয়া উঠে।

কিন্তু তাহাও কি সম্ভব হইতে পারে? দুনিয়ায় প্রলোভন অনেক আছে; কিন্তু সেই প্রলোভনে পড়িয়া আপনার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিবে, কল্যাণী তেমন মেয়ে নয়। অধঃপাতে যাওয়া লোকে যত সোজা বলিয়া মনে করে, সত্যই তত সোজা নয়।

তথাপি সনাতন অস্থির হইয়া উঠিল। কল্যাণীর নামে লোকে যে এত কথা বলিতেছে, তাহা সে সহ্য করিতে পারিতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল, কল্যাণীর এ গৃহত্যাগ করিয়া আর কোথাও স্বচ্ছন্দে বাস করার সংবাদ পাইবার পরিবর্ত্তে মৃত্যু সংবাদ পাইলেই ভালো হয়। সে কাঁদিবে, কষ্ট পাইবে, তবুও সগর্ব্বে সকলকে জানাইবে—তাহারা যাহা বলিতেছে তাহা মিথ্যা, তাহার মা-লক্ষ্মী নিজের পবিত্রতা বাঁচাইতে আত্মবলি দিয়া বিজিতার গৌরব লাভ করিয়াছে।

সনাতন ভাবিতে লাগিল, সে এখন কি করিবে। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া সে বিশ্বপতিকে একখানা পত্র দেওয়া যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিল।

বহুকাল পরে সে সেদিন খুঁজিয়া খুঁজিয়া দোয়াত, কলম ও কাগজ লইয়া পত্র লিখিতে বসিল।

এক লাইন লিখিতে দশটা ভুল হয়, "ক" লিখিতে "ল" লিখিয়া বসে; কোন্ লাইনটা কাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়ে, সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে গেলে অক্ষর যোজনা করা চলে না। তবু যেমন তেমন করিয়া পত্রখানা শেষ করিয়া সে সেই দিনই নিজের হাতে পোষ্ট আফিসে দিয়া আসিল।

পত্রে সে কল্যাণীর সম্বন্ধে কোন কথাই লিখিল না, কেবল লিখিল বিশ্বপতির শীঘ্র ফিরিয়া আসা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। তাহার শরীর অসুস্থ, সেই জন্য কিছু দিন সে মেয়ের নিকট যাইবে। এখানকার জমিজমা, বাগান ও বাড়ী কাহার ভরসায় রাখিয়া যায়, তাহাই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছে না।

পত্র পাঠাইয়া সে উত্তরের আশায় পথপানে তাকাইয়া রহিল। তাহার দোরগোড়ায় পোষ্টম্যানের পথ-চলা দুষ্কর হইয়া উঠিল। প্রত্যহই সে পথের

ধারে পোষ্টম্যানের প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া থাকে, আকাঙ্ক্ষিত লোকটাকে দেখিয়াই নিকটে ছুটিয়া যায়, ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করে—"বাবুর পত্র আছে—আমার নামের পত্র?"

গ্রামের ছেলেই পোষ্টম্যানের কাজ করে, সে উত্তর দেয় "পত্র নাই।"

অনুনয়ের সুরে সনাতন বলে, "তবু দেখ না ভাই একবার, ওর মধ্যে যদি থাকে—"

পোষ্টম্যান তাহার অন্তরের আকুলতা বুঝে না; তবুও সময় নষ্ট করিয়া খানিক দাঁড়াইয়া হাতের সমস্ত পত্রগুলা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে, তাহার পর উত্তর দেয়—"না দাদা, পত্র আসে নি।"

হতাশ ভাবে ফিরিয়া আসিয়া সনাতন বারাণ্ডায় বসিয়া পড়ে। দিন গণিয়া হিসাব করে কত দিন পত্র দেওয়া হইয়াছে। এই তো কাছেই পুরী,—পত্র যাইতে বড় জোর না হয় চার দিনই লাগে, আসিতেও চার দিন লাগে। কিন্তু কত আট দিন অতীত হইয়া গেল, আজও তো পত্রের জবাব আসিল না।

অবশেষে সত্যই একদিন ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল; পোষ্টম্যান হাসিমুখে একখানি কার্ড দিল। তাহাতে সামান্য দুচার লাইন লেখা,—এই ভাদ্র মাসের কয়টা দিন পরেই বিশ্বপতি আসিতেছে, সনাতন যেন আর কয়টা দিন অপেক্ষা করে।

সনাতন একটা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। তাহা হইলে বিশু আসিতেছে,—আর বেশী দিন সে পুরীতে থাকিবে না।

পত্রখানা সে সযত্নে রান্নাঘরের চালের বাতায় গুঁজিয়া রাখিল।

১৪

বাড়ী ফিরিবার জন্য বিশ্বপতি ছট্‌ফট্ করিতেছিল, পুরী তাহার আর ভালো লাগিতেছিল না।

সেদিন শ্রাবণের মেঘভরা একটী দিনে যে আসিয়াছিল, ক্ষণেকের দেখা দিয়া শান্তির পরিবর্তে অশান্তি লইয়াই সে চলিয়া গেছে,—অহোরাত্র কেবল তাহার কথাটাই মনে জাগিতেছিল।

কতখানি আশা লইয়াই সে আসিয়াছিল; আর কি নিদারুণ অভিমান ও বেদনা লইয়া সে চলিয়া গেছে। সে বিশ্বপতির কাছে একটী কথাও বলে নাই, একটীবার মাত্র যে চোখ দুটি তুলিয়াছিল, তাহাতেই মনের ভাষা ব্যক্ত হইয়া গেছে।

সে আর একটীবার বিশ্বপতির পানে ফিরিয়া চায় নাই, সোজা গিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছিল।

নিজের মনের ব্যথা প্রকাশ করিবার জন্য সে অধীর ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু নন্দার মুখের পানে তাকাইয়া সে একটী কথাও বলিতে পারে নাই। সমস্ত দিনটা নন্দার মুখে একটী কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই, অথচ নীরবে সে নিজের সব কাজই করিয়া গেছে। কতবার বিশ্বপতির সম্মুখে আসিয়াছে, তাহাকে খাওয়াইয়াছে, ঔষধ নিয়মিত ভাবেই নিজের হাতে ঢালিয়া দিয়াছে, অথচ কোন কথাই হয় নাই। সন্ধ্যার পর সে বিশ্বপতির নিকটে আসিয়া বসিল, আবার প্রতিদিনকার মত গল্প জুড়িয়া দিল। এই গল্পের ফাঁকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "বউদির জন্যে আজ তোমার মনটা বড় খারাপ হয়ে গেছে—না বিশুদা?"

অকস্মাৎ চমকাইয়া বিবর্ণ হইয়া উঠিয়া বিশ্বপতি বলিল, "দূর, তাই কি,—সত্যি নন্দা, তার জন্যে আমার—"

খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া নন্দা বলিল, "বিলক্ষণ, তোমার কাছে আমি কি কৈফিয়ৎ চাচ্ছি বিশুদা,—ওর জন্যে তোমায় আর দিব্যি করতে হবে না। স্ত্রীর এ রকমভাবে হঠাৎ চলে যাওয়ায় স্বামীর মনে নিদারুণ কষ্ট হয় না, এ কথা বললে আমি শুনব না।"

অতিরিক্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বিশ্বপতি বলিল, "না না, সত্যি তুমি বিশ্বাস কর নন্দা, রাঙাবউকে সত্যিই আমি ঠিক অন্তরের সঙ্গে নিতে পারি নি। অথচ তুমি তো দেখেছ নন্দা—রূপ তার যথেষ্ট আছে, লেখাপড়া বেশী না জানুক—তবু গুণ তার যথেষ্ট আছে। ও যদি না আসত আমি কোথায় ভেসে চলে যেতুম তার ঠিক নেই। ও ছিল বলেই আমি আজও গৃহী,—আজও ছন্নছাড়া হইনি। যেখানে যখন গেছি—একেবারে ভেসে যেতে পারি নি, নিজের অস্তিত্ব একেবারে বিলীন করতে পারিনি, ওর কথা মনে করে আবার ফিরে এসেছি। কিন্তু তবু—তবু নন্দা, সত্যি কথাই বলছি, আমি ওকে সত্যি নিজের বলে নিতে পারি নি, ওকে ভালোবাসতে পারি নি। যেটুকু করেছি, সে যেন কেবল কর্ত্তব্যের দায়ে। ও যে তা বোঝে নি, তা নয়,—দেখলে না—আমার একটী মাত্র কথায় কি রকম করে চলে গেল, আর একটীবার

পেছন ফিরে চাইলে না, আমি যা বললাম, সে কথাটা বুঝবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করলে না! এতে তুমি মনে করবে রাঙাবউ বোকা,—তা নয়,—সে অনেক বুদ্ধি ধরে, তা জেনে রেখো।"

কল্যাণী যে বোকা নয়, তাহা নন্দা অন্তরে অন্তরে বেশ বুঝিয়াছিল। যদি বিশ্বপতি বোকা বলিত তাহা হইলে সে প্রতিবাদ করিত, বিশ্বপতিও তাহার পরিচয় জানে জানিয়াই সে চুপ করিয়া গেল।

বিশ্বপতি ক্লান্তভাবে বিছানায় কাত হইয়া পড়িয়া বলিল, "হঠাৎ বিকেল হতে মাথাটা কি রকম ধরেছে, কিছুতেই নরম পড়ল না। ভেবেছিলুম গরমে মাথা ধরেছে, কিন্তু এখন তো বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে, তবু—"

নন্দা বলিল, "হাত বুলিয়ে দেব?"

বিশ্বপতি বলিল, "দাও।"

নিস্তব্ধে সে পড়িয়া রহিল, নিস্তব্ধে নন্দা তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

নন্দা ইহার পর কল্যাণীর সম্বন্ধে আর একটী কথাও তুলিল না, বিশ্বপতিও যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়া গেল। তাহার মনে কেবল ভয় হইতেছিল নন্দা কখন কি খোঁচা দেয়, কখন কি কথা বলিয়া বসে।

বাড়ী ফিরিবার জন্য মনটা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। সেদিন বাড়ী ফেরার কথা মুখে আনিবামাত্র নন্দা প্রচণ্ড এক ধমক দিয়া বলিল, "তাই বল যে বউদির জন্যে মন কেমন করছে। তবে কোন্ মুখে সেদিনে বললে বউদিকে ভালোবাস না,—আমি তাই ভাবছি। মাগো, তোমরা পুরুষ জাতটা এত মিথ্যে কথাও বলতে পারো।"

ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বিশ্বপতি বলিল, "আঃ, কি যে বল নন্দা, দেশে কেবল যেন আমার বউই আছে, বাড়ী ঘর জমিজমাগুলো সব ভেসে গেল আর কি। এই দেখ সনাতন পত্র দিয়েছে তার অসুখ—সে মেয়ের বাড়ী চলে যাবে, আমায় শীগ্‌গির যেতে বলেছে

পত্রখানার উপরে একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া নন্দা গম্ভীর মুখে মাথা নাড়িল, "উঁহু, তা বলে তোমার এখন যাওয়া হতে পারে না বিশুদা। এই সে দিন অত বড় ব্যারামটা হতে উঠলে, এখনও চেহারা ফেরে নি, গায়ে জোর পাও নি, এখনই তোমায় পাঠাই আর কি? ও সব কথা রাখ, আসল কথা বল যে দেশে না গেলে তোমার সুবিধা হচ্ছে না। এখানে যে তোমার নেশা চলছে না,—দেশে না গেলে ও সব ছাই ভস্ম খাওয়ার সুবিধা হবে কেন?"

বিবর্ণ হইয়া বিশ্বপতি বলিল, "ছিঃ, ছিঃ, তুমি ও-সব কথা কি বলছ নন্দা? তোমার হয়েছে কি বল দেখি? যা মনে আসছে তাই মুখ ফুটে বলে যাচ্ছো? একটু ভেবে চিন্তে বিবেচনা করে কথা বললেই ভালো হয় না কি?"

চাপা হাসি হাসিয়া নন্দা বলিল, "ভেবে কথা বলবার মত ধৈর্য্য আমার নাই বিশুদা। কিন্তু আমার মনে ছিল না সত্যই তুমি নেশা পুড়িয়ে ভগবান হয়েছ। তা যদি হয়ে থাকো তা হলে সত্যিই কপালের জোর বলতে হবে, কি বল। যাক, তুমি সনাতনকে একখানা পত্র লিখে দাও—এ মাসের এ কয়টা দিন যাক। আশ্বিনের দশই আমাদের যাওয়ার দিন ঠিক করে উনি পত্র দিয়েছেন। তার আগেই উনি আসবেন, আমরা একসঙ্গেই যাব। কলকাতা হতে তুমি সহজেই বাড়ী চলে যেতে পারবে। আর এই কয়টা দিন মাঝখানে বই তো নয়, দেখতে দেখতে কেটে যাবে।"

বাড়ীর দিকে মনটা টানিলেও বিশ্বপতি মুখ ফুটিয়া আর একটি কথাও বলিতে পারিল না। সেই দিনই একখানা কার্ডে সনাতনকে পত্র লিখিয়া সেখানা নন্দার হাতে দিয়া বলিল, "পড়ে দেখ।"

নন্দা হাতের মধ্যে পত্রখানা লইয়া উদাসীন ভাবে বলিল, "না, সত্যি, তোমার মন যদি একান্তভাবে টেনেই থাকে, তুমি অনায়াসে চলে যেতে পারো বিশুদা,—এর পরে যে আমার নামে দোষ দেবে, আমিই তোমায় যেতে দেয়নি—"

অত্যন্ত কাতর হইয়া হাত দু'খানা যোড় করিয়া বিশ্বপতি বলিল, "মাফ কর নন্দা, কেটে কেটে আর নুন দিয়ো না। যদি জানতে এর জ্বালা কি রকম তা হলে এ রকম করে কাটা ঘায়ে নুন দিতে পারতে না।"

নন্দা কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। কথাটা ফিরাইয়া লইয়া বলিল, "দেশে তো যাবে,—সেখানে গিয়ে যদি শরীরের দিকে নজর না দাও, জানছো তার পরিণাম কি হবে?"

বিশ্বপতি বলিল, "তুমি দেখে নিয়ো আমি শরীরের দিকে দৃষ্টি রাখি কি না। কার্ত্তিক মাসে একবার তোমার ওখানে যাব, গেলেই দেখতে পাবে।"

নন্দা গম্ভীর মুখে বলিল, "দেখা যাবে। বেশী

দূরের পথ তো নয়, যদি নাই এসো—আমি নিজেই যাব দেখতে।"

পত্রখানা দাসীর হাতে দিয়া সে পোষ্ট করিতে পাঠাইয়া দিল।

১৫

দিনগুলা যেন কাটিতে চায় না, পুরীর দৃশ্য একঘেয়ে হইয়া গিয়াছে, সমুদ্র দেখিতে আর ভালো লাগে না। কিছুর মধ্যেই আর বৈচিত্র্য নাই।

অথচ একদিন এই সব দেখিতেই বড় ভালো লাগিত। বিশ্বপতি সমুদ্রের ঢেউ দেখিতে ছুটিয়া যাইত। সাগরে সূর্য্যোদয় দেখা তাহার কাছে বড় লোভনীয় ছিল। আকাশে যখন মেঘ সাজিয়া আসিত, কালো জলের উপরে কালো মেঘের ঢেউ খেলিত, আশ্চর্য্য হইয়া সে তখন তাকাইয়া থাকিত।

জগন্নাথের মন্দিরে নিত্য কত লোক আসা যাওয়া করিত, বিশ্বপতি প্রত্যহ তাহা দেখিতে যাইত।

এখন সে আর দেখিতে যায় না, দেখিতে ভালোও লাগেনা। বিশ্বপতি এখন দেশের কথাই ভাবে।

ক্ষুদ্র গ্রাম, জনাকীর্ণ সহরের তুলনায় সে কত পিছনে—কি নিবিড় অন্ধকারেই ডুবিয়া আছে। তবু সেখানে যা আছে, আর কোথাও তাহা নাই। অসুখ হইতে উঠিয়াই সে কল্যাণীকে একখানা পত্র দিয়াছিল, এত কালের মধ্যে তাহার জবাব আসিল না। কল্যাণী রাগ করিয়া গিয়াছে, সে হয় ত উত্তরও দিবে না। বিশ্বপতি অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া পত্র দিয়াছে, রোগের সময় তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছিল, সেই জন্যই সে কল্যাণীকে অমন কটু কথা বলিয়াছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিশ্বপতি বেশ বুঝিতেছিল অভিমানিনী কল্যাণী সে অপমান ভুলিতে পারে নাই, ভুলিতেও পারিবে না। তাহার নিকট হইতে এত দূরে থাকিয়া বিশ্বপতি যে কোনো দিনই ক্ষমা পাইবে না, ইহা জানিত সত্য কথা। নিকটে গিয়া পড়িলে হয় তো ক্ষমা মিলিলেও মিলিতে পারে, দূর কেবল দুইয়ের মাঝখানে অধিকতর দূরত্বের ব্যবধানই জাগাইয়া রাখিবে।

সর্ব্বদাই তাহাকে চিন্তাকুল ও অন্যমনস্ক দেখিয়া নন্দা সেদিন আর স্থির থাকিতে পারিল না, স্পষ্ট বলিল, "তুমি বাড়ী চলে যাও বিশুদা, আমাদের এখনও যেতে দু পাঁচ দিন হয় তো দেরী হবে, তোমায় কেন আর বদ্ধ করে রাখি। এ সময়টা গেলে তোমার ভাঙ্গা শরীর আরও বেশী ভেঙ্গে পড়বে বলেই যা আমার বাধা দেওয়া, নইলে আর কি? সত্যিই তো তুমি আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করবার জন্য এখানে থাকো নি, তোমার ভরসাতেই যে আমরা এই বিদেশে পড়ে আছি, তাও নয়। আমার ঝি চাকর, পুরানো সরকার আছে, ওরাই আমাদের দেখাশুনা করতে পারবে। তুমি থাকলেও যা না থাকলেও তাই, তবে অনর্থক—"

সে কথাটা তার শেষ করিল না। বিশ্বপতি মুখখানা নত করিয়া রহিল, নন্দার কথার একটা উত্তর দিল না।

নন্দা তাহার নত মুখখানার পানে একবার তাকাইয়া বলিল, আমি তা হলে আজই ওঁকে পত্র দেই, তুমি যাচ্ছো। কলকাতায় নেমে ওঁর সঙ্গে একবার দেখা করে যেয়ো অবশ্য করে। কবে যেতে চাও বিশুদা? শুক্রবারে দিন না কি ভালো আছে, সেই দিনই তা হলে যাও—কি বল?"

বিশ্বপতি মুখ তুলিল, তাহার মুখে বড় মলিন একটু হাসির রেখা—"আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি নন্দা, আমায় এ-রকম ভাবে বিঁধে তোমার কি সুখলাভ হয় বল তো? একটা জীবন্ত লোককে ধরে আগুনে পুড়িয়ে তোমার মনে কতখানি শান্তি হয়?"

উত্তরটা নন্দার মুখে আসিয়াছিল—তোমার মত লোককে বিঁধে শান্তি তৃপ্তি লাভ হয় বই কি! কিন্তু সে কথা সে চাপিয়া গেল। বলিল, "তোমায় বিঁধে আমার কোন লাভ নেই, শান্তিও নেই বিশুদা, আর এই কি বিঁধিবার মত কথা? তুমি নিজেই বারুদের স্তূপ, একটুখানি আগুনের আঁচ সইবার ক্ষমতা তোমার নেই, লোকে কি করবে বল?"

খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা বিশুদা, আমার দিব্যি,—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব—সত্যি উত্তর দেবে?"

বিশ্বপতি বলিল, "তোমার দিব্যি দেওয়ার কোন দরকার দেখছি নে, কেন না, দিব্যি না করেও এ পর্য্যন্ত যে মিছে কথা বলেছি তা আমার মনে হয় না। যা জিজ্ঞাসা করবে কর, উত্তর যা দেব তা সত্যিই দেব—যদিও জানি নে বিশ্বাস করবে কি না।"

নন্দা বলিল, "তুমি আগেও বলেছ, এখনও বল,

বউদিকে কেবল কর্ত্তব্যের খাতিরেই দেখ—এই কি সত্যি কথা ?"

বিশ্বপতি মুখ টিপিয়া একটু হাসিল মাত্র।

চিন্তিত মুখে নন্দা বলিল, "তবেই তো দেখছি ভাবিয়ে তুললে। আমি জানতুম মানুষের মন বড় উর্ব্বর, এখানে এতটুকু বীজ পড়বার অপেক্ষা মাত্র, বীজটি পড়বামাত্র গাছ জন্মায়। জানো—আমি ভালোবাসার কথা বলছি ? আমি জানি ভালোবাসা অনেক রকমেই জন্মায়, যেমন উপকারীকে ভালোবাসা, বন্ধুকে ভালোবাসা, শুশ্রূষাকারিণীকে ভালোবাসা—"

বিশ্বপতি বাধা দিয়া বলিল, "আর দাসীকে ভালোবাসা, রাঁধুনীকে ভালোবাসা ? বল বল, ও বেচারাদের কেন ছেড়ে দেবে,—ওদেরও নাম।"

হাসিয়া উঠিয়া নন্দা বলিল, "তাই বা মন্দ কি ? যে ঝি কি রাঁধুনী ঠিক মনের মত কাজ করে যায়, তাকে বুঝি মনিব ভালোবাসে না ? তুমি কি বলতে চাও ভালোবাসা কেবল কর্ত্তব্যের জন্যেই, ওর বৈশিষ্ট্য কিছু নেই ? আজকাল এ জিনিসটা কত সস্তা তা জানো ? নিরেট মূর্খ, পড়ে থাক পাড়াগাঁয়, তবুও তো ভালোবেসে গাঁখানাকে বৃন্দাবন করে তুলেছ।"

বিশ্বপতি বদ্ধ দৃষ্টিতে নন্দার পানে তাকাইয়া রহিল,—বলিল, "ঠাউরেছ ঠিক, যমুনা যদিও সেখানে নেই, তবু আমাদের সেই কাণা নদীটাও উজান বয়েছিল। বড় দুঃখ ছিল নন্দা—সেখানে তুমি ছিলে না, থাকলে একবার দেখে চক্ষু সার্থক করতে।"

নন্দা রাগ করিয়া বলিল, "আমার ভারী দায় কি না। ঘরের পানে না তাকিয়ে কোন্ দু'টো চোখের সন্ধানে, কোথায় কার শাড়ীর আঁচল দেখে ছুটতে, আমি যেতুম তাই দেখতে ? সাতপাকের বাঁধন দিয়ে যাকে আনা যায়, সে বেচারী বাধ্য হয়েই সব সয়ে যায়,—চোখের সামনে স্বামীর ব্যভিচারিতা দেখলেও একটা কথা বলবার যো তার থাকে না। আমি তো সাতপাকের বাঁধনে আসি নি বিশুদা। চোখের সামনে সে রকম দেখলে আমাদের অসহায়ের প্রধান অস্ত্র ঝাঁটা নিয়েই দৌড়াতুম।"

বিশ্বপতি নিঃশব্দে কেবল হাসিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ উভয়েই নীরব হইয়া রহিল।

নন্দা বলিল, "যেতে দাও ও-সব কথা। এক কথা বলতে গিয়ে হাজার কথা এসে পড়ল। বউদিকে তুমি ভালোবাসনা, আসল কথা সেইটেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে চাও। কিন্তু এটা যে সম্পূর্ণ ঠিক নয়, এ কথা জোর করে বলতে পারি। ঠাট্টা ছেড়ে দাও, সত্যি করে বল দেখি—তুমি—"

বিশ্বপতি বাধা দিয়া বলিল, "হয় তো হতে পারে—কোন দিন তা ভাবি নি,—তেবে দেখবার দরকারও হয় নি নন্দা।"

নন্দা পাইয়া বসিল, বলিল, "তবে পথে এসো দাদা। অনেকদিন ধরে অনেক খেলাই খেলেছ,—আজ সত্যিই ধরা দিতে হল কিনা বল দেখি ? হ্যাঁ, সত্যি কথা বল—সাতখুন তোমার মাপ, বল—বউদির জন্যেই ব্যগ্রতা। আমি তোমায় যেমন করেই পারি আশ্বিন মাসের প্রথমেই বাড়ী পাঠিয়ে দেব। তা নয় কত ভণিতা,—ওঁর বাড়ী যায়, জমি যায়, সব যায়,—কাজেই ওঁকে বাড়ী যেতেই হবে, আর কোথাও থাকা চলে না। আচ্ছা, সত্যি বল বিশুদা, এই এতগুলো মিথ্যে কথা এতদিন ধরে বলার কি দরকার ছিল,—সত্যি বললে আমি কি তোমায় ধরে মারতুম—না তোমায় তাড়িয়ে দিতুম ? বাপ রে, তোমরাই আবার বল মেয়েরা ভারি চাপা প্রকৃতি, সে কথা একেবারে মিথ্যে কি না বল। আমি দেখছি তোমাদের নাগাল পাওয়াই দুষ্কর,—আমাদের ক্ষমতা নেই যে তোমাদের জাতের নাগাল পাই।"

হঠাৎ কাণ উঁচু করিয়া সে শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। বিশ্বপতি কি একটা কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছিল, নন্দা ত্রস্তভাবে বলিল, "রোস রোস, শুনে আসি—কারা যেন বেড়াতে এসেছেন, মা আমায় ডাকছেন। আচ্ছা, তোমার কথা পরে শুনব এখন, আগে ওদিকটা দেখে আসি।" ত্বরিত-পদে সে বাহির হইয়া গেল।

মায়ের আহ্বান সে শুনিতে পাইল অথচ বিশ্বপতি শুনিতে পায় নাই,—আশ্চর্য্য হইয়া সে কেবল তাকাইয়া রহিল।

১৬

বেলা বারটার ট্রেণে বিশ্বপতি গ্রামের বুকে আসিয়া দাঁড়াইল।

ট্রেণ থামিতেই সে তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল। সঙ্গে একটা ট্রাঙ্ক ছাড়া আর কিছুই নাই। ট্রাঙ্কে কল্যাণীর জন্য নন্দা কতকগুলি জিনিষপত্র গুছাইয়া দিয়াছে।

তাহার নিজের জন্য প্রস্তুত স্বামীর দেওয়া

উপহার নূতন মিনা-করা ফুল জোড়া বিশুদার স্ত্রীকে উপহার দিয়াছে, শাঁখার উপর সোণা বাঁধান দুইটী বালা এবং একটি সোণা বাঁধান লোহা দিয়াছে। এ ছাড়া কাপড়, জামা, হাতীর দাঁতে তৈয়ারী সিন্দুরের কৌটা, কোন কিছুই দিতে সে কার্পণ্য করে নাই।

তাহাকে লুকাইয়া বিশ্বপতি একখানি ধূপছায়া রঙের শাড়ী, আলতার শিশি, চিরুণী প্রভৃতি কিনিয়াছে। আসার সময় নন্দাকে লুকাইয়া কোন এক সময় বাক্সে ভরিয়া লইয়াছে।

নন্দারাও আসিয়াছে, তাহারা কলিকাতায় নিজেদের বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। যাইবার সময় বিশ্বপতিকে প্রণাম করিতে গিয়া তাহার পায়ের উপর মুখখানা রাখিয়া চোখের জলে পা ভিজাইয়া দিয়া রুদ্ধকণ্ঠে নন্দা বলিয়াছিল, "বাড়ী গিয়েই একখানা পত্র দিয়ো বিশুদা, আর মাঝে মাঝে এক-একবার মনে করে আমার বাড়ী যেয়ো—ভুলো না। আর যদি আমায় কোন দিন এতটুকু স্নেহ করে থাক—এতটুকু ভালোবেসে থাক, তবে আমার মাথায় হাত দিয়ে বলে যাও—এবার হতে সৎ হয়েই থাকবে; আর কোন দিন নেশার জিনিষ স্পর্শও করবে না।"

বিশ্বপতি হাসিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু হাসি তাহার মুখে ফুটে নাই, সে চেষ্টার ফলে তাহার মুখখানাই কেবলমাত্র বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। সে নন্দার মাথায় হাত রাখিয়াছিল, কি বলিয়াছিল, তাহা সেই জানে।

আজ ষ্টেশন ছাড়াইয়া গ্রামের পথে পা দিয়াই মনে পড়িয়া গেল পূজার আর দেরী নাই। আজ সে যেন নূতন করিয়াই আকাশের পানে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া ভাবিল আকাশ নীল হইল কবে, এ বর্ণ এতদিন লুকাইয়া ছিল কোথায়?

মাঠের মাঝখানের পথ দিয়া চলিতে শুভ্র বন-কাশ ফুলগুলি তাহার গায়ে তাহাদের কোমল স্পর্শ দিয়া জানাইল, তাহারা আজও ঠিক তেমনই আছে;—মানুষ নিত্য বদলায়, তাহারা বদলায় না।

পাখীরা গাছের শাখায় বসিয়া,—উড়িয়া যাইতে গান গাহিয়া তাহাকেই যেন অভ্যর্থনা করিয়া গেল।

পাশেই একটা আমগাছের ঘন পাতার আড়ালে বসিয়া একটা পাখী শীষ দিতেছিল। একটু দাঁড়াইয়া বিশ্বপতি পক্ষীটাকে একবার দেখিবার করিল। মনে পড়িল—এ দোয়েলেই শীষ দিতেছে; কয়েক মাস পূর্ব্বে গ্রামে যখন সে ছিল তখন এই দোয়েলের শীষেই প্রত্যহ প্রভাতে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। ঘরের জানালার ধারে একটী গাছে বসিয়া পাখীটি প্রত্যহ ভোরের সময় গান গাহিতে সুরু করিত।

মাত্র কয়েক মাস দেশ ছাড়া; ইহারই মধ্যে যেন কত পরিবর্ত্তন হইয়া গেছে। যেদিন সে যায়, সেদিন ওই শিউলি ফুলের গাছটা লক্ষ কুঁড়ি বুকে জাগাইয়া তুলে নাই,—আজ সবুজ পাতার মাঝে লক্ষ সাদা কুঁড়ি জাগিয়াছে, গাছের তলায় কত ফুল ঝরিয়া পড়িয়াছে।

দ্রুতপদে বিশ্বপতি পথ অতিবাহিত করিতে লাগিল। গ্রাম্য পথ এ সময় পথিক-পরিত্যক্ত, গ্রামবাসী এ সময় নিজের নিজের গৃহে কার্য্যে ব্যাপৃত। পথে ক্বচিৎ কাহারও সহিত দেখা হইল; তাহারা পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল, একটা কথাও বলিল না।

বিশ্বপতি কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত করিল না, ছোট হালকা ট্রাঙ্কটাকে হাতে লইয়া হন হন করিয়া সে বাড়ীর দিকে চলিল।

সনাতন বাড়ীর বারাণ্ডায় বসিয়া তামাক খাইতেছিল, হঠাৎ সামনে বিশ্বপতিকে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি হুঁকা ফেলিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল—"এই যে দাঠাকুর,—আমি তোমার কথাই ভাবছিলুম।"

তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া আসিয়া সে তাহার হাত হইতে ট্রাঙ্ক নামাইয়া ঘরের ভিতর লইয়া গেল, একটা মাদুর আনিয়া বারাণ্ডায় পাতিয়া দিল।

শ্রান্তভাবে বিশ্বপতি মাদুরে বসিয়া পড়িল; সনাতন বাতাস করিতে করিতে বলিল, "ওপরের জামাটা খুলে ফেল দাঠাকুর, একেবারে ঘেমে নেয়ে উঠেছ যে।"

একটু হাসিয়া গায়ের জামা খুলিতে খুলিতে বিশ্বপতি বলিল, "পাখা আমায় দাও সনাতন; তোমায় আর বাতাস করতে হবে না। তুমি একটু বস—পাঁচটা কথাবার্ত্তা হোক।"

সনাতন সে কথায় কাণ দিল না, আগের মতই বাতাস করিতে করিতে বলিল, "ইস, কি চেহারাই হয়ে গেছে দাঠাকুর একেবারে যে আধখানা হয়ে গেছ, দেখে আর চিনবার যো নেই। গায়ের অমন সোণার মত রং একেবারে

কালি হয়ে গেছে, সমস্ত মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে—"

বিশ্বপতি নিজের আকৃতির পানে একবার তাকাইয়া বলিল, "এখন তো বেশ ভালো হয়েছি; যে চেহারা হয়েছিল তা যদি আগে দেখতে তাহলে জ্ঞান থাকত না।" বলিয়া সে প্রচুর হাসিতে লাগিল।

সনাতন দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া বলিল, "জগবন্ধু রক্ষা করেছেন। শ্রীরূপের মুখে সবই শুনেছি দাঠাকুর, যা অসুখ হয়েছিল, ওতে যে প্রাণে বেঁচেছ এই ঢের। তুমি একটু বসো দাঠাকুর, আমি চট করে মুখুয্যে বাড়ী হতে আসি।"

সে বিশ্বপতির আহার্য্যের ব্যবস্থা করিবার জন্য উঠিয়া পড়িল। মুখুয্যে বাড়ীর মেয়েদের ধরিয়া যদি দুইটী ভাতের জোগাড় করিয়া আনিতে পারে, তাহাই সে ভাবিতেছিল। এই মানুষটা দুপুরে বাড়ী আসিয়াছে, এখন নিজেই রাঁধিয়া খাইবে, ইহা একেবারেই অসম্ভব।

সে পাখা রাখিয়া উঠিয়া অগ্রসর হইতেই বিশ্বপতি ডাকিল,—"আবার মুখুয্যেদের বাড়ী কেন, হঠাৎ এমন কি দরকার পড়ল?"

মাথা চুলকাইয়া সনাতন বলিল, "তোমার খাওয়ার যোগাড় করতে।"

বিশ্বপতি দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "কেন, তারা কেউ নেই,—কোথায় গেল সব?"

কি উত্তর দিবে সনাতন তাহাই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না; সে কেবল মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

বিশ্বপতি প্রশ্ন করিয়া নিজেই তাহার উত্তর দিল, "বোধ হয় তার মাসীমার বাড়ী গেছে। তা যাক—একা এই বাড়ীতে থাকাও তো বড় কম কথা নয়,—ওতে আমি এতটুকু রাগ বা দুঃখ করি নি, করবও না। অনেক কাল সেখানে যায় নি, কত দিন আমি নিজে পাঠাতে চেয়েছিলুম, কিছুতেই নড়ে নি, কেবল বলেছে আমার কষ্ট হবে। যাক— দেহটাও ভালো হবে। কিন্তু আমার খাওয়ার যোগাড় করতে ওদের বাড়ী আর বলতে যাওয়া কেন? ঘরে চাল ডাল আছে তো, ওই দু'টো খিচুড়ী করে নেব এখন।"

সনাতন একটা পথ পাইয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়া গেল, বলিল, "তাই কি হয় দাঠাকুর, এই সবে গাড়ী হতে নামলে—এখনই চান করে এসে নিজের খাবার নিজেই তৈরী করে নেবে—এ কখনও হতে পারে? মুখুয্যেদের বড় মাকে আমি আগেই বলে রেখেছি—তুমি এলে তোমার খাবার তাঁকে দিতে হবে। তিনি বলে দিয়েছেন বলেই না যাচ্ছি। তুমি একটু বস,—আমি এখনই ফিরে আসছি।"

সে চলিয়া গেল ও মিনিট পাঁচ সাতের মধ্যেই ফিরিয়া আসিল।

খানিক বিশ্রাম করিয়া বিশ্বপতি একবার বাড়ীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইল, ঘরের ভিতরটা দেখিয়া ট্রাঙ্কটাকে তক্তাপোষের উপর রাখিয়া খানিকটা তৈল মাথায় দিয়া ঘষিতে ঘষিতে সে স্নান করিতে চলিয়া গেল।

সে যখন ফিরিয়া আসিল, তখন আড়াইটা বাজিয়া গিয়াছে।

সনাতন মৃদু তিরস্কার করিয়া বলিল, "একে তো ওই শরীর, এখনও ভালো করে সেরে উঠতে পারনি দা ঠাকুর, তাতে এতক্ষণ ধরে যে জল বসিয়ে এলে, এটা কি উচিত হল? বড় মা কখন ভাত দিয়ে গেছেন, তোমার জন্যে বসে থেকে এইমাত্র উঠে গেলেন। নাও, এখন তাড়াতাড়ি করে কাপড় ছেড়ে খেতে বস দেখি।"

বিশ্বপতি কাপড় ছাড়িয়া আহারে বসিল; পরম পরিতৃপ্তির সহিত ভাত খাইয়া আচমন সমাপ্তে সে ঘরে আসিয়া সনাতনের প্রস্তুত বিছানায় শুইয়া

"আচ্ছা সনাতন, তোমার মা-লক্ষ্মী কবে মাসীমার বাড়ী গেল? ওখান হতে কেউ নিতে এসেছিল—না সে নিজেই চলে গেল?"

উত্তরের আশায় সে সনাতনের মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

কেমন করিয়া সে সংবাদ দেওয়া যায়,— সনাতন একেবারে ঘামিয়া উঠিল।

বিশ্বপতি একটা হাই তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পুরী হ'তে ফিরে এখানে এসে সে কি বললে? আমার কথা কিছু বলেছিল?"

এ সত্য আর গোপন করিয়া রাখা চলে না, এখন প্রকাশ না করিলেও ঘণ্টাখানেক পরেই প্রকাশ হইয়া পড়িবে, তাহাতে এতটুকু সন্দেহ নাই।

কম্পিত কণ্ঠে সনাতন বলিল, "মা-লক্ষ্মী তো পুরী হতে ফেরেনি দা-ঠাকুর!"

"ফেরেনি—সে কি সনাতন—অ্যাঁ"—বিশ্বপতি ধড়্‌ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

সনাতন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মুখ ফিরাইল।

বিশ্বপতি ডাকিল—"সনাতন—"

সনাতন মুখ তুলিল, আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "মা-লক্ষ্মী সেই গিয়েছেন, আর তাঁর ঘরে তিনি ফেরেন নি। সেই পর্য্যন্ত যক্ষের মত এ বাড়ী আগলে বসে আছি দা-ঠাকুর, এত অসুখ হয়েছে তবু এক পাও নড়তে পারি নি।"

বিশ্বপতি দুই হাতে আর্ত্ত বক্ষ চাপিয়া ধরিল, রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল, "মরে গেছে, কোথায় তার সব শেষ হল?"

সনাতনের মুখে শীর্ণ হাসির রেখা নিমেষের তরে জাগিয়া উঠিল,—"মরলে ত ভালো হতো—সকল বিষয়ের শান্তি হতো। সে মরেনি দা-ঠাকুর, সে তোমার মুখে, তোমার নির্ম্মল বংশে কালি দিয়ে কোথায় চলে গেছে।"

"আর নিমাই—"

সনাতন উত্তর দিল, "সেও আর আসে নি।"

পৃথিবী কি ঘুরিতেছে, পায়ের তলা হইতে সরিয়া যাইতেছে? সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হইয়া গেল কেন? এখানকার আলো, শব্দ, লোকজন সব কোথায় গেল?

বিশ্বপতি হাতখানা আড়াআড়ি ভাবে চোখের উপর চাপা দিয়া শুইয়া পড়িল।

সনাতন যেমন দাঁড়াইয়া ছিল, তেমনই আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত করুণ নেত্রে বিশ্বপতির পানে তাকাইয়া রহিল।

১৭

বিশ্বপতি এ ধাক্কা সামলাইয়া উঠিল।

সনাতন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল—বিশ্বপতির হাসি, আনন্দ যেন বাড়িয়া উঠিল। ছেলেটা কি পাগল হইয়া গেল না কি?

সে বিস্ময়ে বিশ্বপতির পানে তাকাইয়া থাকে। বিশ্বপতি তাহার মুখ দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "কি ভাবছ বলব সনাতন? ভাবছ—এ রকম একটা ধাক্কা পেয়েও আমি সইলুম কি করে? মানুষে যা সইতে পারে না—"

সনাতন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমি আগেই তাই খবর দেই নি দা-ঠাকুর।"

বিশ্বপতি বলিল, "ভেবেছিলে আমি অস্থির হয়ে উঠব, কিন্তু তা কেন হবে সনাতন? সত্যি বল—ভেবে দেখ—সে বড় কম কষ্টে যায় নি, তার সে কষ্টের কথা আমি জানি,—আর কেউ জানে না। বলছো—গ্রামের লোকে যা-না-তাই বলছে,—ওরা বলুক, ওদের বলার দিন এসেছে, বলতে দাও। ওরা কি জানে সনাতন, কেবল বাইরেটা দেখে বিচার করছে বই তো নয়—ওদের কথা ছেড়ে দাও—"

বলিতে বলিতে সে হো হো করিয়া হাসিয়া

সনাতন রাগ করিয়া বলিল, "তুমি ও-রকম করে হেসো না দা-ঠাকুর। আমি আগে এ কথা বিশ্বাস করতে চাই নি, কিন্তু এখন বিশ্বাস করছি—এখন ঠিক জানছি এ রকম ব্যাপারও ঘটতে পারে। বলছ কষ্ট পেয়ে গেছে, কিন্তু কি কষ্ট ছিল তার বল দেখি? খাওয়া-পরার কষ্ট সে তো একটা দিনও পায় নি—"

বিশ্বপতি তাহাকে থামাইয়া দিল,—"থাম সনাতন, ওই খাওয়া-পরাটাকেই খুব বড় করে দেখো না, জগতে খাওয়া-পরাটাই শ্রেষ্ঠ সুখ নয়, তা জানো? খেতে বিড়াল কুকুরেও পায়, তারাও বেঁচে থাকে; সেও তেমনি খেতে পরতে পেয়েছিল, কিন্তু এতটুকু আদর, এতটুকু যত্ন সে আমার কাছ হতে কোন দিন পায় নি। সকল মানুষের মনেই সাধ-আহ্লাদ বলে একটা জিনিস থাকে। অনেক জিনিসই মানুষ পাওয়ার কামনা করে, এও তুমি জানো তো? তুমি কি বলতে চাও তোমার মা-লক্ষ্মীর মনে সাধ-আহ্লাদ কিছু ছিল না, তার অন্তরের অন্তরালে কোন দিন এতটুকু কামনা-বাসনা জাগে নি? সব ছিল সনাতন, ওর ওই বুকের আড়ালে অনেক কিছুই পাওয়ার আশা জেগে ছিল, কিন্তু আমি তার একটা সাধও পূর্ণ করতে পারি নি—তার অন্তরের বিরাট দৈন্যের পানে চাই নি, ঠিক তোমারই মত তার কেবল খাওয়া-পরার আবশ্যকতাটাই বুঝেছিলুম, তাই খেতে-পরতে দিয়েই নিজের কর্ত্তব্য শেষ হয়ে গেল বলে ভেবেছিলুম। তার কোথায় বেদনা তা বুঝি নি—তার বেদনা দূর করবার চেষ্টা করি নি;—নিজের দিকে চেয়ে নিজের পাওনাগণ্ডাই বুঝে নিয়েছিলুম। তুমি বলছ কষ্ট সে পায় নি, কিন্তু আমি জানি সে তার সর্ব্বস্ব দিয়েও তার প্রতিদানে এতটুকু কিছু না পেয়েই চলে গেছে।"

উভয়েই অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। নীরব ঘরে বিশ্বপতি ভাবিতেছিল—যে চলিয়া গেছে,

তাহার কথা, আর সনাতন ভাবিতেছিল বিশ্বপতির কথা।

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সনাতন বলিল, "কিন্তু লোকের কথা আমি যে সইতে পারিনে দা-ঠাকুর।"

বিশ্বপতি শান্ত কণ্ঠে বলিল "মারামারি করবে? কিন্তু কি নিয়ে মারামারি করবে, কি কথা বলে গ্রামের লোকেদের থামাতে চাও বল দেখি? তোমার মা-লক্ষ্মী যেমন সত্যিই ঘর ছেড়ে গেছে, তেমনি সত্যিই এরা অনেক কথা বলছে। এ দুই-ই সত্যি ব্যাপার, এর মধ্যে মিথ্যের নাম-গন্ধ নেই বলেই এর প্রতিবাদ করা চলে না সনাতন। দেশের লোক বলবে আমায়ই তো—? তা বলুক, আমি সত্যি বলেই চুপ করে থাকব।"

সনাতন বলিল, "কেউ কেউ বলছে বউবাজারে নিমাইয়ের বাড়ীতে গেলেই ওদের দেখতে পাওয়া যাবে, ওরা ওখানে ছাড়া আর কোথাও নেই।"

বিশ্বপতি মাথা নাড়িল, শান্ত কণ্ঠেই বলিল, "না, কি দরকার তার, কেন আমি সেখানে তার খোঁজ করতে যাব? সে যা চেয়েছিল আমি তার কিছুই দিতে পারি নি; সে যদি এখন তা পেয়ে থাকে, আমার কি উচিত তাকে বঞ্চিত করা? কেবলমাত্র দুইটী মন্ত্র পাঠ, একটা অনুষ্ঠানের শক্তি কি এতই বেশী হবে সনাতন, যাতে একটী বিমুখ চিত্তকে ফিরান যেতে পারে? যেখানে সত্যিকার কোন আকর্ষণ নেই, সেখানে সে মন্ত্রপাঠ মিথ্যে হয়ে যায়, নারায়ণ-শিলা পাথরই হয়ে থাকে, দশজন সাক্ষীর মুখর মুখও নিস্তব্ধ হয়ে যায়। আজ আমারও সব মিথ্যে হয়ে গেছে সনাতন, অন্তরের বন্ধন—অন্তরের আকর্ষণই আজ সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

মূর্খ সনাতন এ-সব কথার অর্থ বুঝিল না, কেবলমাত্র বুঝিল বিশ্বপতি স্ত্রীর উপর সকল দাবী ছাড়িয়া দিয়াছে, কুলত্যাগিনী স্ত্রীর সহিত সে আর কোনও সম্পর্ক রাখিবে না।

যে কথাটা দিনকতক সমস্ত গ্রামখানাকে বেশ সরগরম রাখিয়া আবার নূতন প্রসঙ্গের মধ্যে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল, বিশ্বপতি ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গে সে কথা আবার নূতন করিয়াই জাগিয়া উঠিল। পথে, ঘাটে, বাজারে, হাটে, সর্ব্বত্র আবার সেই চাপা কথাটা ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। বিশ্বপতির কাণে সকল কথাই আসিতে লাগিল, সেও মনের খুসিতে অপর্য্যাপ্ত হাসিতে সুরু করিয়া দিল।

সেদিন মুখুয্যে মহাশয় তাহার দেখা পাইয়া বলিলেন, "তাই তো বাবাজি, বউ মা যে এমন করে তোমাদের নির্ম্মল কুলে কালি দিয়ে যাবে, তা আমরা কেউই স্বপ্নেও ভাবি নি। এ দিকে তো বউটি লক্ষ্মী ছিল, মুখে একটী কথা ছিল না, কেউ কখনও ওর মুখ দেখতে পায় নি; লোকে পাঁচমুখে বউয়ের সুখ্যাতি করত, সকলেই বলত—এমন বউ আর হবে না। ওর মধ্যে যে এত শয়তানী ছিল, তা আর কে জানবে বল? যাই হোক, ও-সব কথা ভেবে আর মন খারাপ করো না বাবাজি, আবার বিয়ে-থাওয়া কর, সংসার পাতাও। কিসের বয়স তোমার, তোমার বয়সে আমার দুই পক্ষ গতায়ু হয়েছিল, আমি আবার কানাইয়ের মাকে বিয়ে করবার যোগাড় করেছিলুম। কিছু ভেব না, মন খারাপ কর না; পুরুষ তুমি, সোজা চল। বাংলাদেশে মেয়ের অভাব নেই; এক স্ত্রী আছে জেনেও লোকে সেই ছেলের হাতেই নিজের মেয়ে দান করে,—আগের পক্ষের পাঁচ সাত ছেলে মেয়ে থাকতে লোকে আবার বিয়ে করে স্ত্রী আনে,—বোঝ, এ দেশের মেয়ের বাজার কি রকম, কত সস্তায় বাংলার মেয়ে বিকায়? তোমার ভাবনা কিসের বাবাজি, আজ কথা দাও, কাল দেখতে পাবে একশ মেয়ে বরণডালা সাজিয়ে তোমার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।"

নিজের রসিকতায় নিজেই প্রীত হইয়া তিনি সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন।

বিশ্বপতি মৃদু হাসিয়া বলিল, "দেখি, দু'দিন যাক, দু'দিন পরে বিয়ে একটা করলেই হবে।"

পাড়ার কয়েকটা তরুণ একেবারে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল; তাহারা আসিয়া বিশ্বপতিকে ধরিয়া বসিল, "সে হচ্ছে না দাদা, বউদি হয় তো মুহূর্ত্তের ভুলে একটা অন্যায় কাজই করে ফেলেছেন; তাই বলে তাঁকে এত বড় শাস্তি দেওয়া যায় না। বউদি নিমাইয়ের মত লোকের প্রলোভনে পড়ে গেছেন; আপনিও যথার্থ স্বামীর আদর্শ দেখান। আপনাকে গিয়ে তাঁকে আনতে হবে না, আমাদের হুকুম করুন, আমরা তাঁকে নিয়ে আসি।"

বিশ্বপতি গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িল—"না, দরকার নেই।"

সুরেশ নামে ছেলেটী বলিল, "আপনি এ দৃষ্টান্ত দেখাতে পারবেন না?"

বিশ্বপতি বলিল, "না, ভুল বুঝো না, সে

জন্যে আমি তাকে যে আনতে চাই নে—তা নয়। সে যেখানে সুখে আছে তাই থাক, এখানে এই কষ্টের মধ্যে আমি তাকে আনতে চাই নে।"

ছেলেরা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তাহারা বুঝিল বিশ্বপতি যদিও কল্যাণীকে ভালোবাসিত, তবু সেই ভালোবাসার জন্যও তাহাকে ক্ষমা করিবে না।

ইহারই কয়েক দিন পরে বিশ্বপতি সেদিন সনাতনকে ডাকিয়া বলিল, "এখানে আমায় ওরা আর থাকতে দিলে না সনাতন, আমি কলকাতায় ফিরে যাই।"

উত্তেজিত হইয়া সনাতন বলিল, "লোকের কথার ভয়ে তুমি কলকাতায় পালাবে দা-ঠাকুর? কেন, তুমি কি দোষ করেছ যার জন্যে তোমায় এ দেশ ছেড়ে যেতে হবে?"

মলিন হাসিয়া বিশ্বপতি বলিল, "দোষ কারও নয়, দোষ আমার অদৃষ্টের। ওদের কথার ভয়েই যে আমি চলে যেতে যাচ্ছি তা নয়, আমার মন আর এ দেশে থাকতে চাচ্ছে না। মাসখানেকের জন্যে একবার কলকাতায় ঘুরে এলে হয় তো আবার ভালো হয়ে উঠবে।"

অপ্রসন্ন মুখে সনাতন বলিল, "সেই নন্দার বাড়ীতেই তো যাবে দা-ঠাকুর? ওকে নিয়ে দেশে বড় কম কথাটা তো হয় না; লোকে যা বলছে তা শুনলে কাণে হাত চাপা দিতে হয়। আবার ওই বাড়ীতেই থাকবে তো?"

বিশ্বপতি বলিল, "লোকে যা বলে সবই কি ঠিক হয় সনাতন? লোকের মুখ আছে, ওরা অনেক কথাই বলবে, তার মধ্যে একটা হয় তো সত্যি, দশটা মিথ্যে। আমি নন্দার বাড়ীতে ছিলাম, নন্দা প্রাণপণ যত্নে সেবা করে আমায় বাঁচিয়েছে, যারা এমন সুন্দর একটা কথা গড়বার উপাদান পেয়েছে, তারা তা ছাড়বে কেন? এতটুকু উপাদান না পেয়েও যখন মস্ত বড় প্রাসাদ শূন্যে তৈরী হতে পারে, এতে তো এতটুকু উপাদান আছে। কিন্তু ও সব কথা ছেড়ে দাও সনাতন, ও-সব ব্যাপার নিয়ে যত ভাববে ততই আরও জটিল হয়ে উঠবে।"

মূর্খ সনাতন বলিল, "কিন্তু নন্দা—"

বাধা দিয়া অসহিষ্ণুভাবে বিশ্বপতি বলিয়া উঠিল, "আবার নন্দা? নন্দা যে কি তা আমি আজও বুঝতে পারি নি সনাতন, ওকে আমি আজও চিনতে পারি নি। ওর নাগাল পেতে হলে অনেকটা উঠতে হয়, ততখানি উঠবার মত শক্তি আমার নেই,—তাই আমায় নীচেই পড়েই থাকতে হয়েছে। সে আমায় নিজের কাছে রেখে আমার উপকারই করেছিল; যা কেউ পারে নি সে তা পেরেছিল। এ জন্যে আমায় বলতে পার, আমি লুব্ধ পতঙ্গের মত তার দিকে ছুটেছিলুম, কোন দিকে চাই নি। অথচ স্পষ্ট যে তাকেই আশা করেছিলুম তা নয়। আমি কোন দিন বুঝতে চেষ্টা করি নি, আমারই মনের অন্তরালে তাকে পাওয়ার আশা প্রচ্ছন্ন ছিল। তবু—তবু যদি জানতে সনাতন, কতখানি এগিয়ে গেছে, তা হলে আমায় ওর কাছে থাকার জন্যে একটী কথা বলতে পারতে না।"

সে দুই হাতের মধ্যে মাথাটাকে চাপিয়া ধরিল।

সনাতন আর একটী কথা বলিল না, কিন্তু তাহার সহজ বুদ্ধিতে সে এত উঁচু ধরণের কথা যে লইতে পারিল না, তাহা তাহার অপ্রচ্ছন্ন মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারা গেল।

বিশ্বপতি নিজের সামান্য কাপড় জামা কয়খানা গুছাইয়া নন্দার দেওয়া ট্রাঙ্কটাতেই ভরিয়া লইল। কল্যাণীর জন্য জিনিসগুলা বাক্সের তলায় চাপা দিয়া রাখিল, সেগুলা কি করিবে সে সম্বন্ধে চিন্তা করিবার সময় সে এখনও পায় নাই।

একদিন ক্লান্ত মন লইয়া শ্রান্ত চরণে গ্রাম্যপথ অতিবাহিত করিয়া বিশ্বপতি কলিকাতায় যাত্রা করিল।

আজ গ্রামের বুকে সে সৌন্দর্য্য ছিলনা, গ্রাম আজ নেহাতই শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে—সেই জন্যই তাহার কোন আকর্ষণও নাই। বিশ্বপতির নয়নে যে মোহের অঞ্জন ছিল, চোখের জলে তাহা আজ ধুইয়া গেছে।

চলিতে চলিতে হঠাৎ একবার সে থমকিয়া। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া সে একবার চারিদিকে চাহিল।

উজ্জ্বল সুনীল আকাশ; বাতাসে ভাসিয়া সূর্য্যালোকে উজ্জ্বল দুই একটুকরা সাদা মেঘ আসিয়া আবার চলিয়া যাইতেছে। আকাশে বাতাসে আজ আগমনীর সুর বাজিয়া উঠিতেছে, গাছের ডালে বসিয়া পাখীরা আগমনী গাহিতেছে। পথের ধারে স্থলপদ্ম ফুলের গাছটা অসংখ্য লাল ফুলে নিজের সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া দিতেছে। পথিক পথ চলিতে তাহার পানে তাকাইয়া মুগ্ধ

হইয়া যায়। গ্রাম ছাড়াইয়া মাঠের পথ। পথের দুধারে ধানের গাছগুলি বাতাসে দোলা খাইতেছে। অদূরে কাশফুলগুলির সাদা মাথা নোয়াইয়া দিয়া বাতাস দিগন্তে ছুটিয়া চলিয়াছে।

দৃষ্টি-পথ ঝাপ্সা হইয়া আসিল, সকল দৃশ্যের সামনে পাতলা কুয়াশার একখানি পর্দ্দা যেন নামিয়া আসিল।

বিশ্বপতি আর চোখ তুলিল না, পথের পানে দৃষ্টি রাখিয়া সে দ্রুত অগ্রসর হইল।

১৮

সন্ধ্যার একটু পরে বিশ্বপতি শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌছিল। ট্রাঙ্কটাকে হাতে লইয়া সে পথে নামিল। নন্দার বাড়ী সে চিনিত, সোজা হ্যারিসন রোড ধরিয়া সে অগ্রসর হইল। একবার একখানা রিক্সা ভাড়া লইবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু পকেটে হাত দিয়া সে ইচ্ছা দুর করিতে হইল, মাত্র কয়েকটী পয়সা ছাড়া পকেটে আর কিছু নাই।

হন হন করিয়া সে পথ চলিতেছিল; বড় রাস্তা ছাড়িয়া একটা গলিপথে খানিকদূর গিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল।

রূপোপজীবিনীর দল সে পথে দাঁড়াইয়া আছে, অনেক ঘরে ইহারই মধ্যে গান-বাজনা সুরু হইয়া গেছে।

পাশ দিয়া চলিতে একটী মেয়ে ডাকিল,—"আসুন"।

দারুণ ঘৃণায় বিশ্বপতির মুখখানা বিকৃত হইয়া । সে উত্তেজিতভাবে কি যেন বলিতে গিয়া হঠাৎ চুপ করিয়া গেল।

মনে পড়িয়া গেল—আজ যে পথে পদার্পণ করিতে—যাহাদের পানে চাহিতে তাহার সর্ব্বশরীর ঘৃণায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে, কল্যাণীও তো এই পথে আসিয়া—উহাদেরই একজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অথবা একদিন দাঁড়াইবে। আজ হয় তো সে স্বপ্নেও জানে না তাহার স্থান এই পথের ধারে কোন একটা খোলার ঘরে। তাহাকেও হয় তো একদিন ইহাদেরই মত কদর্য্য সাজে নিজেকে সজ্জিত করিয়া শীর্ণ পাণ্ডুর মুখে কদর্য্য হাসির রেখা ফুটাইয়া এই পথের ধারে প্রতিদিন দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে।

কেই বা তাহা ভাবে? এই যে সব হতভাগিনীরা এখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহাদের মধ্যে কতজন যখন বাহিরের প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া পথে পা দিয়াছিল তখন কল্পনাতেও আনে নাই একদিন তাহাদের সবই যাইবে—থাকিবে কেবল কাঠামোখানা। আজ তাহাদের সুখস্বপ্ন টুটিয়া গেছে, তাহাদের চোখের সামনে যে ভবিষ্যৎ, তাহা নিবিড়তম অন্ধকারে ঢাকা। উঠিতে ইচ্ছা হয় না, তবু তাহাদের উঠিতে হয়। এক হাতে চোখের জল মুছিয়া তবু তাহাদের মুখে হাসি ফুটাইতে হয়। নারীজীবনে এ কি নরক বিড়ম্বনা। একদিন ইহারাই ছিল গৃহের দেবী; স্বর্গের সুষমা, স্ত্রী, কন্যা, ভগিনী; ক্ষণিকের মোহে পুড়িয়া আজ তাহারা নামিয়াছে কোথায়? আজ তাহাদের অতীত জ্বালাপ্রদ, বর্ত্তমান ভীষণ ভীতিপূর্ণ, ভবিষ্যৎ নিকষ কালো অন্ধকারে ঢাকা। ইহাদের উদ্ধার করিবে কে,—সে পথই বা কই?

বিশ্বপতি ঘৃণা করিবে কাহাকে? কাহাকে সে দুই পায়ে দলিয়া পিছনে ফেলিয়া যাইতে চায়? কল্যাণীও যে উহাদের অন্তর্ভূত হইয়াছে,—একদিন পথ চলিতে বিশ্বপতি তাহার গৃহের সুষমাকেও এই পথের ধারে বিকৃত অবস্থায় লুটাইতে দেখিবে।

বিশ্বপতিকে চুপচাপ দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সেই মেয়েটী সাহস করিয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

পথের আলো উজ্জ্বলভাবে তাহার মুখের উপর পড়িয়াছিল। বিশ্বপতি তাহার মুখের পানে তাকাইয়া দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না।

হায় অভাগিনী নারী, তবু ওই মুখে হাসি ফুটাও, তবু ওই মুখে কথা বল? চোখের কোণ জলে ভরিয়া উঠিতেছে,—কি কষ্টেই না সে জল সামলাইয়া লইতেছ নারী,—যেন উছলাইয়া পড়িয়া তোমার গণ্ডের কৃত্রিম বর্ণ না ধুইয়া যায়। কল্যাণী,—হায় কল্যাণী কোথায় ছিলে, কোথায় আসিয়াছ? শেষে উদরান্নের জন্য এমনই করিয়া তোমাকেও লোকের কাছে হাত পাতিতে হইবে? হায় দুর্ভাগিনী—

খুব শান্ত সুরেই সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি চাও?"

মেয়েটী নত মুখে বলিল, "আপনি যদি—"

সে যে কথাটা বলিতে চায়, তাহা বলিবার আগেই বুঝিয়া লইয়া বিশ্বপতি করুণা-মিশ্রিত কণ্ঠে বলিল, "আসল কথা বল যে তোমার কিছু চাই—কেমন? কিন্তু আমার কাছে মাত্র পাঁচ আনা

পয়সা ছাড়া আর কিছুই নেই। তাই নাও, এতেই আজ দিনটা কাটিয়ে দিয়ো।"

পকেট হাতড়াইয়া শেষ সম্বল পাঁচ আনা বাহির করিয়া মেয়েটীর কম্পিত হাতের উপর রাখিয়া সে দ্রুত অগ্রসর হইয়া গেল। একবার ফিরিয়াও দেখিল না, যাহাকে সে পয়সাগুলি দিয়া গেল, সে তখনও সজল চোখে এই যথার্থ মানুষটার পানে তাকাইয়া রহিয়াছে। তাহার জীবনে এরূপ ধরণের মানুষ বুঝি এই প্রথম পড়িল,—সে যথা-সর্বস্ব,—যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, দিয়া নিঃস্বের মত চলিয়া যায়, বিনিময়ে কিছুই চায় না।

বিশ্বপতি ভাবিতেছিল পকেটে আর কিছু থাকিলে ভালো হইত। মাত্র পাঁচ আনা পয়সা; উহাতে কতক্ষণের জন্য ওই মেয়েটীর ক্ষুধা নিবৃত্ত থাকিবে? বড় জোর আজকার রাতটা,—কাল সকালেই অভাব-রাক্ষসী আবার তো লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইবে। যদি বেশী কিছু থাকিত, অন্ততঃ পক্ষে দুইটা দিনও হয় তো সে স্বভাবসিদ্ধ শান্তিপূর্ণ জীবন উপভোগ করিবার সুযোগ পাইত,—দুইটা দিন সে কলঙ্ক হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিত,—নিজের ভাবনা নিজেই করিতে পাইত।

ঝোঁকের বশে পকেটে যাহা ছিল তাহাই লইয়া সে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, ভাবিয়া চলিয়া আসিলে আরও কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারিত।

সম্মুখে একটী নারী।

বিশ্বপতি চলার পথে বাধা পাইয়া দাঁড়াইল।

প্রথম দৃষ্টিপাতেই সে অস্বাভাবিক রকম চমকাইয়া বিবর্ণ হইয়া গেল।

এ কে,—এ মুখ তাহার পরিচিত নয় কি? হাঁ —ওই মুখ চোখ, ওই সুন্দর সুঠাম ভঙ্গী, সুদীর্ঘ দেহ—এ সবই তো তাহার বড় পরিচিত।

"চন্দ্রা—"

কেমন করিয়া এই নামটা তাহার মুখ ফুটিয়া অতর্কিতে বাহির হইয়া পড়িল, তাহা নিজেই সে জানে না। নিজের কণ্ঠস্বরে সে নিজেই চমকাইয়া অবাধ্য জিহ্বাটা চাপিয়া ধরিল।

চন্দ্রা কোথায় যাইবে বলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার সামনে পথের উপর একখানা মোটর দাঁড়াইয়া বিশ্রী রকম শব্দ করিতেছিল।

নিজের নামটা শুনিবামাত্র চন্দ্রা চমকাইয়া মুখ ফিরাইল; বিশ্বপতির পানে দৃষ্টি পড়িতেই সে একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল।

পর মুহূর্তে সে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া একটু হাসিল, বলিল, "দাদাবাবু যে—এ পথে হঠাৎ? হাতে একটা বাক্স দেখছি, বাড়ী হতে আসছ, না বাড়ী চলেছ?"

বিশ্বপতি ভাবিতেছিল ইহার কথার উত্তর দিবে কি না। অবশেষে উত্তর দিতে হইল।

বলিল, "না—বাড়ী যাচ্ছি নে, বাড়ী হতে আসছি। তারপর—এখানেই আছ বুঝি? বেশ—বেশ, অনেক দিন পরে তোমায় দেখে ভারি খুসি হয়েছি। কোন্ ঘরে আস্তানা তুলেছ—এই খোলার চালাখানা বোধ হয়? এ-রকম ঘর ছাড়া তোমাদের কপালে আর ঘর জুটবে কোথা হতে—আমিও তো তাই ভাবি।"

চন্দ্রা হাসিতে লাগিল, বলিল, "রোস, গাড়ীখানাকে আগে বিদায় করে দেওয়া যাক, একটু দেরী কর।"

সে অগ্রসর হইয়া গেল, বিশ্বপতি সেখানে দাঁড়াইয়া চারিদিককার বীভৎস দৃশ্যগুলা দেখিয়া লইল।

চন্দ্রা ট্যাক্সি বিদায় করিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিল, বলিল, "এসো—"

বিশ্বপতি অগ্রসর হইল না, বলিল, "না, গিয়ে আর কাজ নেই, এখান হতেই বিদায় নেওয়া যাক।"

"বাঃ, বেশ লোক তুমি; তোমার জন্যে আমি গাড়ী বিদায় করে দিলাম, অত ক্ষতি সইলুম; আর তুমি কি না চলে যেতে চাচ্ছো। সে হবে না দাদাবাবু, আজ আমার ঘরে তোমার নিমন্ত্রণ, যেতেই হবে।"

সে বিশ্বপতির হাতখানা চাপিয়া ধরিতেই বিশ্বপতি জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, "ছাড়, ছাড়, রাস্তায় আর কেলেঙ্কারী করতে হবে না, চল, যাচ্ছি।"

চন্দ্রা একটু হাসিয়া অগ্রসর হইল।

পিছনে পিছনে চলিতে চলিতে বিশ্বপতি ভাবিতেছিল—যদি কোন দিন এমনই অতর্কিতে তাহার পলায়িতা স্ত্রীর সহিত দেখা হইয়া যায়!

উঃ সে কথা মনে করিতেও বুকের মধ্যে কি রকম করিয়া উঠে।—

বিশ্বপতি একবার উপরপানে চাহিয়া মাথা একটু নত করিল—সে দিন যেন না আসে, সে দিন বিশ্বপতি সহ্য করিতে পারিবে না। যত

দুঃখ কষ্ট বেদনা আসে আসুক, সে দিন যেন না আসে।

১৯

দ্বিতল অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিতে করিতে বিশ্বপতি বলিল, "কারও অদৃষ্ট পাতা-চাপা, কারও পাথর-চাপা। তোমার অদৃষ্ট পাতা-চাপা ছিল কি না, তাই পাতাটা বাতাসে উড়তেই ভেতরের সুখসমৃদ্ধি প্রকাশ পেয়েছে। যাক, সত্যি ভারি খুসি হয়েছি চন্দ্রা, অদৃষ্টটা ফিরিয়েছ দেখছি। আমি তো ভেবেছিলুম কোনও একটা খোলার ঘরে জায়গা করে নিয়েছ।"

চন্দ্রা সিঁড়ির পথ দেখাইয়া উপরে উঠিতে উঠিতে বলিল, "ভদ্দর লোকের ঘরে জন্মাই নি, ছোটলোকের মেয়ে—তোমাদের আশীর্ব্বাদের জোরেই পাতা উড়ে যাবে দাদাবাবু। ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন—তাঁর আশীর্ব্বাদের জোরেই আজ অবস্থা আমার ফিরেছে।"

তীব্রকণ্ঠেই বিশ্বপতি বলিয়া উঠিল, "ভগবানের আশীর্ব্বাদ বলো না চন্দ্রা, এ নারী-জীবনের চরম অভিশাপ ছাড়া আর কিছুই নয়।"

বলিতে বলিতে সে যে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল, তাহা চন্দ্রার চক্ষু এড়াইল না।

দ্বিতলে একটী সুসজ্জিত ঘরে ইজিচেয়ারে বিশ্বপতিকে বসাইয়া চন্দ্রা বলিল, "আগে একটু জল খেয়ে নাও দাদাবাবু, তার পর কথাবার্ত্তা হবে এখন। ভয় নেই, আমি হাতে করে দেব না, আমার রাঁধুনী বামনি আছে, তাকে দিয়ে যেতে বলি

বিশ্বপতি নিষেধ করিবার আগেই সে চলিয়া গেল। খানিক পরে একটী মেয়ের হাতে জলখাবার দিয়া সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল।

মেয়েটী জলখাবার বিশ্বপতির সামনে তেপায়া টেবলটার উপরে রাখিয়া বাহির হইয়া গেল। অদূরে মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া চন্দ্রা বলিল, "নাও জলটুকু খাও আগে, তার পর কথাবার্ত্তা হবে এখন। বুঝতে পারছি, আজ সারাদিন কিছুই খাওয়া হয় নি।—মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। জলতেষ্টা তো আছেই; তা ছাড়া ক্ষিধেও তো বড় কম হয় নি।"

বিশ্বপতি সত্যই তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পড়িয়াছিল। শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "না, সত্যি ক্ষিধে হয় নি তবে তেষ্টা যে পেয়েছে, এ কথা স্বীকার না করলে মহাপাপ হবে।"

চন্দ্রা বলিল, "আচ্ছা—আগে জল খাও, তার পর কথাবার্ত্তা হবে এখন।"

বিশ্বপতি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া রেকাবীখানি অবিলম্বে খালি করিয়া ফেলিল। তাহার পর একনিঃশ্বাসে একগ্লাস জল খাইয়া সে মুখ মুছিবার জন্য কোঁচার কাপড়টা তুলিয়া লইতেই চন্দ্রা ব্যস্ত হইয়া তোয়ালেখানা আগাইয়া দিয়া বলিল, "এইটাতে হাত মুখ মোছ।"

বিশ্বপতি একটু হাসিয়া হাত হইতে তোয়ালে-খানা লইল।

চন্দ্রা জিজ্ঞাসা করিল, "তার পর, যাওয়া হচ্ছে কোথায়? বাড়ী ছেড়ে চলে এলে কেন?"

বিশ্বপতি বলিল, "যাচ্ছি নন্দার কাছে, সেখানে থাকব বলে এসেছি। হঠাৎ বিশেষ নয়, অনেক ভেবে চিন্তে শেষকালে এই ব্যবস্থাই ঠিক করলুম।"

চন্দ্রা আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া বলিল, "বেশ লোক, নন্দার মোহ তোমার এখনও যায় নি দেখছি! নইলে নিজের সংসার ভাসিয়ে দিয়ে অনায়াসে চলে আসতে পারলে?"

বিশ্বপতি হাসিল, "নিজের সংসারই নেই; কার জন্যে ভাবব চন্দ্রা?"

চন্দ্রা রাগ করিয়া বলিল, "শুনেছি মোহের আঁজন চোখে পরলে লোকে সব কিছুই দেখিতে পায় না,—তাদের মনটাও সে সময় অন্ধ হয়ে যায়,—তোমারও তাই হয়েছে দাদাবাবু। নন্দা তোমায় এমনভাবে মুগ্ধ করেছে, যাতে তুমি তোমার সংসারের কথা, স্ত্রীর কথা, সব ভুলে গেছ। সত্যি বল ত দাদাবাবু, বৌদিকে কোথায় রেখে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নন্দার কাছে বাস করতে এলে?"

বিশ্বপতি মুখ নীচু করিল। তাহার পর আস্তে আস্তে মুখ তুলিয়া ধীরকণ্ঠে বলিল, "তার ব্যবস্থা আমায় করতে হয় নি চন্দ্রা, নিজের ব্যবস্থা সে নিজেই করে নিয়েছে; তার জন্যে আমায় আর কোনো দিনই মাথা ঘামাতে হবে না। সে দয়া করে তার ভাবনা হতে আমায় চিরমুক্তি দিয়ে গেছে।"

চন্দ্রা বিস্ফারিত নেত্রে বিশ্বপতির পানে খানিক তাকাইয়া রহিল, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "সে কি কথা বলছ? বউদি মারা গেছে, কই—সে কথা শুনি নি তো?"

বলিয়াই মনে পড়িয়া গেল সে সংবাদ পাইবে

কেমন করিয়া,—কে যে সংবাদ এখানে আনিয়া দিবে? সে যেখানে বাস করে, এ যে আলাদা জগৎ,—এখানে ও জগতের কোন বার্ত্তাই আসিয়া পৌঁছায় না।

বিকৃত হাসি হাসিয়া বিশ্বপতি বলিল, "না, সে দুর্ভাগ্য তার অদৃষ্টে আসে নি চন্দ্রা,—তা হলে অনেকখানি কামনা বাসনা নিয়ে তাকে যেতে হতো। তুমি যে পথে এসে যেখানে থেমে গেছ, সেও এই পথে গেছে, কোথায় থেমে গেছে, সে সন্ধান এখনও পাই নি। তার জীবনে অনেক আশাই ছিল কি-না, দরিদ্র স্বামী তার কোন বাসনাই পূর্ণ করতে পারে নি, সেই জন্যে সে চলে গেছে।"

কতক্ষণ উভয়েই নীরব।

অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চন্দ্রা বলিল, "তোমার মত দরিদ্র স্বামীর ঘরে স্ত্রীরূপে বাস করবার অধিকার পেলে অনেক রাজকন্যাও ধন্য হয়ে যেত। তার অদৃষ্ট বড় খারাপ, না হলে স্বামীর স্ত্রীরূপে পবিত্র জীবন যাপন করতে সে পারলে না কেন? এই কুৎসিত চির-অভিশপ্ত জীবন যাপন করতে সে চলে গেল কেন?"

বিশ্বপতি চুপ করিয়া কোন দিকে অন্যমনস্ক ভাবে তাকাইয়া রহিল।

চন্দ্রা বলিল, "সে বুঝতে পারেনি দাদাবাবু, আপনি চলার গতিতেই সে গড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু একদিন বুঝবার দিন তার আসবে; সে দিন সে জানতে পারবে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া কতখানি ভয়ানক। নিজেকে সে দিন তাকে ধিক্কার দিতেই হবে, সে দিন তাকে চোখের জল ফেলতেই হবে। এই চিরন্তন সত্যের ব্যতিক্রম তার বেলায়ও ঘেটে যাবে।"

শুষ্ক হাসিয়া বিশ্বপতি বলিল, "না ঘটতেও পারে। তুমিও তো বেশ আরামে রয়েছ চন্দ্রা। এ পথে এসে সুখীই হয়েছ দেখতে পাচ্ছি; খোলার ঘর ছেড়ে দোতালা বাড়ী, লাইট, ফ্যান, দাসদাসী, কোন কিছুরই তো অপ্রতুল নেই দেখছি।"

চন্দ্রার মুখখানা মুহূর্ত্তের জন্য একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল। তখনই জোর করিয়া এক টুকরা হাসি মুখে ফুটাইয়া সে বলিল, "কিন্তু দাদাবাবু, এই ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরটুকুই তুমি দেখছ,—কিসের বিনিময়ে লাভ করেছি, তা তো দেখছ না। মুখের হাসিটুকু দেখে যা ভাবছ, সত্যি তা নয়। ওই হাসির আড়ালে কান্নার সাগর গর্জ্জে ফুলে উঠছে তা দেখছ না,—দেখছ উপরেরটাই—না? আমি যদি বউদির অধিকার পেতুম, পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য পেলেও আমি সে কুঁড়েঘর ছাড়তুম না দাদাবাবু, কিছুতেই না—কেউ আমায় একচুল সরাতে পারত না।"

হঠাৎ সে দুই হাতের মধ্যে মুখখানা লুকাইয়া ফেলিয়া উপুড় হইয়া পড়িল।

বিশ্বপতি দেখিতে লাগিল, সে কি রকমভাবে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

কল্যাণীও একদিন এইরূপেই কাঁদিবে। পিছনে ফেলিয়া আসা সেই কুঁড়েঘরটার স্মৃতি হয় তো তাহার মনে ভাসিয়া উঠিবে। সে আর্ত্তভাবে কাঁদিয়া বলিবে—আমায় এ নরক হইতে উদ্ধার কর মুক্তিদাতা, আমায় তোমার চরণে স্থান দাও।

কল্পনায় ভাসিয়া উঠিল কল্যাণী। বিশ্বপতি বিস্ফারিত চোখে চাহিয়া দেখিল—রূপহীনা কল্যাণী, —তাহার পানে আর কেহ ফিরিয়াও চায় না। তাহার পাপার্জ্জিত অর্থ আর তাহাকে শান্তি দিতে পারে না,—সে সত্রাসে সেদিক হইতে চোখ ফিরাইয়া ব্যগ্র ব্যাকুল হাত দু'খানা বাড়াইয়া দিয়া আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিতেছে—এসো, ওগো এসো, আমায় মুক্ত কর, আমায় এ অন্ধকার হইতে আলোয় লইয়া যাও।

হঠাৎ চমক ভাঙ্গিয়া গেল,—চন্দ্রা কি বলিতেছে। কাল্পনিক কল্যাণী কোথায় পলাইল,—সামনে জাগিয়া উঠিল বাস্তব চন্দ্রা।

চন্দ্রা সোজা হইয়া বসিয়াছে। তাহার চোখে জল নাই; কিন্তু চোখের পাতা তখনও আর্দ্র রহিয়াছে।

"নন্দার কাছে যাবে—তাই যাও। ওখানে থাকলে তুমি বেশ ভালো থাকবে তা জানি। তার আগে এখানে আমার কাছে দু'দিন থেকে যাও না দাদাবাবু, এতে তোমার কোন আপত্তি হবে কি?"

"এখানে, তোমার কাছে?" বিশ্বপতি ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, মনে বোধ হয় দ্বিধা জাগিয়া উঠিয়াছিল।

"কিন্তু এখানে থাকলে তোমার অসুবিধা হবে না চন্দ্রা? অবশ্য—আমার থাকতে কোন আপত্তি নেই। এখন যেখানে সেখানে যেমন তেমন করে জীবনের বাকি দিন কয়টা কাটিয়ে দিতে পারলেই বাঁচি। লজ্জা ভয় সঙ্কোচ কোনদিনই আমার ছিল না, তা তো জানো? তোমার বাড়ী যাওয়া নিয়ে অনেকেই অনেক কথা

বলেছিল। সে সব কথা আমার কাণে যে আসে নি তা নয়, কিন্তু সে আসাই মাত্র। থাকতে আমি পারি, ঠুনকো জাতের ওপর মায়া আমার এতটুকু নেই। সচ্চরিত্র নামে খ্যাতিলাভ করবার জন্মে আমি এতটুকু উৎসুক নই। তবে তোমার পাছে কোন ক্ষতি হয় তাই ভাবছি। কারও ক্ষতি করে আমি নিজে পরম সুখে থাকব এমন স্বার্থপর আমি নই চন্দ্রা।"

চন্দ্রা মুখ ফিরাইয়া গোপনে চোখের জল মুছিল, সঙ্গে সঙ্গে মৃদু হাসিয়া বলিল, "না গো, এতটুকু ক্ষতির ভয় যদি থাকত, আমি তোমায় এখানে রাখতে চাইতুম না। এমন বোকা তো কেউ নেই যে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভাঙ্গবে। আজ তুমি জাতের মায়া করছ না, কিন্তু আমি করি, নিজের নয়—তোমার। আজই না হয় জাতের ছাপ আমার গায়ে নেই, একদিন তো ছিল, যেদিন আমার ছায়া মাড়ালে তোমাদের জাতকে স্নান করতে হতো। তার ছায়াটা তো আজও এ মন হতে মোছে নি। মনে অহোরাত্র জেগে আছে বলেই কায়স্থের ছেলেকে নিজের হাতে জলটুকু পর্য্যন্ত খেতে দিতে পারলুম না। বলবে সংস্কার, আমিও তা মেনে নেব। এই সংস্কারের বাঁধন হতে মুক্ত হতে পারে কজন? এর প্রভাব যে-কোন রকমে মানুষের জীবনে ফুটে উঠবেই। ওই একটা দিকেই যা দুর্ব্বলতা আছে। আর ওরই জন্মে যেটুকু ক্ষতি সহ্য করেছি, তা ছাড়া আর নয়। ভয় নেই, আমার এতটুকু ক্ষতি করবার ক্ষমতা এখনও তোমার নেই। দেখছো তো কত বড় বাড়ীখানা দখল করেছি, এর মধ্যে বহু অর্থও করেছি। এত টাকা রাখব কার জন্যে, এত বড় বাড়ীখানার মালিক হবে এর পরে কে?"

বিশ্বপতি চেয়ারে হেলিয়া পড়িয়া একটা আড়ামোড়া ছাড়িয়া হাই তুলিয়া বলিল, "বুঝেছি, শেষ কাজটা তুমি আমায় দিয়েই করিয়ে নিতে চাও? বহুত আচ্ছা, তা হলে একটু চটপট মরে যাও চন্দ্রা, তোমার মুখে আগুন দিয়ে নেওয়া যাক। কেবলমাত্র মুখে আগুন দেওয়ার ফলে যদি এত বড় বাড়ী আর এতগুলো টাকাকড়ি পাই—সে যে অনেক সৌভাগ্যের কথা। জান ত, অনেক তপস্যা করবার ফলে তোমার মুখে আগুন দেওয়ার অধিকারী হয়েছি। অবস্থা তো বেজায় রকম কাহিল, দিন আনা দিন খাওয়া গোছের; দেশের বাড়ীখানা আছে এইমাত্র,—দেয়াল ভাঙ্গছে, চালের খড় উড়ছে, জমিজমাগুলোও বেহাত হয়ে গেছে। জীবিকার জন্মে চাকরী করা যখন পোষাবে না—যে ভাবেই হোক পরের কাছে থেকেই যখন ভাত জোটাতে হবে, তখন এখানে রাজার হালে থেকে হুকুম চালিয়ে সুখভোগ করা যাক। তবে তাই হল চন্দ্রা, দিনকতক—অর্থাৎ অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্যে এখানেই ডেরা ফেললুম। দিনান্তে তোমার সেবাটুকু নিঃশেষ করে নেওয়া যাক। শেষে কিন্তু একদিন এই আলসে প্রকৃতিটাই তোমার চোখে সূঁচ বিঁধিয়া দেবে। সে দিন বিদায় করবার পথ খুঁজে পেলে হয়।"

সে প্রচুর হাসিতে লাগিল, কিন্তু চন্দ্রার মুখখানা অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে চোখ তুলিল না, মেঝের উপর দুইটী চোখের দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিয়া নিস্তব্ধেই সে বসিয়া রহিল।

২০

দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতেছিল, বিশ্বপতি কোন সংবাদ দিল না। নন্দা প্রতিদিন সাগ্রহে অপেক্ষা করিত,—হয় তো আজ তাহার সংবাদ আসিবে, একখানি পোষ্টকার্ডে অন্ততঃ পক্ষে দু'টি মাত্র লাইনে সে লিখিয়া জানাইবে, ভালো আছে।

দিনের পর দিন চলিয়া গিয়া সপ্তাহ, তাহার পর ক্রমে মাসের পর মাসও চলিয়া গেল, বিশ্বপতি কোনও সংবাদ দিল না।

নন্দা উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল বড় কম নয়। অন্য সময় হইলে হয় তো এত ব্যস্ত হইয়া পড়িত না, কারণ, এ লোকটীর স্বভাবই যে এই রকম তাহা সে বেশ জানিত। সে যখন যেখানে যায়,—সকলকে আপনার করিয়া লইয়া এমন ভাবে জাঁকাইয়া বসে যে, কেহ দেখিয়া বিশ্বাস করিতে পারে না—একদিন হঠাৎ এই লোকটিই এই সব পিছনে ফেলিয়া অচেনা অজানা পথে এমন যাত্রা করিবে, যখন তাহাকে ডাকিয়া আর তাহার সাড়া মিলিবে না। এই সব আপনার জন তখন তাহার একেবারেই পর হইয়া যায়,—ইহাদের কথা ভুলিয়া গিয়া আবার নূতন কোনও স্থানে দিব্য জাঁকাইয়া বসে। এ-সব প্রকৃতির লোকেরাই এমনই। ইহাদের যতই কেন না স্নেহ ভালোবাসা ঢালিয়া দেওয়া যাক, যতই শক্ত শৃঙ্খল দিয়া বাঁধা যাক, দেখা যায় সে সবই

মিথ্যা হইয়া গেছে। ইহারা চিরপথিক, চিরদিন চলার পথে চলিয়াছে, বিশ্রাম ইহাদের অদৃষ্টে বিধাতা লেখেন নাই।

কোন দিন হয় তো ইহারা শান্তিও পায় না। দূরের পানে লক্ষ্য রাখিয়া চলার কালে হাতের কাছে যাহা পড়ে তাহা হেলা করিয়াই যায়, দূর ততই দূরে সরিয়া যায়, মরীচিকা দূরে নাচিতে থাকে।

নন্দা বিশ্বপতির প্রকৃতি জানিয়াও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল, কেবল তাহার অসুস্থ শরীরের কথা ভাবিয়া। অতবড় ব্যারাম হইতে যে মানুষ কেবলমাত্র সুস্থ হইয়াই একা বাড়ী চলিয়া গেল, তাহার একখানা পত্র দেওয়া উচিত ছিল বই কি।

সব বুঝিয়াও নন্দা রাগ করে। কি রকম মানুষ বিশুদা, পিছন ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গে সে ভুলিয়া গেল একদিন কেহ প্রাণপাত করিয়া তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছে,—রোগীর পানে তাকাইয়া তাহার আহার নিদ্রা ছিল না।

মাঝে মাঝে নন্দা অন্যমনস্ক হইয়া পড়িত। কোন মতে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস সে রুদ্ধ করিতে পারিত না।

সে দিন কি একটা কথায় সে স্পষ্টই স্বামীকে বলিয়া বসিল, "তোমরা বড় অকৃতজ্ঞ জাত বাপু। কেউ তোমাদের জন্যে প্রাণপাত যত্ন যখন করে, তখন সে যত্ন বেশ নাও, কিন্তু পেছনে ফিরবার সঙ্গে সঙ্গে সব ভুলে যাও।"

অসমঞ্জ একটু হাসিল, বলিল, "তাই বটে। কিন্তু বিচারটা বড় একচোখো হচ্ছে নন্দা। খালি নিজেদের দিকটাই দেখছ, পুরুষদের পরে বড় অন্যায় দোষ চাপাচ্ছ। যদি উপযুক্ত বিচার করতে তা হলে বলতে দোষ দুই জাতেরই আছে, কেউ একা দোষী নয়।"

নন্দা খুসি হইল না, বলিল, "কেন, মেয়েরা কি দোষ করেছে?"

অসমঞ্জ মাথা দুলাইয়া বলিল, "এক হাতে কখনও তালি দিয়েছ নন্দা,—দেওয়া যায় দেখেছ? অবশ্য তুমি যেমন একমাত্র পুরুষ বেচারাদের ঘাড়েই দোষ চাপাচ্ছ, আমি তা চাপাব না, আমি বলব না সব দোষ মেয়েদের, তারা অকৃতজ্ঞ। এ রকম একতরফা বিচার করতে তোমরা পার, আমরা পারি নে।"

নন্দা মুখ ভার করিয়া বলিল, "একতরফাই বটে। নিজেদের দোষ কে-ই বা কোন্ দিন দেখতে পায়? যদি দেখতে তা হলে অনেকটাই জ্ঞান হতো, মানুষ হতে পারতে।"

অসমঞ্জ এবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "বটে বটে, ভুলে গিয়েছিলুম তোমরা কি, আর আমরা কি? আমরা শাসক আর তোমরা যে শাসিত। নিজেদের দোষ আমরা দেখব কি করে? তোমরা চিরদিনই প্রভুর আজ্ঞাবহা দাসী, কাজেই—"

নন্দা মহা কোলাহল বাধাইয়া দিল, "ও কথা বলো না বলছি। কিসের জোরে তোমরা প্রভু আর আমরা দাসী তা প্রমাণ কর।"

অসমঞ্জ বলিল, "এ প্রমাণ করা শক্ত কি? আজই তোমায় হিন্দুদের শাস্ত্রগুলো ভাঙ্গো করে দেখাব এখন, তাতেই দেখতে পাবে।"

নন্দা ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "শাস্ত্র তো তোমাদেরই পুরুষ জাতেরা তৈরী করেছে। তারা নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দেখে ঠিক সেই মতই আইন তৈরী করেছে। আজ আমরা তোমাদের কারচুপি বেশ ধরতে পেরেছি বলেই না শাস্ত্রগুলো অতলজলে ডুবিয়ে অথবা পুড়িয়ে ফেলতে চাই।"

অসমঞ্জ বলিল, "ফেললেই তার স্মৃতি যাবে?"

নন্দা জোরের সঙ্গে বলিল, "মানুষের স্মৃতি এমন কিছু সবল নয় যে যুগ যুগান্তর ধরে একটা ছায়া ধরে রাখবে। কাজেই সে ছায়াকে মিলাতেই হবে।"

অসমঞ্জ বলিল, "অনেক সময় ছায়াই কায়ায় পরিণত হয় নন্দা। যেদিন উপকারিতা বুঝবে, সেদিন মরা ছায়াকে জীবন্ত কায়ায় পরিবর্ত্তিত করে নিতে একটুও দেরী হবে না।"

নন্দা বলিল, "উপকারিতা বুঝলে তবে তো? আমরা আজ বিচার করে দেখছি ওতে উপকার নেই, আছে অপকার। অমনি করে শাস্ত্রের দোহাই দিয়েই না এ দেশের মেয়েগুলো মরেছে। আজ যে মেয়েদের তোমরা দেখছ, সেটা ওদের কায়াই মাত্র। পদে পদে নিষেধের গণ্ডি দিয়ে রেখে তোমরাই ওদের নির্জ্জীব করে দিয়েছ। ওদের উৎসাহ—হাসি—আনন্দ নিঃশেষে শাস্ত্রের তুলি দিয়ে মুছে দিয়েছ।"

বলিতে বলিতে সে চুপ করিয়া গেল। একদিন যে মেয়েটি প্রবল ঘৃণার সঙ্গে তাহার বাণী উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, তাহার কথা মনে করিয়া সে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল।

অসমঞ্জ চুপ করিয়া ছিল, একটু হাসিয়া বলিল,

"আমি ভাবছি কি নন্দা, তুমি যদি হাজার হাজার লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই রকম লেকচার দাও, তারা কি রকম তোমায়—"

রাগ করিয়া নন্দা বলিল, "যাও, সব তাইতে ঠাট্টা ভালো লাগে না।"

অসমঞ্জ বলিল, "সত্যি—ঠাট্টা নয়, সত্যিকার যা তাই বলছি। বেশ, ছেড়ে দিচ্ছি এ-সব কথা। আমার কথা আমি বলতে পারি, তাতে কোনও দোষ নেই নিশ্চয়ই। আমি একালের এই নারী-প্রগতি মোটেই যে পছন্দ করিনে তা নয়, তবে বড় বাড়াবাড়ি দেখলে অগত্যা কথা বলতে হয় বটে। হও না তোমরা খনা, লীলাবতী, গার্গী, বিশ্ববারা,—তোমরা আমাদের সত্যিকার সহধর্ম্মিণী ভগ্নি কন্যা হও, তোমাদের কাছ হতে আমরা সহায়তা পাবই। আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কেবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তোমরা শক্তি ক্ষয় কোরো না, আমাদের শক্তিও ক্ষয় কোরো না, এইমাত্র মিনতি। মনে করো দুইটি প্রধান শক্তি মিলে এক হয়ে কাজ করলে অনেক কিছুই করা যেতে পারে; কিন্তু এরা নিজেদের মধ্যে যদি মারামারি কাটাকাটি করে মরে, তাতে নিজেদেরই ক্ষতি নয় কি? জগতের কোন উপকার তো হবেই না—তা ছাড়া নিজেদের অস্তিত্ব নিজেরাই লোপ করে দেবে।"

উভয়ে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

নন্দা বলিল, "মস্ত বড় বড় কথা বলে ফেলেছ। গার্গী, বিশ্ববারার কথাটা বলা সহজ, মেনে নেওয়াই কঠিন। আজ যদি সত্যিকার বিশ্ববারা তোমাদের সামনে আসে, তোমরা তাকে যে আমল দেবে না, এ আমি ঠিক বলে দিচ্ছি। ক্ষমতার গর্ব্ব বড় বেশী। সেই গর্ব্বই তোমাদের কোন কিছু মানতে দেবে না। কে বলতে পারে, অতীতে যারা জন্মে উপযুক্ত স্থান পেয়ে নিজেদের প্রতিভা বিকাশ করতে পেরেছিল, এর মধ্যে আরও কোনও মেয়ে সেই রকম বা তার চেয়েও বেশী শক্তি নিয়ে জন্মেছিল কি না; কিন্তু তার দুর্ভাগ্য বশতঃ উপযুক্ত স্থান না পেয়ে অকালেই ঝরে পড়তে হয়েছে। এ কথা স্বীকার নিশ্চয়ই করবে, এ দেশে প্রতিভার ধ্বংস হয় এই রকমে—ফুটতে গিয়ে ফুটতে না পেরে ফুল ঝরে পড়ে। তার পর শুকিয়ে রেণু রেণু হয়ে একদিন উড়ে যায়। তখন তার ফোটার দাগটুকুও থাকে না। তোমরা স্থান দাও নি, মেয়েরা তাই নিজেরাই নিজেদের স্থান গড়ে নিচ্ছে। সেখানে তারা দাঁড়াবে। অদূর ভবিষ্যতে অমন হাজার বিশ্ববারা, মৈত্রেয়ী, গার্গী এই দেশের বুকেই আবার জেগে উঠবে। আজ যাকে তোমরা বলছ উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বেচ্ছাচারিতা,—কালে এই প্রথম উচ্ছ্বাস কেটে গেলে দেখতে পাবে নির্ম্মল পরিষ্কার সুপেয় জল—যাতে তৃষ্ণা দূর করবে—তৃপ্তি আনবে। এ কথা মানি—আজ প্রথম যে আলোড়ন এসেছে, এতে তলা হতে অনেক জমা কাদা ওপরে ভেসে উঠবে। সেগুলো পরিষ্কার করবার জন্যেই না এই প্রচেষ্টা চলছে।"

একটু থামিয়া সে বলিল, "অথচ এ ময়লা জলের তলায় আছেই,—মাঝে মাঝে এক একটা চাপ যখন ভেসে ওঠে তখন সমস্ত জলটাই নোংরা হয়ে ওঠে। এ রকম ভাবে নিত্য জল নোংরা হয়ে অখাদ্য হওয়ার চেয়ে একেবারে তলার সব ময়লা ছেঁচে তুলে ফেলা ভালো। এতে জল একবারই নোংরা হবে। তার পরে যে জল পাওয়া যাবে তাতে অনেকদিন চলবে।"

অসমঞ্জ চুপ করিয়া রহিল, ভাবে মনে হইল সে নন্দার কথাগুলা ভাবিতেছে।

নন্দা কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ উঠিয়া গেল। খানিক পরে সে যখন ফিরিয়া আসিল, তাহার হাতে তখন একখানা পত্র রহিয়াছে।

"দেখ, এই পত্রখানা কাল পোষ্ট করব বলে রেখেছিলুম, কিন্তু কারও হাতে দিতে আর মনে ছিল না। তুমি বার হওয়ার সময় এখানা নিয়ে যেয়ো দেখি।"

অসমঞ্জ পত্রখানা উল্টাইয়া ঠিকানাটা দেখিয়া লইয়া পকেটে রাখিল।

নন্দা বলিল, "আশ্চর্য্য দেখ—আমরা তোমাদের খাওয়া পরা, ঘুমের সময় পর্য্যন্ত দেখব শুনব, আর তোমরা পেছন ফিরলে আর ফিরে চাইবে না, একেবারে সব ভুলে যাবে—নয় কি?"

অসমঞ্জ এবার সত্যই গম্ভীর হইয়া গেল। হাতের সিগারেটটা দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "এ কথা কিছুতেই ঠিক নয় নন্দা,—সব পুরুষই তোমার বিশুদা নয়, একথা মনে কোরো।"

নন্দা বিবর্ণ হইয়া গিয়া স্বামীর পানে চাহিল।

অসমঞ্জ বলিল, "তোমার বিশুদা তোমার একটা ডাক শুনে সব ফেলে এতদূরে ছুটে এসেছিল, তখন তার বাড়ীর কথা মোটেই মনে ছিল না। তার পর একদিন যেমন বাড়ীর কথা মনে হল, সে বাড়ীর দিকে ছুটল,—তুমি যে প্রাণপাত করে তাকে বাঁচিয়েছ সে কথাটা পর্য্যন্ত সে ভুলে গেল। জেনে

রাখ নন্দা, একটী মাত্র মানুষকে ধরে সমস্ত মানুষকে বিচার করা চলে না। সকল "পুরুষই তোমার বিশুদা নয়, সকলেই তার মত অকৃতজ্ঞ নয়।"

নন্দার সুন্দর ঠোঁট দু'খানা কাঁপিতে লাগিল, চোখ দুইটী নিজের অজ্ঞাতেই কখন জলে ভরিয়া উঠিল।

হয় তো আত্মগোপন করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইত না; যদি না অসমঞ্জ উঠিয়া যাইত।

দূর নীলাকাশের একটী কোণ ঘেঁসিয়া তখন কালো একখানি মেঘ ভাসিয়া উঠিতেছিল। তাহার পানে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে নন্দার চোখের জল হঠাৎ ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

২১

একা নন্দা চুপ করিয়া ত্রিতলের খোলা ছাদে বসিয়া ছিল।

আকাশে শুক্লা পঞ্চমীর চাঁদ একটুখানির জন্য ভাসিয়া উঠিয়া হাসিতেছে।

টবের উপর ফুলগাছগুলিতে ফুল ফুটিয়াছে, তাহার মৃদু গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। দ্বিতলে খাঁচায় বদ্ধ কোকিলটা চাঁদের আলো দেখিয়া মাঝে মাঝে চীৎকার করিতেছিল—কুহু কুহু।

নন্দা ভাবিতেছিল মানুষের ব্যবহারের কথা। মানুষ জাতিটাই অকৃতজ্ঞ, ইহারা উপকারীর উপকার পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে চাহে না।

দাসী আসিয়া জানাইল বাবু ডাকিতেছেন। বিরক্ত হইয়া উঠিয়া নন্দা তাহাকে তাড়াইয়া দিল।

ইহারই খানিক পরে অসমঞ্জ স্বয়ং ছাদে আসিয়া উপস্থিত হইল।

দেখা গেল, সে বেশ ব্যস্ত হইয়া আসিয়াছে। আসিয়াই সে যখন নন্দার কপালে হাত দিল তখন নন্দা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও আবার কি, গায়ে হাত দিচ্ছ—কারণ?"

অসমঞ্জ উত্তর দিল,—"দেখছি অসুখ হয়েছে কি না?"

নন্দা তাহার হাতখানা সরাইয়া ফেলিয়া রাগ করিয়া বলিল, "থাক্; তুমি তো রোজই আমার জ্বর দেখছ। অমনি করে ডেকে ডেকেই না তুমি আমার জ্বর নিয়ে এসো।"

অসমঞ্জ একটু হাসিয়া বলিল, "তাই বটে; তোমার না কি মোটেই অসুখ হয় না নন্দা, তাই তুমি এ কথা বলছ। এ রকম কথা বলা বরং আমার মানায়, তোমার মানায় না। তবু যদি রোজ মাথা ধরা, গা গরম না হতো,—"

নন্দা চুপ করিয়া আকাশের পানে তাকাইয়া রহিল।

অসমঞ্জ বলিল, "শুনছো নন্দা, তোমার বিশুদার খবর পেলুম।"

নন্দা ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর?"

অসমঞ্জ একটু হাসিয়া বলিল, "বেশই আছে, কোনও অসুখ বিসুখ নেই। শুনে আশ্চর্য্য হবে নন্দা, সে আর কোথাও নেই, এখানে—এই কলকাতাতেই আছে।"

বিশ্বপতি এখানে আছে অথচ নন্দাকে একটা সংবাদ দেয় নাই, তাহার সহিত একটীবার দেখা করে নাই, এ কথা কখনও বিশ্বাস হয়? নন্দা যখন তাহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া চোখের জলে ভাসিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়াছিল, "পত্র দেবে তো বিশুদা,—একটা খবর দিয়ো কেমন আছ·—" তখন সে জোর করিয়াই বলিয়াছিল, "দেব বই কি,—খবর নিশ্চয়ই দেব।"

অতখানি জোর দিয়া যে কথা বলে, সে মানুষটা নিজেই কি মিথ্যা, অপদার্থ? মানুষ এমনও হইতে পারে?

তবু নন্দা জোর করিয়া বলিল, "বিশুদা এখানে আছে—খবর দেয় নি, এ কথা তুমি কার কাছে শুনলে? এ কখনও হতে পারে—সে একেবারে—"

অসমঞ্জ বাধা দিল,—"হয় নন্দা, জগতে অসম্ভব কিছুই নেই; একদিন যা অসম্ভব থাকে, কোনও এক সময় সেইটাই সম্ভব হয়ে যায়, এ কথা মানো তো? তোমার কৃত উপকার হয় তো তার মনে আছে, হয় তো মনে পড়ে তাকে তুমি কি রকম সেবা যত্ন দিয়ে বাঁচিয়েছ, তবু সে আসতে পারবে না,—আমার মত মুখ তার নেই। যে পবিত্রতা থাকলে মানুষ অবাধে সকলের সঙ্গে মিশতে পারে, সে পবিত্রতা তার নেই,—আগে হয় তো ছিল, এখন নষ্ট হয়ে গেছে। আমি কারও মুখে শুনে এ কথা বিশ্বাস করি নি, আজ নিজের চোখে তাকে দেখে আমার ভুল ভেঙেছে। আজ পথে তার সঙ্গে আমার দেখা হল, সে খানিক আমার পানে চেয়ে থেকে ছুটে চলে গেল, আমি অবাক হয়ে কেবল তার পানে তাকিয়ে রইলুম।"

নন্দা খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "বুঝেছি, বিশুদা আবার নেশা করতে সুরু করেছে। যাক, সে কোথায় আছে, সে খবরটা জানতে পেরেছ?"

অসমঞ্জ অন্যমনস্ক ভাবে বলিল, সে সন্ধান না নিয়ে আমি আসি নি নন্দা। সে যে জায়গায় আছে, সে জায়গায় ভদ্রলোকের ছেলে সংজ্ঞানে যায় না।"

নন্দার মুখখানা কালো হইয়া গেল।

সেই রাত্রিটা সে মোটেই ঘুমাইতে পারিল না; ছোটবেলাকার স্মৃতিগুলা ছায়াচিত্রের মত তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল।

সেই বিশুদা,—তাহাকে কি স্নেহই না করিত, কত ভালোই না বাসিত। মনে পড়ে, একদিন পাড়ায় কোথায় কোন্ অকাজ করিয়া বিশুদা পালাইয়াছিল, দু'দিন ফিরে নাই। নন্দা তখন কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু ফুলাইয়াছিল। বিশুদা পালাইয়াও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে নাই, একদিন সন্ধ্যায় আসিয়া দেখা দিয়া গিয়াছিল।

এ সেই বিশুদা; এখানে—এত কাছে থাকিয়াও সে একটা সংবাদ দিল না, একবার দেখা করিল না।

মানুষের পরিবর্ত্তন অস্বাভাবিক হইয়াও এত স্বাভাবিক হইয়া যায়, কয়েক মাস পূর্ব্বে যাহাকে দেখা যায়, প্রকৃতিগত বৈলক্ষণ্য তাহারও মাঝে লক্ষিত হয়।

কিন্তু সেই বিশুদা—যে একদিন মাতালকে ঘৃণা করিত, চরিত্রহীনকে ঘৃণা করিত, আজ তাহাকে মাতাল করিল কে, চরিত্রহীন সাজাইল কে?

নন্দার চক্ষু দুইটী কতবার অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। দুই হাতে আর্ত্ত বক্ষটাকে চাপিয়া ধরিয়া ভাষাহীন প্রার্থনা করিতে লাগিল—"ওকে ফিরাও প্রভু, ওকে ফিরাও; একটী মানুষের অমূল্য জীবন এমন ভাবে নষ্ট হতে দিয়ো না,—ওকে পথ দেখাও, ওকে আলো দেখাও।"

মধ্যরাত্রে অসমঞ্জের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

পার্শ্বে কে যেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল,—"নন্দা—"

রুদ্ধ কণ্ঠে নন্দা উত্তর দিল, "কেন?"

স্ত্রীকে পার্শ্বে টানিয়া আনিয়া অসমঞ্জ জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি—এত রাত পর্য্যন্ত তুমি জেগে আছ, এখনও ঘুমোও নি?"

নন্দা উত্তর দিল না, স্বামীর বুকের মধ্যে মুখখানা রাখিয়া সে নীরবে চোখের জল ফেলিল।

অসমঞ্জ অন্ধকারেই তাহার মুখের উপর হইতে চুলগুলি সরাইয়া দিতে দিতে স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "বুঝেছি, বিশুদার অধঃপতনের কথাই ভাবছ; তোমার মনটা বড় খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু কেন নন্দা, সে তোমার এমন কেউ নিজের লোক নয় যার অধঃপতনে তোমার মনে আঘাত লাগবে। তুমি অত ভেঙ্গে পড়লে কেন নন্দা?"

রুদ্ধ কণ্ঠে নন্দা বলিল, "তোমায় এতদিন অনেক কথাই বলেছি, একটা কথা কেবল গোপন করে গেছি, সে জন্যে আমায় মাপ কর। বিশুদা আজ অধঃপাতের শেষ ধাপে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, সে আজ মাতাল,—চরিত্রহীন,—তোমরা তাকে ঘৃণা করবে; কিন্তু যদি জানতে তার এই অধঃপতনের মূল কে, তা হলে তাকে ঘৃণা করতে পারতে না।"

সোৎসুকে অসমঞ্জ জিজ্ঞাসা করিল, "কে নন্দা, কে তার অধঃপতনের মূল?"

"আমি—ওগো, সে আমি—"

নন্দা দুই হাতে অসমঞ্জের একখানা হাত নিজের মুখের উপর চাপিয়া ধরিল।

আকাশ হইতে পড়িয়া অসমঞ্জ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি?"

উদ্ভাসিত চোখের জল কোনমতে চাপা দিয়া বিকৃত কণ্ঠে নন্দা বলিল, "হ্যাঁ, আমিই। তুমি জানো না, বিশুদা ছোটবেলা হতে আমায় খুব ভালোবাসত; আমার সঙ্গে তার বিয়ে হয় নি, সেইজন্যে সকলের পরে—বিশেষ করে আমার পরে রাগ করেই সে অধঃপাতের পথে গেছে, নিজেকে ধ্বংস করেছে।"

অসমঞ্জ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর হঠাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

নন্দা নিৰ্জ্জীবের মত পড়িয়া রহিল। তাহার মনে হইল, স্বামীর যে ভালোবাসা সে পাইয়াছিল, এই সময় হইতে তাহা সে হারাইয়া ফেলিল।

অসমঞ্জ পত্নীর মাথায় হাতখানা বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল, 'তা হলে বুঝেছ নন্দা—তোমার জন্যেই সে অধঃপাতে গেছে বলে তাকে সংশোধন করে ফিরাতে হবে তোমাকেই? তার স্ত্রীর সে ক্ষমতা নেই, কারণ তাকে কেবল স্ত্রী নামে পরিচিতা হওয়ার গৌরবটাই দেওয়া হয়েছে, স্বামীর পরে অধিকার তার এতটুকু নেই। আমি এতে মত দিচ্ছি নন্দা; কারণ, আমি তোমায় বিশ্বাস করি, আমি তোমায় ভালোবাসি। আমার সেই বিশ্বাস, সেই ভালোবাসা তোমায় অটুট রেখে তাকে ফিরিয়ে আনবে তোমাকে দিয়ে।"

নন্দা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "সত্যি তুমি আমায় বিশ্বাস কর?"

অসমঞ্জ গাঢ়স্বরে বলিল, "হ্যাঁ করি, কেন না আমি তোমায় কেবল চোখে দেখে ভালোবাসি নি, মুগ্ধ হই নি; তোমায় আমি অন্তর দিয়ে পেয়েছি, তোমার অন্তরের পরিচয় পেয়েছি। তোমায় অবিশ্বাস? না নন্দা, সে দিন, সে সময় যেন না আসে, তোমায় যেন চিরদিন এমনই চোখে আমি দেখে যাই।"

নন্দার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া অসমঞ্জের হাতের উপর পড়িতে লাগিল।

অসমঞ্জ ডাকিল, "নন্দা—"

আর্দ্রকণ্ঠে নন্দা বলিল, "আমায় আশীর্ব্বাদ কর গো, যেন তোমার বিশ্বাস অটুট রেখে তোমার স্ত্রী হয়ে মাথার সিঁদুর নিয়ে মরতে পারি; মরার সময় যেন তোমায় সামনে দেখতে পাই।"

২২

মাস আট নয় বিশ্বপতির কোনও সংবাদ না পাইয়া সনাতন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

এই আত্মভোলা লোকটিকে সে যথার্থই স্নেহ করিত, ভালোবাসিত। কল্যাণী চলিয়া যাওয়ায় সনাতন বিশ্বপতির জন্যই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল, এই লোকটাকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবে তাহাই সে ভাবিয়া পায় নাই। বিশ্বপতি সে আঘাত যখন হাসিমুখে সহিয়া গেল, তখন সত্যাই সে যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়া গেল। অনেক কিছু সে ভাবিয়া রাখিয়াছিল, চুপি চুপি দুই একটী মেয়ে দেখিয়া রাখিতেছিল, ভাবিয়াছিল—বিশ্বপতিকে সে আবার সংসারী করিবে। সংসারে থাকিতে গেলে এমন কত আঘাত মানুষকে সহিতে হয়; লোকে কি সে আঘাতের বেদনা ভুলিয়া গিয়া আবার নূতন করিয়া সংসার পাতে না? হয় সবই—সন্তান মারা গেলে মা প্রথমে শোকে বাহ্যজ্ঞান হারাইলেও আবার উঠে, আবার হাসে। অমন যে নিদারুণ সন্তান-শোক, তাহাও চাপা দিতে হয়।

কিন্তু তাহার সকল ইচ্ছা নিষ্ফল করিয়া বিশ্বপতি যখন নন্দার কাছে যাইতেছে বলিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল, তখন সনাতন নন্দার উপর একেবারে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল।

হয় তো কল্যাণীকে লইয়া বিশ্বপতি সুখেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত, যদি দীর্ঘ দিন পরে নন্দা আবার নূতন করিয়া মাঝখানে আসিয়া না দাঁড়াইত। সে আকর্ষণ করিল বলিয়াই বিশ্বপতি গৃহের মায়া উপেক্ষা করিয়া দূরে চলিয়া গেল, হতভাগিনী কল্যাণী গৃহত্যাগ করিয়া কোথায় গেল কে জানে! বিশ্বপতির গৃহ শ্মশান হইল, কল্যাণীর বড় সাধের সাজানো সংসার ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। বিশ্বপতিকে সুখী করিবার জন্য সনাতন আবার যে আয়োজন করিতেছে, নন্দা সে চেষ্টাও ব্যর্থ করিয়া দিয়া বিশ্বপতিকে কাছে ডাকিয়া লইল।

দিনের পর দিনগুলা কাটিয়া যাইতে লাগিল, বিশ্বপতি ফিরিল না, একখানা পত্রও দিল না। সনাতন নন্দার উপর আক্রোশ লইয়া ফুলিতে লাগিল।

বাকি খাজনার দায়ে যেদিন জমীদারের গোমস্তা আসিয়া যা না তাই বলিয়া অপমান করিয়া গেল, সেই দিনই ঘরের দরজায় ডবল তালা ঝুলাইয়া দিয়া সনাতন একেবারে সোজা ষ্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইল এবং কলিকাতার টিকিট কিনিয়া ট্রেণ আসিবামাত্র সকলের আগে ট্রেণে উঠিয়া বসিল।

কলিকাতায় নন্দার বাড়ী গিয়া সে নন্দাকে বেশ দশ কথা শুনাইয়া দিবে। তাহাতেও যদি সে বিশ্বপতিকে মুক্তি না দেয়, সনাতন নন্দার স্বামীকে সব কথা বলিয়া দিবে, এই তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

বেচারা অসমঞ্জের জন্য তাহার কষ্ট হইতেছিল বড় কম নয়। তাহাকে সনাতন একবার মাত্র দেখিয়াছিল। আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিয়াছিল—নন্দার এমন স্বামীকেও সে ভালোবাসিতে পারে নাই,—এখনও সে বিশ্বপতিকে ভালোবাসে কি করিয়া? অসমঞ্জের মত সুপুরুষ, মহৎ-হৃদয় লোক খুব কমই দেখা যায়। নন্দার অদৃষ্টক্রমেই সে এমন স্বামী পাইয়াছে। শিক্ষায়, চরিত্রে, আকৃতিতে, সম্পদে অসমঞ্জ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এমন কথা বলাও তো অত্যুক্তি নয়। নন্দা এমন স্বামীর স্ত্রী হইয়া আজও তাহাকে ছলনা করে, ইহাই বড় আশ্চর্য্যের কথা।

অসমঞ্জ বেচারা কিছুই জানে না। তাহার স্ত্রী পরপুরুষের চিন্তায় আপনহারা, সে বেচারা নিজের সমস্ত ভালোবাসা সেই স্ত্রীকেই উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়া যাইতেছে। স্বপ্নেও তাহার মনে

কোন দিন জাগে নাই—তাহার স্ত্রীকে যাহা সে ভাবে, সে তাহা নয়। কল্যাণীকে সকলে আজ ঘৃণা করে, তাহার নাম মুখে আনিতে যে কোনও মেয়ে মুখবিকৃতি করে, তাহার কথা কেহ শুনিতে চাহে না, কিন্তু সে যে অতৃপ্ত বাসনা লইয়া গৃহত্যাগ করিয়া গেছে, নন্দার অন্তরের অন্তরালে তাহাই নাই কি? আজ নন্দা সতী সাবিত্রীর আসনে প্রতিষ্ঠিতা থাকিয়া লোকের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিতেছে কি করিয়া? সনাতন তাহার উপরের আবরণ ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়া জগৎকে দেখাইবে—আজ ভাগ্যদোষে কল্যাণী যেখানে গিয়া দাঁড়াইয়াছে, নন্দার স্থানও সেইখানে,—পূজা পাইবার যথার্থ অধিকারিণী সে নয়।

সমস্ত পথটা সে ভাবিতে ভাবিতে চলিল, যদিই সে বিশ্বপতিকে ঘরে ফিরাইয়া আনিতে না পারে, তাহা হইলে অসমঞ্জকে এ সব কথা বলা উচিত কি না। এ সংবাদ শুনিলে অসমঞ্জের মনের সুখশান্তি চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া যাইবে, হয় তো আঘাত সহিতে না পারিয়া সে আত্মহত্যা করিবে, নয় তো পাগল হইয়া যাইবে। সেইটাই কি ভালো হইবে? একজনকে রক্ষা করিতে গিয়া আর একজনকে হত্যা করার মহাপাপ কি সনাতনকে অর্শিবে না?

ট্রেণ যখন শিয়ালদহে আসিয়া পৌছিল তখনও সে কর্ত্তব্য ঠিক করিতে পারে নাই।

পথে চলিতে চলিতে সে একরকম কর্ত্তব্য ঠিক করিয়া লইল। অসমঞ্জকে কোন কথা বলিয়া এখন লাভ নাই, নন্দাকে সতর্ক করিয়া দিলেই চলিবে।

নন্দার বাড়ীর সামনে যখন সে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন অসমঞ্জ কোথায় যাইবে বলিয়া বাহির হইতেছিল, মোটরখানা বাড়ীর সামনে প্রস্তুত হইয়া ছিল।

সনাতন নিকটে গিয়া দাঁড়াইল, সসম্ভ্রমে একটা নমস্কারও করিল।

বৃদ্ধ লোকটীর পানে তাকাইয়া অসমঞ্জ মনে করিতে পারিল না ইহাকে কোথায় দেখিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা হতে আসা হচ্ছে?"

সনাতন কুন্ঠিত কণ্ঠে বলিল, "আমি নন্দা দিদিমণির দেশের লোক, তাঁর কাছেই এসেছি।"

অসমঞ্জ নিকটস্থ ভৃত্যকে আদেশ করিল, "একে বউদিদিমণির কাছে নিয়ে যাও, তাঁকে বলে দাও গয়ে এ তাঁর বাপের বাড়ী হতে এসেছে।"

সে গাড়ীতে চলিয়া গেল, ভৃত্য সনাতনকে ঘরের মধ্যে বসাইয়া নন্দাকে সংবাদ দিতে গেল।

ধনীর গৃহসজ্জা দেখিয়া দরিদ্র সনাতন আশ্চর্য্য হইয়া তাকাইয়া রহিল। এত নূতন ও আশ্চর্য্য জিনিষ সে কখনও চোখে দেখে নাই। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে মনেই সে বলিল, "দাঠাকুরকে সহজে এখান হতে নিয়ে যাওয়া যাবে না তা বেশই বোঝা যাচ্ছে।"

নন্দা পর্দ্দার পাশে ভিতর দিকে আসিয়া দাঁড়াইল, একবার উঁকি দিয়া দেখিয়া সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "ওমা, তুমি সোনা দা? আমি ভাবছি দেশ হতে খবর না দিয়ে এমন অসময়ে কে এল? এখানে বসলে কেন, ভেতরে এসো।"

সনাতন মলিন হাসিয়া উঠিল।

দ্বিতলে নিজের ঘরে নন্দা তাহাকে বসাইল।

"তার পর,—হঠাৎ যে সোনাদা, কি মনে করে? তুমি যে কলকাতায় আসবে তা যেন একেবারে স্বপ্নেরও অগোচর। দেশের সব ভালো? মুখুযোদের বাড়ী, শিরোমণি মশাইরা, জগৎ পিসী, তার ছেলে বউ—"

সনাতন ঈষৎ হাসিয়া জানাইল—সব ভালো, কারও কোনও অসুখ নেই।

নন্দা উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "এবার বর্ষায় খুব জল হয়েছে—সেই সেবারকার মত? পুকুর, খানা, নদী, বিল, সব জলে ডুবে গেছে,—পাড় ছাপিয়ে পথে ঘাটে জল এসেছে? আচ্ছা সোনাদা, রায়েদের বাগানে সেবারকার মত এক বুক জল দাঁড়িয়েছে,—ছেলে মেয়েরা কাগজের নৌকো গড়ে, মোচার খোলার নৌকো করে তাতে ভাসায়? শুনছি না কি এবার ধান জন্মায় নি,—সব দেশে এবার কি দুর্ভিক্ষ হবে? ওখানে ধান কি রকম হয়েছে সোনাদা?"

সনাতন বলিল, "দুর্ভিক্ষের কথা কি করে বলব দিদিমণি? আমাদের গাঁয়ে এবার তো বেশ ধানই হয়েছে; জল যেমন প্রতি বছর হয় তেমনই হয়েছে,—খুব বেশীও নয়, খুব কমও নয়—পরিমাণমত।"

আরও কত কি জিজ্ঞাসা করার মত কথা আছে, কিন্তু সনাতনের শুষ্ক মুখের পানে তাকাইয়া তাহার আহারের কথা মনে করিয়া নন্দা উঠিয়া পড়িল—"ওমা, তোমার খাওয়ার কথা একেবারেই ভুলে গেছি সোনাদা, আজ সারা দিন বোধ হয় তোমার খাওয়া হয় নি। একটু বোস, আমি

বামুন ঠাকরুণকে তোমার খাওয়ার কথা বলে আসি।"

সনাতন বলিল, "আমি খেয়ে এসেছি,—আমার খাওয়ার জন্যে তোমার ব্যস্ত হতে হবে না। ভোরে উঠেই ভাতে-ভাত রেঁধে খেয়েছি।"

কিন্তু নন্দা কিছু না খাওয়াইয়া ছাড়িল না। সনাতনকে হাত পা ধুইয়া জলখাবার খাইতে হইল।

নন্দা গল্প করিতে বসিল। সে গল্প তাহার গ্রামের সম্বন্ধে। কিন্তু আশ্চর্য্য—সকলের কথাই সে জিজ্ঞাসা করিল, বিশ্বপতি বা কল্যাণীর নাম সে মুখেও আনিল না।

অনেক কথাবার্ত্তার মধ্যে সনাতন জিজ্ঞাসা করিল, "দাঠাকুর কোথায় দিদিমণি, তাঁকে দেখতে পাচ্ছি নে। ওঁর কাছে বিশেষ দরকার বলেই এসেছি, আবার সন্ধ্যার ট্রেণে আজই আমায় ফিরে যেতে হবে।"

নন্দা শুষ্ক মুখে উত্তর দিল, "বিশুদা তো এখানে নেই সোনাদা।"

সনাতন বিশ্বাস করিল না, একটু হাসিয়া বলিল, "আমাকে কেন আর মিছে কথা বলে ভুলাচ্ছ দিদিমণি? আজ আট নয় মাস হল দাঠাকুর তোমার বাড়ী আসবে বলে এসেছে। তার পর এতগুলো যে পত্র দিলুম—একখানার উত্তর পর্য্যন্ত দিলে না। মানুষটার আক্কেল দেখ একবার,—পেছন ফিরলে আর যদি একটা কথা মনে থাকে। আমি যক্ষের মত তার বাড়ী-ঘর আগলে নিয়ে বসে আছি,—একটা দিন আমার বাড়ী ফেলে নড়বার যো নেই,—যেন আমারই সব দায়। তুমিই বল দিদিমণি,—বুড়ো বয়সে লোকে কত তীর্থধর্ম্ম করে,—আমার সে তীর্থধর্ম্ম করা চুলোয় যাক, একদিনের জন্যে বাড়ী হতে বার হওয়া চলে না,—এ রকম করলে চলে কি করে? একটা মাত্র মেয়ে, প্রায়ই খবর দিয়ে পাঠাচ্ছে যেন তার কাছে গিয়ে শেষ জীবনটা একটু আরামে কাটাই। সত্যি কথা বল দিদিমণি, চোখের দৃষ্টি গেছে, গায়ের শক্তি গেছে, এখন নাতি নাতিনী, মেয়ে জামাই সব থাকতে কে আর খেটে খেতে চায়? ওই যে একটা কথা আছে—পরের বন্ধনে বন্ধন, আমার হয়েছে ঠিক তাই। পরের বাড়ী-ঘর জিনিসপত্র নিয়ে এমন জড়িয়ে পড়েছি, এক দণ্ড যদি হাঁফ ফেলবার অবকাশ থাকে। কেন বাপু, তোমার জিনিস, বাড়ী, তুমি গিয়ে দখল কর, আমি চলে যাই, আমি কেন জড়িয়ে থাকি?"

ক্ষীণকণ্ঠে নন্দা বলিল, "সে কথা ঠিক। কিন্তু বিশুদার দস্তুরই যে তাই সোনাদা। এই দেখ না, এই কিছু দিন আগে পুরীতে সেবারে কি ব্যারামটাই না হল। অত সেবা-যত্ন করে বাঁচিয়ে তুলে দেশে পাঠালুম। মানুষ কি না একখানা পত্র পর্য্যন্ত না দিয়ে কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে রইল। ভেবে মরি। তার পর সেদিন মাত্র ওঁর মুখে বিশুদার খবর পেলুম যে, সে না কি এখানেই আছে, কিন্তু সে এমন জায়গায় আছে, যেখানে সহজে কেউ যেতে পারবে না।"

নন্দা জোর করিয়া মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, "আমি কি মিছে কথা বলছি সোনাদা? এখানে থাকলে তুমি যে এতক্ষণ এসেছ নিশ্চয়ই দেখতে পেতে, সে কোথায় লুকিয়ে থাকতো?"

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া সে বেদনাপূর্ণ কণ্ঠে আবার বলিল, "যার যা স্বভাব তা কি কিছুতেই যায় সোনাদা? যে স্বেচ্ছায় পিছল পথে একবার পা দিয়েছে, সে পিছলে যাবেই, তার চলার গতি রোধ করবে কে, তাকে বাধা দিতে শক্তি কার? বিশুদাকে ঠেকান তোমার, আমার বা বউদির কাজ নয়। ও যখন জেনে শুনে ধ্বংসের পথে চলেছে, তখন ওকে বাঁচানো আমাদের সাধ্যাতীত।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সনাতন বলিল, "বুঝেছি দিদিমণি, আর বলতে হবে না। দাদা-ঠাকুরের এমনি অধঃপতন হয়, তবু আবার সে ঘরে ফিরত কেবল মা-লক্ষীর টানে। কিন্তু সে বাঁধন কেটে গেছে বলেই সে আর কোন দিন ঘরের পানে ফিরবে না। সে যাক্ কিন্তু আমিই বা আর কত দিন যখের মত ওই বাড়ী-ঘর আগলে বসে থাকব বল দেখি?"

বিস্মিতা নন্দা জিজ্ঞাসা করিল, "ঘরের বাঁধন কেটে গেছে মানে?"

সনাতন শুষ্ক হাসিল মাত্র।

ইহার পর সে যখন কল্যাণীর গৃহত্যাগের কাহিনী বর্ণনা করিল, তখন নন্দা একেবারে স্তম্ভিতা হইয়া গেল।

না, বিশুদাকে অধঃপাতে যাইবার জন্য দোষ দেওয়া যায় না। এরূপ আঘাত পাইলে মানুষ আত্মহত্যা করে, বেদনা ভুলিবার জন্য যে কোন দিকে চলিয়া যায়, যে কোনও প্রলেপ দিতে চায়। বিশ্বপতি পাগল হয় নাই, আত্মহত্যা করে নাই, মদ খাইয়া জ্বালা জুড়াইতে চায়।

মনে পড়িয়া গেল কল্যাণীর সেই বিবর্ণ মুখখানা। দুই হাতে দরজাটা চাপিয়া ধরিয়া সে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার নয়নে সে কি দৃষ্টি, তাহার মুখে সে কি ভাব ফুটিয়াছিল! স্বামীর পার্শ্বে নন্দাকে দেখিয়া সে কি ভাবিয়াছিল, তাহার অন্তরে কতখানি গ্লানি, কতখানি ঈর্ষা জাগিয়াছিল?

সে ভুল করিয়াছে, সে নন্দাকে চিনে নাই। নন্দার মধ্যে যে সত্যকার স্ত্রী জাগিয়া আছে, তাহাকে দেখিতে পায় নাই।

এই সামান্য ভুলের বশে সে যে কাজ করিয়াছে তাহা যে অসীম, অনন্ত! ইহার তো শেষ নাই; সুতরাং সংশোধনও করা যাইবে না। তাহার সারা জীবনটা কলঙ্ক-কালিমা-মণ্ডিত থাকিয়াই যাইবে, —এ কলঙ্ক হইতে মুক্তি পাইবার পথ নাই, উপায় নাই।

হায় হতভাগিনি! করিলে কি? নিজের সর্ব্বস্ব নষ্ট করিলে, স্বামীর সর্ব্বস্ব নষ্ট করিলে, নন্দারও সুখশান্তি সব ঘুচাইলে!

অনেক অনুরোধেও সনাতন নন্দার বাড়ীতে রাত্রি যাপন করিল না; বলিল, "কি করে থাকব দিদিমণি, দাঠাকুরের জিনিসপত্র সব আমার জিম্মায় রয়েছে। যদি কোন রকমে এতটুকু নষ্ট হয়ে যায়, আমি যে ধর্ম্মে পতিত হব। কোন্ দিন নিজের ঘরের কথা তার মনে পড়বে, সেদিন সে ফিরে যখন দেখবে ঘর তার নষ্ট হয়ে গেছে—যেখানে যে জিনিসটী ফেলে গেছল সেখানে তা নেই, সেদিন আমায় কি বলবে, ভাবো দিদিমণি?"

এই অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকটীর মনের মহান ভাব দেখিয়া নন্দার চোখে জল আসিল।

রুদ্ধ কণ্ঠে সে বলিল, "তুমি যাও সোনাদা। আমি শেষ একবার চেষ্টা করে দেখব যদি কোন রকমে বিশুদাকে ঘরে পাঠাতে পারি,—যদি তাকে আবার সংসারী করতে পারি। এ রকম ব্যাপার প্রায়ই তো ঘটে সোনাদা, মানুষ সামান্য ভুলে ভয়ানক সর্ব্বনাশও করে ফেলে। তা বলে সবাই তো ঘর ছেড়ে উদাস হয়ে বার হয় না, ঘরের মানুষ ঘরেই থাকে। প্রাণপণ চেষ্টা করেও বিশুদাকে আমি ঘরে ফিরাব। যত দিন সে দিন না আসে, তুমি তার ঘরখানা, তার দলিলপত্রগুলো দেখো।"

সনাতন বিদায় লইল।

২৩

মাত্র দুই দিনের জন্য যে অতিথিকে চন্দ্রা বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়া স্থান দিয়াছিল, সে যে চিরকালের মতই আসন পাতিয়া বসিয়া পড়িবে, তাহা চন্দ্রা ভাবে নাই।

চন্দ্রা চায় না বিশ্বপতি এখানে থাকিয়া এমনই ঘৃণিত ভাবে জীবন যাপন করে। যে যাহাকে ভালোবাসে, সে তাহাকে নীচু দেখিতে চায় না। সে চায়—তাহার ভালোবাসার পাত্র উপরে থাক—আরও উপরে উঠুক।

চন্দ্রা বিশ্বপতিকে বাড়ী যাইবার জন্য যতই পীড়াপীড়ি করে, বিশ্বপতি ততই তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরে।

সেদিন খুব রাগ করিয়াই চন্দ্রা বলিল, "তুমি বাড়ী যাবে কি না বল দেখি?"

বিশ্বপতি উত্তর দিল না, কেবল মাথা নাড়িল।

চন্দ্রা দৃপ্ত হইয়া বলিল, "ও-কথা বললে চলছে না। তোমার বাড়ী-ঘর সব গেল, আর তুমি এখানে দিব্যি শুয়ে বসে দিন কাটাচ্ছ। বাড়ী যাবে না, আমি কি তোমায় চিরকাল এখানে রাখব?"

বিশ্বপতি বলিল, "বাড়ী-ঘর আমার কিছুই নেই চন্দ্রা।"

ঝাঁজের সঙ্গেই চন্দ্রা বলিল, "না, তোমার কিছু নেই, তুমি একেবারে পথের ভিখারী! তোমার মতলবটা কি বল দেখি? তুমি কি চিরকালের জন্য এখানেই থাকতে চাও?"

বিশ্বপতি হাসিল,—"থাকলামই বা, তাতে তো তোমার অসুবিধে নেই চন্দ্রা।"

চন্দ্রা এই আশ্চর্য্য-প্রকৃতি লোকটীর পানে খানিক তাকাইয়া রহিল। তাহার পর নরম সুরে বলিল, "আমার ক্ষতি অসুবিধা হোক বা না হোক, তোমার যে যথেষ্ট ক্ষতি হচ্ছে, এ কথা তো অস্বীকার করতে পারবে না। আগে মনের মধ্যে যেটুকু সৎপ্রবৃত্তি ছিল, এখন তাও গেছে। আমার বাড়ীতে দিনরাত রয়েছ, লোকে জানতে পারলে মুখে চুণকালি দেবে, সে ভয়টুকু পর্য্যন্ত নেই। তোমায় কেউ দেখে আজ ভদ্রলোকের ছেলে বলতে পারবে কি? যেমন আকৃতি—প্রকৃতিও ঠিক তারই মত হচ্ছে যে।"

বিশ্বপতি প্রচুর হাসিতে লাগিল। তাহার হাসিতে বিরক্ত হইয়া চন্দ্রা বলিল, "নাও, হয়েছে,

হাসি থামাও। সব তাইতে ওই যে হাসি, ও আমি দেখতে পারি নে। কি যে হয়েছে তোমার, মনুষ্যত্ব-জ্ঞান এতটুকু নেই। সেদিনে সেই ড্রাইভারটার সঙ্গে কি সব কথাবার্ত্তা বলতে সুরু করলে বল দেখি,—লজ্জায় তখন আমার মাথা যেন কাটা গেল।"

হাসি থামাইয়া বিশ্বপতি বলিল, "তখন সেটা না বুঝলেও পরে আমিও তা বুঝেছিলুম চন্দ্রা। কিন্তু জানোই তো মাতালের হিতাহিত বোধ থাকে না। একটা কথা চন্দ্রা, তুমিই বা ওর কাছে ভদ্রলোকের ছেলে বলে আমার পরিচয় দিতে গেলে কেন, বললেই হতো তোমার বাড়ীর চাকর বা বাজার-সরকার?"

চন্দ্রা মুখ ভার করিয়া রহিল।

বিশ্বপতি বলিল, "সেজন্যে যে আমার মনে এতটুকু কষ্ট হতো—তা নয়। কেন না, জানই তো, আত্মসম্মান-বোধ আমার মোটেই নেই,—ওসব বালাইয়ের ধার আমি ধারি নে। হ্যাঁ, যেদিন পথে এখানে আমায় প্রথম দেখলে, সেদিনও একটু ছিল—যার জন্যে আমি আসতে চাইনি। কিন্তু তুমি আমায় জোর করে সেদিনে ধরে নিয়ে এলে। সেদিনে আমার মনে এতটুকু জ্ঞান ছিল—আমি ভদ্রসন্তান,—আমার সমাজ আছে, ধর্ম্ম আছে,—আমায় লোকের কাছে মুখ দেখাতে হবে। কিন্তু আজ সে জ্ঞান চাপা পড়ে গেছে চন্দ্রা,—আজ আমি পশুরও অধম হয়েছি। আজ আমার কি মনে হয় জানো? মনে হয় সমুদ্রের বুকে বিছানা পেতেছি, ঢেউ আসছে—আসুক, আমায় তো ডুবাতে পারবে না।"

চন্দ্রা অন্যমনস্ক ভাবে জানালা-পথে বাহিরের পানে তাকাইয়া ছিল, খানিক নীরবে থাকিয়া মুখ ফিরাইল। দুইটি চোখের দৃষ্টি বিশ্বপতির মুখের উপর রাখিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আমি যদি জানতুম তুমি পিছল পথের সন্ধানেই আছ, তা হলে তোমায় কখনই সেদিন ডেকে নিতুম না। যে ভুল করেছি, তার জন্যে নিজেই অনুতাপ করছি, কাউকেই সেজন্যে দোষ দিচ্ছিনে—দেবও না। কিন্তু একটা কথা বল দেখি, তোমার মত অনেকেই তো অধঃপাতে যায়, তারা কি আর সৎ হয় না, আর কি ঘরে ফেরে না?"

বিশ্বপতি হাসিল, বলিল, "যাবে না কেন? আমিও যেতুম, যদি আমার কেউ থাকত,—আমার ঘর জ্বালাপ্রদ না হয়ে শান্তিপ্রদ হতো। আমি কোথায় ফিরে যাব? ঘর আমার কাছে শ্মশান হয়ে গেছে,—ঘরের দিক হতে কোন ডাকই আর আমার কাণে আসে না। আজ ভাবি চন্দ্রা, যদি কেউ থাকত—; আমার মুখের পানে তাকাতে, আমার ব্যথায় সান্ত্বনা দিতে, আমার চোখের জল মুছিয়ে দিতে যদি আমার মা কিম্বা একটা বোনও থাকত চন্দ্রা,—"

বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল, আত্মগোপনের জন্যই সে তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে সে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া চন্দ্রার পানে তাকাইল, বলিল, "আমার যে কেউ নেই তা তো জানোই। সেবার পুরী গিয়েছিলুম, মাত্র তিন মাস ছিলুম—সেও কেবল ব্যারামের জন্যে। ব্যারাম যদি না হতো, অনেক আগেই বাড়ী ফিরতুম। তুমি কি মনে কর—এই তিন মাসের মধ্যে বাড়ীর কথা আমার মনে পড়ে নি, আমি বাড়ী ফিরতে চাই নি? না চন্দ্রা, তা যদি মনে করে থাকো—জেনো সে ভুল ধারণা, কেন না, আমি অহোরাত্র বাড়ীর কথাই ভাবতুম—সে কি শুধু বাড়ীর জন্যেই? সে বাড়ী তো আজও আছে, তবে আজ কেন আমি তার আকর্ষণ অনুভব করছি নে? তার কারণ, তখন যে ছিল সে আজ নেই,—তখন যে কর্ত্তব্যপালনের উৎসাহ ছিল আজ তা নেই। আমি সব হারিয়েছি, আমার সব ফুরিয়ে গেছে।"

চন্দ্রা পলকহীন নেত্রে বিশ্বপতির পানে তাকাইয়া রহিল, আস্তে আস্তে বলিল "তবে যে একদিন বলেছিলে বউকে তুমি ভালোবাস না?"

বিশ্বপতি একটু হাসিল,—"কর্ত্তব্যপালনের মধ্যেও নিষ্ঠা থাকে চন্দ্রা,—নিষ্ঠাটাই অজ্ঞাতে হয় তো এতটুকু ভালোবাসা গায়ে মেখে নেয়। তাকে হয় তো ভালবাসতুম—কিন্তু অন্তরে তাকে নিতে পারি নি।"

চন্দ্রা জিজ্ঞাসা করিল, "যদি জিজ্ঞাসা করি কিসে সে তোমার অনুপযুক্তা হয়েছিল,—তার তো রূপ গুণ কিছুরই অপ্রতুল ছিল না, তবু কেন তাকে অন্তরে স্থান দিতে পার নি,—সেটা কি খুব অন্যায় হবে?"

বিশ্বপতি ধীরে ধীরে মাথা দুলাইল—"অন্যায় কিছুমাত্র নয় চন্দ্রা, যে এ কথা শোনে সেই জিজ্ঞাসা করে—কেন আমি তাকে অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসতে পারি নি। আমি এ সব বিষয়ে দিলখোলা

লোক, কোন দিন কিছু গোপন করি নি—করবও না।"

বলিতে বলিতে সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তখনই সে হাসি থামাইয়া বলিল, "দেখছ, কি রকম বেহায়া,—যে হাসির জন্যে এইমাত্র কত অপমান করলে, আবার—"

মর্ম্মপীড়িতা চন্দ্রা বাধা দিয়া বলিল, "কই, কখন, তোমায় হাসির জন্যে অপমান করলুম?"

বিশ্বপতি বলিল, "মেয়েদের ওই বড় দোষ,—এইমাত্র যে কথা বললে—তখনই সেটা ভুলে যায়, শোন—পণ্ডিত চাণক্য কি বলেছেন মেয়েদের সম্বন্ধে—"

চন্দ্রা রাগ করিয়া বলিল, চাণক্যের কথা তুমিই বোঝ, আমার বুঝবার দরকার নেই, শুনতেও চাই নে।"

বিশ্বপতি বলিল, "যাক, চাণক্য বেচারাকে না হয় নিষ্কৃতি দিলুম,—উলুবনে মুক্তো ছড়িয়ে যে কোন লাভ হবে না—শেষে খুঁজে তুলতে প্রাণান্ত হবে, তা বেশ জানি। হ্যাঁ, রাঙাবউয়ের কথা বলছিলে তো? দেখেছিলে তো, সে কি রকম সুন্দরী ছিল?"

চন্দ্রা কেবলমাত্র মাথাটা কাত করিল।

বিশ্বপতি বলিল, "অমন রূপ গুণ কি আমার মত লোকের কুঁড়ে ঘরে মানায়? এ যেন বানরের গলায় মুক্তার মালা পড়েছিল, —বানরে তার কোনও মর্য্যাদা বুঝলে না—রাখলেও না। তার যা ছিল, তাতে তাকে মানাত রাজার ঘরে। আমি তাকে স্ত্রীর সম্মানটুকু পর্য্যন্ত দিতে পারি নি। কেন দিতে পারি নি, সে কথা—"

সে থামিয়া গিয়া চন্দ্রার বিবর্ণ মুখখানার পানে তাকাইল।

বহুদিনকার পুরাতন একটা জনশ্রুতি চন্দ্রার মনে পড়িয়া গিয়াছিল; নন্দা—বিশ্বপতি—কল্যাণী, আরও কত কি।

চন্দ্রা অন্যমনস্ক ভাবে তাহাই ভাবিতেছিল। হঠাৎ বিশ্বপতির কথা থামিয়া যাইতেই, সে সচকিত হইয়া মুখ তুলিতে দেখিতে পাইল, সে তাহারই মুখের উপর নীরবে দুইটী চোখের দৃষ্টি তুলিয়া ধরিয়াছে।

চন্দ্রা বড় অস্বস্তি বোধ করিল। একটু নড়িয়া সরিয়া বসিয়া অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল, "তার পর—"

বিশ্বপতি জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের তার পর? তুমি বড় অন্যমনা হয়ে পড়েছ চন্দ্রা—"

চন্দ্রা জোর করিয়া মুখে হাসি টানিয়া আনিল, বলিল, "সত্যিই তাই, একটা কথা ভাবছিলুম।"

"বুঝেছি—আচ্ছা, একটু পরে কথা হবে এখন।" শ্রান্তভাবে বিশ্বপতি শুইয়া পড়িল।

২৪

ঘরের মধ্যে ভাত দেওয়া হইয়াছিল। বিশ্বপতিকে ডাকিতে পাঠাইয়া চন্দ্রা বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া ছিল।

জাতির ব্যবধান সে সন্তর্পণে বাঁচাইয়া চলিয়াছে। সেই জন্য কেবল মাত্র বিশ্বপতির জন্যই ব্রাহ্মণী নিযুক্ত হইয়াছে। চন্দ্রা খুব দূরে দূরে থাকে, যেন কোনক্রমে শুচিতা নষ্ট না হয়।

আত্মভোলা এই লোকটী এত দিনের মধ্যে বুঝিতে পারে নাই—চন্দ্রা সব সময় নিকটে থাকিয়া কেবল মাত্র দুই বেলা তাহার খাওয়ার সময়টিতেই সরিয়া যায় কেন।

আজ আহারের সময় ব্রাহ্মণী উপস্থিত না থাকাতেই মুস্কিল বাধিয়া গেল; চন্দ্রার কারসাজি ধরা পড়িয়া গেল।

চন্দ্রা দরজার কাছে বসিয়া ছিল। কিছুতেই ঘরের মধ্যে আসিল না দেখিয়া বিশ্বপতি একটু হাসিল মাত্র, তখনকার মত কিছুই সে বলিল না।

আহার সমাপ্তে আচমন করিতে করিতে চন্দ্রার পানে তাকাইয়া হাসিমুখে সে বলিল, "জাতের বালাই আমি রাখতে চাইনে; অথচ তুমি জোর করে রাখাও—এর মানে?"

চন্দ্রা দৃঢ় গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "পুরুষেরা চিরদিনই উচ্ছৃঙ্খল হয়ে থাকে। ওরা বাঁধন-হারা জীবন নিয়ে চিরদিনই ছুটতে চায়, মেয়েরাও যদি তাদের মত উচ্ছৃঙ্খল বাঁধনহারা জীবন ভোগ করতে চায়, তবে সবই যে যাবে, কিছুই থাকবে না। পুরুষের উদ্দাম গতি নিয়ন্ত্রিত করবার জন্যেই তো মেয়েদের দরকার। গতির বেগ সবারই সমান হলে তো চলবে না।"

বিশ্বপতি বলিল, "আজকাল বেশ কথা শিখেছ তো চন্দ্রা?"

চন্দ্রা উত্তর দিল না।

বিশ্বপতি একটা পাণ মুখে দিয়া বলিল, "যাক, জাতের সম্বন্ধে আশ্বস্ত রইলুম। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, বলব আমার জাত যায় নি। কিন্তু মন তো

এ কৈফিয়তে খুসি হয় না চন্দ্রা। জিজ্ঞাসা করি—ভাতের হাঁড়ির মধ্যেই কি আমার জাতটা সীমাবদ্ধ রয়েছে ?”

চন্দ্রা আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “মানে ?”

বিশ্বপতি উত্তর দিল, “মানে খুবই সোজা, জলের মত পাতলা। এর মধ্যে শক্ত তো কিছুই নেই চন্দ্রা, যা বুঝতে দেরী হবে। ছোঁওয়া ভাত খেলেই আমার যে জাত চলে যায়, সে জাত যাক না কেন, অমন ঠুনকো জিনিস নাই থাকল। জাত আঁকড়ে থেকে তো লাভ নেই, বরং মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার লাভ আছে।”

চন্দ্রা খানিক চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, “জাত রাখার দরকার না বুঝে সেকালের লোকেরা তৈরী করেন নি।”

বিশ্বপতি বলিল,—“ওইখানেই যে দারুণ ভুল করে গেছেন। একটা মানুষ-জাতের মধ্যে হাজার জাত তৈরী করে তাঁরা যে গণ্ডী দিয়ে গেছেন, সেই গণ্ডীর জন্যেই না আজ এ রকম ভাবে আমরা ধ্বংস হচ্ছি। আমরা মুখে পরিচয় দিই আমরা বিরাট হিন্দুজাতি, কিন্তু ভাবো দেখি, এই বিরাটকে কত শত খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে ? এর মধ্যে কত জলচল কত অজলচল হিসেব করলে তো স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়! এগুলো রাখার উপকারিতা কি ? এতে সমাজের, দেশের, দশের কি উপকার হবে, তা আমায় বুঝিয়ে দিতে পারো ?”

চন্দ্রা মাথা নাড়িল, “আমি জাতে বাগ্দী, কি করে বুঝাব ?”

বিশ্বপতি মৃদু হাসিল, বলিল, “তোমার মনের ও-গলদ কিছুতেই কাটবে না দেখছি। বাপরে, কি তোমরা মেয়ে জাত, সংস্কারগুলোকে এমন করে আঁকড়ে ধরেছ—মরলেও ছাড়বে না।”

চন্দ্রা বলিল, “তাই বটে। কিন্তু এও মনে রেখো, তোমরা ভেঙ্গে যাও, আমরা কেবল গড়ে যাই। আর গড়তে গেলে সংস্কারেরই দরকার হয়। ছোট মেয়েটী ঘর গুছায়, রান্না-বান্না করে পাঁচজনকে খাওয়ায়, সেই আবার মা হয়ে সন্তান প্রতিপালন করে, অথচ শিক্ষা হয় তো সে কারও কাছে পায় নি। তবে এ বোধশক্তি তার আসে কোথা হতে ? তুমি কি বলবে না এ তার সংস্কার,—তার সংস্কারই তাকে গঠন করতে, পালন করতে প্রবৃত্তি দিয়েছে ?”

বিশ্বপতি বলিল, “শোন চন্দ্রা, তর্ক করতে গেলে ঢের তর্কই করা যায়, যার কেবল কথায় মীমাংসা হয় না। আমি যখন তোমার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছি, তখন তুমি যা ব্যবস্থা করবে, আমায় তাই পালন করে যেতে হবে, আমি কেবল এইটাই মেনে চলব। তোমার সংস্কার তোমার থাক, আমার মত আমার থাক, কি বল ?”

চন্দ্রা বিষণ্ণ মুখে একটু হাসিল।

“কিন্তু আমি একটা কথা ভাবি,—এক এক সময় তুমি বেশ জ্ঞানীর মত কথা বল, এক এক সময় অমন জ্ঞানহারা হও কেন বল দেখি ?”

বিশ্বপতি মাথাটা কাত করিয়া বলিল, “ঠিক, আমিও ভাবছি কখন তুমি এই প্রশ্নটা করবে। কেন হই তা তুমি জানো তো চন্দ্রা। এ কথা আর কেউ জিজ্ঞাসা করলেও করতে পারে, তোমার জিজ্ঞাসা করা মানায় না।”

চন্দ্রা বলিল, “তবু জিজ্ঞাসা করছি—তোমার মুখ হতে স্পষ্ট কথা শুনতে চাই। শুনেছিলুম নন্দার জন্যেই তুমি নিজেকে পতিত করেছ—”

বিশ্বপতি বাধা দিল, “হ্যাঁ,—আমার পতিত হওয়ার কারণ সেই মেয়েটীই বটে। কিন্তু এর জন্যে তাকে তুমি অভিশাপ দিতে পার না চন্দ্রা। আমাকেই দোষ দাও। দোষী সে নয়—আমি। আজ এই প্রথম তোমার কাছে বলছি চন্দ্রা—জানি তোমার মনে ব্যথা লাগবে,—জানি তুমি আমায় কতখানি স্নেহ কর, কতখানি ভালোবাসো, সেই ভালবাসার জন্যেই কতখানি ত্যাগ করেছ। আমায় হয় তো ঘৃণা করবে চন্দ্রা, কারণ, আমিও তোমায় এ পর্য্যন্ত জানিয়ে এসেছি—আমি তোমায় ঠিক অতখানিই স্নেহ করি—ভালোবাসি। এই ছলনার মধ্যে এতটুকু ফাঁক কোন দিন দেখতে পেয়েছ চন্দ্রা ? না, তা পাও নি। পাছে আলগা হয়ে আসে তাই আমি বাঁধনের পর বাঁধন চাপিয়ে গেছি, বোঝার পর বোঝা চাপিয়ে দিয়েছি ; আলগা হতে এতটুকু সুযোগ দিই নি। আজ নন্দা পরের স্ত্রী, আমি পরের স্বামী। আমাদের মাঝখানে অনন্ত অসীম ব্যবধান জেগে রয়েছে। মরণের ওপারে গিয়েও যে কেউ কাউকে পাব, সে আশা আমি করি নে, সে বিশ্বাসও আমার নেই ; কেন না পরজন্ম—পরলোক তোমরা মানতে পার, আমি মানি নে। আমি জানি মাটির কোলে জন্মেছি, এখান হতে লক্ষ আশা আকাঙ্ক্ষার লয় এখানেই হয়ে যাবে। উর্দ্ধে বা অধঃ কোন দিকেই আমার পথ নেই। আমার

মাটি-মা নিজেই আমায় তার বুকে টেনে ঘুম পাড়াবে,—বস্, এইটুকুই শেষ।"

চন্দ্রা একটা নিঃশ্বাস ফেলিল—অতি গোপনে—যেন বিশ্বপতির কাণে না যায়। বলিল, "কিন্তু নন্দাকে ভালোবেসে তোমার শান্তি হল কি, তুমি পেলে কি?"

বিশ্বপতি শুধু হাসিল, "শুধু জ্বালা, বেদনা ছাড়া আর কিছুই পেলুম না। একদিন, জানো চন্দ্রা—প্রথম যখন আমি নন্দাকে ভালোবেসেছিলুম, সেদিন নীল আকাশকে সাক্ষী করে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম তাকে ছাড়া আর কাউকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করব না, আর কোনও নারীকে ভালোবাসব না, আর কোনও নারীর দেহ স্পর্শ করব না—"

আর্দ্রকণ্ঠে চন্দ্রা বলিল, "কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা তো অটুট রইল না।"

বিশ্বপতির মুখের উপর ক্লান্তির ছায়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। শ্রান্তকণ্ঠে সে বলিল, "না, রইল না; কেন রইল না বলি। যেদিন শুনলুম নন্দার বিয়ে হয়ে গেল, যেদিন দেখলুম তার মুখে হাসি ফুটে উঠেছে, যেদিন শুনলুম নিজের মুখে সে বললে অসমঞ্জের সঙ্গে বিয়ে হওয়ায় সে সুখী হয়েছে, সেইদিন আমার চোখের উপর হতে একটা কালো পর্দ্দা খসে পড়ে গেল, আমি এক নিমেষে সমস্ত জগৎটাকে যেন স্পষ্ট দেখতে পেলুম। সেইদিন হতে আমার জীবনের ওপরে দারুণ বিতৃষ্ণা এলো,—আমি ইচ্ছা করেই নিজেকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে চললুম। মা একবার বলতেই আমি কল্যাণীকে বিয়ে করলুম। তার পর তোমাকে ধ্বংস করলুম—মনে পড়ে চন্দ্রা? তুমি কোথায় ছিলে, তোমাকে টেনে নিয়ে এসেছি কোথায়? বাগ্দীর ঘরে জন্ম নিলেও হিন্দুর আদর্শ সীতা সাবিত্রীর সম্পদই তো তোমার ছিল। সে সম্পদ চুরি করলে কে, আমিই নই কি?"

চন্দ্রার চোখে জল আসিয়াছিল, সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিতে লাগিল।

কাহাকে সে ভালোবাসে, কাহার জন্য সেও সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছে? সে কি এই বিশ্বপতিই নহে? গ্রামে থাকিতে অপর্য্যাপ্ত কলঙ্ক দুই হাতে কুড়াইয়াছে। কেবল মাত্র বিশ্বপতিকে রক্ষা করিবার জন্যই সে সহরে পলাইয়া আসিয়াছিল। এখানে অতখানি প্রতিষ্ঠা, অর্থ, সম্পদ লাভ করিয়াও সে সব বিসর্জ্জন দিয়াছে—সে কি এই লোকটার জন্যই নহে? অভাগিনী কল্যাণী আজ গৃহত্যাগিনী, কলঙ্কের পসরা মাথায় লইয়া দীনা হীনা কাঙালিনীর মত কোথায় কোন্ পঙ্কের মাঝে নিজের স্থান খুঁজিয়া লইয়াছে—সেও কি ইহার জন্য নয়? কেবলমাত্র কর্ত্তব্যনিষ্ঠাটুকু সম্বল করিয়া কয়টা নারী বাঁচিয়া থাকিতে পারে? তবু তাহার উপর কেবলমাত্র কর্ত্তব্যের খাতিরে বিশ্বপতির যে আকর্ষণটুকু ছিল, চন্দ্রার উপর তাহাও নাই। তবু চন্দ্রা তাহাকে তেমনি গভীর ভাবে ভালোবাসে, যেমন সর্ব্বপ্রথমে ভালোবাসিয়াছিল।

চন্দ্রা চোখ ফিরাইয়া প্রশ্ন করিল, "নন্দা আজও তোমায় ভালবাসে?"

বিশ্বপতি উত্তর দিল, "বাসে—কিন্তু সে ভালোবাসা অন্য ধরণের। বোন যেমন তার ভাইকে ভালোবাসে, মা যেমন তার সন্তানকে ভালোবাসে, নন্দা আমায় সেই রকম ভালোবাসে। আজ ভাবি চন্দ্রা,—হ্যাঁ, দিনরাত নেশায় ভোর হয়ে থাকি বলে যে ভাবি নে তা নয়,—আমি ভাবি—যদি সেদিন তোমার এখানে না এসে আমি বরাবর নন্দার কাছে যেতুম, আমি মানুষ হয়েই বাঁচতুম, এ রকম জানোয়ার হতুম না। তুমি আজ যত সংযত ভাবেই থাক, যত সৎই হও, তবু তুমি তুমিই, নন্দার পায়ের ছায়া স্পর্শ করিবার অধিকার তোমার নেই,—তুমি চিরদিন সকলের সামনে ঘৃণিতা হয়েই থাকবে। তুমি নিজেই পাঁকের মধ্যে পড়ে আছ, আমায় তুমি তুলে ধরবে সে শক্তি তোমার কই? তার সে শক্তি আছে। সে আমায় ভদ্রভাবে ভদ্রসমাজে নিয়ে যেতে পারত, আমার জীবন আলোয় উজ্জ্বল করে দিত, অন্ধকারের মধ্যে এমন করে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আমায় মরতে হতো না।"

হাত দু'খানা আড়াআড়ি ভাবে চোখের উপর চাপা দিয়া বিশ্বপতি নিস্তব্ধে পড়িয়া রহিল।

চন্দ্রা হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিল, "যাবে?"

বিশ্বপতি হঠাৎ চমকাইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায়?"

চন্দ্রা বলিল, "নন্দার কাছে? আমি তোমায় এখনি সেখানে পাঠিয়ে দেব।"

বিশ্বপতি হাসিল, ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "মুখ দেখানোর মুখ নেই চন্দ্রা। পথ হয় তো আছে, কিন্তু সে পথে কাঁটা ফেলা। ওর কাছে যাওয়ার পথ আমার চিরদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে গেছে। যে মুখ একদিন ওকে দেখিয়েছি, সে মুখে নিজের হাতে কালি মেখেছি।"

চন্দ্রা বিকৃত কণ্ঠে বলিল, "পথের কাঁটা তুলতে পারা যায়, মুখের কালিও মুছে ফেলা যায়।"

গম্ভীর মুখে বিশ্বপতি বলিল, "হ্যাঁ, তা হয় তো যায়; মনের কালি ওঠে না চন্দ্রা, সেখানকার কাঁটাও ওঠে না। আমার মনের স্মৃতির পাতাগুলি যে কালিতে ভরে গেছে, সে কালি আমি মুছতে পারব কি? তুমি কি মনে ভাবছ, আমার অধঃপতনের এই কাহিনী তার কাণে পৌছায় নি? একদিন মাতাল অবস্থায় তার স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে নির্ব্বাকে আমার পানে তাকিয়ে ছিল। সে কি তার স্ত্রীকে গিয়ে এ কথা বলে নি?"

চন্দ্রা নতমুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বিশ্বপতি উদাসভাবে বাহিরের পানে তাকাইয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চন্দ্রার কোনও সাড়া না পাইয়া সে মুখ ফিরাইল—"চন্দ্রা, কাঁদছ?"

চন্দ্রা তেমনই মাথা নত করিয়া রহিল। নিঃশব্দে চোখের জল তাহার আরক্তিম গণ্ড দুইটী ভাসাইয়া দিতে লাগিল।

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিশ্বপতি বলিল, "ওই দেখ, ওই তো তোমাদের দোষ। কথা শুনতে চাইবে অথচ তা সইবার ক্ষমতা নেই। ওই জন্যেই আমি এত কাল কোন কথা বলি নি, আজও বলতে চাচ্ছিলুম না, নেহাৎ জানতে চাইলে বলেই সব কথা বলে ফেললুম।"

কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া চন্দ্রা বলিল, "না, সে জন্যে আমি এতটুকু কষ্ট পাই নি। আমি ভাবছি, তোমার ইহ-পরকাল যে সব গেল, এর জন্যে দায়ী কে,—আমিই নই কি?"

বিশ্বপতি শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "দায়ী কেউ নয়, দোষী কেউ নয়; দোষী আমি—দায়ী আমি। কিন্তু চন্দ্রা—আমায় এখান হতে যেন বিদায় করে দিয়ো না। যখন আশ্রয় দিয়েছ তখন থাকতে দিয়ো। তুমি যা খুসি তাই কর—আমি তাতে আপত্তি করব না, তাকিয়েও দেখব না। আমায় কোণের দিকে একটা ঘর দিয়ো, দিনে কিছু করে মদ দিয়ো, দু'বেলা দু'টো দু'টো করে ভাত আর ক'খানা কাপড় দিয়ো—বস্, আমার দিন বেশ কেটে যাবে।"

চন্দ্রা মুখ ফিরাইয়া চোখের জল মুছিতেছিল। ঠোঁটের উপর একটু হাসির রেখা ফুটাইয়া তুলিয়া বলিল, "দেখা যাবে। আসল কথা বল, আমায় তোমার অসহ্য বোধ হয়েছে; সেই জন্যই তফাতে থাকবার ব্যবস্থা করার কথা বলছ। বেশ, আমি আজ হতে তোমার আলাদা ব্যবস্থা করে দেব এখন।"

ধীরে ধীরে সে উঠিয়া পড়িল। বিশ্বপতি বিস্মিত নয়নে এই অদ্ভুত মেয়েটীর পানে তাকাইয়া রহিল। তাহার পানে না তাকাইয়া চন্দ্রা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

সুনীল আকাশের এক কোণে একখানা মেঘ জমিয়া উঠিয়াছে। এদিক হইতে বাতাসে ভাসিয়া দুইখানি মেঘ তাহার পানে ছুটিয়াছে। তাহারা পরস্পর মিলিতে গিয়া মিলিতে পারিল না; একটী বড় মেঘখানির সহিত মিশিয়া গেল, অপরখানি পাশ কাটাইয়া অনির্দ্দিষ্টের পানে ছুটিয়া চলিল।

কত দিন এমন কত দৃশ্য চন্দ্রার নয়ন-সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়াছে,—সে দেখিয়াও দেখে নাই, আজ সে দেখিল।

ওই বৃহতের পানে লক্ষ্য রাখিয়া সকলেই ছুটিয়াছে। কত লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র আসিয়া বৃহতের সহিত মিশিয়া তাহাকে বৃহত্তর করিয়া তুলিতেছে। দূর হইতে ক্ষুদ্রতম কত খণ্ড যে ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া মিলিতে পায় না, অসীম আকাশে দিশা হারাইয়া লক্ষ লক্ষ যুগ তাহাদের ফিরিতে হয়, সে সন্ধান কে রাখে, কে তাহাদের পানে তাকায়?

চন্দ্রা আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, রেলিংয়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে ঝর ঝর করিয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিল।

২৫

তাড়াতাড়ি ট্রাম হইতে নামিতে গিয়া কি করিয়া পা বাধিয়া পড়িয়া গিয়া মাথায় দারুণ আঘাত পাইয়া বিশ্বপতি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে তাহার চেতনা ফিরিয়া আসিল। নিজের চারি দিকে এত লোকজন দেখিয়া সে খানিক বিস্মিতভাবে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল।

যাহারা তাহার সেবার ভার লইয়াছিল তাহারা ছাড়া যাহারা কেবলমাত্র ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—চলিয়া গেল।

বিশ্বপতি উঠিবার উদ্যোগ করিতে একটী ছেলে বলিল, "আর খানিকটা শুয়ে থাকুন মশাই, ডাক্তার বলেছেন আর কুড়ি পঁচিশ মিনিট আপনাকে শুয়ে থাকতে হবে।"

বিশ্বপতি একটু হাসিয়া বলিল, "যে ডাক্তার এ রকম ভাবে শুয়ে বিশ্রাম নেওয়ার ব্যবস্থা করেন,

তিনি আমাদের মত গরীব লোকদের জন্যে তৈরী হন নি মশাই। এ-সব গরীবের ব্যবস্থা অত ঘড়ি ধরে করতে গেলে চলে না। পড়ে গেলেও আমাদের তখনি উঠতে হয়, খাটতে হয়, আবার—"

বলিতে বলিতে মুখ তুলিয়া সে ছেলে কয়টীর পানে তাকাইয়া হঠাৎ নীরব হইয়া গেল।

যে ছেলেটীর হাতে পাখা ছিল সে জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কি মশাই?"

বিশ্বপতি উত্তর দিল না। পিছনে যে ছেলেটী আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া ছিল তাহার পানে তাকাইয়া সে যেন আঘাতের দারুণ বেদনাও ভুলিয়া গেল।

"নিমাই—"

নিজের রূঢ় কণ্ঠস্বরে নিজেই সে চমকাইয়া উঠিয়া নীরব হইয়া গেল।

নিমাই অগ্রসর হইয়া আসিল। তাহার বিবর্ণ মুখে একটু হাসি। তাহা যেমন ক্ষীণ, তেমনিই মলিন—যেন জোর করিয়া টানিয়া আনা।

বিস্মিত ছেলে কয়টীর পানে তাকাইয়া নিমাই বুঝাইয়া দিল—"আমাদের গাঁয়ের লোক, আমাদের বিশুদা, বুঝলি রে সমীর।"

সমীর ছেলেটী যেন হাঁফ ফেলিয়া বাঁচিল, বলিল, "ওঃ, সেই জন্যেই বুঝি তুমি অমন করে ছুটে এলে, বুক দিয়ে পড়ে সেবা করলে নিমাইদা? তাই বল—তোমার দেশের লোক কি না—সেই জন্যই—"

নিমাই বাধা দিল, "থাম থাম, পাগলামো করিস নে। আমার বিশুদা বলে আমি না হয় সেবা করলুম, তোরা করলি কেন বল তো? একা আমার গুণই গাস নে ভাই, তোদের না পেলে বিশুদাকে ওখান হতে উঠিয়ে এখানে আনতুম কি করে? যাক, এবার একখানা ট্যাক্সি ডাক দেখি, বিশুদাকে বাড়ী নিয়ে যাই।"

বিশ্বপতি যেন আকাশ হইতে পড়িল, "বাড়ী যাব,—কার বাড়ী?"

নিমাই দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "আমার বাড়ী। আপত্তি করো না বিশুদা, জোর করতে চেয়ো না। আর তুমি জোর করলেও আমি শুনব না, তোমায় দুই হাতে তুলে গাড়ীতে তুলব। দুষ্টুমী ছেড়ে দিয়ে —যা বলি, সুবোধ ছেলের মত তাই শোন দেখি। মাথায় আর হাতে খুব চোট লেগেছে। তোমায় দু'দিন এখন চুপচাপ শুয়ে বসে থাকতে হবে— উঠতে পাবে না। গরম গরম লুচি দুধ খেয়ে গায়ে জোর আনতে হবে—এই হচ্ছে তোমার এখনকার ব্যবস্থা। কি বলিস রে, তোরা সব বোবার মত চুপ করে রইলি কেন, কথা বল্ না।"

রমেশ ছেলেটী মেডিক্যাল কলেজে পড়ে, বিজ্ঞের মত মাথা দোলাইয়া বলিল, "ঠিক, আর ফলও তার সঙ্গে খেতে হবে।"

নিমাই বলিল, "নিশ্চয়ই—বাঁচা তো চাই। আপত্তি করো না বিশুদা, তোমার আপত্তি কিছুতেই টেকবে না জেনে রেখো। যে চেহারা হয়েছে —এতে এই আঘাত পেয়েছ। আজ যদি তোমায় ছেড়ে দিই,—কেবল শুশ্রূষা আর পথ্যের অভাবেই তুমি মারা যাবে তা আমি বেশ বুঝছি।"

বিশ্বপতি স্তম্ভিত ভাবে নিমাইয়ের পানে তাকাইয়া রহিল। সে শুনিয়াছে—কল্যাণী নিমাইয়ের সহিত গৃহত্যাগ করিয়াছে, এখনও সে নিমাইয়ের বাড়ী আছে।

কিন্তু নিমাইকে দেখিলে বিশ্বাস হয় না কল্যাণীকে সে লইয়া আসিয়াছে। তাহার কথা-বার্ত্তা আগেকার মতই সরল, বাধাশূন্য শিশুর মতই। তেমনই হাসি আজও তাহার মুখে লাগিয়া আছে। নিমাই যদি কল্যাণীকে তাহার বাড়ী রাখিত, সে কি তাহা হইলে বিশ্বপতিকে জোর করিয়া সেই বাড়ীতেই লইয়া যাইবার কথা মুখে আনিতে পারিত?

অবিলম্বে ট্যাক্সি আসিয়া দাঁড়াইল।

বন্ধুদের সাহায্যে নিমাই বিশ্বপতিকে গাড়ীতে তুলিল, বিশ্বপতির আপত্তি কেহ কাণে তুলিল না।

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া বিশ্বপতি হতাশ ভাবে হেলান দিয়া বসিয়া রহিল।

তাহার হতাশ ভাব দেখিয়া মৃদু হাসিয়া নিমাই বলিল, "ভাবছ কেন দাদা, তুমি যেখানে থাক, আমি সেখানে খবর পাঠিয়ে দেব এখন। অনেক দিন ধরে তোমার অনেক খোঁজ করেছি, কিন্তু কোন অন্ধকার খনিতে যে মণি হয়ে জলছ, সে খবর কেউ দিতে পারে নি। সেবার দেশে গিয়ে শুনলুম, তুমি নন্দার বাড়ী যাচ্ছ বলে বাক্স বিছানা নিয়ে রওনা হয়েছ। তার পর তোমার আর কোনও উদ্দেশ নেই। এখানে নন্দার বাড়ী খোঁজ নিলুম—শুনলুম তারাও তোমার কোনও সন্ধান জানে না। আজ ভগবান নেহাৎ দয়া করে পথের মাঝখানে তোমায় মিলিয়ে দিলেন দাদা; এ কথা হাজারবার বলব। তাজা অবস্থায় থাকলে হাজার ডাকলেও মুখ ফিরিয়ে চলে যেতে সে জানা কথা।

নেহাৎ না কি বড় কায়দায় পড়েছে—নড়বার ক্ষমতা নেই, বেশী কথা বলবার ক্ষমতা নেই,—তাই আমার হাতের সেবাও তোমায় নিতে হল, বাধ্য হয়ে আমার বাড়ীতেও তোমায় যেতে হচ্ছে।"

দৃপ্ত হইয়া উঠিয়া বিশ্বপতি বলিল, "থাম থাম নিমাই, তোর ও-সব কথা শুনতে আমার মোটেই ভালো লাগছে না, আমার মাথার মধ্যে কি রকম করছে।"

খুব নরম সুরে নিমাই বলিল, "ভালো লাগবে দাদা, যখন শুনতে পাবে বাস্তবিকই আমি অপরাধী নই, আমি নির্দ্দোষ। তোমরা যে যাই বল, সকলেই জানো আমি দোষী, কিন্তু আমি জোর করে বলছি—আমি দোষী নই। আমার মাকে জানো তো,—এও জানো আমার মা আমার সব কথাই জানেন। তিনি আমার এত বড় একটা দোষ উপেক্ষা করে কখনই আমার কাছে থাকতে পারতেন না। এই যে বাড়ী এসেছে, গাড়ী রাখো। বিশুদা, এখানে তোমায় নামতে হবে, আমার মা এখানে আছেন।"

বন্ধুরা সঙ্গে আসে নাই। বিশ্বপতিকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া তাহারা চলিয়া গিয়াছিল। নিমাই বাড়ীর চাকরদের সহায়তায় বিশ্বপতিকে গাড়ী হইতে নামাইয়া লইয়া গিয়া একটা ঘরে বিছানায় শোয়াইয়া দিল।

দুর্ব্বল বিশ্বপতি খানিকটা দম লইতেছিল। নিমাই বলিল, "কোথায় থাক ঠিকানাটা বল, কাউকে সেখানে পাঠিয়ে দি।"

বিশ্বপতি মাথা নাড়িল, বলিল "খবর কোথাও পাঠাতে হবে না নিমাই, সন্ধ্যে নাগাৎ আমি চলে যাব এখন।"

নিমাই পার্শ্বে একখানা চেয়ারে বসিয়া বলিল, "দেখা যাবে এখন। সেজন্যে এখনই ভাবাবার কোনও দরকার নেই, বিশুদা। এখন একটু গরম দুধ আনছে, সেইটুকু খেয়ে ফেল।"

বিশ্বপতি মাথা নাড়িল, "না, এখন থাক।"

পর মুহূর্ত্তে দুই কনুইয়ের উপর ভর দিয়া উঁচু হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে দুধ আনবে—রাঙাবউ? কল্যাণী?"

নিমাই সশব্দে হাসিয়া উঠিল, "ক্ষেপেছ? তোমার মনের ধারণা দেখছি কিছুতেই দূর করতে পারব না। আচ্ছা, ঠিক কথা বল বিশুদা, সত্যিই তুমি বিশ্বাস করেছ বউদিকে আমি নিয়ে এসেছি, আমার এখানে রেখেছি? শুনেছ তো এখানে আমার মা আছেন। সন্তান যত খারাপই হোক, মাকে সে চিরদিনই দেবীর আসনে রেখে ভক্তি শ্রদ্ধা দিয়ে থাকে। মায়ের সামনে যতক্ষণ সে থাকে, ততক্ষণ তাকে সন্তান হয়েই থাকতে হয়। হাজার পাপ করলেও সে থাকে মায়ের কাছে সেই কোলের শিশুটীর মতই। তুমিও তো মা চেনো বিশুদা, তোমারও তো মা ছিল, বল দেখি—মায়ের সামনে কোনও সন্তান যথেচ্ছাচার করতে পারে কি?"

বিশ্বপতি শুইয়া পড়িল, উত্তর দিল না।

নিমাই বলিল, "হয় তো তুমি ভাবছ, এখানে আমার মা আছেন বলে আমি তাকে এখানে রাখি নি, অন্য জায়গায় রেখেছি। ধারণাটা অসম্ভব নয়, কারণ আমার অর্থের অভাব নেই, তার জন্যে একটা বাড়ী ভাড়া করা—তার খরচ চালানো আমার পক্ষে শক্ত নয়। কিন্তু বিশুদা, আমার কথা শোন, আমি অকপটে তোমার কাছে সত্য কথাই বলব, তাতে তুমি বুঝতে পারবে—আমি দোষী নই।"

এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া সে বলিল, "এ কথা সত্য—বউদিকে আমি এখানে—আমার মায়ের কাছে রাখব বলে এনেছিলুম। ভেবেছিলুম যে পর্য্যন্ত তুমি না এসো তাকে আটক করে রাখব, আমার ধর্ম্মপরায়ণা পবিত্রা মায়ের কাছে থেকে সেও পবিত্র জীবন যাপন করবে। কিন্তু ভুল যে কতখানি করেছিলুম তা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝতে পারলুম। আগে বুঝি নি, যে পালাতে চায় তাকে কিছুতেই ধরে রাখা যায় না। যে নিজেকে ধ্বংস করতে চায়, তাকে রক্ষা করা যায় না। বুঝলুম সেই দিন—যেদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই মা এসে খবর দিলেন বউদিকে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি সমস্ত কলকাতা সহর তন্ন তন্ন করে খুঁজলুম। শেষে জানতে পারলুম সে বাংলায় নেই। যখন আমি তাঁকে খুঁজছিলুম, সে তখন পাটনায় বিশ্রাম করছিল।"

বিশ্বপতি একটা নিঃশ্বাস্ ফেলিল, "একেবারে পাটনা?"

বিকৃতমুখে নিমাই বলিল, "হ্যাঁ। তার পর সেখানে হতে সে বম্বে গিয়ে কোন্ একটা ফিল্মে নেমেছে। এতে তার খুব নাম হয়েছে। হয় তো তুমিও 'পিয়ারা' নামটা শুনে থাকবে।"

বিশ্বপতি বালিসের মধ্যে মুখ লুকাইল।

নিমাই বলিল, "মুখ তোল বিশুদা, অমন করে

ভেঙ্গে পড়ো না। যে তোমার মন ভেঙ্গে দিয়ে, পবিত্র কুলে কালি দিয়ে গেছে, তার সম্বন্ধে এত খোঁজ নেওয়ার দরকার আমার ছিল না। কিন্তু জানি—তোমার সঙ্গে একদিন আমায় মুখোমুখি হতে হবে। সেদিন আমায় কৈফিয়ৎ দিতে হবে। আরও শোন—আরও বলি—সে এখন একটী বিখ্যাত রাজার অন্তঃপুরের শোভাবর্দ্ধন করছে,—আমার তোমার মত পাঁচশ'টা চাকর সে এখন রাখতে পারে।"

বিশ্বপতি তেমনই ভাবে পড়িয়া রহিল। অনেকক্ষণ তাহার সাড়া না পাইয়া নিমাই তাহার গায়ের উপর হাতখানা রাখিল। শান্ত কণ্ঠে ডাকিল,—"বিশুদা—"

বিশ্বপতি মুখ তুলিল।

"তোর বিশুদাকে মাপ কর নিমাই,—তোকে বুঝতে না পেরে অনেক কথাই বলে গেছি ভাই—"

সে উঠিতেই নিমাই তাহাকে ধরিয়া জোর করিয়া শোয়াইয়া দিল,—"করছ কি, উঠো না বলছি। আমি তোমায় বেশ চিনি বিশুদা, তোমার অগাধ বিশ্বাস আর স্নেহই না আমায় সে মহাপাতক হতে রক্ষা করেছে। আমি এগিয়েছিলুম, কিন্তু যখন দেখলুম বউদি তার ভার আমার ওপরেই দিতে এল, সেই মুহূর্ত্তে মনে হল—আমি করছি কি? না, যাক সে-সব কথা। একটা কথা বলি—বউদি এখানে এসেছে,—কাল বিকেলে আমি গড়ের মাঠে মহারাজার সঙ্গে তাকে বেড়াতে দেখেছি। দেখবে কি? তুমি যদি দেখা করতে চাও বিশুদা—"

"থাম নিমাই থাম, কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দিস নে—"

বিকৃত মুখখানার উপর হাত দু'খানা চাপা দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া বিকৃত কণ্ঠে বিশ্বপতি বলিল, "সে আমার কাছে মরে গেছে নিমাই, তার নাম লইবার ক্ষমতাও আমার আর নেই।"

নিমাই একটা নিঃশ্বাস ফেলিল।

২৬

দু'দিন নিমাইয়ের বাড়ীতে কাটাইয়া বিশ্বপতি যেদিন চন্দ্রার বাড়ীতে ফিরিল, সেদিন চন্দ্রা নির্ব্বাক বিস্ময়ে কেবল তাহার পানে তাকাইয়া রহিল।

বিশ্বপতি তাহার সহিত একটা কথাও বলিল না, নিজের জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরটীতে প্রবেশ করিয়া দরজা ভেজাইয়া দিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

সে একাই আসিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু নিমাই তাহাকে একা ছাড়িয়া দেয় নাই। তাহার সঙ্গে সেও আসিয়াছিল। বিশ্বপতিকে শতবার জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার বাসস্থানের কথা নিমাই জানিতে পারে নাই। এই বাড়ীর দরজায় আসিয়াই সে তাহার প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছিল।

একটু হাসিয়া সে বলিয়াছিল, "যাক, দুঃখ বিশেষ নেই বিশুদা, জীবনে চলবার পথ বউদি যেমন খুঁজে নিয়েছে—তুমিও তেমনি পেয়েছ, কেউ কাউকে ছাড়িয়ে যেতে পায় নি। আমার দুর্ভাগ্য যে তোমাদের সঙ্গে আমার মত লোকের পথে চলতে মিল হবে না। সেই জন্যে এখান হতেই খসে পড়লুম;—নমস্কার—"

তাহার কথাগুলা বেশ মিষ্ট হইলেও অন্তরে আঘাত দিয়াছিল বড় বেশী রকম। বিশ্বপতি বিবর্ণ মুখে তাহার পানে তাকাইয়া ছিল, একটী কথা তাহার মুখে ফুটে নাই।

সে যে নিজেই চন্দ্রার বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছে, সে কথা সে ভুলিয়া গেল। যেন চন্দ্রাই তাহাকে আশ্রয় দিয়া তাহার দশদিককার দশটা পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। জগতে তাহার মুখ দেখাইবার উপায় রাখে নাই। এই জন্য তাহার যত ক্রোধ সবই চন্দ্রার উপর গিয়া পড়িল।

বাড়ীতে প্রবেশ করিবার পথের উপর চন্দ্রা দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার উপর দৃষ্টি পড়িতে বিশ্বপতির মুখখানা বিকৃত হইয়া উঠিল। সে পাশ কাটাইয়া দ্রুতপদে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

খানিক পরে আস্তে আস্তে দরজা ঠেলিয়া চন্দ্রা ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল বিশ্বপতি উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া আছে।

তাহার মাথার কাছে সে বসিয়া পড়িল। আস্তে আস্তে মাথার উপর হাতখানা রাখিতেই বিশ্বপতি চমকাইয়া উঠিয়া মুখ তুলিল। চন্দ্রা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল তাহার চোখে জলধারা।

চন্দ্রা আড়ষ্ট ভাবে খানিক বসিয়া রহিল। তাহার পর হঠাৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তুমি কাঁদছ—ওগো, তুমি কাঁদছ—"

বলিতে বলিতে সে নিজেই ঝর ঝর করিয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিল।

বিশ্বপতি লজ্জিত ভাবে চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, "ও কি, তুমি কাঁদলে কেন চন্দ্রা? আমার মনে আজ বড় আঘাত লেগেছে; সেই

জন্যেই হয় তো আমার চোখে জল এসেছে কিন্তু তুমি কেন চোখের জল ফেললে ?"

চন্দ্রা উত্তর দিল না, নিঃশব্দে অঞ্চল দিয়া চোখের জল মুছিতে লাগিল।

বিশ্বপতি নীরবে কতক্ষণ পড়িয়া রহিল। তাহার পর রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কই, জিজ্ঞাসা করলে না চন্দ্রা;—দু'দিন আমি কোথায় ছিলুম, আমার কি হয়েছিল ?"

চন্দ্রা কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিল, "আমি খোঁজ নিয়েছিলুম, তুমি নিমুদার বাড়ীতে আছ।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বিশ্বপতি বলিল, "শুনেছ চন্দ্রা, সে আমায় কতখানি ঘৃণা করে গেছে ? সে বলে গেছে, আমি এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি, যেখানে দাঁড়ানোর ফলে সে আমার সঙ্গে যে তার পরিচয় আছে, এ কথা মুখে আনতে ঘৃণা বোধ করে। জীবনে সে আর কোন দিন আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না।"

চন্দ্রা মাথা নাড়িল, বলিল, "শুনি নি, কিন্তু এই রকমই যে হবে, এমনই করে সকলের কাছ হতে ঘৃণা কুড়াবে, তা আমি জানতুম। যে পথে এসে দাঁড়িয়েছি, এর তুল্য ঘৃণিত পথ আর নেই। যে কেউ আমার সংস্রবে আসবে, সেই সকলের ঘৃণ্য হবে, পরিত্যক্ত হবে। সেই জন্যেই না কেউ না জানতে তোমায় নিজের জায়গায় ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করেছিলুম ?"

"এইবার যাব চন্দ্রা,—জগতের ঘৃণা আমায় সত্য পথ দেখিয়েছে। আমি ওদের ঘৃণা সয়ে আর এখানে থাকতে পারব না। পথে ভিক্ষা করে খাব, গাছতলায় থাকব, সেও ভালো ; তবু এখানে তোমার কাছে রাজার সুখে জীবনটা নষ্ট করব না।"

বিশ্বপতি উঠিয়া বসিয়া খোলা জানালা-পথে বাহিরের পানে তাকাইয়া রহিল।

আশ্চর্য্য মানুষের স্বভাব। মানুষকে যতদিন কাছে পায়, তত দিন তাহার অস্তিত্ব মানুষের কাছে সব সময় অনুভূত হয় না। কিন্তু যখন চলিয়া যাওয়ার সময় হয়, তখন সমস্ত স্নেহ ভালবাসা ঢালিয়া আঁকড়াইয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে।

বিশ্বপতি যত দিন নিজে নড়িতে চায় নাই, তত দিন চন্দ্রা তাহাকে বাড়ীতে অথবা নন্দার কাছে পাঠাইবার জন্য বড় ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। আজ সে নিজেই চলিয়া যাইতে চাহিতেছে। কথাটা বজ্রাঘাতের মতই তাহার বক্ষে বাজিয়া তাহাকে কতক্ষণ নিস্পন্দ নীরব করিয়া রাখিল।

অনেকক্ষণ উভয়েই নীরব,—কি ভাবিতেছিল, কে জানে। বাহিরের পানে চাহিয়া শ্রান্ত বিশ্বপতি মুখ ফিরাইয়া সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ শুনিয়া সচকিত হইয়া মুখ তুলিল।

"এখনও তুমি এ ঘরে রয়েছ চন্দ্রা ? আমি ভেবেছিলুম চ'লে গেছ।"

চন্দ্রা মলিন-মুখে এক-টুকরা হাসি ফুটাইয়া তুলিয়া বলিল, "না, এইবার যাব।"

বিশ্বপতি বলিল, "হাতে কোন কাজ নেই তো, তা হলে একটু বস। আমার কপালটায় একটু হাত বুলিয়ে দেবে কি ? মাথার বড় যন্ত্রণা হচ্ছে।"

নিঃশব্দে চন্দ্রা তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া গেল, "ও, তোমায় একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। ভবানীপুর হতে কে এক ভদ্রলোক তোমায় ডাকতে এসেছিলেন।"

"ভবানীপুর হতে,—আমায় ডাকতে—"

বিশ্বপতি বড় বেশীরকম বিবর্ণ হইয়া গেল।

চন্দ্রা বলিল, "হ্যাঁ, সে ভদ্রলোক তোমায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে মোটর এনেছিলেন।"

উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়া বিশ্বপতি বলিল, "আমায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে এসেছিলেন ? কেন এসেছেন, কেন আমায় নিয়ে যেতে চান, সে কথা কিছু জিজ্ঞাসাও কর নি চন্দ্রা ?"

চন্দ্রা উত্তর দিল, "জিজ্ঞাসা করেছিলুম। তিনি বললেন—নন্দার অসুখ, সে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়।"

নন্দার অসুখ—

বিশ্বপতি একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল।

সে জানে অসুখ খুব বাড়াবাড়ি না হইলে নন্দা সংবাদ দেয় নাই, তাহাকে ডাকে নাই। এখানে এতদূরে সন্ধান লইয়া তাহাকে ডাকিতে লোক পাঠাইয়াছে, হয় তো—

বিশ্বপতি আর ভাবিতে পারিল না, দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিল।

চন্দ্রা ভয় পাইল, জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে, অমন করছ কেন ?"

শুষ্ক হাসিয়া বিশ্বপতি বলিল, "না, কিছুই করছি নে তো ? এখন চন্দ্রা, একবার সেখানে যাই, দেখি কি হয়েছে ?"

সে উঠিয়া পড়িল।

চন্দ্রা জিজ্ঞাসা করিল, "সেখানে মুখ দেখাতে পারবে?"

বিশ্বপতি অগ্রসর হইয়াছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "পারব বই কি। সে যদি ভালো থাকত, মুখ দেখাতে পারতুম না, কিন্তু তার অসুখ, সে আমায় ডেকে পাঠিয়েছে। আমার সব গ্লানি—সব দীনতা চাপা দিয়েও আমায় সেখানে যেতে হবে চন্দ্রা, না গেলে চলবেই না।"

চন্দ্রা কেবল চাহিয়াই রহিল। বিশ্বপতি বাহির হইয়া গেল,—একবার পিছন ফিরিয়াও তাহার পানে তাকাইল না।

গলিটা পার হইয়া বড়রাস্তায় পড়িয়া সে একখানা বাসে উঠিয়া বসিল।

ধর্ম্মতলা মোড়ের নিকট বাস থামিয়া গেল। বাসের পাশ দিয়া একখানি রোলস্ রয়েস্ কার ছুটিয়া যাইতে সামনে কয়খানি মোটরের বাধা পাইয়া থামিয়া গেল।

মোটরে ছিল একটি মেয়ে। বিশ্বপতি যে মুহূর্ত্তে অন্যমনস্কভাবে মোটরের আরোহী সেই মেয়েটির পানে তাকাইল, সেও সেই সময় চোখ তুলিল।

বিশ্বপতির মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইল। আবার যখন সে মুখ তুলিয়া চাহিল, তখন কারখানি ভিড় ঠেলিয়া আস্তে আস্তে অগ্রসর হইয়াছে। মেয়েটি এমনভাবে অপর পার্শ্বে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে যে, তাহার সুগৌর একখানি হাত ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না।

'কল্যাণী'—

বিশ্বপতির মুখে এই একটি শব্দই ভাসিয়া আসিল। সে অধর দংশন করিল।

হ্যাঁ, এ সেই কল্যাণী, বিশ্বপতির রাঙাবউ। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই সুন্দর সুডৌল হাত দু'খানি। প্রভেদ এই—সে আজ বহুমূল্য বসন-ভূষণে সজ্জিতা। তবুও তাহাকে দেখিয়া চিনিতে বিশ্বপতির এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় নাই। একদিন নয়, দু'দিন নয়, দীর্ঘ পাঁচ বৎসর সে বিশ্বপতির গৃহলক্ষ্মী, সহধর্ম্মিণী হইয়া বাস করিয়াছিল। আজ সে যতই কেন না নিজেকে পরিবর্ত্তিত করুক, বিশ্বপতির চোখকে প্রতারিত করিতে পারিবে না।

সেও চিনিয়াছে, তাই তাহার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আত্মগোপন মানসেই সে ওদিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল।

অভাগিনী—

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়াই বিশ্বপতি চমকাইয়া উঠিল। কে অভাগিনী, কল্যাণী? না, সে তখন রাজার রাণী। তাহার মত সৌভাগ্য কাহার? সে যথেষ্ট যশ পাইয়াছে, অর্থ পাইয়াছে, সামান্য সেই পল্লীর কথা—সেই কুটীরখানির কথা—আর এই দীনতম স্বামীর কথা তাহার মনে হয় কি?

মনে হইয়াও কাজ নাই; কল্যাণী সুখী হোক; ভগবান, উহাকে সুখী কর।

২৭

নন্দার কঠিন ব্যারাম।

একদিন হঠাৎ পড়িয়া গিয়া সে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিল। চব্বিশ ঘণ্টা পরে সে জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়াছিল; কিন্তু সে জ্ঞান বেশীক্ষণ স্থায়ী হইতেছিল না।

অসমঞ্জ অধীর হইয়া উঠিয়া যেখানে যত ডাক্তার কবিরাজ ছিল সব আনিয়া ফেলিয়াছিল,— ফকীর, সন্ন্যাসী, কাহাকেও সে বাদ দেয় নাই। যেমন করিয়াই হোক, নন্দাকে তাহার বাঁচানো চাই, নহিলে তাহার সবই মিথ্যা হইয়া যাইবে।

সেদিন প্রভাতে জ্ঞান হইতে নন্দা যখন বিশ্বপতিকে একবার দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করিল, তখন তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্যই অসমঞ্জ তাহার জনৈক কর্ম্মচারীকে বিশ্বপতির বাসার ঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়াছিল। সেই ভদ্রলোকই অনেক খুঁজিয়া দীর্ঘ দুই ঘণ্টা পরে বিশ্বপতির সন্ধান পাইয়াছিলেন।

বিশ্বপতি যখন সে বাড়ীতে গিয়া পৌছিল, তখন নন্দা আবার মূর্চ্ছিতার মতই পড়িয়া আছে। বিশ্বপতিকে দেখিয়াই অসমঞ্জ তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিল, "এসেছ বিশুদা, দেখছ—তোমার স্নেহের বোনটীর কি অবস্থা হয়েছে। বাঁচবার কোন আশা নেই,—কখন কি হয়ে পড়বে তার ঠিক নেই। ডাক্তার বলে দিয়েছে, হার্ট ভারি দুর্ব্বল, যে-কোন সময়ে হার্টফেল হয়ে মারা যেতে পারে।"

বিশ্বপতি আড়ষ্ট ভাবে নন্দার বিছানার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। শুষ্ক নেত্রে চাহিয়া দেখিতে

লাগিল, সেই নন্দার কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়া গেছে, চেনার যো নেই।

আজ কয়দিনকার ব্যায়ামের যন্ত্রণায় তাহার সোনার মত রং কালি হইয়া গেছে, চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে। সে বিছানায় পড়িয়া আছে যেন একগাছি শুষ্ক ফুলের মালা,—ফুলের দলগুলি শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে,—আছে দুই একটী শুষ্ক দল সহ বোঁটাগুলি। সাক্ষ্য দিতেছে—একদিন সে রূপে গন্ধে অতুলনীয় দলগুলিকে তাজা অবস্থায় একত্র গাঁথিয়া রাখিয়াছিল,—একদিন সেই ফুলগুলি জগতের নয়ন তাহাদের দিকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল।

আজ তাহার রূপ গিয়াছে, গন্ধ গিয়াছে,—আছে শুধু তাহার থাকার চিহ্নটুকু।

আস্তে আস্তে কখন বিশ্বপতির চোখ দুইটী জলে ভরিয়া উঠিল, চোখের পাতা দুইটী ভিজিয়া ভারি হইয়া গেল; সে নন্দার পার্শ্বে বসিয়া পড়িল।

আর্দ্র কণ্ঠে অসমঞ্জ বলিল, "আজ তের দিন ঠিক এই ভাবেই পড়ে আছে বিশুদা, এই তেরটা দিন আমার যে কি উৎকণ্ঠায় কেটেছে তা কেউ জানে না। কাউকেই দেখাতে তো বাকি রাখছি নে বিশুদা, যে যা বলছে তাই করছি, পয়সার দিকে চাই নি। যেমন করেই হোক আমার শেষ পয়সাটীও ব্যয় করে আমি ওকে বাঁচিয়ে তুলতে চাই বিশুদা, আমার ওকে চাই-ই, ও না হলে আমার চলবে না।"

সে যেন উন্মত্ত হইয়া গিয়াছে, তেমনই দৃপ্ত ভাবে তাহার চোখ দুইটি জ্বলিতেছে।

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিল, "আজ কয়দিন ধরে তোমায় দেখতে চাচ্ছে, কয়দিন কেবল তোমার সন্ধানে নানা জায়গায় লোক পাঠাচ্ছি। ভগবান তোমার সন্ধান দিলেন, নইলে তোমায় যদি না পেতুম আর ওর কিছু হতো—"

সে দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিল, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "তা হলে আমার এ ক্ষোভ রাখবার আর জায়গা থাকত না।"

বিশ্বপতি বদ্ধদৃষ্টিতে নন্দার মুখের পানে তাকাইয়া ছিল। তাহার কাণে তখন কোন কথা আসিতেছিল না, চোখের সম্মুখ হইতে বর্ত্তমান মিশাইয়া গিয়া অতীতের একটী দিনের ছবি জাগিয়া উঠিয়াছিল। সে সেইদিন—যে দিনে সে এমনই রোগশয্যায় পড়িয়া ছিল, তাহার পার্শ্বে নন্দা ছাড়া আর কেহই ছিল না; নন্দা যখন তাহার বিছানার পাশে পরিপূর্ণ আশার মতই হাসিভরা মুখে আসিয়া দাঁড়াইত, তখন বিশ্বপতি রোগের যাতনা ভুলিয়া যাইত, বাঁচিবার আশা মনে জাগিত, সাহস আসিত,—আনন্দ হইত। তাহার মনে হইত, একমাত্র নন্দাই তাহাকে বাঁচাইতে পারে,—শমন নন্দার দুইটী কোমল হাতের কঠিন বন্ধন ছিন্ন করিয়া কিছুতেই তাহাকে লইয়া যাইতে পারিবে না।

হইলও তাহাই, নন্দা তাহাকে বাঁচাইল। কত দিন রাত অনাহারে অনিদ্রায় তাহার পার্শ্বে সে কাটাইয়া দিয়াছে, যমের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছে। বিশুদার জন্য নন্দার উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না, সে যেখানে গিয়াছে—নন্দার ব্যগ্র ব্যাকুল দুইটি চোখের দৃষ্টি তাহাকে অনুসরণ করিয়া ফিরিয়াছে।

কিন্তু সে? এমনই বিশ্বাসঘাতক সে যে, সেই প্রাণদাত্রীর কথাটী পর্য্যন্ত মনে আনে নাই। সে এই স্বর্গে আসিতে স্বেচ্ছায় পথভ্রান্ত হইয়া উঠিল চন্দ্রার গৃহে, পূতিগন্ধপূর্ণ নরকে। স্বর্গে প্রবেশের অধিকার পাইয়াও যে হারায়, তাহার তুল্য হতভাগ্য কে?

বিশ্বপতির চোখ দুইটী কখন শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া চোখ জ্বালা করিতে লাগিল, তবু সে চোখ ফিরাইতে পারিল না, নন্দার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

অসমঞ্জের অনর্গল কথা চলিতেছিল—সব প্রলাপের মতই অসম্বদ্ধ। নন্দা বিশ্বপতির জন্য কত না কষ্ট পাইয়াছে, কতই না চোখের জল ফেলিয়াছে। বিশ্বপতির অধঃপতন তাহার অন্তরে নিদারুণ ক্ষত উৎপন্ন করিয়াছে। তাহাকে কাছে ফিরাইবার জন্য কত না চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু বিশ্বপতির দেখা সে পায় নাই।

শুনিতে শুনিতে বিশ্বপতির মনে হইতেছিল সারা বুকখানা তাহার জ্বলিয়া গেল। সে যেন আর সহ্য করিতে পারে না, ছুটিয়া পালাইতে পারিলেই বাঁচে। কিন্তু যাইবেই বা কেমন করিয়া,—এখান হইতে এক পা নড়িবার সামর্থ্য তাহার নাই।

সন্ধ্যার সময় নন্দা চক্ষু মেলিল, শীর্ণ হাতখানা সামনের দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিল,—"ওগো, শুনছো—"

অসমঞ্জ তাহার হাতখানা নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। নিজের হাতখানা তাহার মাথায়

রাখিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "এই যে নন্দা, আমি শুনছি, কি বলবে বল।"

নন্দা দম লইয়া বলিল, "বিশুদা আসে নি? তাকে খুঁজে পেলে না? আমি কিন্তু এইমাত্র স্বপ্ন দেখছিলুম বিশুদা এসেছে, কত কথা বলছে।"

অসমঞ্জ বলিল, "সত্যই বিশুদা এসেছে নন্দা এই তোমার পাশেই বিশুদা বসে আছে।"

মুখ উঁচু করিয়া নন্দা বিশ্বপতির পানে তাকাইল। হঠাৎ তাহার চোখ ছাপাইয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

অসমঞ্জ তাহার চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে আর্দ্র কণ্ঠে বলিল, "কাঁদছ কেন নন্দা? বিশুদাকে দেখতে চেয়েছিলে—সে এসেছে, যা বলবার আছে তা বল।"

বিশ্বপতি যেন জড় পদার্থে পরিণত হইয়া গেছে। তাহার মুখে কথা নাই, চোখে পলক নাই। প্রাণবান মানুষটী হঠাৎ যেন পাষাণে পরিণত হইয়াছে।

তাহার কোলের উপর হাতখানা রাখিয়া নন্দা যখন ডাকিল, "বিশুদা—"

তখন আচমকা একটা ধাক্কা খাইয়া তাহার লুপ্ত জ্ঞান ফিরিয়া আসিল।

"কি বলছ নন্দা—"

রুদ্ধ কণ্ঠে নন্দা বলিল, "আজ এই শেষ দিনে দেখা দিতে এলে দাদা, ভালো থাকতে একদিন আসতে পারলে না? তোমায় বলব বলে অনেক কথা মনে করে রেখেছিলুম, আজ সে সব হারিয়ে ফেলেছি বিশুদা, কিছু বলতে পারব না। আজ তোমার সময় হল, এত দিনে এতটুকু সময় করে উঠতে পার নি ভাই?"

বিশ্বপতি এত জোরে অধর দংশন করিল যে রক্ত বাহির হইয়া পড়িল।

নন্দা আবার ডাকিল, "বিশুদা—"

বিকৃত কণ্ঠে বিশ্বপতি উত্তর দিল,—"কি?"

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া নন্দা বলিল, "কথা বলছ না কেন? না, আমি আজ তোমায় বকব বলে ডাকি নি, বকবার প্রবৃত্তি আমার আর নেই, ক্ষমতাও নেই। তোমায় আজ ডেকেছি শুধু শেষ দেখা করবার জন্যে, শেষ দু'টো কথা বলবার জন্যে। বিশুদা—"

বিশ্বপতি তেমনই বিকৃত কণ্ঠে উত্তর দিল, "তোমার পাশেই আছি নন্দা, যাই নি।"

নন্দা বলিল, "তোমায় আজ একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে ভাই। তোমার আগেকার জীবনের সব কথা আমি জানি, বর্ত্তমানের কথাও আমার অজানা নেই,—আমি সব শুনতে পেয়েছি। আমার এই হাতখানা ধরে প্রতিজ্ঞা কর বিশুদা, বল,—তুমি সৎ হবে, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আবার সংসারী হবে?"

জিজ্ঞাসু নেত্রে সে বিশ্বপতির পানে তাকাইল।

তাহার শীর্ণ হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বিশ্বপতি বলিল, "প্রতিজ্ঞা করছি নন্দা, তোমার হাত ছুঁয়ে বলছি—আমি ঘরে ফিরে যাব, ভালো হব; কিন্তু সংসারী হব কি নিয়ে? আমার যে কেউ নেই—কিছু নেই।"

ক্লান্তিভরে আবার চক্ষু মুদিয়া আসিতেছিল, প্রাণপণ যত্নে সে ভাব দূর করিয়া নন্দা বলিল, "আবার নতুন করে তোমায় সংসার পাততে হবে বিশুদা—"

বিশ্বপতির চক্ষু দুইটী একবার দৃপ্ত হইয়া উঠিয়া তখনই স্বাভাবিক হইয়া গেল; সে মাথা নাড়িয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, "আর যা বল সব করব, কেবল আবার বিয়ে করে সংসার পাতব না। ওইটী আমায় মাপ কর নন্দা, তুমি তো জানো সবই, আমায় আবার মিথ্যে অভিনয় করতে, মিথ্যে জীবন কাটাতে আদেশ দিয়ো না।"

নন্দা রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আমি চলে যাচ্ছি বিশুদা, তোমাদের কারও মাঝখানে আর ব্যবধান হয়ে থাকব না। ছেলেবেলার কথা ভুলে যাও ভাই, পূর্ব্বস্মৃতি মনে জাগিয়ে রেখে নিজেকে সব রকমে বঞ্চিত করো না।"

বিশ্বপতির মলিন মুখে একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল। দৃঢ় কণ্ঠে সে বলিল, "মিথ্যে কথা নন্দা, এ একেবারেই অসম্ভব, সেই জন্যেই আমি পারব না। স্মৃতি হতে কোন ছবি মুছে ফেলতে কেউ কোনদিন পারে নি, পারবেও না; আমার বেলাতেই কি সেই চিরাচরিত নিয়মের ব্যতিক্রম হবে?"

নন্দা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া মুখ ফিরাইল। অসমঞ্জের মুখের পানে তাকাইয়া সে হঠাৎ আর্ত্ত-ভাবে কাঁদিয়া ফেলিল।

পক্ষী-জননী আর্ত্ত শাবককে যেমন দু'টি ডানার নীচে টানিয়া লইয়া ঢাকিয়া ফেলে, অসমঞ্জ তেমনই করিয়া নন্দাকে নিজের বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "আমি জানি, সব জানি নন্দা, কোন কথাই আমার কাণ অতিক্রম করে যায় নি।

ভয় কি নন্দা,—আমি আছি, আমি তোমায় ছাড়ব না। আমি তোমায় অবিশ্বাস করি নি, তোমায় সমস্ত মন দিয়ে ক্ষমা করেছি।"

স্বামীর বুকের নীচে বড় নিশ্চিন্ত হইয়া বড় আরামেই নন্দা ঘুমাইয়া পড়িল।

২৮

তিন দিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া নন্দার বিছানার পাশে সমানে একেবারে বসিয়া থাকিয়াও বিশ্বপতি কিছু করিতে পারিল না। অসমঞ্জের ও তাহার সকল চেষ্টা যত্ন ব্যর্থ করিয়া নির্দ্দয় কাল নন্দার অমূল্য প্রাণ লইয়া চলিয়া গেল।

অসমঞ্জ নন্দার বুকের উপর মাথা দিয়া পড়িয়া রহিল। কি সে তাহার অধীরতা, কি সে যন্ত্রণা,—কিন্তু বিশ্বপতি নীরব—নিস্পন্দ।

সে যেন কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না, নন্দা চলিয়া গেছে, নন্দা আর নাই। সেই নন্দা,—যাহাকে সে এতটুকু বেলা হইতে দেখিয়াছে, কত মারিয়াছে আবার কোলে লইয়াছে, যাহাকে সে নিজের চেয়েও বেশী ভালোবাসিত—সে আজ নাই। তাহার অন্তরে যে চিরস্থায়ী আসন পাতিয়া বসিয়াছিল, কল্যাণী সেখানে প্রবেশাধিকার পায় নাই, চন্দ্রা স্পর্শের অধিকার পায় নাই, সেই নন্দা—সে সকল ভালোবাসা ব্যর্থ করিয়া চিরদিনের মতই চলিয়া গেছে।

যখন তাহার বাহ্য চেতনা ফিরিয়া আসিল তখন নন্দার মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাইবার জন্য সুসজ্জিত করা হইয়াছে। অসমঞ্জ উঠিয়া বসিয়াছে, নন্দার নিষ্প্রভ মুখখানার পানে তাকাইয়া নিঃশব্দে সে চোখের জল ফেলিতেছে।

ধড়ফড় করিয়া বিশ্বপতি উঠিয়া পড়িল। সে এ দৃশ্য আর সহ্য করিতে পারে না, সে পালাইবে।

মৃতদেহ লইয়া পথে বাহির হইয়া অসমঞ্জ বিশ্বপতির হাত দু'খানা চাপিয়া ধরিয়া আর্দ্র কণ্ঠে বলিল, "তুমিও সঙ্গে এসো বিশুদা, ওর দেহের সদ্গতি করতে হবে—চল। তুমি সঙ্গে না গেলে ওর আত্মা তৃপ্ত হবে না।"

সবেগে মাথা নাড়িয়া বিশ্বপতি বলিল, "না না, আমি যেতে পারব না ভাই, আমায় ক্ষমা কর—চলে যেতে দাও।"

অসমঞ্জ বলিল, "কি করে হবে বিশুদা, ওর—"

বিশ্বপতি বাধা দিয়া আর্ত্ত কণ্ঠে বলিল, "কেন হবে না? ওর ওই দেহখানা পুড়ে আমার চোখের সামনে ছাই হয়ে যাবে, আমায় তাও দেখতে হবে? না, আমি তা সইতে পারব না, কিছুতেই পারব না। অসমঞ্জ, আমার ভালোবাসা স্বর্গীয় নয়, আমি কেবল নন্দার ভেতরকার মানুষটাকেই ভালোবাসি নি, ওর ওই রক্তমাংসের দেহটাকেও ভালোবেসেছিলুম। আমি সব রকমে এমন ভাবে পুড়তে পারব না—কিছুতেই না।"

অসমঞ্জের হাত হইতে জোর করিয়া নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া সে ছুটিয়া পলাইল।

কোথা হইতে কোথায় পা পড়িতেছে তাহার ঠিক নাই, চোখের সম্মুখ হইতে ঘর বাড়ী পথ সব অদৃশ্য হইয়া গেছে।

কোনও ক্রমে বিশ্বপতি যখন চন্দ্রার বাড়ীর দরজায় আসিয়া বসিয়া পড়িল তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, পথে পথে বৈদ্যুতিক আলোগুলি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সামনের বাড়ীটায় কে যেন হার্ম্মোনিয়ামের সঙ্গে সুর মিলাইয়া গাহিতেছে—

প্রিয় যেন প্রেম ভুলো না
এ মিনতি করি হে—

*　　*　　*

আমার সমাধি পরে,　　দাঁড়ায়ো ক্ষণেক তরে
জুড়াব বিরহ-জ্বালা ও চরণ ধরি হে।

"নন্দা নন্দা—"

বিশ্বপতি আকাশের পানে তাকাইল। কোন দিন গানের এই কথাগুলি নন্দার অন্তরে ধ্বনিয়া উঠিয়াছিল কি?

কাঁদিতে পারিলে ভালো হইত, কিন্তু এমনই হতভাগ্য সে—কিছুতেই এক ফোঁটা জল তাহার চোখে আসিল না। বুকের ভিতরটা অসহ যাতনায় ফাটিয়া যাইতেছে, চোখের জলে হয় তো এ যন্ত্রণার উপশম হইত।

পাশের দরজাটা খট করিয়া খুলিয়া গেল, তাহার উপর দাঁড়াইল চন্দ্রা। সম্ভব—কেহ তাহাকে সংবাদ দিয়াছিল বিশ্বপতি ফিরিয়া আসিয়া দরজার ধারে বসিয়া আছে।

একবার তাহার পানে তাকাইয়া বিশ্বপতি চোখ ফিরাইয়া লইল।

চন্দ্রা অগ্রসর হইয়া আসিল, খানিক তাহার পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া তাহার পর বিশ্বপতির একখানা হাত টানিয়া লইয়া শান্ত সংযত কণ্ঠে বলিল, "ভেতরে এসো।"

বিশ্বপতির সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, মনে পড়িল

—আজই সে নন্দার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া শপথ করিয়াছে সে সৎ হইবে—ঘরে ফিরিবে। সে শপথ তাহার রহিল কই,—আবার যে ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহাকে চন্দ্রার দুয়ারেই আসিয়া দাঁড়াইতে হইল।

চন্দ্রা বলিল, "তবু বসে রইলে কেন, বাড়ীর মধ্যে এসো।"

বিশ্বপতি ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পড়িল, বলিল, "না চন্দ্রা, আমি আর এ বাড়ীতে যাব না। আজই প্রতিজ্ঞা করেছি এবার হতে সৎ হব—বাড়ী ফিরে গিয়ে সেখানে বাস করব।"

শান্তকণ্ঠে চন্দ্রা বলিল, "তুমি যে যাবে, তা আমি জানি। বাড়ী যাবে যেয়ো, আমিও তোমায় এখানে রাখব না, কাল দিনের বেলা উদ্যোগ করে আমি তোমায় পাঠিয়ে দেব। এখন তোমার মাথার ঠিক নেই, সারাদিন হয় তো জলটুকুও খাও নি,—এ অবস্থায় তোমায় ছেড়ে দিতে পারি নে। তা ছাড়া, ট্রেণ কখন, তা তোমারও জানা নেই—আমারও জানা নেই। ষ্টেশনে পড়ে থেকে রাত কাটানোর চেয়ে এখানে আজ রাতটা কাটিয়ে যাওয়া ভালো হবে না কি?"

বিশ্বপতির মন ও দেহ দুই-ই আজ অপ্রকৃতিস্থ ছিল, যন্ত্রচালিতের মতই সে চন্দ্রার অনুসরণ করিল।

২৯

দ্বিতলে যে ঘরটায় চন্দ্রা বিশ্বপতিকে লইয়া গেল, প্রথমটায় সে ঘরের পানে দৃষ্টি পড়ে নাই; খাটে বসিয়াই বিশ্বপতি চমকিয়া উঠিল।

তাহার মনের ভাব বুঝিয়া চন্দ্রা অনুনয়ের সুরে বলিল, "আজ এই ঘরেই থাক গো, তোমায় একা ও-ঘরে রেখে আমার শান্তি হবে না। তা হলে আমাকেও ও-ঘরে তোমার কাছে গিয়ে থাকতে হবে।"

বিশ্বপতি হঠাৎ উচ্ছ্বসিত ভাবে হাসিয়া উঠিল—

"আজ যার জন্যে এত ভাবনা চন্দ্রা, কাল সে এতক্ষণ কোথায় থাকবে, শোওয়ার বিছানা পেলে কি না, দু'টো ভাত খেতে পেলে কি না, তা তো দেখতে পাবে না।"

চন্দ্রা অন্যমনস্ক ভাবে এক দিকে তাকাইয়া রহিল,—অনেকক্ষণ উত্তরেই নীরব হইয়া রহিল।

বিশ্বপতি শুইয়া পড়িয়াছিল, দুই কনুইয়ের উপর ভর দিয়া উঁচু হইয়া উঠিয়া বলিল, "শুনেছ চন্দ্রা, নন্দা আর নেই, আজ সকালেই সে মারা গেছে?"

বিকৃত কণ্ঠে চন্দ্রা বলিল, "তোমায় দেখেই তা বুঝতে পেরেছি।"

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিশ্বপতি বলিল, "বুকটা যেন জ্বলে যাচ্ছে, ফেটে যেতে চাইছে, তবু কাঁদতে পারছি নে। ঠিক এই জায়গাটা চন্দ্রা—এখানটায় হাত রেখে দেখ—"

সে চন্দ্রার হাতখানা তুলিয়া নিজের বুকের উপর রাখিল।

চন্দ্রা নত হইয়া পড়িল, তাহার বুকের উপর মুখখানা রাখিয়া উচ্ছ্বসিত ভাবে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল, তাহার কান্না আর থামে না।

চন্দ্রার মাথায় হাতখানা বুলাইতে বুলাইতে বিশ্বপতি বলিল, "কাঁদছ—কাঁদো। উঃ, অমনি করে যদি কাঁদতে পারতুম—"

আর্ত্ত কণ্ঠে চন্দ্রা বলিল, "কাঁদ, খানিকটা কাঁদলে তোমার বুকের যন্ত্রণা কম পড়বে।"

বিশ্বপতি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "না, কাঁদতে পারব না চন্দ্রা, বুকটা যেন পাষাণ হয়ে গেছে। আর কত আঘাত সইব চন্দ্রা, সইবারও অতীত হয়ে গেছে। ওকে পরের হাতে দিয়েও সইতে পেরেছিলুম; কিন্তু আজ যে কিছুতেই সান্ত্বনা পাচ্ছি নে। মন যখন বড় খারাপ হতো, ওরই কাছে ছুটে যেতুম। আজ যে আমার জুড়ানোর জায়গা কোথাও রইল না চন্দ্রা—"

চন্দ্রা সোজা হইয়া বসিয়া তাহার বুকে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। বিশ্বপতি দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া পড়িয়া রহিল।

দেওয়ালের ঘড়িতে এগারটা বাজিয়া গেল।

চমকিয়া উঠিয়া বিশ্বপতি বলিল, "তোমার খাওয়া হয় নি চন্দ্রা?"

আর্দ্র কণ্ঠে চন্দ্রা বলিল, "খাব এখন।"

"না, তুমি আগে খেয়ে এসো" বলিয়া বিশ্বপতি চন্দ্রার হাতখানা সরাইয়া দিল।

তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ক্ষীণকণ্ঠে চন্দ্রা বলিল, "না গো, আজ আমায় কিছু খেতে বলো না, আমার খাওয়ার ইচ্ছে নেই। খাব তো রোজই, কিন্তু তোমায় তো রোজ পাব না।"

বিশ্বপতি চুপ করিয়া রহিল।

শেষ রাত্রের দিকে হঠাৎ চন্দ্রার ঘুম ভাঙিয়া

গেল; খাটের উপর বিশ্বপতি ঘুমের ঘোরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ডাকিতেছে—"নন্দা নন্দা—"

শঙ্কিতা চন্দ্রা দেয়ালের সুইচ টানিয়া দিল। উজ্জ্বল আলোয় সে দেখিল, বিশ্বপতি ক্ষুদ্র বালকের মতই ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। চন্দ্রা একটা শান্তিপূর্ণ নিঃশ্বাস ফেলিল। অশ্রুধারা যখন গলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, তখন সান্ত্বনা মিলিবে আপনিই।

প্রভাতে বিছানা হইতে উঠিয়াই বিশ্বপতি বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

চন্দ্রা অতি কষ্টে চোখের জল সামলাইয়া তাহার যাত্রার আয়োজন করিয়া দিতেছিল। যে ছোট ট্রাঙ্কটা বিশ্বপতি লইয়া আসিয়াছিল, এতদিন সেটা আবদ্ধ অবস্থায় ঘরের এক পাশে পড়িয়া ছিল। বিশ্বপতি আর একটা দিনও এ ট্রাঙ্কটার খোঁজ লয় নাই, চন্দ্রাও ইহার মধ্যে কি আছে, তাহা জানিবার জন্য উৎসুক হয় নাই। আজ বহু দিন পরে সেই বাক্সটা খুলিয়া সাজাইয়া দিবার জন্য নন্দার দেওয়া উপহার দ্রব্যগুলার পানে চোখ পড়িতে চন্দ্রা স্তম্ভিত হইয়া গেল।

এক টুকরা কাগজে বড় বড় অক্ষরে লেখা "বউদিকে-ভক্তি উপহার"। নীচে নাম লেখা —"নন্দা"।

চন্দ্রার চোখ ফাটিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রুধারা ঝরিয়া বাক্সের মধ্যে প'ড়তে লাগিল। এ সব হইতে সে কোথায়—কতদূরে সরিয়া পড়িয়া আছে। এ সকলের নাগাল পাইবার ক্ষমতা তাহার নাই।

মনে পড়িল, দেবতা দর্শনের অধিকার মাত্র তাহার ছিল। মন্দিরের বাহির হইতে সে দেবতা দেখিয়াছে, দরজার উপর উঠিতে কোনদিন সে যোগ্যতা পায় নাই। আজও হৃদয়ে অসীম শ্রদ্ধা প্রেম লইয়া অর্ঘ্য সাজাইয়া সে মন্দিরের বাহিরেই থাকিয়া গেছে, ভিতরে প্রবেশ-লাভের অধিকার সে পায় নাই, কোন দিনই পাইবে না।

দুই হাতে আর্ত্ত বক্ষখানি চাপিয়া ধরিয়া সে মাটীতে লুটাইয়া পড়িল, "দেহের দেউলে প্রদীপ জ্বলিল, কিন্তু তুমি তো জানিলে না দেবতা? জন্ম হইতে বঞ্চিতা রাখিয়াছ, দূর হইতে দেবতার অধিকারই দিলে,—জীবন-ভোর তোমার আহ্বান-গীতি গাহিয়া চলিলাম, তোমায় জাগাইতে পারিলাম না।"

যেমন গোপনে সে বাক্স খুলিয়াছিল তেমনিই গোপনে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল।

বিদায়ের কালে সে যখন একতাড়া নোট বিশ্বপতির পকেটে দিল তখন বিশ্বপতি চমকিয়া পিছনে সরিয়া গেল,—"এ কি চন্দ্রা?"

প্রাণপণে উচ্ছ্বসিত কান্নাটাকে চাপিয়া চন্দ্রা বলিল, "নাও, অনেক দরকারে লাগবে। সৎ ভাবে জীবন কাটাতে গেলেও টাকার দরকার হয়, কেন না চুরি ডাকাতি করতে পারবে না, কোন দিন অদৃষ্টে ভিক্ষেও না জুটতে পারে। শুনেছি তোমার ঘর পড়ে গেছে, গিয়ে মাথা গুঁজবে, এমন একটা আশ্রয় তো চাই।"

বিশ্বপতির চমক লাগিল—তাই বটে।

নোটের তাড়াটা বাহির করিয়া নাড়াচাড়া করিয়া বিশ্বপতি বলিল, "কত দিলে?"

চন্দ্রা বলিল, "বেশী নয়, পাঁচ হাজার।"

বিশ্বপতি যেন আকাশ হইতে পড়িল,—"পাঁচ হাজার! তুমি কি ক্ষেপেছ চন্দ্রা, তোমার যা কিছু সম্বল—যা কিছু জমিয়েছ, সব আমায় দিয়ে দিলে? না না, ও সব পাগলামি রাখ, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে বলে' আমার মাথাও তো খারাপ হয় নি যে তোমার সর্ব্বস্ব আমি নিয়ে যাব! আমায় একশ' টাকা দাও, তাতে আমার ঢের চলবে। আমি বেকার অবস্থায় বসে থেকে আমার অতীত জীবনের পাপক্ষয় করবার জন্যে যে কেবল নাম জপ করব তা তো নয়, খেটে খাবই। জমী-জমা করব, তাতে এর পর বেশ আয় দাঁড়িয়ে যাবে, তাতে আমার দিনগুলো রাজার হালেই কেটে যাবে।"

সে নোটের তাড়া তুলিতেই চন্দ্রা তাহার পায়ের কাছে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল, আর্ত্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "না গো, এই আমার সর্ব্বস্ব নয়। আমার অনেক আছে—অনেক হবে। আমার মত অভাগিনী মেয়েরা না খেয়ে মরে না। মরলে জীবনে প্রায়শ্চিত্ত হল কই, বুকে আগুন জ্বললো কই? ও টাকা নিয়ে যাও। আমি যা দিয়েছি তা আর ফিরিয়ে নিতে পারব না।"

বিশ্বপতি কতক্ষণ নির্নিমেষে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া নোটের তাড়া পকেটে রাখিল।

চন্দ্রা প্রণাম করিল, বিশ্বপতি একটা কথাও বলিল না।

চন্দ্রা শুধু হাসিয়া বলিল, "পায়ের ধুলো নিলুম, একটা আশীর্ব্বাদও তো করলে না?"

উদাসভাবে বিশ্বপতি বলিল, "কি আশীর্ব্বাদ করব চন্দ্রা?"

চন্দ্রার চোখে জল আসিতেছিল। সে বলিল, "বল শীগ্‌গির মরণ হোক। আর কোন দিকেই যাওয়ার পথ নেই, সব পথই কাঁটা ফেলে বন্ধ করেছি। কেবল ওই একটা পথই আমার খোলা আছে। বল—দু একদিনের মধ্যেই যেন মরণ হয়, আমি যেন সকল জ্বালা জুড়াতে পারি।"

বিশ্বপতি অকস্মাৎ যেন সচেতন হইয়া উঠিল, এবং আজ ভালো করিয়াই সামনের মানুষটীর পানে তাকাইল।

ইস, এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে চন্দ্রার! এ তো একদিনের পরিবর্ত্তন নয়। কত দিন ধরিয়া অল্পে অল্পে চন্দ্রার দেহ ক্ষয় হইয়া আসিতেছে, তাহার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ মলিন হইয়া আসিয়াছে, বড় বড় দু'টি চোখের নীচে কালি পড়িয়া গেছে। সমস্ত মুখখানার উপরে যে ক্লান্তির ছায়া জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা তো বিশ্বপতি একদিনও দেখে নাই। নিজের খেয়ালেই সে চলিয়াছে। আর একটী মানুষ যে তাহার খেয়ালের জন্য নিজের সুখ-শান্তি, যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতেছে, তাহা সে জানিতেও চাহে নাই।

বিশ্বপতি চন্দ্রার মাথায় হাতখানা রাখিল। স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "না চন্দ্রা, সে আশীর্ব্বাদ আমি করব না, করতে পারব না। আশীর্ব্বাদ করছি তুমি সৎ হও, তোমার তুমিকে কল্যাণময় ভগবানের নামে সঁপে দাও, তাঁর কাজ কর।"

"পারব? আমি সৎ হতে পারব? আমার দ্বারা ভালো কাজ হতে পারবে?"

চন্দ্রা ব্যগ্রভাবে বিশ্বপতির হাতখানা দুই হাতে চাপিয়া ধরিল।

শুষ্ক হাসিয়া বিশ্বপতি বলিল, "পারবে না কেন চন্দ্রা? ভগবান তো সাধুর জন্যে নন, তিনি পাপীর জন্যেই রয়েছেন। মহাপাপী জগাই মাধাই পরিত্রাণ লাভ করেছিল, আমার মত মহাপাপীও পরিত্রাণ পাওয়ার আশা যখন করছে, তখন তুমিও পাবে না কেন চন্দ্রা? আমার চেয়ে মহাপাপ তো তুমি কর নি, তবু আমি যখন সৎপথে সৎ হয়ে চলবার আশা করছি, তুমিও সে আশা করতে পারো।"

চন্দ্রা বিশ্বপতির চরণে মাথা রাখিল, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "তোমাকেই এই যাত্রাপথের গুরু বলে নিলুম। আজ আমায় যে নূতন ব্রতে ব্রতী করে গেলে, আশীর্ব্বাদ করে যাও—আমার সে ব্রত যেন সম্পূর্ণ করতে পারি।"

নিঃশব্দে সে চোখের জলে বিশ্বপতির পা ভিজাইয়া দিল।

"আসি চন্দ্রা, ট্রেণের সময় হয়ে এলো—"

চন্দ্রা উঠিল, অতি কষ্টে প্রবহমান চোখের জল সামলাইয়া বলিল, "এসো—"

কুলীর মাথায় সেই পুরাতন ট্রাঙ্কটী চাপাইয়া বিশ্বপতি বাড়ীর বাহির হইল।

পথে বাঁক ফিরিবার সময় সে একবার পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল—খোলা দরজার উপর দাঁড়াইয়া চন্দ্রা,—অসহ্য কান্নার চাপে সে আর যেন দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছে না, তবু সে চাহিয়া আছে সেই পথটীর পানে—যে পথ বাহিয়া তাহার প্রিয় চিরকালের মতই চলিয়াছে। হয় তো আজ এই চিরবিদায়-ক্ষণে তাহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছে সেই দিনটীর কথা—যেদিনে ওই পথেই সে আসিয়াছিল।

একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বিশ্বপতি চোখ ফিরাইল।

সামনে পথ—ওই পথ বাহিয়া তাহাকে চলিতে হইবে, পিছনের দৃশ্য অদৃশ্য হইয়া যাক।

৩০

দীর্ঘ তিন বৎসর পরে বিশ্বপতি আবার গ্রামের বুকে পদার্পণ করিল।

গ্রামের যেন আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গেছে,—সবই আছে অথচ যেন কিছুই নাই।

পথ দিয়া চলিতে চলিতে বিশ্বপতি দুই দিক পানে চাহিতেছিল। দেখিতেছিল সে যাহা দেখিয়া গিয়াছিল সেগুলি ঠিক আছে কি না।

আষাঢ়ের আকাশ মেঘে ঢাকা। কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে বর্ষা নামিয়াছে, শুষ্ক খাল-বিল পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, পথের ধারে ধারে জল জমিয়াছে। শুষ্কপ্রায় গাছগুলিতে নূতন পাতা ধরিয়াছে। খানিক আগে যে এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গেছে তাহার জল এখনও টুপটাপ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। চারি দিক দিয়া জলধারা ছুটিয়া খাল বিল পুষ্করিণীতে পড়িয়া সেগুলিকে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। কালো আকাশের বুক চিরিয়া মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিতেছে,—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গুরু গুরু মেঘ ডাকিয়া উঠিতেছে।

দূরে সোঁ সোঁ করিতেছিল। কোথা হইতে ঝর ঝর করিয়া অজস্র বৃষ্টিধারা আসিয়া পড়িল

চঞ্চল কলহাস্যপরায়ণ একদল শিশুর মতই। নিমেষে তাহারা আবার কোথায় বিলীন হইয়া গেল। পিছনে রাখিয়া গেল কেবল তাহাদের আসার চিহ্নটুকু।

ছাতা ছিল না,—সেই বৃষ্টিধারা বিশ্বপতির সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত করিয়া দিয়া গেল। দূর হইতে যখন বৃষ্টি আসিতেছিল, তখন বিশ্বপতি মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া দেখিতেছিল। যখন তাহাকে সিক্ত করিয়া দিয়া পিছনে ফেলিয়া সে ধারা আবার চলিয়া গেল, তখনও সে মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া রহিল।

সুন্দর—অতি সুন্দর। খোলা মাঠে বৃষ্টির এই খেলা কি চমৎকার। জলধারার উন্মাদ নৃত্য নূপুরের ঝম ঝম শব্দ কাণে আনিয়া পাগল করে, ইহার শীতল স্পর্শে সকল জ্বালা যেন জুড়াইয়া যায়।

বাড়ীর কাছে আসিয়া বিশ্বপতি থামিল।

বর্ষাস্নাত জনবিরল পথ। এতখানি পথ আসিতে কাহারও সহিত দেখা হইল না। গ্রাম্য পথ যেন এই দিনের বেলাতেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বৃষ্টির নূপুর তাহার বুকে বুঝি সুরের তন্দ্রাজাল বুনিয়া দিতেছে। আকাশ মাদল বাজাইয়া সুরের তাল রাখিতেছে।

একখানি ঘর কোনক্রমে এখনও দাঁড়াইয়া আছে, আর দু'খানি পড়িয়া গেছে। যে ঘরখানি দাঁড়াইয়া আছে, তাহার দরজা বন্ধ। "সনাতন—"

দীর্ঘ তিন বৎসর পরে নিজের বাড়ীর উঠানে দাঁড়াইয়া সে ডাকিল।

প্রকৃতির নিস্তব্ধতা টুটিয়া গেল। পাশেই একটা গাছের ডালে জলসিক্ত দেহে একটি কাক বসিয়া ঝিমাইতেছিল, অকস্মাৎ শব্দে চমকিয়া সে তাকাইয়া দেখিল। বিশ্বপতি আবার ডাকিল "সনাতন—"

পাশের বাড়ীর জানালা-পথে বৃদ্ধা মুখুয্যে-গৃহিণীকে দেখা গেল।

"কে, বিশু,—ফিরে এসেছ বাবা? আমাদের বাড়ী এসো। ঘর তোমার চাবী বন্ধ, চাবী আমার কাছে রয়েছে।"

বিশ্বপতি জিজ্ঞাসা করিল, "সনাতন কি মেয়ের বাড়ী গেছে কাকিমা?"

কাকিমা উত্তর দিলেন, "ওা আমার পোড়া-কপাল রে,—সে খবরটাও পাও নি? সে কি আর আছে বাবা? আজ মাস তিনেক হল সে মারা গেছে। চাবি আর কারও কাছে দিয়ে গেল না—আমার হাতে দিয়ে গেল। অসুখ শুনে ওর মেয়ে জামাই এসে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সে কি টানাটানি! তবু কিছুতেই যদি সে গেল। স্পষ্ট বললে—"দা ঠাকুর আমায় বাড়ী চৌকি দিতে রেখে গেছে। বেঁচে থাকতে এ বাড়ী ছেড়ে আমার যাওয়া হবে না।" হলও ঠিক তাই, ওইখানে—তোমার ভিটেতেই সে মরল—তবু গেল না।" নন্দা—সনাতন,—

কোথায় তাহারা? তাহারা আজ ওই উর্দ্ধলোকে স্থান পাইয়াছে। ওখান হইতে তাহারা হতভাগ্য বিশ্বপতির পানে তাকাইয়া আছে কি? শ্রান্তদেহ বিশ্বপতি দাঁড়াইতে অক্ষম হইয়া বারাণ্ডায় বসিয়া পড়িল। সে দিনটা বাধ্য হইয়াই তাহাকে কাকিমার বাড়ীতে থাকিতে হইল। পরদিন সকাল হইতে সে নিজের গৃহসংস্কারের জন্য লোকজন যোগাড় করিতে ব্যস্ত হইল। মিস্ত্রী নিযুক্ত হইল—নূতন ঘর তুলিতে হইবে। এই তাহার পিতৃ-পুরুষের ভিটা। এইখানেই তাহাকে থাকিতে হইবে। এখান হইতে সে আর কোথাও যাইবে না। হাতে যখন সে টাকা লইয়াছে—পিতৃ-পুরুষের ভিটা, নিজের জন্মভূমি সে ধ্বংস হইতে দিবে না। বর্ষার জন্য ঘরের কাজ বড় বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিল না,—মাঝামাঝি স্থগিত হইয়া গেল।

পাড়ার পাঁচজন পরামর্শ দিলেন—এইবার বিয়ে-থাওয়া করে সংসারী হও বাছা,—আর এমন করে লক্ষ্মীছাড়ার মত টো টো করে বেড়িয়ো না।

বিশ্বপতি একটু হাসিল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসও ফেলিল।

বর্ষা অতীত হইবার সঙ্গে সঙ্গে নূতন ঘরের কাজ আবার আরম্ভ হইল। শীঘ্রই ঘর শেষ হইয়া গেল। একদিন বিশ্বপতি নূতন ঘরে প্রবেশ করিল।

এত দিন পরে সে চন্দ্রাকে একখানি পত্র দিল,—সে নূতন ঘর তুলিয়াছে, যদি চন্দ্রা এক দিন কিছুক্ষণের জন্যও এখানে আসে—যদি দেখিয়া যায়, বিশ্বপতি বড় আনন্দ পাইবে।

চন্দ্রা উত্তর দিল, তাহার গ্রামে ফিরিবার মুখ নাই। কলঙ্কিনী চন্দ্রার কলঙ্কময় পায়ের চিহ্ন পবিত্র গ্রামমাতার পথের ধূলায় আর অঙ্কিত হইবে না। বিশ্বপতি নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে শুনিয়া সে বড় আনন্দিত হইয়াছে। বিশ্বপতির সামনে সে আর যাইবে না। নিজেকে সে ভয় করে, প্রলোভনের বস্তু হইতে তাই সে তফাতে

থাকিতে চায়। তাহার অবস্থা বুঝিয়া বিশ্বপতি যেন তাহাকে ক্ষমা করে, সে এই প্রার্থনা করিতেছে।

আজ কল্যাণীর কথা বিশ্বপতির মনে জাগিল না। জাগিল খুব বড় হইয়া এই যথার্থ দুর্ভাগিনী মেয়েটীর কথা, যে তাহাকে ভালোবাসিয়া কেবল তাহাকে বাঁচাইবার জন্যই জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া চিরদিনের জন্য দূরে চলিয়া গেছে,—তাহাকে নিজের সর্ব্বস্ব দিয়া পরম শান্তি লাভ করিয়াছে।

বিশ্বপতির মন আজ উঁচু সুরে বাঁধা। সে নিজেকে ফিরাইয়াছে। নন্দার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহার মনে বিশ্বাস আছে—জোর আছে—সে আর পদচ্যুত হইবে না।

চন্দ্রাকে সে আজ বড় করুণার চোখেই দেখে, চন্দ্রার জন্য সে বড় বেশী রকমই ভাবে। চন্দ্রা মুক্তি পাক, সৎ হোক, শান্তিলাভ করুক—আজ সমস্ত মনঃপ্রাণ দিয়া সে ইহাই প্রার্থনা করে।

৩১

শরীরটা কয় দিন হইতে ভালো যাইতেছিল না। বিশ্বপতি দুই দিন কোথাও বাহির হয় নাই, ঘরেই শুইয়া পড়িয়া দিন কাটাইতেছিল।

আহারের ব্যবস্থা কাকিমার ওখানে ছিল। তিনি প্রত্যহ দু'তিনবার যাওয়া-আসা করিতেন, বিশ্বপতিকে দেখা-শোনা করিতেন।

আজকাল বিশ্বপতিকে দেখার লোকের অভাব ছিল না। তাহার অনেক টাকা হইয়াছে কথাটা খুব শীঘ্র গ্রামের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। নবীন মিত্র তাঁহার বয়স্থা কন্যাটীর উপযুক্ত পাত্ররূপে তাহাকেই নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন এবং বিশ্বপতির নিকটে এ প্রস্তাবও করিয়াছিলেন। কিন্তু সে হাঁ বা না কিছুই বলে নাই। নবীন মিত্রের আশা ছিল যথেষ্ট; তিনি সেই জন্যই বিশ্বপতিকে সকলের বেশী যত্ন দেখাইতেছিলেন।

সেদিন সন্ধ্যার পরে বিশ্বপতি একাই ঘরের মধ্যে শুইয়া পড়িয়া ছিল। খানিক আগে নবীন মিত্র চলিয়া গিয়াছেন। কাকিমাও একবার সাড়া দিয়া গিয়াছেন।

বাহিরে শুক্লা দশমীর চাঁদের আলো। চারি দিক অম্লান জ্যোৎস্নায় ভরিয়া গেছে। দূরে কোথায় কোন্ নিভৃত নিকুঞ্জের আড়ালে লুকাইয়া একটী পাপিয়া অবিশ্রান্ত চীৎকার করিতেছিল—চোখ গেল, চোখ গেল।

ঘরে লণ্ঠনটী খুব মৃদু ভাবে জ্বলিতেছিল। এক কোণে আড়ালভাবে থাকায় তাহার মৃদু আলো ঘরের মধ্যে স্ফুট হইয়া উঠিতে পারে নাই। বাহিরের স্ফুট জ্যোৎস্না মুক্ত জানালাপথে আসিয়া কতকটা বিছানার উপর কতকটা মেঝের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বাতাস ঝির ঝির করিয়া জানালা দিয়া আসিয়া দেয়ালে বিলম্বিত ছবির কাগজগুলাকে কাঁপাইয়া দিতেছিল।

বিশ্বপতি বিছানায় শুইয়া পড়িয়া বাহিরের পানে তাকাইয়া ছিল।

আজ রাত্রিটী কি সুন্দর। মনে পড়িতেছিল পুরীতে সমুদ্রতীরে এমনই জ্যোৎস্নালোকে নন্দার সঙ্গে বেড়ানোর কথা। সম্মুখে অনন্ত সমুদ্র। ঢেউয়ের উপর চাঁদের আলো পড়িয়া কি সুন্দর লুকোচুরি খেলা করিতেছিল। পায়ের তলায় বালুকারাশি ঝিক্‌মিক করিয়া জ্বলিতেছিল। আজ যেমন জ্যোৎস্নাদীপ্ত নীলাকাশের বুকে কোথা হইতে টুকরা টুকরা সাদা মেঘ ভাসিয়া আসিয়া দৃপ্ত চাঁদের উপর দিয়া আবার কোন্ অজানা দেশে চলিয়া যাইতেছে—সেদিনও তেমনই চলিতেছিল।

নন্দার সে কি আনন্দ! তাহার মুখের কথা সেদিন ফুরায় নাই। কলকণ্ঠ বিহগীর ন্যায় সে কেবল সেদিন গল্প করিয়াছিল। বিশ্বপতি চলিতে চলিতে কতবার সে জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল হাসিভরা মুখখানার পানে তাকাইয়া ছিল। কতবার তাহার মনে হইয়াছিল, আকাশের চাঁদ সুন্দর, না এই মুখখানি সুন্দর। তুলনায় যেন নন্দার মুখখানাই অধিকতর সুন্দর বলিয়া মনে হইয়াছিল।

একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস বিশ্বপতির সমস্ত বুকখানা দলিয়া দিয়া গেল। হায় রে, সে আজ কোথায়? সে ওই চাঁদের রাজ্যেই চলিয়া গেছে। বিশ্বপতির ব্যগ্র দুইটী বাহুর বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেছে। ব্যগ্র বুকের আকুল আহ্বানে দেখা দেওয়া দূরে থাক, একটী সাড়াও দিবে না।

কিন্তু বিশ্বপতি শুনিয়াছে অন্তরের একাগ্রতাময় আহ্বান না কি অনন্তের অধিবাসীকেও চঞ্চল করিয়া তুলে,—তাহাকে ইহলোকে টানিয়া আনে। আজ সে অনন্তকে বিশ্বাস করিতে চায়। মরিলেই সব ফুরায় বলিয়া ধারণা করিতে তাহার বুক ফাটিয়া যায়। নন্দা অনন্তে আছে, তাহার সব

শেষ হইয়া যায় নাই—হইতে পারে না। আজ সে প্রাণপণে বড় ব্যগ্রতায় নন্দাকে ডাকে, নন্দা কি একবার আসিয়া তাহাকে দেখা দিয়া যাইতে পারিবে না?

নন্দা, নন্দা, কোথায় নন্দা—কোথায় তুমি? একটিবার মুহূর্ত্তের জন্যও কি আসিতে পারিবে না? একটিবার চোখের দেখা দিয়া যাইতে পারিবে না? ওগো অনন্তবাসিনি, একটিবার মুহূর্ত্তের জন্যও এসো, দেখা দাও।

বিশ্বপতি চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিল।

দূরে কোথায় বাঁশী বাজিতেছিল। জ্যোৎস্না রাত্রে সে বাঁশীর সুর বড় সুন্দর শুনাইতেছিল।

বারাণ্ডায় একটা শব্দ শুনিয়া সে চাহিল,—বোধহয় মিত্র মহাশয় আসিয়াছেন।

কিছুক্ষণ অতীত হইয়া গেল, কেহ আসিল না।

দরজার কাছ হইতে কে যেন সরিয়া গেল, ক্ষীণ আলোকে যেন তাহার শাড়ীর লাল পাড়টুকু দেখা গেল। কে যেন দরজার পাশে দাঁড়াইয়া ছিল,—বিশ্বপতি এ পাশে ফিরিতেই সে পাশে লুকাইল।

"কে, কে ওখানে—"

কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

নন্দা আসিয়াছে কি? হাঁ, নিশ্চয়ই সে আসিয়াছে। সে ছাড়া আর কেহ নহে। বিশ্বপতিকে সে বড় ভালোবাসিত। বিশ্বপতির আহ্বানে সে তাহার বড় প্রিয় চন্দ্রলোকে পর্য্যন্ত থাকিতে পারে নাই। সে বিশ্বপতির কাছে আসিয়াছে।

"নন্দা, নন্দা—"

বিশ্বপতি ডাকিতে লাগিল—"এদিকে এসো, সামনে এসো নন্দা। এসেছ যদি—নিষ্ঠুরার মত চলে যেয়ো না।"

ধীরপদে একটি নারীমূর্ত্তি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। মৃদু আলোকে স্পষ্ট দেখা গেল না, মনে হইল তাহার মুখের অর্দ্ধেকটা অবগুণ্ঠনে আবৃত।

"নন্দা—"

বিশ্বপতি একেবারে উঠিয়া বসিল।

"আমি নন্দা নই। নন্দা নেই, সে মরে গেছে। মরা মানুষ জীবন্তের রাজত্বে আসতে পারে না।"

এ কি, এ কাহার কণ্ঠস্বর? বিশ্বপতি বিস্ফারিত নেত্রে রমণীর পানে তাকাইয়া রহিল। অস্ফুটে তাহার কণ্ঠ হইতে অজ্ঞাতেই বাহির হইল,—"চন্দ্রা—"

মেয়েটি হঠাৎ তাহার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া, তাহার পায়ের উপর একেবারে উপুড় হইয়া পড়িল। আর্ত্ত কণ্ঠে কাঁদিয়া বলিল, "না গো, বাগ্দীর মেয়ে চন্দ্রাও যে সৌভাগ্য লাভ করেছে, আমি তাও পাই নি। আমি নন্দা নই, চন্দ্রাও নই, আমি অভাগিনী কল্যাণী"—

"কল্যাণী—"

সামনে কালসাপ দেখিয়াও মানুষ বোধ হয় এত চমকাইয়া উঠিত না। বিশ্বপতি পা সরাইয়া লইতে গেল, কল্যাণী পা ছাড়িল না। দুই হাতে পা দু'খানি চাপিয়া ধরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিশ্বপতি যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না—কল্যাণী ফিরিয়া আসিয়াছে! সেই কল্যাণী—যাহাকে সে একদিন এক মুহূর্ত্তের জন্য দেখিয়া বুঝিয়াছিল কল্যাণী কোথায় গিয়াছে, সুখসমৃদ্ধির চরম সীমায় সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সেই কল্যাণী, যাহার নাগাল পাওয়া তাহার মত লোকের পক্ষে কল্পনারও অতীত! সে আজ আবার এখানে, এই পল্লীতে—এই কুটীরে ফিরিয়াছে?

উভয়েই নীরব। কল্যাণী কেবল কাঁদিতেছিল। আর বিশ্বপতি ভাবিতেছিল দূর অতীতের ও বর্ত্তমানের কথা।

তবুও তো সে সংসার পাতাইয়াছিল। হয় তো কল্যাণীকে লইয়া সে সুখী হইতে পারিত। বাল্য প্রেমের কথা ভবিষ্যতে কোন দিন না কোন দিন তাহার মন হইতে মিলাইয়া যাইত। তাহা হয় নাই। দারুণ ঈর্ষায় কল্যাণীর হৃদয় দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল,—সে নন্দার প্রতি স্বামীর আকর্ষণ সহিতে পারে নাই।

কেই বা পারে? বড় ভালোবাসার পাত্র বা পাত্রীকে অপরের হাতে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে কে পারে? নারী আত্মহত্যা করে, সুখের সংসারে আগুন ধরাইয়া দেয়, নিজেকে ধ্বংসের পথে অগ্রসর করিয়া দেয়,—ইহার মূলে অনেক সময় এই একটী কারণই থাকে না কি? সরল-প্রকৃতি পুরুষ অনেক আঘাত সহিতে পারে, অনেক ক্ষতি সহিতে পারে; দুর্ব্বলা নারী কোনও আঘাত, কোনও ক্ষতি সহিতে পারে না।

বিশ্বপতি বাহিরের পানে তাকাইয়া রহিল। তখনও বাহিরে অম্লান চাঁদের আলো, তখনও

পাপিয়া দূরে কোথায় ডাকিতেছে—চোখ গেল, চোখ গেল।

চাহিয়া চাহিয়া চোখ জ্বালা করিতে লাগিল; বিশ্বপতি চোখ ফিরাইয়া পদতলে নিপতিতা নারীর পানে তাকাইল।

অনুতাপ? বোধ হয় তাহাই ঐশ্বর্য্য। তাহার অনুপমেয় অসীম সৌন্দর্য্যে ইহাকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারে নাই। দরিদ্রের এই পর্ণকুটীরই তাহাকে শত বাহু মেলিয়া ডাকিয়াছে। সে দূরে থাকিতে পারে নাই,—সহস্র বন্ধন দুইটী কোমল হাতে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সে ঘরের পানে ছুটিয়া আসিয়াছে।

সে আশ্রয় চায়। এই ঘরে তাহার পূর্ব্ব-স্মৃতি লক্ষ শিকড় ছড়াইয়া জাঁকিয়া বসিয়াছে। সে এখন এই স্থানে তাহার জায়গা গড়িয়া লইতে আসিয়াছে। কিন্তু তাহা কি আর সম্ভব হয়? কল্যাণী ভাবিয়াছে, সেই শিকড় দিয়া সে আবার বাঁচিবার সম্বল আহার্য্য যোগাড় করিয়া লইবে। কিন্তু তাই কি হয়? বাহিরের আকর্ষণে সে যখন ঝুঁকিয়াছিল, তখন সেই সুতার মত লক্ষ বাঁধন যে ছিঁড়িয়া গিয়াছে, সেদিক কি সে দেখে নাই?

বিশ্বপতি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

৩২

"কল্যাণী,—রাঙাবউ—"

কল্যাণী,—চমকাইয়া উঠিয়া মুখ তুলিল। সেই 'রাঙাবউ' আহ্বান। বহুকাল সে এ ডাক শুনিতে পায় নাই। অনেক আদরের সম্ভাষণ হয়তো সে শুনিয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে আন্তরিকতা ছিল কি?

একবার মাত্র মুখ তুলিয়াই সে আবার বিশ্বপতির পায়ের উপর মুখখানা রাখিল।

সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসটাকে অতিকষ্টে প্রশমিত করিয়া ফেলিয়া বিশ্বপতি বলিল, "কিসের আকর্ষণে আজ রাজপ্রাসাদ ছেড়ে এই দীনদরিদ্রের পর্ণকুটীরে এলে রাঙাবউ? এখানে এমন কিছুই নেই যা তোমায় এতটুকু তৃপ্তি শান্তি দিতে পারবে।"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কল্যাণী বলিল, "ভুল বুঝেছ গো, আমায় তুমি ভুল বুঝেছ। আমি আমার অন্তরের ডাকে এসেছি। এই ঘরের আকর্ষণ আমি কিছুতেই ঠেকাতে পারলুম না। এই গাঁয়ের পথ আমায় ডেকেছে, এর ঘাট আমায় ডেকেছে, এর আকাশ, বাতাস, গাছ, লতা আমায় ডেকেছে। এর ডাক এড়িয়ে আমি কোথায়—কেমন করে থাকবো গো, আমি কোথায় থেকে শান্তি পাব?"

গম্ভীরভাবে বিশ্বপতি বলিল, "যারা ডেকেছে, তাদের কাছে যাও কল্যাণী। আমি তো তোমায় ডাকি নি। তবে আমার কাছে এসেছ কেন?"

"না, তুমি আমায় ডাক নি। না ডাকতে এসেছি, এ অপরাধের শাস্তি দাও। তোমার দেওয়া দণ্ড যতই কঠোর হোক—আমি তা মাথা পেতে নেব। আমায় দণ্ড দাও গো, আমি সেই দণ্ড নিতেই এসেছি।"

সে বিশ্বপতির পায়ের কাছে মাথা খুঁড়িতে লাগিল।

ব্যস্ত হইয়া বিশ্বপতি তাহাকে ধরিবার জন্ত হাতখানা বাড়াইয়াই সরাইয়া লইল,—"আঃ, ও কি করছ কল্যাণী? ওঠ—ছিঃ, ও রকম পাগলামী করো না।"

কল্যাণী মাথা তুলিল।

তাহার মুখ তখন বিষাদ-মলিন, গম্ভীর। বলিল, "আমায় জিজ্ঞাসা করছ কেন এলুম, সে কথা বললে বিশ্বাস করবে কি?"

বিশ্বপতি বলিল, "আমায় কোন কথা বিশ্বাস করানোর জন্যে তোমার এত ব্যাকুলতা কেন কল্যাণী? আমি অতি ক্ষুদ্র, আমার ওপরে নির্ভর করাই যে তোমার অনুচিত।"

কল্যাণীর মুখখানা একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, "আমি কোথাও থাকতে পারি নি, তাই এখানে চলে এসেছি।"

"কিন্তু যে দিন চলে গিয়েছিলে, সে দিনে কি ভেবেছিলে কল্যাণী—পেছনে যাকে ফেলে চলেছো, সে তোমাকে অবিরত ডাক দেবে, সেই ডাক তোমায় কোথাও স্থির হয়ে থাকতে দেবে না?"

বিশ্বপতি হাত বাড়াইয়া লণ্ঠনের দম বেশী করিয়া দিয়া ভালো করিয়া কল্যাণীর পানে তাকাইল।

কল্যাণী মুখ নত করিয়া বসিয়া রহিল। একটা কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

উভয়ে অনেকক্ষণ নীরব।

বিশ্বপতি ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। বলিল, "আর রাত করছ কেন—এখন যাও।"

কল্যাণী মুখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিল। সে চোখে সর্ব্বহারার দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেন

তাহার যাহা কিছু ছিল সব সে হারাইয়া ফেলিয়াছে।

বীর কণ্ঠে সে বলিল, "আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছ; কিন্তু আমি যাব বলে তো আসি নি, তোমার পায়ের কাছে থাকব বলে এসেছি। ভয় নেই, আমার দ্বারা তোমার এতটুকু অনিষ্ট হবে না। আমি তোমার কাছ হতে অনেক দূরে সরে থাকব। আমায় কেবল এই ঘরে থাকবার অনুমতি দাও।"

বিশ্বপতি গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িল, একটী কথাও বলিল না।

কল্যাণী কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "আমায় এতটুকু অধিকারও দেবে না, কিন্তু চন্দ্রাকে তো অনেকখানিই অধিকার দিয়েছিলে? ঘৃণ্য বাগ্দীর মেয়ে হয়েও সে যা পেলে, আমি তা পাব না,—তার এতটুকু পাওয়ার দাবী করতে পারব না?"

শক্ত ভাবেই বিশ্বপতি বলিল, "ভুল করেছ কল্যাণী। চন্দ্রা গৃহত্যাগ করে গেলেও তার স্থান ছিল ঘরে—কেন না আমার জন্তেই সে গিয়েছিল। কিন্তু তুমি তো আমার জন্তে—আমায় বাঁচাতে যাও নি কল্যাণী,—আমায় সব রকমে ধ্বংস করতে তুমি চলে গেছলে। কিন্তু কি চমৎকার অভিনয় করতেই শিখেছ, আমি তাই ভাবি। তোমার মত "ষ্টেজ ফ্রি" হতে খুব কম অভিনেত্রীই পারে। সেই জন্তেই তোমার নাম চিত্রজগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। চন্দ্রা গ্রাম ত্যাগ করে গেছে, আর সে এখানে আসে নি। আমার জন্তে সে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেছে, তবু সে আমার শত সহস্র অনুনয়েও এখানে এল না। আর তুমি—তুমি কল্যাণী,—যে মুখে নিজের হাতে চুণ কালি মেখেছ, সেই মুখ দেখাতে গ্রামে ফিরে এসেছ,—তবু আবার থাকতে চাচ্ছো কি করে? মনে রেখো—এখানে তোমার এই অভিনয়ে লক্ষ হাতে করতালি পড়বে না, অগস্তি প্রাণের অর্ঘ্য তোমার পায়ের তলায় জমবে না।"

কল্যাণী বদ্ধদৃষ্টিতে বিশ্বপতির কঠিন মুখখানার পানে তাকাইয়া রহিল। তাহার চোখে এতটুকু জল ছিল না। কিন্তু তাহার আরক্তিম ঠোঁট দু'খানা নীল হইয়া গিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

হঠাৎ সে উঠিয়া পড়িল। দরজার দিকে দুই পা অগ্রসর হইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বিশ্বপতির পাশে বসিয়া পড়িল। দুই হাতের মধ্যে মুখখানা ঢাকিয়া আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "নিষ্ঠুর, পাষাণ, আমি যে কেবল তোমার জন্তেই সব ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি, কেবল তোমার জন্তেই এই গ্রামে আবার পা দিয়েছি। তোমার সেবা যদি করতে পাই—লোকে যে যাই বলে বলুক—কারও কথা কাণে নেব না বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছি। সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢেকে লুকিয়ে এসেছি, কাউকে দেখতে দিই নি। ওগো, আমায় এমন করে নিষ্ঠুরের মত তাড়িয়ে দিয়ো না। আমায় এখানে —তোমার ঘরে এতটুকু আশ্রয় দাও। আমি কেবল তোমার কাজ করে দেব, তোমায় চাইব না।"

বিশ্বপতি মাথা নাড়িল, দৃঢ়কণ্ঠেই বলিল, "আর তা হয় না কল্যাণী, আর তা হবে না। সামনে জলন্ত আগুন নিয়ে আমি বাস করতে পারব না। আমার বুকে দিনরাত আগুন জলছে, আরও জলবে। শেষে আমায় আত্মহত্যা করে সকল জালার অবসান করতে হবে। বুঝলে কল্যাণী, তুমি যেমন আমায় মিথ্যে সন্দেহ করে নিজেকে নষ্ট করেছ, আমি তোমার ওপরে সত্যিকার অভিমান নিয়েই নিজেকে ধ্বংস করেছিলুম। অনেক কষ্টে আবার মানুষ হওয়ার চেষ্টা করছি। এ সময় আমায় বাধা দিয়ো না। অনেক মহাপাপ করেছি। অনুতাপ করবার অবকাশ যাতে জীবনকালের মধ্যে পাই—তাই কর। আমায় আর আত্মহত্যারূপ মহাপাতকে ডুবিয়ো না।"

কল্যাণী থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ চেষ্টা করিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সে বলিল, "তাই ভালো, আমি চলে যাব,—তোমাকে আর পাপে ডুবাব না। কিন্তু আজ এই রাত্রে আমায় এতটুকু আশ্রয় দেবে না কি? একা এই রাত্রে কোথায় যাব? কেউ আমায় আশ্রয় দেবে না। অন্ততঃপক্ষে আজকের রাতটা,—আমি কাল ভোর হতেই উঠে চলে যাব—"

ধড়মড় করিয়া বিছানা হইতে উঠিয়া শশব্যস্ত ভাবে বিশ্বপতি বলিল, "আমার তাতে এতটুকু আপত্তি নেই। আজ রাত্রে তুমি এখানে এই ঘরেই থাকো, আমি বাইরে যাচ্ছি।"

"কিন্তু তোমার যে অসুখ—"

শুষ্ক হাসিয়া বিশ্বপতি বলিল, "এমন কিছু শক্ত ব্যারারাম নয়, সামান্ত জর মাত্র—ওতে কিছু হবে না। আমি বারাণ্ডায় একটা মাদুর পেতে শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দেব এখন, তুমি ঘরে থাকো।"

কল্যাণী আড়ষ্ট ভাবে বসিয়া রহিল। বিশ্বপতি একটা মাদুর ও একটা বালিস লইয়া গিয়া বারাণ্ডায়

রাখিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, কল্যাণী তখনও সেইভাবে বসিয়া আছে।

বিশ্বপতি শান্তভাবে বলিল, "আজ বোধ হয় বিশেষ কিছু খাওয়া হয়নি। ওই আলমারীতে দুধ আছে, ঘরে আর কিছুই নেই। উপোস করে থেকো না, দুধটুকু খেয়ে কুঁজোয় জল আছে নিয়ো। আমি এই বারাণ্ডায় রইলুম। ভয়ের কোন কারণ নেই। তুমি দরজা বন্ধ করে নিশ্চিন্ত হয়ে শোও।"

সে বারাণ্ডায় চলিয়া গেল।

বাহিরে মাদুর পাতার শব্দ হইল, বিশ্বপতি যে শুইয়া পড়িল, তাহাও বেশ বুঝা গেল।

কল্যাণী উঠিল না, নড়িল না, একটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাসও ফেলিতে পারিল না। তাহার বুকের মধ্যে ব্যথার বোঝা জমাট হইয়া বসিয়াছিল, সে তাহা এতটুকু হাল্কা করিবার চেষ্টাও করিল না, অথবা উপায় খুঁজিয়া পাইল না।

বাহিরে দশমীর চাঁদ তখন ডুবিয়া গেছে, অন্ধকার ঝোপে গর্তে কোথায় লুকাইয়া ছিল, চাঁদ ডুবিবার সঙ্গে সঙ্গে রক্ত-পিপাসু ব্যাঘ্রের মতই নিরীহ ধরিত্রীর বুকে লাফাইয়া পড়িল।

গান গাহিতে গাহিতে পাখীটি থামিয়া গেছে। অন্ধকার নামিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার চোখেও বুঝি বিশ্বের ঘুম জড়াইয়া আসিয়াছে। নীড়ের মাঝেই বুঝি সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নিকটে নারিকেল গাছের একটা পাতার গোড়ার দিকে একটা পেচক আসিয়া বসিল ও বারকতক ডানা নাড়িল। নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সেই একটা তাহার অভিযোগ বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিতে লাগিল। আকাশের গায়ে অগণন তারা ফুটিয়া উঠিয়া অন্ধকার ধরিত্রীর পানে নিস্তব্ধে তাকাইয়া ছিল। পেচকের অভিযোগ কেবল তাহাদেরই কাছে পৌঁছিতেছিল।

মধ্য রাত্রিতে অকস্মাৎ বিশ্বপতির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মনে হইল—ঘরের মধ্যে কল্যাণী যেন মুখে চাপা দিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। সে তাহার অভিযোগ শুনাইতে চায় কাহাকে? অন্ধকার ঘরে সে কাহার পায়ে প্রাণের গভীর বেদনা উজাড় করিয়া ঢালিতে চায়?

রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিয়া বিশ্বপতি ডাকিল, "কল্যাণী—রাঙাবউ—"

হয় তো তাহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা তখন শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। দরজা খোলা থাকিলে হয় তো সে ভূলুণ্ঠিতা কল্যাণীর মাথাটা নিজের কোলেই টানিয়া লইত।

ভিতর হইতে কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। বোধ হয় গভীর ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া সে কাঁদিয়াছিল। বিশ্বপতির সাড়া পাইয়া দুঃস্বপ্ন তাহার বিভীষিকা লইয়া সরিয়া গিয়াছে।

আপনা আপনিই কুণ্ঠিত হইয়া বিশ্বপতি নিজের মাদুরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

৩৩

ভোরে আলো ধরার গায়ে প্রথম চুম্বনরেখা আঁকিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বপতি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

কাল রাত্রে কত কি ঘটিয়া গেছে,—আজ ভোরের আলোয় মনে হইতেছে, সে সব যেন একটা স্বপ্ন। কিন্তু সে স্বপ্ন নয়, এই প্রভাতের আলোর মতই সত্য। কল্যাণী আসিয়াছে,—কাল রাত্রে সে এই ঘরে বাস করিয়াছে,—এখনও ঘরের ভিতর রহিয়াছে। হয় তো এখনও ঘুমাইয়া আছে, দরজা এখনও ভিতর হইতে বন্ধ।

সূর্য্য উঠিয়া পড়িল। সমস্ত বারাণ্ডা, উঠান রৌদ্রে ভরিয়া গেল। একজন দুইজন করিয়া কয়েকজন প্রতিবাসীও আসিয়া পড়িলেন।

বিশ্বপতির শারীরিক খবর লইতে তাঁহারা সকলেই উৎসুক। সে ভালো আছে। তাঁহারা যে এত ভোরেই তাহাকে দেখিতে আসিয়াছেন, সেজন্য সে তাঁহাদের নিজের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইল।

মিত্র মহাশয় সবিস্ময়ে বলিলেন, "বাবাজি, কাল সারারাত কি এই বারাণ্ডাতেই শুয়েছিলে না কি? ঘর তো দেখছি বন্ধ, এখানে বিছানা পাতা দেখছি—"

বিশ্বপতি উত্তর দিল না।

ততক্ষণে আর দু'একজনে কথাবার্ত্তা চলিয়াছে। কাল সন্ধ্যার ট্রেণে একটি মেয়ে ষ্টেশনে নামিয়াছে। একাই সে অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া গ্রামের পথে চলিতেছিল। সে মেয়েটি কে, কোথায় গেল, ইহাই লইয়া তাঁহারা বিলক্ষণ মাথা ঘামাইতেছিলেন।

বিশ্বপতির মুখখানা একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল।

তাঁহারা খানিক পরে যখন বিদায় লইলেন, তখন সে যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিয়া সে ডাকিতে লাগিল, "কল্যাণী, কল্যাণী—রাঙাবউ—"

উত্তর নাই।

ঘরে যেন মানুষ নাই,—ঘর এমনই নিস্তব্ধ। রাত্রে তবু একটু উসখুস শব্দও পাওয়া গিয়াছিল,—আজ এতটুকু শব্দ নাই।

ব্যস্ত হইয়া বিশ্বপতি ডাকিতে লাগিল—"রাঙাবউ, ওঠো—, দরজা খোল—"

তথাপি উত্তর নাই।

কি একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় বিশ্বপতির সারা হৃদয়খানা পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সে দরজা ছাড়িয়া জানালার কাছে গিয়া দেখিল কল্যাণী জানালাটিও বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

আশঙ্কা যেন সত্যেই পরিণত হইয়া যায়। রুদ্ধশ্বাসে জানালার এতটুকু একটা ফাঁক দিয়া বিশ্বপতি ঘরের ভিতরটা দেখিবার চেষ্টা করিল।

মেঝের উপর কল্যাণী শুইয়া আছে। বিশ্বপতির শত ডাকেও সে নড়িল না।

শঙ্কিত বিশ্বপতি দুই একজন নিম্নশ্রেণীর লোককে ডাকিয়া অবশেষে দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

কল্যাণী তখনও শুইয়া। বিশ্বপতি মাথার কাছে জানালাটা খুলিয়া দিতেই এক ঝলক রৌদ্র আসিয়া কল্যাণীর মুখখানার উপর পড়িল।

শান্ত স্থির মুখ, সে যেন ঘুমাইয়া আছে। বিশ্বপতি তাহার কপালে হাত দিল, বুকে হাত দিল, সে দেহ বরফের মতই শীতল। নাসিকায় হাত দিয়া সে পরীক্ষা করিল তাহার নিশ্বাস পড়িতেছে কি না। সকল পরীক্ষা শেষ করিয়া সে কল্যাণীর মাথার কাছে বসিয়া পড়িল।

দরজার নিকট হইতে কালুমিস্ত্রি সোদ্বেগে জিজ্ঞাসা করিল, "মা লক্ষ্মী না, দা-ঠাকুর?"

বিশ্বপতি একবার শুধু তাহার পানে তাকাইল। একটী শব্দ তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না। দেখিতে দেখিতে সমস্ত গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল, বিশ্বপতির কুলত্যাগিনী পত্নী কাল রাত্রে ফিরিয়া আসিয়া এখানেই আত্মহত্যা করিয়াছে। ছোট বড় স্ত্রী পুরুষ যে যেখানে ছিল, সকলেই ব্যাপারটা দেখিতে ছুটিয়া আসিল।

বিশ্বপতি কোন দিকে চাহিল না, একদৃষ্টে কেবল কল্যাণীর মুখের পানেই তাকাইয়া রহিল।

অভাগিনী, সত্যই বড় অভাগিনী। স্বামীর উপর নিদারুণ অভিমান বশে, কেবল স্বামীকে জব্দ করিবার জন্যই সে গৃহত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু জব্দ করিতে গিয়া জব্দ হইল সে নিজেই; নিজের শান্তি সুখ সে নিজেই নষ্ট করিয়াছে। সে রাণীর ঐশ্বর্য্য, সম্মান পাইয়াছিল। প্রভূত ক্ষমতাও তাহার করতলে ছিল। তবু এই কুটীরের মায়া, স্বামীর প্রেম, গ্রামের ডাক সে ভুলিতে পারে নাই; তাই সে ঐশ্বর্য্য, সম্মান, ক্ষমতা সব ফেলিয়া দীন বেশে আবার স্বামীর কাছে এই কুটীরেই ফিরিয়াছে। এই কুটীরেই সে তাহার শেষ নিঃশ্বাস ফেলিয়া গেল। এইখানে তাহার অন্তরে যে প্রেম প্রথম বিকশিত হইয়াছিল, সে প্রেমের সমাধি সে এইখানে এইরূপে দিয়া গেল।

মুখের উপর তাহার কি শান্তি, কি তৃপ্তিই না ফুটিয়া উঠিয়াছে। যদিও সে তাহার প্রিয়তমের স্পর্শ পায় নাই, তবু সান্নিধ্য পাইয়াছে। সেই যে তাহার মত কুলত্যাগিনীর পক্ষে যথেষ্ট পাওয়া।

একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বিশ্বপতি মুখ ফিরাইল।

কি নিদারুণ অভিশপ্ত জীবন তাহার। সে কিছুই পাইল না। যাহারা তাহাকে ভালো-বাসিয়াছিল তাহারা সবাই তাহার স্মৃতির জালে জড়িত হইয়া রহিল। কল্পনায় তাহাদের দেখা মিলিবে, সম্পত্তি মিলিবে, বাস্তবে তাহারা চিরদিনের জন্যই বিলীন হইয়া গেল।

ঠিক মাথার কাছেই একখানা পত্র পড়িয়াছিল,—কল্যাণীর হাতের লেখা। কাল অনেক রাত্রি অবধি ঘরে আলো জ্বলিয়াছিল। সে বোধ হয় বিশ্বপতির কাগজে তাহারই পেন্সিল দিয়া তাহাকেই পত্রখানা লিখিয়া গিয়াছে।

কল্যাণী লিখিয়াছে—

"আমায় তুমি ঘরছাড়া করতে চাও নিষ্ঠুর? একবার নিদারুণ অভিমানের বশে রাগে দুঃখে কেবল তোমায় জব্দ করবার জন্যেই স্বেচ্ছায় ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলুম। আজ যখন ভুল বুঝে ফিরেছি, তখন আর কি ফিরতে পারি,—তাই কি সম্ভব? আমি এসেছি—কোথাও যাব না। এখানে আমার জায়গা, আমি এখানেই থাকব। এইখানে যে শেষ শয্যা বিছাব, তুমি যখনি ঘরে আসবে তোমার মনে সেই স্মৃতিটাই দপ করে জ্বলে উঠবে। আমায় মন হতে তাড়িয়েছ, ঘর হতে তাড়াতে চাও,—পারবে না। আমি জোর করে দখল করব।

"আমি মরব,—হ্যাঁ, কেউ আমায় রক্ষা করতে পারবে না। এই রাত্রে তুমি আমার রুদ্ধ দরজায় ঘা দিয়ে ডাকলে কল্যাণী, রাঙাবউ। মন অধীর

হয়ে উঠল সে ডাকে। মনে হল—দরজা খুলে দিয়ে তোমার প্রসারিত দু'টি হাতের বাঁধনে নিজেকে ধরা দেই। কিন্তু না, আজ রাত্রে তুমি হয় তো সাময়িক উত্তেজনায় আমায় তোমার পাশে টেনে নেবে। রাত প্রভাতের সঙ্গে মিলবে কি—কেবল ঘৃণা আর অবজ্ঞা নয় কি?

"তোমায় আমি হেয় করব না। তুমি যেখানে উঠেছ, আমি সেইখানেই তোমায় রাখব। তুমি জানো—তোমার জন্যে একদিন নিজেকে ধ্বংস করেছি,—আজ প্রাণটাকেও নষ্ট করব।

"আজ আমার কি মনে পড়ছে জানো? এই ঘরে প্রথম যে দিন নূতন বউ হয়ে এসে ঢুকলুম, সেই দিনটার কথা। ফুলশয্যা এই ঘরেই হয়েছিল সে কথা মনে পড়ে কি? হয় তো তোমার মনে নেই, কিন্তু আমার মনে আছে। কেন না, সে দিনের স্মৃতি তুমি আজ ভুলে যেতে পারলেই বাঁচো, কারণ, সে দিনটাকে তুমি সেদিন প্রাণপণে এড়াতে চেয়েছিলে। আমি তা চাই নি; আমি চেয়েছিলুম সেই রাতটাকে সম্পূর্ণভাবে সার্থক করে নিতে, যার স্মৃতি চিরকালই আমার স্মৃতি-মন্দিরে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলবে।

"তার পর কত জ্যোৎস্নাসিক্ত রাত এসেছে। কত ফুলই কত দিন পেয়েছি। কত রাতে কত পাপিয়া কত কোকিল গান গেয়েছে। কিন্তু সে রাতটা আর পেলুম না। অনেক মুক্তা জহরত জীবনে পরতে পেয়েছিলুম, কিন্তু সেদিনে নিজের অনিচ্ছায় কেবল মায়ের আদেশ পালন করতে যে লোহাটা তুমি নিজের হাতে আমায় পরিয়ে দিয়েছিলে, তার মূল্য নেই। সে অমূল্য সম্পদ আজও আমি বড় যত্নে হাতে রেখেছি।

"ওগো, এ ভুল তো করতুম না—যদি তখন একটাবার আমায় ডাকতে—একটাবার বলতে—তুমি বেশ করেছ, আমার অসুখের খবর পেয়ে এত দূরে—পুরীতে ছুটে এসেছ।' তুমি আমায় রূঢ় কথা বললে। আমার অন্ধ অভিমান তাই আমায় নিয়ে এল সেইখানে—যেখানে আছে কেবল নিকষ কালো ঘন অন্ধকার। সেখানে, ওগো দেবতা—তুমি নেই, আছে কেবল শয়তান। আরাধ্য দেবতা, তিরস্কার করছ—কর, কিন্তু আমার ওই ঘর যে আমায় ডাক দিয়েছে,—আমায় গ্রামের পথ ঘাট যে আমায় ডাক দিয়েছে,—আমি দূরে সরে থাকব কি করে?

"আজ প্রাণ ভরে ওদের দেখে নিচ্ছি। জানালা দিয়ে দেখছি ঘুমন্ত পথটা পড়ে রয়েছে। তার এক দিকে অন্ধকার আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে, আর এক দিকে চাঁদের আলো আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। অদূরে ঘাট দেখা যাচ্ছে। ওইখানে বাসন মাজতে বসে কত দিন ওই গাছগুলোর পানে আনমনে তাকিয়ে থাকতুম। ঘাটের উপরকার বকুল গাছটা আজ আমার মতই রিক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওতে আজ ফুল ধরে নি, কিন্তু কত দিনই ও আমায় কত ফুল উপহার দিয়েছে।

"সব গেছে—কিন্তু স্মৃতি তো মর্ম হতে মিলায় নি গো। আজ যাওয়ার বেলায় সব যে একে একে মনে জাগছে। অতি ছোট কথা—ক্ষুদ্র ঘটনা-গুলোকেও তো আজ ছোট বলে মনে হচ্ছে না। দীর্ঘ পাঁচটা বছর এখানে কাটিয়েছি, সে তো বড় কম দিন নয়।

"নিঃসম্বল হয়ে আসি নি, সম্বল নিয়েই এসেছি। তবু যে কি আশা ছিল বলতে পারি নে। মনে করেছিলুম—হয় তো স্থান পাব,—দাসীর মত এক পাশে পড়ে থাকবার মত এতটুকু স্থান কি আমায় দেবে না? চন্দ্রাও তো স্থান পেত যদি সে আসত। কিন্তু সে আসে নি, কারণ তুমিই বলেছ তার লজ্জা আছে, সঙ্কোচ আছে। সে অভিনেত্রীর জীবন যাপন করে নি, তাই যে গ্রাম সে পেছনে ফেলে গেছে, সে গ্রামে সে আর আসবে না।

"কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—তার আসবার দরকার কি? সে অনেক পেয়েছে। এত বেশী আমি যে আশা করতেও পারি নে। সে তো আমার মত সব দিয়ে কেবল ব্যর্থতাই লাভ করে নি।

"ভুল বুঝো না গো,—আমি এখানে অভিনয় করে হাততালি নিতে আসি নি। যশ যথেষ্ট পেয়েছি—গৃহস্থ-ঘরের কল্যাণী বধূরূপে নয়, শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীরূপে। কিন্তু কে চেয়েছিল তা? সে দিনগুলো যে আমার জীবনের অভিশাপ, দুঃস্বপ্ন।

"সম্বল নিয়ে এসেছি, আমার সামনে শিশিতে রয়েছে। কতটুকু? মাত্র কয়েক বিন্দু। কিন্তু ওতেই আমার জীবন নষ্ট হবে। ওই আমার অসময়ের বন্ধু,—আমায় চিরদিনের জন্যে শান্তি দেবে।

"তার পর? তার পর অনন্ত লোকে অনন্ত জ্বালা। আমি মানি—সব মানি—ইহলোক পরলোক, স্বর্গ নরক,—সব। আজ মরণ নিশ্চিত

জেনে ভাবছি—ওখানে আমার জন্যে কি শান্তি তোলা আছে, আমায় আমি কি পাব।

"জানি—সে জগতেও আমি তোমায় পাব না, সেখানে নন্দা তোমার পাশে এসে দাঁড়াবে,—আমায় বহু দূরে থাকতে হবে। তবু আমি ছায়ার মত তোমার অনুসরণ করব, আমি তোমায় নিজের করবই। সেদিন নন্দাকে তার সকল দাবী মিটিয়ে নিয়ে সরে যেতে হবে, চন্দ্রা বহুদূরে থাকবে, তুমি সেদিন একান্তভাবে আমারই হবে। এই আশা নিয়ে আমি লক্ষ জন্ম ঘুরব। একটা জন্মে সার্থকতা লাভ করবই; সেই আশায় আমি লক্ষ জন্ম কাটিয়ে দেব।

"তোমায় মিনতি করি—আমায় একেবারে মন হতে মুছো না, আমার স্মৃতির সমাধি দিয়ো না। এই ঘরের পানে তাকাতে আমার কথা মনে করো; ভেবো—এইখানে আমি শুয়েছিলুম। জন্ম জন্ম আমি তোমার স্মৃতি বুকে নিয়ে ফিরব, অনন্ত যন্ত্রণা সইব, তুমি আমার জন্যে এইটুকু করতে পারবে না?

"বিদায়, ভোরের আর বেশী দেরী নেই,—শেষ রাতের শুকতারাটি জেগে উঠছে দেখতে পাচ্ছি। আমায় আজ যেতেই হবে, থাকার যো নেই। আমার বিছনাটার পাশে একটাবার দাঁড়িয়ো গো, এই আমার অনুরোধ, একটাবার ডেকো—রাঙাবউ, কল্যাণী—

"আমি চলার পথে তোমার সেই ডাকটা সম্বল করে চলব। বিদায়—

অভাগিনী কল্যাণী।"

"রাঙাবউ—কল্যাণী—"

বিশ্বপতি হঠাৎ এই অভাগিনী কুলত্যাগিনীর মুখের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িল; তাহার দুইটী চোখের জল ঝর ঝর করিয়া মৃতার মুখের উপর একপসলা বৃষ্টির মতই ঝরিয়া পড়িল।

সমাপ্ত

ব্রতচারিণী

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

ব্রতচারিণী

১

"জ্যোতি—"

ঠাকুরদাদার গুরুগম্ভীর আহ্বান জ্যোতির্ময়ের কাণে গিয়া পৌঁছিল। সে তখন নিজের কক্ষে একখানা বই লইয়া অন্যমনস্কভাবে তাহার পাতা উল্টাইতেছিল।

এ আহ্বানকে ঠেকাইয়া রাখিবার সাহস তাহার ছিল না; তাই তাড়াতাড়ি বই ফেলিয়া সে উঠিয়া পড়িল।

ঠাকুরদাদা বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় ভারী রাশভারি লোক। এমন লোক ছিল না যে তাঁহাকে ভয় না করিত। জ্যোতির্ম্ময় তাঁহাকে বড় ভয় করিত। কোন দিন তাঁহার আহ্বান সে উপেক্ষা করিতে পারে নাই। তাঁহার মুখের উপর একটা কথা কহিবার সাহস তাহার কখনও হয় নাই।

বিহারীলাল নিজের কক্ষে বিছানার উপর মোটা তাকিয়াটায় ঠেস দিয়া বসিয়া ছিলেন। সম্মুখে গড়গড়ার উপরে কলিকায় সদ্যসাজা অম্বরী-তামাক পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছিল, সে দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না।

জ্যোতিঃ দরজার বাহির হইতে একবার উঁকি দিয়া দেখিল, ঠাকুরদার মুখের ভাবটা কি রকম। বিহারীলালের মুখখানা স্বভাবতঃই গম্ভীর, হাসি তাঁহার মুখে খুব কমই ফুটিত। লোকে বলিত, উহা জমাদারী চাল। কিন্তু চালই হোক অথবা প্রকৃতই হোক, সকলকেই তাঁহার সম্মুখে সঙ্কুচিত হইতে হইত।

জ্যোতির্ম্ময় লক্ষ্য করিয়া দেখিল—আজ ঠাকুরদার মুখখানা বড় বেশী রকম গম্ভীর,—প্রশস্ত ললাটে কয়েকটা রেখাও ভাসিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার আহ্বান নিতান্ত সাধারণ ধরণের ছিল না; তাহাতে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল যাহা মাথার মধ্যে গোল বাধাইয়া দেয়। অপরাধ করিয়া গোপন করিবার প্রয়াস ব্যর্থ করিতে, অপরাধীকে সম্মুখে আনিতে যে আদেশ প্রচারিত হয়, ইহা ছিল তাহাই।

ঠাকুরদার আদরের খানসামা রাখাল দাস কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইতেছিল,—দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া খোকাবাবুকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া সে কারণটা বুঝিয়া লইল। সে বেশ বুঝিল, বাবুর আর একটা ডাক না আসিলে খোকাবাবুর এ জড়তা দূর হইবে না। সে নিজেই খোকাবাবুর কুণ্ঠা দূর করিয়া দিবার জন্য একটু উঁচু সুরেই বলিল, "এই যে খোকাবাবু এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ঘরে চলুন, বাবু অনেকক্ষণ হ'তে আপনার খোঁজ করছেন।"

জ্যোতির্ম্ময়ের ইচ্ছা হইতেছিল তাহার পরিপুষ্ট গণ্ডে ঠাস করিয়া একটা চড় বসাইয়া দেয়; কিন্তু ততদূর পৌঁছিতে তাহার সাহস হইল না। মাথা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে সে ভিতরে প্রবেশ করিল।

কর্ত্তাকে অত্যন্ত অন্যমনস্ক দেখিয়া রাখাল মনে করাইয়া দিল, "বাবু, তামাক পুড়ে যায়—"

বিহারীলাল সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ, এই যে নেই। জ্যোতি এসেছে?"

জ্যোতির্ম্ময় বিনীতভাবে সম্মুখে সরিয়া দাঁড়াইল।

রাখাল উত্তর দিল,—"এই যে খোকাবাবু,—"

বিহারীলাল চোখ তুলিয়া পৌত্রের মুখের উপর ধরিলেন,—"তাই তো,—কখন এসেছ তা আমি জানতে পারি নি। বসো এখানে, কথা আছে। বিশেষ কোন কাজ করছিলে না তো?"

জ্যোতির্ম্ময় মাথা চুলকাইয়া অত্যন্ত বিনীত-ভাবেই উত্তর দিল,—"না, একখানা বই দেখছিলুম।"

"আজকালকার রাবিশ নভেল তো?"

ঠাকুরদাদা ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন।

জ্যোতির্ম্ময় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "না দাদা, আমার পড়ার বই। আমি নভেল পড়ি নে।"

খুসি হইলেও সে ভাব ঠাকুরদার মুখে ফুটিল

না, বলিলেন, "হ্যাঁ, রাবিশ নভেলগুলো পড়ো না, ওতে মনের মধ্যে ক্লেদ জমিয়ে দেয়। বাস্তবিক দেখেছি—নভেলের মধ্যে এমন সব ব্যাপার থাকে যাতে ছেলেদের মাথা একেবারে খারাপ করে দেয়, —তাদের জীবনটাই তারা নভেল বলে মনে করে। যাক গিয়ে, দাঁড়িয়ে রইলে কেন,—বসো।"

কুণ্ঠিতভাবে জ্যোতির্ময় ফরাসের এক প্রান্তে বসিয়া পড়িল।

ঠাকুরদা তেমনি গম্ভীর মুখে তামাক টানিতে লাগিলেন। দেয়ালের ঘড়িতে টক টক শব্দ করিতে করিতে বড় কাঁটাটা মিনিটের পর মিনিটের ঘর ছাড়াইয়া চলিল। কতক্ষণ যে জ্যোতির্ময় বেচারাকে এমনভাবে চুপচাপ বসিয়া থাকিতে হইবে, সে দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না।

যখন গড়গড়ার নল হইতে আর ধূম বাহির হইল না, তখন তিনি নলটা নামাইয়া রাখিলেন। দুইটী চোখের তীক্ষ্ণ তীব্র দৃষ্টি জ্যোতির্ময়ের মুখের উপর রাখিয়া কোন ভূমিকা না করিয়াই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুনলুম তুমি না কি বিলাতে যাচ্ছো?"

কথাটা বড় গোপনেই ছিল। বন্ধুমহলে এ কথা লইয়া বেশ ঘোঁট চলিতেছিল, কিন্তু সে গণ্ডী ছাড়াইয়া সে কথা কেমন করিয়া যে এতদূরে এই পল্লীগ্রামে কৃষ্ণ-প্রকৃতি দাদার কাণে আসিল—ইহাই আশ্চর্য্য। সুযোগ জুটিয়াছিল, বন্ধুদের উৎসাহ ছিল। সাহস করিয়া সে এখনও এ কথা বাড়ীতে তুলিতে পারে নাই, পাছে একটা গণ্ডগোল বাধে, তাহার আশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ সম্মান সে লাভ করিয়াছিল, বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই তাহাকে বিলাতে প্রেরণ করা হইতেছিল।

ঠাকুরদা ইহাতে রাগ করিবেন—কিন্তু তাহা কয় দিন থাকিবে? দু'দিনে সে রাগ পড়িয়া যাইবে, আবার তিনি যে মানুষ তাহাই হইবেন। তাঁহার এই দুদিনের বিরক্তির ভয়ে সে এমন সুযোগ ছাড়িয়া দিবে?

শিক্ষার এমন সুযোগ সে ত্যাগ করিতে পারিবে না; কারণ তাহার অন্তরে জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবল।

কথাটা শুনানো হইতই, তবে এমন ভাবে নয়। দূরে থাকিয়া পত্র দ্বারা জানাইলে ভয় বিশেষ থাকে না, জ্যোতির্ময় তাহাই সঙ্কল্প করিয়াছিল। আজ সামনাসামনি সেই কথা শুনিতে ও বলিতে হইবে ভাবিয়া সে ঘামিয়া উঠিয়াছিল। মাথা নত করিয়া সে ভাবিতে লাগিল কোন্ বিশ্বাসঘাতক এ সংবাদ এখানে আনিল? বিহারীলাল তাহার বিবর্ণ মুখখানার পানে তখনও তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলেন; সে যতবার মাথা তুলিতে গেল সেই তীব্র দৃষ্টির জন্য ততবারই মাথা নত হইয়া পড়িল।

বিহারীলাল বলিলেন, "কথার উত্তর দিতে পারছ না কেন জ্যোতি,—কথাটা কি সত্য?"

কি বলিবে তাহা জ্যোতির্ময় ঠিক করিতে পারিতেছিল না। জীবনে কখনও সে মিথ্যা কথা বলে নাই, আজও সে এই সত্যটাকে মিথ্যার আবরণ দিয়া ঢাকিতে পারিতেছিল না। সে নতমুখে বসিয়া রহিল, ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম দেখা দিল, সে উত্তর দিতে পারিল না।

"জ্যোতি—"

অকস্মাৎ তীব্র কঠোর বাণীর পরিবর্ত্তে এই শান্ত কোমল আহ্বান সেই একই মুখে শুনিতে পাইয়া বিস্ময়ে জ্যোতির্ময় মুখ তুলিল। ঠাকুরদার মুখের সে ভয়াবহ গম্ভীরতা নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া গিয়া শান্ত কোমলতা বিরাজ করিতেছে।

"তুমি কি পাগল হয়েছ জ্যোতি? তুমি বিলাত যাবে এ কথা মুখে বললেও অন্তরে এ ভাব কখনও পোষণ করতে পার না, এই কথাটী বললেই তো ফুরিয়ে যেত দাদু। আমি আজ অজ্ঞাত হাতের পত্রখানা পেয়ে একেবারে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলুম,—এ কি কখনও হতে পারে? হিন্দু ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলে তুমি, বিধবা মায়ের সন্তান, বুড়ো ঠাকুরদার চোখের তারা,—আমার বংশের দুলাল, আমার শ্রাদ্ধাধিকারী, তোমার দ্বারা কি এমন কায হতে পারে দাদা? একবার মুখ ফুটে শুধু সেই কথাটী বল দেখি ভাই,—এ কথা সম্পূর্ণ মিছে; খেয়ালের বশে কোন দিন মুখে আনলেও কাযে এ কখনই করতে পার না।"

বৃদ্ধ দেখিতেছিলেন—বয়ঃপ্রাপ্ত পৌত্র,—বলপ্রকাশে নিজের মান যাইবার সম্ভাবনা—কৌশলে স্বকার্য্য উদ্ধার করিতে হইবে।

সমুদ্র পার হইলেই যে অহিন্দুর দেশ হয় এবং সেই দেশে গেলে হিন্দুর জাতিপাত হয়, ইহা দেশের প্রবীণদের মজ্জাগত ধারণা হইয়া আছে, তাহা জ্যোতির্ময় বেশ জানিত। এই সব গোঁড়ামীর জন্যই জ্যোতির্ময় হিন্দুধর্ম্মে শ্রদ্ধা হারাইয়াছিল।

জ্যোতির্ময় ধীর কণ্ঠে বলিল, "বিশ্ববিদ্যালয় হতে আমায় পাঠাবার কথা হচ্ছে, বিজ্ঞান শিখবার—"

দীপ্ত হইয়া উঠিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "চুলোয় যাক

তোমার বিশ্ববিদ্যালয়। যে ছেলে ভাল হবে তাকেই যে বিলাত পাঠাতে হবে, এমন কোন কথা থাকতে পারে না। ওই যে তোমাদের মনে কি ধারণা জন্মে গেছে বিলেতে না গেলে যথার্থ শিক্ষা হয় না, এও কি একটা কথা হতে পারে? যারা মানুষ হতে চায়, তারা এই দেশের শিক্ষাতেই মানুষ হতে পারে বলে আমার বিশ্বাস, যেমন বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, হেমচন্দ্র প্রভৃতি হয়েছেন। তুমি কি বলতে চাও এঁরা বিলেতে যান নি বলে যথার্থ শিক্ষা লাভ করেন নি? তোমরা বলবে—বিলেতে না গেলে সম্পূর্ণ ভাবে শেখা যায় না, এ সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। সব ছেড়ে দিয়ে আমি বলছি হ্যাঁ, সে দেশে গেলে আর কিছু না হোক, বিলাসিতা শেখা যায় বটে। এই যে হাজার হাজার বিলেত-ফেরত কালাসাহেব আমাদের দেশে রয়েছেন, দেখাও এঁরা বিশেষভাবে কতখানি শিক্ষা পেয়েছেন। এঁরা যদি উপার্জ্জন করেন দৈনিক এক শিলিং, ব্যয় করে বসেন এক গিনি। এতেই বোঝা যায়, কতখানি আর কি শিক্ষা এরা পেয়েছেন। এঁরা আরও শিখেছেন—দেশকে—বিশেষ করে দেশবাসীকে ঘৃণা করতে। পল্লীগ্রামে যারা এককালে বাস করত, দু'দিন সহরবাসী হয়ে তারা যেমন পল্লীগ্রামকে ঘৃণা করতে শেখে, পল্লীর জল হাওয়া আর তাদের সহ্য হয় না, পাকা সহুরে চাল দেখায়,—এই সব বিলেত-ফেরতরাও দু'পাঁচ বছর বিলেতে কাটিয়ে এসে তেমনি—বা ততোধিক—নিজেদের দেশকে ঘৃণা করে, দেশবাসীকে ঘৃণা করে। এরা এই দেশেরই টাকা নেবে, নিজেদের বিলাসিতায় তা খরচ করবে, অথচ এমন ভাব দেখাবে, যেন এ দেশে বাস করে তারা এ দেশকে ধন্য করে দিচ্ছে। দেশের আচার-ব্যবহারকে এরা অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে, প্রাণপণে এ সব এড়িয়ে চলে। ধর্ম্ম এদের কাছে ছেলেখেলার জিনিস, প্রচলিত ঠাকুর দেবতার মূর্ত্তি হয় পুতুল, শালগ্রাম হয় পাথরের নুড়ি। দেবতার কাছে মাথা নোয়ানো দূরে যাক, পাছে দেখতে হয়, এই ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে এরাই। ব্রাহ্মণের ছেলে পৈতা ফেলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। আহারে বিহারে, ব্যবহারে এরা খাঁটি ইংরাজকেও চমক লাগিয়ে দেয়। অনুকরণপ্রিয় বাঙ্গালী যতদিন না নিজেকে সংযত করতে পারবে, ততদিন তার ঘর ছেড়ে বাইরে যাওয়াই অন্যায়। তাই বলছি, যদি কোন দিন তুমি বিলেতে যেতে চাও, জেনো—কখনই আমি অনুমতি দেব না।"

ঠাকুরদার দীর্ঘ বক্তৃতায় জ্যোতি বাধা দিল না, কথা শেষ হইলে সে একটা কথাও বলিল না, যেমন চুপ চাপ বসিয়া ছিল, তেমনি বসিয়া রহিল। বিহারীলাল শ্রান্তভাবে তাকিয়ার উপর ঠেস দিলেন; আবার বলিতে লাগিলেন, "তোমার পরে আমার কতটা আশা ভরসা আছে তা কি তুমি জান জ্যোতি? বুড়ো হয়েছি, কবে মরে যাবো তার ঠিক নেই। বড় আশা করে তোমার বাপ ও কাকাকে মানুষ করেছিলুম," নিজে তাদের শিক্ষার ভার নিয়েছিলুম, উপযুক্ত রকমে শিক্ষা দেওয়া আমার সার্থক হয়েছিল। এরা দু'ভাই একজন বি-এ, একজন এম-এ পাস করেই পণ্ডিত হয় নি, রীতিমত সংস্কৃত পড়েছিল, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র পড়েছিল। এরা কেউ আজকালকার ছেলেদের মত ধর্ম্মপ্রসঙ্গ গাঁজাখোরের তৈরী বলে উড়িয়ে দিত না। ভগবান আমার সকল সুখে বাদ সেধেছেন জ্যোতি, তাই বড় ছেলে তোমার বাপকে যখন হারালুম, তখন আমার বয়স প্রায় পঞ্চাশ, তোমার বয়স মাত্র তিন। তারপর তোমার কাকা—আর, কয়দিনের কথা সে জ্যোতি, সেও আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে গেল। আমি সব শোক—সব দুঃখ ভুলে গেছি দাদু,—শুধু তোর দিকে চেয়ে, তোকে নিয়ে আমি সব ভুলে রয়েছি।"

একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস তিনি কোন মতে দমন করিতে পারিলেন না।

ব্যথিত কণ্ঠে জ্যোতি ডাকিল, "দাদু, আমায় মাপ করতে হবে, আমি যাব না।"

শান্তমুখে বিহারীলাল বলিলেন, "হ্যাঁ, তাই মনে রেখে দিয়ো ভাই। মনে রেখো, তুমি ছাড়া এই বুড়োর আর কেউ নেই। আর কয়দিন বাঁচব ভাই, প্রায় সত্তর বছর বয়েস হল, নেহাৎ সেকালের হাড় বলে এখনও বেঁচে আছি। মনে রেখো আমার পিণ্ড তোমায় দিতে হবে, মুখ-অগ্নি তোমায় করতে হবে, আর আমার কেউ নাই। যাও দাদা, আর আমার কথা নেই।"

নতমুখে জ্যোতির্ম্ময় বাহির হইয়া গেল। বিহারীলাল রাখালের পানে হাসিমুখে চাহিয়া বলিলেন, "আর এক ছিলিম তামাক দে রাখাল! বুঝলি রে, ও পত্রখানা একেবারে মিথ্যে লেখা। জ্যোতি না কি ব্রাহ্ম হবে, ব্রাহ্মের মেয়ে বিয়ে

করে বিলেত যাবে, হ্যাঁ রে, এ কখনও হতে পারে, বল দেখি? আমি আগেই জেনেছি—ও যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অতগুলি ছেলের মধ্যে ভাল হয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে ওর অনেক শত্রুর সৃষ্টি হয়েছে। এ পত্র ওর কোন শত্রুর লেখা, এ ঠিক বলে দিচ্ছি। আমি সব বুঝি রে, সব জানি। আমার সন্দেহ হচ্ছে এ পত্র আর কারও নয়, তাদের। যাই হোক, আমি বিশ্বাস করছি নে, সে জানা কথা।"

পরম শান্তিতে তিনি তামাক টানিতে লাগিলেন।

২

বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় নিকষ কুলীন ছিলেন। এখনও অনেক অতি বৃদ্ধ বৃদ্ধার মুখে কৌলিন্যের গৌরব শুনিতে পাওয়া যায়; বিহারীলালও নিজেদের কুলীনত্বের কথা ভাবিয়া গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিতেন। তাঁহার পিতা যে কয়েকটি বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি ঘরণী গৃহিণী ছিলেন, বিহারীলাল তাঁহারই পুত্র।

কুলীন হইলেও বিহারীলাল পূর্ব্বপুরুষের পন্থানুসরণ করেন নাই; তিনি একটি মাত্র বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার দুইটি মাত্র পুত্রও ছিল,—জ্যেষ্ঠ জ্যোতির্ম্ময়ের পিতা প্রকাশ; কনিষ্ঠ প্রতাপ, তাঁহার একটি মাত্র কন্যা ইভা বর্ত্তমান।

জ্যোতির্ম্ময়ের মাতা ঈশানী বর্ত্তমানে এ সংসারের গৃহিণী, ইভার মাতা এখানে থাকিতেন না।

প্রতাপের বিবাহ হইয়াছিল কলিকাতায়; তাঁহার স্ত্রী বেশ শিক্ষিতা মেয়ে ছিলেন। পল্লীগ্রামে আসিয়া তিনি প্রথমবারেই হাঁপাইয়া উঠিয়াছিলেন, জানিতে পারিয়া বিহারীলাল পুত্রবধূকে সেই যে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন—আর আনেন নাই। পৌত্রী জন্মিয়াছিল—সে সংবাদও তিনি পাইয়াছিলেন। মন বিচলিত হইয়া উঠিলেও তিনি পৌত্রীর জন্য পুত্রবধূকে আর এখানে আনেন নাই। প্রতাপ অতি কষ্টে অন্যকে দিয়া একবার কথাটা তুলিয়াছিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ তাঁহাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার জন্যে তাঁকে এখানে এনে দরকার নেই প্রতাপ, জানোই তো,—এখানে এলে বউমার ভারি কষ্ট হয়। তোমার মেয়েটিও মায়ের কাছে সেখানে থাক, ভগবান দিন দিলে যে কোন রকমে একবার তাকে দেখতে পাবই, সে জন্যে এখন ব্যস্ততা নিষ্প্রয়োজন। তুমি বরং মাঝে মাঝে সেখানে যেয়ো, তাদের দেখেশুনে এসো। আমি যে এখন পৌত্রীকে দেখতে পেলুম না, এতে আমার একটুও দুঃখ নেই।"

দুঃখ যে নাই তাহা প্রতাপ জানিতেন। পিতার বুকটা অসহ্য বেদনায় ফাটিয়া গেলেও তিনি তাহা প্রকাশ করিবেন না, পুত্রের কাছেও নয়। পিতৃভক্ত পুত্র পিতার বিরক্তি ও দুঃখ উৎপাদন করিতে স্ত্রীকে আর এখানে আনিবার প্রস্তাব করেন নাই; কিন্তু ইভাকে একবার না দেখাইয়া থাকিতে পারিলেন না।

চতুর্থবর্ষীয়া বালিকা ইভা পিতার সহিত এক দিনের জন্য রামনগরে আসিয়াছিল। পদ্মফুলের মত মেয়েটিকে পিতামহ বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন, আনন্দে তাঁহার দুই চোখ দিয়া জলধারা গড়াইয়া পড়িল।

পিতার স্নেহ দেখিয়া প্রতাপের প্রাণ বিগলিত হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, "ইভা এখানেই থাক না, বাবা, বউদির কাছে সে বেশ থাকতে পারবে এখন। জ্যোতির সঙ্গে ওর খুব আলাপ হয়ে গেছে, দু'জনে বেশ খেলছে।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বিহারীলাল বলিলেন, "না প্রতাপ, আমি তা পারব না, এতটুকু শিশুকে মাতৃহারা করবার মত সাহস আমার নেই। তুমি ইভাকে যেখান হতে এনেছ, সেখানে রেখে এসো। বড় হয়ে স্বেচ্ছায় যদি আসতে চায় তখন আসবে।"

প্রতাপ বিকৃতমুখে বলিলেন, "বাবা, গোখরো সাপ কখনও বিষহীন ঢোঁড়া হয় না তা তো জানেন। বড় হয়ে ইভা যে শিক্ষা পাবে, তা বুঝতে পারছেন তো, তবে কেন ওকে সেখানে পাঠাতে চাচ্ছেন? তাদের বাড়ীর আচার বিচার আলাদা, শিক্ষা আলাদা। সে সংসারে যে মানুষ হবে, সে যে আমাদের সঙ্গে ঠিক মিলতে পারবে না, তা আপনিও তো জানেন বাবা। ইভা শিশুমাত্র, তাকে সে সংসর্গ ছাড়াতে পারলে আমাদের উপযুক্তভাবে গঠন করে নেওয়া যাবে। সে সংসর্গে বড় হলে,—যে শিক্ষা যে আচার ব্যবহার তার মনে প্রাণে বদ্ধমূল হয়ে যাবে, তা কি আর দূর করা যাবে? সেখানে রাখলে ঘরের মেয়ে যে একেবারেই পর হয়ে যাবে বাবা?"

বিহারীলাল শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "ভগবানের যদি তাই ইচ্ছা হয়, তবে অবশ্যই তা হবে প্রতাপ,

তুমি আমি চেষ্টা করলেই কি তা খণ্ডন করতে পারব? তাই বলে মায়ের বুক হতে জোর করে সন্তান কেড়ে নিয়ে যে নিজের কাছে রাখবে, তোমার ব্যাপকে এমন নির্ম্মম পাষণ্ড মনে করো না।"

ইহার পর প্রতাপ ইভাকে তাহার মায়ের কাছে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলেন।

তিনি আরও দুই একবার স্ত্রীকে রামনগরে পিতার নিকটে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু জয়ন্তী কিছুতেই পল্লীগ্রামে আসিতে আর রাজী হন নাই, ইভাকেও আর আসিতে দেন নাই। অপমানিত ও বিরক্ত প্রতাপ নিজেই কলিকাতায় শ্বশুরালয়ে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন।

কয়েক বৎসর পরে প্রতাপ অত্যন্ত কঠিন ব্যারামে পড়িলেন। তখন তাঁহার নিষেধ উপেক্ষা করিয়া বিহারীলাল পুত্রবধূকে সংবাদ দিলেন। দুইদিন পরে জয়ন্তী যেদিন কন্যাসহ রামনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সেইদিনই প্রভাতে প্রতাপ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। শব তখন শ্মশানে। বিহারীলাল পৌত্রকে সঙ্গে লইয়া পুত্রের সৎকার করিতে গিয়াছেন। কথাটা ভাবিতেও হৃদয় ফাটিয়া যায়,—পিতৃভক্ত উপযুক্ত দুইটী পুত্রই চলিয়া গেল,—মরণ-পথযাত্রী পিতা বাঁচিয়া রহিলেন, দুইটি পুত্রের সৎকার করিলেন!

সে আজ চার বৎসর পূর্ব্বের কথামাত্র, জ্যোতি তখন থার্ড ইয়ারে উঠিয়াছে। প্রতাপের বড় ইচ্ছা ছিল, জ্যোতিকে মানুষ করিয়া দেখিয়া শুনিয়া যাইবেন; কিন্তু নিষ্ঠুর কাল তাঁহার আশা পূর্ণ হইতে দিল না।

সেদিন সন্ধ্যার পরে দাহ শেষে বৃদ্ধ পিতা কিছুতেই বাড়ী আসিতে পারিতেছিলেন না,—জ্যোতির্ম্ময় তাঁহাকে অতিকষ্টে ধরিয়া আনিয়াছিল। বাড়ী আসিয়াই তিনি শুইয়া পড়িয়াছিলেন, আর উঠিতে পারেন নাই।

পরদিবস প্রাতে তিনি শুনিতে পাইলেন পুত্রবধূ ও পৌত্রী আসিয়াছে। তাঁহার মাথার মধ্যে দপ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল! অকস্মাৎ চেঁচাইয়া উঠিয়া তিনি বলিলেন, "বউমা, ওদের এখনি আমার বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে বল; আমি আর ওদের মুখ দেখতে চাইনে, ওদের সঙ্গে আমার আর কোনও সম্পর্ক নেই।"

উষ্ণ-প্রকৃতি জয়ন্তী অভিমানে কাঁদিয়া তৎক্ষণাৎ কন্যা লইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। জ্যোতির্ম্ময়ের মাতা ঈশানী তাঁহার হাত দু'খানা ধরিয়া শান্ত, সংযত কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি করছ কি ভাই ছোট বউ, ঠাকুরের কথা শুনে রাগ করে চলে যাচ্ছো কোথায়? ওঁর কি এখন মাথার ঠিক আছে,—এ রকম সময়ে কারও কি মাথার ঠিক থাকে ভাই? যাঁর বয়স সত্তর বছর হয়েছে,—উপযুক্ত দু'টি ছেলে, নাতি, নাতনী রেখে কোথায় তিনি যাবেন, তা না হয়ে সেই দু'টী ছেলে গেল, তিনিই তাদের দাহ করে এলেন,—ভাব দেখি কি রকম তাঁর অবস্থা? এমন শোকে মানুষ যে পাগল হয়ে যায় বোন, ভাব দেখি। ওঁর দিকে একবার চাও, তার পরে রাগ করো।"

জয়ন্তী চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "শুধু তো ওঁর ছেলেই যায়নি দিদি, আমার স্বামী গেছে, ইভুরও বাপ গেছে। শোক যে ওঁর একার শুধু নয়, আমাদেরও বটে, এই কথাটা একবার ভাবলে হতো না কি? না, ভাই, দিদি, আমায় এখানে তুমি থাকতে বল না; এ রকম অপমান সয়ে আর কেউ থাকলেও থাকতে পারে—আমি পারিনে। আমারই বা কি ভাই,—তাঁর যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলের সঙ্গে সম্পর্ক ফুরিয়ে গেছে। মেয়েটিকে নিয়ে যেখানে সেখানে পড়ে থাকব;—বিধবার ভাবনাটাই বা কি, তুচ্ছ দু'টো ভাত খাওয়ার জন্যে—যেখানে খুসি থাকলেই হল।"

ঈশানী আর কথা কহিতে পারিতেছিলেন না, নীরবে অঞ্চলে চোখের জল মুছিতে লাগিলেন।

তাঁহার সকল অনুনয় ব্যর্থ করিয়া অস্নাতা, অভুক্তা জয়ন্তী, তখনই কন্যাকে লইয়া গোযানে উঠিয়া বসিলেন। ঈশানী আর্ত্তভাবে কাঁদিয়া বলিলেন, "চললে ছোট-বউ? এখনও নিজের ভালমন্দ বুঝতে পারলে না, কিন্তু এর পর এই কাযের জন্যেই তোমায় অনুতাপ করতে হবে।"

জয়ন্তী গোপনে চক্ষু মুছিয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন, "না দিদি, আমি জানি—এর জন্যে আমায় কোন দিনই অনুতাপ করতে হবে না। এখন বরং আমার এখানে থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল, আমার বুদ্ধিতে আমি এই বুঝেছি।"

সেই ঘটনার পর সুদীর্ঘ চারিটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। জ্যোতির্ম্ময় এখন চতুর্ব্বিংশতিবর্ষীয় যুবক, ইভা পঞ্চদশবর্ষীয়া কিশোরী। জ্যোতির্ম্ময় কলিকাতায় বোর্ডিংয়ে থাকিত। সে স্থান হইতে ইভার মাতুলালয় খুব কাছে ছিল। প্রায় প্রত্যহই

সে ইভার সহিত দেখা করিত। বিহারীলাল পুত্রবধূর উপর বিরক্ত হইয়া ইভার সহিত সকল সম্পর্ক উঠাইয়া দিয়াছিলেন, জ্যোতির্ময় উঠাইতে পারে নাই, কারণ ইভাকে সে বড় ভালবাসিত। বাস্তবিকই ইভাকে যে দেখিত, সে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না।

ইভার মামা বড় ডাক্তার ছিলেন। তিনি বিলাত হইতে নিজের নামের পিছনে এম-ডি উপাধি জুড়িয়া আনিয়া দেশে জাঁকিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার দুইটি কন্যা, একটি পুত্র। পুত্র রবীন্দ্র জ্যোতির্ময়ের সমবয়স্ক। উভয়ে একসঙ্গে এবার পরীক্ষা দিতেছে। পরীক্ষা সমাপনান্তে সে বিলাত যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল।

প্রফেসর সুরেশ মিত্র জ্যোতির্ময়কে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, অনেক সময় অনেক সাহায্য করিতেন। ইনি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম ছিলেন। বিজ্ঞানে জ্যোতির্ময়ের অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়া তিনিই বিশেষ করিয়া সকলের চক্ষু তাহার দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, এবং তাহাকে বিলাতে পাঠাইয়া শিক্ষা দেওয়ার সম্বন্ধে তিনিই বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন।

তিনি জ্যোতির্ময়কে উৎসাহিত করিতেছিলেন, তাঁহার স্ত্রী, কন্যা দেবযানী, সকলেই জ্যোতির্ময়কে উৎসাহ দিতেছিলেন। দেবযানী সেকেণ্ড ইয়ারে পড়িতেছিল। জ্যোতির্ময় সকল সময়েই প্রফেসরের বাড়ীতে যাতায়াত করিত এবং পড়ায় ও অঙ্কে দেবযানীকে সাহায্য করিত।

এই ব্রাহ্ম-পরিবারের উৎসাহ পাইয়া জ্যোতির্ময়ের মনের কুণ্ঠিত ভাবটা দূর হইয়া গিয়াছিল। সুরেশবাবু তাহাকে বুঝাইতেছিলেন,—সে এতটা লেখাপড়া শিখিয়া পল্লীগ্রামে গিয়া তাহার দাদুর মত জীবন যাপন করিতে কখনই পারিবে না। জ্যোতির্ময়ও তাহাই বুঝিয়াছিল, পল্লীগ্রামের উপর তাহার কেমন একটা বিসদৃশ ঘৃণা জন্মিয়া গিয়াছিল। তাহার পিতার কথা মনে ছিল না; কারণ, সে তখন মাত্র দুই বৎসরের। কিন্তু কাকাকে সে দেখিয়াছিল, কাকার পরিচয়ও পাইয়াছিল। প্রতাপ বি-এ পাস করিয়াছিলেন। তাহার অন্তর নিস্পৃহ ছিল। পল্লীগ্রামে থাকিয়া পল্লীর হিতসাধন তিনি জীবনের ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিলাত যাইবার কথায় দাদুর মুখভাবটা কিরূপে পরিবর্তিত হইয়া যাইবে, তাহা কল্পনায় আঁকিয়া জ্যোতির্ময় সে কথা সাহস করিয়া এ পর্য্যন্ত কাহাকেও বলিতে পারে নাই। এতদিন সে এখানে আসিয়াছে,—কথাটা বলি বলি করিয়াও বলিতে পারে নাই, পাছে সে কথা কোন প্রকারে কঠোর-প্রকৃতি দাদুর কাণে উঠিয়া পড়ে। দাদু যে কি প্রকৃতির লোক, একমাত্র হিন্দু ছাড়া আর সকল জাতিকে কতখানি ঘৃণার চক্ষে দেখেন, তাহা সে বেশ জানিত। ব্রাহ্মদের বিশেষ করিয়া তিনি দেখিতে পারিতেন না, এবং ইহাদের যে কোন ধর্ম্মই নাই, ইহা মুখে তিনি স্পষ্ট বাক্যে প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না।

এই কঠিন বিচারকের সম্মুখে আপনিই মাথা নত হইয়া পড়িত, কথা একটাও ফুটিত না। কাযেই ঠাকুরদার মনে যে ধারণা বদ্ধমূল ছিল, তাহা দূর করার ক্ষমতা জ্যোতির্ময়ের থাকিয়াও ছিল না।

৩

সন্ধ্যার ধূসর ছায়া ধীরে ধীরে গ্রামবক্ষে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। পশ্চিম গগনের আলো ক্রমে নিভিয়া আসিতেছে। দূরে দূরে অন্ধকার ঘন হইয়া আসিতেছে। এদিকে মাথার উপরে একটু পশ্চিম দিক হেলিয়া পঞ্চমীর চাঁদখানা শূন্যাকারে ভাসিয়া উঠিয়াছে, তাহার আলো এখনও ধরার গায়ে ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। আকাশের গায়ে একটি দুইটি করিয়া নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিতেছে মাত্র, এখনও ভাল করিয়া ফুটিতে পারে নাই। সন্ধ্যার উতল বাতাস বাতাবী লেবুর ফুলের গন্ধ লুটিয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে।

নিস্তব্ধ গ্রাম্য নদীর তীরে খানিকটা বেড়াইয়া জ্যোতির্ময় বাড়ী ফিরিতেছিল। মনটা তাহার দারুণ চিন্তামগ্ন। আজ তাহার মনে একটুও সুখ-শান্তি ছিল না। দাদুর মুখে আজ যে কথা সে শুনিয়াছে, তাহাতেই তাহার উৎসাহ সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে।

গ্রাম্য বধূরা তখন গৃহে গৃহে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালিতেছিল; প্রতি গৃহ হইতে সরু, মোটা, মাঝারি—বিচিত্র সুরে, একই সময়ে অনেকগুলি শঙ্খ নিনাদিত হইতেছিল। সেই শব্দে নীরব ব্যোমপথ পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পথের দুই পার্শ্বে ঝোপে ঝোপে অন্ধকার বেশ ঘনভাবে সাজিয়া দাঁড়াইয়াছিল। পঞ্চমীর চাঁদখানা যখন পশ্চিমে ডুবিয়া যাইবে, তাহারা তখন সমস্ত স্থানটা জুড়িয়া রাজত্ব করিবে।

জ্যোতির্ম্ময় প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্য চোখে শুধু দেখিয়া যাইতেছিল, কিছুই আজ তাহার অন্তর স্পর্শ করিতে পারিতেছিল না। সবই যেন একঘেয়ে হইয়া গিয়াছে,—নূতনের বিশেষত্ব আজ যেন কিছুর মধ্যেই ছিল না। তাহার অন্তরের উচ্চ ধারণা বিলীনপ্রায়,—অন্তরে আশা লুটাইয়া কাঁদিতেছিল—হইল না, কিছুই হইল না, সবই ব্যর্থ হইয়া গেল। আর দশজন ছেলে যা, সেও তাহাই হইয়া রহিল; নূতন কিছু তাহার মধ্যে বিকশিত হইতে পারিল না, সে মানুষ হইতে পারিল না।

এবার যখন সে কলিকাতায় ফিরিবে—কেমন করিয়া কোন্ মুখে সে বলিবে সে যা তাহাই থাকিবে? সুরেশবাবুর কথার মধ্যে সে একটা আশার বাণী শুনিতে পাইয়াছে,—সেই আশায় তাহার সারা অন্তর পূর্ণ,—যে সে বিলাত হইতে ফিরিয়া দেবযানীকে বিবাহ করিতে পাইবে, তাহার জীবনের সুখস্বপ্ন সফল হইবে।

ব্যর্থ হওয়ার কষ্ট হয় তো তাহার বুকে এত লাগিত না—যদি না মাঝখানে দেবযানী থাকিত। দেবযানীকে বিবাহ করিতে না পাইলে তাহার জীবন একটা দুঃখময় স্বপ্নে পরিণত হইবে মাত্র। দেবযানীকে পাইবার আশা করিলে তাহাকে বিলাত যাইতেই হইবে।

আজ সে মাতাকে সকল কথা বলিবে ভাবিতেছিল। ঠাকুরদার কাছে সে একটী কথাও বলিতে পারিবে না। মাও কখনো তাঁহার সহিত অত্যাবশ্যক প্রশ্নোত্তর ছাড়া অন্য কথা নিজে যাচিয়া বলিয়াছেন তাহা মনে পড়ে না। মা যদি পুত্রের হৃদয়ের দুঃখ ভাবিয়া প্রস্তাবটা ঠাকুরদার কাছে তাহার অনুপস্থিতিতে করিতে পারেন, এই একটা তাহার লক্ষ্য ছিল। বিহারীলাল ঈশানীর কথার কখনও অন্যথা করিতেন না, একমাত্র ঈশানীর কথা ছাড়া তিনি আর কাহারও কথা কাণে তুলিতেন না। সাত বৎসরের মেয়েটীকে পুত্রের সহিত বিবাহ দিয়া তিনি গৃহে আনিয়াছেন। পিত্রালয়ে কেহ না থাকায় সেই পর্য্যন্ত ঈশানী এখানেই রহিয়া গিয়াছেন। এতটুকু বেলা হইতেই তিনি বড় শান্ত-প্রকৃতির ছিলেন। বেশী কথা বলা তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল।

তিনি যাহাই হোন না,—জ্যোতির্ম্ময়ের তিনি স্নেহশীলা জননী। একমাত্র পুত্রের জীবনটা যে তিনি ব্যর্থ হইতে দিবেন না, ইহা জ্যোতির্ম্ময় বেশ জানিত।

বাড়ী পৌঁছিয়া সে বরাবর উপরে চলিয়া গেল। ঈশানী তখন পূজার ঘরে সন্ধ্যাহ্নিক করিতে বসিয়াছেন।

ভেজানো দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া জ্যোতির্ম্ময় ডাকিল,—"মা—"

ঈশানীর আহ্নিক তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল; তিনি ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়া বাহির পানে তাকাইতেই জ্যোতির্ম্ময়ের দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলিয়া গেল। সঙ্কেতে তাহাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া তিনি নতজানু হইয়া প্রণাম করিলেন। গৃহদেবতা শ্রীধরের কাছে মনে মনে প্রার্থনা করিলেন,—"ঠাকুর, নিজের জন্যে কোন দিন কিছু প্রার্থনা করি নি, জ্যোতির জন্যে তোমার কাছে প্রার্থনা নিত্য করি। আজও তারই জন্যে তোমার কাছে প্রার্থনা করছি ঠাকুর, তার মনকে ফিরাও, তাকে উচ্ছৃঙ্খল হতে দিয়ো না, তাকে সংযত রাখো। ঠাকুর, এতকাল তার দীর্ঘজীবনই কামনা করে এসেছি, তার লেখাপড়ার কামনা করেছি,—তার ধর্ম্মের জন্যে তো প্রার্থনা করি নি দেবতা,—আজ সেই প্রার্থনাই যে করছি। দয়াময়, তাকে তার মায়ের বুক হতে ছিনিয়ে নিয়ো না, তাকে ভাসিয়ে দিয়ো না। সে তোমার ভক্তের বংশধর, সে যদি ভেসে যায়, সে যদি উচ্ছৃঙ্খল হয়, তা হলে তোমারই যে পূজা হবে না নারায়ণ।"

গৃহদেবতার সেবা হইবে না—এই কথাটা মনে করিতে তাঁহার দুই চোখ দিয়া দর দর ধারে অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল। বংশের প্রদীপ সে এমনি করিয়াই সকলকে ব্যথা দিয়া একেবারে পর হইয়া যাইবে? প্রভু, তুমি না কি বড় জাগ্রত দেবতা;—ওগো, যদি ঘুমাইয়া থাক তবে জাগো,—ওগো, জাগো,—তোমার ভক্তবংশ যেন লুপ্ত হইয়া না যায়।

হাঁ, লুপ্ত হইয়া যাওয়া বই আর কি। সে ব্রাহ্মণ-সন্তান হইয়া যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিবে, কায়স্থ কন্যা বিবাহ করিবে, ম্লেচ্ছের দেশে যাইয়া কদাচার করিবে। তাহার—সেই ধর্ম্মত্যাগী সন্তানের জলগণ্ডুষ কি পূর্ব্বপুরুষেরা লইতে পারিবেন, দেবতা কি তাহার সেবা লইবেন? তাহার পিতামহ ধর্ম্মত্যাগী পৌত্রকে ত্যাগ করিবেন, মা তাহাকে আর বুকের মধ্যে লইতে পারিবেন না, এ সব কথা মনে করিতেও যে মায়ের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।

অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে স্বর্ণ সিংহাসনস্থিত

শ্রীধরের পানে চাহিলেন,—"ঠাকুর, পাগলা ছেলের মনের গতি পরিবর্ত্তিত কর, জ্যোতির জননী তোমার পৃথক সেবায় বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন।"

দ্বিতলের কোন গৃহেই জ্যোতির্ম্ময়কে দেখিতে পাওয়া গেল না; জনৈকা দাসী বলিয়া দিল,—"খোকাবাবু ছাদে গেছেন।"

মায়ের প্রণাম করিতে অসম্ভব রকম বিলম্ব দেখিয়া জ্যোতির্ম্ময় বিলক্ষণ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। একটা পাথরের নুড়ি বই তো নয় ইহাকে এতটা ভক্তি লোকের আসে কোথা হইতে? ইহাদের অজ্ঞতা দেখিয়া জ্যোতির্ম্ময়ের একটু যে দুঃখ হইত না, তাহা নহে। বেচারারা জানে এটা সামান্য একটা পাথর মাত্র। দেবতা কিন্তু নির্দ্দিষ্ট একটা এতটুকু পাথরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। যিনি সমস্ত জগতে ছোট বড় সকল বস্তুর মধ্যে বিরাজমান, তিনি না কি কোন বস্তু বিশেষে আবদ্ধ থাকিতে পারেন। ইহারা জানিয়া শুনিয়া তবু এই পাথরের নুড়িটাকে পূজা করিবে। মাটীর পুতুলকে কত বহুমূল্য বস্ত্র দিয়া সজ্জিত করিবে, দেখিলে হাসি রাখা দায়। সে যখন বালক ছিল, সকলের দেখাদেখি সেও এই মাটীর পুতুলকে অসীম ক্ষমতাশালী বলিয়া ভাবিত এবং প্রণাম না করিলে কোন একটা ভীষণ শাস্তির কল্পনা করিয়া শিহরিয়া উঠিত। বিজ্ঞানের আলোচনা দ্বারা সে এখন বুঝিয়াছে ভগবান বলিয়া কিছুই নাই, সব সেকালের কতকগুলি অশিক্ষিত লোকের কল্পনা মাত্র। তাহারা বাতাসকে রূপ দিয়াছে, জলকে রূপ দিয়াছে, এমন কি চন্দ্র সূর্য্য তারা প্রভৃতিকেও রূপ দিয়াছে। প্রাকৃতিক নিয়মে যাহা হইয়াছে, হইতেছে বা হইবে, তাহার জন্য ভগবান বলিয়া একটা কিছু মানিয়া লইতে হইবে, ইহা প্রচার করে এই কুসংস্কারান্ধ হিন্দু, আর কেহ নয়।

বলা বাহুল্য—সে পূর্ণ নাস্তিক হইয়া গিয়াছিল। ভগবানে চির-আস্থাবান ঠাকুরদাদা এবং মায়ের স্নেহে ও শিক্ষায় শিক্ষিত লালিত ও পালিত হইয়াও সে একেবারে বিপরীতভাবে চলিয়াছিল। অধ্যাপক সুরেশ মিত্রের বাড়ীতে এক দিন এই বিষয় লইয়া ভীষণ তর্ক বাধিয়া গিয়াছিল। সুরেশবাবুর মতটা কতকটা এই ধরণের ছিল, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী কন্যার এ মত ছিল না। দেবযানী স্পষ্টই বলিয়াছিল,—"ঈশ্বর নেই এ কথা বলবেন না জ্যোতিবাবু, কারণ আপনি এমন কিছু পান নি, যার দ্বারা অতি সহজে প্রতিপন্ন করতে পারবেন ভগবান নেই। আপনার এতটা সাহস দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি, কেন না, এটা আপনার সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। শুনেছি আপনি যেখানে মানুষ হয়েছেন, সেখানে বিরাজ করছে ঘোর পৌত্তলিকতা। জোর করে আজ এ তর্ক তুললেই কি আপনি নিস্তার পাবেন? কে না বলবে—আপনার মনের মধ্যে সেই পারিপার্শ্বিকের ভাব লেগে আছে বলেই আপনি জোর করে প্রমাণ করতে চান আপনি নাস্তিক? এতটা বাড়াবাড়ি করতে যাবেন না জ্যোতিবাবু, এর পর কোন দিন আপনাকে ভেঙ্গে পড়তে হবে, তবে হ্যাঁ পৌত্তলিকতা ছেড়ে দিতে পারেন। খড়, মাটী যার উপাদান, অথবা পাথরের মধ্যে যে সীমাবদ্ধ, তাকে আপনি ভগবান বলে না মানলেও মানতে পারেন। তা বলে এ আপনাকে মানতেই হবে—প্রকৃতির পরে একটা স্থির শক্তি নিশ্চয়ই আছে, যার অস্তিত্ব আমরা বুঝতে পারি, অথচ ধরতে পারি নে। আপনাকে মানতেই হবে—এই শক্তি ভগবানের এবং তিনি নিশ্চয়ই আছেন,—আমরা সকলের মধ্যেই তাঁকে পাই।"

জ্যোতির্ম্ময় তখনকার মত চুপ করিয়া গেলেও মনের ধারণা সে বিসর্জ্জন দিতে পারে নাই। বাড়ীতে পূজার্চ্চনার বিপক্ষে কোন দিন সে একটী কথা বলিতে পারে নাই,—যে যাহা বলিত, বিনা প্রতিবাদে তাহাই শুনিয়া যাইত। মায়ের কাছে মনের ঝোঁকে কচিৎ কখনও কোন কথা প্রকাশ হইয়া পড়িলেও মা তাহা পাগল ছেলের পাগলামী বলিয়া বরাবর উড়াইয়া দিয়া আসিয়াছেন; পুত্রের কথা কোন দিনই তাঁহার মনে রেখাঙ্কন করিতে পারে নাই।

আজ ক্ষণিকের বিষদৃষ্টি স্বর্ণ-সিংহাসনে স্থাপিত পাথরের নুড়িটার উপরে ফেলিয়া জ্যোতির্ম্ময় দ্রুতপদে ত্রিতলের খোলা ছাদে চলিয়া গেল।

ছাদের চারিদিকে বুক সমান প্রাচীর। মেয়েরা দিনের বেলা ছাদে আসিলে সেই প্রাচীরে মধ্যস্থিত ছিদ্রপদে বাহিরটা দেখিতে পাইতেন,—উপর হইতে মুখ বাহির করিবার অধিকার ছিল না।

ছাদে ছিল একটী তরুণী; সে প্রাচীরের উপর ভর দিয়া অদূরস্থ নদীর পানে চাহিয়া ছিল। পঞ্চমীর চাঁদ তখন পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে, তাহার আলো তখনও পৃথিবীর গায়ে স্বপ্নের মত লাগিয়া আছে। অন্ধকার শিকারী-ব্যাঘ্রের মত থাবা পাতিয়া বসিয়া আছে, তাহার গ্রাস করিবার সময় আসিতেছে।

নদীর জলের উপর অস্তপ্রায় চাঁদের কিরণ তখনও ঝিকমিক করিতেছিল। নদী একটানা সুরে গান গাহিয়া চলিয়াছে। সে সুর নিস্তব্ধ রাত্রিতে বড় মধুর হইয়াই কাণে বাজিতেছে। তরুণী মুগ্ধ-চোখে চাহিয়া ছিল,—হঠাৎ পিছনে জ্যোতির্ময়ের অশান্ত চরণক্ষেপের দুপদাপ শব্দ শুনিতে পাইয়া সে বড় বেশী রকম চমকাইয়া মুখ ফিরাইল। সে আশা করে নাই—জ্যোতির্ময় এমন সময়ে এমনভাবে ছাদে আসিয়া পড়িবে। অত্যন্ত সন্ত্রস্তভাবে সে অঞ্চলখানা গায়ে ভাল করিয়া জড়াইয়া সরিয়া আসিল।

জ্যোতির্ময় তাহাকে দেখিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইল। সে এখানে থাকিবে অথবা নামিয়া যাইবে, তাহা ভাবিয়া লইল। সে পিছন ফিরিবার পূর্ব্বেই তরুণী তাহাকে অতিক্রম করিয়া ক্ষিপ্রপদে নীচে নামিয়া গেল।

তরুণীটিকে জ্যোতির্ময় আরও দু'দিন মায়ের কাছে দেখিয়াছিল। তাহাকে দেখিলেই সে যে সন্ত্রস্তে সরিয়া পড়ে, ইহাও সে জানিত।

তবুও সে বিস্মিতভাবে খানিক তাহার গমন-পথের পানে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর শ্লথপদে অগ্রসর হইয়া এক-স্থানে বসিয়া পড়িল। দেহ ও মন তাহার এলাইয়া পড়িয়াছিল, বেশীক্ষণ সে বসিয়া থাকিতে পারিল না। সেখানে শুইয়া পড়িয়া দুই হাতের মধ্যে মুখখানা রাখিয়া গভীর ভাবনায় সে নিমগ্ন হইয়া গেল।

৪

"এ কি জ্যোতি, শুধু ছাদে পড়ে রয়েছিস? কা'উকে বললে কেউ কি একটা মাদুরও দিয়ে যেত না?"

মা কাহাকেও একটা মাদুর অথবা সতরঞ্চি আনিয়া দিবার আদেশ করিবার পূর্ব্বেই জ্যোতির্ময় বাধা দিল, "থাক না মা, এই বেশ আছি। বেশীক্ষণ থাকব না, এখনই নেমে যাব। দরকার কি আর কিছু এনে। তুমি বস এখানে।"

ঈশানী বলিলেন, "কাঁকরগুলো যে গায়ে বিঁধছে বাবা?"

জ্যোতির্ময় হাসিয়া বলিল, "একটুও বিঁধছে না মা। তুমি এখানে বস, আমি তোমার কোলে মাথাটা রেখে খানিক চুপ করে শুয়ে থাকি।"

মা বসিয়া পুত্রের মাথা কোলে তুলিয়া লইলেন; অন্যমনস্কভাবে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। জ্যোতির্ময় চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। আজ সন্ধ্যায় মাকে যে কথাটা নিশ্চয়ই বলিবে ভাবিয়াছিল, কেমন করিয়া সে কথা তুলিবে, তাহাই সে ভাবিতে লাগিল।

মা শান্ত সুরে বলিলেন, "চাঁদ ডুবে গেল, অন্ধকার হয়ে এল জ্যোতি, আমার ঘরে চল না কেন?"

জ্যোতির্ময় বলিল, "না মা, এই বেশ শুয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছি। ও দিকে বড় গোলমাল, ভাল লাগছে না। এখানে কোন্ গোলমাল নেই, বেশ নিশ্চিন্তে আছি।"

মা তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "আচ্ছা তবে আর খানিক থাক।"

জ্যোতির্ময় একবার চোখ তুলিয়া দেখিল, মায়ের দৃষ্টি তাহারই মুখের উপর স্থাপিত। সে চোখ ফিরাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা মা, একটা কথা আজ কয়দিন জিজ্ঞাসা করব ভেবেছি, কিন্তু ভুলে যাই। যে মেয়েটি তোমার কাছে এসে আছে—"

বাধা দিয়া মা বলিলেন, "ওকে চিনিসনে জ্যোতি, কিন্তু নাম শুনেছিস তো, ওর নাম সীতা।"

জ্যোতির্ময় বলিল, "তা আমি বুঝেছি। কিন্তু ও এখানে কেন এসে আছে মা, ওর কি কেউ নেই?"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বেদনাভরা সুরে মা বলিলেন "কেউ থাকলে কি এখানে এসে থাকত জ্যোতি, হতভাগী সব হারিয়েছে, তোমার দাদু ওকে নিরাশ্রয়া দেখে নিয়ে এসেছেন।"

সীতার পরিচয় জ্যোতির্ময় কতকটা জানিত, আজ বাকিটুকু শুনিল।

প্রকাশের বন্ধু ছিলেন বিনয় চট্টোপাধ্যায়। এই দুইটী বন্ধু পরস্পরকে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে ভালবাসিতেন। এই নিঃস্বার্থ ভালবাসার মধ্যে স্ত্রী পর্য্যন্ত স্থান পায় নাই। সেকালের গল্পের মত এই দুইটী বন্ধুর মধ্যে কথা ছিল, যাহার পুত্র হইবে, সে অপরের কন্যার সহিত বিবাহ দিবে। প্রকাশের বিবাহ বিহারীলাল পঠদ্দশায় দিয়াছিলেন। বিনয় পাঠ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই। প্রকাশ যখন মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখন জ্যোতির্ময় দুই তিন বৎসরের শিশু, বিনয়ের তখনও বিবাহ হয় নাই। ইহার তিন বৎসর পরে বিনয়ের বিবাহ হয় এবং কিছুদিন বাদে সীতা জন্মগ্রহ

করে। সীতা জ্যোতির্ময়ের অপেক্ষা সাত আট বৎসরের ছোট ছিল।

প্রকাশ মৃত্যুকালে নিজের প্রতিজ্ঞার কথা পিতা ভ্রাতা ও স্ত্রীকে বলিয়া যান। প্রতাপ এই মেয়েটাকে জ্যোতির্ময়ের ভাবী পত্নী রূপে নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন।

সীতা যখন শিশু তখন তাহার মাতা মারা যান। বিপত্নীক বিনয় আর বিবাহ না করিয়া প্রতাপের ইচ্ছানুযায়ী কন্যাকে উপযুক্তরূপে শিক্ষা দিবার দিকে ঝুঁকিলেন। আজকালকার ছেলেরা শিক্ষিতা পত্নী পছন্দ করে, জ্যোতির্ময়ও সেই দলের অন্তর্গত। সেকালের চালচলনে অভ্যস্ত বিহারীলাল প্রথমতঃ ভাবী নাতবউয়ের এরূপ শিক্ষার আপত্তি তুলিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতাপ তাঁহাকে ভবিষ্যৎ বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিলেন।

সীতা যে বৎসর ম্যাট্রিক পাস করিল, সেই বৎসরই বিনয় ইহলোক ত্যাগ করিলেন। তিনি কলিকাতায় কোন আফিসে কায করিতেন—আয় অপেক্ষা ব্যয় অনেক বেশী ছিল। দেশে পিসী মাসী প্রভৃতি যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা সকলেই সাহায্য পাওয়ার দাবী করিতেন, বিনয়ও যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। এই আয়ের অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্যই তিনি কন্যার জন্য দেনা ছাড়া আর কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। বিহারীলাল যে মুহূর্ত্তে এ সংবাদ পাইলেন, সেই মুহূর্ত্তে দেওয়ানকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন, এবং সমস্ত দেনা শোধ দিয়া সীতাকে রামনগরে লইয়া আসিলেন। মাত্র তিন মাস পূর্ব্বে এ ঘটনা ঘটিয়াছে। জ্যোতির্ময় কলিকাতায় থাকিয়াও এ সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারে নাই। সে ও সীতা জন্মিবার পূর্ব্বে দুই বন্ধুর মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা সে পরে একটু আধটু শুনিয়াও হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল। এবার এখানে আসিয়া আজকার মতই নিমেষের জন্য এই সুন্দরী তরুণীটিকে কয়েকবার সে সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইতে দেখিয়াছে, লজ্জায় সে কোন দিনই ইহার পানে ভাল করিয়া তাকায় নাই। ইহার সহিত তাহার বিবাহ দিবার জন্যই ইহাকে এখানে আনিয়া রাখা হইয়াছে মনে করিতে সমস্ত অন্তরটা তাহার বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। তাহাকে অভাগিনী ভাবিয়া পিতামহ ও মা দয়া করিতে পারেন, তাহাই বলিয়া জ্যোতির্ম্ময়ের সহিত যে তাহার বিবাহ দিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। যে বিবাহ করিবে তাহার দিকটাও দেখা দরকার।

মনে পড়ে—সীতাকে সে একবার দেখিয়াছিল, তখন সীতার বয়স খুবই কম। আজ সীতার কথা মনে করিতে মনে পড়ে সেই তখনকার আকৃতি। জ্যোতির্ম্ময় সবেগে মাথা নাড়িত,—না, তাই কি হয়, সীতাকে সে কিছুতেই বিবাহ করিতে পারিবে না।

ঈশানী অন্যমনস্ক ভাবে কোন দিকে চাহিয়া ছিলেন, জ্যোতির্ম্ময় একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কাত হইয়া শুইল। তাঁহার নিঃশ্বাসের শব্দে সচকিতা মাতা চক্ষু ফিরাইলেন। অন্ধকারে তখন চারিদিক পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। যে পথ দিয়া চাঁদ অস্ত গিয়াছে, সেই পথটা এখনও উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে।

"ঘরে চল জ্যোতি, বড় অন্ধকার হ'য়ে এল।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "অন্ধকার বেশ ভাল লাগছে মা, আলো দেখে চোখ যেন ঝলসে উঠেছে—তাই তো খানিক অন্ধকারে থাকব বলে এসেছি।"

উৎকণ্ঠিতা মাতা বলিলেন, "চোখ জ্বালা করে, চোখ ডাক্তারকে দেখাস নে কেন একবার?"

জ্যোতি হাসিয়া উঠিল। মায়ের হাতখানা চোখের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "ডাক্তারকে দেখালে ডাক্তার বলবে—চশমা নাও; চোখ খারাপ না হলেও বলবে চোখ খারাপ হয়েছে। তোমার ভয় নেই মা, আমার চোখ খারাপ হয় নি।"

মাতা বলিলেন, "তাই হোক। ভগবান তোকে ভাল রাখুন। তোর ধর্ম্মে মতি থাক, সব রকমেই তোর উন্নতি হোক, তাই আমি প্রার্থনা করি। আমার আর কি আছে জ্যোতি! তোকে ভাল দেখে যেতে পারলে আমি বাঁচি।"

তাঁহার গলার সুর ভারি হইয়া উঠিল।

দ্বিতল হইতে একটী অতি মধুর আহ্বান শুনা গেল,—"মা!—"

সচকিতা হইয়া ঈশানী বলিলেন, "ওই সীতা ডাকছে। সে প্রায়ই সন্ধ্যেবেলায় খানিকটা করে বই পড়ে। আজ তোর দাদু একখানা রামকৃষ্ণদেবের জীবনী এনে দিয়েছেন, সেইখানা, পড়বে। তুইও চল না জ্যোতি! খানিকটা না হয় শুনবি।"

মাথাটা মায়ের কোল হইতে তুলিয়া উপুড় হইয়া দুইটা হাত সটান ভাবে রাখিয়া, তাহার উপর মুখখানা রাখিয়া শ্রান্তভাবে জ্যোতির্ম্ময়

বলিল, "তোমরা শোন গিয়ে মা, জীবনী পড়তে বা শুনতে আমার ভাল লাগে না। তোমার সঙ্গে আমার কয়টা কথা ছিল, ভেবেছিলুম আজ বলব, তা আর হয়ে উঠল না। থাক, এর মধ্যে একদিন বললেই হবে।"

উঠিতে উঠিতে উদ্বিগ্ন ভাবে মাতা বলিলেন, "তুই একলাটী এই অন্ধকারে ছাদে শুয়ে থাকবি?"

জ্যোতির্ম্ময় হাসিয়া বলিল, "তা হোক না মা, ভূতের ভয় যে করি নে তা তো জানো। তুমি যাও, আমি খানিক পরেই নেমে যাচ্ছি।"

চলিতে চলিতে পিছন ফিরিয়া ঈশানী ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন, "ভূতের ভয় না হয় নেই,—কিন্তু ওই কাঁকরের উপর শুয়ে থাকবি এমনি করে,—গায়ে বিঁধছে যে।"

"কিছু বিঁধছে না মা। আমি এখনই যাচ্ছি, তুমি যাও ততক্ষণ।"

মা চলিয়া গেলেন।

৫

দ্বিপ্রহরে নিজের ঘরের মেঝেয় একটা মাদুর বিছাইয়া ঈশানী শুইয়া পড়িয়াছিলেন। শেষ রাত্রির দিকটায় একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া মন বড় খারাপ হইয়া গিয়াছিল। আজ সকালে পূজায় বসিয়া অন্য দিনের চেয়ে সময় একটু বেশী লাগিয়াছিল। চোখের জলে পূজার ঘরের মেঝের খানিকটা তিনি ভিজাইয়া দিয়াছিলেন।

আজ তিনি অন্য দিনের চেয়ে অনেক বেশী কায করিতেছিলেন যাহাতে গত রাত্রের স্বপ্নের কথা মনে না পড়ে। সহস্রবার ভাবিতেছিলেন—মনে যে আশঙ্কা অহোরাত্র জাগিতেছে, স্বপ্নটা সেই আশঙ্কারই রূপ প্রকাশিত করিয়াছে মাত্র।

তথাপি মন বুঝিতেছিল না,—তথাপি মনে হইতেছিল, ও যে শেষ-রাত্রের স্বপ্ন,—এ সময়কার স্বপ্ন প্রায়ই সত্য হয় যে।

কিছুতেই এ চিন্তাটাকে তিনি মন হইতে দূর করিতে পারিতেছিলেন না। 'ভাবিব না' ভাবিলেও সেই চিন্তা মনে আসে।

তাঁহার বিষণ্ণ মুখখানা দেখিয়া সীতা অনেকবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। তিনি তাহাকে স্বপ্নের কথা বলিতে পারেন নাই, বলিতে গিয়া তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

সীতা এতক্ষণ দাদুর মাথায় গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছিল, এটী তাহার প্রাত্যহিক কায। বিহারীলাল তাহার অপরিচিত ছিলেন না; বৎসরে যে দুই তিন বার তিনি কলিকাতায় যাইতেন, সীতার আতিথ্য তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইত। ছোটবেলায় সে প্রায়ই পিতার সহিত এখানে আসিত, বড় হইয়াও দু তিনবার আসিয়াছিল; জ্যোতির্ম্ময়ের সহিত বড় হইয়া তাহার আর দেখাশুনা হয় নাই। আগে ছোটবেলায় সে জ্যোতির সহিত খেলাধূলা করিত, অসঙ্কোচে কথাবার্ত্তা বলিত। পিতার মৃত্যু সময়ে সে জ্যোতির সহিত নিজের বিবাহের কথা শুনিয়া লজ্জায় সঙ্কুচিতা হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর আশ্রয়ের জন্য তাহাকে এখানেই আসিতে হইল। লজ্জায় ঘৃণায় তাহার ক্ষুদ্র অন্তর তখন পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

সে আর জ্যোতির্ম্ময়ের সম্মুখে আসিতে পারে নাই, কথা বলা তো দূরের কথা। জ্যোতির্ম্ময় বাঁচিয়া গিয়াছিল। এবার বাড়ী আসিয়াই সীতাকে দেখিয়া তাহার চক্ষু স্থির হইয়া গিয়াছিল,—এইবারই বুঝি দাদু সীতাকে তাহার হস্তে সমর্পণ করেন। সে ভারি ভয়ে ভয়ে থাকিত, পাছে বিবাহের কথা উঠিয়া পড়ে।

সীতা একে একে কখন যে সংসারের সব কাজগুলি নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছিল তাহা কেহই জানিতে পারে নাই। ঈশানীর নিত্য-নৈমিত্তিক কয়েকটি কায,—পূজার জোগাড় করিয়া দেওয়া, তাঁহার রন্ধনের যোগাড় করা—এ সব নিত্য সে ভোরে স্নান করিয়া নিঃশব্দে করিয়া রাখিত। নূতন কয়েকটা কাযও সংসারে বাড়িয়াছিল, যথা,—আজকাল কেহ গায়ে মাথায় হাত না বুলাইলে দিলে বিহারীলালের ঘুম আসে না। আহারের সময় ঈশানী বসিলে চলে না, সীতার বসা চাই,—আবার সে জেদ করিয়া না খাওয়াইলে সেদিনে তাঁহার পেট না কি ভরে না। সন্ধ্যাবেলা নিয়মিতভাবে রামায়ণ, মহাভারত, রামকৃষ্ণ কথামৃত, ভক্তিযোগ প্রভৃতি পড়া চাই; নইলে সন্ধ্যা আর কাটে না। অথচ সীতা আসার আগে সব তাইতেই চলিত।

সীতা ভারি শান্ত প্রকৃতির মেয়ে ছিল। বেশী কথা সে কহিতে পারিত না, কিন্তু সুন্দর অধরোষ্ঠে হাসি তাহার সর্ব্বদাই লাগিয়াই থাকিত। বাড়ীর দাসদাসীরাও তাহাকে এই তিন মাসের মধ্যে গভীরভাবে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল, এটী শুধু

তাহার সাম্যমূলক ব্যবহারের জন্য। সে বামুন ঠাকুরাণীর রন্ধনের তত্ত্বাবধান করিত, সকলের আহার্য্য সমানভাবে বণ্টন করিয়া দিত, কাযেই কেহ বেশী কেহ কম পাইত না। রাখাল এই মেয়েটীকে বড় ভালবাসিত। একদিন এই মেয়েটীই যে এই বিশাল সংসারের গৃহিণী হইবে অসঙ্কোচে সে এ কথা প্রকাশ করিত।

সীতা নহিলে বিহারীলালের একদণ্ড চলিত না। সীতার নিরুপম সৌন্দর্য্য, শিক্ষা, বিনয়, লজ্জা, বিহারীলালের গর্ব্বের জিনিস। তিনি পারিষদবর্গকে লক্ষ্য করিয়া সগর্ব্বে বলিতেন, "বুঝেছ হে, প্রকাশ আমার বড় বিচক্ষণ ছিল; ঠিক এমনটী হবে জেনেই সে জন্মের আগে বিয়ের ঠিক করে রেখেছিল। সীতা নইলে আমার একটী দণ্ড চলে না তা তো তোমরা দেখতে পাচ্ছো। দিদির আমার শুধু রূপই নেই, গুণ রূপের চেয়ে অনেক বেশী। আমার অন্ধকার বাড়ীখানা তার হাসি দিয়ে সে উজ্জ্বল করে রেখেছে।"

দাদুকে ঘুম পাড়াইয়া নিঃশব্দ-পদে সীতা দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিল। ক্ষমা দাসী কতকগুলা বাসন লইয়া, পাশ কাটাইয়া যাইতে গিয়া, দেয়ালে বাসনের গোছা লাগিয়া বাসনগুলি ঝন্ ঝন্ করিয়া পড়িয়া গেল। ক্ষমা অপ্রস্তুত হইয়া তাড়াতাড়ি বাসন কুড়াইতে লাগিল। সীতা তাহাকে সাহায্য করিতে করিতে বলিল, "দুপুরবেলাটা একটু সাবধানে চলাফেরা করো, দাদুর খুব ঘুমটা এসেছে, নইলে এই শব্দে তাঁর ঘুম এখনি ভেঙ্গে যেত।"

ক্ষমা মুখখানা বিকৃত করিয়া ফেলিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। বিহারীলালের ঘরের দরজা একটু ফাঁক করিয়া সীতা দেখিল তিনি ঘুমাইতেছেন, বাসনের ঝন্‌ঝনানি শব্দেও তাঁহার ঘুম ভাঙ্গে নাই। নিশ্চিন্ত হইয়া সে ফিরিল।

ঈশানীর একটু তন্দ্রা আসিতেছিল, বাসনের শব্দে তাঁহার তন্দ্রা ছুটিয়া গিয়াছিল। সীতা গৃহে প্রবেশ করিতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি পড়ে গেল মা?"

সীতা তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া তাঁহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল, "ক্ষমা বাসন নিয়ে যেতে ধাক্কা লেগে সব পড়ে গিয়েছিল মা। আপনার বুঝি খুব ঘুম এসেছিল মা, শব্দে ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু দাদুর ঘুম এসেছিল মা, শব্দে ভাঙ্গেনি, খুব আশ্চর্য্য যা হোক।"

ঈশানী তাহার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া হাসিমুখে বলিলেন, এমন ফুলের মত হাতের পরশ পেয়ে বাবার চোখে স্বর্গের ঘুম নেমে আসে, সে ঘুম কি সহজে ছোটে মা? থাক,—আমার গায়ে আর হাত বুলাতে হবে না;—এই একজনের সেবা করে এলে, এখন খানিকটা জিরিয়ে নাও।"

সীতা কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, মুখখানা তাহার লাল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "না মা, একে কি আর সেবা বলে? ভারি তো গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দেওয়া,—"

ঈশানী শান্ত হাসিয়া বলিলেন, "ভারি না হয় হাল্‌কাই হ'ল। তুমি এখন একটু বস মা, আমার গায়ে আর হাত বুলিয়ে দিতে হবে না, পাও টিপতে হবে না। তুমি সেলাই কর, আমি ততক্ষণ ঘুমাই।"

সীতা, একখানি খদ্দরের রুমাল সেলাই করিতেছিল। ইহাতে সে চারিদিকে সুতার ফুল তুলিতেছিল, সেগুলি বাস্তবিকই বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। স্কুলে সে নানাবিধ সূচীশিল্প শিক্ষা করিয়াছিল। এখানে এই তিন মাস আসিয়া শুধু গৃহকর্ম্ম করিয়াই সে নিশ্চিন্ত ছিল না, অবকাশ সময়ে অনেক জিনিস সে প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছিল। দাদুর রুমালের কষ্ট দেখিয়া সে তাঁহাকে কয়েকখানি রুমাল করিয়া দিবে প্রতিশ্রুত হইয়াছে, এই রুমাল তাহারই একখানি।

সীতা সেলাইয়ের বাক্স লইয়া ঈশানীর পার্শ্বে বসিল। ঈশানী অন্যমনস্কভাবে তাহার সেলাইয়ের পানে চাহিয়াছিলেন, কখন তাঁহার চোখ দুইটী আলস্য ভরে মুদিয়া আসিয়াছিল।

"মা —"

সেলাইয়ে নিবিষ্টমনা সীতা চমকাইয়া মুখ তুলিল,—সম্মুখে দরজার উপর দাঁড়াইয়া জ্যোতির্ম্ময়। সীতাকে দ্বিপ্রহরেও মায়ের কাছে থাকিতে দেখিয়া সে ভারি বিরক্ত হইয়াছিল। আশ্চর্য্য, কোন সময় মাকে তাহার নির্জ্জনে পাইবার যো যেন নাই। কোথা হইতে এই মেয়েটা আসিয়া তাহার মাকে যেন কাড়িয়া লইয়াছে।

তথাপি সে দাঁড়াইয়া রহিল, আশা ছিল—সীতা তাহাকে দেখিয়াই চলিয়া যাইবে।

সীতা সেলাই ফেলিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি উঠিতেছিল। ঈশানীর সামান্য তন্দ্রা ছুটিয়া গেল, তিনি বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উঠে যাচ্ছো যে সীতা?"

উত্তর না পাইয়া তিনি মুখ তুলিতেই দরজার উপর দণ্ডায়মান জ্যোতির্ম্ময়কে দেখিতে পাইলেন। বলিলেন, "জ্যোতি এসেছে,—বেশ তো; ওকে দেখে তোমার ছুটে পালানোর তো দরকার নেই মা। মায়ের কাছে আসবার ওরও যেমন অধিকার আছে, মায়ের কাছে বসে থাকবার তোমারও তেমনি অধিকার আছে। আমি শুধু ওর একার মা নই মা, তোমারও মা। তুমি যেমন সেলাই করছো মা, তেমনি সেলাই কর। জ্যোতি এই দিকটায় বসবে, ওকে একখানা আসন দাও।"

সীতা তাহারই হাতের বুনা একখানা কার্পেটের আসন মায়ের অপর পার্শ্বে পাতিয়া দিয়া জড়সড় ভাবে তার একপার্শ্বে বসিয়া পড়িল।

জ্যোতির্ম্ময় আসনে বসিতে বসিতে কুণ্ঠিত মুখে বলিল, "তোমার সঙ্গে আমার দুটো কথা ছিল মা। সে সব কথা আর কাউকে শুনানো আমার ইচ্ছা নেই,—গোপনীয় কথা।"

সীতা একবার চকিত দৃষ্টি ঈশানীর মুখের উপর ফেলিয়া নড়িয়া উঠিল; ঈশানী তাহার অঞ্চলটা হাতের মধ্যে লইয়া শান্তকণ্ঠে বলিলেন,—"এমন কিছু গোপনীয় কথা থাকতে পারে না জ্যোতি! যা সীতার সামনে বলা যায় না। তুমি অসঙ্কোচে তোমার কথা বল।"

জ্যোতির্ম্ময় নতমুখে অন্যমনস্কভাবে মায়ের পার্শ্বে মাদুরের উপর পতিত একটা কুটা আঙুলী দ্বারা অল্পে অল্পে সরাইতে সরাইতে বলিল, "না মা, হতে পারে,—সীতার সামনে তোমার গোপন কথা কিছু না থাকলেও থাকতে পারে, তা বলে আমার এমন কথাও থাকতে পারে যা অসঙ্কোচে তোমাকেই বলতে পারি, আর কাউকে বলতে পারিনে।"

সীতার সমস্ত মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরের দিকে চলিয়া গেল।

ঈশানী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পুত্রের মুখের উপর ফেলিয়া বলিলেন, "এমন কি গোপনীয় কথা আছে জ্যোতি, যা আমি ছাড়া আর কেউ শুনতে পাবে না?"

কথাটা মুখে আসিতে আসিতে কতবার ফিরিয়া গেল, কিন্তু না বলিলেও যে নয়। এতদূর অগ্রসর হইয়া আসিয়া আর পিছাইতে পারা যায় না, পিছাইলে যে তাহারই দারুণ ক্ষতি।

সে একবার মুখ তুলিয়া মায়ের পানে চাহিল। মা অপলক দৃষ্টিতে তাহারই পানে চাহিয়া আছেন দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি চোখ নামাইয়া লইল। সকল জড়তা ঝাড়িয়া ফেলিয়া সঙ্কোচ লজ্জা দূর করিয়া ফেলিয়া দৃঢ়স্বরে সে বলিল, "তোমরা যে কেন পরের মেয়ে সীতাকে ঘরে এনে রেখেছ, আর কেন যে তার বিয়ে দিচ্ছ না, তা বুঝতে পারছিনে মা। আমার আশায় যদি তার বিয়ে না দিয়ে থাক, তবে ভুল করেছ; কারণ, আমি তাকে কখনই বিয়ে করতে পারব না।" কি সুস্পষ্ট অথচ সরল কথা। ঈশানী স্তম্ভিত ভাবে জ্যোতির্ম্ময়ের পানে তাকাইয়া রহিলেন। জ্যোতির্ম্ময় যে মায়ের সম্মুখে স্পষ্টভাবে এমন কথা বলিতে পারিবে, তাহা ঈশানী কখনও আশা করেন নাই।

"তুই কি বলছিস জ্যোতি, তোর কথা আমি কিছুমাত্র বুঝতে পারছিনে। যা বলবি—একটু স্পষ্ট করে খুলে বল।"

প্রথমটায় কোনও একটা কথা বলিতে যতটা সঙ্কোচ বোধ হয়,—একবার কোনও ক্রমে বলিয়া ফেলার পরে আর ততটা সঙ্কোচ থাকে না। জ্যোতির্ম্ময় প্রথম ধাক্কাটা সামলাইয়া লইয়া মুখ তুলিল,—শান্তভাবে বলিল,—"ভাল করেই তো বলছি মা, সীতাকে আমি বিয়ে করতে পারব না।"

আহতা জননী স্থির দৃষ্টি পুত্রের মুখের উপর রাখিয়া বলিলেন, "কেন তাকে বিয়ে করতে পারবিনে,—তার মধ্যে কোনও ত্রুটি দেখতে পেয়েছিস কি?"

জ্যোতির্ম্ময় মাথা নাড়িল, "কিছু না মা,—সে জন্যে যে আমি বিয়ে করব না তা তো না। তুমি তো জানো—আমি দাদার সামনে মোটে কথা বলতে পারিনে। তোমায় বলছি—তুমিই কথাটা দাদুকে বলো।"

ঈশানী বলিলেন, "আমি পারব না জ্যোতি,—এ কথা আমি তাঁর সামনে মুখে আনতে পারব না। তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ,—তিনি—আমার স্বর্গগত স্বামী তাঁর বাপকে যা বলে গেছেন মৃত্যু সময়ে,—তিনি সে কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন। তুমি জানো—তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। বাবা জানেন—মৃতের প্রতিজ্ঞা তাঁকে রাখতেই হবে। আমার কথা বলবে? আমিও সেই আদেশ পালন করতে—"

তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

জ্যোতির্ম্ময় তেমনই শান্তকণ্ঠে বলিল, "সীতার বিয়ের জন্যে তোমাদের কাউকে কিছু ভাবতে হবে না মা। তোমরা অনুমতি দাও, আমি পাত্র ঠিক করে দিচ্ছি। আমাদের নিখিলেশ—এবারে সে

স্কলারশিপ পেয়েছে,—যাতে সে সীতাকে বিয়ে করে আমি তার চেষ্টা করব। আমি কোন কারণে বিয়ে করতে পারব না মা; আমার এজন্য মাপ কর।"

তাহার চোখ দুইটি ছল ছল করিয়া উঠিল।

মায়ের হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। তিনি কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, "কিন্তু আমি যদি জানতে চাই কোন্ কারণে তুই সীতাকে বিয়ে করতে চাসনে, তা কি আমায় জানাতে পারবিনে জ্যোতি?"

জ্যোতির্ম্ময় মুখ ফিরাইয়া বলিল, "বলব মা, সমস্ত কথাই তোমায় আমি বলব। তোমার কাছে কখনও কোন কথা গোপন করিনি মা, আজও করব না। আমার বিলাত যাওয়ার কথা—"

ব্যগ্রভাবে ঈশানী বলিলেন, "তা'হলে এ কথা সত্য; কিন্তু এ কথা তো আমায় জানাসনি জ্যোতি!"

"না মা, বলিনি, বলতে সাহস করিনি—তাই। কিন্তু ভেবেছিলুম তোমায় সব কথা বলব, কারণ তোমায় না বললে—তোমার আশীর্ব্বাদ না পেলে আমি কোন কাজেই সিদ্ধিলাভ করতে পারব না। মনে করে দেখ মা,—আমি অনেকদিন আগে একদিন তোমার মুখে সীতাকে বিয়ে করবার কথা শুনে আপত্তি করেছিলুম, এ পর্য্যন্ত বরাবরই আপত্তি করে আসছি, কিন্তু আমার কথা তোমরা শুনেও শোননি। আজ আমি সাহস করে স্পষ্ট বলছি—সীতাকে আমি বিয়ে করব না, করতে পারব না। আমি স্বীকার করছি—সীতা সব বিষয়েই শিক্ষিতা, কিন্তু মা,—আমি সীতার উপযুক্ত নই।"

ঈশানী পুত্রের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "তুই তার উপযুক্ত নোস, এ কথা বলিসনে বাবা। আমি জানি—সীতার যদি কেউ স্বামী হওয়ার যোগ্য হয়,—তবে সে তুই। তোর মাথার মধ্যে অনেক কল্পনা ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওসব ছেড়ে দে জ্যোতি; ওতে নিজেও কষ্ট পাবি, আমাদেরও কষ্ট দিবি। হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্ম্ম নিয়ে, ব্রাহ্ম মেয়ে বিয়ে করে—"

"এ কথা যদি তুললে মা, তবে এর শেষ করে দেওয়াই ভাল—"

জ্যোতির্ম্ময় মুখ তুলিল। কণ্ঠে জড়তা আসিয়াছিল, জোর করিয়া সে জড়তা দূর করিয়া সে বলিল, "অনেকটা সত্য মা, ওর মধ্যে মিথ্যে যদিও আছে—কিন্তু তা খুব কম। আমায় ক্ষমা কর মা,—আমি তোমার বড় অভাগা সন্তান, তোমায় বড় কষ্ট দিচ্ছি।"

মায়ের কোলের মধ্যে মুখখানা লুকাইয়া রুদ্ধ কণ্ঠে সে বলিল, "মিথ্যা কথা বলতে কখনও শিক্ষা দাওনি মা, তোমার ছেলে কখনও মিথ্যা কথা বলেনি। যদি বিলাতে না যেতে পাই, তবে দেবযানীকে আমি বিয়ে করতে পারব না। আমার জীবনটাই যে তা'হলে মিথ্যে হয়ে গেল মা।"

আজ বড় দায়ে পড়িয়াই—যে কখনও বিবাহের কথা মায়ের সম্মুখে উচ্চারণ করে নাই, আজ সে নিজের গোপন ভালবাসার কথা ব্যক্ত করিয়া ফেলিল। তাহার বিলাত যাওয়ার মূলে কি আছে তাহা জানিতে পারিয়া জননী শক্ত হইয়া গেলেন।

অনেকক্ষণ ঈশানী কথা বলিতে পারিলেন না। তাঁহার দৃষ্টি সম্মুখে দেয়ালের গায়ে বিলম্বিত রাধা-কৃষ্ণের ছবির পানে পড়িয়াছিল। আর্ত্তভাবে প্রাণটা বুকের মধ্যে লুটাপুটি খাইয়া কাঁদিতেছিল,—এ কি পরীক্ষায় ফেলিলে ঠাকুর?—একদিকে পুত্রের সারা জীবনটা ব্যর্থ করিয়া দেওয়া, এ কি কোন মায়ে জানিয়া-শুনিয়া পারে? অপর দিকে ও কি ভীষণ দৃশ্য,—কি ভীষণ কল্পনা?

তিনি আর চাহিতে পারিলেন না, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ফেলিলেন; তাঁহার মুদ্রিত নেত্রকোণ বাহিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রুজল ঝরিয়া জ্যোতির্ম্ময়ের মাথার উপর পড়িতে লাগিল। জ্যোতির্ম্ময় মায়ের শান্তিময় বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া নিঃশব্দে কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেলিল। সামান্য দুই একটী কথার মধ্য দিয়াই তাহার অন্তরের নিরুদ্ধ আবেগ আজ সে মায়ের কাছে ব্যক্ত করিয়া ফেলিতে পারিয়াছে,—বেদনামিশ্রিত আনন্দে হৃদয়খানা ভরিয়া উঠিতেছিল।

"জ্যোতি,—"

জ্যোতির্ম্ময় চমকাইয়া মুখ তুলিল।

আর্দ্রকণ্ঠে ঈশানী বলিলেন, "আমায় আর কোন কথা বলিসনে বাবা। আমার সকল আশার শেষ হয়েছে, বেশ বুঝেছি—আমার সামনে জেগে আছে নিকষ-কালো অন্ধকার। নারায়ণ আমায় এ কি কঠিন পরীক্ষায় ফেলিলেন,—"

দুই হাতে তিনি মুখ ঢাকিলেন।

উত্তেজিত জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "নারায়ণ কি করতে পারবে মা? নারায়ণ কিছু দেয়নি—কিছু দেবে না, কিছু করেনি—কিছু করবে না—কারণ,

নারায়ণ শব্দটা থাকলেও আসলে কেউ নেই; ওসব তোমাদের মিথ্যে ধারণামাত্র।"

ঈশানীর মুখখানা বিকৃত হইয়া উঠিল, বিকৃত কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "অমন কথা মুখে আনিসনে জ্যোতি। নিজে সকল বিশ্বাস হারিয়েছিস,—স্রোতের মুখে কুটোর মত ভেসে চলেছিস,—প্রবৃত্তি দমন করতে যে সংযমের আবশ্যক, তা তোর এতটুকু নেই। ঘর ছেড়ে বাইরের পানে লক্ষ্য রেখে পাগলের মত ছুটছিস,—আসল জিনিস পায়ের চাপে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাচ্ছে। সামনে তোর তৃষ্ণার সুশীতল জল রয়েছে, তোর তৃষ্ণা তাতে মিটল না;—তুই সে দিকে না চেয়ে আকণ্ঠ তৃষ্ণা বুকে নিয়ে হাহাকার করে মরীচিকার পেছনে ছুটছিস,—জানিনে তোর এ তৃষ্ণা জীবনে সুদীর্ঘকালেও মিটবে কি না। সোণা ফেলে রাংতা কুড়াতে যাস নে রে, আপনার জনকে দূরে ফেলে পরকে আপন করতে যাস নে। মনে রাখিস, রক্তের টানই আসল, আর যা তা সবই মৌখিক। দুনিয়ায় আর কেউ আপন হবে না, কেউ আপনাকে নিঃস্ব করে তোকে ভরিয়ে রাখতে চাইবে না,—সবাই তোর কাছ হতে নিতে চাইবে—নেবেও তাই। যদি তোকে উচ্চশিক্ষা দেওয়ার সুযোগ না দেওয়া হতো, তা হলে নিজের ধর্ম্মকে, নিজের ঠাকুর-দেবতাকে কি এমন করে অবিশ্বাস করতে পারতিস রে? তোর উচ্চশিক্ষা তোর জীবনে কিছুমাত্র সফলতা দিতে পারে নি, তোকে উন্নতির পথে নিয়ে যেতে পারে নি,—আমি দেখছি, তোকে দিন দিন অধঃপতনের পথে নিয়ে যাচ্ছে। যে শিক্ষা নিজের ধর্ম্মের ওপরে, দেবতার ওপরে বিতৃষ্ণা ধরিয়ে দেয়, আপনার জনকে পর করে দেয়, তাকে তোরাই উচ্চশিক্ষা বলতে পারিস, আমি পারি নে রে,—আমি পারি নে। এই শিক্ষাই মায়ের বুক হ'তে ছেলেকে কেড়ে নেয়, বুড়ো ঠাকুরদার একমাত্র অবলম্বনকে—"

বলিতে বলিতে হঠাৎ উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদিয়া ফেলিয়া তিনি উঠিয়া পড়িয়া দ্রুত বাহিরে চলিয়া গেলেন।

আজ বড় আঘাত পাইয়াই তিনি অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন যাহা তাঁহার স্বভাবের বহির্ভূত ছিল। কখনও তিনি কাহারও সম্মুখে চোখের জল ফেলিতে পারেন নাই, লোকের সম্মুখে চোখের জল ফেলা তিনি বড় লজ্জার কথা মনে করিতেন। জ্যোতির্ম্ময়ের কথা শুনিয়া বুকে তিনি বড় আঘাত পাইয়াছিলেন। প্রথমটা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, তাহার পর নাড়া পাইয়া তাঁহার বেদনা মুখে হঠাৎ উছলাইয়া পড়িল। চোখের জল ফেলিব না ভাবিয়াও তিনি তাহা সামলাইতে পারিলেন না।

অভিমানে দুঃখে সারা হৃদয়খানা তাঁহার যেন শতধা হইয়া যাইতেছিল। কে সে দেবযানী, কতখানি শক্তি আছে তাহার? তাহার মোহাকর্ষণ কি এতই বেশী—যাহার কাছে মা, স্নেহময় দাদু, ধর্ম্ম—সবই তুচ্ছ, সবই হেয়? দেবযানীকে পাইবার জন্য সে মা, দাদু ও ধর্ম্ম সবই ত্যাগ করিতে প্রস্তুত?

হায় রে পুত্র! ইহারই জন্য তিনি অন্তরের এত ব্যাকুলতা, এত অস্থিরতা, এত বেদনা অনুভব করেন? এই পুত্রের পত্র পাইতে দুই দিন বিলম্ব হইলে তিনি চোখের জলে ঠাকুরঘরের মেঝে ভিজাইয়া দেন? কই,—সে তো তাঁহাকে চায় না; মায়ের চেয়ে সে দেবযানীকেই বেশী ভালবাসে।

"নারায়ণ,—"

ঈশানী বারাণ্ডার ধারে থামের আড়ালে বসিয়া পড়িয়া নিঃশব্দে চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন।

৬

কলিকাতা হইতে জরুরী পত্র আসিয়াছে, আগামী কল্য প্রভাতেই জ্যোতির্ম্ময়কে বাড়ী হইতে রওনা হইতে হইবে। অধ্যাপক সুরেশবাবু তাহাকে বার বার অনুরোধ করিয়াছেন,—তাহার কল্য পৌঁছান চাই-ই।

ঈশানীর মুখের হাসি আজ কয়দিন হইতে একেবারেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, বিষণ্ণতা তাঁহার মুখের উপর আজ কয়দিন হইতে সমভাবে জাগিয়া আছে। সীতা কয়েকবার তাঁহার বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—শরীর ভাল নাই বলিয়া ঈশানী তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

সমস্ত দিন নীরবে তিনি গৃহকর্ম্ম করিয়াছেন, পুত্রের আবশ্যক দ্রব্যাদি নিজের হাতে গুছাইয়া দিয়াছেন, তাহার পর সন্ধ্যার সময় কাপড় কাচিয়া আসিয়া পূজার ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন, এখনও বাহির হন নাই।

কাল সকালে কলিকাতায় যাইতে হইবে। এখানে থাকিয়া পরাধীনতার দুঃসহ কষ্ট জ্যোতির্ম্ময়কে অহরহ পীড়ন করিলেও—কাল হইতে সে

যে আশ্রয় মুক্তিলাভ করিবে—ইহাতে যতটা আনন্দ পাইবার কথা, ততটা আনন্দ সে কিছুতেই পাইতেছিল না। আজ তাহার এই পল্লীগ্রাম, মায়ের কোল ছাড়িয়া যাইতে অন্তরের কোন নিভৃত স্থানে ব্যথা বাজিয়া উঠিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল—সে আর এখানে ফিরিতে পাইবে না, এই যেন তাহার একেবারে যাওয়া। পল্লীর বুকে তেমনি করিয়া প্রভাতে নূতন সৌন্দর্য্য ফুটিবে, বাতাস আসিয়া সবুজ পাতায় দোল দিয়া কৌতুক ভরে খেলিবে, এমনি করিয়া চাঁদের শুভ্র সুন্দর আলো পল্লীর বুকের উপর শুভ্র আচ্ছাদনের মত ছড়াইয়া পড়িবে, সে আর দেখিতে পাইবে না।

আজ শুক্লা চতুর্দ্দশীর রাত্রি; প্রায় পূর্ণাকারে শুভ্র চাঁদ আকাশের গায়ে ভাসিয়া উঠিয়াছে, তাহার উজ্জ্বল আলো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আজ বাড়ী হাসিতেছে, পথ হাসিতেছে, গাছ লতা ফুল সব হাসিতেছে; অদূরে বসন্তের নদীর বুকে আলোর তুফান আসিয়াছে। আজ সব আলো,—চাঁদের আলো যাহা কিছু স্পর্শ করিয়াছে তাহাই হাসিতেছে।

জ্যোতির্ম্ময়ের প্রাণে আনন্দ ছিল না।—বিরস মনে, উদাস চোখে সে শুধু দেখিয়া যাইতেছিল। বহুদূরে কোন্ কৃষকের কুটীর হইতে বাঁশীর সুর বাতাসে দুলিতে দুলিতে ভাসিয়া কাণে আসিতেছে। সে যেন বড় করুণ, যেন কাঁদিয়া কাহাকে বিদায় দিতেছে। এই চিরপরিচিত সব—সব থাকিবে, থাকিবে না শুধু একলা সে, কতদূরে—কোথায় সে চলিয়া যাইবে কে জানে। অন্তরে কে আঘাত করিতেছিল, কে ডাকিয়া বলিতেছিল, দেখিয়া লও,—তোমার আর দেখা হইবে না।

এ কাহার কথা,—কে গো অন্তরবাসী তুমি, এ কথা বলিতেছ কেমন করিয়া? তাহার ঘর এইখানে, তাহার মা এইখানে, তাহার দাদু এইখানে,—যাহা কিছু তাহার আপনার সবই যে এইখানে, সব বিসর্জ্জন দিয়া সে যাইবে—কোথায় যাইবে, কেন যাইবে?

কিন্তু না যাইলেও যে সব যায়। তাহার দেবযানী, সে অন্যের হইবে,—জ্যোতির্ম্ময় তাহা কেমন করিয়া সহ্য করিবে? যাহাকে সে পাইত—যে তাহারই জন্য প্রতীক্ষায় ছিল, তাহাকে সে এমন করিয়া হারাইবে?

অন্তরের পানে সে চাহিল। দেবযানীহীন জীবন—সে কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবে? কোন আশা নাই, উন্নতি নাই,—জীবন্মৃত অবস্থায় বাঁচিয়া থাকা অসহ্য।

ফাল্গুনের মধুময় বাতাস—নীচে বাগানে প্রস্ফুটিত লেবুফুল, হেনাফুলের সুন্দর গন্ধ লইয়া মাতামাতি করিয়া বেড়াইতেছিল। ত্রিতলে সীতার ঘরে সেতারে ঝঙ্কার উঠিল। তাহার সহিত অতি কোমল একটু সুর মিশিয়া গেল। সে কণ্ঠস্বর সীতার।

সীতা গাহিতেছিল—

যতবার আলো জ্বালাতে চাই
নিভে যায় বারে বারে,
আমার জীবনে তোমার আসন
গভীর অন্ধকারে।

বড় করুণ সুরে সীতা গানটী গাহিতেছিল। সে সুর তাহার চোখের জলে সিক্ত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ঊর্দ্ধে উঠিতেছিল, কাঁপিতে কাঁপিতে নীচে নামিতেছিল।

সেতারটা বাড়ীতে অনেক কাল হইতে পড়িয়া আছে। প্রতাপ বিশেষ সখ করিয়া এটী কিনিয়াছিলেন। বেশীদিন তিনিও ইহা ব্যবহার করিতে পান নাই। জ্যোতির্ম্ময় যখন বাড়ী আসিত, তখন মাঝে মাঝে ইহাতে সুর দিত। কিন্তু সে সুর দেওয়াই মাত্র, কারণ, গান সে অত্যন্ত ভালবাসিলেও নিজে কখনও গাহিতে পারে নাই।

পল্লীগ্রামের নিস্তব্ধ-সন্ধ্যায়—জ্যোৎস্নালোকে সীতার মধুর কণ্ঠে গানটী বড় সুন্দর শুনাইতেছিল। জ্যোতির্ম্ময় অলস ভাবে দেহখানা এলাইয়া দিয়া এক মনে গানটী শুনিতেছিল।

জ্যোতির্ম্ময় এখানে আসা পর্য্যন্ত সীতা একদিনও গান গাহে নাই,—আজ ঈশানীর একান্ত আগ্রহে সে সেতার লইয়া বসিয়াছে। গান গাহিবার মত শক্তি তাহার আজ ছিল না, কণ্ঠে সুর ফুটিতেছিল না, মুখে ডাক ফুটিতেছিল না, তবু সে জোর করিয়া গান গাহিতে গেল। আনন্দের গান গাহিতে গিয়া আজ বুক ভাঙ্গা বেদনার উচ্ছ্বাস বাঁধ ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া আসিল;—আত্মহারা সে গাহিতে লাগিল—

যে লতাটী আছে শুকায়েছে মূল,
কুঁড়ি ধরে যায় নাহি ফল ফুল,
আমার জীবনে তব সেবা তাই বেদনার উপচারে।

গাহিতে গাহিতে তাহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল; ঈশানীকে

গোপন করিবার জন্যই সে মুখখানা নীচু করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলিল।

অদূরে ঈশানী একখানা আসনের উপর বসিয়া গান শুনিতেছিল। তাঁহার বুকের মধ্যে জমাটবাঁধা বেদনা—গান শুনিতে শুনিতে বিগলিত হইয়া উঠিতেছিল,—দুই চোখ দিয়া তাঁহারও জলধারা গড়াইতেছিল।

এই গানের মধ্যে প্রতি কথায় গোপন বেদনাই প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। প্রভু, এমন অদৃষ্ট দিয়াই পাঠাইয়াছ,—অন্ধকারে আলো জ্বালা আর হইল না। তোমার আসন অন্ধকারেই পাতা রহিল। অন্ধকারে পথ চিনিয়া আসিতে পারিবে কি গো? দূর হইতে এত অন্ধকার দেখিয়া হয় তো ফিরিয়া যাইবে,—তোমার সেবার জন্য এই যে বেদনাভরা উপচার—সব ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

ঘুরিয়া ফিরিয়া গানটা দুই তিনবার গাহিয়া সীতা চুপ করিল; সেতার থামিয়া গেল।

চোখ মুছিতে মুছিতে ঈশানী ডাকিলেন,—"সীতা।"

সীতা সজল চোখ দুইটী তাঁহার মুখের উপর রাখিয়া আর্দ্রকণ্ঠে উত্তর দিল, "কেন মা।"

'তুমি এ গান গাচ্ছো কেন মা,—এ গান তো তোমার উপযুক্ত নয়। এ গান আমারই অন্তরের কথা ব্যক্ত করছে।—যার সব শেষ হয়ে গেছে, যার ঘর বার সব অন্ধকার হ'য়ে গেছে, তারই কথা বলছে,—এ তো তোমার মত বালিকার উপযুক্ত গান নয় মা,—তোমার সামনে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল আলোতে পূর্ণ, তুমি সেই গান কর মা। এ রকম গান আর গেয়ো না,—এ সুর তোমার মুখে মানায় না, অন্য গান—যাতে মনে বেশ স্ফূর্তি আসে সেই রকম গাও।"

অন্য দিকে চাহিয়া উদাসভাবে সীতা বলিল, "আর কি গান গাইব মা, আমি যে অন্য গান জানিনে।"

বড় গোপনে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে আবার সেতারে সুর দিল।

ঈশানী রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "যার যা তাই সাজে। আমার বুকে বড় ব্যথা, তাই কথা বলতে গেলে ব্যথাই ফুটে বার হয়। আমার চারিদিককার আলো নিভে গেছে মা, আমার পেছনে অন্ধকার, সামনে অন্ধকার, ওপরে—নীচে সব অন্ধকারে ঘেরা; এই নিকষ-কালো অন্ধকারের মধ্যে একা আমি দাঁড়িয়ে। হাঁফিয়ে উঠছি—কিন্তু কেউ নেই যে আমায় আলো দেখায়, আমায় পথ চিনায়। কেউ নেই যে আমার হাত ধরে নিয়ে যায়। সময় সময় দুই হাতে এই বুকখানা এমনি করে চেপে ধরে আর্ত্তভাবে কেঁদে বলি—নারায়ণ, আর কত পরীক্ষা করবে,—আমার সকল শক্তি যে অন্তর্হিত হয়েছে গো। আর না—আমার ক্ষুদ্র জীবনটা একেবারেই শেষ করে দাও,—আমায় আর অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখ না।"

দারুণ মর্ম্মবেদনায় কণ্ঠরোধ করিয়া দিয়াছিল। যাহাতে খানিকক্ষণ তিনি আর কথা বলিতে পারিলেন না।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সেই বেদনাকে উড়াইয়া দিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া তিনি বলিলেন, "কিন্তু তুমি কেন মা, তুমি কেন ভাবছ তোমার সামনেও অন্ধকার; তুমি মা পেছনে অন্ধকার ফেলে এসেছ সামনে তোমার উজ্জ্বল আলোকময় ভবিষ্যৎ। তুমি তার দিকে চাও,—অন্তর তোমার সেই আলোকে ভরিয়ে ফেল। কেন তুমি সেই অতীতের পানে চাইবে?"

কেন? এ কেন উত্তর দিতে গিয়াও যে দিতে পারা যায় না। সীতার অধরোষ্ঠ দু'টি কাঁপিতে লাগিল। সে তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া লইয়া সম্মুখে জানালা পথে বাহিরের জ্যোৎস্নাসিক্ত প্রকৃতির পানে চাহিল। চোখ ভরিয়া জল আসিয়াছিল, পলকের পর পলক যে চোখের পাতার জলটুকু শুষিয়া ফেলিল।

দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, কর্ত্তাবাবু দিদিমণিকে ডাকছেন, এখনই যাওয়া চাই।"

নিরানন্দের মাঝখানে আনন্দের গান গাহিবে কি করিয়া সীতা, তাই ভাবিতেছিল। এ যেন নিদাঘশেষে নববসন্তের আবাহন করা। দারুণ তাপে যখন গাছের ফুলের কুঁড়ি বিকশিত না হইতে খসিয়া পড়িয়াছে, সবুজ পাতা শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, তখন জোর করিয়া সেই গাছকে সবুজ পাতায় ও ফুলে সাজাইয়া দেওয়া। এ কি হয়? যে ফুল শুকাইয়া গিয়াছে, তাহাকে সঞ্জীবিত করিয়া তোলা মানুষের কায নয়।

দাদু ডাকিতেছেন শুনিয়া সে মনে মনে ভারি খুসী হইয়া উঠিল। সেতার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "আগে দাদুর কথা শুনে আসি মা, নইলে তিনি রাগ করবেন। ফিরে এসে না হয় গান করব এখন।"

শুষ্ক হাসির ক্ষণিক রেখা মুখে ফুটাইয়া

তুলিয়া ঈশানী শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন, "তার পর তুমি যে গান করবে তা আমি বেশ জানি মা। বাবা আজ যখন এমন অসময়ে বাড়ীর মধ্যে এসেছেন, তখন নিশ্চয়ই যে একটা না একটা কিছু হয়েছে তা বুঝতে পারছি। অমনি এখনই যে তোমায় ছেড়ে দেবেন না এও জানা কথা। আচ্ছা মা, তুমি যাও —আমি ততক্ষণ শুয়ে পড়ি গিয়ে।"

সীতা বলিল, "এখনই শুতে যাচ্ছেন মা, জ্যোতিদার খাওয়া দাওয়া—"

"তার এখনও ঢের দেরী আছে, সে এখনি খাবে না। আজ আমার শরীরটাও বড় খারাপ বোধ হচ্ছে, খানিক ঘুমাতে পারলে একটু শান্তি পাব এখন। তুমি এসে আমায় যদি ঘুমাতে দেখ— ডেকে দিয়ো।"

তিনি উঠিয়া পড়িলেন, সীতাও বাহির হইল।

মুক্ত ছাদে জ্যোৎস্নালোকে জ্যোতির্ময় দাঁড়াইয়া ছিল, সীতাকে দেখিয়া সে সরিয়া গিয়া গৃহের ছায়ায় অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইল। সীতা একবার চোখ তুলিয়া দেখিল, তখনই চক্ষু নত করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

৭

প্রকাণ্ড দালানটা অতিক্রম করিলে তবে বিহারীলালের শয়ন-গৃহ পাওয়া যায়। তাঁহার এই গৃহটির সঙ্গে অন্দরের ও বাহিরের সমান যোগ থাকিলেও ঘনিষ্ঠতা কাহারও সহিত ছিল না। অন্দরের দিককার দরজাটা প্রায়ই বন্ধ থাকিত। যখন বিশেষ আবশ্যক পড়িত এই দরজা খুলিয়া দিলে সীতা আসিতে পারিত।

বিছানার উপর বিহারীলাল শুইয়া পড়িয়াছিলেন। নিকটে আর কেহ ছিল না। রাখাল তামাক দিয়া বাহিরে দরজার কাছে যে কোন আদেশের প্রতীক্ষায় নিয়মিতভাবে বসিয়া ঝিমাইতেছিল।

সীতা প্রবেশ করিতে করিতে উদ্বিগ্নভাবে বলিল, "আজ এখনি যে ঘরে এসেছেন দাদু? রোজ আপনি তো রাত দশটার কমে বৈঠকখানা হতে ওঠেন না,—তাও কত ডেকে ডেকে—খাবার জুড়িয়ে যায় বলে আপনাকে ঘরে আনতে হয়। আজ না ডাকতেই এই সন্ধ্যে সাতটার সময়ে ভেতরে এসে চুপ করে শুয়ে পড়ে আছেন যে,— অসুখ-বিসুখ কিছু করে নি তো?

দেওয়ালের আলোটা অত্যন্ত মৃদুভাবে জ্বলিতেছিল। ঘরের মধ্যে আলো ও অন্ধকার দুইটা মিলিয়া সমান আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। সীতা আলো বাড়াইয়া দিল। তাহার পর বৃদ্ধের ললাটে হাত দিয়া গায়ের তাপ পরীক্ষা করিল।

বিহারীলাল তাহার কোমল হাতখানা চোখের উপর চাপিয়া ধরিয়া শ্রান্তভাবে বলিলেন, "না রে পাগল, অসুখ হয় নি। বাইরে আজ বিশেষ কাজ কিছুই ছিল না, আর একখানা পত্রও আজ বিকেলের ডাকে পেলুম। পত্রখানা সকালে আসার কথা, কিন্তু সকালে আজ পোষ্টম্যান ডেলিভারি করতে পারে নি বিকেলে দিয়ে গেল। সেখানা তোমাদের পড়াবার জন্যে তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। মা তোমার কাছে ছিলেন না?

সীতা উত্তর দিল, "হ্যাঁ মা ছিলেন। তাঁর শরীর আজ ভারি খারাপ করেছে বলে তাড়াতাড়ি করে শুতে চলে গেলেন, আমিও আজ বেশী পীড়াপীড়ি করি নি; কারণ বাস্তবিকই আজ কয় দিন হ'তে তাঁর শরীর খারাপ যাচ্ছে।"

বিহারীলাল বলিলেন, "তবে থাক, মাকে আজ ডেকে কোন দরকার নেই। কাল তুমিই মাকে এই পত্রখানা দিয়ো, তিনি নিজে যেন পড়ে দেখেন।"

বালিসের তলা হইতে তিনি এনভেলাপ-বদ্ধ একখানা পত্র বাহির করিয়া সীতার হাতে দিলেন। সীতা কভারে লিখিত ঠিকানা দেখিয়া লইয়া বলিল, "এ যে আপনার পত্র দাদু।"

বিহারীলাল শ্রান্ত দেহখানা বিছানায় এলাইয়া দিয়া বলিলেন, "আমার নামে বটে, কিন্তু ছোট বউমা সকলকে উদ্দেশ করেই লিখেছেন। তাঁর বিশেষ ইচ্ছা পত্রখানা তুমি, জ্যোতি, মা সকলেই দেখ। পড় দিদি—আমি বলছি, কোন বাধা নেই, তুমি পড়।"

সীতা পত্রখানা সন্তর্পণে খুলিয়া পড়িতে লাগিল।

ক্ষুব্ধকণ্ঠে বিহারীলাল বলিলেন, "বুড়োয়া হাজার শক্ত হলেও এক এক সময়ে ভারি দুর্ব্বল হয়ে পড়ে দিদি। ইতার পত্রখানা যেদিন পেলুম, সেদিন এই পাষাণ বুকে স্নেহধারা হঠাৎ উৎসারিত হয়ে উঠল,—একবার তাকে আমার কাছে পাওয়ার আশায় আমি পাগল হয়ে গেলুম। একবারের জন্যে তাকে আসতে বলেছিলুম, কিন্তু বউ মা আমায় জানিয়েছেন, এখন তা হতে পারে না।

দিদি, উচ্চ মাথা আমার হেঁট হয়ে পড়েছে, আমার মুখে বউ-মা কালি দিয়েছেন। এই পত্র পাওয়ার আগে পর্য্যন্ত আমি ভেবেছিলুম—ইভার ওপরে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, কারণ, সে আমার পৌত্রী, আমার প্রতাপের মেয়ে। সে তার মামাদের নয়, সে তার মায়ের নয়, সে আমার—একমাত্র আমার। কি মোহ আমার, উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছি। যতটুকু কোমল হয়েছিলুম, তার বেশী কঠিন হয়েছি। আমার কোমলতার কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করছি—এখনও করব। আজ মনে পড়ছে দিদি—প্রতাপ আমায় বলে গেছে বাবা সেও কেউটের ছানা,—তারও বিষ আছে—ফণা তার মায়ের মতই সে ধরতে জানে। সে কথা মিথ্যে নয়—আজ বড় আঘাত পেয়ে আমার ভুল বুঝতে পেরেছি।"

ইভার মা অত্যন্ত নরমভাবে জানাইয়াছেন, ইভা এইবার ম্যাট্রিক একজামিন দিতেছে,—সেইজন্য পড়ার ক্ষতি হইবার ভয়ে সে এখন কোথাও যাইবে না। আর কয়টা দিন বাদে তাহার ফাইনাল আরম্ভ। তাহার পরে সে যদি ইচ্ছা করে তবে রামনগরে যাইবে।

সীতা পত্রখানা মুড়িতে মুড়িতে বলিল, "সত্যই দাদু, তার একজামিন সামনে—এখন পড়ার ক্ষতি করে—"

তীব্রস্বরে বিহারীলাল বলিলেন "সে বেশ ভাল কথা আমি তার জন্যে কিছু বলছিনে। ওই যে লিখেছে—যদি রামনগরে যেতে তার ইচ্ছা হয় সে যাবে—ওইখানেই যে কথা বাধছে দিদি? ছোট-বউ মা এখানে এসে কয়দিন থেকে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন, তাঁর কাহিল অবস্থা দেখে আমায় বাধ্য হয়ে তাঁকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিতে হয়েছিল। তাঁরই মেয়ে ইভা, সে কেউটের ছানা,—আগেই বলে বসবে—আমি পল্লীগ্রামে যাব না। ওরা যে সহরের জল-হাওয়ায় পুষ্ট, পল্লীগ্রামে এসে ওরা কি থাকতে পারবে বলে তুমি মনে কর? কিন্তু কি স্পর্দ্ধা প্রতাপের স্ত্রীর—সে আমার পত্রের উত্তর নিজে দিয়েছে, স্পষ্টই জানিয়েছে ইভা আসবে না।"

রাগটা তাঁহার অতিরিক্ত হইয়া গিয়াছিল। এতটা রাগের কারণ পত্র-মধ্যে ছিল না কিন্তু তিনি এই পত্রখানা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আগেকার কথাগুলা মনে করিয়া এই পত্রের সামান্য ত্রুটিও খুব বড় করিয়া ধরিয়াছিলেন। সীতা পত্রখানা দশবার ভাঁজ করিতে লাগিল দশবার খুলিতে লাগিল—কি বলিবে তাহা সে ঠিক করিতে পারিতেছিল না।

বিহারীলাল কিছুক্ষণ নীরবে রহিলেন। তাহার পর ধীরস্বরে বলিলেন, "আমি বেশ বুঝেছি—তুমি ভাবছ সীতা, এই সামান্য পত্রখানা পেয়ে আমি এতটা রেগে উঠলুম কেন? আমার বুকে অহরহ যে আগুন জ্বলেছে দিদি, সে আগুনে আমার সব পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও এখনও আগুন নেভে নি। এই পত্রখানা সেই আগুনে ইন্ধন যুগিয়েছে। তুমিই একদিন কথায় কথায় বলেছিলে সীতা, হয় তো আমার পত্র পায় না বলেই ইভার সাহস হয় না আসার কথা বলতে। তোমার কথা শুনে আমার উঁচু সুরে বাঁধা হৃদয়-তারটা হঠাৎ কোমল পর্দ্দায় নেমে গেল। আগেকার সব কথা, বউমার ব্যবহার, প্রতাপের মরণের কথা,—সব ভু'লে গেলুম। তখন মনে হল—ইভার সেই ছোট মুখখানি,—আধফোটা ফুলের মত টলটল করছে,—মনে হল তার সেই আধ-আধ কথা। যদি সে নিজে আমায় লিখত—আমি একজামিনের পরে যাওয়ার চেষ্টা করব,—এই এতটুকু মাত্র কথা সীতা—বেশী তো চাই নি আমি,—তা হলে আজ তো আমার এত দুঃখ হত না দিদি। বউ-মা লিখছেন, এতে জানাচ্ছে—আমি ইভার কেউ নই, তার ওপরে আমার এতটুকু দাবী নেই। এতে জানাচ্ছে তিনি আমায় গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না—মেয়েকে শিক্ষা দেওয়া, তার এখানে-আসা—এ সবই তাঁর ইচ্ছার ওপরে নির্ভর করছে। ভারী সুন্দর সীতা,—স্বামীর প্রতি তিনি যা কর্ত্তব্য দেখিয়েছেন, বৃদ্ধ শ্বশুরের প্রতি দেখাচ্ছেন—এ শিক্ষিতাতেই সাজে,—আর তাই বুঝি আরও সুন্দর বলে মনে হয়।"

আবার খানিক তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। সীতার হস্ত বুকের উপর টানিয়া আনিয়া তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, কুক্ষণে প্রতাপের ওখানে বিয়ে দিয়েছিলুম। অনেকে নিষেধ করেছিল তাদের কথা শুনি নি,—ভাবলুম, যেমন বড়-বউমাকে পেয়েছি তেমনি ছোট-বউমাকে পাব। গোড়াতেই বড় ভুল করেছিলুম,—সেই ভুলের শাস্তি আজীবন-কাল আমায় ভোগ করতে হচ্ছে। এই তো পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল—যা মেয়েদের মাথা একেবারে বিকৃত করে দেয়। আর এরই জন্য আমি মেয়েদের শিক্ষা দিতে চাই নে। অনেকে বলতে পারে, শিক্ষা দিলে মানুষের মন উন্নত হয়,—এই হিসাবে মেয়েদের মনের সঙ্কীর্ণতা দূর করবার জন্যে তাদের

শিক্ষা দেওয়া ভাল। যারা বলে—তারা শিক্ষিত হয়ে পরকে ভালবাসতে শেখে, পরকে আপন করে নেয়। তারা মর্ম্ম দিয়ে আমার মত এ কথার সত্যতা অনুভব করতে পারে নি; তাই দু' কথা বলে যায়। আমার ছোট-বউ-মা শিক্ষিতা, আলো পেয়েছেন, তাই সহর হতে পল্লীতে এসে মুখ বিকৃত করেছেন। কিছুতেই তিনি এখানকার মেয়েদের সঙ্গে মিশতে পারেন নি। এদের কাছে এসেও তিনি নিজের মহত্ব নিয়ে অনেক দূরে সরে থাকতেন। তাঁর শিক্ষা তাঁকে যথার্থ শিক্ষিত স্বামীর সঙ্গে মিশতে দেয় নি,—মাঝখানে বিরাট ব্যবধানরূপে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর পাশ্চাত্য শিক্ষায় আমাদের দেশের সতী সীতা সাবিত্রী নেই, তাই তিনি জানতে পারেন নি—স্বামী যদি গাছতলায় বাস করেন, স্ত্রীকেও স্বর্গ মনে করে সেই গাছতলায় বাস করতে হবে। তিনি জেনেছেন—স্বামী দেবতা নয়—সংসারের সাথী মাত্র।—তাই যখন তিনি পল্লীগ্রামে থাকতে পারলেন না—চলে গেলেন, দু'দিনের সাথীকেও ফেলে চলে গেলেন,—পাতিব্রত্য যে একটা ধর্ম্ম তা তিনি স্বীকার করতে পারলেন না। হতভাগ্য ছেলে আমার—কি আর বলব সীতা, স্ত্রী-কন্যা থাকতেও তার কিছু নেই জেনে এই বুড়ো বাপের কোলে মাথা রেখে—"

তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে কাঁপিতে রুদ্ধ হইয়া গেল। শুষ্কনেত্রে অন্যমনস্কভাবে তিনি কোন দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সীতা আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া ছিল, একটি শব্দ তাহার মুখে ফুটিল না।

কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া বৃদ্ধ পুনরায় বলিলেন, "সে কি আমারই কাষ ছিল দিদি? সে তার স্ত্রী-কন্যাকে দেখবার জন্যে অধীর ভাবে চারিদিকে চাহিল, একবার—শুধু একবার মাত্র তার মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা স্বর ফুটল—ইভু, তার পর সব নীরব, আর একটি কথা তার মুখে ফুটল না। কি হল বল দেখি দিদি! কোথায় আমার মাথা কোলে করে নিয়ে সে বসবে, তা না হয়ে আমি তার মাথা কোলে করে নিয়ে বসলুম, তার মুখে আমি জল দিলুম,—তার কাণে আমি ভগবানের নাম ঢেলে দিলুম। সে কি আমার কাজ সীতা, সে কি কোন বাপে করতে পারে? কিন্তু পারলুম,—সব পারলুম সীতা,—জানিনে কে আমার সে শক্তি দিয়েছিল, কে আমায় স্থির করে রেখেছিল! নিষ্পলকে সেই মুখখানার পানে তাকিয়ে রইলুম, দেখলুম—ধীরে ধীরে তার দু'টি চোখের পাতা কেমন মুদে এল, "বাবা" বলে ডাকতে ডাকতে তার স্বর বন্ধ হয়ে গেল, সব দেখলুম। তার পর শেষ যা তাও করলুম দিদি, সেই ছেলের সঙ্গে শ্মশানে গেলুম,—লোকে যেতে দিচ্ছিল না, বলছিল আমি তার মুখাগ্নি করতে পারব না। তা কি হয় রে,—এ বুক যে পাষাণে গড়া এ কিছুতেই ভাঙ্গে না। বৃদ্ধ বাপের সামনে শেষ একটিমাত্র ছেলের শব চিতায় উঠল! জানিস দিদি নিজের হাতে তার মুখে আগুন দিলুম—ধূ ধূ করে পুড়তে লাগল, ছাই হয়ে গেল। আমার সুসন্তান—আমার যোগ্য পিতৃভক্ত ছেলের সব শেষ হয়ে গেল—দাঁড়িয়ে দেখলুম। বাড়ী ফিরে এলুম, পরদিন সকালে শুনলুম—তারা এসেছে। আমার মাথায় দপ্ করে আগুন জলে উঠল শ্রাদ্ধের যোগাড় করবার অধিকার তাদের দিলুম না—তাদের তাড়িয়ে দিলুম।

এক একটী কথা যে কতখানি বেদনাভরা, তাহা সীতা অন্তর দিয়া অনুভব করিতেছিল। বিহারীলাল একটু চুপ করিবামাত্র সে অধীর ভাবে বলিয়া উঠিল, "থাক থাক দাদু,—আমি ও-সব শুনেছি, আর অনর্থক—"

বাধা দিয়া উত্তেজিত-কণ্ঠে বৃদ্ধ বলিলেন, "অনর্থক নয় সীতা, আমার মধ্যে অহরহ সেই কথাই জাগছে যে! শুনেছ কখনও—সত্তর বছরের বৃদ্ধ যুবকের মত অসীম উৎসাহ নিয়ে কেবল কাযই করে যায়, এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম নিতে চায় না? কেন বিশ্রাম নিতে চাইনে তা জানো? বিশ্রামের সময় মনে পড়ে প্রতাপের কথা। প্রতাপ যে প্রকাশের বিয়োগকে ভুলিয়ে রেখেছিল সীতা, তাই জন্যে আমি প্রকাশকে একটা দিন মনে করতে পারিনি। পুরাণে পিতৃভক্ত রামের কথা পড়েছ,—যে পিতৃ-আজ্ঞায় চোদ্দ বছর বনবাসী হয়েছিল,—আমার ছেলে আমার জন্যে নিজের স্ত্রী-কন্যা পর্য্যন্ত ত্যাগ করেছিল। ছোট-বউমা এখানে থাকতে চান নি,—কিন্তু তিনি, তাঁর ভাই, প্রতাপকে নিজেদের কাছে রাখবার জন্যে চেষ্টার ত্রুটী করেন নি। পিতৃভক্ত সন্তান আমার—কিছুতেই আমার সঙ্গ ত্যাগ করেনি। বউমার—তাঁর ভাইয়ের সব পত্র সে আমায় দিয়েছিল, আমি পড়িনি,—সব ওই ড্রয়ারে পড়ে আছে। আমি কাউকে সে পত্রের কথা বলিনি, কাউকে দেখাইনি; আজ বড় মনের দুঃখে তোমাকে বললুম দিদি।

একদিন ওই ড্রয়ার খুলে সে সব পত্র দেখো, জানতে পারবে আমারি বউ-মা কি রকম প্রকৃতির মেয়ে, দিদি। সে আমার বড় কষ্টেই চোখের জল ফেলেছিল, সেখানকার সঙ্গে সব সম্পর্ক তুলে দিয়েছিল, তবু বাপকে ত্যাগ করে নি। এই তো শিক্ষার ফল দিদি, একেই আমরা সুশিক্ষা বলতে চাই। ইভাকে এই জন্যেই শিক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা প্রতাপের ছিল না। এই কুশিক্ষা পেয়ে সেও তো একটী সংসারকে এমনি করে জ্বালিয়ে দেবে! তবে এ শিক্ষার দরকার কি? যে শিক্ষা মানুষকে মানুষ করে তোলে, আমি সেই শিক্ষার পক্ষপাতী, সেই শিক্ষাই আমি চাই।"

দুই হাত চোখের উপর চাপা দিয়া তিনি হাঁপাইতে লাগিলেন। সীতা নিঃশব্দে তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বিহারীলাল চোখের উপর হইতে হাত নামাইয়া লইলেন। স্থির দৃষ্টি সীতার মুখের উপর রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "জ্যোতি বুঝি কাল সকালেই কলকাতায় যাবে?"

সীতা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিল,—"হ্যাঁ—"

বিহারীলাল বলিলেন, "বিলেত যাওয়ার কথা তার কাছ হতে তোমরা কিছু শুনতে পেয়েছ কি?"

সীতার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল,—"আমি তো কিছু জানি নে দাদু।"

"জানো না-আচ্ছা—"

এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বিহারীলাল বলিলেন, "রাত নয়টা বেজে গেল, এখন তুমি যাও দিদি। এই পত্রখানা নিয়ে যাও, কাল বউমাকে দেখিয়ে কারও হাতে দিয়ে আমায় বাইরে পাঠিয়ে দিয়ো। রাখালকে বলে যাও দরজাটা বন্ধ করে দিক, আমি এখন ঘুমাব।"

সীতা উঠিতে উঠিতে বলিল, "কিছু খাবেন না দাদু,—"

বিহারীলাল মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "কিছু খাব না, দিদি, আজ শরীরটা বড় খারাপ বোধ হচ্ছে। তুমি যাও, আমার বড় ঘুম আসছে।"

সীতা পত্রখানা লইয়া বাহির হইল, রাখালকে ডাকিয়া দাদুর আজ্ঞা জ্ঞাপন করিয়া সে চলিয়া গেল।

৮

জ্যোতির্ম্ময় চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীটা যেন নিরানন্দে ভরিয়া উঠিয়াছিল। ঈশানী এই কয়দিন শরীরে ও মনে শক্তি না পাইয়াও সংসারের কায নিয়মিত ভাবেই করিয়া যাইতেছিলেন,—জ্যোতির্ম্ময় চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন ভাঙ্গিয়া পড়িলেন।

অন্তঃপুরের সঙ্গে বিহারীলালের সম্পর্ক প্রায় ছিল না বলিলেই চলে। দুপুরে মাত্র অর্দ্ধ ঘণ্টার জন্য ভিতরে আসিয়া তাড়াতাড়ি স্নানাহার করিয়া আবার বাহিরে চলিয়া যাইতেন। অন্য সকলে যে মধ্যাহ্ন সময়টা অলসভাবে ঘুমাইয়া, বসিয়া কাটাইত, তিনি সে সময়টাও বৃথা নষ্ট হইতে দিতেন না,—সে সময় তিনি জমিদারীর কাগজপত্র দেখিতেন। লোকে বলিত, বৃদ্ধের জীবন-তরুর মূল যত শিথিল হইয়া আসিতেছে, তিনি ততই মাটী আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছেন। উপযুক্ত দুইটী পুত্র যাহার চলিয়া গিয়াছে, তাহার এত বিষয়ানুরক্তি বড় বিসদৃশ বলিয়াই বোধ হয়। এখন তাঁহার ধর্ম্ম-কর্ম্ম তীর্থভ্রমণ ইত্যাদি প্রশস্ত।

কে বুঝিবে—কেন তিনি ইহার মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে চান? কর্ম্মশূন্য ধর্ম্মজীবনে চিন্তা-দুঃখের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায় না। তিনি আগে নির্জ্জনতা ভালবাসিতেন, এখন নির্জ্জনতা বড় ভয় করেন, গোলমালের মধ্যে এখন লিপ্ত থাকিতে চান। প্রতাপ যতদিন বর্ত্তমান ছিলেন, সংসারের সব ভার তাঁহার উপর দিয়া বিহারীলাল দূরে দূরে থাকিতেন। প্রতাপের মৃত্যুর পর প্রায় বৎসর-খানেক তিনি কিছুই করেন নাই। ভগবানের নাম করিতে গিয়াছেন, আরাধনা করিতে গিয়াছেন, সব ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। কর্ম্মহীন ধর্ম্ম তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিতেছিল। ছেলেদের কথা, পুত্রবধূ ও পৌত্রীর কথা মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিতে পারেন নাই। নির্জ্জনে থাকিলে তিনি পাগল হইয়া যাইবেন, তাই তিনি নির্জ্জনে থাকিতে পারিলেন না, আবার কোলাহলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। যতদিন বাঁচিতে হইবে, ততদিন কায করিয়া যাওয়া যাক; ইহারই মধ্যে যদি ধর্ম্ম সম্ভব হয়,—হোক।

বৃদ্ধের দৃষ্টি দিন দিন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল, চলিতে চরণ কাঁপিত; সম্মুখের দিকে তিনি অনেকটা নত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তথাপি তিনি

প্রাণপণে দুর্ব্বলতা ঠেকাইয়া রাখিতেছিলেন, যুবকের শক্তি লইয়া কায করিতেছিলেন। একটা না একটা লইয়া আর সব ভুলিয়া থাকা চাই। অতীতের দুঃখময় স্বপ্নে নিমগ্ন থাকিলে পাগল হইয়া যাইতে হইবে যে।

সমস্ত দিনটা তাঁহার বাহিরে কাটিয়া যাইত। আগে কোন দিন রাত্রি বারোটার কমে তিনি ভিতরে আসিতেন না; আহারান্তে শয়ন করিতে রাত্রি একটা বাজিয়া যাইত। সীতা এখানে আসিয়া তাঁহার ভারও গ্রহণ করিয়াছিল,—ঠিক দশটার সময় তাঁহার শয়ন করা চাই। নয়টার সময় ভিতরে আসিতে হইত। তাঁহাকে আহার করাইয়া, বিছানায় শয়ন করাইয়া, তাহার পর সীতা বিদায় লইত। তাঁহার চিরকালের নিয়ম ব্যতিক্রম করিয়া দিয়াছিল সীতা এই স্নেহের শাসনটুকু বৃদ্ধের কাছে বড়ই মিষ্ট লাগিত।

সে দিন জ্যোতির্ম্ময়ের সহিত যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহার পর হইতে ঈশানী আর কিছুতেই শান্তি পাইতেছিলেন না। এ শেল-সম কথা তিনি কাহাকেও বলিতে পারিতেছিলেন না, সে কথা তাঁহার মনের মধ্যে গোপন রহিয়া গিয়াছিল। বিদায়-মুহূর্ত্তে জ্যোতির্ম্ময় আসিয়া যখন তাঁহার পায়ের ধুলা লইয়া মাথায় দিল, তিনি তখন আগেকার মতই নারায়ণের ফুল ও তুলসী তাহার হাতে দিতে গেলেন। সে মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল, "আমায় তো স্পষ্টই চিনতে পেরেছ মা, জেনেছ—তোমার ছেলে নাস্তিক, সে কিছু মানে না,—তবু কেন মা, জেনে শুনে এ ফুল-তুলসী আমায় দিতে আসছ? আমার মন যা বলে মিথ্যা, আমি কোন দিনই জোর করে তাকে সত্য বলে মেনে নিতে পারিনে, পারবও না। এই ফুল-তুলসী তোমার কাছে শ্রদ্ধাভক্তি পেতে পারে, আমি এদের সাধারণ হিসাবেই দেখছি মা,—এর মাধ্যে বিশেষত্ব কিছুমাত্র নেই। দরকার নেই মা, ও আর আমায় দিয়ো না।"

মায়ের হাতের ফুল-তুলসী হাতেই রহিয়া গেল, তাঁহার মুখ দিয়া আশীর্ব্বচন দূরে থাক,—একটা শব্দও ফুটিল না। তাঁহার চোখের জলে ঝাপসা চোখের সম্মুখ দিয়া জ্যোতির্ম্ময় চলিয়া গেল। হাতের ফুল-তুলসী অজ্ঞাতে কখন হাত হইতে খসিয়া পড়িয়া গেল; তিনি আড়ষ্ট ভাবে শুধু দাঁড়াইয়া রহিলেন।

হায় রে,—যদি কাঁদিতে পারিতেন সেও যে ভাল ছিল। কিন্তু পারিলেন কই? বেদনা অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া বুকের মধ্যে লুটাপুটি খাইতে লাগিল, চোখ দিয়া একটী ফোঁটা জলও তো পড়িল না।

সেই দিন হইতে তাঁহার মনে হইতেছিল—জ্যোতির্ম্ময় একেবারেই চলিয়া গিয়াছে,—আর সে ফিরিয়া আসিবে না, আর সে মা বলিয়া ডাকিবে না। এই কথাটা ভাবিতে তাহার সারা বুকখানা টন্‌টন্ করিয়া ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল।

আহারে বসিয়া বিহারীলালও আজ ভাল করিয়া আহার করিতে পারিলেন না। অদূরে উপবিষ্টা অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা মলিনমুখী পুত্রবধূর পানে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "জ্যোতি কবে আসবে তা কি কিছু বলে গেল বউ-মা?

গোপনে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঈশানী মাথা নাড়িয়া অর্দ্ধোচ্চারিত ভাবে উত্তর দিলেন, "কই না"

"বিলেত যাওয়ার কথাও বলে নি?"

তাঁহার অন্তরে এই কথাটাই জাগিয়া উঠিতেছিল, বাহিরে অতিরিক্ত গাম্ভীর্য্য, উদাসীনতা দেখালেই অন্তর হাহাকার করিয়া ফাটিয়া যাইতে চাহিয়াছিল।

ঈশানী জীবনে কখনও পিতৃসম শ্বশুরের সম্মুখে মিথ্যা কথা বলেন নাই। প্রথমটা উত্তর দিতে তাঁহার কণ্ঠস্বর জড়াইয়া আসিলেও কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া তিনি বলিলেন, "তেমন কিছু বলে নি,—তবে—"

তিনি চুপ করিয়া গেলেন।

বিহারীলাল দুধের বাটীতে চুমুক দিতে দিতে বলিলেন, "কথাটা সে তবে তোমার কাছেও তুলেছিল মা, তুমি নিশ্চয় তাকে বুঝিয়েছ, যাতে সে বিলেতে—সেই অহিন্দুর দেশে না যায়?"

রুদ্ধকণ্ঠে ঈশানী বলিলেন, "বলেছি বাবা?"

অত্যন্ত খুসী হইয়া উঠিয়া বিহারীলাল বলিলেন, "হ্যাঁ, তা বলবে বই কি মা, না বুঝিয়ে বললে ওরা কি বুঝতে পারে মা? পাঁচজন বন্ধু মিলে কথাটা তুলেছিল—ভেবেছিল এটা খুব পৌরুষের কথা,—এ কথা যে আবার আমাদের কাণে এসে পৌছাবে তা আর ভাবে নি। কথাটা বলবামাত্র তার মুখটা ফেকাসে হয়ে উঠেছিল,—বেশ বুঝেছিলুম, সে ভয় পেয়েছে। হাজার হোক—ছেলেমানুষ তো,—এম-এ পড়েছে বলেই বয়েস তার বিশ বছর পার হয়ে যায় নি। আমাদের কাছে সে সেই ছেলেমানুষই রয়ে গেছে, অন্যের কাছে সে যতই জ্ঞানবান হোক না কেন। এই সামনে জ্যৈষ্ঠ মাসটা গেলে আষাঢ় মাসের প্রথমেই বিয়েটা দিতে পারলে বাঁচি।

বৈশাখ মাস ওর জন্মমাস, না বউ-মা?—জন্মমাসে বিয়ে হতে পারে না; জ্যৈষ্ঠ মাসে জ্যেষ্ঠ ছেলের বিয়ে দেওয়া চলবে না, কাজেই আষাঢ় মাস ছাড়া আর উপায় নেই। যাই হোক, ওর বিয়েটা দিয়ে, কায-কর্ম্মগুলো সব বুঝিয়ে দিই। তারপরে নিশ্চিন্ত হয়ে সংসার ছেড়ে বার হই। লোকে বলে—আমার মতিভ্রম হয়েছে,—নইলে দুই জোয়ান ছেলে হারিয়ে আবার আমি বিষয়-আশয় দেখছি কেমন করে? কেমন করে—আর কেন, এ প্রশ্নের উত্তর তাদের দেওয়া নিষ্প্রয়োজন, কেন না, তারা নিন্দা করছেই, করবেও। ওরা না জানুক, আমি তো জানি—এ সব সে জ্যোতির বিষয়, আমি তাকে বুঝিয়ে দিয়ে ছুটী নেব। এবার আর সংসারে নয়,—একেবারে দেশ ছেড়ে যাব, বুঝলে বউ-মা। আষাঢ় মাসে বিয়েটা দিতে পারলে এখন আমি বাঁচি।"

সীতা পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিল। বিবাহের প্রসঙ্গ উঠিবামাত্র সে ধীরে ধীরে কখন সরিয়া গিয়াছিল। ঈশানী নতমুখে কেবল একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিলেন মাত্র।

জ্যোতির্ম্ময়ের পত্রের আশায় ঈশানী ব্যগ্র হইয়া পথপানে চাহিয়া ছিলেন। কয়েকদিন বাদে জ্যোতির্ম্ময়ের পত্র আসিয়া পৌঁছিল।

দাসী দু'খানা পত্র আনিয়া ঈশানীর নিরামিষ রন্ধন-গৃহের দরজার কাছে রাখিয়া বলিল, "রাখাল পত্র দু'খানা দিয়ে গেল। খোকাবাবু কর্ত্তাবাবুকেও পত্র দিয়েছেন, তিনি সেখানে ভাল আছেন সে বলে গেল।"

ঈশানী তখন ভাতের ফেন ঝরাইতেছিলেন,—সীতা তাঁহার তরকারী কুটিয়া দিতেছিল। পত্র দু'খানা দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি বঁটি ফেলিয়া উঠিয়া সে দু'খানা কুড়াইয়া লইল।

ঈশানী জিজ্ঞাসা করিলেন, "জ্যোতির পত্র এসেছে কি?"

সীতা উত্তর করিল, "হ্যাঁ, এই কার্ডখানায় পৌঁছা খবর দিয়েছেন দেখছি।"

জ্যোতির পত্রে—শুধু সে পৌঁছিয়াছে এবং ভাল আছে এই দুইটী মাত্র কথা লেখা ছিল। অন্য বারে সে যখন কলিকাতায় যাইত, তখন তাহার দীর্ঘ পত্র অনেক কথা বহন করিয়া মায়ের কাছে আনিত। এবারকার এই ক্ষুদ্র পত্রখানার পানে তাকাইয়া ঈশানী কোন মতে দীর্ঘশ্বাস রোধ করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন।

সীতা বুঝিয়াও বুঝিল না, জিজ্ঞাসা করিল, "এবার জ্যোতিদার এত ছোট পত্র কেন মা? আমি এখানে এসে পর্য্যন্ত তাঁর যে সব পত্র দেখছি, সবগুলোই বড়, চার পৃষ্ঠা ভরা। বাড়ীর কাউকেই তিনি বাদ দেন না, মানুষ হতে আরম্ভ করে গরু, পাখী, বেড়াল, কুকুর, সবারই খোঁজ নেন; এবার এক কথায় সেরে দিয়েছেন—তোমরা কেমন আছ—ব্যস, সব শেষ হয়ে গেল। কলকাতায় যাওয়ার সময় জ্যোতিদার মুখ যেমন ভার দেখলুম, আপনার মুখও তেমনি ভার হয়েছিল। আপনি কি জ্যোতিদার সঙ্গে ঝগড়া করেছিলেন মা?"

ঈশানীর মলিন-মুখে রেখার মত একটু হাসি ফুটিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল,—"ঝগড়া কেন হবে মা, কিছুই হয় নি। ও পত্রখানা কার দেখ তো?"

কথাটাকে তিনি যে চাপা দিতে চান তাহা সীতা বেশ বুঝিতে পারিল। ঈশানী জানিতে পারেন নাই সেদিনকার কয়েকটী কথা সীতার অনিচ্ছাতেও তাহার কাণে গিয়াছিল। দেবযানীর নামটা কাণে আসিতেই সে থমকিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মুহূর্ত্তে সমস্ত ঘটনা তাহার কাছে পরিষ্কার হইয়া গিয়াছিল। ঘৃণায়, লজ্জায়, সঙ্কোচে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল—ছি ছি, সীতা কি জ্যোতির্ম্ময়ের স্ত্রী হইবার আশায় এখানে পড়িয়া আছে,—জ্যোতির্ম্ময় কি তাহাই ভাবিয়া রাখিয়াছে? জ্যোতির্ম্ময় যখন তাহার বন্ধু নিখিলেশের সহিত সীতার বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল, তখন সীতার সমস্ত মুখখানায় সিন্দুরের আভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল—সে দ্রুতপদে আপনার গৃহে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িয়াছিল।

জ্যোতির্ম্ময় যে কয়দিন এখানে ছিল, সে কয়দিন লুকাইয়া থাকিবার জন্য সীতা কি চেষ্টাই না করিয়াছে। ছি ছি, কি লজ্জা, কি অভিমান! না, সীতা আর এখানে কিছুতেই থাকিবে না, সে তাহার মাসীমার কাছে চলিয়া যাইবে। তাহার এক মাসীমা এখনও আছেন। পিতা বর্ত্তমান থাকিতে তিনি কতবার তাহাকে নিজের কাছে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন। মাসীমার পুত্র প্রশান্ত কয়বার তাহাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছিল, কিন্তু পিতা তাহাকে কোথাও পাঠাইতে পারেন নাই। এবার সে নিশ্চয়ই মাসীমাকে পত্র দিবে, মাসীমার কাছে গিয়া থাকিবে,—এমন লজ্জার মধ্যে

জড়াইয়া সে এখানে থাকিতে পারিবে না। নিজের আত্মীয়ের সংসারে সে দাসী হইয়া থাকিবে সেও ভাল, তবু এখানে ইহাদের সংসারে কর্ত্রী ভাবে সে কিছুতেই থাকিবে না।

কথা ভাবা যতদূর সহজ, করা ততোধিক কঠিন হইয়া উঠে; সেই জন্যই অনেকবার বলি বলি করিয়াও এ কথা সে তুলিতে পারে নাই। এই সংসারে আসিয়া এমন স্থানে সে আটকাইয়া পড়িয়াছে, যে স্থান হইতে সরিয়া পড়া একেবারেই অসম্ভব। বৃদ্ধ দাদুর ও ঈশানীর এক মুহূর্ত্ত তাহাকে না হইলে চলে না। ইঁহাদের এই স্নেহ-ভালবাসা কাটাইয়া সে যাইবে কি করিয়া?

রাখাল আসিয়া ঈশানীকে ডাকিল, কর্ত্তাবাবু একবার তাঁহাকে ডাকিতেছেন।

মূলে কোন বিশিষ্ট কারণ না থাকিলে বিহারীলাল ডাকেন না, ইহা সকলেই জানিতেন। তাই শঙ্কিত ভাবে ঈশানী রাখালের পানে তাকাইলেন।

রাখাল তাঁহার সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিল, বলিল "খোকাবাবুর পত্র এসেছে, তিনি তাই নিজের মুখে আপনাকে বলতে চান মা, সেই জন্যে ডাকছেন।"

আশ্বস্ত হইয়া ঈশানী সীতার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "একটু বসো মা, ততক্ষণ তরকারী কোট আমি এখনি আসি। জ্যোতি যদিও আমাকে আলাদা পত্র দিয়েছে বাবা জানছেন—তবুও ওঁকে যে পত্রখানা সে দিয়েছে, সেখানা আমায় না দেখালে ওঁর শান্তি হবে না। এর পর আবার তোমাকেও ডাকবেন দেখো। যাকে যাকে উনি ভালবাসেন, তাদের সবাইকে ওই পত্রখানি না দেখালে বাবার কিছুতেই শান্তি হবে না।"

ঈশানী হাত ধুইয়া চলিয়া গেলেন।

উদাস দৃষ্টিতে সীতা জ্যোতির্ম্ময়ের পত্রখানার পানে তাকাইয়া রহিল।

৯

একবার বিহারীলালের কাছে গেলে সহজে যে আর নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না, তাহা সীতা বেশ জানিত। নিরামিষ রন্ধনের যোগাড় করিয়া দিয়া আমিষের গৃহে গিয়া দেখিল, পাচিকা ঠাকুরাণী বৃহৎ ভাতের হাঁড়ি উনান হইতে নামাইতে অপারগ হইয়া পড়িয়াছেন।

"সর, আমি ভাত নামিয়ে দিচ্ছি—"

কোমরে কাপড় জড়াইয়া সীতা ভাতের হাঁড়ি ধরিল ও অবলীলাক্রমে নামাইয়া দিল। বৃদ্ধা ক্ষ্যান্ত ঠাকুরাণী ভারি খুসি হইয়া বলিল, "হয়েছে, এইবার সর দিদিমণি, আমি ফেন ঝরাচ্ছি।"

সীতা বলিল, "তুমি ততক্ষণ ডালের হাঁড়ি চড়াও, আমি ভাতের ফেন ঝরিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। বুড়ো মানুষ, এত বড় হাঁড়ি নামাতে পার না, আমায় একবার ডাকলেই পার। না হয় বাড়ীতেও তো লোকের অভাব নেই, কেউ হাঁড়িটা নামিয়ে দিলেই পারে।"

বৃদ্ধা সজল চোখে বড় করুণ সুরে কি বকিয়া যাইতে লাগিল, সীতা তাহাতে কাণও দিল না। ভাতের ফেন ঝরাইয়া হাত ধুইয়া বাহিরে আসিতে দেখিল, আত্মীয়া সম্পর্কীয়া মামীমার ছোট ছেলেটী এক ঘড়া জল কাত করিয়া ফেলিয়া, সেই জলের উপর পড়িয়া আছড়াইতেছে,—মা কোথায় কর্ম্মান্তরে ব্যস্ত রহিয়াছেন, পুত্রের খোঁজ লইবার অবকাশ নাই। সীতা ছেলেটীকে উঠাইয়া গা মুছাইয়া দিল। ছেলেটীকে শান্ত করিয়া সে তাহার মাতাকে খুঁজিয়া ছেড়ে দিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, ঈশানী সেইমাত্র ফিরিয়া আসিয়া রন্ধন চড়াইতেছেন। তাহার মুখের সে মলিনতা কাটিয়া গিয়াছে, স্বাভাবিক শান্ত প্রফুল্ল ভাব ফিরিয়া আসিয়াছে দেখিয়া সীতা ভারি আরাম পাইল।

সীতাকে দেখিয়া ঈশানী বলিলেন, "এই যে মা, কোথায় গিয়েছিলে? এ পত্রখানা পড়ে রইল, পড়।"

সীতা এনভেলাপবদ্ধ পত্রখানা হাতে লইয়া বলিল, "দাদু কি বললেন মা?"

ঈশানী শান্ত হাসিয়া বলিলেন, "যা বলেছি তাই। জ্যোতির পত্র এসেছে, দাদুর মুখের আর বিশ্রাম নেই। সেই এক কথা—সে কি কখনও বিলেত যেতে পারে,—দৈবাৎ বলে ফেলেছিল। আমিও তাই ভাবছি মা, সত্যিই কি সে যেতে পারে? ক্ষণিক একটা খেয়ালের ঝোঁক উঠেছিল—বিলেত যাবে, সুরেশবাবুর মেয়েকে বিয়ে করবে,—তাই কি হয় কখনও? হাজার হোক বামনের ছেলে, জন্মকালের সংস্কার কখনও ত্যাগ করতে পারে? তার পর ব্রাহ্ম মেয়ে বিয়ে করলে আর আমাদের এ বাড়ীতে মাথা ঢুকাতে পারবে না; বিলেত যাওয়া তো আলাদা কথা। ওসব খেয়াল মা,—দু'দিনে খেয়াল মিটে গেলে ঘরের ছেলে

ঘরেই ফিরে আসবে। যাক গিয়ে ও সব, ও পত্রখানা কার?" •

এনভেলাপের উপর সুন্দর ইংরাজীতে ঈশানীর নাম লেখা ছিল; সীতা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আপনার নামের পত্র মা, আপনি পড়ুন।"

ঈশানী বলিলেন, "তুমিই পড় মা। এ জগতে আমায় পত্র দিতে জ্যোতি আর ছোট-বউ ছাড়া আর কেউ নেই। জ্যোতি পত্র দেখলুম, এ পত্র ছোট-বউ ছাড়া আর কেউ দেয় নি

সীতা কভার ছিঁড়িয়া পত্র বাহির করিল। প্রথমেই সে নীচে নামের পানে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া, অন্যমনস্ক দৃষ্টি সমস্ত পত্রখানার উপর বুলাইয়া গেল।

তাহার মুখখানা নিমেষে বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া লইল; এ পত্র পড়িবার মত সাহস তাহার ছিল না। আস্তে আস্তে পত্রখানা ঈশানীর পার্শ্বে রাখিয়া সে সরিয়া যাইতেছিল, ঈশানী ডাকিলেন, "চলে যাচ্ছ কেন মা, পত্রখানা আমায় পড়ে শুনাও।"

নিজে তিনি অতি সামান্য লেখাপড়া জানিতেন। মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি পুস্তক কোনক্রমে পড়িতে পারিতেন। পত্রাদি আসিলে ভারি মুস্কিলে পড়িতে হইত; কেন না হাতের লেখা তিনি বুঝিতে পারিতেন না। সীতা আসা পর্য্যন্ত তিনি বাঁচিয়া গিয়াছিলেন,—সে তাঁহাকে পত্রাদি পড়িয়া শুনাইত।

সীতা ফিরিয়া আসিল, পত্রখানা তুলিয়া লইল। তাহার হাত কাঁপিতেছিল, গলার মধ্যে কি একটা ঠেলিয়া উঠিয়া স্বরটাকে বড় বিকৃত করিয়া তুলিতেছিল। একবার সে ঈশানীর শান্ত মুখখানার পানে তাকাইল। তাহার পর চোখ ফিরাইয়া পত্রের উপর রাখিল। কয়েকটা ঢোঁক গিলিয়া কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক অবস্থায় কতকটা ফিরাইয়া আনিয়া সে পড়িতে লাগিল।

জয়ন্তী এই দীর্ঘ পত্রখানি লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"দিদি"

তোমরা কেউ খবর না নিলেও, আমি যে তোমাদের খবর রাখি, তা হয় তো তোমরা জানো না। জ্যোতির্ম্ময় আমাদের বাড়ীর পাশেই থাকে। সে প্রায়ই এ বাড়ীতে আসা-যাওয়া করে। আমি তার মুখে তোমাদের সব খবরই পেয়েছি এবং এখনও পাই।

তার মুখে শুনতে পেলুম বাবা না আমার পত্র পেয়ে অত্যন্ত রাগ করেছেন। আমি তোমায় শুধু এই কথাটা জিজ্ঞাসা করছি দিদি, তাঁর এই রাগ করাটা কি উচিত হয়েছে? হভার সামনে একজামিন, এখন তাঁর আদেশ মাত্রই যে তার একজামিন না দিয়ে ওখানে ছুটে যেতে হবে এমন কোন কথা থাকতে পারে না। দুদিন বাদে তার একজামিন আরম্ভ, একটা দিন এ সময় উপস্থিত হ'তে না পারলে তার একটা বছর নষ্ট হয়ে যাবে। এই একটা বছর তার পড়ার খরচ আবার কে টানবে বল তো? আমার দাদা নেহাৎ দয়া করে বোনের, ভাগিনীর সকল খরচ বহন করছেন। কিন্তু এ তো বইবার কথা নয়, তুমিই ন্যায্য বিচার করে দেখ, তার পর উত্তর দাও। আমার বিয়ে হয়ে পর্য্যন্ত শ্বশুরবাড়ীর একখানাও কাপড় পাই নি, টাকাকড়ি তো দূরের কথা।

তোমরা বলবে, সে ত আমারই দোষ—আমি সেখানে থাকতে পারি নি বলে তোমরা রাগ করে আমায় ভাইয়ের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছ। থাকতে পারা বা না পারা, তার জন্যে আজ কোন কথা বলতে আসি নি ভাই দিদি। তবে এইটুকু মনে কোরো, আমায় যে শিক্ষিতা বলে তোমরা ঠাট্টা-তামাসা করেছ, সেই শিক্ষাটুকু না থাকলে খোরাক পোষাকের দাবী আমিও করতে পারতুম।

তোমার দেবর—আমার স্বামী স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধী ছিলেন, সে শুধু তাঁর বাপের জন্যে। এই যে শ্বশুর মহাশয় সেদিন ইভাকে লিখেছেন—স্ত্রী-শিক্ষা অধঃপতনের মূল,—এটা কতদূর নীচ মনের উপযুক্ত কথা সেটা একবার মনে করে দেখ। ইভা কখনও তাঁর কাছ হতে কিছু পেয়েছে কি—কখনও একখানা কাপড়,—একখানা গহনা? তাঁর বিশাল সম্পত্তি অগাধ অর্থ; কিন্তু ইভা একটী পাইও পাবে কি? বলবে ইভা হিন্দুর মেয়ে, লেখাপড়া শিখলেও তাকে বিয়ে করতেই হবে। ভাল কথা, কিন্তু বিয়ের পরে যদি সে বিধবা হয়? বিধবা হ'লে তার মায়েরই মত তাকে পরের গলগ্রহ স্বরূপ জীবন কাটাতে হবে তো? আমার তবু একটী ভাই আছে। তোমরা সব সম্পর্ক উঠাতে পারলেও, ভাই সম্পর্ক উঠাতে পারে নি। কিন্তু তার কি হবে? তার ভাই নেই যে তাকে আশ্রয় দেবে। কাজেই, বাধ্য হয়ে তাকে তার ভবিষ্যতে জীবিকার্জ্জন করার মত শিক্ষা আমায় দিতে হচ্ছে। হ্যাঁ, সে নিজের জীবিকার্জ্জন করবে; তবু যিনি

একদিন তার মাকে ও তাকে কুকুরের মত দুয়ার হ'তে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছেন, তাঁরই সেই দুয়ারে একমুঠো ভাতের প্রত্যাশায় কিছুতেই যাবে না।

স্ত্রী-শিক্ষা অধঃপতনের মূল, এ কথা তিনি বলতে পারেন, যিনি মেয়েদের নিতান্ত ঘৃণার চোখে দেখেন,—মেয়েরা চিরদিন তাঁদের করুণাপ্রার্থিনী হয়ে থাক, তাঁরা এদের ওপরে যথেচ্ছা ব্যবহার করেন, এইটাই যাঁরা চান। মেয়েদের শিক্ষায় তাঁরা দোষ ধরবেন বই কি,—মেয়েরা যে তা হলে মুখ ফুটে সত্য কথা বলতে পারবে। তোমার কথা দিয়েই বলছি দিদি, তুমি এই যে মুখটী বুজে পড়ে আছ,—কত কথাই না তোমায় শুনতে হয়েছে, কত নির্য্যাতন না সইতে হয়েছে। হয়তো আজ তুমি আমার এ কথা হেসে উড়িয়ে দেবে, বলবে—না, এঁরা খুব যত্ন করেন, খুব ভালবাসেন, দেবীর মত শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু আমি কখনও একথা বিশ্বাস করি নে যে, বিধবাকে লোকে ভালবাসে, আদর করে। হতে পারে—তুমি আদর পেতে পার, যত্ন পেতে পার, তাই বলে সকল বিধবা যে পায় না, এ আমি ঠিক জানি। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি এ দেশের বিধবাদের লাঞ্ছনা, এদের চোখের জল,—এদের দীর্ঘনিঃশ্বাস কাণে আসছে। এই সব মেয়েদের যদি শিক্ষা দেওয়া যেত, তবে কি এরা এমন করে আত্মীয়ের সংসারে ক্রীতদাসীর মত জীবন-পণে আবদ্ধ থেকে এ রকম ভাবে লাঞ্ছনা গঞ্জনা সইত, চোখের জলে ভেসে অহরহ মৃত্যু প্রার্থনা করত?

ইভার মামা যে চিরকাল তার ভার বইবেন, এমন কোন কথা নেই; অথবা তাকে যে তাঁর গলগ্রহ হয়ে থাকতে হয়, আমি সে ইচ্ছা করি নে। যখন তার কিছু নেই, সে পরের কৃপায় মানুষ হচ্ছে, তখন তার ভবিষ্যতের জন্যে নিশ্চয়ই বেশী রকম লেখাপড়া শেখা দরকার।

যাক, এ সব কথায় আর দরকার নেই এখন অন্য কথা বলি। যা বলবার জন্যে পত্র লিখতে বসেছি তার একটাও বলা হয় নি, ইভার কথা এসে পড়ল। এ সব কথা বাবাকে জানানো উদ্দেশ্য; কিন্তু তাঁকে লিখতে পারলুম না। তোমায় সব জানাচ্ছি, তুমি তাঁকে জানাতে পার।

তোমার ছেলে এখানকার একটী মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। শুনলুম তার কথা তোমায় সে বলেছে। দেবযানী ওদের প্রফেসার সুরেশ মিত্রের মেয়ে। হয় তো খুব আশ্চর্য্য হবে যে, ব্রাহ্মণ কায়স্থে বিয়ে হবে কি করে?—কারণ কায়স্থ ব্রাহ্মণের চেয়ে অনেক ধাপ নীচে। আমাদের সমাজে যখন রা়ঢ়ী বারেন্দ্র বিয়ে হতে পারে না, তখন কায়স্থ-কন্যা ও ব্রাহ্মণপুত্রের বিয়ে কোন্ সমাজানুমোদিত হতে পারে? এর আগে তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি—সুরেশবাবু ব্রাহ্ম, এবং ব্রাহ্ম সমাজে জাতিভেদ বেশী নেই। ব্রাহ্মণ উচ্চবর্ণ; কিন্তু কায়স্থও অস্পৃশ্য নহে। আজকাল এ রকম বিয়ে অনেক জায়গায় চলন হয়ে গেছে, হচ্ছেও অনেক। তবে তোমরা সহর হ'তে বহু দূরে থাক,—হয় তো এ সব বার্ত্তা তোমরা কখনও পাও নি, তাই শুনবামাত্র আকাশ হতে পড়বে, আগেই মাথা নাড়বে,—এ বিয়ে হবে না, হতে পারবে না।

তুমি বেশী লেখাপড়া জানো না; নইলে জানতে পারতে, এ রকম বিয়ে আমাদের দেশে এই নতুন নয়,—বহু পূর্ব্ব যুগে এ রকম বিয়ে প্রচলিত ছিল। প্রমাণ দেখতে চাও—রাজা যযাতি, ব্রাহ্মণ-কন্যা দেবযানীকে বিয়ে করেছিলেন। লোপামুদ্রা ক্ষত্রিয়-কন্যা হয়ে ব্রাহ্মণকে বিয়ে করেছিলেন। সে সব বিয়ে যদি তখনকার দিনে সমাজানুমোদিত বলে গণ্য হয়ে থাকে, তবে এখনই বা না হয় কেন? তোমার ছেলে কায়স্থ-কন্যা দেবযানীকে কেননা বিয়ে করতে পারবে, তার কারণ তবে আমায় দেখাও।

আমি জানি, সে দেবযানীকে কতখানি ভালবাসে। সে নিজের মুখে বলেছে, দেবযানীকে না পেলে সে আর বিয়ে করবে না। জানো না দিদি,—এ রকম হতাশ হয়ে ছেলেরা আত্মহত্যা পর্য্যন্তও করে থাকে। তার খুব আশা সে দেবযানীকে বিয়ে করবে, বিলাত যাবে—একটা মানুষ হয়ে ফিরে আসবে। আমি এও জানি, বাবা এতে কখনই মত দেবেন না; কারণ তিনি গোঁড়া হিন্দু সেকালের প্রথামত বাঁধা গৎ ঝাড়বেন। দেশে থেকে মেয়েদের সামান্য শিক্ষায় যিনি এক মুহূর্ত্তে ভবিষ্যৎ দেখে ফেলেন, জ্যোতির এই বিয়ে আর বিলাত যাওয়ার নামে তিনি যে পাগল হয়ে যাবেন, তাতে আমার এতটুকু সন্দেহ নাই।

আর দেবযানী? আমি যতদূর জানি—সেও জ্যোতিকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। সে সব রকমেই জ্যোতির উপযুক্ত পাত্রী। আমি জ্যোতিকে ছেলের মত ভালবাসি। জানি নে

আমার এ কথা তোমরা বিশ্বাস করবে কি না; কারণ, তোমরা না কি শিক্ষিতা মেয়েদের ভালবাসা, স্নেহ, ভক্তি প্রভৃতি হৃদয়ের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলোও নিক্তি দিয়ে ওজন করে দেখ।

শুনলুম—জ্যোতির সঙ্গে বিয়ে দেবে বলে' তোমরা একটী মেয়েকে বাড়ীতে এনে রেখেছ। তার কথা আমি আগে হতে জানলেও তাকে কখনও চোখে দেখি নি। তবু এ কথা বলতে পারি, তোমরা তোমাদের চোখ দিয়ে যা শিক্ষা ও সৌন্দর্য্য বলে দেখ, তোমাদের জ্ঞানে যা গুণ বলে' ধারণা কর, তা অতি তুচ্ছ; অন্ততঃ জ্যোতি তাকে তুচ্ছ বলে ঘৃণা করবেই। ধরে বেঁধে দিতে পারবে না; কারণ, সে এখন শিশু নয়,—নিজের হৃদয়ের পানে চেয়ে ভালমন্দ বিবেচনা করাব শক্তি তার আছে। এই চেষ্টার ফলে এই হবে যে, তুমি তার ভক্তি শ্রদ্ধা হারিয়ে বসবে,—ভবিষ্যতে মা নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে তার অন্তরটা ভক্তিতে ভরে উঠবে না,—তার চোখ দুইটী ছল ছল করে আসবে না,—তার সারা অন্তরটা ঘৃণায় ভরে উঠবে। একটীমাত্র সন্তান তোমার, তার বুকে তোমার আসন অটুট রেখো,—মা ডাক শুনতে ইচ্ছা করে বঞ্চিতা হয়ো না।

আমি তোমার চেয়ে বয়সে ছোট, সম্পর্কে ছোট হয়েও তোমায় যে উপদেশ দিতে সাহস করছি, এর জন্যে আমায় মার্জ্জনা কর। আমিও সন্তানের মা। সন্তানের মুখের মা আহ্বানটা কাণে শোনাই আমাদের নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনা। সেই মা ডাক হ'তে বঞ্চিতা হওয়া যে নারী-জীবনে কতবড় অভিশাপ, তা তো বুঝতে পারি দিদি। তাই তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি। শুধু বর্ত্তমান দেখো না,—ভবিষ্যৎ ভাবতে, ভবিষ্যৎ দেখতে চেষ্টা কর।

তুমি মনে কর না, আমি জ্যোতির কাছ হতে সব কথা শুনে লিখছি। সে আমায় একটা কথাও বলে নি,—আমি তার মলিন মুখ দেখে সব বুঝতে পেরেছি। তাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বড় মলিন হাসি হেসে শুধু বললে, "আমার বিলেত যাওয়া হল না।" আর একটী কথা সে বলে নি। বড় ব্যথা সে পেয়েছে, কিন্তু মুখ ফুটে একটী কথা বললেনা। হায় দিদি, তুমি মা, তাই জিজ্ঞাসা করছি—তোমার ধর্ম্ম বড়, তোমার ওই সমাজ বড়, না—তোমার সন্তান বড়?

আশা করছি, তোমরা ভাল আছ। যে মেয়েটীকে এনে রেখেছ, তার বিয়ে দিয়ে দাও,—বড়ঠাকুরের প্রতিজ্ঞা রক্ষা হবে।

সব কথাই বললুম দিদি। বেশ ভাল করে সব কথা বিবেচনা করে দেখ, তার পর যা ব্যবস্থা হয় কর। আমার মতে যা ভাল তাই বললুম, এখন তোমার যা ইচ্ছা। যদি ইচ্ছা হয়—রাগ না করে থাক, একখানা পত্র দিয়ো। প্রণাম নিয়ো। সেবিকা ছোটবউ।"

তরকারীর কড়াটা উনানে বসানো ছিল, ঈশানী তাহা নামাইয়া ফেলিয়া হাত ধুইলেন। নিঃশব্দে বড় মলিন মুখে তিনি আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেলেন।

প্রথম কয়েক মুহূর্ত্ত তরুণী সীতা আড়ষ্ট ভাবে পত্রখানা হাতে করিয়াই দাঁড়াইয়া ছিল। যখন তাহার চমক ভাঙ্গিল, তখন সে দেখিল, তরকারী-সুদ্ধ কড়াখানা উনানের ধারে পড়িয়া রহিয়াছে,—ঈশানী কখন চলিয়া গিয়াছেন।

পত্রখানা ফেলিয়া রাখিয়া সে ঈশানীর রুদ্ধ দ্বারে গিয়া আঘাত করিয়া বিকৃতকণ্ঠে ডাকিল, "মা—"

গৃহমধ্য হইতে উত্তর আসিল না।

সীতা আবার দরজায় আঘাত করিয়া ডাকিল, "মা, রান্না ফেলে চলে এলেন যে—"

ঘরের মধ্য হইতে কান্নাভরা সুরে ঈশানী উত্তর দিলেন, "ওসব বামন-ঠাকরুণকে নিয়ে যেতে বলে দাও মা। আমার আজ শরীর বড় খারাপ করছে, কিছু খাব না।"

সীতা খানিক দরজায় ভর দিয়া চুপ করিয়া অন্যমনস্ক দৃষ্টি কোন দিকে ফেলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রমে তাহার বড় বড় চোখ দুইটী অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। হঠাৎ কখন চোখ ছাপাইয়া ঝর ঝর করিয়া আরক্তিম গণ্ড দুইটী ভাসাইয়া স্রোত ছুটিল। ধীরে ধীরে সে নীজের ঘরে চলিয়া গেল।

একখানি পত্র আসিয়া বাড়ী মধ্যে যে এত গোল বাধাইয়া তুলিয়াছে তাহা বিহারীলাল জানিতে পারিলেন না। যে দুইটী নারী পত্রের কথা জানিয়াছিল, তাহারা ইহার কথা একেবারেই গোপন করিয়া গেল।

১০

বিহারীলাল দিন গণিতেছিলেন—কবে জ্যোতির্ম্ময় আবার ফিরিয়া আসিবে, কবে তাহার

বিবাহটা দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত মনে তীর্থযাত্রা করিতে পারিবেন। তাঁহার সকল আশাই এখন ঘুচিয়া গিয়াছে, এই একটি আশা লইয়া তিনি এখনও বাঁচিয়া আছেন।

ম্যানেজার সুশীলবাবু অল্পদিন মাত্র এই ইষ্টেটে কার্য্য লইয়াছেন। ইনি সীতার পিতা বিনয়ের সম্পর্কীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। তিনি বিহারীলালের কার্য্যে দু'দিন পূর্ব্বে কলিকাতায় গিয়াছিলেন রাত্রির ট্রেণে ফিরিয়া সেদিন তিনি প্রভুর সহিত দেখা করিতে পারিলেন না।

সকালবেলা বিহারীলাল নিত্যকার মত বৈঠকখানায় বসিয়া জমীদারীর কাগজপত্র দেখা শুনা করিতেছিলেন, নীচে মেঝেয় কয়েকটি প্রজা অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে বসিয়া ছিল। ইহারা গোমস্তার অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রভুর নিকট নালিশ করিতে আসিয়াছে। অনেক দিন হইতে তাহাদের উপর অনেক অত্যাচার চলিতেছিল। এতদিন তাহারা ভয়ে কর্ত্তাবাবুর নিকট নালিশ করিতে আসিতে পারে নাই,—বড় অসহ্য হওয়ায় আজ তাঁহারা চলিয়া আসিয়াছে।

সুশীলবাবুকে ডাকিবার জন্য প্রত্যুষে লোক পাঠান হইয়াছে। অনেক দিন জ্যোতির্ম্ময়ের কোন সংবাদাদি পাওয়া যায় নাই, বিহারীলাল অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়া ছিলেন। বিহারীলাল দুইখানি পত্র দিয়াও তাহার উত্তর পান নাই। সেইজন্য তিনি সুশীলবাবুকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, যেন তিনি আগে জ্যোতির্ম্ময়ের সংবাদ নেন।

সুশীলবাবু আসিতেই তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন, এই যে তুমি এসেছ সুশীল। আমি কাল রাত্রেই তোমার কাছে লোক পাঠাব ভেবেছিলুম,—বউ মা বারণ করলেন, তাই আর কাউকেও পাঠাইনি। আজ ভোরে তাই তোমায় ডাকতে লোক পাঠিয়েছি। তুমি হয় তো মনে ভাবছ বুড়ো পাগল হয়ে গেছে, তার এক ঘণ্টা দেরী সইছে না।"

স্নিগ্ধ সকৌতুক হাসিতে তাঁহার মুখখানা ভরিয়া উঠিল।

সুশীলবাবু ফরাসের এক পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। বৃদ্ধ এখনই পৌত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন,—তিনি তখন কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া তাঁহার মুখ শুকাইয়া উঠিয়াছিল।

কাগজ দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্ক ভাবে বিহারীলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল রাত্রে তুমি এসেছ,—না?"

সুশীলবাবু উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ। আমিও রাত্রিতেই আসবার চেষ্টা করেছিলুম; কিন্তু বৃষ্টি এসে পড়ল—"

বিহারীলাল বলিলেন, "ভালই করেছ। তেমন কিছু দরকার ছিল না যে তখন সেই বৃষ্টিতে এসে না বললে চলত না।"

তেমন কিছু দরকার যে ছিল না, তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়া ও কথার ভাবেই বুঝা যাইতেছিল।

বিহারীলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "জ্যোতির কাছে গিয়েছিলে, সে বেশ ভাল আছে তো? বলেছিল, তাদের কি একটা পরীক্ষা বাকি আছে, সেটা হয়ে গেছে কি?"

সুশীলবাবু অন্যদিকে চাহিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, খোকাবাবু বেশ ভালই আছেন দেখলুম। সে পরীক্ষাটা হয়ে গেছে শুনতে পেলুম।"

উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়া বিহারীলাল বলিলেন, "পরীক্ষা হয়ে গেলেই তার বাড়ী আসার কথা ছিল; হয়ে গেল তবে সে এল না কেন?"

সুশীলবাবু মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

যে কথা তিনি শুনিয়া আসিয়াছেন, তাহা কোনরূপে তিনি মুখে আনিতে পারিতেছিলেন না। বৃদ্ধ যে অনেক আশা লইয়া পথপানে চাহিয়া আছেন, পরীক্ষা দিয়া পৌত্র ফিরিয়া আসিবে। তিনি গৃহদেবতা শ্রীধরের ভোগ মানিয়াছেন, গ্রাম্যদেবী চণ্ডীর পূজা মহাসমারোহে দিবেন স্থির করিয়াছেন, সে সকল আশা তাঁহার ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। তিনি কেমন করিয়া জানাইবেন সে আর আসিবে না, অথবা সে আসিলেও বিহারীলাল তাহাকে এ গৃহে আর স্থান দিবেন না।

তাঁহাকে নীরব দেখিয়া সন্দিগ্ধ ভাবে বিহারীলাল মুখ তুলিয়া তাঁহার পানে চাহিলেন। সে দৃষ্টির সম্মুখে নিজেকে স্থির রাখিতে না পারিয়া সুশীলবাবু অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন।

কাগজপত্রগুলি এক পার্শ্বে সরাইয়া রাখিয়া উদ্বিগ্ন ভাবে বিহারীলাল বলিলেন, "আমি বেশ বুঝতে পারছি তুমি আমায় কি একটা কথা গোপন করবার চেষ্টা করছ কিন্তু তোমার এ চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। সত্তর বছর বয়েস যার, সে সংসারের অনেক দেখে-শুনে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করে, সে কথা নিশ্চয়ই তুমি ভুলে যাওনি সুশীল। বল,—যতই অপ্রিয় সত্য হোক না কেন, তা প্রকাশ

করতে কুণ্ঠিত হয়ো না;—মিথ্যে কতকগুলো কথা দিয়ে তাকে চাপা দিতে চেয়ো না—জেনো এ বুক বড় শক্ত, অনেক আঘাত পেয়েছে, তবুও যখন ভাঙেনি,—আরও অনেক আঘাত সইতে পারবে, তবু ভাঙবে না।"

সুশীলবাবু রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "জ্যোতি—"

তিনি থামিয়া যাইতে বিহারীলাল বলিলেন, "কি করেছে সে তাই বল।"

সুশীলবাবু বলিলেন, "সে অধ্যাপক সুরেশ মিত্রের মেয়েকে বিয়ে করছে শুনলুম। আমার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল, সে অনেক—"

"থাক থাক, শুনেছি—বুঝেছি সুশীল"—এমন তীক্ষ্ণ সুরে তিনি কথা কয়টী বলিয়া গেলেন যে, সুশীলবাবু থতমত খাইয়া নীরব হইয়া গেলেন।

বৃদ্ধ খানিকটা গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর কাগজপত্রগুলা আবার সম্মুখে টানিয়া আনিয়া তাহার উপর চোখ রাখিলেন। চশমার কাচ ঝাপসা হইয়া উঠিয়াছিল; তাই চশমা খুলিয়া কাচ দুইখানা একবার মাজিয়া লইয়া আবার চোখে দিলেন।

সুশীলবাবু বিস্মিত ভাবে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, এ সংবাদ শুনিয়া বৃদ্ধ না জানি কি কাণ্ড করিয়া বসিবেন! দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন যে, তাঁহার মুখখানা একবার মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র বিকৃত হইয়া তখনই আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিল।

বিহারীলাল প্রজাদের প্রদত্ত আবেদন পত্রখানা গভীর মনোযোগের সহিত পড়িয়া গেলেন। চোখ তুলিয়া প্রজাদের প্রধান মণ্ডল রতনের পানে তাকাইয়া শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, আচ্ছা, আজ তোমরা যাও। সোমবারে দীননাথ গোমস্তার সদরে আসবার কথা আছে, তোমরাও সেইদিনে আসবে, আমি সেই দিনে তার বিচার করব। তোমরা না এলে—"

রতন মণ্ডল ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া করযোড়ে বলিল, "হুজুর মা বাপ; তিনি বলেছেন—যদি আমরা আপনার কাছে কোন কথা জানাই, তা হলে তিনি আমাদের ঘর জ্বালিয়ে দেবেন, আমাদের জরু গরু—"

বিহারীলাল গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "সে ভার আমি নিচ্ছি, তোমাদের সে ভয় করতে হবে না। আমি বলছি, তোমরা কয়জনে সোমবারে অবশ্য আমার কাছে আসবে, আমি তার বিচার করব,—আজ তোমরা যাও।"

সসম্ভ্রমে নতজানু হইয়া প্রণাম করিয়া তাহারা বিদায় লইল।

আবেদন-পত্রখানা পার্শ্ববর্ত্তী বাক্সের মধ্যে রাখিয়া বাক্স রুদ্ধ করিয়া বিহারীলাল সুশীলবাবুর দিকে ফিরিলেন। তাঁহার মুখে চোখে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়া একটু হাসিলেন, বলিলেন, "তুমি আশ্চর্য্য হয়ে গেছ সুশীল, যে আমার একমাত্র বংশধর,—সে ধর্ম্মত্যাগী হল—আমি সেটা শুনে সহ্য করে গেলুম! কিন্তু তুমি জানো না সুশীল,—চোখে না দেখলেও যে এক বছর তুমি এখানে এসেছ এর মধ্যে নিশ্চয়ই শুনেছ—এর চেয়ে কত বড় আঘাতও আমায় সইতে হয়েছে। বিচলিত হই নি এমন কথা বলতে পারি নে; কারণ, আমিও মানুষ, দেবতা নই। প্রথম যখন স্ত্রী গেল, তখন আমার কাছে পৃথিবী মরে গেল,—প্রেতের মত এই পৃথিবীর বুকে আমি রইলুম। তার পর ধীরে ধীরে আমার বুকে আবার স্পন্দন অনুভব করলুম, সুখ-দুঃখ আবার বোধ করলুম, যাতে জানলুম—আমি মরিনি, আমি বেঁচে আছি। আমার যোগ্য ছেলে প্রকাশ চলে গেল, ক্রমে তার শোকও ভুলে গেলুম। প্রতাপ গেল—তার স্ত্রী-কন্যা আমার পর হয়ে গেল। আমি জগতের আর কারও ওপর এতটুকু ভরসা করি নি, জানি—কেউ আমার থাকবে না,—আমায় ফেলে একে একে সব চলে যাবে। উৎসব ফুরিয়ে গেছে সুশীল, তার চিহ্ন বুকে নিয়ে আমি শুধু বেঁচে আছি। ফুলের মালা শুকিয়ে গেছে, একে একে আলো সব নিভে গেছে, আমি যাই নি—আমি আছি। কি শক্ত বুক দেখেছ, অনেক আঘাত সইতে পারি; কিন্তু তোমরা হলে তোমাদের বুক শতধা হয়ে যেত! সব যাক—সব যাক, আমার দেবতা তো যাবেন না। অকৃতজ্ঞ মানুষ ছাড়তে পারে, সব ভুলে যেতে পারে, দেবতা তো প্রতারণা করতে পারেন না। ভুল বুঝেছিলুম ভুল আমার ভেঙ্গে গেছে। সংসার ত্যাগ করে আবার সংসারে জড়িয়ে পড়েছিলুম, এ তারই শাস্তি। নারায়ণ জানালেন—সব মিথ্যে—একমাত্র তিনিই সত্য।

ইতস্ততঃ ছড়ানো কাগজপত্রগুলি একত্র গুছাইয়া তাহার উপর এক খণ্ড লৌহ চাপা দিয়া চশমা খুলিয়া তিনি উঠিলেন। একটু আগে রাখাল তামাক সাজিয়া দিয়া গিয়াছিল সে তামাক পুড়িয়া

ধোঁয়া উঠিতেছিল, সে দিকে বিহারীলালের দৃষ্টি ছিল না।

"আচ্ছা, আজ তবে এসো সুশীল। আমায় এখন একবার বাড়ীর মধ্যে যেতে হবে।"

খড়ম জোড়া পায়ে দিয়া তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন।

সীতা পূজার যোগাড় করিতেছিল, খড়মের শব্দ পাইয়া সচকিত হইয়া উঠিল। পাড়ার একটি ছোট মেয়ে প্রত্যহ পূজার সময় আসিয়া জুটিত পুরোহিত আসিয়া পূজা করিয়া যাইতেন, সে প্রত্যহ প্রসাদ পাইত।

সীতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কে আসছে মিনি, ঠাকুর মশাই না কি রে?"

মিনি দেখিয়া কিছু বলিবার আগেই বিহারীলাল দরজার উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন; ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়া বলিলেন, "এই যে দিদি তুমি পূজোর যোগাড় করছ। আমি আজ শ্রীধরের পূজো করব, এখনি স্নান করে আসছি।"

তিনি চলিয়া গেলেন।

আজ হঠাৎ তাঁহার এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া সীতা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সে আজ কয় মাস এখানে আসিয়া রহিয়াছে, বিহারীলালকে এক দিনও সে পূজার ঘরে দেখিতে পায় নাই। বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তরুণ বয়স হইতে ঠাকুরের পূজা করিয়া আসিতেছেন,—বিহারীলাল তাঁহার উপরে এ ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ছিলেন।

স্নানান্তে ফিরিয়া আসিয়া তিনি পূজার আসনে বসিলেন। সীতা বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া আছে দেখিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "তুমি ভাবছ সীতা, আমি হয় ত পূজা করতে জানি নে। যাকে নিয়ত বিষয়-কর্ম্মে নিবিষ্ট থাকতে দেখেছ, সে যে পূজো করতে আসবে, এ যেন তোমার কাছে একেবারেই অসম্ভব বলেই ঠেকে। দিদি, বছর সত্তর বয়েস হয়েছে, এখনও পাথেয় এতটুকু সঞ্চয় করতে পারলুম না। আশা ছেড়ে দিয়েও কি মিথ্যে আশায় ভুলে ছিলুম, আজ তাই ভাবছি। সব হারানোর পথ বেয়েই যে চলেছি দিদি,—আমার যে নিজেকে পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলবার সম্ভাবনা আছে, তাও আমি ভুলে গিয়েছিলুম। যখন দারুণ বাতাস বইতে সুরু করেছিল, তখন আমি তাসের ঘর তৈরী করছিলুম। বাতাসে সে ঘর একটা একটা করে ভেঙ্গে পড়ছিল, আমি আবার তাকে গড়ে তুলতে প্রাণপণ চেষ্টা আর যথেষ্ট সময় ব্যয় করছিলুম। আজ দেখছি—একেবারে সব ভেঙ্গে পড়েছে। আর ভুলব না ভাই। যা গেছে তা যাক, এ ব্যর্থ প্রয়াসের আর দরকার নেই,—আমায় এখন মুখ ফিরিয়ে সরে দাঁড়াতে হবে। হায় রে, সোণা ফেলে যে শুধু রাংই কুড়িয়েছি, তা এতকাল জানতে পারি নি, আজ জেনেছি,—সব দিয়ে আসার পথে তবু কি কুড়িয়ে নিতে চেয়েছিলুম, কার জন্যে তবু সঞ্চয় করতে চেয়েছিলুম—ভেবেছিলুম যতক্ষণ জীবন আছে তার জন্যে খেটে যাই—শুধু খেটে যাই? লোকে পাগল বলেছে, উপহাস করেছে,—অজ্ঞাতে সে কথা কাণে এসেছে, হেসে সব উড়িয়ে দিয়েছি। সব ফুরাল দিদি,—সব ফুরিয়ে গেল। সঞ্চয়ের বাসনা দূরে থাক,—আজ মনে হচ্ছে, এতদিন রক্ত জল করে' দিন-রাত খেটে যা বাড়িয়ে এসেছি, সেই সব যদি দু'হাতে বিলিয়ে দিতুম, তাও যে ভাল হত দিদি।"

তাঁহার স্বর কান্নায় ভিজিয়া উঠিয়াছিল, তিনি চোখ ফিরাইয়া সিংহাসনস্থিত বিগ্রহের পানে চাহিলেন।

তাঁহার মনে যে কতখানি ব্যথার গ্লানি জমিয়া উঠিয়াছিল, তাহা সীতা বেশ বুঝিয়াছিল। তাহার বুকখানা দলিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল।

আবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠে বিহারীলাল বলিলেন, "সে যে এমন করে আমার বুকে ব্যথা এঁকে দিয়ে যাবে, তা তো কখনও ভাবি নি দিদি। বউ-মা বুদ্ধিমতী, তিনি আগেই তার মানসিক গতির পানে দৃষ্টি করেছিলেন; তাই তিনি আমায় তাকে বেশী পড়াতে, বেশী দিন কলকাতায় রাখতে বারণ করেছিলেন। আমি তাঁর কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলুম। তারই ফল আজ আমায় পেতে হচ্ছে। আবার ভাবছি—এ বেশই হয়েছে,—নারায়ণ তাঁর ভক্তকে এমনি করে পরীক্ষা করছেন, দেখছেন, তবু আমি বিশ্বাস হারাই কি না,—তাঁকে ছাড়ি কি ধর্ম্মত্যাগী পৌত্রকে ছাড়তে পারি। আমি এই ভেবে তাঁকে এই মুহূর্ত্তে ধন্যবাদ দিচ্ছি—এর আগে আমার মৃত্যু হয় নি। তোমরা বলবে, এর আগে আমার মরা ভাল ছিল,—তা হলে এ আঘাত সইতে হতো না। কিন্তু আমি এক একবার দুঃখে অধীর হলেও, সময় সময় সত্য জ্ঞানে বুঝতে পারছি—এই সব দেখবার জন্যই আমার বেঁচে থাকার দরকার। তাই তিনিই আমার জীবনী শক্তি বর্দ্ধিত করে দিয়েছেন। আমি

যদি এর আগে মরতুম, আমার সকল সম্পত্তি সে এতদিন হাতে পেত ; কারণ, সে এখন সাবালক হয়েছে। সে এই মেয়েটাকে বিয়ে করত, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করত এবং বিলাতেও যেত,—এই কষ্টার্জ্জিত অতুল সম্পত্তি হাতে পেয়ে সে যথেচ্ছাচার করত। বিধর্ম্মীর পায়ের স্পর্শে আমার পবিত্র ভিটে কলঙ্কিত হতো, বিধর্ম্মীর হাতে আমার পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত শ্রীধরের লাঞ্ছনার শেষ থাকত না। এই জন্যেই আমি মরি নি, এখনও বেঁচে আছি বলেই এর প্রতিবিধান আমি করতে পারব,—আমার পবিত্র ভিটে, আমার শ্রীধর—আমি রক্ষা করতে পারব। যেটা হোতই তা এখন আমি বেঁচে থাকতে আমার চোখের সামনেই যে হল, এ আমার সৌভাগ্য দিদি। আজ হতে যত দিন বাঁচবো, আমার শ্রীধর আমারই হাতে থাকবেন। আর তেমন আন্তরিকতার সঙ্গে জমীদারী দেখবার —এ বাড়িয়ে তোলবার কি দরকার ভাই। যা নেহাৎ না করলে নয় তাই মাত্র করে যাব, আর কিছু নয়।"

বিহারীলাল পূজায় বসিলেন। সীতা খানিক স্তব্ধ ভাবে বসিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল।

১১

সে দিন আকাশে ঘন ঘোর মেঘ সাজিয়া আসিয়াছিল, থাকিয়া থাকিয়া কালো মেঘের গা বাহিয়া ঝর ঝর করিয়া বৃষ্টিধারা ধরার বুকে নামিয়া আসিতেছিল। আশ্বিনের প্রথম, বর্ষা'র সময় অতীত হইয়া গেলেও আকাশ এখনও পরিষ্কার হয় নাই। অদূরে কূলে কূলে পূর্ণা নদী তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া ছুটিয়াছে। তাহার বুকের উপর দিয়া ছোট বড় কত নৌকা হেলিয়া দুলিয়া তরঙ্গের তালে তালে নাচিয়া যাওয়া আসা করিতেছে। ওপারের দৃশ্যটী তখন বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। কালো মেঘগুলি স্তর বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই স্তরের ফাঁকে ফাঁকে মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইতেছে, একদিকে উঠিয়া নিমেষে অন্য পার্শ্বে ছুটিয়া লয় হইয়া যাইতেছে, আবার উঠিতেছে আবার মিলাইতেছে। নীচে ও-পারে এ পারে বাবলা গাছগুলি প্রায় আগাগোড়া হরিদ্রা রংয়ের ফুলে সাজিয়া দাঁড়াইয়া আছে। উড়িতে উড়িতে শ্রান্ত পাখী গাছের ডালে বসিবামাত্র তাহার ভরে পাতা ও ফুল হইতে টপ টপ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে, কখনও বৃন্তচ্যুত ফুল খসিয়া পড়িতেছে। কালো মেঘের নীচে গাছ-ভরা ফুল বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। উপরে কালো মেঘের স্তর, তাহার বুকে বিদ্যুতের খেলা। নীচে তাহারই ছায়া বুকে ধরিয়া নদী চলিয়াছে ; দর্শক-রূপে গাছগুলি দাঁড়াইয়া সেই অসীম সৌন্দর্য্য দেখিয়া লইতেছে।

ছোট বড় বাবলাগাছের মাঝখান দিয়া ঘাটে আসিবার সরু পথটী। দু'ধারে ছোট বড় জঙ্গলে পূর্ণ রেখার মত সেই সরু পথটী আঁকিয়া বাঁকিয়া আসিয়া নদীর বালুকাময় ঘাটে শেষ হইয়া গিয়াছে। ও-পারের গ্রামবাসিনীরা মাঝে মাঝে কলসী কক্ষে সেই সরু পথটী বাহিয়া আসিতেছে, নদীর কালো জলে ঢেউ দিয়া কলসী পূর্ণ করিয়া জল লইয়া মন্থর গতিতে সেই পথে ফিরিয়া যাইতেছে। এই পথটী কোথা হইতে আসিয়াছে তাহা জানা নাই। জমীদার বাটীর মেয়েরা ছাদে দাঁড়াইয়া অথবা জানালায় উঁকি দিয়া পথ দেখিতে পায়, মেয়েদের দেখিতে পায়, গ্রাম কোথায় তাহা দেখিতে পায় না। ইহাদের সম্বন্ধে তাহারা বিশেষ কিছু সংবাদ রাখে না। জানে এইটুকু—এখানে দাঁড়াইলে উহাদের দেখিতে পাওয়া যায়।

সীতা নীরবে খোলা জানালার পার্শ্বে বসিয়া শ্রান্ত-নেত্রে প্রকৃতির অসীম সৌন্দর্য্যের পানে চাহিয়া ছিল। আজ তাহার মুখটা বড় গম্ভীর, তাহার চির-পরিচিত হাসি আজ মুখে ছিল না। দৃষ্টি তাহার বড় উদাস, এই অনন্ত সৌন্দর্য্য আজ সে যেন অনুভব করিতে পারিতেছিল না; শুধু দেখিয়া যাইতেছিল। আজ আকাশে যেমন নিকষ কালো মেঘ সাজিয়া আসিয়াছে, পৃথিবীর মুখের হাসি যেমন মুছিয়া দিয়াছে, বাড়ীখানার উপরও তেমনি বিষাদ অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। আকাশের মেঘ আবার কাটিয়া যাইবে, তরুণ সূর্য্যের অরুণ-আলোয় ধরার মুখ আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, এ বাড়ীর উপর যে বিষাদ ঘনাইয়া আসিয়াছে, যে মেঘ সকলের হৃদয়াকাশে কঠিন হইয়া জমা হইয়াছে, তাহা কোন দিন কাটিয়া যাইবে?

খানিক আগে বেশ একপসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়া এখন আকাশ থম থম করিতেছে। সন্ধ্যার দিকে আবার বৃষ্টি নামিবে তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। পথে ঘাটে জল জমিয়াছে। দিবাশেষে সেই

জলের মধ্য দিয়া, পল্লীসুলভ তালপাতার ছাতা মাথায় রাখাল বালক গরু লইয়া গৃহে ফিরিতেছে,—তাহাদের গরু তাড়ানোর শব্দ কাণে আসিতেছে। কোন রাখাল বালক গান ধরিয়াছিল—

কেউ কারও নয় দেখ না চেয়ে
কবে ফুটবে আঁখি।

তাহার মেঠোসুরের গানটী বড় মধুর হইয়া কাণে বাজিতেছিল। গায়ককে দেখিবার জন্য যতদূর দৃষ্টি চলে সীতা চাহিয়া দেখিল—দেখা গেল না।

গত বৎসর পূজার সময় জমীদার বাড়ীতে সখের থিয়েটার কর্ত্তৃক বিল্বমঙ্গল প্লে হইয়া গিয়াছিল। এক বৎসর অতীত হইয়া গেলেও গানগুলা এখনও এই পল্লীগ্রামে পুরাতন হয় নাই।

গানটা সীতাও জানিত; কিন্তু সে জানিয়া রাখা মাত্র। আজ এই রাখাল বালক কর্ত্তৃক মেঠোসুরে গেয় গানের একটী লাইন মাত্র যেমন ভাবে তাহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইল এমন আর কোন দিনই হয় নাই।

দোষ কাহারও নয়,—দোষ তাহার নিজের। সে স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরিতেছে—ইহার জন্য কাহাকেও দোষী করা যায় না। সে কেন এখানে আসিল, কেন মাসীমার কাছে গেল না? এখানে সে অজস্র আদর পাইতেছে, এত আদর যে তাহার অসহ্য। বুকের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা জাগে—কাহার জিনিস কে লইতেছে? সে কোথা হইতে আসিল, জ্যোতির্ম্ময়ের স্নেহময়ী, মা ও দাদুকে কাড়িয়া লইল? হয় তো তাহারই জন্য সে পর হইয়া গেল, তাহারই উপর রাগ করিয়া সে বহু দূরে সরিয়া গেল, যেখানে তাহার নাগাল পাওয়া যাইবে না।

অভিমানে সীতার চোখ দুইটী ছল ছল করিতে লাগিল,—কেন, সে তো বিবাহ করিতে চায় নাই, —সে নিশ্চয়ই ঠিক করিয়াছিল এমনই ভাবে জীবন কাটাইয়া দিবে। কেন, অনেক কুলীন-কন্যাই তো অবিবাহিত জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, কুলীন-কন্যার সে অধিকার সমাজে প্রশস্ত রহিয়াছে যে, উপযুক্ত পাত্রাভাবে তাহারা অবিবাহিতাও থাকিতে পারে। যতদিন সে না আসিয়াছিল ততদিন তো জ্যোতির্ম্ময় যায় নাই। আজ সে আসিয়াছে দেখিয়া—পাছে তাহাকে বিবাহ করিতে হয় সেই ভয়ে পলাইয়াছে।

মনে পড়িল, আজ তাহার বাল্যসঙ্গিনী রমা একখানা পত্র দিয়াছে। পত্রখানা তাড়াতাড়ি একবার দেখিয়া লইয়া বাক্সের মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছে, ভাল করিয়া সেখানা পড়াও হয় নাই।

জ্যোতির্ম্ময় যে সীতার নির্ব্বাচিত স্বামী তাহা রমা জানিত। ইহা লইয়া সে সীতাকে কত দিন কত বিদ্রূপ করিয়াছে। এখানে আসিয়াও সীতা তাহার বিদ্রূপ এড়াইতে পারে নাই। আষাঢ় মাসে বিবাহের কথা ছিল। বিবাহ যে হয় নাই, ইহা আত্মীয়-বন্ধু সকলেই শুনিয়াছিল। অনেকে জানিয়াছিল, বিবাহ অগ্রহায়ণ মাসে হইবে, রমাও তাহা জানিত।

জ্যোতির্ম্ময়ের সংবাদ সে তাহার দাদার নিকট পাইত—তাহার দাদা জ্যোতির্ম্ময়ের বন্ধু ছিলেন। জ্যোতির্ম্ময় যে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে এবং দেবযানীকে বিবাহ করিয়া বিলাতে যাইবে, এই সংবাদে সে অতিরিক্ত রকম আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল এবং সীতাকে পত্র দিয়াছিল।

রমা লিখিয়াছে—

সত্যই আমি জ্যোতির্ম্ময় বাবুর পরিচয় পেয়ে ভারি আশ্চর্য্য হয়ে গেছি সীতা। অমন সুন্দর আকৃতির ভিতরে যে এতটা গরল থাকতে পারে, ওর মধ্যে যে শয়তান বাস করতে পারে, তা আমার জানা ছিল না। এখন দেখছি যারা সুশ্রী, তাদেরই মন বড় খারাপ। ওরা সব করতে পারে। আমরা সবাই জানি, জ্যোতিবাবু তাঁর বাগ্‌দত্তাকেই গ্রহণ করবেন, আমরা জানি—কি সৌন্দর্য্যে, কি শিক্ষায়, কোন অংশেই তুমি তাঁর অনুপযুক্তা নও। দুর্ভাগ্য তাঁর,—যে আজীবন কাল তাঁরই প্রতীক্ষায় বসে আছে, তাকে অবহেলা করে—দু'দিনের পরিচিতা একটী মেয়েকে জীবনের সঙ্গিনীরূপে বরণ করে নিচ্ছেন। এর আভ্যন্তরিক পরিচয় তিনি পাননি, বাহ্যিক পরিচয় অতি সামান্য পেয়েছেন। এতে যিনি মুগ্ধ হয়ে যেতে পারেন—বোঝা যায়, কোন দিন তাঁর এ মুগ্ধ ভাব দূর হয়ে যাবেই। আর আজীবনকাল তাঁকে তাঁর এই ভুলের জন্যে কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এ রকম ভালবাসার পরিণাম এই রকমই হয়; হঠাৎ এত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে যে কূল ছাপিয়ে ছুটে যায়, আবার যখন শুকাবে তখন বিন্দুমাত্র থাকে না।

শুনলুম, তিনি না কি এই মেয়েটীকে এত ভালবেসেছেন যে, একে না পেলে তাঁর জীবন একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাবে। যে এতটুকু বেলা হ'তে স্বামীরূপে তাঁকে দেখছে, ভক্তি শ্রদ্ধা প্রেম যে হৃদয়ের মধ্যে জমিয়ে রেখেছে, তার সে অর্ঘ্য

তিনি ঠেলে ফেললেন কেমন করে? কি নির্ম্মম অন্তঃকরণ এই পুরুষদের! এরা নারীর সুখ-দুঃখের পানে চায় না। নিজেদের সুখ-দুঃখ-বোধ তাদের এতই বেশী যে, তাই নিয়ে অধীর হয়ে থাকে। নারী যে ভালবেসে সব ছাড়তে পারে, এমন দৃষ্টান্ত আমাদের এ দেশে অনেক পাওয়া যায়। হিন্দুর ঘরের ব্রহ্মচারিণী বিধবারাই তা দেখাচ্ছেন। এই যরা ভারতের বুকে এই ত্যাগশীলা মায়েরা রয়েছেন বলেই ভারতের বুকে আজও একটু স্পন্দন অনুভূত হয়। ভারতের মেয়ে যে দিন ভালবেসে আত্মসুখ ত্যাগ করতে ভুলে যাবে, সে দিন ভারত একেবারেই মরে যাবে। এই দেশের পুরুষদের কেউ কেউ নারীকে বড় কম নির্য্যাতন করে না; কিন্তু নারী যেমন ভাবে সব সয়ে যায়, অন্ত দেশের মেয়েরা কখনই সে রকম ভাবে সয়ে যায় না এই হচ্ছে অন্য দেশের মেয়েদের সঙ্গে এ দেশের মেয়েদের যা পার্থক্য। এর কারণ ভারতীয় নারীর একনিষ্ঠ প্রেম, যাকে সতীত্ব বলা যায়। এ কথা বলতে পারব না যে অন্য দেশের কোন মেয়ের এই একনিষ্ঠ প্রেম নেই। কিন্তু সে রকম মেয়ে খুবই কম দেখা যায়। পাশ্চাত্য দেশের মেয়েদের অধিকাংশ স্বামী মারা গেলে বিয়ে করতে পারে। অনেকে ক্রমান্বয়ে পাঁচ সাতটাও বিয়ে করে থাকে; অথচ সকলকেই এমন ভাব দেখায় যেন অত্যন্ত ভালবাসে। একে কি প্রেম বলা যায়? ভালবাসা দুই রকমের আছে; এক স্বর্গীয়, এর ধ্বংস নেই,—এ চিরকাল অটুট থাকে, ভালবাসার পাত্রের অভাবজনিত কোন ক্লেশ এতে অনুভব করা যায় না,—একেই প্রেম বলে। আর এক রকম আছে, অন্যজ ধরণের, যাকে আমরা কামজ ভালবাসা বলি, যার জন্যে অনেক গৃহ শ্মশানে পরিণত হয়ে যায়। এই সব মেয়ে বাল্য হতে শিক্ষা পায় না—স্বামীকে দেবতা বলে শ্রদ্ধা ভক্তি করতে হয়। সেই জন্যে তারা স্বামীকে সাথী বলেই ভেবে নেয়; আর সেটা সাময়িক ও সাংসারিক বলেই ভাবে। ওরা অনেকে পরজন্ম বা আত্মার অস্তিত্ব মানতে চায় না, এই জীবনটাকে যথেষ্ট ও শেষ বলে মনে করে—তারই ফলে তাদের এই অবনতি। এ দেশের মেয়ে ছোটবেলায় জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা পায়—স্বামী দেবতা, স্বামী পরম গুরু। বড় হয়েও এ শিক্ষা তাদের যায় না, মজ্জাগত হয়ে দাঁড়ায়। এ দেশ সতীর,—সতীত্ব এ দেশের মজ্জাগত জিনিষ। এরা মরলেও একনিষ্ঠ প্রেমের সাধনা ত্যাগ করতে পারে না।

জ্যোতিবাবু তো সোজা পথ চিনে নিলেন। এখন তুমি কি করবে আমি তাই জিজ্ঞাসা করছি।

সীতা আর পড়িল না, পত্রখানা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া উদাস দৃষ্টিতে কোন দিক পানে চাহিয়া রহিল। অল্পে অল্পে তাহার চক্ষু দুইটী অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল,—ক্রমে চোখ ছাপাইয়া বর্ষার ধারার মতই ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

সে যে জ্যোতির্ম্ময়ের উপযুক্ত নহে, তাহা তো বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই সে জানে। জ্যোতির্ম্ময়ের উচ্চাকাজ্ক্ষা স্পষ্ট না জানিতে পারিলেও যে একটা আভাস পাইয়াছিল, তাহাতেই পিছনে সরিয়া গিয়াছিল; আর এক তিল অগ্রসর হইবার সাহস তাহার হয় নাই। সে নিজে তো বিবাহ করিতে চায় নাই। জ্যোতির্ম্ময় যখন অন্ধকার পূর্ণ মুখে বাড়ী হইতে চলিয়া গেল, তখন কতবার সে ভাবিয়াছিল, তাহাকে বলিবে—কেন সে ছুটী থাকিতেও চলিয়া যাইতেছে? তাহার জন্যই যে জ্যোতির্ম্ময় পলাইতেছে, তাহা সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিল। সে তখন বলিতে চাহিয়াছিল, জ্যোতির্ম্ময় এখানেই থাক,—সে না হয় মাসীমার কাছে চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু হায় রে, কথা মুখে আসিয়া মিলাইয়া গিয়াছিল,—কম্পিত চরণ দুইটী কিছুতেই দেহখানাকে জ্যোতির্ম্ময়ের সম্মুখে বহিয়া লইয়া আসিতে পারে নাই।

সে দেবযানীকে বিবাহ করিবে তা করুক না কেন, কিন্তু কেন সে কথা মনে করিতে অব্যক্ত যন্ত্রণায় বুকটা ফাটিয়া যায়? সে তাহার পূজার অর্ঘ্য সাজাইয়া দেবতার আসার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল,—শূন্য মন্দির পড়িয়া রহিল, দেবতা তো আসিল না, সে অর্ঘ্য লইল না। তাহার প্রেম-অর্ঘ্য পদাঘাতে ফেলিয়া দিয়া সে অন্য একটী নারীকে বরণ করিয়া লইতে চলিয়াছে। সেই নারীই তাহার জীবনের সঙ্গিনী হইবে। আর সে—অনাদৃতা, অপমানিতা নারী দূরে দাঁড়াইয়া তাহাদের পানে তাকাইয়া আজীবন ব্যর্থ বেদনা বুকে চাপিয়া নীরবে চোখের জল মুছিয়া যাইবে। ভগবান্—!

ভগবানকে ডাকিয়াই সে চমকাইয়া উঠিল,—না না, সে করিতেছে কি, ভগবানকে ডাকিয়া জ্যোতির্ম্ময়ের অমঙ্গল কামনা করিতেছে যে। সে সুখী হোক ভগবান, বিবাহিত জীবন তাহার সুখময়

হোক। দাদুর আদেশে সীতাকে জীবন-সঙ্গিনী করিলে সত্যই তাহার জীবন শ্মশান হইয়া যাইত, তাহার মুখের হাসিও মিলাইয়া যাইত। সে দাদুকে যেরূপ ভয় করিত, তাহাতে সীতা বা মা কেহই ভাবিতে পারে নাই, মরিয়া হইয়া সে সেই দেবযানীকেই বিবাহ করিয়া ফেলিতে পারিবে। সীতা ভালবাসিয়াছে, তাহার একনিষ্ঠ প্রেম অর্ঘ্যরূপে দেবতার পায়ের তলায় নিঃশব্দে জড় হোক, দেবতা যেন জানিতে না পারে। সে তাহার জীবন-ভোর এমনই নীরবে সমস্ত জীবন ঢালিয়া পূজা করিয়া যাইবে,—তাহার সাধ, আনন্দ, হাসি সবই সে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিবে। জ্যোতির্ম্ময় তাহাকে বিবাহ না করুক, তাহাকে ঘৃণা করুক, তাহাতে কি আসিয়া যায়? শ্রীধর, হৃদয়ে বল দিয়ো, যেন সকল আঘাত সে নীরবে সহ্য করিতে পারে,—ব্যর্থতা যেন তাহাকে ছাপাইয়া না উঠিতে পারে। সীতা যেন বিচলিত না হয়, সীতা যেন ভাঙ্গিয়া না পড়ে, সীতা যেন অটুট হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে।

চকিতে মনে পড়িয়া গেল দাদুর কথা। সীতা তাহার সমস্ত অন্তরখানি দিয়া দাদুর বেদনা অনুভব করিল।

এই বৃদ্ধ,—কি না ছিল ইঁহার! একে একে সব হারাইয়াছেন, তবু ভাঙ্গিয়া পড়েন নাই তো। বিক্ষিপ্ত মনটাকে কুড়াইয়া আনিয়া তিনি শ্রীধরের উপর ঢালিয়া দিয়াছেন, সব হারানোর ব্যথা দাগ দিয়াও দিতে পারিতেছে না,—স্থায়ীভাবে আসন লইতে পারিতেছে না। কি আশ্চর্য্য শক্তি এই বৃদ্ধের। অমনি শক্তি চাই প্রভু,—যেন-কোন দুঃখ স্থায়ীভাবে হৃদয়ে স্থান না পায়।

সন্ধ্যার অন্ধকার মলিন ধরার বুকে আকাশের গা বাহিয়া ঝরিয়া পড়িল। আকাশের মেঘে জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। নদীর পশ্চিমে স্তরে স্তরে যে কালো মেঘটা জমিয়াছিল ইহারই মধ্যে সেই স্তরগুলি সারা আকাশময় ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। বিদ্যুৎ আকাশের এক কোণ হইতে উঠিয়া আর এক কোণ পর্য্যন্ত ছুটিয়া যাইতেছিল। মাঝে মাঝে গুম গুম করিয়া মেঘ ডাকিতেছিল।

সীতা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ফিরিল।

১২

সন্ধ্যার সময়টায় ঈশানী অন্য দিন আহ্নিকে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া যান, আজও আহ্নিক করিতে বসিয়াছিলেন বটে, সে বসাই সার—কেন না আহ্নিকের মন্ত্র তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

সীতা নিকটে আসিয়া বসিল; তাহার বিবর্ণ মুখখানার পানে তাকাইয়া ঈশানী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় গিয়েছিলে মা?"

তিনি তাহার মুখের পানে তাকাইয়া আছেন দেখিয়া সীতা তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইল, বলিল, "আজকের আকাশটা ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল মা, তাই দেখছিলুম।"

ঈশানী বাহিরের পানে তাকাইয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "তাই বটে! তুমি মা আশ্চর্য্য হয়ে আকাশের শোভা দেখছিলে,—আমিও দেখছিলুম, কেবল ভিন্ন ভাবে—এই যা প্রভেদ। আমি দেখছিলুম, মেঘগুলো চারদিক হতে উঠে আকাশের গায়ে জমাট বেঁধে দাঁড়ায়, আকাশে যখন তাদের আর স্থান হয় না, তখন ঝর ঝর করে ঝরে পড়ে আকাশের বুক পাতলা করে দেয়। আমার মনের মেঘ শুধু জমাট বেঁধেছে, ঝরতে পারছে না, তাই পাতলা হতেও পারছে না। আকাশের মেঘ পরিষ্কার হবে, আবার সূর্য্য উঠবে; কিন্তু এ সংসারের মাথায় অদৃশ্যাকারে যে কালো-মেঘ এসে জমছে, এ মেঘ আর কখনও পরিষ্কার হবে না, সূর্য্যও আর উঠবে না।"

আনমনাভাবে তিনি খানিকক্ষণ বাহিরের পানে তাকাইয়া রহিলেন; অন্তরের আবেগ গলা পর্য্যন্ত ঠেলিয়া আসিয়াছিল, তাহা দমন করিতে খানিকটা সময় লাগিল।

একটু পরে শান্তভাবে হাসিবার চেষ্টা করিয়া উদাস ভাবে তিনি বলিলেন, "যাক্ গিয়ে, তার কথা মুখে আর না আনাই ভাল। একটু মনে করতে গেলে আগাগোড়া সব কথাই মনে পড়ে, অমনি মুখেও সেই সব কথা ছাড়া আর কোন কথা আসে না। যত যা এড়াতে চাই তত তাই এসে পড়ে, আর সব ভাবনা পড়ে থাকে আশ্চর্য্য মানুষের স্বভাব।"

হায় রে মায়ের মন; তুমি মনে করিবে না তো কে মনে করিবে মা? যে সন্তানকে দশ মাস গর্ভে ধারিয়াছ, আপনার সুখ-দুঃখ ভুলিয়া গিয়া যাহার সুখ-দুঃখে সুখ-দুঃখ অনুভব কর, সে যে তোমার সকল ভাবনার উপরে। কোথায় কিছু হইতেছে, কে কি করিতেছে, এ কথা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে সেই সন্তানের কথাই মনে জাগিয়া উঠে। তোমার চিত্ত যে তাহারই জন্য সর্ব্বদা

ব্যগ্র। সেই সন্তানের কথা—"ভাবিব না" বলিলেই কি সব ফুরায় জননী?

সীতা ব্যথিতনেত্রে মায়ের পানে চাহিয়া রহিল,—অনেকগুলি কথা বলিবার মত ছিল, একটাও বলা হইল না।

ঈশানী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ বুঝি মায়ের সেলাই হয় নি? বাবা জিজ্ঞাসা করছিলেন, রুমাল কয়খানা শেষ হয়েছে কি না।

কুণ্ঠিতা হইয়া সীতা বলিল, "এই যে মা, এখনই শেষ করে দেব। একখানার এক দিক বাকি আছে, আর সবগুলো হয়ে গেছে। আজই রাত্রে দাদুকে সবগুলো দিয়ে দেব এখন।"

ঈশানী বলিলেন, "হ্যাঁ, আজকেই দিয়ে ফেলো, আর—"

বাধা দিয়া সীতা বলিল, "দাদু তো আমায় আর কাছে রাখতে রাজি হন না মা। ওবেলা যখন খেতে বসেছিলেন, তখন জিজ্ঞাসা করলুম—কেন তিনি আমায় আর তেমন করে কাছে ডাকেন না; গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে গেলে বলেন—দরকার নেই। তিনি একটু হেসে বললেন, "ওরে পাগলী, যাদের বড় আপনার ভেবেছিলুম, নিজের বলে বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছিলুম, তারা সবাই একে একে চলে গেল, তোর ওপরে আর কি আমি ভরসা রাখতে পারি? কে জানে কবে আবার তুইও সকল বাঁধন কেটে উড়ে কোথায় চলে যাবি। তখন যে বড় সাংঘাতিক অবস্থা হবে। তার চেয়ে আগে হতেই ব্যবস্থা করে রাখি।' তাঁর কথা শুনে আর সেই হাসি দেখে আমি আর তাঁর কাছে থাকতে পারিনি, আর কাছেও যাইনি মা।"

ঈশানী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন; বৃদ্ধের মনের অবস্থা তিনি যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলেন। জীবনের শেষ সময়ে মানুষ বিশ্রাম চায়, পুত্র পৌত্রে পরিবৃত হইয়া শান্তিতে বাকি দিন কয়টা কাটাইয়া দেয়, সেই সময়ে এই বৃদ্ধ সব হারাইয়া হাহাকার করিতেছেন। আজ ভগবানের নাম করিতে মুখে ভাসিয়া আসে পুত্রদের নাম, ভগবানের চরণ ধ্যান করিতে মনে জাগিয়া উঠে পুত্রদের মুখ। যাহারা প্রথম জীবনে সব পাইয়া শেষ জীবনে সব হারায় বাস্তবিকই তাহারা বড় অভাগা।

বেদনাপূর্ণ কণ্ঠে সীতা বলিল, "আর যে কয়টা দিন দাদু বাঁচতেন মা, এ আঘাত পেয়ে আর বাঁচবেন না। কত আঘাত মানুষ সইতে পারে? একটা দৃঢ়-মূল গাছও ক্রমাগতে আঘাতে মাটীতে পড়ে যায়,—মানুষ এত আঘাত পেলে কি বাঁচতে পারে? মূলে অবিরত আঘাত পড়ে জীবনী-শক্তি শিথিল করে দিচ্ছে; কোন সময় উপড়িয়ে পড়বে ঠিক নেই।"

ঈশানী উত্তর দিতে গিয়া পারিলেন না, দন্তে অধর চাপিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন।

সীতা বলিতে লাগিল, "আপনিই বা কম কি করছেন মা? এই যে খান না, আমাদের লুকিয়ে এখানে সেখানে দাঁড়িয়ে চোখের জল মোছেন—"

ঈশানী রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "এটা মা তোমার একেবারে গড়ানো কথা। আমি কি অনাহারে থাকি, না সত্যই কাঁদি?"

সীতা মুখখানা অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া বলিল, "সে কথা আমি শুনব না মা, নিজের চোখে যা দেখছি, তা মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতে পারব না। খাওয়ার সময় অনেক দিন আপনাকে অর্দ্ধেক খেয়ে উঠতে দেখেছি, নিত্য আপনার—সর্দ্দি, শরীর খারাপ লেগেই রয়েছে। আমি সামনে থাকলে আপনি চোখের জল ফেলতে পারেন না, কিন্তু অনেক দিন রাত্রে এক ঘুমের পর হঠাৎ জেগে উঠে আপনার দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনেছি মা। আপনাকে ডেকে ডেকে তার পর আপনি যে উত্তর দিয়েছেন, গলার সুরেই জানতে পেরেছি—আপনি কেন অত ডাকের পর তবে উত্তর দিয়েছেন।"

ঈশানী হাসিবার চেষ্টা করিলেন, হাসি ফুটিল না, মুখখানা বিকৃত হইয়া উঠিল মাত্র। তিনি বলিলেন, "এই কথা? কিন্তু তুমি বুঝতে ভুল করেছ মা, ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরতে মানুষ নানা রকম শব্দ করে থাকে, ঘুমের ঘোরে যে উত্তর দেওয়া যায়, তা তেমন স্পষ্ট হয়ে ফোটে না—যেমন জ্যান্ত অবস্থায় পাওয়া যায়।"

সীতা বলিল, "আচ্ছা যাক মা,—আপনি যে এমনি ভাবেই কথাগুলো কাটাবার চেষ্টা করবেন তা আমি জানি। বলবেন—ঘুমের ঘোরে নিঃশ্বাস ফেলেন, অসুখ করে বলে খেতে পারেন না, রাত্রে মোটে ক্ষুধা থাকেনা—"

ঈশানী বলিলেন, "পাগলী, তোমার তাই মনে হয় মা? একদিন না হয় খেলুম না, এতদিন না খেয়ে মানুষ থাকতে পারে?"

সীতা বলিল, "আর কেউ পারে না মা, কিন্তু আপনি পারেন। লোককে বুঝাতে একটু দেরী হয় না মা,—খাওয়া ঘুম সবই বুঝানো যায়,

বুঝান যায় না শুধু চেহারাখানা দেখিয়ে। আপনার যে চেহারা হয়েছে সেটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, অন্যে তো দেখতে পাচ্ছে।"

ঈশানী অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন, "চেহারা চিতায় যাক মা, বিধবার আবার চেহারার কি দরকার? তাদের বেঁচে থাকাই ঝকমারী যে।"

সীতা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

১৩

একা ছাদের উপর বিহারীলাল শুইয়া পড়িয়া ছিলেন। রাত্রি হইয়া গিয়াছে। শুক্লা একাদশীর চাঁদখানা নীল আকাশের গায়ে দুলিতে দুলিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছে। শুভ্র আলোকে দশদিশি ভরিয়া গিয়াছে। বহু দূরে কোথায় কে জানে—একটা নাম না জানা পাখী অবিশ্রান্ত টিহু—টিহু বলিয়া চীৎকার করিতেছিল।

বিহারীলাল শুইয়া পড়িয়া উজ্জল আকাশের পানে চাহিয়া ছিলেন।

মনে পড়ে—যৌবনে কবে এমনি চাঁদের আলো এই ছাদে থাকিয়া উপভোগ করিয়াছিলেন। সেদিন ছিল সম্মুখে কত আশা, অন্তরে ছিল কত উৎসাহ, আজ কিছু নাই।

হঠাৎ যেন তাঁহার সকল কাজের অবসান হইয়া গিয়াছে। উৎসাহ, আশা, আনন্দ সব চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার সত্তর বৎসর বয়স হইলেও এতদিন শ্রান্তি তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে নাই, আজ এক দিক একটু শিথিল পাইয়া সে আসিয়া পড়িয়াছে, আর তাহাকে ঠেকাইবার যো নাই। জীবন-প্রবাহে একবার অবগাহন করিয়া তিনি যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, দ্বিতীয়বার অবগাহনের সঙ্গে সঙ্গে সত্তর বৎসরের জরা বার্দ্ধক্য তাঁহাকে নিবিড় ভাবে জড়াইয়া ধরিয়াছে।

এই সেই বিহারীলাল, যাঁহার কর্ম্মে এতটুকু শৈথিল্য ছিল না, তিনি এখন হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়াছেন। জীবন-তরণী যেদিকে হয় চলুক, না হয় ডুবিয়া যাক। দেওয়ান-গোমস্তার হাতে সকল ভার তুলিয়া দিয়াছেন, বিষয়-সম্পত্তির উপর কেমন একটা বিতৃষ্ণা আসিয়া গিয়াছে।

সত্যই তো, আর কাহার জন্য সঞ্চয়? তাঁহার আয়ু নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে, আর যে কয়টা দিন বাঁচিবেন, এইরূপেই কাটিয়া যাইবে। তাহার পর এই জমিদারী যাক বা থাক তাহাতে তাঁহার কি? নিদারুণ অভিমানে বৃদ্ধের হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছিল,—কেহ রহিল না, সকলেই তাঁহাকে ফেলিয়া একে একে সরিয়া পড়িল? তিনি আজীবনকাল কঠোর পরিশ্রম করিয়া ক্ষুদ্র কয়েক শত বিঘা জমী এত বড় করিয়া তুলিলেন কিরূপে, মহালের পর মহাল কিনিয়া গেলেন কেন? এ কি তাঁহার নিজেরই বাসনা তৃপ্তির জন্য, কাহারও ভোগ করিবার জন্য নয় কি?

শান্ত আকাশের পানে চাহিয়া বিহারীলাল ভাবিতেছিলেন, তাঁহার না ছিল কি। একদিন সবই তো ছিল, আজ কেহ নাই। হায় রে, কেহ নাই এ কথাটা ভাবিতেও যে বুক ফাটিয়া যায়, কেন না এখনও তাঁহার বংশধর পৌত্র-পৌত্রী বর্ত্তমান; তথাপি তিনি হাহাকার করিতেছেন,—কেহ নাই,—আমার কেহ নাই।

"বাবা—"

বৃদ্ধ চকিতে কাপড়ের এক প্রান্ত দিয়া চোখের কোণে জমিয়া উঠা জল মুছিয়া ফেলিয়া শুষ্ককণ্ঠে উত্তর দিলেন, "কেন মা?"

ঈশানী দুধের বাটী তাঁহার নিকট নামাইয়া শান্তস্বরে বলিলেন, "দুধটুকু খেয়ে নিন বাবা।"

বিহারীলাল তেমনই শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন, "আমি তো আগেই বলে দিয়েছি মা, আমি কিছু খাব না।"

ঈশানী রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "তা কি হয় বাবা? একাদশী আপনি বরাবরই করেন তা জানি, কিন্তু দুধ ফল তো খান; কোনবার এমন নির্জ্জলা একাদশী করেন নি তো।"

কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল, প্রাণপণে সংযত করিয়া বিহারীলাল বলিলেন, "করেছি বই কি মা, অনেকবার নির্জ্জলা একাদশী করেছি। প্রতাপ আমায় জল খেতে বাধ্য করেছিল। সে অনেক কালের কথা মা, একাদশীর দিনে আমার অসুখ হয়েছিল, প্রতাপ আমায় তার দিব্য দিয়ে জল খাইয়েছিল। সে আগে জানত না, আমি একেবারে কিছু খাই নে, সেই দিনে প্রথম সে জেনেছিল। সে তার কি অনুনয় বিনয় আমার পায়ের ওপরে মাথা রেখে নিঃশব্দে সে চোখের জল ফেলেছিল। তোমার শাশুড়ীর মৃত্যুর পর আমি যে ব্রত নিয়েছিলুম, সন্তানের চোখের জলে আমার তা ভেসে গিয়েছিল। তার পর সে চলে গেলেও তুমি, জ্যোতি আমার সামনে যখন দুধ ফল এনে দিয়েছ, পুতুলের মত তা নিয়েছি, খেয়েছি। আর কেন মা কল্যাণী, আর কেন আমায় যত্ন করে খাওয়াতে এসেছ?

আমার ব্রত এখন পালন করতে দাও, আমায় পরিত্রাণ দাও।"

ঈশানীর দুইটী চোখ দিয়া নিঃশব্দে অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল। তিনি বিকৃতকণ্ঠে বলিলেন, "এখন তো ব্রতপালন করার সময় আপনার নেই বাবা, এই বুড়ো বয়সে নির্জলা উপবাস—"

বাধা দিয়া মলিন হাসিয়া বিহারীলাল বলিলেন, "কিছু হবে না মা। সারাদিনটা কেটে গেছে, সন্ধ্যেও গেছে, রাতটুকু বেশ কেটে যাবে। সীতা দুবার আমায় খাওয়াতে এসেছিল, ধমক দিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি; কিন্তু তোমায় তো তাড়াতে পারছিনে মা লক্ষ্মী। যার কল্যাণের জন্যে জল মুখে দিতুম, সে আজ কোথায়, কোন্ জায়গায় বিশ্রাম করছে, আর তার জন্যে আমায় তো ভাবতে হবে না মা। যে অনুরোধ করেছিল, নিজেদের শুভাশুভ দেখিয়েছিল, সে আজ শুভাশুভের অতীত যে। যাও, মা, দুধ নিয়ে যাও, রাতটুকু আমায় এমনিই থাকতে দাও।"

"বাবা—"

ঈশানীর কণ্ঠ একেবারে রুদ্ধ হইয়া গেল।

বিহারীলাল উত্তর দিলেন, "কেন মা?"

"তখন ঠাকুরপোর কল্যাণের জন্য নির্জলা উপবাস করেন নি এখন উপবাস করে আপনার নাতির অকল্যাণ করবেন? আপনার এই উপবাস দারুণ মনোকষ্টের জন্যে, সে কষ্ট যে দিয়েছে সে আপনারই নাতি। বাবা, এ যে তারই অকল্যাণ করা, তার আয়ু এতে যে অর্দ্ধেক ক্ষয়ে যাবে। সে ধর্ম্মত্যাগী হোক তা আপনি সহ্য করতে পারছেন—পারবেন, কারণ সে বেঁচে আছে; কিন্তু আপনি বেঁচে থাকতে সে চলে যাবে আপনি কি তাই ইচ্ছা করেন বাবা?"

পুত্রবধূ শ্বশুরের পদতলে আছড়াইয়া পড়িলেন, শান্ত স্বভাবা বধূ জীবনে কখনও শ্বশুরের সম্মুখে চোখের জল ফেলিতে পারেন নাই, জীবনে কখনও এমন ভাবে কথা কহিতে পারেন নাই। আজ পুত্রের অকল্যাণ ভয়ে মায়ের অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি যে মা, তিনি তো আর কিছু নহেন।

বিহারীলাল পা টানিয়া লইলেন; তাঁহার দৃষ্টি জগৎ ছাড়িয়া আকাশের পানে চকিতের মত গিয়া পড়িল। একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস তিনি কিছুতেই দমন করিতে পারিলেন না।

"ওঠ মা, আমি দুধ খাচ্ছি।"

ঈশানী চোখের জল মুছিতে মুছিতে উঠিলেন; দুধের বাটীটা শ্বশুরের হাতে দিতে তিনি এক নিঃশ্বাসে সবটুকু পান করিয়া ফেলিলেন।

পুত্রবধূর পানে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "হয়েছে তো মা, আর তো তোমায় কথা বলবার রইল না। কিন্তু বুঝতে বড় ভুল করেছ লক্ষ্মী, জ্যোতি তোমার একারই নয়,—সে যে এ বুড়োর কতখানি তা তুমি ধারণা করতে পার নি। সে যে আমায় কতখানি দাগা দিয়ে গেছে, তাতে বুকখানা কতখানি ব্যথায় ভরে গেছে, সে কথা তো মুখে আমি বলতে পারছিনে মা। ভাবি— ভগবান আমায় সব দিয়ে শেষকালটায় কেন এমন করে সব তাইতেই বঞ্চিত করলেন? এ পর্য্যন্ত প্রাণ ঢেলে যথাসাধ্য পরের উপকারই করে এসেছি, মন্দ তো কারও কখনও করিনি; তবে—" বলিতে বলিতে তিনি থামিয়া গেলেন। ঈশানী কোন দিকে চাহিয়া ছিলেন কে জানে, তাঁহার মধ্যে যে জীবন আছে তাহা বোধ হইতেছিল না।

"কিন্তু মা, এই বিষম পরীক্ষা। সময় সময় জ্ঞান হারালেও আবার যখন জ্ঞান ফিরে পাচ্ছি, তখন বেশ বুঝতে পারি, দয়াময় এবার তাঁর ভক্তকে শেষ পরীক্ষা করে দেখছেন—আমি তাঁকে ছাড়ি, না বংশের দুলাল বড় স্নেহের পৌত্রকে ছাড়ি। বড় কঠিন সময় মা,—একবার এদিক দুলছি, একবার ওদিক দুলছি।"

ঈশানী অস্পষ্ট সুরে কি বলিলেন বুঝা গেল না।

শান্তকণ্ঠে বিহারীলাল বলিলেন, "আমি আমার চিত্তকে কতকটা বশে এনেছি মা,—স্বার্থপরতায় অন্ধ হয়ে আমার বলতে যা কিছু রেখেছিলুম, সব শ্রীহরির পায়ে সঁপে দিয়েছি। আজ তার ধর্ম্মান্তর গ্রহণের দিন, এই রাত তার বিয়ের রাত মা—"

খানিকটা অন্যমনস্ক ভাবে তিনি অন্য দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর চক্ষু ফিরাইয়া পুত্রবধূর পানে দৃষ্টি রাখিয়া তিনি বলিলেন, "এইখান হতে আমি তাকে আশীর্ব্বাদ করছি, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি—তার জীবন সুখময় হোক। আমার সঙ্গে তার সকল সম্পর্ক উঠে গেছে, আমার পবিত্র ভিটেয় আর সে তার কলঙ্কিত চরণের দাগ ফেলতে আসতে পাবে না, আমার অতুল সম্পত্তি হতে একটি পয়সা সে পাবে না। ভগবান তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি দিন, সে নিজের জীবিকা নিজেই অর্জ্জন করবে। শুধু তোমার

জন্যেই আমার একটু ভয় হচ্ছে মা লক্ষ্মী; আমি ভাবছি—আমার অন্তে সে যখন আসতে চাইবে, তুমি স্নেহে অন্ধ—তখন কি তাকে ঠেকাতে পারবে? হয় তো যে ভিটেকে আমি পবিত্র তীর্থ বলে জানি, সেই ভিটেয় তাকে আসতে দেবে, তাকে—"

আর্ত্তকণ্ঠে ঈশানী বলিয়া উঠিলেন, "না বাবা, ধর্ম্মত্যাগী এ ভিটের কখনই পদার্পণ করতে পারবে না। ভগবান না করুন—যদিই আপনি আমার আগে চলে যান—আপনার মর্য্যাদা আমি রাখব। আমি একদিন তার মা ছিলুম, আর তার মা নই। আমার ছেলে যেদিন ধর্ম্মত্যাগ করেছে, আমার সঙ্গে সেই দিনই তার সকল সম্পর্ক উঠে গেছে।"

"পারবে মা—এ দৃঢ়তা, এ সাহস বরাবর এমনই স্থির রাখতে পারবে তো?"

মাথা নত করিয়া শ্বশুরের পায়ের উপর দৃষ্টি রাখিয়া দৃঢ়কণ্ঠে ঈশানী বলিলেন, "পারব বাবা, আপনার আশীর্ব্বাদে আমি সব পারব।"

পুত্রবধূর মাথায় হাত রাখিয়া বৃদ্ধ ধীর কণ্ঠে বলিলেন,—"হ্যাঁ, আমি আশীর্ব্বাদ করছি মা, আমার আশীর্ব্বাদ নিশ্চয়ই সফল হবে, তুমি সব পারবে। কতটুকু তখন ছিলে মা তুমি—যখন তোমায় আমি এনেছিলুম। তোমায় গড়ে তুলেছি আমিই—আমারই তেজ, গর্ব্ব আর নিষ্ঠা দিয়ে,—আমার কল্পনা তোমাতেই মূর্ত্তিমতী হয়ে ফুটেছে। তুমি মা হতে পার; কিন্তু মাতৃত্বের জন্যে যে আপনার সাহস, দৃঢ়তা, ধর্ম্মনিষ্ঠা হারানো—তা তুমি পারবে না। সার কথা মনে রেখো মা, জগতে কেউ কারও নয়। এই যে আমি আমার আমার করে মরি, কে আমার বল দেখি? কেউ আমার নয়; তাই কেউ রইল না, সবাই চলে গেল। মা, মনে রেখে দিয়ো—কেউ সাথী হয় নি, কেউ সাথী থাকবে না,—সঙ্গে যাবে শুধু ধর্ম্ম, পুণ্য ও পাপ আর কিছু নয়। স্নেহের জন্যে ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ো না, ধর্ম্মের পায়ে স্নেহ বিসর্জ্জন দিয়ো ও জেনো—তোমার সে দেওয়া সার্থক হল।"

ঈশানী নিঃশব্দে তাঁহার পায়ের ধূলা লইলেন।

অনেকক্ষণ উভয়েই নীরব। অনেকক্ষণ পরে ঈশানী মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "নীচে যাবেন না বাবা, রাত অনেক হয়ে গেল?"

বিহারীলাল বলিলেন, "যাব মা একটু বাদে; সীতা কোথায়?"

ঈশানী বলিলেন, "সেলাই নিয়ে হয় তো বসেছে।"

বিহারীলাল একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সেই দিন হতে সে আর বড় একটা আমার কাছে আসে না।"

ঈশানী বলিলেন, "আপনিই না কি তাকে আসতে বারণ করেছেন বাবা?"

বিহারীলাল অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর করিলেন, "হ্যাঁ, বারণ করেছি—কেন করেছি জান মা? বড় মুখ করে তাকে এনেছিলুম; তার মাসীমা যখন তাকে নিয়ে যেতে চাইলেন—তাঁকে জানালুম, সে আমার পৌত্রবধূ হবে, আমার সংসারের সম্রাজ্ঞী হবে। বড় গর্ব্ব করেই কথাটা বলেছিলুম মা! আমার কথা যে রইল না এই ভেবে আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি। সে আমার সামনে এলে আমার মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে,—মনে হয় কেন একে আনলুম,—তার মাসীমার কাছে পাঠিয়ে দিলেই ভাল হত। তার মাসীমা তাকে এতদিন সৎপাত্রে সমর্পণ করতেন, আমি না হয় সমস্ত ব্যয়টাই দিতুম। এখন এ মেয়ে নিয়ে আমি কি করব,—তার মাসীমা যখন আমায় জিজ্ঞাসা করবেন, তখন আমি কি জবাব দেব?"

ঈশানী চুপ করিয়া রহিলেন।

আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বিহারীলাল বলিলেন, "তার শিক্ষা তাকে এতটুকু মনুষ্যত্ব দান করলে না মা! সে বুঝলে না, আমি তার জন্যে যা নির্ব্বাচন করেছিলুম,—তা যথার্থ-ই কোহিনুর,—মাথায় রেখে গর্ব্ব করার জিনিস,—পায়ের তলায় ফেলে হেলা করে দলে যাওয়া যায় না। আমি বাইরের সৌন্দর্য্য দেখে ওদের মত মুগ্ধ হয়ে যাই নে, আমি দেখি ভিতরটা। আমি যাকে এনেছিলুম সে রাং নয়, সে সোণা। মূর্খ সে তাই—ঘরের পানে না তাকিয়ে বাইরে ছুটে চলে গেল।"

"মা—"

সীতার আহ্বান শুনিয়া ঈশানী উঠিলেন, "আপনি আর বেশীক্ষণ ছাদে পড়ে থাকবেন না বাবা, আমি নীচে চললুম। সীতাকে আপনার কাছে রেখে যাই, ওর হাত ধরে আসবেন।"

সীতার পানে তাকাইয়া তিনি বলিলেন, "তুমি বাবাকে নিয়ে এসো মা; খুব সাবধানে এনো—দেখো যেন না পড়ে যান। একে বুড়ো-মানুষ, তার পর সারাদিনের অনাহার।"

তাঁহার এই সতর্কতায় বৃদ্ধের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। বৈকালে তিনি নিজেই বহুকাল—আজ বোধ হয় পনের বোল বৎসর পরে যখন ছাদে

আসিবার কথা বলিয়াছিলেন, তখন ঈশানী অত্যন্ত সতর্কতার সহিত তাঁহাকে ধরিয়া ছাদে আনিয়াছিলেন। তিনি অতিরিক্ত বৃদ্ধ হইয়াছেন। বহুকাল পরে সিঁড়ি বাহিয়া ত্রিতলে উঠিতে পাছে অতিরিক্ত শ্রান্ত হইয়া পড়েন, কোথায় পা পড়িতে কোথায় পা পড়িয়া পাছে পড়িয়া যান, ঈশানী সেই ভয়ে ত্রস্তা হইয়া উঠিয়াছিলেন।

এই অতিবৃদ্ধির জন্য ঈশানীর মুহূর্ত্তমাত্র শান্তি ছিল না। মুখে তিনি প্রকাশ করিতে পারিতেন না—তাঁহার কার্য্যেই ব্যগ্রতা ফুটিয়া উঠিত। জ্ঞান হইয়া পিতা মাতা কি তিনি জানিতে পারেন নাই। শ্বশুর স্বয়ং যেদিন মা বলিয়া অষ্টম-বর্ষীয়া বালিকাকে বুকে তুলিয়া লইলেন, তাহার পর অফুরন্ত স্নেহাদর ঢালিয়া দিতে লাগিলেন, সেইদিন হইতে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার সমব্যথার ব্যথী এই বৃদ্ধ। আজ যে তিনি পুত্র হারাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বুকে কতখানি ব্যথা বাজিয়াছিল, তাহার চেয়েও বেশী ব্যথা যে এই বৃদ্ধের বুকে বাজিয়াছিল, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। নিজের কষ্ট ভুলিয়া তাই তিনি এই বৃদ্ধের বেদনা দূর করিবার চেষ্টা প্রাণপণে করিতেছিলেন। এ বৃদ্ধের জীবন-তরুর মূল যে শিথিল হইয়া গিয়াছে। যাওয়ার বেলা এতটা ব্যথা, এতটা কষ্ট লইয়াই যাইতে হইবে। এতটুকু সান্ত্বনা কি থাকিবে না, যাহা তাঁহাকে শেষ সময়টায় স্নিগ্ধতা দান করিতে পারে? ভগবান্! —ঈশানীর চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

সমস্ত দিন একাদশীর উপবাসে শ্রান্তদেহা ঈশানী নীচে চলিয়া গেলেন, তিনি আর বসিতে পারিতেছিলেন না।

১৪

সীতা ছাদের প্রাচীরের উপর ভর দিয়া দেখিতেছিল, চাঁদের আলো পৃথিবীর গায়ে পড়িয়া কি অপরিসীম সৌন্দর্য্য বিকাশ করিয়া দিয়াছে!

বিহারীলাল তাহার পানে তাকাইয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "সীতা, আমার ওপরে রাগ করে অতটা দূরে রইলি দিদি, আমার কাছে আসবি নে? জগতে একে একে সবাই আমায় যেমন করে ছেড়ে চলে গেল, তুইও তেমনি করে আমার এত কাছে থেকেও এড়িয়ে গেলি ভাই?"

বৃদ্ধের এই কথার মধ্যে এমন একটা সুর ছিল, যাহাতে সীতা আর দূরে থাকিতে পারিল না। তাঁহার পায়ের কাছে আসিয়া বসিয়া পড়িল। আপত্তি করিবার পূর্ব্বে তাঁহার পা দু'খানা নিজের কোলের উপর তুলিয়া লইয়া বলিল, "না দাদু, আমি তো নিজের ইচ্ছায় যাইনি। আপনিই তো সে দিন আমায় বলেছিলেন—আর আমার সামনে আসিস্ নে, তাই আমি আর যাই নে।"

"তুই এদিকে আয় দিদি; আমার মাথায় আগে কিছুক্ষণ হাত বুলিয়ে দে, তার পর পা টিপে দিস্।

তাহাকে মাথার কাছে বসাইয়া তাহার কোলে মাথা রাখিয়া তৃপ্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিহারীলাল বলিলেন,—"আঃ কি শান্তি ভাই! বড় সাধ ছিল—তোর কোলে এমনি করে মাথা রেখে বড় শান্তিতে শেষ ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ব, কিন্তু সে সাধ আমার পূর্ণ হল না। ভবিষ্যৎ আমার কাছ হতে তোকে টেনে নিয়ে গিয়ে কোথায় ফেলবে তা কে জানে,—শেষ-মুহূর্ত্তে এমন কেউ হয় তো থাকবে না, যার কোলে আমি মাথা রাখতে পারব।"

সীতা ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, "না দাদু, আমি চিরকাল আপনার কাছেই থাকব; আপনার শেষ সময়েও এমনি করে আপনার মাথা কোলে নিয়ে বসব—আপনার এ সাধ অপূর্ণ থাকবে না। আমি আপনাকে এ অবস্থায় ফেলে রেখে কোথায় যাব, কোথায় আর আমার আশ্রয় আছে?"

শ্রান্ত চোখের নিভন্ত-প্রায় দৃষ্টি জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল সীতার মুখের উপর ফেলিয়া বিহারীলাল বলিলেন, "আর কি তোকে এখানে রাখতে পারা যাবে ভাই? কোন্ সাহসে পরের মেয়ে তোকে এখানে রাখব? বড় মুখ করে তোকে এখানে এনেছিলুম, আমার এই বড় দুঃখ রইল, আমার মনের কোন সাধ মিটলনা। মানুষ আশা ছাড়ে না ভাই, মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মানুষ আশা করে সে মরবেনা, সে বাঁচবে। হায় রে মানুষ, হায় রে আশা—আশাই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে; নইলে মানুষ থাকতনা—সবাই মরে যেত। দেখিস নি দিদি, আমার এক একটা যায়, আর একটার আশায় ভুলে থাকতুম। সব গিয়েও আশা ছিল—জ্যোতি মানুষ হবে, তোর সঙ্গে তার বিয়ে দেব, কিন্তু কিছুই হলনা। সব আশা মানুষ যখন হারায়, তখন সে আর কি বেঁচে থাকতে চায় রে ভাই?"

রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে সীতা বলিল, "আমি কোথাও

যাবনা দাদু, আমার আশ্রয় এইখানে—আপনার কোলের মধ্যে ছাড়া আর কোথাও নেই।"

বিহারীলাল ধীরে ধীরে মাথা নাড়িলেন, "তাও কি হয়, পাগলি, তুই বললেও তারা শুনবে কেন? প্রথমেই তারা অনাত্মীয় আমার কাছে আসতে দেওয়ায় আপত্তি করেছিল,—জ্যোতির সঙ্গে বিয়ে দেব বলে এক রকম প্রায় জোর করেই তোকে এনেছিলুম। তারা নিশ্চয়ই শুনতে পাবে,—চাই কি সুশীলও আত্মীয় হিসাবে তাদের জানাবে—জ্যোতি অন্যকে বিয়ে করেছে। তখন তারা আমায় কি বলবে? আর এক মুহূর্ত কি তোকে এখানে রাখবে? সে যে তোর মাসীমা—তার যে জোর আছে, আমার কি সে জোর আছে দিদি,—তুই যে আমার বড় আপনার হয়েও লোকের বিচারে—পর।"

উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া সীতা বলিল, "হোক মাসীমা, আমি যাব না দাদু, আমায় আপনি জোর করে আপনার কাছে রেখে দেবেন।"

"জোর করে—"

বৃদ্ধের মুখে হাসি আসিল, "জোর কেমন করে করব ভাই? তোকে বিয়ে করতে হবে, সংসার পাততে হবে—"

হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া তাঁহার মাথা কোল হইতে নামাইয়া সীতা উঠিয়া গেল; একটা পার্শ্বের প্রাচীরের ধারে গিয়া দাঁড়াইয়া সে গোপনে চোখ মুছিতে লাগিল।

দূর হোক বিবাহ—বিবাহ মানুষের একবারই হইয়া থাকে, দু'বার হয় না। আত্মসমর্পণ করা যায় একবারই, দু'বার করা যায় না বলিয়াই সীতা জানে। সোজা বুদ্ধিতে দাদু ভাবিতেছেন, বিবাহ না হইলে তাহার মনুষ্য জন্মটাই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তিনি তো জানেন না, সীতার বিবাহ হইয়া গেছে। জগতে কেহ জানে না, জ্যোতির্ময়ও জানে না—সীতা অন্তরে তাহাকেই স্বামী বলিয়া জানিয়াছে,—তাহাকেই সেখানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এ দেহ সে আর কাহাকেও দান করিতে পারিবে না, অন্তরে সে আর কাহাকেও স্থান দিতে পারিবে না।

কিন্তু এ কথা সে মুখ ফুটিয়া বলিবে কি করিয়া! কুলীনের ঘরে কত মেয়ে সেকালে অবিবাহিতা থাকিত, এই সব মেয়েরা সংসারের, দশের, দেশের কত কায করিত। দাদুই তো গল্প করিয়াছেন—তাঁহার এক পিসী চিরকুমারী থাকিয়া বৃদ্ধ বয়সে মারা যান। সীতা কি এই পুণ্যবতী কুমারীর আদর্শে জীবন যাপন করিতে অনুমতি পাইবে না? লোকে কথায় কথায় সে কালের দৃষ্টান্ত দেয়—বিবাহ বিষয়ে কোন দৃষ্টান্ত দেয় না?

যখন সে দাদুর নিকটে ফিরিয়া আসিল, তখন তিনি উঠিয়া বসিয়া প্রাচীরে হেলান দিয়া সম্মুখের চাঁদের আলোয় স্নাত, বাতাসে দোদুল্যমান নারিকেল গাছের পাতাগুলির পানে চাহিয়া ছিলেন। সীতাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা গিয়েছিলি দিদি?"

তিনি লক্ষ্যও করেন নাই—সীতা অপর পার্শ্বে প্রাচীরের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল।

সীতা বলিল, "মনে হল মা যেন ডাকছেন, তাই ও-ধারে গিয়ে শুনছিলুম।"

একটু হাসিয়া বিহারীলাল বলিলেন, "দাদুর কাছে এই মিথ্যা কথাটা বলতে একটুও বাধল না সীতা?"

সীতার মুখখানা লাল হইয়া গেল, সে উত্তর দিতে পারিল না, নীরবে পদাঙ্গুলী দিয়া মেঝেয় দাগ দিতে লাগিল—চোখ তুলিয়া বৃদ্ধের পানে সে আর তাকাইতে পারিল না।

বিহারীলাল নীরবে কতক্ষণ তাঁহার পানে তাকাইয়া রহিলেন, গোপনে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "চল ভাই, নীচেয় যাওয়া যাক। বড় ঠাণ্ডা পড়ছে,—বুড়ো মানুষ, হিমে থেকে শেষ কালে বাতের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠতে হবে। আমার হাতখানা একটু ধর সীতা, হাঁটতে গেলে হাঁটুতে বড় ব্যথা করে।"

মাস ছয় সাত আগে তাঁহার হাঁটুতে ব্যথা ছিল না। বৃদ্ধ বয়সে বাত হয় কথাটা শোনা কথার মত শুনিয়া আসিয়াছিলেন। উপযুক্ত পরিশ্রমের ফলে শরীর অপটু হয় না; উৎসাহময় জীবনে শ্রান্তি না থাকায় দেহটাকেও জড় পদার্থে পরিণত হইতে হয় নাই; কাজেই বাত এতকাল অগ্রসর হইতে পারে নাই। ফাঁকের ঘর পাইয়া সে এই আশ্বিন মাসেই আসিয়া পড়িয়াছে; এখনও শীতকাল সম্মুখে পড়িয়া।

সীতা সন্তর্পণে তাঁহার হাত ধরিয়া উঠাইল। সিঁড়িতে আলো ছিল, তাহারই সাহায্যে সীতা সাবধানে বৃদ্ধকে নামাইতে লাগিল। নামিতে নামিতে বিহারীলাল বলিতেছিলেন, "বাস্তবিক সীতা, তোকে আর কাউকে দিলে আমার চলবে না—তোকে এখানে আমার কাছেই থাকতে হবে। দেখ, যদি ইচ্ছা হয়, তবে না হয় এই বুড়োকেই

বিয়ে করে ফেল। না হলে তোকে কাছে রাখবার জন্যে সেই রকম একটী পাত্রের জন্যে এই বুড়ো বয়সে আমায় দৌড়াদৌড়ি করতে হবে। এমন পাত্র চাই যে, ঘরে থাকবে—আর কোথাও তোকে পাঠাতে হবে না। তোকে তোর মাসীমার কাছে আর যে পাঠাব না সে জানা কথা; কেবল বিয়েটার জন্যেই যা ভাবনা। তা যদি ঘরে ঘরে হয়ে যায়, তা হলে বেঁচে যাই।"

সীতা জিজ্ঞাসা করিল, "বিয়ে না করলে কি হবে দাদু?"

তাহার মনের ভাব চতুর বৃদ্ধ সবই বুঝিতেছিলেন। তথাপি হঠাৎ বিস্মিত হইবার ভাণ করিয়া বলিলেন, "তা কি হয় পাগলি—বিয়ে করতেই হবে, এই সংসারের নিয়ম।"

সীতা অন্ধকার মুখে বলিল, "সংসারের—সমাজের নিয়মে বিয়ে না করলে জাত যায়, না দাদু? আচ্ছা, তাই যদি হয় দাদু, তা হলে আপনার পিসীমার যে বিয়ে হয় নি, তাতে আপনার জাত গিয়েছিল?"

"সে যে উপযুক্ত ঘর, উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যায় নি।"

সীতা বলিল, "এও না হয় তাই ধরুন দাদু, মনে করুন, উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না বলেই আমার বিয়ে হয় নি। আমি আপনার কাছে থেকে শুধু আপনার সেবা করব, শ্রীধরের পূজোর যোগাড় করে দেব, আর তো কিছুই চাইনে। আপনি আমায় বিদায় করবার জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন কেন, আমি আপনার কি করেছি বলুন তো?"

তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল, আবেগটাকে চাপিবার জন্যই সে দন্তে অধর চাপিয়া ধরিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

"কিছুই করিস নি ভাই,—কিছুই করিস নি। তুই না থাকলে আমি এ আঘাতটা কিছুতেই সামলে উঠতে পারতুম না রে, একেবারেই ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যেতুম। তোর বিয়ে করতে হবে না, মাসীর কাছেও যেতে হবে না, এই বুড়োর অন্ধকার ঘর আলো করে তুই এখানেই থাক।"

বৃদ্ধ একবার মুখ তুলিলেন; দৃষ্টিক্ষীণতা হেতু বুঝিতে পারিলেন না—তাহার মুখখানার উপর পুলকের ঢেউ বহিয়া যাইতেছে কি না।

১৫

বুদ্ধিমতী জয়ন্তী অনেক ভাবিয়া দেখিলেন, তিনি যদি এখনও রামনগরে না যান, ক্ষতি তাহাতে আর কাহারও হইবে না যতটা তাঁহার হইবে। ইভারও বয়স হইয়া গিয়াছে, সপ্তদশ বৎসরে সে পা দিয়াছে। আর কতকাল তাহাকে অবিবাহিতা রাখিতে পারিবেন? তাহা ছাড়া, ভ্রাতার সংসারে গলগ্রহরূপে পড়িয়া থাকাও যুক্তিযুক্ত নহে। সেদিন ভ্রাতৃবধূর সহিত রাধানাথ সেনের বাটী বেড়াইতে গিয়া তাঁহার মায়ের মুখে যে কথাটা শুনিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মর্ম্মে বিঁধিয়া আছে। রাধানাথ সেনের মাতা বহুদর্শিনী বৃদ্ধা। তিনি বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন, চিরকাল কি ভাইয়ের বাড়ী থাকা ভাল দেখায় মা? তোমার নিজের ঘর আছে, সংসার আছে, পরের সংসারকে আপনার বলে যতই টানতে যাও না কেন, তবু লোকেও বলবে,—নিজের মনও বলবে, এ পরের কাষ বই নয়। নিজের চালায় যদি পড়ে থেকে নুন-ভাত খাও সেও ভাল, সেও মানের মা, পরের অট্টালিকায় বাস করে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন উপচারে ভাত খাওয়া মানের নয়। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলেই সে পরের হয়ে গেল; কেন না, বাপ মা এ দেশে মেয়েকে দান করে থাকেন, তার ওপরে তাঁদের আর কোন অধিকার থাকে না। তোমার বাপের বাড়ীর ওপরে আর কোন জোরই নেই মা। এঁদেরও কথা নয় যে, তোমাদের ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করেন,—তবুও যেটুকু করছেন সে কেবল দয়া করে। সেখানে যেটা জোর করে নিতে পার, এখানে সেটা কতদূর কুণ্ঠিতভাবে চেয়ে নিতে হয় সেটা একবার ভেবে দেখ।

কথাগুলা যে যথার্থ তাহাতে কোন সন্দেহই ছিল না; সেইজন্যই তাহা জয়ন্তীর মনে দাগ দিতে সমর্থ হইয়াছিল। একদিন এমনি কথাই তিনি ঈশানীর মুখে শুনিতে পাইয়াছিলেন; কিন্তু সেদিন তিনি আঘাত পাইয়া আঘাতই দিয়াছিলেন, বিষ বর্ষণ করিয়াছিলেন, এই যথার্থ সত্য কথাকে তিনি কিছুতেই আমল দিতে চান নাই। এখন পরের মুখে সেই কথা শুনিয়া আঘাত পাইয়া তাঁহার অন্তরে সত্য-জ্ঞান ফুটিয়া উঠিয়াছিল,—তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, এই মামীর কথাই ঠিক, ইহাতে এতটুকু সংশয় নাই।

কিন্তু যাইবেন কিরূপে? বহুবর্ষ পরে নিজে

যাচিয়া সাধিয়া আবার সেখানে গিয়া দাঁড়াইবেন কোন্ লজ্জায়? ঈশানীর মুখে তীব্র বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া উঠিবে, তিনি ভাবিবেন,—হয় তো মুখ ফুটিয়া স্পষ্টই বলিবেন, এখন এলে কেন ছোটবউ? যখন আমি থাকতে বলেছিলুম, তখন থাকতে পারলে না,—এখন না ডাকতে চলে এলে—এর অর্থ কি?

কই, তাহারা তো একখানা পত্রেও যাইবার কথা কিছুই লেখে নাই। তিনি পত্র দেন, তাহার উত্তর আসে মাত্র দু'টি কথা, দেখার ইচ্ছা তাহাতে কিছুই লেখা থাকে না। এরূপ অবস্থায় নিজে সাধিয়া যাওয়া অত্যন্ত বিসদৃশ বলিয়া ঠেকে।

আচ্ছা, একখানি পত্র লিখিয়া তাহাদের মনের ভাবটা জানা যাক; তাহার পরে যাওয়ার ব্যবস্থা করিলে চলিবে।

তিনি তখনই পত্র লিখিতে বসিলেন।

সামান্ত দু'চার কথায় পত্রখানা শেষ হইয়া গেল। তিনি জানাইলেন, রামনগরে তাঁহার একবার যাইবার ইচ্ছা আছে,—যদি সময় পান তাহা হইলে দু' চারদিনের জন্য ইভাকে লইয়া ওখানে যাইবেন। ইহাতে কাহারও আপত্তি আছে কি না।

তিনি যে স্থায়িভাবে রামনগরে বাস করিতে যাইবেন, এ কথা কিছুতেই লিখিতে পারিলেন না। দুই চার দিনের জন্য যাইবেন,—যদি তাহাদের সেরূপ ইচ্ছা দেখিতে পান, তাহা হইলে সেখানে থাকিয়া যাইবেন; নচেৎ আবার এখানে চলিয়া আসিবেন—এই ভাল কথা।

অভিমানে তাঁহার হৃদয়খানা পূর্ণ হইয়া উঠিল, চোখেও খানিকটা জল আসিয়া পড়িল। অঞ্চলে চোখ মুছিয়া তিনি অন্যমনস্কভাবে কোন দিকে চাহিয়া রহিলেন। হায় রে, তিনি রাগ করিবেন, অভিমান করিবেন কাহার উপর? যাহার উপর রাগ অভিমান করিয়া থাকা চলিত, সে যে চলিয়া গিয়াছে।

নিজের দিকটা দেখিতে তিনি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। অধিকাংশ মানুষের স্বভাবই এই, তাহারা নিজেদের ভুল বা কোন ত্রুটী দেখিতে পায় না, অথচ পরের ভুল ত্রুটীগুলি তাহাদের চোখের সম্মুখে স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠে। জয়ন্তী নিজের দোষ কখনই দেখিতে পান নাই। তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা সবই ঠিক হইয়াছে, কোথাও এতটুকু ত্রুটী হয় নাই।

পত্রের উত্তর কয়েক দিন পরেই আসিল। ঈশানী নিজের হাতে উত্তর দিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন—তিনি পৃথিবীতে আসিয়া শুধু দিয়াই যাইতেছেন। এই নিঃস্ব ভাবে দানের পথে যদি এতটুকু কিছু কুড়াইয়া পান, তাহাই তাঁহাকে আমরণ কাল বড় শান্তি দিবে; বুকভরা দুঃখের মধ্যে সান্ত্বনা মিলিবে, শুধু সেই দু'দিনের পাওয়ার স্মৃতিটুকু। ছোটবউ দয়া করিয়া ইভাকে দু'দিনের জন্য রামনগরের মত পল্লীগ্রামে আনিবে বলিয়াছে, ইহাতে ঈশানী বড় আনন্দ পাইয়াছেন।

পত্রখানা পাইয়া জয়ন্তীর মুখখানা অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল; এ পত্রে তাঁহাকে এতটুকু শান্তি দিতে পারিল না। মনে হইতে লাগিল, এ পত্রখানা একটা খোঁচা বহন করিয়া আনিয়াছে। সেই খোঁচাটা তিনি বুকের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিলেন।

ইভা এই পত্রখানা পড়িয়া অত্যন্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; উৎসাহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল, "কবে রামনগরে যাবে মা? আমার এখনি সেখানে যেতে ইচ্ছে করছে; দাদুকে, জেঠিমাকে, সীতাদিকে দেখতে ভারি ইচ্ছা করছে।"

মা একটা ধমক দিয়া বলিলেন, "যা যা, অতটা আনন্দ করতে হবে না। ভারি তো দাদু, জেঠিমা, যারা নিজেরা একখানা পত্র দিয়ে উদ্দেশ নেয় না—"

বাধা দিয়া ইভা বলিল, "কেন, এই তো জেঠিমা লিখেছেন রামনগরে যাওয়ার কথা?"

জয়ন্তী রাগতভাবে বলিলেন, "হাঁ, অমনি লিখেছেন কি না, আমি পত্র দিয়েছিলুম, তারই এই উত্তর এসেছে। যেচে পত্র যাকে লেখা যায়, অন্ততঃ পক্ষে ভদ্রতার খাতিরেও তার একখানা উত্তর দিতে হয়। আপনার লোকের কি এই পত্র দেওয়া? যেতে চাইলুম,—পত্র দিয়েছেন, "আসতে পার।" "গরজে গয়লা ঢেলা বয়" বলে একটা যে কথা আছে না, এ ঠিক তাই বই আর কি। সর্ব্বস্ব নিয়ে নিজেরা ভোগ দখল করছেন, পাছে আমি গেলে ভাগ দিতে হয়—"

ইভা বলিয়া উঠিল, "ও কি মা, ও সব কি বলছ?"

আর্ত্তভাবে ইভা বলিল, "জেঠিমা কি ভোগ দখল করছেন মা? শুনেছ তো—দাদু দাদাকে ত্যাগ করেছেন, দাদা ব্রাহ্ম হয়েছেন সেই জন্যে। জেঠিমার আর আছে কে, দাদাকে তো আর নিতে পারবেন না। বিধবা মানুষ, একবেলা দু'টো

আতপ চালের ভাত খান, দু'বেলা দু'খানা কাপড় পরেন—তাও থান, এতে তিনি কি ভোগ করছেন মা ?"

কথাটা হঠাৎ মুখ দিয়া বাহির হইয়া যাওয়ায় জয়ন্তীও বড় কম অপ্রস্তুত হইয়া পড়েন নাই। তথাপি সেই অপ্রস্তুত ভাবটা চাপা দিবার জন্য মেয়েকে ধমক দিয়া বলিলেন, "তোর নিজের কায কর গিয়ে ইভু, আমায় বেশী বকাসনে বাপু, আমার মাথার ঠিক নেই। এর পর কি বলতে কি বলে ফেলব, বুড়ো মানুষের কিচ্ছু ঠিক থাকে না।"

হাসিয়া উঠিয়া ইভা বলিল, "বুড়ো হয়েছ মা ? চুল একটাও পাকল না, দাঁত একটাও পড়ল না, এর মধ্যে তুমি বুড়ো হয়ে গেলে ? যদি তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে মানুষ বুড়ো হয় মা তবে তো কথা'ই নেই।"

হাসি চাপিয়া গম্ভীরভাবে জয়ন্তী বলিলেন, "বুড়ো নই তো কি ? তোর মা আমি, এ কথা বলতেই হবে। বকাস নে ইভু—যা।"

ইভা বলিল, "আচ্ছা আমি যাচ্ছি, কিন্তু তুমি রামনগরে যাবে তো মা ?"

জয়ন্তী পত্রখানা নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিলেন "কি করে বলব—যাব কি না। যে রকম পত্রখানার ধরণ দেখছি—"

"না মা, তোমার পায়ে পড়ি—যেতেই হবে। এবার রামনগরে গিয়ে আর কিন্তু কলকাতায় আসতে পারবে না। সকলেই বলে—আমার দাদু অতবড় জমিদার, অমন নামজাদা বড়লোক, তাঁর অতবড় বাড়ী, অত লোকজন সব থাকতে আমরা কেন এখানে এমন করে পড়ে থাকি। তাদের কথা শুনে আমার বড় লজ্জা হয় মা। সে দিন আমার এক বন্ধু অরুণা বোস আমায় একখানা খবরের কাগজে দেখালে—দাদু দেশের জন্যে কত টাকা দিয়ে যাচ্ছেন, যে যা চাচ্ছে তাকে তাই দিচ্ছেন, গভর্ণমেণ্ট হতে তাঁকে 'রাজা' উপাধি দেওয়ার প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। দেখে গর্ব্বে আমার বুকটা ভরে উঠল। হ্যাঁ মা, যে দাদুর নাম সবাই করছে, আমি এমন দাদুর কাছ ছেড়ে কোথায় পড়ে আছি, বল তো ? পাড়া-গাঁ বলে যাকে তুমি চিরকাল হেলাই করে এসেছ, এই সহরের চেয়ে আমার যে সেই পাড়া-গাঁ বড় বলে মনে হয়। তুমি বলবে—সহরে থেকে আনন্দ পাওয়া যায়, আমি বলি—সহরে এতটুকু আনন্দ নেই, সহরে মুক্ত স্বাধীন-জীবন নেই, স্বাধীনতা আছে পল্লীগ্রামে, তাই সেখানে আনন্দও যথেষ্ট পাওয়া যায়। সত্য কথা যে সেখানে ইলেক্‌ট্রিক লাইট নেই, ফ্যান নেই, কলের জল, ট্রাম, বাস—এত গোলমাল কিছু নেই। কিন্তু মা সেখানে আছে পনের দিন অন্ধকারের পরে পনের দিন মুক্ত চাঁদের আলো যা সহরবাসীরা উপভোগ করতে পায় না; সেখানে আছে গাছের পাতায় বেধে ভেসে আসা শান্ত শীতল বাতাস, সেখানে আছে নদীর বুকের শীতল জল, সেখানে ট্রামের, বাসের, লোকের গোলমাল নেই, আছে পাখীর গান, বড় সুন্দর—বড় মধুর। সেখানে ঝোপে ঝোপে বনজ ফুল ফুটে ওঠে, মুক্ত বাধাশূন্য বাতাসে দুলে ওঠে, পাখীরা শ্যামল গাছের ডালে বসে গান গেয়ে ওঠে। কবে কোন্ কালে দেখেছি—আজ তা মনেও পড়ে না। গান মিলিয়ে গেলেও তার রেসটুকু মধুর হ'য়ে বুকে কেমন জেগে থাকে। আমার মনে সেই ছোটবেলায় দেখার স্মৃতি খুব ছোট হয়েও জেগে আছে। আজ মনে হয়—যেন সে সব স্বপ্ন দেখেছি। সেই জ্যেঠিমা, সেই দাদু, সেই রামনগর; গাছের ছায়ায় ভরা আঁকা-বাঁকা গ্রাম্য পথ। বাতাসে ঝির ঝির করে গাছের ঝরা পাতা পথের ওপরে পড়ছে, পথিকের গায়ে পড়ছে। আবার দেখতে ইচ্ছা হয় মা, আবার সেই গ্রামের বুকে ফিরে যাওয়ার বড় সাধ হয়।"

জয়ন্তী নীরবে কন্যার কথা শুনিতেছিলেন, তাঁহার মনেও বহুকালিকার অতীত কথা জাগিয়া উঠিতেছিল। সে আজ আঠার বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, যেদিন তিনি রামনগরে গিয়া চারিদিককার বন-জঙ্গল, ঝোপ দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। পিতা মাতা যে হাত পা ধরিয়া তাঁহাকে জলে ফেলিয়া দিয়াছেন—প্রকাশ্য ভাবে ইহা বলিয়া ললাটে করাঘাত করিয়া তিনি কাঁদিয়াছিলেন।

একটা কথা মনে করিতেই অনেক কথা মনে পড়িয়া যায়। নিজের এই একটা দোষ চোখে ভাসিয়া উঠিতে পর পর সব দোষগুলি বায়স্কোপের ছবির মত মনে জাগিয়া উঠিল।

অনুতাপে বিদ্ধা জয়ন্তী ইভার পানে আর তাকাইতে পারিলেন না, কথা কহিতে গিয়া তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল,—"তুই বড় বেশী কথা বলতে আরম্ভ করেছিস ইভা, আগে তো এত কথা বলতিস নে। পল্লীগ্রামের সৌন্দর্য্য তো বড়, তার আবার এত বর্ণনা। কোন্ সেই ছোট-বেলায় দেখেছিস, এখন তার কথা বলতে আর

জ্ঞান থাকছে না; এখন যদি একটীবার দেখিস, তা হলে কখনো এক দিনের জায়গায় দু'টি দিন আর সেখানে থাকতে চাইবি নে। ওই যে বললি—নদীর শান্ত কালো জল,—মরে যাই আর কি তোর উপমা নিয়ে। সে কি নোংরা; দাম তার সমস্ত অংশ ভরে ফেলে সামান্য জল এমন পাণ্ডটে আর দুর্গন্ধময় করে রেখেছে যে, তার দিকে চাইলে আর খাওয়ার প্রবৃত্তি হয় না। তার পর চাঁদের আলো, সে আর কতটুকু বল দেখি? একমাত্র অন্ধকারের রাজত্ব সেখানে—সেই নিবিড় জমাট-বাঁধা অন্ধকারের পানে চাইলে বুকের রক্ত শুকিয়ে ওঠে। আর শ্যামল পাতায় স্নিগ্ধ বাতাসের কথা বললি যে ইভু—অমন বাতাস পাওয়ার চেয়ে জমাট গরমে পচে মরতে হয় সেও ভাল। সে বাতাস শুধু ম্যালেরিয়ার বীজাণুতে ভরা। তাতে আমাদের মত লোকদের সেখানে গিয়ে দু'দিন থেকে দু' বছরের জন্যে অসুখ বরণ করে নেওয়া। পল্লীগ্রামের তো সবই ভাল তোর চোখে,—কিছু মন্দ নয়,—তবু আরও যদি থেকে বলতিস।"

ইভা বড় গোপনে একটা নিঃশ্বাস ফেলিল মাত্র, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তবে থাক মা, সে অসভ্য নোংরা দেশে গিয়ে আমাদের কায নেই। এ আমরা খুব সুখে আছি। এই ফ্যানের হাওয়া, ইলেক্‌ট্রিক লাইট, কলের জল,—আমরা কেমন সুখে আছি। সেখানে অশিক্ষিত অসভ্যদের মাঝে গিয়ে আমাদের শিক্ষার গর্ব্বে আঘাত পড়বে, চাই কি—সঙ্গদোষে হয় তো আমরাও মন্দ হয়ে পড়ব। দাদা ওই জন্যেই ব্রাহ্ম হয়ে গেছে, ব্রাহ্ম মেয়ে বিয়ে করেছে,—দেশে আর যেতে হবে না, ভালই হয়েছে। কাল দাদার বিলেত যাওয়ার দিন। যখন তুলে দিতে যাব তখন বলব—তুমি খুব ভাল কায করেছ, দেশের যারা সুশিক্ষিত ছেলে তারা সবাই যেন এমনি করে। শিক্ষিত যে হবে, সে ওই সব অসভ্য বর্ব্বরদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক লোপ করবে,—তা হোক না কেন দাদু অথবা বাগ্‌দত্তা স্ত্রী। আমিও যদি শিক্ষার অহঙ্কার করতে চাই, শিক্ষিতার গৌরব রাখতে চাই, তবে যেন পল্লীগ্রামে যাওয়ার কথা মুখেও আনি নে।"

দুপদাপ করিয়া সে ঘর কাঁপাইয়া চলিয়া গেল।

সে যে কতখানি অভিমানে পূর্ণ হইয়া কথাগুলো বলিয়া গেল, তাহা জয়ন্তী বেশ বুঝিলেন। তাঁহার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল, দন্তে অধর চাপিয়া তিনি দুর্বিনীতা কন্যার গমন-পথের পানে চাহিয়া রহিলেন।

ইভা যে কেমন করিয়া তাঁহার নিয়ম-পদ্ধতি এড়াইয়া গেল, ইহাই না বড় আশ্চর্য্য কথা। তিনি পরের ছেলে জ্যোতির্ম্ময়কে আপনার করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন, নিজের মেয়ে ইভাকে পারেন নাই। তিনি তাহাকে যে পথে চলিতে উপদেশ দিতেন, সে ঠিক তাহার বিরুদ্ধ পথে চলিত,—তাঁহার মতকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দিবার জন্যই যেন তাহার জন্ম হইয়াছে। মনে পড়ে স্বামীর কথা, তাঁহাকে তিনি কিছুতেই স্ব-মতে আনিতে পারেন নাই। জীবনের পথে স্বামী-স্ত্রীরূপে ক্ষণেকের তরে মিলিয়াও এই বিরুদ্ধ মতের জন্য উভয়ে উভয়ের নিকট হইতে বহু দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন, জীবনে আর কখনও মিলিত হইতে পারেন নাই। এই মেয়েটীর মধ্যে পিতার সেই তেজ, সেই দর্প, সবই জাগিয়াছিল, পিতার মতই সে মাতাকে দমনে রাখিতে চায়।

জ্যোতির্ম্ময় যখন দেবযানীকে বিবাহ করিবার কথা তুলিয়াছিল, সকলেই তাহার সমর্থন করিয়াছিল, ক'রে নাই কেবল ইভা। সে দৃপ্তা ব্যাঘ্রীর মত গর্জ্জিয়া উঠিয়াছিল, জয়ন্তী কিছুতেই তাহাকে শান্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছিল, বিবাহের পূর্ব্বে যদি সে সুরেশবাবুর পরিবারে জানায়—জ্যোতির্ম্ময়কে তাহার দাদু এই অপরাধে ত্যাগ করিবেন, যে সম্পত্তি মূলে রহিয়াছে তাহা হইতে একটা পাইও জ্যোতির্ম্ময় পাইবে না—তাহা হইলে হয় তো একটা গোল বাধিতে পারে। বিহারীলাল নিষ্ঠাবান হিন্দু, হিন্দুত্ব রক্ষা করিতে তিনি যে পৌত্রকে পরিত্যাগ করিবেন এ জানিত সত্য কথা।

আজ কয়দিন হইল জ্যোতির্ম্ময়ের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। নিমন্ত্রণ হইলেও জয়ন্তী ইভাকে যাইতে দেন নাই। কাল জ্যোতির্ম্ময় বিলাত রওনা হইবে, জয়ন্তীকে সে প্রণাম করিয়া গিয়াছে। ইভার সহিত দেখা হয় নাই—সে তখন বাড়ী ছিল না। জ্যোতির্ম্ময় বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়া গিয়াছে—যেন কাল ইভাকে পাঠাইয়া দেওয়া হয়, সে দেখা করিয়া যাইবে।

ইভা'কে বাল্যকাল হইতে সে কনিষ্ঠা ভগিনীর মতই স্নেহ করিত। ইভা অন্যায় দেখিলে বেশ দু'কথা শুনাইয়া দিতে ভয় পাইত না। ইহার

জন্ম জয়ন্তী গোপনে ইভাকে শাসন করিতে গেলে সে তাঁহাকে এমন গরম ভাবে কথা শুনাইয়া দিত যে, তাহার উত্তরটা ঠিক মত দেওয়া যাইত না; অথচ সেই কথাগুলা অন্তরে তীব্র জ্বালা উৎপাদন করিত। দুর্ব্বিনীতা এই মেয়েটাকে লইয়া জয়ন্তী সর্ব্বদা শশব্যস্ত হইয়া থাকিতেন,—কি জানি, সে কাহাকে কখন কি বলিয়া বসে তাহা ঠিক নাই।

১৬

বিহারীলাল বালিসে হেলান দিয়া বিছানার উপর বসিয়া ছিলেন, সীতা মেঝের একখানা মাদুরের উপর বসিয়া সেজের আলোকে রাজা ভরতের উপাখ্যান পড়িয়া তাঁহাকে শুনাইতেছিল। বাহিরে শান্ত সন্ধ্যা ধীরে ধীরে সমস্ত পৃথিবীর গায়ে অন্ধকারের মৃদু প্রলেপ দিতেছিল। উপরে অন্ধকার আকাশে তেমনি ধীরে ধীরে একটা দুইটা করিয়া নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিতেছিল। বর্ষার মেঘ আকাশ ছাড়িয়া বৎসরের মত চলিয়া গিয়াছে, শরৎ আসিয়াছে। নীচে বাগানে শেফালিকা গাছে অসংখ্য ফুল ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহার মধুর স্নিগ্ধ-গন্ধ বাতাস চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়াছে। পূজার আর বেশী দিন বিলম্ব নাই। আজ অমাবস্যার নিশি, কাল দেবীর বোধন বসিবার কথা। প্রতি বৎসর জমীদার বাড়ীতে প্রতিপদে বোধন হইয়া থাকে, এ বৎসরও যে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রতাপ বর্ত্তমান থাকিতে এ বাড়ীতে পূজার আনন্দ অফুরন্ত ছিল। এক পূজা শেষ হইতে না হইতে আবার আগামী বৎসরের পূজার জন্য জিনিস সঞ্চয় আরম্ভ হইত। পূজার প্রতিপদের দিন হইতে মহা ধুমধাম পড়িয়া যাইত, কথকতা বসিত, চারিদিক হইতে লোকজন আসিয়া গ্রামে জমিত, গ্রাম টলমল করিত। বিখ্যাত যাত্রার দল, কীর্ত্তনের দল আসিয়া জুটিত। ষষ্ঠীর দিন হইতে যাত্রা আরম্ভ হইত, কীর্ত্তন আরম্ভ হইত, লোকে আশা মিটাইয়া কীর্ত্তন, যাত্রা, কথকতা শুনিত। এই আনন্দোৎসবের কর্ত্তা ছিলেন প্রতাপ, অন্তঃপুরে ছিলেন ঈশানী। স্বামী হারাইয়াও তিনি কর্ত্তব্যচ্যুতা হন নাই, শক্তি হারান নাই। অন্তঃপুরের সব কায তাঁহার হাতে। প্রভাত হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত তাঁহার বিশ্রাম থাকিত না। বিহারীলাল সকল ছাড়িয়া দিয়া মহানন্দে শুধু সব দেখিয়া যাইতেন। লোকে প্রতাপের জয়গান করিত, মা লক্ষ্মী ঈশানীর নাম করিত, গুণ গাহিত,—শুনিতে শুনিতে বিহারীলালের দুইটী চোখ অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিত; পরলোকগতা পত্নীর কথা মনে পড়িত, পুত্রের কথা মনে পড়িত, তিনি গোপনে চোখ মুছিতেন।

তাহার পর প্রতাপ চলিয়া গেলেও জমীদার-বাড়ীর সে আনন্দোৎসব একেবারে লোপ পায় নাই, জ্যোতির্ম্ময় পিতৃব্যের এই কার্য্য-ভার নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিল। সে যদিও কোন ধর্ম্মে আস্থা স্থাপন করিতে পারে নাই, যদিও সে কিছুই মানিত না, তথাপি আনন্দের প্রধান অঙ্গ এই পূজার আয়োজন খুব উৎসাহের সহিত করিত। নিজে সে কোন দিনই প্রতিমার নিকট মাথা নত করিতে পারে নাই, তথাপি সে ইহার আকর্ষণও ছাড়াইতে পারিত না।

আবার সেই পূজা আসিয়াছে, কিন্তু কোথায় কে? কে আজ বাহিরের সব ঠিক করিবে? ভিতরের ভারই বা লইবে কে? বৃদ্ধের হাঁটু ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, চলিতে গেলে থর থর করিয়া পা কাঁপে। চোখের দৃষ্টি একেবারে ঝাপসা হইয়া গিয়াছে, পরিচয় না দিলে আর কাহাকেও চিনিতে পারেন না। তিনি যে সকল কার্য্যের বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন, আর কিছু করিবার সামর্থ্য তাঁহার নাই।

পুত্র-বিয়োগ-বিধুরা মায়ের আর কিছু করিবার ক্ষমতা নাই; সে উৎসাহ নাই। তিনি কি অন্য অন্য বারের মত ক্ষীণ দেহ লইয়া শারীরিক দুর্ব্বলতা উপেক্ষা করিয়াও জোর করিয়া রন্ধনার্থ বসিতে পারিবেন? তাঁহার দেহ এবার এত দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে যে, হাঁটিতে গেলে বুকের মধ্যে ধড়ফড় করে।

সীতা বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। সে গত বৎসর হইতে এখানে আছে। গতবারের পূজার বিপুল আয়োজন সে দেখিয়াছে। পূজা আসিতেছে—এই আনন্দেই সে পূর্ণ হইয়া থাকিত। সে নিজের চোখে গত বৎসরে যাহা দেখিয়াছে, এ বৎসরে তাহার কিছুই নাই। এ বৎসর আনন্দময়ী কি নিরানন্দ গৃহে আসিয়া নিরানন্দেই চলিয়া যাইবেন, আনন্দ কি বিতরণ করিবেন না?

আজ সে অনেকগুলা কথা বলিবে বলিয়াই বিহারীলালের নিকটে আসিয়াছিল। কিন্তু একটা কথাও তাহার বলা হইল না। বিহারীলাল তখন নীরবে অর্দ্ধশয়ানাবস্থায় স্বল্পান্ধকার আকাশের পানে চাহিয়াছিলেন, দেখিতেছিলেন—দিনের আলো

কেমন করিয়া ধীরে ধীরে নিবিয়া আসে, অন্ধকার কেমন করিয়া পা বাড়ায়। তাঁহার জীবন কি এক ভাবে এক স্থানে থাকিয়া যাইবে, অস্তগমনোন্মুখ হইয়াও কি এ অস্ত যাইবে না? হায় রে, যে মৃত্যুকে চাহে না, মৃত্যু তাহাকেই চায়, তাহাকেই শীতল বুকে টানিয়া লইয়া চিরশান্তিময় হাত তাহার গায়ে বুলায়। যে চায় তাহাকে কেন লয় না? এ কি আশ্চর্য্য বিধান মৃত্যুর? সে বৃদ্ধকে রাখিয়া শিশুকে আগে গ্রহণ করে, পিতাকে রাখিয়া উপযুক্ত পুত্রকে কোলে টানে। কোথায় পুত্রের কোলে মাথা রাখিয়া হরিনাম শুনিতে শুনিতে বৃদ্ধ পিতা পরম শান্তিতে বিদায় লইবেন, পুত্র মুখে অগ্নি দিবে, পুত্র শ্রাদ্ধ তর্পণ করিবে,—তাহা না হইয়া পুত্র পিতার কোলে মাথা রাখিয়া চলিয়া গেল, তিনি পিতা হইয়া তাহার মুখাগ্নি করিলেন, পুত্রের শ্রাদ্ধ পিতা করিলেন? কি নিদারুণ মর্ম্মঘাতী কাজ।

নিদারুণ মর্ম্মব্যথায় বৃদ্ধ দুই হাতে দীর্ণ বুকখানা চাপিয়া ধরিলেন। এই তো সেই পৃথিবী, এখনও তো সেই একই চন্দ্র সূর্য্য নীলাকাশে ভাসিয়া উঠে। এই চন্দ্র সূর্য্য একদিন রাম-রাজত্বে ব্রাহ্মণের শিশুপুত্রের মৃত্যু দেখিয়াছিল। সে কোন্ অতীত যুগ,—সে কোন্ অতীত কাল,—যে কালে মৃত্যুকেও বশ্যতা স্বীকার করাইতে পারা যাইত—মৃত্যু ও পিতামাতা বর্ত্তমানে পুত্র হরণ করিতে ভয় পাইত?

"দাদু—"

হঠাৎ এই আহ্বানটা কাণে আসিতেই বৃদ্ধ সোজা হইয়া বসিলেন, হাত দুখানা শ্লথ ভাবে দুই দিকে পড়িয়া গেল। মনের গুপ্ত ব্যথা তিনি কাহারও সম্মুখে প্রকাশ করিতে চান না। কেহ যখন কমাইতে পারিবে না তখন এ প্রকাশ করিয়া লাভ কি? এ বেদনা তাঁহার গাম্ভীর্য্যের আড়ালে থাকিয়া যাক, কেহ যেন না জানিতে পারে।

মুখখানা যে অসহ্য যাতনায় বিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা তিনি নিজেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। জোর করিয়া তিনি স্বাভাবিক অবস্থা মুখে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিলেন। কথা কহিতে গিয়া পাছে কণ্ঠস্বরের বিকৃত ভাব ধরা পড়িয়া যায়, তাই দুই চার বার কাসিয়া কণ্ঠস্বর ঠিক করিয়া লইয়া প্রচুর উৎসাহের অযথা ভাণ দেখাইয়া বলিলেন, "এই যে দিদি, তুই এসেছিস। আমি ভাবছিলুম তোকে একবার ডাকতে পাঠাব এখনি। মনের টান একবার দেখেছিস ভাই,—যে যাকে ডাকে তাকেও ঠিক তার ভাবনা করতেই হবে এ জানা কথা। এই দেখ না তার প্রমাণ, যেমন আমি তোর কথা ভেবেছি অমনি তুই সশরীরে এসে পড়েছিস। একেই বলে মনের টান—অর্থাৎ কি না,—"

ঠিক উপযুক্ত কথাটা তিনি সময়মত খুঁজিয়া না পাইয়া মাথার টাকে হাত বুলাইতে সুরু করিয়া দিলেন।

কতখানি কৃত্রিমতার মধ্যে তিনি নিজেকে রাখিয়াছেন, কতখানি গোপনতার মাঝখান দিয়া এই কথাগুলিকে তিনি টানিয়া আনিতেছিলেন, তাহা সীতা বেশ বুঝিতে ছিল। সে তাহার করুণ চোখ দুইটী দাদুর মুখের উপর তুলিয়া ধরিল। হায় রে, বৃথাই তাহার চোখে ধূলা দিবার আয়োজন করা। সে যে দিকে চাহিতেছে সেই দিকেই এই আত্মগোপনের বৃথা চেষ্টা। ঈশানী হয় তো কি কথা বলিতেছেন, বলিতে বলিতে থামিয়া যান,—সে কথাটা আর খুঁজিয়া পান না। আহারে বসিয়া হাতের ভাত হাতেই থাকিয়া যায়, কোন দিকে চাহিয়া কি ভাবেন কে জানে! সীতা যেমন বলে—"ও কি মা, খাওয়া বন্ধ করে কি ভাবছেন বলুন তো,—"অমনি তিনি চমকাইয়া উঠিয়াই হাসিয়া ফেলেন। সে কি হাসি? সে যে বুকের মধ্যে গুমরিয়া উঠা সেই কান্না, যাহা অনবরত বুকের মধ্যে গড়াইয়া বেড়াইতেছে। কান্নাকে হাসির আকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রকাশ করিলেও—যাহারা বুঝে তাহারা ইহাকে হাসি বলিতে পারে না।

তাহার পর এই মরণের দ্বারে উপনীত বৃদ্ধ, তিনি সযতনে আপনাকে অনেক দূরে সরাইয়া লইয়া গোপন রাখিতেছেন। সীতা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতেছে যে, দাদু আগে কোলাহলের মধ্যে জীবন কাটাইবার প্রয়াসী ছিলেন—হঠাৎ তিনি অত্যন্ত নির্জ্জনতার পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন। নির্জ্জনে তাঁহার স্বরূপ তিনি প্রকাশ করিতে পারেন, সর্ব্বদা মুখোসের প্রয়োজন হয়না। কিন্তু নির্জ্জনে থাকার চেয়ে তাঁহার বাহিরে কাযকর্ম্মের মধ্যে থাকাই যে ভাল ছিল। আগে যখন তিনি দিনরাত বিষয়-সম্পত্তির মধ্যেই ডুবিয়া থাকিতেন, এই সব কথা ছাড়া তাঁহার মুখে অন্য কথা ছিল না, তখন সীতাই কতদিন তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে,

কতদিন বলিয়াছে,—"দাদু, চিরকালই কি বিষয়-কর্ম্ম নিয়ে কাটিয়ে দেবেন, একটু আধটু নিজের পারলৌকিক ভাবনা করুন, এ জন্মেই সব শেষ হয়ে যাবে না।" দাদু হাসিতেন, বলিতেন—"নিজের কায করব বই কি ভাই। আগে জ্যোতি আসুক, তোকে তার পাশে বসাই, তার পর তোদের জিনিস তোদের বুঝিয়ে দিয়ে আমি একেবারে বিশ্রাম নেব।"

সেই বিষয়ী দাদুর এই বিষয়-বিতৃষ্ণা সীতার মনে বড় আঘাত দিয়েছে। তিনি এখন সকাল হইতে বেলা বারটা পর্য্যন্ত ঠাকুর-ঘরে বসিয়া কাটান। সীতা রুদ্ধ দরজার ফাঁক দিয়া উঁকি দিয়া দেখে, সে তো পূজা করা নয়, সে নীরবে মর্ম্মবেদনা নিবেদন করিয়া দেওয়া। হাতের অর্ঘ্য হাতেই থাকিয়া যায়, চোখের জলে সচন্দন তুলসীপত্র ভাসিয়া যায়। হায় প্রভু, তাঁহার এই একাগ্রতা-পূর্ণ পূজা লইবার জন্যই কি তাঁহার আয়ুরেখা এত দীর্ঘ করিয়া টানিয়া দিয়াছ—যাহার পরিসমাপ্তি আজও হইল না।

সীতা একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল।

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, "ঠিক মনের টানই বটে দাদু, সেই জন্যেই আমি এসেছি। আচ্ছা, কি জন্যে আমায় মনে মনে ভাবছিলেন একবার বলুন তো দেখি।"

বিহারীলাল বলিলেন, "ওই যে,—ওই বইখানা একটু পড়ে শুনাবার জন্যে। হায় রে, চোখে কি আর দেখতে পাই যে আপনি পড়ব? এই কিছুদিন আগেও চোখে বেশ দেখতে পেতুম, কাউকে একটু পড়ে দেওয়ার জন্যে আজকের মত খোসামোদ করতে হত না,—আর আজ কি না পরের খোসামোদ করে বই পড়িয়ে শুনতে হয়।"

সীতা ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, "আমি তো আপনার সেবার জন্যেই রয়েছি দাদু,—যখন যা দরকার পড়ে আমায় বললে আমি করে দেব।"

বিহারীলাল তাহার মাথায় হাতখানা বুলাইয়া দিতে দিতে হাসিয়া বলিলেন, "সে তো জানিই দিদি, তুই যে আমার সেবাদাসী। আপনার যারা, তাদের তো পেলুম না, সেই জন্যেই ভগবান তোকে আমায় মিলিয়ে দিয়েছেন। আর বেশী দিন যে বাঁচব না তা বেশ বুঝেছি দিদি। এই পাঁজরায় ঘা খেয়েও বেঁচে ছিলুম, এবার ঘা পড়েছে বুকের এই জায়গায়; একেবারে হৃৎপিণ্ডের ওপরে এ ঘা কি আর সামলাতে পারব রে? যে কয়টা দিন বেঁচে থাকি, তোকে দিয়ে নিজের সেবা পুরোদস্তুর আদায় করে নেবই। মনে কিছু করিসনে ভাই,—তোর বুড়ো দাদুটা বড় দুষ্ট, নিজের পাওনা কড়াক্রান্তি হিসাবে আদায় করে নিতে চায়।"

তিনি বহুদিন পরে আজ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তাঁহার হাসিতে ঘরটা গম্‌-গম্‌ করিতে লাগিল। রাখাল সন্দিগ্ধভাবে দরজার বাহির হইতে মুখ বাড়াইল।

হাসি থামিলে বৃদ্ধ বলিলেন, "দেখছিস সীতা, আজ অনেক কাল পরে আমায় হাসতে দেখে রাখাল বেটা উঁকি দিয়ে দেখলে, ভেবেছে—বুড়ো হয় তো পাগল হয়ে গেল। তাও যদি হতুম, সেও যে ভাল ছিল। কিন্তু পাগল হয় কারা জানিস? যাদের রক্ত গরম অর্থাৎ কাঁচা বয়স যাদের—হয় তো একটা আঘাত পেয়েই তাদের মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে যায়। আমার কেমন করে হবে? এ রক্ত বড় ঠাণ্ডা, এ মাথাও ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, তাই আঘাতের পর আঘাতেও যেমন ছিলুম তেমনি রয়েছি।"

রাগের ভাণ দেখাইয়া সীতা বলিল, "আপনি যদি যা, তা বলেন তাহলে আমি চলে যাব দাদু।"

না না দিদি, আর বলব না। তুই বইখানা ওখান হতে পেড়ে নে দেখি, পড়—আমি চুপ করে শুনি।"

সীতা বই লইয়া প্রদীপের কাছে বসিল।

১৭

মায়াবাদীর সম্মুখে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! রাজা ভরত বৃদ্ধবয়সে পুত্রের হাতে রাজ্যভার তুলিয়া দিয়া বনে গিয়াছেন। সেখানে ভগবানকে পাইবার আশায় কঠোর তপস্যা করিতেছেন। একদিন বনমধ্যে তিনি একটী হরিণ-শিশু কুড়াইয়া পাইলেন।

যিনি পুত্র, কলত্র, রাজ্য—এক কথায় সংসারের সকল আকর্ষণ ছাড়াইয়া আসিতে পারিয়াছিলেন, তিনি কি না এইরূপে একটী ক্ষুদ্র হরিণ-শিশুর মায়ায় জড়াইয়া পড়িলেন। মায়ার কি প্রতাপ,—সে তপস্বীর মনও বিচলিত করিয়া তুলে,—তাহাকে তাহার কাম্য ভগবানের আরাধনা হইতে বিচ্যুত করে। যে মায়া ত্যাগ করিয়া রাজা ভরত বনে আসিলেন, সেই মায়া এখানে তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছিল।

বনের জন্তু সে, একদিন বুঝি সে স্বাধীনতা সম্পূর্ণ ভাবে উপভোগ করিবার জন্যই বনে চলিয়া গেল। রাজার তখন তাহার জন্য কত না

ব্যাকুলতা, কত না চোখের জল ঝরিয়া পড়িয়াছিল। কোথায় রে, কোথায় চলিয়া গেল সে? ভরত বনে বনে পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, তাঁহার চোখ ফাটিয়া শ্রাবণের ধারার মত অশ্রুজল ঝরিতেছিল। তাঁহার তখন মনে হইতেছিল—সে দেখিতে কেমন সুন্দর ছিল, কতখানি তাহাকে ভালবাসিত, তাঁহার কোলে কেমন আসিত।

অবশেষে মৃত্যু। লেখক বড় সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—মৃত্যু কেমন ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে। সে স্পষ্ট জানাইয়া দিতেছে সে আসিতেছে। কিন্তু তপস্বী ভরতের মানসচোখের সম্মুখে ভাসিতেছিল সেই হরিণশিশু। তাঁহার বহির্দৃষ্টি তখন অল্পে অল্পে নিভিয়া আসিতেছে। তখনও সেই ঝাপসা চোখে তিনি দেখিতে চাহিতেছেন, সে আসিতেছে কি না। সে আসিল না, সে আর আসিবে না। যে একবার স্বাধীনতা-সুখ উপলব্ধি করিতে পায়, সে কি আর বন্ধন জড়াইতে চায়? সে আর পিছন পানে ফিরিয়া চায় না, কেবল সম্মুখে দৃষ্টি রাখিয়া অগ্রসর হইয়া যায়।

বিহারীলাল সমস্ত মন-প্রাণ ঢালিয়া দিয়া এই অপূর্ব্ব উপাখ্যান শুনিতেছিলেন। কতবার এই উপাখ্যান বাড়ীতে কথক-ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছেন, কতবার নিজে পড়িয়াছেন, তবু এ উপাখ্যান আর পুরাতন হয় না। আজ সীতার মুখে এ উপাখ্যান যেমন সুন্দর শুনাইল, এমন সুন্দর আর কোন দিন মনে হয় নাই। পড়িতে পড়িতে সীতার কণ্ঠস্বর বড় করুণ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার অন্তর বিলোড়িত হইয়া উঠিতেছিল।

নারায়ণ! মুক্ত কর, মুক্ত কর, তোমার এ চিরসেবকে, এ জন্মের বাসনা-কামনাময় কর্ম্মফল ভোগ করিতে আবার যেন এমন পঙ্কিলতার মাঝে জন্ম লইতে না হয় প্রভু!" কত রূপে কত সময় পরীক্ষা করিতেছ, কত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি নাই তাহা তো জানি। আমায় দৃঢ়তা দাও, আমায় শক্তি দাও, আমায় সাহস দাও, সত্যজ্ঞান দাও। আর যে পরীক্ষা আসিবে আমি যেন তাহাতে উত্তীর্ণ হইতে পারি।

প্রথমটা শুনিতে শুনিতে চোখে জল আসিয়াছিল, কখন চোখ ছাপাইয়া দু চার ফোঁটা শুষ্ক গণ্ড বহিয়া ঝরিয়াও পড়িয়াছিল। সীতা যখন পাঠ সমাপনান্তে গলায় কাপড় দিয়া উদ্দেশে কাহাকে প্রণাম করিয়া মাথা তুলিয়া তাঁহার পানে চাহিল, তখন তাঁহার মুখের উপর—প্রথমে যে বিষণ্ণতা জাগিয়াছিল তাহা আর দেখিতে পাইল না। বৃদ্ধের মুখখানা তখন অস্বাভাবিক দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, তিনি তাঁহার লক্ষ্যহারা জীবনে যেন একটা লক্ষ্য স্থির করিতে পারিয়াছেন; অসীমের কোলে দাঁড়াইয়া সীমা খুঁজিয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, এই মুহূর্ত্তে সীমায় পৌছাইবার পথ খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

ক্ষীণদৃষ্টি কোথায় ন্যস্ত ছিল কে জানে, ফিরাইয়া আনিয়া সীতার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু বুঝতে পারলি কি দিদি?"

সীতা কোমল কণ্ঠে বলিল, "যতটুকু সামর্থ্য দাদু, ততটুকু বুঝতে পেরেছি। বুঝেছি—মায়ায় জড়িয়ে থাকলে এই রকম অবস্থা হয়,—মায়াই আমাদের ঘুরে ফিরে নিয়ে আসে। পুরাণকার রাজা ভরতের দৃষ্টান্ত দিয়ে আমাদের সাবধান করে দিচ্ছেন। মানুষ যখন জন্মায় দাদু, তখন সে একা রিক্ত হাতে আসে; পরনের কাপড়খানি পর্য্যন্ত হাতে করে আনে না। সংসারে তাদের ভুলিয়ে রাখবার জন্য পিতামাতা, স্ত্রী, পুত্র, ধন ঐশ্বর্য্য সব দেয়। এর জন্যে আমরা বুকে ব্যথা পাই, দারুণ অসুখী হই, হাহাকার করে কাঁদি। আমরা কি মনে ভাবি দাদু, আমরা রিক্ত হাতে এসেছি, আবার রিক্ত হাতে চলে যাব? এই সংসার-গণ্ডীর বাইরে ওরা কেউ আমার বাপ মা, স্ত্রী-পুত্র স্বামীরূপে পাশে ছিল না—সংসার আমায় এই সব মিথ্যে জিনিস দিয়ে মায়ায় ভুলিয়ে রেখেছে,—আবার যখন চলে যাব তখন কেউ আমার সঙ্গে যাবে না। মুক্ত জীব আমি,—কেন স্বেচ্ছায় জড়িয়ে পড়ব,—একটা দাগ বুকে নিয়ে গিয়ে আবার কেন সংসারের মায়াজালে জড়াতে আসব? সে জন্যে এ জন্মের কর্ম্মফল ভোগ করতে গিয়ে নতুন কর্ম্মে হাত দেব,—এ জন্মের মায়াপাশ শিথিল করিতে গিয়ে নতুন মায়ায় জড়িয়ে পড়ব, ফলে মুক্তি আমার কখনই হবে না। কত জন্ম এমনি করে আসব, আঘাত সইব, আবার যাব, তা কে জানে। আমরা এই সহজ সরল সত্য কথাটা—সব জেনে বুঝেও ভাবতে ভুলে যাই; তাই লক্ষবার আসছি আবার যাচ্ছি, কোনবারই পূর্ণতা লাভ করতে পারছিনে। এই সংসারটাকেই সার বলে চিনেছি,—এই সংসারের ওপরে আর একটা স্থান আছে যেখানে আমাদের যেতেই হবে, তার কথা তো একটা দিনও ভাবি নে দাদা।"

শুনিতে শুনিতে বৃদ্ধের দীপ্তিহীন চক্ষু দুইটি

প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সত্য—সীতা যে এমন সব কথা জানে, তাহা তো তিনি জানেন না। রুদ্ধকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "বড় কষ্ট রইল দিদি, যে তোকে—"

অনুমানেই তাঁহার বক্তব্য বুঝিয়া লইয়া সীতা মৃদু তিরস্কারের সুরে বলিল, "না; আপনার মুক্তি আর কিছুতেই হবে না দাদু,—আপনার এতখানি বয়স হল, আপনি এখনও কিছু করতে পারলেন না। আমায় যতটা কাছে পেয়েছেন—বিয়ে দিলে কি ততটা কাছে রাখতে পারতেন? ধরুন, আপনার নাতির সঙ্গেই না হয় আমার বিয়ে দিতেন, তাতেও কি এমন ভাবে আমায় পেতেন দাদু? আমার ঘাড়ে যে কর্ত্তব্যের ভার চাপিয়ে দিতেন, তা আমায় আগে পালন করতেই হতো। তাহলে এমনভাবে বই শোনা, সেবা পাওয়া, কিছুই আপনার হয়ে উঠতো না। ভগবান যা করেন তা ভালোর জন্যেই করেন।"

"ঠিক কথা বলেছিস ভাই, ভগবান যা করেন তা ভালোর জন্যেই। জানিস দিদি, বুঝি সব, জানি সব,—তবু ওই এক একবার বুকটার মধ্যে কেমন করে ওঠে, তা আমিই বুঝতে পারি নে।"

চুপ করিয়া তিনি কি ভাবিতে লাগিলেন।

সীতা আস্তে আস্তে বলিল, "মা বলছিলেন পূজো এসেছে; এবার—"

চোখ তুলিয়া বিহারীলাল একটু হাসিয়া বলিলেন, "মায়ের যেমন ইচ্ছা তেমনিই পূজো হবে। তিনি ইচ্ছাময়ী, তাঁর ইচ্ছাতেই এ রকম ঘটেছে, এ তো জানা কথা দিদি। তিনি ইচ্ছা করেছেন এবার ভক্তের ঘরে বিনাড়ম্বরে আসবেন, তাই আসুন।"

সীতা বইখানা নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিল, "সে ভাল কথা, তবে খাওয়ানো দাওয়ানো—"

বিহারীলাল বলিলেন, "সেও মায়ের ইচ্ছা"

সীতা খানিকটা গুম হইয়া বসিয়া রহিল। প্রদীপের সলিতাটা পুড়িতে পুড়িতে প্রদীপের মুখে গিয়া ঠেকিয়াছিল, একটা কাঠি দিয়া সলিতা বাড়াইয়া দিয়া সে বলিল, "আর একটা কথা দাদু; আমি পূজোর কথা আর সেই কথাটা বলবার জন্যেই এসেছিলুম। শুনতে পেলুম—প্রজাদের ওপর না কি ভারি অত্যাচার হচ্ছে—"

বিহারীলাল উদাস ভাবে বলিলেন, 'সেও ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা।"

অকস্মাৎ দপ করিয়া জলিয়া উঠিয়া সীতা বলিল, "না দাদু, এটাকেও ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা বা শ্রীধরের ইচ্ছা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দেবতা বলেন নি—তুমি দরিদ্র প্রজাদের বুকে বাঁশ দিয়ে ডল, এতে আমি ভারি খুসি হব; কারণ, এ আমার ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা—জীব যেন জীবের রক্ষণাবেক্ষণ করে,—যতক্ষণ শক্তি আছে, ততক্ষণ জীব যেন জীবের উপকারই করে যায়।"

একটু হাসিয়া বিহারীলাল বলিলেন, "রাগ করছিস দিদি? আমায় লক্ষ্য করেই যে কথাটা বলছিস, তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। আচ্ছা, সত্যি করে বল দেখি, আমার কি শক্তি আছে? আমার পানে একবার ভাল করে চেয়ে দেখ, দেখে তবে কথা বল।"

সীতা শান্ত স্বরে, বলিল, "দেখেছি দাদু। কর্ম্মবীর আপনি, আপনার জীবন তো কর্ম্মশূন্য নয়, বিনাকর্ম্মে একটী মুহূর্ত্ত আপনার কেটে যেতে পারে নি। আপনি বড় আঘাত পেয়ে মুষড়ে পড়েছেন, ভাবছেন আর উঠতে পারবেন না—কিন্তু একবার উঠে দাঁড়ান দেখি—আপনার মনের ইচ্ছা আপনাকে শক্তি দেবে। আমি আপনাকে দিন-রাত লক্ষ্য করে দেখছি, কতবার কথাটা বলব ভেবেছি, কিন্তু কোন দিন মুখ ফুটে বলতে পারি নি। আপনাকে খাটতেই হবে,—যতক্ষণ দেহে জীবনীশক্তি থাকবে, আপনি বিশ্রাম নিতে পারবেন না। আমি বেশ বুঝছি, এই খাটুনীর মধ্যে দিয়েই আপনি দারুণ ব্যথার কতকটা শান্তি পাবেন। চুপ করে বসে থাকতে গেলে মানুষের মনে অনেক ভাবনাই জেগে ওঠে। একটা কোন কাযে নিযুক্ত থাকলে ভাবনা মোটেই দাঁড়াতে পায় না। আপনি হয় তো ভাববেন—আমি আপনার ওপরে অন্যায় অত্যাচার করছি। কিন্তু তা নয় দাদু, আপনার অবস্থা দেখে আমি আপনাকে আবার কাযে লাগিয়ে রাখতে চাই।"

"আবার বিষয়পঙ্কে জড়িয়ে ফেলবি দিদি, একটু ভগবানের নামও করতে দিবি নে?"

সীতা গম্ভীর মুখে বলিল, "ভুল করছেন দাদা,—বিষয় আপনার নিজের ভেবে যদি কায করতে চান, তা হ'লে জড়িয়ে পড়বেন। এখন আপনার নিজের বলতে এ সংসারে কাউকে পাচ্ছেন না। বিষয়ে আত্মজ্ঞানও কখন হবে না, এ আমি ঠিক বলে দিচ্ছি। মনে করুন, এ বিষয় পরের, আপনি এই বিষয়ের ম্যানেজার,—প্রভুর আদেশে আপনি খাটছেন। এই যে হাজার হাজার জীব আপনার মুখের পানে তাকিয়ে আছে দাদু! প্রত্যহ

যারা এসে আপনার রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করে ফিরে যায়, আপনার কি উচিত নয় এদের দেখা? আপনি কায করে যান, কাযের ফল ভগবানকে অর্পণ করুন। সে দিন গীতা তো পড়লেন দাদু, ভগবান বলছেন—"

শ্রান্তভাবে বালিশের উপর হেলিয়া পড়িয়া একটা আড়ামোড়া দিয়া হাই তুলিয়া বিহারীলাল বলিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, আবার সবই করব,—এবার তোকেও আমার পাশে থাকতে হবে বুঝলি দিদি। চোখে আর দেখতে পাইনে, কাণে ভাল শুনতে পাইনে; কায করতে গিয়ে অনেক দিনের অনভ্যাসের ফলে যখন শ্রান্তি আসবে, তখন তুই আমায় উৎসাহ দিবি, তুই আমায় শক্তি দিবি। দে দিদি, দেয়াল হতে ওই ভাঙ্গা সেতারটা পেড়ে, ওতে আজ একটু সুর দে তো।"

সীতা বলিল, "এখন থাক না দাদু; আপনার পায়ে এখন মালিশটা একটু করে দি। আজ এই রাতটুকুর মধ্যে আপনাকে চাঙ্গা করে তুলতে হবে তো, কাল সকালেই আপনাকে ঠেলে বাইরে বার করে দেব।"

"আর আমার সঙ্গে তোকেও যেতে হবে।"

একটু হাসিয়া সীতা বলিল, "দরকার হলে যেতে হবে বই কি দাদু, আপনি যে এখন ছেলেমানুষের বাড়া হয়েছেন। সময় সময় ঠিক বুড়ো দাদুর মতই জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ দেন, আবার সময় সময় একেবারেই ছেলেমানুষ হয়ে যান। তখন আমি পাশে না থাকলে আপনাকে ধমকাবে কে? সবাই আপনাকে ভয় করে চলবে, আমি তো ভয় করব না।"

বিহারীলাল স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "তা করলে আমি আশ্রয় পাই কোথায় বল দেখি? আমি যে তোর কোলের নাতি দিদি, কখনও মারবি, ধমক দিবি, কখনও বা আদর করে কোলে টেনে নিবি। তোর কাছে নিজেকে হালকা ক'রে দিয়ে আমি বাঁচি। আর আমার জুড়ানোর যায়গা কোথায় আছে ভাই?"

১৮

দীর্ঘকাল অন্তঃপুরের নির্জ্জনে কাটাইয়া একদিন বিহারীলাল বাহিরে বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। রাখাল বৃহৎ গড়গড়ায় বৃহৎ কলিকা বসাইয়া দিয়া গেল। আমলাবর্গ সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল, ম্যানেজার বাবুর নিকট খবর পাঠানো হইল।

তামাক টানিতে টানিতে বিহারীলাল গম্ভীর মুখে সম্মুখে দণ্ডায়মান বীরেন্দ্র বোসকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "শুনলুম, ম্যানেজার বাবু না কি নিয়ম মত কাছারী করেন না, এ কথা কি সত্য?"

বীরেন বোস মাথা চুলকাইয়া আঁ উঁ করিয়া উত্তর দিল "কথাটা সত্যি নয়। কাছারী করেন বই কি; তবে আজ কয় দিন ধরে তাঁর শরীরটা ভারি খারাপ যাচ্ছে শুনেছি, তাই—"

ভ্রুকুটী করিয়া বিহারীলাল বলিলেন, "তার পর শুনলুম, প্রজাদের ওপরে না কি উৎপীড়ন হচ্ছে?"

চতুর বীরেন্দ্র বোস সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "সে কি কথা! প্রজাদের ওপরে উৎপীড়ন করবে এমন ক্ষমতা কার? আমি বরং সকলকে ডেকে এক করাচ্ছি, আপনি তাদের মুখেই সে প্রমাণ পাবেন।"

বিহারীলাল বলিলেন, "থাক, তাদের ডাকতে হবে না।"

সুশীলবাবু আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। লোকটী যথার্থ-ই বড় ভাল মানুষ ছিলেন; পল্লীগ্রামে আসিয়া এবার ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছিলেন, কিছুতেই সারিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না।

বিহারীলাল তাঁহার আকৃতির পানে তাকাইয়া সে সব কথা আর তুলিতে পারিলেন না, শান্ত সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পূজো এসে পড়ল যে সুশীল, তার কোন উপায় করছ কি?

বিমর্ষ মুখে সুশীলবাবু বলিলেন, "কি করব বলুন, আমি প্রায়ই জ্বরে পড়ে আছি,—যে দু'দিন ভাল থাকি,—"

বাধা দিয়া বিহারীলাল বলিলেন, "তা তোমার চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি। উপস্থিত পূজোটা কোন রকমে সেরে ফেলে, তার পর মাস তিন চার ছুটি নিয়ে কোন স্বাস্থ্যকর যায়গায় থেকে এসো, শরীরটা সুধরে যাবে। যাক, পূজোর কি রকম ব্যবস্থা হবে বল দেখি?"

সুশীলবাবু পার্শ্ববর্ত্তী একটা ড্রয়ার খুলিয়া একটা ফর্দ্দের কাগজ বাহির করিয়া কর্ত্তার সম্মুখে রাখিলেন। বিহারীলাল চশমা চোখে দিয়া সেখানা পড়িলেন। তাহার পর সেখানা সুশীলবাবুকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, হয়েছে ঠিকই তবে কতকগুলো যেন কিছু বেশী বলে বোধ হচ্ছে। ওই যাত্রা, কীর্ত্তন, এগুলো এবার বাদ পড়বে, ও সব কেটে দাও। ওতে প্রতি বছর অনেকগুলো করে টাকা বৃথা নষ্ট হয়। ও টাকাটা দেশের অন্য

কাযে লাগালে উপকার হবে, অনর্থক আমোদে এত করে টাকা ব্যয় করে কোন দরকার নেই।"

বিনা বাক্য ব্যয়ে সুশীলবাবু তাঁহার নির্দ্দেশমত কতকগুলি পদ কাটিয়া দিলেন।

তাহাতে মোট কত টাকা
একটা হিসাব করিয়া
লিখিয়া রাখিলেন।
বলিলেন, "একদিন বলেছিলুম, [illegible] কাযে
টাকা দেব, সে কথা বোধ হয় [illegible] ছে তোমার?"

সুশীলবাবু বলিলেন, "এই তো মাস তিনেকের কথা হবে—পনের হাজার টাকা—"

"হ্যাঁ, সে টাকা যে দেওয়া হয়েছে তা আমার মনে আছে। আরও হাজার পাঁচেক টাকা এবার শুধু দুঃস্থ লোকদের জন্যেই এটা দেওয়া হবে মনে রেখ।"

সুশীলবাবু খাতা কাগজ সব সম্মুখে আনিয়া ফেলিলেন; বিহারীলাল সবিস্ময়ে বলিলেন, "এ সব কি?"

সুশীলবাবু বলিতে গেলেন, "হিসাব পত্র—"

সোজা হইয়া বসিয়া বিহারীলাল বলিলেন, "আমি ও সব এখন দেখতে আসি নি সুশীল। আগে কোন ক্রমে পূজোটা হয়ে যাক, তার পর ও সব দেখা শোনা যা হয় যাবে।"

কুণ্ঠিতভাবে সুশীলবাবু সবগুলা সরাইয়া লইলেন।

তামাক টানিতে টানিতে বিহারীলাল বলিলেন, "তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে। সন্ধ্যের দিকে—যদি তোমার শরীর ভাল থাকে, তবে একবার এসো দেখি, পরামর্শ ঠিক করে ফেলব। কথাটা অনেক দিন ধরে মনে করছি, কিন্তু সময়াভাবে এতদিন বলা হয় নি।"

বেলা এগারটা পর্য্যন্ত বাহিরে থাকিয়া,—যাহাতে আগামী পূজা সুশৃঙ্খলে শেষ হইয়া যায়, তাহার জন্য সকলকে সতর্ক থাকিতে উপদেশ দিয়া বিহারীলাল উঠিলেন। রাখাল বাবু পিছনে চলিল। স্নানান্তে শ্রীধরের পূজা সারিয়া তিনি আহার করিতে বসিলেন। ঈশানী অনতিদূরে বসিয়া রহিলেন, সীতা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বাতাস করিতে লাগিল।

মৃদুকণ্ঠে ঈশানী বলিলেন, "বোধন বসেছে বাবা, পূজোর কয় দিন লোকজন খাওয়ানোর কি ব্যবস্থা হবে?"

উদ্বিগ্নমুখে বধূর পাংশুমলিন মুখখানার পানে তাকাইয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "তুমি দেবীর ভোগ রাঁধতে পারবে না মা?"

সীতা বলিল, "মার যে প্রায়ই জ্বর হচ্ছে দাদু,—কাল রাত্রে খুব জ্বর এসেছিল, এখনও সামান্য একটু আছে। মা ভোগ রাঁধতে হয় তো পারবেন না, আমি রাঁধলে হবে?"

পরিহাসের সুরে বিহারীলাল বলিলেন, "তুই পারবি?"

সীতা জোর করিয়া বলিল, "পারব না কেন দাদু, খুব পারব! এই তো মাঝে মাঝে বামুন ঠাকরুণের যখন অসুখ-বিসুখ হয়, তখন তো আমিই রেঁধে দিই"

বিহারীলাল মুখ তুলিয়া একবার তাহার দীপ্ত মুখখানার পানে তাকাইলেন। তাহার পর গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তা তো হবে না দিদিমণি।"

সীতার মুখখানা শুকাইয়া উঠিল, "কেন হবে না দাদু?"

বিহারীলাল বলিলেন, "আমাদের নিয়ম স্বগোত্রা ভিন্ন আর কোন মেয়ে ভোগ রাঁধতে পারবে না। যদি তোমার এ বংশের কারও সঙ্গে বিয়ে হতো ভাই, তুমি সব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ অধিকারও পেতে। তুমি আর সব পাবে, পাবে না শুধু ভোগ রাঁধবার অধিকার, স্বগোত্রা না হলে এ হয় না।"

আঘাত পাইয়া সীতার মুখখানা নিমেষে বিবর্ণ হইয়া গেল। এ বৃদ্ধকে সে কি করিয়া বুঝাইবে—দুইটা মন্ত্র উচ্চারণ করিলেই যে বিবাহ হইয়া যায়, তাহা নহে। তাহার যে বিবাহ হইয়া গিয়াছে। জ্যোতির্ম্ময় তাহাকে বাহ্যিক স্ত্রী বলিয়া স্বীকার না করুক, আর কাহাকেও সে জীবনের সহচারিণী বলিয়া গ্রহণ করুক, তথাপি সে তাহারই স্ত্রী। সে বাগ্‌দত্তা, জ্যোতির্ম্ময় তাহার স্বামী। মানুষ ইহা না মানিতে চাক,—কারণ মানুষ, বাহ্যিক অনুষ্ঠান লইয়া চলে—যিনি ভোগ লইবেন, সেই দেবী তো সবই জানেন।

একটুখানি নীরব থাকিয়া সে বলিল, "কিন্তু আপনিই তো বলেছেন দাদু, ভগবানকে ভক্তি করে যে যা দেয় তিনি তাই নেন; তবে আমি—কেবলমাত্র আপনার স্বগোত্রা নই এই অপরাধে কেন মা আমার হাতের ভোগ নেবেন না? মা তো শুধু আপনার একার নন দাদু, তিনি যেমন আপনার মা, তেমনি আমারও মা। আপনার সেবার অধিকার আছে, আমার কেন নেই?"

প্রবীণ বিহারীলাল শুধু একটু হাসিলেন, বলিলেন, "ঠিক কথাই বলেছিস সীতা, কিন্তু এক্ষে

আমার কোন হাত নেই ভাই। আমি সমাজে বাস করি বলেই আমায় সমাজের সকল নিয়ম মেনে চলতে হয়; নইলে উপায় নেই। মায়ের পূজা এই হিন্দু সমাজের চিরন্তন নিয়মানুসারেই চলে আসছে, এই নিয়মের ব্যতিক্রম করে নতুন কিছু চালানোর যোগ্যতা আমার নেই। মা সকলেরই মা, আমারও যেমন তোরও তেমনি, অন্ত্যজেরও তাই। তবে হাড়ি বাগদি ডোম প্রভৃতি অন্ত্যজেরা কেন পূজোর দালানে উঠিতে পারে না, কেন পূজো করতে পায় না বল দেখি? তাদের ভক্তি আমাদের চেয়ে কিছু কম নয়,—তারাও আমাদেরই মত মাকে মা বলে ডাকে, তবু কেন তারা তফাতে থাকে? আমিও কি বুঝতে পারিনে ভাই এ নিয়ম ভাল নয়, কেন না মায়ের কাছে উচ্চ নীচ ভেদাভেদ জ্ঞান নেই? আমি ব্রাহ্মণ বলে তাঁর কাছে বড় আর তারা অন্ত্যজ বলে যে ছোট তা নয়, মায়ের চোখে সবাই সমান; তবু কেন এ পার্থক্য সমাজ সৃজন করেছে তা বলতে পারি নে। জানিস দিদি, এ সমাজে যখন বাস করতে হচ্ছে—, হবে, তখন এর সমস্ত নিয়মই প্রতিপালন করে যেতে হবে, তা ছাড়া আর উপায় নেই।"

উত্তপ্তভাবে সীতা বলিল; "আপনি বলবেন দাদু, সেকালে যাদের হাতে সমাজ-ধর্ম্ম গঠিত হয়েছে, তাঁরাই এই নিয়মটা করে গেছেন। হতে পারে দাদু, তাঁরা কেউ হয় তো এই বিধানটা দিয়ে গেছেন। কিন্তু—হৃদয়টা প্রসারতা তখন ছিল এখন যে তা নেই, এ বেশ বলতে পারা যায়। আমরা দিন দিন নূতন নূতন বিধি সংস্কার নিয়ে এসে এর সঙ্গে যোগ করে এ ধর্ম্মকে আরও উন্নত—আরও মহীয়ান করছি, ভাবছি; কিন্তু তাতে যে আরও অবনতি ঘটছে, তা আমরা দেখছি নে। একটা গল্প বলছি শুনুন দাদু, এটা সত্যই গল্প নয়, আমার নিজের চোখে দেখা একটা ঘটনা। একবার বাবার সঙ্গে আমাদের দেশে গিয়েছিলুম। এখানে একটা দেবমন্দিরে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ ছিল। একদিন খুব গোলমাল শুনে বাবার সঙ্গে আমিও সেখানে গেলুম, দেখলুম, অনেকে একটা লোককে ধরে মারছে। জানতে পারলুম, এই লোকটা না কি কিছু দিন আগে স্বপ্ন দেখে—সে নিজের হাতে এই বিগ্রহটীকে পূজো করছে। এই স্বপ্ন দেখার পর সে নিজের হাতে ঠাকুর পূজো করবার জন্যে পাগল হয়ে যায়। কিন্তু সে জাতিতে ছিল অন্ত্যজ চামার, তার পূজো করা দূরে থাক, মন্দিরের দরজায় দাঁড়াবার অধিকার পর্য্যন্ত ছিল না। লোকটা না কি কতদিন মন্দিরে ঢুকে পূজো করবার প্রার্থনা কত লোকের কাছে করেছে, কিন্তু সবাই তাকে পাগল বলে তাড়িয়ে দিয়েছে। এ দিনে কোথাও কাউকে না দেখে সে দরজা খোলা পেয়ে চুপি চুপি মন্দিরে ঢুকে পূজো করছিল, এই অপরাধে তাকে কি শাস্তিই পেতে হল। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিলুম, এত মার খেয়েও তার মুখে বেদনার একটু চিহ্ন ফুটল না, তৃপ্তির আনন্দ তার মুখখানা ভরিয়ে তুলেছিল; কেন না, তার অনেক কালের সাধ পূর্ণ হয়েছে—সে পূজো করতে পেয়েছে। দাদু, এই ভক্তি ভালবাসা নিয়ে সে মন্দিরে প্রবেশ করবার অধিকারী নয়, পূজো করবার অধিকারী নয়; আর যারা ভক্তিশূন্য—পেশাদার ব্রাহ্মণ,—অনেকে হয় তো মন্ত্রটাও উচ্চারণ করতে পারে না,—নির্ব্বিষ খোলসের মত কেবলমাত্র পৈতাটা কাঁধে ফেলে রেখেছে,—তারাই ধর্ম্মগত পূজো করবার যথার্থ অধিকারী? আমার মনে হয় দাদু, এদের পূজো ভগবান নেন না, ভগবান সেই জন্যে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন, আমরা প্রাণশূন্য পুতুল পূজোই করে যাই মাত্র। মা আসছেন,—পূজো করবে কে, মায়ের আবাহন করবে কে? যারা আবাহন করবে, তারা বাইরে দাঁড়িয়ে, মায়ের মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবে নিষ্ঠাহীন ব্রাহ্মণ—শুধু ওই শাদা সূতো গলায় রাখার জোরে? আজ তাই না আমরা দেবতার সাড়া পাই নে দাদু,—মন্দিরে প্রার্থনা জানাই, সে প্রার্থনা শূন্যে ভেসে যায়? দেবতা কোথায়—দেবতা যে অনাচারে অত্যাচারে চলে গেছেন। দেবতা চামারের অন্তরের পূজো গ্রহণ করেছিলেন, সেই দিন তাঁর যথার্থ পূজো হয়েছিল। আপনিই বলুন না দাদু, যাদের বুকে এত ভক্তি, কেন তারা পূজো করতে পারবে না?"

বিহারীলাল বিস্মিত নেত্রে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন। এ কি জ্ঞানালোকে দীপ্ত সীতার মুখখানি! এমন জ্যোতি তিনি কখনই তাহার মুখে দেখেন নাই।

ধীর কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "তোর প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারব না দিদি,—আমি শিরোমণি মশাইকে ডেকে পাঠাই, তিনিই উত্তর দেবেন।"

শুষ্ক হাসিয়া সীতা বলিল, "না দাদু, আর দরকার নেই তাঁকে। আপনার আদেশ আমি

মাথায় করে নিলুম; সত্যই আমি আপনার স্বগোত্রা নই, আমার হাতের ভোগ মা নেবেন না; অথবা নিলেও দেওয়া যেতে পারে না।"

ঈশানী বলিলেন, "আমিই সব রেঁধে দেব বাবা, সীতা সাহায্য করবে। আরও দুই একজনকে নেওয়া যাবে, তার জন্যে কিছু ভাববেন না। বাইরের রান্নার লোক ঠিক করুন, তা হলেই সব হবে।"

বিহারীলাল আহারান্তে গণ্ডূষ করিয়া বলিলেন, "সে সব ঠিক হয়েছে মা। অনেক কাল এ সব কায নিজের হাতে না করলেও মনে ভেব না কোন দিকে ভুল হয়ে যাবে। মাকে আনা একটা উপলক্ষ মাত্র, আসল কায দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করা। বিহারী মুখুয্যে কখনও ছেলে নাতির হাতে সব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকত না মা, সে নিজেও সব দেখাশুনা করত। তবে দায়িত্বটা ওরাই সব মাথায় নিত; সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকা গিয়েছিল। তবে তোমার যে অসুখ হল মা, একবার কবিরাজ কি ডাক্তার দেখালে ভাল হত না কি?"

সীতা বলিল, "ম্যানেজার দাদার কাছে হোমিওপ্যাথী ওষুধ আছে। খবর দিয়ে পাঠিয়েছিলুম, তিনি ওষুধ দিয়ে পাঠিয়েছেন।"

মাথা নাড়িয়া বিহারীলাল বলিলেন, "উঁহু, না দেখে ওষুধ দেওয়া ঠিক নয়। আমি বলে এসেছি সন্ধ্যেবেলা সুশীল আসবে, সেই সময় মাকে দেখিয়ে ওষুধ ঠিক করে নিতে হবে।"

তিনি আসন ত্যাগ করিলেন।

১৯

নির্ব্বিবাদে পূজা শেষ হইয়া গেল।

পূজার কয় দিন ঈশানীর সামান্য একটু করিয়া জ্বর হইলেও তিনি তাহা গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন নাই। তাঁহার সম্মুখে কর্ত্তব্য জাগিয়াছিল, নিজের শক্তিহীনতা তিনি উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

তাঁহার কার্য্যে সীতা এতটুকু সাহায্য করিতে পারিল না; দূরে দাঁড়াইয়া বিষণ্ণ মুখে সে শুধু চাহিয়া দেখিতেছিল। পূজায় আত্মীয় আত্মীয়াগণ আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের দ্বারা যে কায হইল, সীতার দ্বারা তাহাও হইল না।

তাহার বিষণ্ণ মুখখানা ঈশানীর বুকে দারুণ ব্যথা জাগাইয়া দিতেছিল। হায় অভাগিনী, তুই-ই যে এই গৃহের বধূ হইবার জন্য আসিয়াছিলি, আজ কোথায় উজ্জ্বল সিন্দূর তোর ললাটে দপ, দপ, করিয়া জ্বলিবে, কোথায় এই পূজার ভোগ তুই আজ স্বহস্তে মায়ের সম্মুখে দিবি, তাহা হইল না, কি ঘটিতে কি ঘটিয়া গেল।

তিনি বড় আশা করিয়াছিলেন, এ বৎসর পুত্র, পুত্রবধূ লইয়া মায়ের চরণে প্রণাম করিবেন। তাঁহার সে আশা সমূলে উৎপাটিত হইয়া গেল। আজ তাঁহার পুত্র থাকিয়াও নাই, সে ধর্ম্মত্যাগী, অন্যের স্বামী। যাহাকে বধূরূপে নির্ব্বাচন করিয়া আনিয়াছিলেন, সে কুমারীরূপে তাঁহার কাছেই পড়িয়া রহিল। সে পুত্র জীবিত থাকিয়াও তাঁহার নিকটে মৃত। তিনি শ্বশুরের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাকে এ ভিটায় কিছুতেই পদার্পণ করিতে দিবেন না।

সে যদি আসে—

মায়ের হৃদয় দুলিয়া উঠিল,—না, সে কি আর ফিরিয়া আসিবে? যদি ফিরিয়া আসার ইচ্ছা তাহার থাকিত, তাহা হইলে সে কি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিত? সে তো জানে, সমাজ যদিও কোন দিন তাহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া কোলে টানিয়া লইতে চায়, দাদু লইবেন না। দাদু যে বড় কঠিন বিচারক। যদিও সে তাঁহার আদরের দুলাল বংশধর, তথাপি তাহার এতটুকু ত্রুটী তিনি ক্ষমার চোখে দেখিবেন না। এ সমাজে তাহার স্থান হইলেও এ গৃহে তাহার আর স্থান নাই,—এ দ্বার তাহার সম্মুখে চির অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

পূজা শেষ হইল, ঈশানীও শয্যা লইলেন।

সুশীলবাবু চিকিৎসার ভার লইয়াছিলেন। তিনি বরাবরই জমীদারের অন্তঃপুরে যাতায়াত করিতেন, ঈশানীকে তিনি মা বলিতেন, সীতা তাঁহার সম্পর্কীয়া ভগিনী হইত। এই মেয়েটীকে সুশীলবাবু বড় স্নেহ করিতেন।

সীতার পিতা দরিদ্র সুশীলবাবুকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন, নিজের ভাগিনেয়ীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন, তখন সীতা ক্ষুদ্র বালিকা মাত্র। তাহার পর তাঁহারই একান্ত অনুরোধে সুশীলবাবু বিহারী লালের ম্যানেজার হইতে পারিয়াছিলেন।

কার্ত্তিক মাসও কাটিয়া আসিল, শীতের আভাস চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল।

ঈশানীর জ্বর দুই এক দিন থাকে না, আবার দশ বার দিন প্রায় লাগিয়াই থাকে। সীতা প্রাণপণে তাঁহার সেবা করিতেছিল। তাহার সেই চির-অক্লান্ত সেবায় বিচলিতা ঈশানী অশ্রুপূর্ণ

মেয়ে বলিলেন, "কেন মা, আর আমায় বিছানা হতে তোলবার চেষ্টা করছিস্? এই শোওয়াই আমার জন্মের মত হোক। শ্রীধরের কাছে তাই প্রার্থনা কর,—আমার যেন আর না উঠতে হয়।"

সীতা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "ও কথা বলবেন না মা, আমার বড় কষ্ট হয়।"

সেদিন জ্বরটা খুব জোরে আসিয়াছিল। ঈশানী নিজের বিছানায় লেপে আগাগোড়া ঢাকিয়া পড়িয়া ছিলেন। জ্বরের সময় অসহ্য যন্ত্রণা হইলেও একটী শব্দ তাঁহার মুখে ফুটিত না। জ্বর আসিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মুখ বন্ধ করিতেন, আর একটী শব্দও তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইত না। আজও জ্বরের প্রবল যন্ত্রণা সত্বেও তিনি মুখ বুজিয়া পড়িয়া রহিলেন, একটা আঃ উঃ শব্দও তাঁহার মুখে ফুটিল না।

সীতা পূজার যোগাড় করিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া, তাঁহাকে আপাদ মস্তক লেপ-মুড়ি দিয়া শুইয়া থাকিতে দেখিয়া বুঝিল, তাঁহার আজিকার জ্বরটা প্রবল ভাবে আসিয়াছে। সকালে জ্বর খুব সামান্যই ছিল। সুশীলবাবু প্রাতে দেখিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন, আজ সম্ভবতঃ জ্বরটা ছাড়িয়া যাইবে; কেন না, কাল ও পরশু দুই দিন সামান্য করিয়া জ্বর হইয়াছিল। আজ নয় দিন হইয়া গিয়াছে, জ্বর আর প্রবল ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিবে না, ইহা সকলেরই বিশ্বাস ছিল; কিন্তু বিশ্বাস তাহা মিথ্যা হইয়া গেল।

সীতা লেপ সরাইয়া তাঁহার গায়ে হাত দিতেই তিনি চমকাইয়া উঠিলেন,—"কে, সীতা?"

সীতা উত্তর করিল, "হ্যাঁ মা, আমি। আজও আপনার এতটা জ্বর এল মা, গা যে আগুন হয়ে

"হোক,—হোক মা, অন্তরের চাপা আগুন এবার বাইরে ফুটে বার হচ্ছে, হতে দে মা। এই এতটা আগুন আমি মনের মধ্যে চেপে রেখেছিলুম রে, সেটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে—তাই দেখতে পাচ্ছিস। উঃ, বুকের এই বায়গাটা আমার জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেছে। এখানে আর কিছু নেই রে, সব পুড়িয়ে এ আগুন এখন বাইরে প্রকাশ হতে পেরেছে। এখন দেহটা পুড়িয়ে ছাই করলেই হয়। দে মা, তোর ঠাণ্ডা হাতখানা আমার বুকের ওপর দে,—বুকের মধ্যে বড্ড হু হু করছে।"

মুখের আবরণটা তিনি খুলিয়া ফেলিলেন। তাঁহার মুখখানা তখন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, দুই চোখের কোণ বাহিয়া জলধারা গড়াইয়া পড়িতেছে। সীতা তাঁহার বুকে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। ঈশানী তাহার মুখের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিলেন। নিঃশব্দে তাঁহার চোখ দিয়া জলধারা বাহির হইয়া উপাধান সিক্ত করিতে লাগিল।

চিন্তামগ্না সীতা হঠাৎ এক সময় চোখ তুলিয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিল, চিন্তা তাহার দূর হইয়া গেল। আপনার অঞ্চলে তাঁহার চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল, "কাঁদছেন মা—"

তাহার কণ্ঠস্বর যে বিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল, সেদিকে তাহার নিজেরই দৃষ্টি ছিল না।

একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঈশানী বলিলেন, "বড় কষ্টে চোখ ফেটে আপনিই যে জল বার হয়ে পড়ে মা,—এ জল আমি যে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারছি নে।"

সীতা সান্ত্বনাপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "ওই আপনার বড় দোষ মা,—আপনি কিছুতেই মনকে সান্ত্বনা দিতে পারেন না। আপনি মানুষ, আপনার জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে, আপনি কেন সামান্য মনোবৃত্তির বশে চলবেন? চেষ্টা করলে যাদের চাকরের মত খাটিয়ে নিতে পারেন, তাদের বশ হয়ে আপনি কেন চলবেন? দেখুন, দাদু অনেকটা জোর করে নিজেকে সামলে নিয়েছেন। কষ্ট তো মা আপনার চেয়ে তাঁর বড় কম হয় নি।"

ঈশানী কম্পিত হস্তে চোখের জল মুছিতে গেলেন। সীতা নিজের হাতে মুছাইয়া দিল। বেদনাভরা কণ্ঠে ঈশানী বলিলেন, "ভুল বুঝেছিস মা। নিজের জন্যেই নিজে ব্যথা পেয়ে কাঁদছি, তা ভাবিস নে। আমার তবু সান্ত্বনা আছে—আমি সব পেয়েছিলুম, অদৃষ্টের দোষে রাখতে পারলুম না, তাই হারিয়ে ফেললুম। আমি যে তোর কথা ভেবে কাঁদি মা,—ভাবি, তোর জীবনটা একেবারেই এমন করে ব্যর্থ হয়ে গেল। তোর সে হাসি মিলিয়ে গেছে, সে আনন্দ আর নাই। সদানন্দময়ী মা আমার,—আমার পরিবর্ত্তন তোর চোখে পড়েছে, তোর পরিবর্ত্তন কি আমার চোখ এড়িয়ে যেতে পারে? আমি পুরুষ নই, আমি তোর বুড়ো দাদু নই যে, অতি কষ্টে হাসি মুখে এনে আমায় ভুলাতে পারবি। ওরে মা, এ কথাটা একবার ভাবিস নি,—আমি নারী,—নারীর কথা, নারীর ব্যথা নারীই বোঝে, আর কেউ বোঝে না।"

হঠাৎ বড় আঘাত পাইয়া মানুষের মুখ যেমন বিবর্ণ হইয়া যায়, সীতার মুখখানা তেমনই বিবর্ণ

হইয়া গেল। মুহূর্তে সে ভাব সামলাইয়া লইয়া সে হাসিয়া ফেলিল,—"আপনি পাগল হয়েছেন মা,—কি আমার ছিল,—কি আমার গেছে? সংসারে সংসারীরূপে বাস করবার ইচ্ছা আমি কোন দিন করিনি, কখনও করব না। এই তো সংসার মা,—লোকে বলে বড় সুখের। কিন্তু আমি দেখছি, বড় দুঃখের। যেখানে অনবরত আঘাত পেয়ে বুকের হাড়গুলো গুঁড়িয়ে যায়, দিনরাত যেখানে দীর্ঘশ্বাস আর চোখের জল ফেলতে হয়, এমন সংসারে বাস করার চেয়ে না বাস করাই ভাল মা। মাকাল ফল দূর হতে দেখতে ভারি সুন্দর, সাজিয়ে রাখার উপযুক্ত; কিন্তু ব্যবহার করতে গেলেই তার ভেতরের অসারত্ব ফুটে বার হয়। এই সংসারের অসারত্ব জেনেই, যাঁরা বাস্তবিক জ্ঞানী, তাঁরা জড়িয়ে পড়তে চান না,—অনেক দূর হতে দেখে যান মাত্র।"

নিজের সম্বন্ধে যে কথা উঠিয়াছিল, সীতা যে তাহা এড়াইয়া গেল, তাহা ঈশানী বেশ বুঝিতে পারিলেন। একটুখানি নীরব থাকিয়া তিনি বলিতে গেলেন, "আমার বড় ইচ্ছা ছিল মা—"

তিনি যে কি ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করিবেন, তাহা অনুভবে বুঝিয়া লইয়া, সীতা বিবর্ণ মুখে ধমক দিয়া আগেই বলিয়া উঠিল, "বেশী কথা বলবেন না মা। জ্বরটা বড় বেশী রকম এসেছে, যা তা বকছেন। আমি ম্যানেজার দাদাকে ডাকতে পাঠাই,—তিনি এসে মাথা যদি ধুইয়ে দিতে বলেন তাই দেব।"

সে জনৈক দাসীকে বাহিরে বৈঠকখানায় দাদুর কাছে সংবাদ দিয়া পাঠাইল। কাছারীর কাজ স্থগিত রাখিয়া বিহারীলাল তখনই সুশীলবাবুকে ভিতরে পাঠাইয়া দিলেন। সুশীলবাবু রোগিনীর দেহের তাপ লইয়া মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিলেন, "আমার ঔষধে কোন ফল হবে না সীতা। এতদিন এলোপ্যাথি ব্যবহার করলে মা ভাল হয়ে যেতেন। আগেই মাকে বলেছিলুম—নৃপেন বাবুকে এনে দেখানো হোক। তিনি বড় ডাক্তার, হাতযশ [illegible] আছে,—তাঁকে দেখালে জ্বর এতদিন কবে ভাল হয়ে যেত। কর্ত্তাবাবুও তাই বলেছিলেন, কিন্তু মার অসম্মতিতেই শুধু হল না। যাই হোক, এখন মাথাটা বেশ করে ধুইয়ে দাও। উপস্থিত আমি ওষুধ নিয়ে আসছি। তার পর বিকেলে আজ নৃপেন বাবুকে আমি নিজেই ডেকে নিয়ে আসব—মায়ের আপত্তি আজ শুনব না।"

সীতা বলিল, "কখন শোনা হবে না। এমন ভাবে ইচ্ছা করে ভুগে ভুগে শেষটায় মারা পড়বেন, এইটাই মায়ের মন। তার পর আমাদের উপায় যে কি হবে, তা তো ভাবছেন না।"

তাহার গলার কাছে কান্না ঠেলিয়া আসিতেছিল। জোর করিয়া সে তাহা চাপিয়া রাখিল। মুখখানা এই চেষ্টায় বিকৃত হইয়া উঠিল। মুখ অন্য দিকে ফিরাইয়া রাখিয়া, সে ভাবটা সামলাইয়া লইয়া, সে স্বাভাবিক সুরে বলিল, "একটু বসুন দাদা, আমি মার মাথাটা ধুইয়ে দিই, তার পর গিয়ে ওষুধ আনবেন।"

সে ঈশানীর মাথা ধোয়াইয়া দিল। সুশীলবাবু ঔষধ লইয়া আসিলেন। ঔষধ খাওয়াইয়া বাতাস দিতে দিতে ঈশানী ঘুমাইয়া পড়িলেন। সম্পর্কীয়া পিসীমা ও কান্ত দাসীকে তাঁহার কাছে রাখিয়া সীতা বাহির হইল।

বিহারীলাল আহারে বসিয়াছিলেন। আজ সীতা বা ঈশানী কেহই কাছে ছিলেন না। বৃদ্ধের আহার্য্য মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। রাঁধুনী মোক্ষদা ঠাকুরাণী তরকারী ভাল না হওয়ার জন্য অনর্থক তিরস্কৃত হইতেছিল। সীতা ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে একটু হাসিয়া বলিল, "সুক্তো হওয়ার জন্যে ওকে বকছেন কেন দাদু,—আপনি কাল খেতে চেয়েছিলেন বলে আমিই করতে বলেছিলুম। তুমি যাও বামুন-পিসী, যদি আর কিছু দরকার হয়, আমি তোমায় ডাকাব এখন; আমি এখানে দাদুর কাছে থাকছি।"

বামন-ঠাকুরাণী তাড়াতাড়ি কর্ত্তাবাবুর সম্মুখ হইতে সরিয়া গিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

সীতা দাদুর পার্শ্বে বসিয়া বলিল, "আজ ভাল করে কিছুই খাননি যে দাদু, সব পাতে পড়ে রয়েছে।"

বৃদ্ধ অভিমানপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "কি করে খাই বল দেখি? চিরকাল আমার পাতের কাছে কেউ না বসলে আমার খাওয়া হয় না। কখনও ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি। আগে মা থাকতে তিনি বসতেন। তার পর পিসীমা ছিলেন। ক্রমে তোর ঠাকুর মা, আমার বউমা, তুই—এক এক করে মায়ের সে ভারটা তোরাই নিয়েছিস খাব কি করে বল দেখি,—খেতে গিয়ে গলা যেন চেপে ধরছিল।"

সীতা হাসি চাপিয়া বলিল, "তাইতেই এমন সাধের সুক্তো ফেলে দিয়েছেন তা বুঝেছি। এ তরকারীগুলো যেন ফেলবেন না দাদু,—সব আপনাকে কুড়িয়ে খেতে হবে। একটু দেরী

হয়েছিল দাদু,—মার বড় জ্বর এসেছে,—তাঁর মাথা ধুইয়ে, ওষুধ খাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে রেখে এলুম। জানি—আপনার কাছে না এলে আপনার খাওয়া হবে না—।"

বিহারীলাল ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "জ্বর এসেছে? খুব বেশী—?"

সীতা বিষন্নমুখে বলিল, "খুব বেশী; এত গা গরম কোন দিন এর মধ্যে হয় নি। দাদা ভাই বলছিলেন, তাঁর ওষুধে যখন কোন ফল হল না, তখন হোমিওপ্যাথি আর না দিয়ে নৃপেনবাবুকে একবার ডেকে এনে দেখানো ভাল।"

বিহারীলাল ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ,—হ্যাঁ, সে যাওয়ার আগে আমায় বলেছিল বটে। আমি বলেছি—দেখি বউমাকে জিজ্ঞাসা করে, তিনি কি বলেন, তার পর যা ভাল হয় তা করা যাবে। মা কি সে ওষুধ খাবেন?"

সীতা বলিল, "খাবেন না তো কি? আপনি ওষুধ আনিয়ে দিন, দেখুন আমি খাওয়াতে পারি কি না। আপনার মত তো সবাই নয় দাদু যে—"

হাসিয়া বিহারীলাল বলিলেন, "ঠিক কথা বলছিস ভাই, আমি নিজে কখনও ডাক্তারী ওষুধ খাইনি। যদিই ওষুধ খেতে হয়, কবিরাজিটাই ব্যবহার করি। আমি নিজে খেতে পারিনে বলে মনে হয়—ও ওষুধ আর কেউ খেতে পারবে না। যাক, যদি মাকে খাওয়াতে পারিস, আমি নৃপেনকে ডেকে মাকে দেখিয়ে ওষুধের ব্যবস্থা করি। তা তুই এখন যা, আঁধার খাওয়া হয়ে এসেছে। মার কাছে তুই না থাকলে তাঁর ভারি কষ্ট হবে।"

সীতা বলিল, "তিনি ঘুমোচ্ছেন দাদু, পিসীমা বসে আছেন, ক্ষ্যান্ত মাথায় বাতাস দিচ্ছে।"

বিহারীলাল সন্দিগ্ধ ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "উঁহু, ওরা কি তেমনভাবে সেবা করতে পারবে মা —যেমনটী তুমি করবে? কমলা বসে থাকলেই বা কি,—সে যেমন মানুষ, তাতে কাউকেই ছোঁবে না। তুই যা ভাই, আমার হয়ে গেছে।"

বিরক্তভাব দেখাইয়া সীতা বলিল, "অত তাড়াতাড়ি করে খাচ্ছেন কেন দাদু। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে এমন বিষম খাবেন, যার ধাক্কা সামলাতে আপনার দুইটি ঘণ্টা কেটে যাবে। আপনি যেমন আস্তে আস্তে খান, তাই করুন। আপনার খাওয়া শেষ হলে আমি আপনাকে বিছানায় শুইয়ে রেখে তার পর যাব।"

বিহারীলাল আর কথা বলিলেন না। তিনি বেশ জানিতেন, সীতা যাহা ধরিবে তাহা শেষ না করিয়া ছাড়িবে না, এমনই কঠোর পণ তাহার। সে তাহার নিত্য-নৈমিত্তিক কাযগুলি এমনই করিয়া একান্ত জেদের সহিত নিক্তির মাপে মাপিয়া লয় যেন একতিল কমবেশী না হয়।

দুধের বাটীতে ভাত ফেলিয়া মাখিতে মাখিতে অন্যমনস্কভাবে তিনি বলিলেন, "বউমার নামে একখানা পত্র এসেছে, রাখাল সেখানা কোথায় রাখলে জিজ্ঞাসা করতো দিদি।"

রাখাল দরজার কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল, সে পত্রখানা আনিয়া সীতার কাছে দিল।

বিহারীলাল বলিলেন, "মায়ের কাছে পত্রখানা পাঠিয়ে দিয়েছিলুম, তাঁর বড় জ্বর এসেছে দেখে রাখাল পত্র বুঝি দিতে পারে নি। তুমি পড় তো দিদি, ছোট বউমা লিখেছেন তা বুঝতে পেরেছি। কি লিখেছেন তা শোনা যাক।"

এখানি জয়ন্তীর সেই পত্র, যেখানিতে তিনি এখানে আসিবার কথা লিখিয়াছিলেন।

পত্র শুনিতে শুনিতে বিহারীলালের মুখখানা গম্ভীর হইয়া উঠিল। চক্ষু দুইটী মুহূর্ত্তের তরে দীপ্ত হইয়া উঠিয়া তখনই নিভিয়া গেল। তিনি নীরবে দুধের বাটিতে চুমুক দিতে লাগিলেন।

সীতার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু বিহারীলালের গম্ভীর মুখখানার পানে তাকাইয়া সে আনন্দ প্রকাশ করিতে পারিল না,—মনটা ভারি দমিয়া গেল।

অনেকক্ষণ বিহারীলাল একটী কথাও কহিলেন না। নীরবে আচমন শেষ করিয়া বিছানার উপর বসিলেন। রাখাল তামাক সাজিয়া গড়গড়ায় কলিকা বসাইয়া দিয়া গেল।

"দাদু—"

বিহারীলাল তাহার উদ্দেশ্য বুঝিলেন। তামাক টানিতে টানিতে মাথা নাড়িলেন,—"না—ওসব ফেঁসাদে আমি আর জড়িয়ে পড়ব না সীতা, আমি ওদের এখানে আসতে দিতে রাজি নই।"

শান্তকণ্ঠে সীতা বলিল, "তা কি হয় দাদু? মনে করুন, তিনি আপনারই পুত্রবধূ, মা আর তিনি দুই-ই এক,—পার্থক্য কিছুই নেই। মানুষের মন তো চিরকাল সমান থাকে না দাদু! একদিন তিনি যে পল্লীগ্রামকে ঘৃণা করে গেছেন, শত অনুনয়েও যেখানে আসতে চাননি,—আজ নিজে যেচে সেধে সেখানে আসতে চাচ্ছেন। এতেই বুঝুন, তাঁর মনের ভাবের কতখানি পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে।

না—না, দাদু, আপনি মুখ ভার করবেন না। তাঁরা আসতে চাচ্ছেন, আসুন। আপনার কাছে কোন দিন কিছু প্রার্থনা করিনি; আজ এই প্রার্থনাটী কর্‌ছি,—তাঁদের ঘরে তাঁদের আসবার অনুমতি দিন। আমাদের অন্ধকার ঘর আবার আলোয় ভরে উঠুক, বিষাদ চলে যাক,—আনন্দ আসুক।"

"আলো,—আনন্দ?"

বৃদ্ধের মুখে বড় মলিন একটু হাসির রেখা ভাসিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল—"তুই বলছিস কি পাগলী? যে ঘরে একদিন বিদ্যুতের আলো জলেছে, সেই ঘরে জোনাকীর আলো! সে নিজেকেই আলো দিতে পারে না, চারিদিক আলো করে তোলবার ক্ষমতা কি তার? সেই আলোতে কতটুকু আনন্দ পাবি দিদি? ক্ষুদ্র জোনাকী—তার নিজের দেহটাই অন্ধকারে থেকে যায়। যেটুকু তার সীমা, সেই নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী ছাড়িয়ে যাওয়ার ক্ষমতা তার কই? সেই আলো ঘরে এনে তুই আনন্দ পেতে চাস পাগলী? আনন্দ যেখান হতে চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেছে, সেখানে এই আনন্দের উদ্যম করা বিষাদের মর্ম্মান্তিক পরিহাস তা জানিস ভাই? কিন্তু না, আমি তোর এ উদ্যমে বাধা দেব না। একবার দেখতে চেয়েছিলি, আমি দেখাতে পারি নি,—ভগবান আপনিই তোকে দেখবার সুযোগ যখন দিচ্ছেন—দেখে নে। তারা আসুক—কিন্তু এইটুকু সতর্ক থাকিস ভাই, আমার এ ঘরে যেন তারা কেউ না আসে,—আমি তাদের দেখতে চাইনে।"

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি মুখ ফিরাইলেন।

একটু পরে বলিলেন, "কেন তারা এখানে আসছে, এইটুকু যদি ভেবে দেখতিস সীতা, তবে তাদের আনতে চাইতিস নে। তারা জানে—আমি জ্যোতিকে ত্যাগ করেছি। পাছে এই বিশাল সম্পত্তি—যা আমি আমার বুকের রক্ত ফোঁটা ফোঁটা করে দিয়ে বাড়িয়েছি—এই সম্পত্তি কাউকে দিয়ে ফেলি, সেই দেওয়া বন্ধ করতেই তারা আসছে। আমি তোর ঠাকুরদা দিদি,—ঠেকে অনেক শিখেছি,—সহজে কেউ চোখে ধুলো দিতে পারে না। তোদের চোখে ধুলো দিতে যে সে পারে,—আমার চোখে ধুলো দেওয়া ভারি শক্ত। দু'দিন বড় আঘাত পেয়ে ভেঙ্গে পড়েছিলুম,—আবার দাঁড়িয়েছি, আবার শক্ত হয়েছি। কর্ত্তব্য হারিয়ে ফেলেছিলুম,—এর পর কি করতে হবে তা ভুলে গিয়েছিলুম,—আমার সামনে হারানো কর্ত্তব্যজ্ঞান আবার জেগে উঠেছে, কি করতে হবে, তা আমি ঠিক করে নিয়েছি।"

সীতা পত্রখানা হাতে লইয়া আস্তে আস্তে সরিয়া গেল।

২০

অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি একদিন বৈকালে জয়ন্তী কন্যাসহ রামনগরে আসিয়া পৌঁছিলেন।

তাঁহার কন্যা যে পল্লীগ্রামবাসিনী অশিক্ষিতা নারী নহে, সে যে সহরবাসিনী এবং শিক্ষিতা, প্রথম দৃষ্টিতেই ইহা সকলকে বুঝাইয়া দিবার জন্য জয়ন্তী কন্যাকে বিশেষরূপে সাজাইয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। ইভার পায়ে উচ্চ গোড়ালীযুক্ত জুতা, ষ্টকিং, পরণে বিচিত্রভাবের শাড়ী, বাঁকা সিঁথা; রেশমের মত কোমল চিক্কণ কালো চুলগুলি মুখের, ললাটের উপর দিয়া ঢেউ তুলিয়া গিয়াছিল।

এ সজ্জা যদিও ইভার পক্ষে কিছুতেই অতিরিক্ত হইতে পারে না, তথাপি সে তাহার প্রচলিত এই সজ্জার দারুণ বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল। এই শাড়ীখানাই সে স্বাভাবিক ভাবে পরিয়াছিল, এবং পায়ের জুতাও খুলিয়াছিল। তবে একটাতে সে ভুল করিয়াছিল। পল্লীগ্রামের মেয়েরা যে এখনও বাঁকা সিঁথা দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন, তাহা সে একবারও ভাবে নাই। সেইজন্য সিঁথার দিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না।

মেয়ের এই স্বাভাবিক সজ্জা বেশ জয়ন্তীর চোখে কাঁটা বিঁধাইয়া দিয়াছিল। তিনি তিরস্কার করিয়া তাহাকে নিজের হাতে নিজের মনের মত সাজাইয়া দিলেন। ইভা অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া রহিল,—মায়ের কার্য্যের একটী প্রতিবাদও করিল না।

সঙ্গে আসিয়াছিল বাজার-সরকার শম্ভু। সে প্রথমতঃ ক্ষুদ্র গ্রাম্য ষ্টেসন দেখিয়া খুব একচোট হাসিয়া লইল। তাহার পর গরুর গাড়ী দেখিয়াই চক্ষু কপালে তুলিল।

জয়ন্তী ভারী অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন। রাগও যথেষ্ট হইতেছিল—কেন না, তিনি আগেই জানাইয়াছিলেন, তিনি এই ট্রেণে আজ এখানে আসিবেন। ষ্টেসনে দুখানা, অন্ততঃ পক্ষে একখানা পালকী রাখাও কি উচিত ছিল না? বাড়ীর সকলেই তো বেশ জানেন—জয়ন্তী কখনও গরুর গাড়ীতে উঠেন নাই। আত্ম-অভিমান মনে

জাগিয়া উঠিল,—না, এখানে আসা তাঁহার কোন মতে উচিত হয় নাই। দাদা বাঁর বার নিষেধ করিয়াছিলেন, তাঁহার কথা অমান্য করিয়া আসা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। বেশ ছিলেন সেখানে,—অনর্থক ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিবার কোন কারণ ছিল না। এই—যাচিয়া সাধিয়া অপমান বরিয়া লওয়া তাঁহারই নিজের জেদের জন্য হইল। যদি পরে কলিকাতাগামী কোন ট্রেণ থাকিত,—জয়ন্তী আর রামনগরে যাইতেন না,—আবার কলিকাতায় ফিরিতেন, সেও ভাল ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ আর ট্রেণ ছিল না,—বাধ্য হইয়া তাঁহাকে রামনগরেই যাইতে হইবে।

মুখখানার উপর বিরাট অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল। তিনি একবার গরুর গাড়ীর দিকে, একবার পল্লীগ্রামের স্বল্পপরিসর—দু'ধারে ঝোপজঙ্গলাবৃত উঁচু-নীচু পথের দিকে তাকাইয়া অন্তরে শিহরিয়া উঠিতেছিলেন।

ইভা মায়ের ভাব দেখিয়া বিরক্ত হইয়া বলিল, "ভাবছ কি মা, ওঠ গাড়ীতে।"

তিরস্কারের সুরে জয়ন্তী বলিলেন, "সে তো উঠতেই হবে। তোর জেদে পড়েই না আজ আমার এই দুর্দ্দশা। দিব্য ছিলুম বাপু,—এই পাড়াগাঁয়ে সাধ করে এসে,—এই উঁচু-নীচু কাঁচা রাস্তায় গরুর গাড়ীতে বসে যেতেই হবে।"

যদিও নিজের ইচ্ছাও জাগিয়াছিল, তথাপি আজ বেকায়দায় পড়িয়া জয়ন্তী সব দোষটা ইভার ঘাড়েই চাপাইয়া দিলেন,—তিনি যেন নেহাৎ তাহার জেদে পড়িয়াই আসিয়াছেন, নহিলে কখনও আসিতেন না।

ইভা হাসিয়া ফেলিল। রাগ করিবার কথা হইলেও রাগ করিল না; বলিল, "সে কথা ভেবে আর কি করবে মা? আর যখন উপায় নেই, তখন এই গরুর গাড়ীতে উঠে যেতেই হবে। শম্ভুদা, হাঁ করে তুমিও তো বেশ দাঁড়িয়ে রয়েছ! একখানা গাড়ী ঠিক করে ফেল। না হয় আমিই—"

মেয়ের জ্যেঠামীতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বিকৃত মুখে জয়ন্তী বলিলেন, "থাক থাক,—আর অতটা বাহাদুরী তোকে করতে হবে না। আগে যদি পত্র না দিতুম—তা' হলেও না হয় মনকে প্রবোধ দিতে পারতুম। আসলে কথা হচ্ছে এই—ওঁদের কারও ইচ্ছে নয় যে আমরা এখানে আসি বা থাকি। বোঝা গেছে সব। কিন্তু এসে পড়েছি যখন—আর তো উপায় নেই। তুমি দেখ শম্ভু, ওদেরই মধ্যে ভাল দেখে একখানা গাড়ী ঠিক করে ফেল।"

শম্ভু গাড়ী দেখিতে গেল।

ইভা বলিল, "হয় তো বাড়ীর কাযে সব ব্যস্ত হয়ে আছেন, তাই অতটা ঠিক করতে পারেন নি। দাদার মুখে শুনেছি, এ বাড়ীর মেয়েরা আমাদের মত বাইরে বেরুতে পায় না,—বাইরের সঙ্গে তাদের এতটুকু সম্পর্ক নেই। ভেতরটার মধ্যেই তারা চলাফেরা করে,—সেইখানকার খবরটুকুই তারা রাখে। দাদু বাইরে থাকেন, হয় তো জ্যেঠিমা সময় মত তাঁকে আমাদের আসার খবর দিতে ভুলে গেছেন, নচেৎ দেখতে—"

বাধা দিয়া অভিমানভরা কণ্ঠে জয়ন্তী বলিলেন, "তুই আর ও কথাটা বলিসনে ইভু। আমি বেশ জানি—সব কথাই সকলে জানে,—জেনেও আমায় সবাই অবহেলা করছে। যাক গিয়ে, করুক ওরা অবহেলা,—আমি দু'দিনের জন্যে এসেছি বই তো নয়, পরশু তরশু ঠিক চলে আসব। শম্ভুকে এ দু'টো দিন ছেড়ে দিচ্ছিনে। একে তো এই ভূতের দেশ,—কিছু নেই,—এখানে না কি মানুষ বাস করতে পারে। চল, তোর সখটা খুব বেশী কি না, দু'দিন থেকে দেখে শুনে চল। এর পর আর কখনো আসতে চাইবিনে—এ আমি বলে দিচ্ছি।"

গরুর গাড়ী ঠিক করিয়া শম্ভু ফিরিল। মেয়ে অত্যন্ত উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইল। মা যেন নেহাৎ বাধ্য হইয়াই তাহার পশ্চাৎ চলিলেন।

গাড়ীর মধ্যে উঠিতে উঠিতে ইভা হাসিমুখে বলিল, "এই তো বেশ বসবার যায়গা আছে মা। আমরা দু'জনে এই দিকটায় বসি, শম্ভুদা সামনে বসুক, বেশ যাওয়া যাবে।"

কেন আসিয়াছেন ভাবিয়া জয়ন্তীর অন্তর অনুতাপে ফাটিয়া পড়িতে চাহিতেছিল। তিনি উঠিবার আগেই ইভা ভিতরে উঠিয়া গেল এবং বড় আরামে পা ছড়াইয়া বসিয়া পড়িল।

জয়ন্তী বিকৃতমুখে গাড়ীতে উঠিতে উঠিতে বলিলেন, "তবে তাই বসো। শম্ভু, এইখানটায় বসো। ছাতা নেই, যে কাটফাটা রোদ—ভারি কষ্ট হবে তোমার। আমার এই গায়ের কাপড়খানা না হয়,—"

শম্ভু বাধা দিয়া বলিল, "না মা, আমার কিছু দরকার নেই,—আমি বেশ যেতে পারব এখন। এই মাঠটা ছাড়ালে ওদিকে বেশ গাছের ছায়া পাওয়া যাবে।"

গ্রাম্যপথে গাড়ী চলিল। চালকের মাঝে মাঝে গরুর লেজ আকর্ষণ, গ্রাম্য ভাষায় গরুর উদ্দেশ্যে গালাগালি—ইভা যতই শুনিতেছিল, গাড়ীর মধ্যে ততই সে হাসিয়া লুটাপুটি খাইতেছিল।

কাঁচা রাস্তা। বহুদিন বৃষ্টি না হওয়ায় এবং অনবরত গরুর গাড়ী যাতায়াত করায় পথে প্রচুর ধূলা জমিয়াছিল। গরুর পায়ে, চাকায়, সেই ধূলা উড়িতে লাগিল। জয়ন্তীর নাকে মুখে ধূলা আসায় তিনি অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া রহিলেন।

পথের দূরত্ব তাঁহার নিকট অজ্ঞাত ছিল না। বহুকালের কথা সে—যে দিন এই পথখানি তিনি পিছনে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। তখন দারুণ ঘৃণায় বলিয়া গিয়াছিলেন, "এখানকার সঙ্গে সম্পর্ক আমার এই শেষ,—আর কখনও এ পথে আসিব না।" আজ সেই দিনের কথা মনে করিতে তিনি অত্যন্ত অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিলেন।

ইভা গাড়ীর পিছনের ফাঁক দিয়া বাহিরের দৃশ্য দেখিতেছিল। বহুকালের আকাঙ্ক্ষিত দেশে আসিয়া তাহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। মনের অনেক ভাবপূর্ণ কবিত্বময় কথা ফুটিয়া উঠিবার জন্য গলার নিকট আসিয়াছিল; কিন্তু মায়ের গম্ভীর মুখখানার পানে তাকাইয়া সে সাহস করিয়া একটা কথাও বলিতে পারে নাই। শম্ভু গাড়ীর সম্মুখে গাড়োয়ানের পার্শ্বে বসিয়া কুঞ্চিতমুখে তীব্র ভাষায় গ্রামের বিরুদ্ধে অনেক মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিল; আর মা তাহার সমর্থন করিয়া যাইতেছিলেন। এ সব কথা শুনিতে ইভার ভাল লাগিল না,—সে বাহিরের দিকে মন নিবিষ্ট করিল।

খানিক বাদে আবার তাহার মনটা মায়ের কথার উপর গিয়া পড়িল। মা তখন সদুঃখে বলিতেছিলেন, "মেয়ে যেমন জিদ করে এসেছে, তেমনি মজা বুঝবে। সে হচ্ছে সেকেলে ধরণের জমীদার-বাড়ী,—ওদের প্রাণের চেয়ে মান আগে,—চন্দ্র সূর্য্যে ওদের মেয়ের মুখ দেখতে পায় না, সাতমহল পার হয়ে তবে অন্দর, বাইরের সঙ্গে ওদের সম্পর্ক নেই। মরবে—নিজেই কষ্ট পাবে। চিরকাল ফাঁকা যায়গায় থেকেছে,—কখনও এমন করে নবাবদের বাড়ীর মত সাত-দেউড়ীর পরে ঘরের মধ্যে বাস করে নি। একবার বাস করে দেখুক—কি রকম সুখে থাকতে হয়। রোজ বিকেলে আর হাওয়া খাওয়াও চলবে না, যখন খুসি তখন ছুটে বেরুনোও চলবে না।"

ইভার বড় হাসি পাইতেছিল। এখনি মা অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিবেন—এই ভয়ে হাসি চাপিয়া সে গম্ভীরভাবে বলিল, "তা হোক না মা; দু'দিনের জন্য বইত নয়; আমরা তো চিরকাল বাস করতে যাচ্ছিনে।"

জয়ন্তী মুখখানা অতিরিক্ত রকম ভার করিয়া বলিলেন, "দু'দিনের জন্যে? ধর,—যদি চিরকালই থাকতে হয়?"

ইভার হাসি চাপা রহিল না; তবে উচ্ছ্বসিত হইয়াও উঠিতে পাইল না। সে বলিল, "চিরকাল তোমায় এই জংলা পাড়াগাঁয়ে আটক করে রাখবার শক্তি কার আছে মা? বাবা—স্বামীর দাবী নিয়ে যা করতে পারেন নি, দাদু কি শ্বশুরের দাবী নিয়ে তা পারবেন? তুমি যে এখানে থাকবেই না, সে জানা কথা। আর তাঁরাও আমাদের জোর করে এখানে রাখতে চাইবেন না; কারণ, তুমি যে সহরের আলোর মানুষ, তা তাঁরা বেশই জানেন। সুতরাং আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি মা, যে, আমায় এখানে চিরকাল কখনো থাকতে হবে না।"

"থাক,—তুই আর হাসিস নে ইভা,—সকল সময় তোর ওই হাসি আমার ভাল লাগে না বাপু,—দেখে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যায়।"

মুখে জয়ন্তী তাহাকে ধমক দিলেন বটে, কিন্তু সত্যই তাহার কথাগুলা তাঁহার মনে একটা কঠিন আঘাত দিয়েছিল, তাই তাঁহার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি আর কথা বলিলেন না।

দীর্ঘ পর্য্যটনে পথের দীর্ঘতা ফুরাইল,—জমীদার-বাড়ীর বৃহৎ সদর দ্বারে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। রামসিং দ্বারোয়ান দরজার পার্শ্বে তাহার মাদুরখানা বিছাইয়া জাঁকিয়া বসিয়া একখানা রামায়ণ খুলিবার উদ্যোগ করিতেছিল, দরজার বাহিরে একখানা গাড়ী দাঁড়াইতে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "গাড়ী কোথায় যাবে?"

শম্ভু উত্তর দিল, "এই বাড়ীতেই এসেছে।"

রামসিং অনুমানে বুঝিল বাবুর আত্মীয় কেহ আসিয়াছেন। সে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা হতে আসছেন?"

শম্ভু বিরক্ত হইয়া উত্তর দিল,—"আসছে ষ্টেশন হতে,—ছোট মা এসেছেন,—বাবুকে খবর দাও।"

"ছোট মা!—" রামসিং রামায়ণ ফেলিয়া উঠিল।

এই পরিবারে সে মাথার চুল পাকাইয়াছে। যদিও সে সামান্য দ্বারোয়ান, বাহিরের সঙ্গেই তাহার

সম্পর্ক, তথাপি অন্দর সম্পর্কীয় অনেক কথাই সে জানিত। সসম্ভ্রমে মাথা নত করিয়া সে বাবুকে সংবাদ দিতে ছুটিল।

বিহারীলাল পুত্রবধূ ও পৌত্রীর আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া বিচলিত হইলেন না, স্থির কণ্ঠে বলিলেন, "সদর দরজা দিয়ে গেলে এই কাছারী ঘর সামনে পড়বে। এদিকে দিয়ে নিয়ে যেতে নিষেধ কর। খিড়কীর দরজায় গাড়ী নিয়ে যেতে বলে দাও, আমি সীতাকে খবর পাঠাচ্ছি।"

বাবুর আদেশে গাড়ী অনেকটা ঘুরিয়া খিড়কীর দরজায় চলিল। অসহিষ্ণু জয়ন্তী নির্ব্বিষ সর্পিনীর স্থায় গর্জ্জিয়া বলিলেন, "সবই বাড়াবাড়ি; পাছে কেউ ওঁর বাড়ীর মেয়েদের দেখে ফেলে, তাই কি ভীষণ ব্যবস্থা! তুই একটু বেশ করে দেখ ইভা, ভাল করে দেখে নে।"

ইভা চুপ করিয়া রহিল। সে জানিত, কথা বলিতে গেলে এখনি একটা প্রলয় কাণ্ড বাধিয়া যাইবে,—মায়ের এই অতি-কষ্টে সংযত কণ্ঠস্বর সীমা অতিক্রম করিয়া সপ্তমে চড়িয়া বসিবে। দরকার নাই অতটা কাণ্ড বাধাইয়া,—চুপচাপ থাকাই সব চেয়ে ভাল। সে—কলিকাতায় যখন মা তাহাকে নিজের ইচ্ছামত সাজাইয়া দিতেছিলেন, তখন হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তাঁহার কথা যতই কঠোর হোক না কেন, সবই নীরবে সহিয়া যাইবে,—উত্তরটা যাহাতে না দিতে হয়, প্রাণপণে তাহাই করিবে।

পিছনের দরজায় আসিয়া গাড়ী থামিল। শম্ভু আগে নামিয়া পড়িল। জয়ন্তী নিতান্ত অপ্রসন্ন মুখে নামিলেন। সব শেষেই ইভা নামিল।

অনেক কালের পুরাতন ও পরিচিত দাসী ক্ষমা দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল। সে ছোটমায়ের পায়ের ধূলা মাথায় দিল। ইভাকে প্রণাম করিল, বলিল, "আসুন মা, ভেতরে চলুন।"

দিদি আসিয়া দরজায় দাঁড়াইতে পারেন নাই, সামান্ত একটা দাসী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল,—এ ব্যাপারটা জয়ন্তীর মর্ম্মে বিঁধিয়া গেল। কোন কথা না বলিয়া ইভা তাহার পশ্চাদনুবর্ত্তিনী হইল। অগত্যা জয়ন্তী তাহার পিছনে চলিতে চলিতে শম্ভুর পানে ফিরিয়া বলিলেন, "তা হলে শম্ভু—তুমি,"

রামসিং সসম্ভ্রমে বলিল, "আমি বাইরে নিয়ে যাচ্ছি মা।"

শম্ভুর বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া জয়ন্তী ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

ভিতরে দরজার পার্শ্বে সীতা দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার পানে চোখ পড়িতে ইভা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। জয়ন্তী মুগ্ধ বিস্ময়ে এই মেয়েটীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানার পানে চাহিয়া রহিলেন। সীতার সজ্জায় অভিনবত্ব কিছুই ছিল না। একটা শাদা সেমিজ ও একখানা কালা ফিতাপাড় ধুতি মাত্র তাহার পোষাক। প্রকোষ্ঠে তিনগাছি করিয়া সরু সোনার চুড়ী। এই শাদাসিধা সজ্জায় তাহার সৌন্দর্য্য যেন উছলাইয়া পড়িতেছিল।

সে জয়ন্তীর পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল। ইভাকে আদর করিয়া বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া, তাহার সুন্দর ললাটে একটী স্নেহের চুম্বন দিয়া, একটু হাসিয়া বলিল, "আসুন কাকীমা, এসো ভাই ইভা, উপরে চল। মায়ের বড্ড অসুখ হয়েছিল। এখন একটু ভাল হলেও তাঁকে নীচে নামতে দেই নে; কেন না, সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামা করতে গেলে তাঁর বুক বড্ড ধড়ফড় করে।"

জয়ন্তী মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিতে গেলেন,—"তুমি—তুমি, সীতা?"

মৃদু হাসি সীতার আরক্তিম অধরোষ্ঠের উপর দিয়া খেলিয়া গেল। সে মাথা নত করিয়া উত্তর দিল, "হ্যাঁ কাকীমা, আমিই সীতা।"

বিস্ময়ে গালে হাত দিয়া জয়ন্তী বলিলেন, "এমন প্রতিমা অবহেলা করে জ্যোতি চলে গেল,—এর চেয়ে যে অনেক নিকৃষ্ট তাকে বরণ করে নিলে? এ যে সেই গল্পটার মত হয়েছে রে ইভু—"

ইভা সীতার আরক্ত মুখখানার উপর দৃষ্টি রাখিয়া বিরক্তভাবে বলিল, "তুমি কি বলছ মা,—চুপ কর এখন, ও সব কথা পরে হবে। চল, আগে জ্যেঠিমার সঙ্গে দেখা করি।"

সীতা ইভার পাশাপাশি সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে বলিল, "আমি আজ মাত্র পত্রখানা পেয়ে মাকে পড়ে শুনালুম। দাদুর কাছে ঘণ্টা খানেক আগে মাত্র সেখানা দেওয়া হয়েছে। পত্রখানা কাল আমাদের পাওয়ার কথা ছিল, ডাকের গোলমালে একটা দিন দেরী হয়ে গেছে। রামসিংকে পালকী বেহারা নিয়ে ষ্টেশনে পাঠানোর কথা প্রথমে হয়েছিল। তার পর বোঝা গেল সেটা অনর্থক হয়ে যাবে। তোমরা ষ্টেশনে এসেছ বেলা প্রায় বারটার সময়ে, আর এই চার পাঁচ ক্রোশ গরুর গাড়ীতে আসতে বেলা পাঁচটা বেজে গেছে। খাওয়া-দাওয়াও আজ হয় নি বোধ হয় ভাই?"

এই মেয়েটীর সঙ্কোচহীন আলাপে, বাধাশূন্য

সরল ব্যবহারে ইভা তাহার বিশেষ অনুরক্তা হইয়া উঠিল। সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, ভাত আজ খাই নি, তবে চা আর খাবার খেয়ে এসেছি।"

সীতা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ, সমস্ত দিনটা কেটে গেছে—খাওয়া হয় নি? তার পরের ট্রেণে এলে কলকাতা হতে একেবারে খেয়ে-দেয়ে আসতে পারতে। এখানে পৌঁছাতে না হয় একটু সন্ধ্যেই হয়ে যেত, তবু শরীর তো ঠাণ্ডা থাকত। সেই কোন্ সকালে চা আর খাবার খেয়েছ,—এতক্ষণ সব হজম হয়ে গেছে। চল, তোমাদের মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে আমি খাবার যোগাড় করি গিয়ে।"

ঈশানীর ঘরে তিনি শুধু একাই ছিলেন না। বিহারীলালের ভাগিনেয়ী ঈশানীর ননদিনী কমলা, আর দুই একটি আত্মীয়া সেখানে ছিলেন। জুতা পায়ে দিয়া সে ঘরে প্রবেশ করিতে ইভা ভারি সঙ্কুচিতা হইয়া উঠিল। মেয়েরা সকলেই যেন বিশেষভাবে তাহার পায়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া আছেন, ইহাই ভাবিয়া সে মুখখানা লাল করিয়া দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল।

জয়ন্তী ঈশানীকে প্রণাম করিলেন। ঈশানী আত্মীয়াদের পরিচয় দিলে, তাঁহাদের কাহাকেও প্রণাম করিলেন, কাহারও নিকট হইতে প্রণাম পাইলেন।

বহুকাল পরে আজ দুইটী জায়ে সাক্ষাৎ; আজ কোথায় সে দিন,—স্বামী বর্ত্তমান না থাকিলেও যে দিন ঈশানী আজকার মত অভাগিনী ছিলেন না! লক্ষ্মণের মত দেবর, সোণার চাঁদ ছেলে, আজ তাহারা কেহ নাই। ঈশানী মুখ ফিরাইয়া নীরবে চোখের জল মুছিতে লাগিলেন। জয়ন্তী দুই বাহুর মধ্যে মুখখানা লুকাইয়া ঝর ঝর করিয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন।

মুহূর্ত্তে ঈশানী প্রকৃতিস্থা হইলেন। ইভার পানে তাকাইয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন মা, ঘরের মধ্যে এস।"

সীতা মুখ নত করিয়া তাঁহার কাণে কি বলিল। ঈশানী স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "পায়ে জুতো আছে তাই আসতে পাচ্ছ না মা? তা থাক না পায়ে জুতো,—জ্যেঠিমার কাছে আসতে কোন দোষ নেই। তোমার জ্যেঠিমা এমন শুচিগ্রস্তা নয় যে, তোমাদের ছুঁতে দ্বিধা বোধ করবে। তোমার দাদাও জুতো খুলে রেখে কোন দিন তার মায়ের কোলে আসবে বলে পবিত্র হয়ে আসে নি। কত সময় তাকে এই বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছি। সে যে অনেক সময় অপবিত্র হয়ে আছে, তাও কোন দিন ভাবতে পারি নি। আজ তোমাকেও তেমনি করে বুকে পেতে চাই মা, সকল দ্বিধা দূর করে তুমি এস।"

পুত্রের কথা বলিতে আবার চোখে জল আসে। জয়ন্তী চোখ মুখ মুছিয়া মুখ তুলিলেন। শুষ্ক কণ্ঠে ডাকিলেন, "জ্যেঠিমা ডাকছেন, ঘরে আয় ইভু।"

ইভা কুণ্ঠিতভাবে ঘরে প্রবেশ করিল। ঈশানীকে প্রণাম করিতে যাইতে, তিনি তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন। দুই চোখের জল তাহার মাথার উপরে গড়াইয়া পড়িল। বিকৃত কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "ছোট-বউ, ঠাকুর-পো আর একটীবার ইভুকে দেখবার ইচ্ছা করেছিল। মা আমার আবার সেই ভিটেয় এল কিন্তু ঠাকুর-পো আজ কোথায়?"

সীতা সেখানে বেশীক্ষণ থাকিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি করিয়া অভুক্তদের আহার্য্য প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া গেল। আজ আনন্দ তাহার ক্ষুদ্র বুকে ধরিতেছিল না; তাই অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কাজ হইয়া গেল।

২১

একটা কথাই আছে, আর মানুষ আপনার মন দিয়াও বুঝিতে পারে—আজন্মকাল একত্র থাকিয়াও যে প্রীতি অন্তরে জাগিয়া উঠে না, হয় তো দু'দণ্ডের আলাপেই সেই প্রীতি জাগিয়া যায়। এই জন্যই ইভা দু'দণ্ডের আলাপে সীতাকে গভীরভাবে ভালবাসিয়া ফেলিল, এবং ভালবাসিয়া হৃদয়ে বড় তৃপ্তি পাইল। সে মনে করিয়া দেখিল, তাহার এই ক্ষণিকের সাথীটাকে সে যতটা ভালবাসিতে পারিয়াছে, এতটা ভালবাসিতে অন্য কোন মেয়েকে পারে নাই।

আসল কথা, সীতার মধ্যে এমন একটা সরল ভাব ছিল, যাহাতে তাহাকে ভাল না বাসিয়া কেহই থাকিতে পারিত না; তাহার আকর্ষণে সকলকেই জড়াইয়া পড়িতে হইত। সে সরলা বলিয়া যে জ্ঞানহীনা, আত্মমর্য্যাদাবোধহীনা, তাহা নয়; নিজের মর্য্যাদা অটুট রাখিয়া সে ছোট বড় সকলের সহিতই মিলিয়া মিশিয়া যাইতে পারিত। বাড়ীর দাসী চাকর হইতে আরম্ভ করিয়া স্বয়ং রুক্ষ-স্বভাব বিহারীলাল পর্য্যন্ত তাহার কথার অবাধ্য হইতে পারিতেন না। সীতার দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত

তীক্ষ্ন, এ সংসারের অতি ক্ষুদ্র প্রাণীটি পর্য্যন্ত তাহার সদা-সতর্ক চোখের সম্মুখ দিয়া এড়াইয়া যাইতে পারিত না।

বাড়ীর দাস-দাসীরা তাহাকে কর্ত্তার চেয়েও বেশী সম্মান করিত, বেশী ভালবাসিত। কর্ত্তার সহিত তাহাদের শুধু বেতনের সম্পর্ক। সীতার সহিত অন্তরের সম্পর্ক। কাহারও অসুখ-বিসুখ হইলে সীতা ব্যতীত দেখিতে কেহ নাই। সে নিজের হাতে পথ্য প্রস্তুত করিবে, খাওয়াইবে, ঔষধ নিয়মিত ভাবে দিবে, কথার অবাধ্য হইলে তিরস্কার করিবে, আবার মায়ের মত সস্নেহে চোখের জল মুছাইয়া দিবে। মেয়েটী সামান্য কয়টি মাসের মধ্যে সকলের অন্তরে স্নেহ ভালবাসা দিয়া জয় করিয়া লইয়াছিল। যতদিন সে বিবাহের পাত্রীরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া এখানে ছিল, ততদিন বিহারীলাল তাহাকে স্বাধীনতা দেন নাই, কারণ সে তাঁহার বংশের বধূ হইবে। জ্যোতির্ম্ময় চলিয়া গেলে, তিনি সীতাকে আর আবদ্ধ করেন নাই, তাহাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, যাহা জমীদার বাড়ীর মেয়েদের পক্ষে একেবারেই স্বপ্ন সমান ছিল। চিরঘৃণিত মেয়েদের স্বাধীনতার পক্ষপাতী বিহারীলাল কেন যে হইয়াছিলেন, তাহা আর কেহ জানিতে পারে নাই। ইদানীং তাঁহার জমীদারী-সংক্রান্ত কাগজপত্র নিজে না দেখিয়া তিনি সব সীতাকে দেখাইতেন। সীতাকে তিনি বুঝাইতেন—"কবে আছি, কবে নেই, কে বলতে পারে দিদি, একটু আধটু জেনে রেখো, কাযে লাগবে। এর পরে যাকে বিষয়ের উত্তরাধিকারী করে রেখে যাব, তাকে সব বুঝিয়ে দিতে হবে তো।"

সে দিন সকালে স্নানান্তে পূজার যোগাড় করিয়া আসিয়া সীতা বিধবাদের রন্ধনের যোগাড় করিতেছিল। ঈশানী রন্ধন করিতে বসিয়াছিলেন। দুর্ব্বলতা সত্বেও তিনি রন্ধন ছাড়িতে পারেন না, রন্ধন তাঁহার জীবনের প্রধান অবলম্বন ছিল। আজ সীতা প্রথমে তাঁহাকে কিছুতেই রন্ধন করিতে দিবে না বলিয়া পিসী-মা-কমলাকে রন্ধনার্থে ডাকিয়া আনিয়াছিল, কিন্তু ঈশানী তাঁহাকে কিছুতেই অগ্রসর হইতে দিলেন না। সীতার দিকে মুখ ফিরাইয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "তুই কি আমায় কোন কাজ করতে না দিয়ে মেরে ফেলতে চাস সীতা,—আমার বেঁচে থাকা যে তোর ইচ্ছে নয় তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। যদি আমার কায আমায় না করতে দিস, তবে আমি নিশ্চয় বলছি—কখনও তোর একটী কথা আমি শুনব না।"

সীতা অপ্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল, আর বাধা দিতে পারিল না। মহানন্দে ঈশানী রাঁধিতে বসিলেন।

বাড়ীর দাসী বৃদ্ধা রামহরির মা আজ কয়দিন জ্বর হইয়া পড়িয়া আছে। সকালে সীতার আদেশে গৌরীদাসীকে তাহার কাছে থাকিতে হইয়াছিল। সে বিকৃতমুখে আসিয়া সংবাদ দিল, রামহরির মা বিছানায় বমন করিয়া ফেলিয়াছে। গৌরী দিদিমণির আদেশে তাহার কাছে বসিয়া থাকিলেও বমন পরিষ্কার করিতে সে কখনই পারিবে না।

সীতা ব্যস্তভাবে উঠিয়া গেল।

ইভা খানিক বাদে তাহাকে খুঁজিতে নীচে একটা ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিস্মিত চোখে দেখিল, সে দুই হাতে বৃদ্ধা দাসীর বমন পরিষ্কার করিতেছে। অপ্রস্তুত গৌরী দ্বারে দাঁড়াইয়া বলিতেছে "আপনি সরে যান দিদিমণি, আমি না হয় এ কায করছি। আপনি নিজের হাতে যে করবেন, তা তো আমি জানি নে; তাই তো বলেছি পারব না। আপনি সরুন, আমি করি।"

সীতা প্রসন্ন মুখে বলিল, "এতে তুমি এত লজ্জা পাচ্ছ কেন গৌরী? অবশ্য পরিষ্কার করতে সকলেরই একটু ঘৃণা হয়, আমার হয় না, কাযেই আমি করতে পারি। তুমি কিছু মনে করো না, এই ত হয়ে গেল, এ আর কতক্ষণের কায।"

ক্ষিপ্রহস্তে সব পরিষ্কার করিয়া গৌরীকে বৃদ্ধা দাসীর পরিচর্য্যায় বসাইয়া দিয়া সে বলিল, "তুমি এখানেই থেকো, ওদিকে যা কায পড়বে, আমি বিন্দি, ক্ষমা, এদের দিয়ে করিয়ে নেব এখন। বুড়ো মানুষ—বড্ড জ্বর এসেছে, যদি তৃষ্ণায় বুক ফেটে যায়—চেঁচাতে পারবে না। তুমি এখানে থাক, যখন যা দরকার হবে তা দিয়ো।"

বাহিরে আসিতেই সে ইভাকে দেখিতে পাইল,—ইভা বিস্ময়ে তাহার পানে তাকাইয়া ছিল।

সীতা একটু হাসিয়া বলিল, "তুমি এখানে কি করতে এসেছ ইভা? নীচেটা বড় সেঁতসেঁতে, এ-সব যায়গায়—"

বাধা দিয়া ইভা বলিল, "আমার আসা উচিত নয়—কেমন? কিন্তু তুমি তো এসেছ দিদি।"

সীতা তেমনি হাসিভরা মুখে বলিল, "আমার সঙ্গে তোমার কথা স্বতন্ত্র বোন। আমি হচ্ছি দুনিয়ার বাইরের জীব, সংসারে বাস করেও আমি

সংসারের কেউ নই; এখানকার কারও সঙ্গে আমার কখনও মিশ খায় নি, খাবেও না।"

ইভা একটু রাগের ভাব দেখাইয়া বলিল, "মিশ যে খায় নি, তা দেখতেই পাচ্ছি। এখানে এসে পর্য্যন্ত তোমার কায দেখে বুঝতে পারছি, তুমি কেমন দুনিয়া-ছাড়া মানুষ। সংসারে তুমি নিবিড়ভাবে জড়িয়ে রয়েছ, অথচ জোর করে বলতে চাও তুমি সংসারের কেউ নও।"

অন্যমনস্ক ভাবে সীতা বলিল, "তাই বটে, কিন্তু এ যে খাপছাড়া মেশা তা তো জানো না বোন। নিজের অস্তিত্ব ভুলে যেমন করে মিশে যেতে এগিয়েছিলুম, প্রাণটা যেমন ভাবে ঢেলে দিতে চেয়েছিলুম—তা পেরেছি কি?"

জোর করিয়া ইভা বলিল, "খুব পেরেছ। এই তোমার নিঃস্বার্থ কায দিদি; ভগবান তোমায় দিয়ে অনেক কায করিয়ে নেবেন বলে, তোমায় কোন বাঁধনে বাঁধেন নি; একের মধ্যে তোমায় আটক করে রাখেন নি,—তোমায় সকলের মাঝে জড়িয়ে দিয়েছেন। তোমার ইচ্ছাশক্তি বাতাসের মত লঘু, স্বাধীন; তোমার দেহ তারই মত স্বাধীনতা পেয়েছে; কাজেই তোমার গতি অবাধ, তোমার কায অতি সুন্দর, সব তাইতেই তুমি সার্থকতা লাভ কর।"

"সেটা বুঝি বড় ভাল ভেবেছিস ইভু—"

হঠাৎ জয়ন্তীর কথা শুনিয়া উভয়েই চমকাইয়া পিছন ফিরিল। খিড়কীর পুকুরে স্নান করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে জয়ন্তী ফিরিতেছিলেন। বরাবর বাথরুমের মধ্যে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করা তাঁহার অভ্যাস, শীতকালে জলটা একটু বেশী রকম উষ্ণ হইলেই ভাল হয়। সীতা ইভার নিকট তাঁহার সম্বন্ধে যাবতীয় কথা তন্ন তন্ন করিয়া জানিয়া লইয়া সকাল বেলা আগে গরমজল করিয়া দিয়াছিল। জনৈক দাসী গরমজলের বালতী ও কাপড় নির্জ্জন ঘাটে লইয়া গিয়াছিল; বাধ্য হইয়া বাথরুম অভাবে ঘাটেই জয়ন্তীকে স্নান সারিয়া লইতে হইয়াছে।

স্নান করিতে যাইবার সময় তিনি একবার উঁকি দিয়া সীতাকে দাসীর বমন পরিষ্কার করিতে দেখিয়াছিলেন। ঘৃণায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ এমন ভাবে লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তখন দাঁড়াইয়া আর একটী কথাও বলিতে পারেন নাই। এখন ফিরিবার সময় সীতা ও ইভাকে এই ধরণের কথা বলিতে শুনিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জলিয়া গেল, উত্তেজনায় কাঁপুনিটাও একটু নরম পড়িয়া গেল; তিনি একটু তীব্র সুরেই বলিলেন, "স্বাধীন থাকা বুঝি বড় ভাল; দেশের অশিক্ষিতা মেয়েগুলো সবাই যদি স্বাধীন থাকতে চায়, তাদের ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করবে কে? শিক্ষিতা মেয়েরা বিয়ে না করলেও তাদের চলে, কেন না নিজেদের জীবিকার জন্যে তাদের কারও গলগ্রহ হয়ে থাকতে হয় না। আমি বলি, সীতার শীগ্‌গিরই বিয়ে করা উচিত; কেন না, এর পরে ওকে পরের গলগ্রহ হয়ে জীবন কাটাতে হবে। বাবা যে আর বেশী দিন বাঁচবেন তা নয়, এর পরে যে বিষয় সম্পত্তির মালিক হবে, সে যদি এরকমভাবে ওকে না রাখতে চায়, তখন ওর উপায় কি হবে, আমি তাই কেবল ভাবি। বয়েস বেশী হয়ে গেলে মাথার ওপর কেউ না থাকলে, এর পর কি আর কেউ বিয়ে করতে চাইবে?"

ইভা আর সহ্য করিতে পারিল না। এ পর্য্যন্ত মায়ের অনেক কথাই সে সহ্য করিয়া আসিয়াছে, আর কত সহ্য করিতে পারা যায়? সে বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিল, মা আদৌ সীতাকে সুচোখে দেখিতে পারেন না, বাড়ীতে সীতার এই একাধিপত্য তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। সীতার প্রতি বিহরীলালের অগাধ স্নেহ, অনন্ত বিশ্বাস তাঁহার মনে একটা তীব্র জ্বালার দহন দিয়াছিল। বৃদ্ধ হয় তো সকলকে সব হইতে বঞ্চিত করিয়া সীতাকেই সব দিয়া যাইবেন, এমনি একটা আশঙ্কা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিয়া তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছিল। সেই জন্যই তাঁহার বাক্যে, চলা ফিরায়, প্রত্যেক কার্য্যে সীতার প্রতি দারুণ অবজ্ঞা, নিদারুণ বিদ্বেষ ফুটিয়া উঠিতেছিল। প্রথমটায় সীতার অনিন্দ্য রূপ চোখে পড়িতে, তিনি কেমন যেন থতমত খাইয়া গিয়াছিলেন, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই—এই মেয়েটী এতখানি সৌন্দর্য্য লইয়াও যে অভাগ্যবতী, ইহাই ভাবিয়া তাঁহার অন্তরটা একটু কোমল হইয়া আসিতেছিল। যেইমাত্র দেখিলেন, সে সংসারের কতখানি জুড়িয়া লইয়া বসিয়াছে, সে সকলের কতখানি আদরের পাত্রী, সে সকলের—এমন কি রূঢ়প্রকৃতি বিহারীলালের উপরেও তাহার আদেশ বিস্তার করে, তখনই তাঁহার মন হইতে করুণাটুকু কর্পূরের ন্যায় উপিয়া গেল। তিনি দিব্যচক্ষে দেখিলেন, যে এই আদর পাইবার যথার্থ অধিকারিণী, তাহাকে সম্পূর্ণ ভাবে বঞ্চিতা করিয়া সীতা সবটা আত্মসাৎ করিয়াছে। কাল রাত্রে

বন্ধার পার্শ্বে শুইয়া অনেক রাত পর্য্যন্ত সরোষে এই —"উড়ে এসেছে চিল—জুড়ে বসেছে বিল" এর সম্বন্ধে অনেক তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। সংসারের ছোট বড় যাহার উপর যত বিদ্বেষ ছিল, সব নিমেষে এক হইয়া এই নিরপরাধিনী বালিকার উপর পড়িয়াছে।

ইভা সীতার বিবর্ণ মুখখানার পানে তাকাইয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "কি কথা হচ্ছিল আর তুমি কি কথা বলতে এলে মা? তোমার ওই যে কি দস্তুর হয়েছে—মাঝখান হতে কিছু না জেনে না শুনে ফস করে এমন এক একটা কথা বল, যা লোকের বুকে বাজের মত পড়ে। তোমায় আমরা কেউ তো কথা বলতে ডাকিনি যে তুমি—"

বাধা দিয়া মিষ্টকণ্ঠে সীতা বলিল, "ছি ইভা, মাকে ও রকম কড়া করে কথা বলতে নেই। মা আছেন বলে, মা যে কি জিনিস তা বুঝতে পারছ না ইভা, আমার মা নেই বলেই, মায়ের স্নেহ আদর যে কি জিনিস, তা আমি বুঝতে পেরেছি। ভগবান আমায় একটী মা এনে দিয়েছেন, আমার ব্যর্থ জীবনখানা সফলতায় ভরে দিয়েছেন। মাকে ব্যথা দিয়ো না, শিক্ষার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার কোরো। কাকী-মা যা বলেছেন, সে খাঁটি কথা জেনো। আমাদের মত অশিক্ষিতা মেয়েরা বিয়ে না করে যে স্বাধীনভাবে থাকতে চাইচে, আমাদের খাওয়া পরা যোগাবে কে? অশিক্ষিতা মেয়েদের কোন পথ নেই, সব দরজা তাদের বন্ধ। মাথার উপরে অভিভাবক থাকা চাই, তাই সকল মেয়েকেই বিয়ে করতে হয়, নইলে পেট চলবে না তো। আজকালকার দিনে কেউ অক্ষম মা বাপ, ভাই বোন, এদেরই পুষতে চায় না, আমার ভার নেবে কে —কাযেই কাকী-মা ঠিকই বলছেন।

অত্যন্ত প্রীতা হইয়া জয়ন্তী বলিলেন, "দেখ তো; যদিও সীতা তোর মত উচ্চ শিক্ষা পায় নি, তবু ওর যা বুদ্ধি আছে, তোর তা নেই। এই তো তোর শিক্ষা হচ্ছে। দিদি বলছিলেন, তুমি না কি বিয়ে করতে চাও না,—এও কি একটা কথা হতে পারে? মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছ, নিজের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করবার মত উপযুক্ত শিক্ষা যখন পাও নি, তখন বিয়ে করব না বললেই তো চলবে না। এখানে যদি নাই টিকতে পার,— পরের ঘরে বামনী হয়ে থাকতে হবে, কি মন যুগিয়ে দাসীবৃত্তি, করতে হবে। কেন না, তার বেশী যোগ্যতা অশিক্ষিতা বা অল্পশিক্ষিতা মেয়ের থাকতে পারে না। সত্যি কথা বলছি, এতে রাগ করো না যেন মা।"

সীতার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সে জোর করিয়া মুখে হাসি টানিয়া বলিল, "না মা, রাগ করব কেন; আপনি ঠিক কথাই বলছেন, ভবিষ্যৎটা আমায় স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিলেন।"

জয়ন্তী কন্যার মুখের উপর একটা তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "ইভু যথেষ্ট লেখাপড়া শিখলেও বুদ্ধিটা ওর ভারি কম, তাইতেই ভয় হয় —কি জানি—কখন কি করে বসবে।"

ইভা দন্তে অধর চাপিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া ছিল, মায়ের কথার উপর আর কথা কহিবে না বলিয়া সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল; এইবার মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কলকাতায় কবে ফিরবে মা?"

জয়ন্তী যেন আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন,—"সে কি, তুই এসেই যে 'যাই যাই' রব তুললি?"

ইভা বলিল, "তুমি কাল ফিরবে বলেছ না?"

একটু হাসিয়া কন্যার পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে মা বলিলেন, "বলেছি বলে কি কালই যেতে হবে পাগলী? এসেছি যখন—দু'দিন থেকে যাই, কি বল সীতা?"

অসহিষ্ণুভাবে ইভা বলিল, "শম্ভুদাকে কেন আটক করে রাখছ অনর্থক? যেতে যদি হয়—চল, না হয় শম্ভুদাকে বলে দেই, সে চলে যাক।"

রাগ করিয়া জয়ন্তী বলিলেন, "তাই বল গিয়ে, সে আজই চলে যাক। বাপ রে, মেয়ে আসার জন্যে তখন এক পা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল, এখন যাওয়ার জন্যে আবার তেমনি ব্যস্ত। আমায় কি তোর হুকুমে চালাতে চাস ইভা? আমায় কেউ আনতে যায়নি, নিজের ইচ্ছেয় এসেছি, আবার নিজের ইচ্ছেয় যখন হয় চলেও যাব। আমায় সেখানে রেখে আসবার একটা লোকও কি এই এতবড় জমীদার-বাড়ীটায় পাব না? তোর এ যায়গা ভাল না লাগে, শম্ভুর সঙ্গে তুইও চলে যা, আমি এখন যাব না।"

ইভা মুখ ভার করিয়া গুম হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সীতার শুষ্কমুখে হাসি আসিতেছিল না, তবু সে জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, "কেন ইভা, কলকাতায় যাওয়ার জন্যে এত ব্যস্ত হচ্ছো, এ যায়গা কি তোমার ভাল লাগছে না? এই তোমার নিজের বাড়ী, নিজের ঘর, এই তোমার সব আপনার জন। আমরা যে তাই, পর বই তো নই। তুমি

এতদিন এসনি, তোমার দায়িত্ব আমি নিয়েছি, তোমার কায আমি করেছি; এখন তোমার কায তুমি নাও, আমায় মুক্তি দাও।"

জয়ন্তী হৃষ্ট গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "বল তো মা, বোকা মেয়েটাকে সেই কথাটাই বুঝিয়ে বল তো। আমার একটা কথা শোনে না, উল্টে ধমক দিয়ে ভয় দেখায়। তোমাদের কথায় যদি ওর জ্ঞানটা ফেরে তা হলে আমি যে বাঁচি।"

মনের আগুন নেভার সঙ্গে সঙ্গে শীতটাও আবার ঝাঁকিয়া ধরিল,—কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি উপরে চলিয়া গেলেন।

সীতা তাঁহার গতির দিকে তাকাইয়া ছিল, চোখ ফিরাইয়া যখন ইভার পানে চাহিল, তখন দেখিতে পাইল তাহার দু'টী চোখ অকস্মাৎ সজল হইয়া উঠিয়াছে।

ইভার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া সান্ত্বনার সুরে সীতা বলিল, "মায়ের কথায় রাগ হয়েছে, দুঃখ হয়েছে ভাই; ছিঃ রাগ করতে নেই। মা যা বলেন তা ভালর জন্যেই, মা কখনও সন্তানের অমঙ্গল কামনা করেন না, তা তো জানো?"

ইভার আরক্তিম ঠোঁট দু'খানা একবার কাঁপিয়া উঠিল; কি বলিতে গিয়া সে সামলাইয়া গেল, রুদ্ধকণ্ঠে শুধু বলিল, "এখনও কিছু জানতে পার নি দিদি। ভগবান সব জানাইবার জন্যেই যখন আমাদের এনেছেন, তখন সবই জানতে পারবে।"

সীতার হাত হইতে হাতখানা ছাড়াইয়া লইয়া সে আর একটীও কথা না বলিয়া উপরে চলিয়া গেল। সীতা তাহার কথা বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

উপর হইতে ঈশানীর ক্ষীণকণ্ঠের আহ্বান ভাসিয়া আসিল,—"সীতা!"

মনে পড়িল তাহাকে মসলা পিষিয়া দিতে হইবে। ঈশানীর ডাল ভাত বোধ হয় হইয়া আসিল।

তাড়াতাড়ি করিয়া ঘাটে গিয়া একবার প্রাতঃস্নান করা সত্ত্বেও আবার গোটা দুই ডুব দিয়া উপরে চলিয়া গেল। তাহাকে আবার স্নান করিয়া আসিতে দেখিয়া ঈশানী রাগ করিলেন, বলিলেন, "এই শীতে আবার স্নান করে এলে সীতা, কাপড় ছেড়ে ফেললে হতো না? দুবার স্নান সহ হবে?"

সীতা একটু হাসিয়া বলিল, "কি করব মা? ঘরে বিধবা আছেন, ঠাকুর আছেন, ঝির বমি মুক্ত করেছি, স্নান না করে কিছু ছোঁব কি করে? আপনি কিছু না বললেও আমার সংস্কার যে মনের মধ্যে কাঁটার মতন বিঁধবে মা?"

মুখখানা অত্যন্ত ভার করিয়া ডালে ফোড়ন দিতে দিতে ঈশানী বলিলেন, "তোমাদের যা বারণ করব, তোমরা তাই করে বসবে। আজ বাবাকে বলে দেব, এমনি অত্যাচার করতে সুরু করেছ, যাতে একটা ব্যারাম না ঘটিয়ে ছাড়বে না।"

সীতা আবার হাসিল, "দাদু কিছু বলতে পারবেন না মা! আপনার শাসনে যা ফল হবে, দাদুর শাসনে সে ফল হবে না।"

ঈশানী হাসিয়া বলিলেন, "আমার শাসনে তোমায় কষ্ট সইতে হবে বড় কম নয়—তা জেনে রেখো।"

সীতা নিঃশব্দে হাসিয়া মসলা পিষিতে বসিল। জয়ন্তী কাছেই বসিয়া তরকারী কুটিয়া দিতেছিলেন, এই স্নেহপূর্ণ কথাবার্ত্তাগুলা তাঁহার যে একটুও ভাল লাগে নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। তাঁহার মুখে বিরক্তির চিহ্নগুলা সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিতেছিল, একটা কাযের অছিলা করিয়া তিনি সেখান হইতে সরিয়া গেলেন।

২২

দিন যেমন আসিতেছিল, তেমনিই কাটিয়া যাইতেছিল। বাড়ীতে আরও যে দুইটি প্রাণী আসিয়াছে, এ খবরটা বিহারীলালের কাছে যেন অজ্ঞাত রহিয়া গেল। তিনি নিত্য যেমন সময় মত খানিকক্ষণের জন্য অন্দরে আসিতেন, তেমনিই আসিতেছিলেন, তাঁহার সেবার ভার আগে সীতার হাতে যেমন ছিল, তেমনিই রহিয়া গেল।

ইভা সীতার সহিত তাঁহার আহারের সময় এক এক দিন আসিত, বৃদ্ধ তাহার পানে একদিনও চোখ তুলিয়া চাহেন নাই। জয়ন্তী এতদিন অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া ঈশানীর পার্শ্বে আসিয়া বসিয়াছিলেন, বৃদ্ধ নিমেষের দৃষ্টিপাতে মুখখানা দারুণ ঘৃণায় বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছিলেন, একবার একটা কথাও বলেন নাই। তাঁহার যা কিছু কথাবার্ত্তা সবই চলিয়াছিল সীতার সহিত—আর সে সবই জমীদারী সম্পর্কীয়।

তিনি সেদিন জয়ন্তীর সম্মুখেই সীতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংসার খরচের আর টাকা কি হাতে আছে দিদি, না সব ফুরিয়েছে?"

সীতা বলিল, "আর নেই দাদু, গোটা দশেক টাকা মাত্র পড়ে রয়েছে।"

বৃদ্ধ একটু হাসিয়া বলিলেন, "সে কথাটা আমাকে জানাতে পারিস্ নি ভাই? আজ সুশীলকে বলে দেব, সে তোর হাতে টাকা দিয়ে যাবে এখন।"

সীতার হাতে সংসারের সমস্ত খরচপত্রের ভার, জয়ন্তীর বুকে অসহ্য জ্বালা ধরাইয়া দিতেছিল। বিহারীলাল আহার সমাপ্তে নিজের শয়নগৃহে যখন চলিয়া গেলেন, সীতাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেল। তখন ঈশানী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ভাগ্যে এই মেয়েটাকে পেয়েছিলেন ছোট বউ, তাই ওই বুড়ো এখনও বেঁচে আছেন। নইলে কি যে হতো তাই ভাবছি।"

মুখখানা অত্যন্ত কালো করিয়াই জয়ন্তী বলিলেন, "পরের মেয়েকে এ ভাবে রাখা আমি কোনমতেই ভাল বলতে পারি নে ভাই দিদি! ওর কি এ জগতে কেউ নেই?"

আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঈশানী বলিলেন, "আছে, মাসীমা, মাসতুতো ভাই, সবই। তারা নিয়ে যেতেও চায়; কিন্তু ও যেতে চায় না, আমরাও ছাড়তে চাই নে। মাসীমার এক দেওর-পো আছে, ছেলেটী বেশ শিক্ষিত। তার সঙ্গে সীতার বিয়ে দেওয়ার কথা তারা বলেছে। কিন্তু তা কি আর হতে পারে ভাই? সেদিন মা আমার কেঁদে আমার দু'টি পা জড়িয়ে ধরে বললে—'মা, আমার বিয়ে হয়ে গেছে, আপনারা আর আমার বিয়ে দেবার কথা মুখেও আনবেন না, আমি বিবাহিতা তাই মনে করুন।' কথাটা শুনে—সত্যি ভাই ছোটবউ, আমিও আর চোখের জল সামলাতে পারলুম না। যে ওকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে চলে গেছে, সেই হতভাগা ছেলেকে অভিশাপ না দিয়ে থাকতে পারলুম না। সে কি সুখী হবে ছোট বউ? আমার আর বাবার শেষ জীবনটাই না হয় কষ্ট দিলে, আর এই যে মেয়েটী এই তরুণ বয়সে সব সুখ আহ্লাদ সব হারিয়ে—"

বলিতে বলিতে তাঁহার দুই চোখ ছাপাইয়া দুইটী ফোঁটা জল হঠাৎ উপছাইয়া পড়িয়া গেল।

জয়ন্তী খানিকটা আড়ষ্টভাবে বসিয়া রহিলেন, একটু পরে শুধু হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু দিদি, জ্যোতির যে বউ হয়েছে, তাকে যদি একবার দেখতে—তা হলে বলতে বটে, হ্যাঁ, জ্যোতি পছন্দ করে বিয়ে করেছে বটে।"

ঘৃণাপূর্ণকণ্ঠে ঈশানী বলিলেন, "থাক ভাই ছোটবউ, আমায় যেন আর না দেখতে হয়, ভগবানের কাছে তাই প্রার্থনা করি। শিক্ষা বলতে তোমরা যা বোঝ ভাই ছোটবউ, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা তা বুঝি নে। যে শিক্ষা সংসারের কোন দরকারে লাগে না, যে শিক্ষায় মানুষকে কর্ম্মিষ্ঠ করে তুলতে পারে না,—অকর্ম্মণ্য করে শুধু দামী আসবাবের মত সযত্নে তুলে রেখে দেয়, সে শিক্ষাকে কি যথার্থ শিক্ষা বলে? রাগ করো না ভাই ছোটবউ, দু'পাতা ইংরাজী পড়লে তোমরা মনে কর সব হ'ল, আমরা তা মনে করি নে। আমরা বলি সিন্দুরশূন্য সিঁথের চেয়ে সিন্দুর-ভরা সিঁথে দেখতে ভাল; হিলতোলা জুতোর বদলে আলতাপরা পা দু'খানা দেখতে ভাল। চেয়ারে বসে বই পড়া কি সব সময়ে সাজে ভাই ছোটবউ,—রান্নাঘরে মাতৃমূর্ত্তিতে হাতা বেড়ি নিয়ে বসলে আরও ভাল দেখায়। সন্তানের পালনের ভার ঝি চাকরের হাতে না দিয়ে নিজে তাদের লালনপালন করা আরও দেখতে ভাল দেখায়। এই জন্যেই সীতাকে আমার বড় ভাল লাগে,—আমি তার মধ্যে আমার জগৎজননী মাতৃমূর্ত্তি দেখতে পাই।"

আঘাত পাইয়া বিবর্ণমুখে জয়ন্তী চুপ করিয়া গেলেন।

বৈকালে সুশীলবাবু কর্ত্তাবাবুর আদেশে সীতাকে খানকতক নোট দিয়া গেলেন। সীতা সেগুলা নিজের বাক্সে তুলিয়া রাখিল।

ঈশানীর শরীরটা আজ তত ভাল বোধ হইতেছিল না। সন্ধ্যা হইতেই তিনি শুইয়া পড়িলেন। জয়ন্তী তাঁহার পাশে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "তোমার যে রকম দেহ হয়েছে দিদি, তাতে দিন কতক অন্য যায়গায় গিয়ে থাকলে খুব ভাল হয়। এ রকম দেহ নিয়ে বেঁচে থাকাও ঝকমারি। সামান্য একটু হাওয়া বদল করলেই যদি ভাল হয়ে যাও দিদি, কেন তবে সাধ করে আর অসুখে ভোগা বল?"

ঈশানী মলিন হাসিয়া বলিলেন, "দরকারই বা কি ভাই ছোট বউ! আর এ দেহ টেনে নিয়ে বেড়াতে পারছিনে। ক্ষয় হতে হতে একদিন একেবারেই যায়, আমি তাই প্রার্থনা করি। ভাল হওয়ার প্রার্থনা আমি একদিনও করি নি—করবও না। যাদের বেঁচে থাকায় সুখ আছে, তারাই বেঁচে থাক ভাই। আমার বেঁচে থেকে কেবল

দুঃখভোগ করা—অশান্তি টেনে আনা বই তো নয় ভাই ছোট বউ। যার কেউ নেই,—স্বামী নেই, ছেলে নেই, সে আর কোন্ সুখের আশায় বেঁচে থাকবে বোন?"

আবেগে তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল। তিনি মুখখানা তাড়াতাড়ি অন্যদিকে ফিরাইয়া লইলেন।

অতিরিক্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া জয়ন্তী বলিলেন, "বালাই, ষাট,—ছেলে নেই ও কথা মনেও ভেব না দিদি। সোণার চাঁদ ছেলে তোমার; কয়টী মা এমন ছেলে পায় বল দেখি? তোমার পুত্র-সৌভাগ্য দেখে সকলেই হিংসে করে, বলে,—অনেক পুণ্য করলে তবে এমন ছেলে পাওয়া যায়। অমন রূপ, অমন গুণ, অমন দৃঢ়তা—সাহস আর একটী ছেলের দেখাও দেখি। যা তা বলে না দিদি, আপনার মনে বুঝে তবে কথা বল। ঝোঁকের বশে সে না হয় যাকে ভালবাসে তাকেই বিয়ে করেছে, না হয় বিলেতেই গেছে। তবু তো সে তোমারই ছেলে। শুধু খেয়ালের বশে সে যে কাজগুলো করেছে, তাই দোষ বলে ধরছো, তার গুণগুলো দেখতে ভুলে যাচ্ছো।"

ঈশানী মুদিতনেত্রে অনেকক্ষণ নীরবে পড়িয়া রহিলেন। তাহার পর ধীরকণ্ঠে বলিলেন, "সব ধরেছি ভাই, দোষ গুণ দু'টোই দেখেছি। গুণের চেয়ে দোষের পরিমাণ বড় বেশী হয়ে গেছে। সে যে কায করেছে, তাতে কোনদিনই যে তাকে আর কাছে পাব না—এই বড় দুঃখ।"

জয়ন্তী তীব্রস্বরে বলিলেন, "ওই তোমাদের বড় দোষ দিদি! অমনি তাকে আর কাছে নেবে না বলে ঠিক করে রেখেছ। সে এমন কি অপরাধ করেছে যে, তাকে আর কাছে নেবে না—চিরকালের জন্য দূরেই রাখবে?"

"অপরাধ?" ঈশানী উঠিয়া বসিলেন। ক্ষীণ চোখ দুইটী তাঁহার তীব্রভাবে জ্বলিয়া উঠিল। দৃপ্তকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "কি অপরাধ করেছে তা এখনও জানতে চাচ্ছো জয়ন্তী? তার জীবনের সব চেয়ে বড় অপরাধ—সে ধর্ম্ম ত্যাগ করেছে। এটাকে 'কিছু নয়' ব'লে উড়িয়ে দিতে চেয়ো না। ধর্ম্ম ছেলে-খেলার জিনিস নয় যে, একবার ফেলে দেওয়া যায়, আবার কুড়িয়ে নেওয়া যায়। তুমি বলবে সে প্রায়শ্চিত্ত করে আবার হিন্দু হতে পারে। কিন্তু কি দরকার তার সে প্রায়শ্চিত্তে? এই ধর্ম্মের উপর মানুষের মনুষ্যত্ব, দৃঢ়তা, সব নির্ভর করছে, তা বোধ হয় ভাব নি? যে এক কথায় ধর্ম্মত্যাগ করতে পারে, সে তো সবই করতে পারে তাকে কি আর বিশ্বাস করা যায় কখনও?"

কথা কয়টী বলিয়াই তিনি শুইয়া পড়িলেন।

জয়ন্তী আর সে বিষয়ে কথা বলা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিলেন না; নীরবে বসিয়া যেমন তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিলেন, তেমনি দিতে লাগিলেন।

সীতা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল, "এ কি মা, এই সন্ধ্যেবেলা শুয়েছেন কেন বলুন দেখি? উঠে বসুন, একটু বাদে শোবেন।"

ঈশানী উঠিলেন না। জয়ন্তী একটু বিরক্তভাবে বলিলেন, "সন্ধ্যেবেলা বলে' শরীর খারাপ হয়েছে যার তারও উঠে বসে থাকতে হবে, এমন কোন কথা নেই সীতা। দিদি খানিকটা শুয়ে আছেন থাকুন।"

সীতা বলিল, "সন্ধ্যেবেলা শুয়ে কাজ নেই কাকীমা। উঠুন বলছি মা, এখন কিছুতেই আপনি শুতে পাবেন না।"

ঈশানী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন। মুখখানা দেখিতে পাইয়া পাছে সীতা আবার এক কথা বলিয়া বসে, এই ভয়ে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা বৃথা হইল, সীতা তাঁহার সজল চোখ দুইটি দেখিতে পাইল।

"বেশ আক্কেল তো আপনার মা, এই সন্ধ্যে-বেলা চোখের জল ফেলছেন? আপনি কি জানেন না, সন্ধ্যেবেলা গৃহস্থের বাড়ী চোখের জল ফেললে অমঙ্গল হয়?"

ঈশানীর মুখখানা শুকাইয়া উঠিল। থতমত খাইয়া তিনি বলিলেন, "কই চোখের জল ফেলছি সীতা? তুমি ভাল করে না দেখেই আমায় এত বলছ।"

ঈশানীর ভয়ার্ত্ত ভাব আর সীতার অবাধ প্রভুত্ব জয়ন্তীর বড় অসহ্য বোধ হইতেছিল। তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আর কার জন্যে মঙ্গল অমঙ্গল বেছে চলবে সীতা? একটী মাত্র ছেলে চলে গেলে সকল মায়েই কেঁদে থাকে। সকাল-সন্ধ্যে বেছে, মঙ্গলামঙ্গল বুঝে কাঁদতে পারে কয়জন? মা তো হওনি বাছা, মায়ের যে কত জ্বালা সইতে হয়, তাও জানো না। মায়ের বুকে যখন ঘা লাগে, তখন আর সময় অসময়? পোষাকি কান্না যাদের, তারাই বেছে—সময় করে লোক-দেখানো কাঁদতে পারে। মায়ের কান্না তো সে রকম নয় বাছা।"

এমনভাবে গুছাইয়া কথা বলিবার ক্ষমতা ঈশানীর ছিল না; মনের কথাই জয়ন্তীর মুখে প্রকাশ হইতে শুনিয়া তিনি ভারী খুসি হইয়া উঠিলেন। সীতা তাঁহার মুখের পানে একবার তাকাইয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, "তবে আপনি খুব কাঁদুন মা; কেঁদে কেঁদে সত্যি যখন জ্বর আসবে, তখন একলাটী এই ঘরে পড়ে থাকতে হবে। আমি কখনো আপনার কাছেও আর আসব না, তা বলে দিয়ে যাচ্ছি।"

জয়ন্তী ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিয়া ঈশানীর পানে তাকাইয়া বলিলেন, "তোমরা ওকে বড্ড স্পর্দ্ধা দিচ্ছ দিদি, তোমাদের পর্য্যন্ত যা না তাই শুনিয়ে দিতে একটুও দ্বিধা বোধ করে না, তা দেখতে পাচ্ছি। যদি শিক্ষা জিনিসটা এর মধ্যে থাকত, তবে এ রকম ব্যবহার করতে পারত না। শিক্ষা নেই বলেই একটু স্পর্দ্ধা পেলে মাথায় উঠতে চায়।"

ক্ষীণ স্বরে ঈশানী বলিলেন, 'কি করব ভাই ছোট বউ, বাবা—"

বাধা দিয়া উগ্রভাবে জয়ন্তী বলিলেন,—"হ্যাঁ, বাবাই যে একে এতটা বাড়িয়ে তুলেছেন, তা আমি একবার দেখেই বুঝতে পেরেছি। সীতা নইলে একটী মিনিট তাঁর চলবার যো নেই, এমনিই তাঁর ভাব। আচ্ছা, এই যে জমীদারীর কাযকর্ম্ম ওকে সব দেখাচ্ছেন শিখাচ্ছেন, এ সব বুঝলে-শিখলেও সে বোঝা-শেখার ওর লাভ হবে কি? আর এক কথা—দেখছি, তোমাদের সব বাক্স সিন্ধুকের চাবি সব ওর হাতে, সংসারের খরচপত্র সব ওর হাতে। এগুলো তোমার নিজের হাতে রাখলে কি হতো ভাই দিদি?"

ঈশানী উপুড় হইয়া পড়িয়া মাথার বালিশের মধ্যে মুখখানা গুঁজিয়া দিলেন। সীতার বিরুদ্ধে যে কেহ কোন কথা বলিতে পারে, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

জয়ন্তী বলিয়া চলিলেন, "শুনছি আজ ওর মাসতুতো ভাই এসেছে। তুমি কি মনে কর দিদি, এই খরচের মধ্যে থেকে মন করলে কিছু সরিয়ে সীতা তার হাতে দিতে পারে না? হাজার হোক সে ওর আপনার। আজ যদি তোমাদের এখানে যায়গা না হয়, কাল ওকে মাসীর বাড়ী গিয়ে থাকতেই হবে। এই সব খরচপত্রের যে একটা হিসেব রাখা—তাও তোমাদের নেই। আমি বলি দিদি, ইভার হাতে খরচ দিলেই হয়। আমার দাদা সংসারের খরচপত্র করবার ভার ইভুর হাতে দিয়েছিলেন, সেখানে ওই যা যতক্ষণে করবে, হিসেবের এতটুকু ভুল কখনও হয় নি। হাজার হোক সে শিক্ষা পেয়েছে আর এ সব তার নিজেরই জিনিস, সে কি অনর্থক একটী পয়সা ব্যয় করতে পারে? টানটা তার যতটা হবে, তুমি আমি ছাড়া আর কারও কি তেমনটা হবে বলে মনে কর তাই দিদি?"

ঈশানী নিস্তব্ধে পড়িয়া রহিলেন। তাঁহার কোন সাড়া না পাইয়া জয়ন্তী মনে করিলেন, তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। দাসী খানিক আগে দেয়ালে আলো জ্বালাইয়া খুব কম করিয়া দিয়া গিয়াছে, তাহার ক্ষীণ আলোতে তাকাইয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন না—ঈশানী ঘুমাইয়াছেন অথবা জাগিয়া আছেন।

একবার ডাকিলেন, "দিদি,—"

ঈশানী উত্তর দিলেন না, একবারও নড়িলেন না। তাঁহার নিদ্রা বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া জয়ন্তী তাঁহার শয্যাত্যাগ করিলেন।

সে রাত্রিটা কাটিয়া গেল; সীতা যেমন হাসিমুখে কর্ত্তব্য কায করিত, তেমনি করিয়া যাইতে লাগিল।

সকালে সে কি মনে করিয়া একবার ইভার ঘরে প্রবেশ করিল। ইভা তখন ষ্টোভে চায়ের জল বসাইয়াছে, জয়ন্তী ও সে উভয়ে চা খাইবেন। এ বাড়ীতে চায়ের চলন ছিল না, জ্যোতির্ম্ময় যখন আসিত, তখন তাহার জন্য মাত্র চা হইত।

অসময়ে সীতাকে আসিতে দেখিয়া ইভা আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া বলিল, "আজ সীতাদি সকালবেলাই এ ঘরে যে? চা খাবে একটু,—দেব?"

সীতা হাসিয়া বলিল, "না ভাই, এখানে এসে পর্য্যন্ত চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। আর ওসব না খাওয়াই ভাল। ভারি বদ্ অভ্যাস।"

ইভা বিস্ময়ে বলিল, "ছাড়তে কষ্ট হল না তোমার?"

সীতা বলিল,—"কষ্ট কি ভাই? মনে করলে সামান্য একটু কষ্টকে বিরাট কষ্ট বলে ধরা যায়; আবার মনে করলে কিছু কষ্টবোধ হয় না। আমার এই ছোট্ট ত্যাগটীতে একটুও কষ্ট হয়নি ভাই, এর চেয়ে আরও বড় ত্যাগ আমায় করতে হবে। কাযেই ছোটর দুঃখে অভিভূত থাকলে আমার চলবে কেন? এ জীবনে অনেক অভ্যাস ছিল ভাই, একে একে সব ছেড়ে দিয়েছি। এখন আমি খুব সহজের

ওপর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে পারি। যাক ও সব কথা। আমি যে চা খেতে আসিনি, এ ঠিক জেনো। সুতরাং তোমায় আমার জন্যে ব্যস্ত হতে হবে না। আমি একটা দরকারে এসেছি,—তোমার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে।"

কৌতূহলাক্রান্তা ইভা বলিল, "তোমার আবার কি বিশেষ কায আছে সীতাদি,—তোমার হাতে ও সব কি?"

সীতা নোটের গোছা তাহার সামনে মাটীতে রাখিয়া বলিল, "তোমার মাথায় একটা দায়িত্ব চাপাতে এসেছি ভাই, কিছু মনে করো না। আমি একা মানুষ, কোন্ দিকে কি করি বল। একদণ্ড হাঁফ ছাড়বার যো আমার নেই। ভাবলুম, আমার বোঝার খানিকটা ভাগ তোমায় দেই। তাই অনেক ভেবে ঠিক করে সংসারের খরচটা তোমার হাতে দিতে এসেছি। শুনেছি, তুমি মামার বাড়ীতে খরচ হাতে রাখতে; এখানেও সেই কায তোমায় করতে হবে।"

ইভা সগর্জ্জনে মাথা নাড়িল। ব্যাপারটা সে চকিতে বুঝিয়া লইল। এই ব্যাপারে, নিশ্চয়ই তাহার মায়ের কটাক্ষপাত আছে। নহিলে হঠাৎ কেন আজ সীতা এগুলি আনিয়া তাহাকে হাতে লইবার জন্য জোর করিতেছে? আজ দুই তিন মাস তাহারা এখানে আসিয়াছে,—একদিনও সীতা তো তাহাকে একখানা কাযের ভার দিতে চায় নাই।

সে বলিল, "ও ভার আমি নিতে পারব না দিদি। শুধু দাদুর ভার নেওয়া আর এই ভারটী ছাড়া আমি সব কাযের ভার নেব। তোমার পোষা জন্তুদের দেখব, জ্যেঠিমাকে দেখব, তাঁর রান্নার যোগাড় করে দেব; আর যা কিছু তোমার কায সব আমি করব; করতে পারব না শুধু এই দু'টো কায।"

সীতা একটু হাসিয়া বলিল, "দাদুর ভার নেবে না কেন?"

ইভা উত্তর দিল, "তোমার মত করে দাদুর সেবা আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না।"

"আমি চলে গেলে তো এ সব ভার তোমাকেই নিতে হবে ইভা, তখন তোমাকেই তো দাদুকে দেখতে হবে।"

সীতার কণ্ঠস্বর বড় কোমল।

ইভা দুইটী চোখের দৃষ্টি তাহার মুখের উপর তুলিয়া ধরিয়া বিস্ময়ে বলিল, "তুমি কোথায় যাবে দিদি?"

সীতা বলিল, "আমার দাদা আমায় নিতে এসেছেন, তা জানো তো? আমি দিন কতক সেখানে যাব ভাবছি, আর এখানে থাকতে ভাল লাগছে না। আমি গেলে, এই সব কাজই তো তোমায় করতে হবে ইভা।"

ইভা তাহার হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া সগর্ব্বে বলিল, "হ্যাঁ, তুমি যাবে বই কি? তোমায় আমরা যেতে দিলে তবে তো যেতে পারবে দিদি, জোর করে তো যেতে পারবে না। আমি তোমায় এই দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে রাখব,—কার ক্ষমতা তোমায় আমার কাছ হতে ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাই দেখব।"

সে দুই হাতে সীতার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার স্কন্ধের উপর মুখখানা রাখিল; দুইজনের চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে চোখ মুছিয়া তাহার বাহুবন্ধন হইতে নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া জোর করিয়া মুখে একটু হাসি টানিয়া আনিয়া সীতা বলিল, "ভাল; যেতেও দেবে না, শক্ত যে দু'টো কায তার একটাও নেবে না,—তবে আমি পারব কি করে?"

ইভা বলিল, "বেশ, খরচপত্রের ভার, আমি নিচ্ছি। তা বলে দাদুর ভার আমি কক্ষনো নিতে পারব না—এ ঠিক করে বলে দিচ্ছি।"

"তবে দাদুর গিন্নি কি করে হবে ইভু?"

বলিয়া হাসিতে হাসিতে সীতা ইভার গণ্ডে টোকা দিল।

ইভা মুখ ভার করিয়া বলিল, "আমি ওই সত্তর বছরের বুড়োর গিন্নি হতে চাই নে দিদি, তুমিই জন্ম জন্ম গিন্নি হয়ে থাক।"

সীতা বলিল, "তা বেশ, আমিই গিন্নি হয়ে থাকব। তুমি এই নোটগুলো তুলে রাখ তো ইভা। তারপর দুপুর বেলায় আমাদের গল্প হবে এখন।"

সীতা বাহির হইতেছিল, সেই সময়ে জয়ন্তী ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে মেঝের উপর কতকগুলি নোট দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "এ টাকা এল কোথা হতে, কে নিয়ে এল?"

সীতা উত্তর দিল, "আমিই এনেছি কাকীমা। আমি কাল দাদুকে বলেছিলুম, আমার দাদা এসেছেন, দিনকতক মাসীমার কাছে কল্যাণপুরে যাব। দাদু তাই শুনে এখন হতে খরচপত্রের ভার ইভার হাতে দেওয়ার কথা বলেছেন। ম্যানেজার দাদা যখন টাকা এনে দিলেন, তখন ইভু

কাছে ছিল না, আমারও ভারি তাড়াতাড়ি ছিল—কাষেই ওর হাতে তখনই দিতে পারিনি। আজ সকালেই আগে দিতে এসেছি। সব বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিয়ে গেলুম, এখন হতে ইভাই সংসারের খরচপত্র চালাবে।"

অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া জয়ন্তী বলিলেন, "ঠিক ব্যবস্থা করেছ মা। ইভা আমার—হাজার হোক, শিক্ষিতা মেয়ে। বে-আন্দাজি খরচ যে সে করে না, তা এক মাস ওর হাতে খরচ দিয়েই বাবা বুঝিতে পারবেন। খরচ এলোমেলো ভাবে করে গেলেই তো হয়না মা, ওর আবার ঠিকঠাক হিসেবেও দেওয়া চাই, নইলে কি হয়? তুমি মা—খরচ শুধু করেই যাও, হিসেবপত্র রাখবার যোগ্য বিদ্যা তোমার নেই। সামান্য বিদ্যায় কি হিসেব রাখা চলে বাছা? হ্যাঁ,—তুমি বাছা নিশ্চয়ই আমাদেরই মত মোটামুটি পড়াশুনা করেছ, সে দেখলেই জানা যায়।"

সীতা শান্ত মুখে বলিল, "তাই নয় তো কি কাকীমা, আমাদের মত লোকের ঘরে মেয়েরা আর কত খানিই বা লেখাপড়া করতে পারে? মোটামুটি পত্র পড়তে লিখতে পারি,—ওই আমাদের পক্ষে খুব বেশী। হিসেবপত্র রাখা কি এই বিদ্যায় চলে? ইভা যে ঠিক হিসেব রাখবে, এ আমি ঠিক জানি।"

সীতার এই নিছক অজ্ঞতার ভাণ ইভার বড় অসহ্য বোধ হইতেছিল। সীতা যে কতখানি পড়িয়াছে, অঙ্কশাস্ত্রে কতখানি তাহার দখল আছে, তাহার পরিচয় ইভা পাইয়াছিল। মা জানেন না—এই ম্যাট্রিক পাস মেয়েটী ঘরে বসিয়া যে পড়া করিয়াছে, তাহাতে সে তাঁহার কন্যাকে বি-এ ক্লাস পর্য্যন্ত শিক্ষা দিতে পারে। সে অনেকবার কথাটা বলিতে গিয়াছিল; কিন্তু সীতা মাথার দিব্য দেওয়ায় সে একটা কথাও বলিতে পারে নাই। আজও সে গুম হইয়া রহিল, একটা কথা কহিল না। হাসিভরা একটা উজ্জ্বল কটাক্ষ তাহার মুখের উপর বুলাইয়া দিয়া সীতা ভারি নিশ্চিন্ত হইয়া চলিয়া গেল।

২৩

প্রশান্ত জ্যোতির্ম্ময়ের সহিত এক ক্লাসেই পড়িয়াছে। সে যে সীতার ভাই, সে পরিচয় জ্যোতির্ম্ময় কখনও পায় নাই, প্রশান্তও দেয় নাই। সে মনে মনে একটা কৌতুককর কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল। যখন বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্রখানা আসিবে এবং তাহার পর বররূপে জ্যোতির্ম্ময় যখন সীতাকে বিবাহ করিতে বসিবে, তখন অকস্মাৎ সে শ্যালকরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া ভগিনীপতিকে আশ্চর্য্য করিয়া দিবে, এই ছিল তাহার অভিপ্রায়।

এই কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করিবার জন্যই সে এত কাল রামনগরে সীতাকে একবার দেখিতেও যায় নাই। তবে পত্রাদি কখনও বন্ধ থাকে নাই; এবং সেই সব পত্রে সে তাহার ডাকনাম একটা ব্যবহার করিত,—সেই পোষাকি ভব্যযুক্ত নামটা ব্যবহার করিত না।

দেবযানীর সহিত জ্যোতির্ম্ময়ের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র পাইয়া তাহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সীতার পিতার মৃত্যুর পরেই বিহারীলাল সীতাকে রামনগরে লইয়া যাইবার জন্য নিজের ম্যানেজার এবং সীতার সম্পর্কীয় দাদা সুশীল বাবুকে পাঠাইয়া দিলেন, তখন প্রশান্ত বা তাহার মাতা আপত্তি করিতে পারিলেন না। বাগ্‌দত্তা এই মেয়েটীর আনুপূর্ব্বিক বিবরণ তাঁহারা জানিতেন; সেই জন্যই প্রশান্ত নিজে উদ্যোগী হইয়া সীতাকে রামনগরে পাঠাইয়া দিয়াছিল।

দেবযানীর সহিত জ্যোতির্ম্ময়ের বিবাহের পত্রখানা প্রশান্তের বুকে একটা অনুভূত যন্ত্রণার সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রশান্ত দুই হাতের মধ্যে মাথাটা রাখিয়া ভাবিতে লাগিল। আজ তাহার মনে পড়িল—মা বলিয়াছিলেন, বিবাহের পূর্ব্বে সীতাকে রামনগরে পাঠানো উচিত নয়। তিনি প্রথমটায় তাহাকে যাইতে দিতে রাজি হন নাই,—কেবল মাত্র প্রশান্তের জেদে পড়িয়া তিনি মত দিয়াছিলেন। সীতাকে প্রত্যাখ্যান করার অপমান আর কাহারও প্রাপ্য নয়, একমাত্র তাহারই। সীতা বালিকা মাত্র,—তাহাকে যাহা বলা হইয়াছে, সে তাহাই করিয়াছে। প্রশান্ত যদি বিশেষ উদ্‌যোগী হইয়া তাহাকে না পাঠাইয়া দিত, সীতা যাইত না—এই দারুণ অপমান তাহা হইলে কাহাকেও সহ্য করিতে হইত না।

এ বিবাহে প্রশান্ত যে উপস্থিত হয় নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। নিদারুণ অপমানে মর্ম্মাহত প্রশান্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, জীবনে সে আর কখনও জ্যোতির্ম্ময়ের মুখদর্শন করিবে না। বিবাহের পরে বিলাত যাইবার আগে জ্যোতির্ম্ময় তাহার প্রিয়তম বন্ধুকে ডাকিবার জন্য দু'বার লোক পাঠাইয়াছিল; অবশেষে নিজে একদিন তাহার মেসে গিয়াছিল,—প্রশান্ত তাহার সহিত দেখা করে

নাই। এই বর্ব্বর প্রকৃতির লোকটার সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছিল এবং ইহারই বাড়ীতে সে নিজের বোনকে পাঠাইয়া দিয়াছে, ইহাই ভাবিয়া সে ভারি অনুতপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

জ্যোতির্ম্ময়ের বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্রখানা পাইয়াই সে সীতাকে এক পত্র দিল—তোমার আর ওখানে থাকার আবশ্যকতা নাই, আমি শীঘ্রই তোমাকে লইয়া আসিব।

এই পত্র পাইয়া সীতা উত্তর দিল, সে এখন যাইতে পারিবে না; কারণ, জ্যোতির্ম্ময়ের ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ও বিলাত যাওয়ার কথা শুনিয়া তাহার মা ও দাদু অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। ইঁহারা একটু সুস্থ না হইলে সে যাইতে পারিতেছে না।

এই পত্র পাইয়া প্রশান্ত ভারি চটিয়া গিয়াছিল। যাহাদের সহিত কোন সম্পর্ক নাই, তাহাদের জন্য সীতার এ মাথাব্যথা কেন?

সে সীতার বিবাহ-সম্বন্ধ ঠিক করিতে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিল। তাহার এমন বোন, ইহার না কি পাত্রের অভাব? জ্যোতির্ম্ময়ের চেয়ে অনেক ভাল ছেলে আছে, যাহারা সীতার মত মেয়েকে পত্নীরূপে পাইলে নিজেদের জীবন সার্থক মনে করে।

প্রশান্তের অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রণব প্রশান্তের সহিত প্রায়ই বিনয়বাবুর বাড়ী যাতায়াত করিত—সেই সময়ে সে সীতাকে দেখিয়াছিল। একদিন প্রশান্তের মুখে সে শুনিয়াছিল সীতা বাগ্‌দত্তা; তাহাতেই সে সাহস করিয়া কোন কথা একদিনও বলিতে পারে নাই। প্রশান্তের মুখে সীতার বিবাহ-ভঙ্গের কথা শুনিয়া সে প্রথমটা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তাহার পর সব ব্যাপার শুনিয়া সে প্রথমে উত্তেজিত ভাবে জ্যোতির্ম্ময়কে গালাগালি করিল। তাহার পর সলজ্জ ভাবে জানাইল, সে সীতাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত; যদি প্রশান্তের মত হয়, তবে সে আগামী মাসের প্রথমেই এই বিবাহ কার্য্যটা শেষ করিবার জন্য ছুটি লইয়া যাইতে পারে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রশান্ত ভারি খুসি হইয়া বন্ধুকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল। প্রণব ধনীর সন্তান, সংসারে মা ব্যতীত আর কেহ নাই। মায়ের অত্যন্ত আদরের সন্তান বলিয়া তাহার আবদারও যথেষ্ট ছিল, সে যাহা ধরিত তাহা করিতই।

প্রণবের সহিত বিবাহের কথাবার্ত্তা ঠিক করিয়া ফেলিয়া প্রশান্ত সীতাকে আর একখানা পত্র দিয়া তাহার উত্তর পাইবার প্রতীক্ষা না করিয়াই প্রণবকে লইয়া রামনগরে রওনা হইল।

তাহাদের দুইটি বন্ধুকে দেখিয়া বিহারীলালের মুখে কে যেন কালি ঢালিয়া দিল। প্রথম কয়েক মুহূর্ত্ত তিনি একটি কথাও বলিতে পারিলেন না; নির্ব্বাকে শুধু চাহিয়া রহিলেন। প্রশান্ত তাঁহাকে প্রণাম করিল, তিনি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেও ভুলিয়া গেলেন।

খানিক বাদে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি বলিলেন, "সীতা দিদি কাল তোমার পত্র পাওয়া মাত্র উত্তর দিয়েছে, সে পত্র বোধ হয় তুমি পাওনি প্রশান্ত?"

প্রশান্ত নম্রভাবে বলিল, "না; আপনাদের এখান হতে পত্র যায় তিন দিনে—সম্ভবতঃ সে পত্র কাল পাওয়া যাবে। কিন্তু পত্র দেওয়ার আর দরকার ছিল না—আমি লিখেছিলুম তো, যে, আমরা এখানে এসে পৌছাব?"

বিবর্ণ মুখে বিহারীলাল বলিলেন, "হাঁ হাঁ—তাই বটে···তাই বটে। আচ্ছা বস তোমরা—আমি ভেতরে যাচ্ছি, দিদিকে খবর দেব এখন।"

আদেশের প্রতীক্ষায় রাখাল দরজার নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল, তাড়াতাড়ি সে অগ্রসর হইয়া আসিল। কিন্তু বিহারীলাল তাহাকে আদেশ না দিয়া নিজেই উঠিলেন। আসল কথা—সীতা চলিয়া যাইবে, এই কথাটা শুনিয়া তাঁহার হৃদয় বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি খানিক নির্জ্জনে থাকিয়া অশান্ত মনকে সান্ত্বনা দিতে চান, মুখ-চোখের বিকৃত ভাবটা বদলাইয়া ফেলিতে চান।

রাখাল তাড়াতাড়ি খড়ম-যোড়া ফিরাইয়া দিল,—তিনি খড়ম পায়ে দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। * * *

বেলা তখনও নয়টা বাজে নাই; সীতা সবেমাত্র স্নান সমাপ্ত করিয়া সাজি ভরিয়া বাগান হইতে পূজার ফুল তুলিয়া আনিতেছিল। আজ ঘুম হইতে উঠিতে তাহার অন্য দিন অপেক্ষা বিলম্ব হইয়া গিয়াছে—বাড়ীর একটী ভৃত্যের অসুখ লইয়া কাল তাহাকে রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিতে হইয়াছিল। আজ যখন সে শয্যাত্যাগ করিয়াছিল, তখন বেলা আটটা বাজিয়া গিয়াছিল, ঈশানীর আদেশে কেহ তাহাকে ডাকে নাই,—কর্ত্তাবাবুও আজ প্রাতে সীতার দেখা পান নাই।

সম্মুখেই বিহারীলালকে দেখিয়া সীতা থমকিয়া দাঁড়াইল,—"এ কি দাদু, আপনি আজ এখনিই

চলে—" বলিতে বলিতে সে থমকিয়া গিয়া তাঁহার মুখের পানে ভাল করিয়া চাহিল; উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল, "আপনার মুখখানা ওরকম দেখাচ্ছে কেন দাদু, অসুখ হয় নি তো?"

জোর করিয়া মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বিহারীলাল বলিলেন, "না ভাই, অসুখ করে নি,—তোর দাদা তোকে এখান হতে নিয়ে যেতে এসেছে সীতা, তাই বলতে এসেছি।"

"আমার দাদা—"

চকিতে সীতা যেন সব বুঝিতে পারিল,—কেন যে দাদুর মুখখানা অতটা অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, তাহাও সে বুঝিতে পারিল। সীতার মুখখানা বড় মলিন হইয়া উঠিল। হাতের সাজি নামাইতে ভুলিয়া গিয়া সে উদাস দৃষ্টিতে কোন্ দিকে তাকাইয়া রহিল।

বেদনাভরা সুরে বৃদ্ধ বলিলেন, "হয় তো কালই তোকে নিয়ে যাবে ভাই,—কাল হতে আর তোকে পুজোর যোগাড় করতে হবে না, বুড়োর সেবাও করতে হবে না। তুই অনেক কাযের দায় হতে মুক্তি পাবি ভাই, কিন্তু আমি থাকব কি নিয়ে, একবার ভাব দেখি? আমার বলতে যেটুকু এখনও অবশিষ্ট আছে, সবই যদি তুই নিয়ে যাস দিদি, কি করে এই শূন্যতা নিয়ে আমি বেঁচে থাকব?"

সুরটা বড় বিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল,—বিহারীলাল তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন।

"বলতে পারিস সীতা, কত মহাপাপ করেছি, কার বুক হতে শ্রেষ্ঠ ধন ছিনিয়ে নিয়েছি, যার শাস্তি আমায় এমন করে বইতে হচ্ছে? সে মহাপাপ আমার এ জন্মের, না পূর্ব্বজন্মের, একবার বলে দে তো ভাই। কত পাপ করেছি, যার ফলে আমায় নিজের হাতে বুকের এক একখানি পাঁজরা খসিয়ে দিতে হচ্ছে? আমার বলে যাকে ধরি, সেই ফাঁকি দিয়ে চলে যায়,—রেখে যায় দগ্ধ করবার জন্যে স্মৃতিখানা, ওরে ভাই, যদি তোদের সব নিয়েই তোরা চলে যাবি, স্মৃতি কেন দিয়ে যাস বল্ দেখি? তোদের যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোদের পায়ের দাগও মুছে নিয়ে চলে যা। আমায় যেন সেই দাগ দেখে জীবনান্ত-কাল পর্য্যন্ত হাহাকার করে কেঁদে না বলতে হয়—আমিই একা পড়ে আছি। যা কিছু সুন্দর, যা কিছু পূর্ণতা, সব চলে গেছে,—এখন যা পড়ে আছে, সব শূন্য—বিরাট ফাঁকি। ওরে, তোরা তোদের সব নিয়ে চলে যা, সব নিয়ে যা—আমি একলা পড়ে থাকব আপনাকে নিয়ে।"

বৃদ্ধের চোখের জল আর কিছুতেই আটক রহিল না; হঠাৎ তাহা উপচাইয়া শুষ্ক গণ্ড বাহিয়া পড়িল। আত্মগোপন মানসে তিনি তাড়াতাড়ি পার্শ্ববর্ত্তী নিজের ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

সেই ভাঙ্গা বুকের বেদনাভরা কথাগুলা বাতাসে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া সীতার বুকে আঘাত করিতে লাগিল। অন্যমনা সীতার হাত হইতে ফুলভরা সাজি মাটীতে কখন পড়িয়া গিয়া চারিদিকে ফুলগুলি ছিটকাইয়া পড়িল। সীতা ডাকিল—"দাদু—"

দাদু তখন দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া বিছানার উপর শুইয়া দুই হাতের মধ্যে মুখ লুকাইয়া পড়িয়া ছিলেন। যদি তিনি দুর্ব্বলচিত্তা নারী হইতেন, কাঁদিয়া মনের ভার কতকটা হাল্কা করিতে পারিতেন। হায় রে, বুক কাটিয়া যায়, তথাপি তিনি তো মুক্তকণ্ঠে কাঁদিতে পারিলেন না।

আজ অনেক দিনের পুরাতন কথা মনে পড়িতেছিল—আমিই শুধু রইনু বাকি। বুকের হাহাকার গোপন থাকিতে চাহিতেছিল না, উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে চাহিতেছিল। দুই হাতে আর্ত্ত বক্ষটা চাপিয়া ধরিয়া মুক্তকণ্ঠে তিনি ডাকিতে লাগিলেন —"ওরে, তোরা কেউ এতটুকু দয়া করলি নে, সবাই আমায় ফেলে একে একে পালিয়ে গেলি? বুড়ো বাপকে তোদের এখানে ফেলে রেখে গেলি—সে কি শুধু এই জ্বালা-যন্ত্রণাগুলো সইবার জন্যেই? এখন আমায় ডেকে নে তোরা—তোদের পাশে আমায় নে—আমি আর সইতে পারছি নে।"

হায় রে, তিনি তো তাহাদের কোন দিন এতটুকু পীড়ন করেন নাই। কত পিতা সন্তানকে তিরস্কার করেন, প্রহার করেন; তিনি কোন দিনই তাহাদের একটী কথাও বলেন নাই। তবে কেন তাহারা চলিয়া গেল? বুকের যত স্নেহ, যত ভালবাসা, সবই নিঃশেষে তাহাদের উপর ঢালিয়া দিয়াছিলেন। তখন স্বপ্নেও জানিতে পারেন নাই—তাহারাই তাঁহাকে এমন করিয়া ফাঁকি দিয়া পলাইবে।

আজ তাঁহার অন্তরের অন্তরতম স্থানে ধ্বনিত হইতেছিল—

'আমার বলে ছিল যারা
আর তো তারা দেয় না সাড়া
কোথায় তারা—কোথায় তা'রা
বারে বারে কারে ডাকি?'

ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, এগারটা প্রায় বাজে, এখনও পূজার যোগাড় হয় নাই; তিনি পূজা করিবেন কখন? এ বাড়ীতে এ রকম তো কখনও হয় নাই। আজ সীতা মা কি এখানে নাই?

সীতা ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পড়িল। তাই তো—এ ফুল সব যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে,—দেবপূজায় আর লাগিবে না। সে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আর একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া আবার ফুল তুলিতে ছুটিল। তাড়াতাড়ি কতকগুলা ফুল তুলিয়া আনিয়া সে ক্ষিপ্রহস্তে পূজার যোগাড় করিয়া দিল।

বৃদ্ধ যদুনাথ ভট্টাচার্য্য আসনের উপর বসিয়া প্রীত মনে শিখা দুলাইয়া বলিলেন, "তাই তো বলি, সীতা মা ভিন্ন এমন পরিপাটী করে পূজোর যোগাড় করতে কি কেউ পারে? কর্ত্তাবাবু বলেন, সীতা মার হাত দু'খানি ভারি সুন্দর, তাই হাতের কাযগুলো অত সুন্দর হয়ে ওঠে—সে কথা খুব সত্য। কাল অনেক রাত জেগে চাকরটাকে বাঁচিয়ে তুলেছ মা,—নইলে তার যে কি হতো, তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে। জানো মা, মানুষ চেনা যায় অন্তর দিয়ে, বাইরের রূপ কিছুই নয়। অন্তর যার কালো, তার বাহিরটা সুন্দর হলেও, তার তুলনা হতে পারে নির্গন্ধ শিমুলফুলের সঙ্গে, আর কিছুর সঙ্গে নয়। তুমি অত জড়সড় হয়ে পড়লে কেন মা লক্ষ্মী, আমি তোমার প্রশংসা করছি বলে কি? জ্যোতি হেলায় রত্ন হারালে। হীরে ফেলে কাচ তু'লে নিয়েছে। এর জন্তে যদি একদিন তাকে অনুতাপ না করতে হয়, তবে আমি ব্রাহ্মণের সন্তান নই।"

মুখখান লাল করিয়া ফেলিয়া সীতা বাহির হইয়া গেল।

বিহারীলালের রুদ্ধ দরজায় আঘাত করিয়া সে ডাকিতে লাগিল—"দাদু, দরজাটা একবার খুলে দিন।"

বিহারীলাল উত্তর দিলেন না।

সীতা উদ্বিগ্ন ভাবে আবার ডাকিল, "দরজাটা একবার খুলে দিন দাদু, বড় দরকার আমার।"

তথাপি তিনি নীরব।

অঞ্চলে চোখের জল মুছিয়া সীতা চলিয়া গেল। রাখালকে ডাকিয়া বলিল, "আমার দাদাকে আমার নাম করে এ ঘরে ডেকে নিয়ে এসো রাখাল।"

রাখাল বলিল, "আর একটী বাবু এসেছেন, তাঁকেও আনব কি?"

সীতা বলিল, "না, শুধু দাদাকে ভেতরে ডেকে আন। তাঁর ভাল ভাবে থাকবার বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়েছে তো?"

রাখাল বলিল, "কর্ত্তাবাবু ম্যানেজার বাবুকে সব বলে দিয়েছেন,—ম্যানেজার বাবু বন্দোবস্ত করে দেবেন।"

সীতার আদেশে রাখাল প্রশান্তকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া আনিল।

বহুদিনের পর প্রশান্ত সীতাকে দেখিতে পাইল। দুই বৎসর পূর্ব্বে সে যে সীতাকে দেখিয়াছিল, এ যেন সে সীতা নয়। দুই বৎসর পূর্ব্বে সীতা ছিল লঘুপ্রকৃতির বালিকা,—তাহার মুখখানা নির্ম্মল হাসিতে পূর্ণ ছিল। আজ সীতার মুখে সে হাসি নাই,—তাহার ললাটে যেন চিন্তার রেখা পড়িয়াছে। সে চপলতা নাই,—সে অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। এই বয়সেই সে যেন অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, তিন সময়কেই দেখিয়াছে,—বর্ত্তমান ছাড়িয়া ভবিষ্যৎ লইয়া আলোচনা করিতেছে। প্রশান্ত একটা নিঃশ্বাসকে কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে পারিল না,—তাহার সমস্ত বুকখানা দলিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বহিয়া গেল।

সীতা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, পায়ের ধূলা মাথায় দিল; তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। স্নেহভরা দৃষ্টি তাহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল আছিস সীতা?"

সীতা একটু হাসিল, বলিল, "হ্যা; তুমি ভাল আছ, মাসীমা ভাল আছেন?"

প্রশান্ত উত্তর দিল, "আমরা বেশ আছি। কিন্তু তুই যে বললি, ভাল আছি,—এটা আমার বিশ্বাস হ'ল না। বছর দুই আগে তোকে যেদিন আমি ট্রেণে উঠিয়ে দিয়ে গিয়েছিলুম, সে দিন তোর যে চেহারা ছিল, আজ তার অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। আমি যদি তোর নাম এখন না জানতে পারতুম, তা হলে হয় তো চিনতেও পারতুম না। তুই আগেকার চেয়ে একহাত লম্বা হয়েছিস, বড্ড রোগা হয়ে গেছিস। তোর চোখ দু'টো শুধু মুখখানার ওপরে ভাসছে। মুখখানা লম্বা হয়ে গেছে। গায়ের গোলাপের মত রংও ময়লা হয়ে গেছে। নিজের মুখখানা কখনও দেখেছিস কি সীতা?"

সলজ্জভাবে সীতা বলিল, "বাঃ, মানুষ লম্বা হলে

রোগা হয়ে যায়, এ কথা বুঝি তুমি জানো না। আমি আগেকার চেয়ে কতখানি লম্বা হয়েছি দেখেছ তো?"

প্রশান্ত মাথা দুলাইয়া বলিল, "তা বেশ দেখছি। আমি তোকে নিয়ে যেতে এসেছি, তা বোধ হয় জেনেছিস? এখানে তোকে রাখার জন্যে অনেকে অনেক কথা বলছে। জ্যোতির সঙ্গে তোর বিয়ে হবে, এই কথা জেনেই তোকে এখানে পাঠিয়েছিলুম। তার তো কিছুই হল না। সে যখন অন্যকে বিয়ে করে চলে গেল, তখন তোকে এখানে ফেলে রেখে লোকের ঠাট্টা-বিদ্রূপ সইবার দরকার আমার নেই। মাও এর জন্যে আমায় খুব বকছেন। এবার তোকে সঙ্গে করে না নিয়ে গেলে, তিনি আমায় বাড়ী ঢুকতে দেবেন না, আমার মুখও দেখবেন না। দরকারই বা কি পরের বাড়ী থেকে বোন? এমন নয় যে, আমরা তোকে দু'টো খেতে দিতে পারব না,—তোর বিয়ে দিতে পারব না। এখানে থেকে অপমান কি কম সইছিস ভাই? আমায় পর্য্যন্ত লোকে যা না তাই বলছে। না, আর আমি তোকে এখানে রাখব না,—কারও কথা শুনব না,—তোকে জোর করে নিয়ে যাব।"

সীতা নতমুখে বলিল, "সন্ধ্যের পর সে সব কথা হবে এখন দাদা, এখন জল খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বস। আমি দাদুকে জানিয়েছি, তুমি এসেছ। শুনে তিনি ভারি আনন্দ পেয়েছেন। তোমার সঙ্গে প্রণববাবুও এসেছেন, না দাদা?"

প্রশান্ত বলিল, "হ্যাঁ, তাকেও সঙ্গে আনলুম। যে পথ,—একা আসতে সাহস হয় না।"

সীতা বলিল, "যদি ঠিক করে লিখতে—তোমরা এই ট্রেণে আসবে, তা হলে গাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হত, এতটা কষ্ট পেতে হত না।"

প্রশান্ত বলিল, "রক্ষা কর সীতা,—এই কত মাইল রাস্তা গরুর গাড়ীতে আসা যে কি ঝকমারি, তা আমি অনুভবেই বুঝতে পারছি। দেহ তা হলে আস্ত থাকত না, গরুর গাড়ীর ঝাঁকানিতে সব হাড় গুঁড়িয়ে এক যায়গায় জমা হতো।"

সীতা বলিতে গেল,—"না হয় পাল্‌কী—"

প্রশান্ত বাধা দিয়া বলিল, "না হয় আর একটু বেশী মান তার। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, পাল্‌কীতে বোঁচকার মত পড়ে থাকার চেয়ে সোজা হাঁটতেই ভালবাসি। আমার হাঁটা অভ্যাস আছে, বিশেষ কষ্ট হয় নি। কিন্তু কষ্ট বেজায় হয়েছে প্রণবের। তার হাঁটা মোটেই অভ্যাস নেই। বেচারা ভয়ানক হাঁপিয়ে পড়েছে। তোদের যদি চা থাকে, তাকে দু কাপ চা খাইয়ে দে, নইলে সে কিছুতেই উঠবে না।"

ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া সীতা বলিল, "এখনি চা করে দিচ্ছি; তুমিও তো খাবে দাদা, তোমাকেও দিই?"

প্রশান্ত ফিরিয়া চলিতে চলিতে বলিল, "না, আমার আর দরকার নেই। তাকে আগে পাঠিয়ে দে, সে খেয়ে একটু চাঙ্গা হয়ে উঠুক।"

সীতা তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

২৪

শরীর বড় অসুস্থ হওয়ায় বিহারীলাল ঘরের বাহির হইতে পারিলেন না। দিনটাও একাদশী ছিল,—এ দিনটা তিনি ফল দুধ খাইয়াই কাটাইতেন। আজ সকাল হইতে সত্যই তাঁহার শরীরটা বড় খারাপ বোধ হইতেছিল। সেই জন্যই তিনি বাহির না হইলেও কেহ কিছু সন্দেহ করিতে পারিল না। একটু সন্দেহ করিয়াছিল সীতা। সে বুঝিয়াছিল, যে পর্য্যন্ত তাহার চলিয়া যাইবার কথা হইয়াছে, সেই পর্য্যন্ত তাঁহার অসুস্থতা বড় বেশী রকম বাড়িয়া গিয়াছে। তিনি না বাহির হইলেও, যাহাতে অতিথি আত্মীয় দুইটীর উপযুক্ত আহার ও বিশ্রামের স্থান হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। রাখালকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, জ্যোতির্ম্ময় যে বড় ঘরটায় থাকিত, সীতা সেই ঘরটী অতিথিদ্বয়ের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে, এবং সুশীলবাবু নিজে থাকিয়া ভৃত্যদের দিয়া ঘরটীতে শয্যাদি ঠিক করিয়া দিয়াছেন।

কর্ত্তাবাবুর আদেশে ঈশানীকে তাহাদের আহারের স্থানে আসিয়া বসিতে হইল।

সীতা একে একে ভাত তরকারী আনিয়া দু'খানি আসনের সম্মুখে সাজাইয়া দিল। পাচিকাকে না দেখিতে পাইয়া বিহারীলাল বলিলেন, "বামণি কোথায় গেল সীতা, তুই এ সব আনছিস কেন?"

সীতা একটু কুণ্ঠিতা হইয়া বলিল, "কাল রাত্রে বামুণ ঠাকরুণের বড্ড জ্বর হয়েছে দাদু, সে জ্বর এখনও অল্প রয়েছে। বুড়ো মানুষ সেই জ্বর নিয়ে তবু দুই উনানে ভাত ডাল বসিয়েছিল, নামাতে আর পারছিল না। আমি পূজার যোগাড় করে দিয়ে গিয়ে দেখি, রান্না তখনও হয় নি। তার বড় কষ্ট হচ্ছে দেখে তাকে সরিয়ে দিলুম।"

দাদু স্থির নেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া রহিলেন। সীতা একটী দাসীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "দাদাদের ডেকে নিয়ে এসো, বল গিয়ে ভাত দেওয়া হয়েছে।"

বিহারীলাল বলিলেন, "তা তুই রান্নার দিকে না গেলেও পারতিস সীতা,—তোর এদিকে কায তো বড় কম নয় দিদি। বাড়ীতে আরও জ্ঞাতি কুটুম্ব, ছোটবউ মা, ইভা, সবাই তো রয়েছে,—কেউ কি রান্নার দিকে যেতে পারতো না?"

সীতা কোমল স্বরেই বলিল, "কাকীমার কি রান্নার অভ্যাস আছে দাদু? বরং আমি যা পারি, তিনি তাও পারেন না।"

প্রণবকে সঙ্গে করিয়া প্রশান্ত আহার করিতে বসিয়া গেল। ঈশানী অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া বিহারীলালের খাটের পাশে বসিয়া রহিলেন, সীতা পরিবেশন করিতে লাগিল।

প্রশান্তের পানে তাকাইয়া বিহারীলাল বলিলেন, "হঠাৎ চলে এসেছিলুম বলে মনে কিছু কর না দাদা,—বাড়ীর মধ্যে এসেই শুয়ে পড়েছিলুম—আর উঠতে পারি নি। দিদি জোর করে খানিক দুধ, গোটাকতক ফল খাওয়ালে, তবে যেন গায়ে একটু বল পেলুম। আমি এতকাল জানতে পারি নি, তুমিই জ্যোতির বন্ধু প্রশান্ত। তোমার কথা অনেকবার তার মুখে শুনেছি। সেবার মেসে থাকতে তার যখন বসন্ত হয়েছিল, তখন তুমি বই তাকে আর কেউ দেখেনি,—কেউ মায়ের মত করে তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিতে পারে নি। তুমি যদি তাকে না দেখতে দাদা, আমাদের যে কি সর্ব্বনাশ হ'ত তা কি করে বলব। এই খানিক আগে দিদি তোমার পরিচয় দিলে। তাতে জানতে পারলুম—তুমি শুধু তার ভাই-ই নও, জ্যোতির প্রাণদাতা বন্ধু। মরণের মুখ হতে তাকে ফিরিয়ে এনে দিয়েছিলে দাদা,—এবার তাকে ফিরিয়ে এনে আমার বুকে দিতে পারলে না, এই বড়-কষ্ট রয়ে গেল।"

প্রশান্ত শান্তকণ্ঠে বলিল, "কিছু জানতে পারিনি দাদা, জানলে তাকে প্রাণপণে ফিরাবার চেষ্টা করতুম। তার বিয়ের দিনে যখন নিমন্ত্রণ-পত্রখানা পেলুম, তখন আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। তবু তার কর্ত্তব্য তাকে মনে করিয়ে দিতে আমি সুরেশ বাবুর বাড়ী গিয়েছিলুম, কিন্তু তার দেখা পাই নি।"

বিহারীলাল কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব হইয়া রহিলেন। তাহার পর সবেগে বলিয়া উঠিলেন, "থাক গিয়ে। বন্ধুর জন্যে বন্ধু যা করে, তুমি তার বেশী করেছ। তাকে মরণের হাত থেকে টেনে এনেছিলে,—সে যদি অন্ততঃ পক্ষে তোমার কাছেও আত্মগোপন না করত, তা হলে নিশ্চয়ই তাকে এই উৎকট উচ্চাকাঙ্ক্ষার হাত হতে বাঁচাতে পারতে। কিন্তু,—না,—থাক, সে সব কথা বলে আর দরকার নেই; তার নাম মুখে আনাও এখন মহাপাপ বলে আমার মনে হয়। আমি জোর করে ভাবতে চেষ্টা করছি—সে নেই, সে মরে গেছে। যার হাতের এক গণ্ডুষ জল পিতৃ-পুরুষ পেতে পারবেন না, সে বেঁচে থাকলেও মরে গেছে বলে ভাবতে হবে।"

বাটীতে যে ডালটা ছিল, প্রশান্ত তাহা নিঃশেষে ভাতের মধ্যে ঢালিয়া লইল। শূন্য বাটীর পানে তাকাইয়া ব্যস্ত ভাবে বিহারীলাল বলিলেন, "আর একটু ডাল এনে দে সীতা, প্রণব বাবুকেও—"

প্রশান্ত হাসিয়া বলিল, "ওকে আর বাবু বলবেন না। এ-ও আপনার নাতির বন্ধু, সুতরাং নাতি বলেই জানুন। ও যে আর কিছু নেবে না, তা আমি বলে দিচ্ছি। ওরা ক্যালকেশিয়ান ভদ্রলোক, আমাদের মত ভাত খেতে বসে থালাকে থালা উজাড় করে দেয় না। দেখুন দাদা, ওর ভাত খাওয়া দেখুন, আর আমার খাওয়া দেখুন।"

বিহারীলাল এই ছেলেটীর সরল কথাবার্ত্তায় ভারি খুসী হইয়া উঠিতেছিলেন। অনেক দিনের পরে তাঁহার হৃদয়ের জমাট-বাঁধা বেদনাটা যেন হাল্‌কা হইয়া গেল। এই ছেলেটীর বলিষ্ঠ উন্নত দেহ, কথাবার্ত্তা—সবই যেন তাঁহার পরলোকগত পুত্র প্রতাপের মত। স্নেহে তাঁহার দুইটী চোখের দৃষ্টি বড় কোমল হইয়া আসিল। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "যে যা খায়, তার ওপরে তো হাত চলে না দাদা। যে কম খায়,—বেছে বেছে এতটুকু করে মুখে দিয়ে শুধু স্বাদটুকু নেয়,—আমি সে রকম লোককে পছন্দ করি নে। কেন করি নে, তা শুনলে অবশ্য তোমরা আমায় নিন্দে করতে পারবে না। এককালে আমারও তোমাদের মত যৌবন ছিল। গায়ে এত জোর ছিল, যা শুনলে অবাক্ হয়ে যাবে। খেতুমও তেমনি—অর্থাৎ এখনকার মত একবেলা খেয়ে তিনবেলা ধরে হজম করতে হত না। সেই খাওয়া, আর উপযুক্ত পরিশ্রম করেছি বলেই আজও এই সত্তর বৎসর বয়সেও উঠতে পারছি, খাটতে পারছি। প্রণবের

বড় ছেলে যায়, তারা চল্লিশ না যেতে আবার এখনকার মত অবস্থায় পড়বে,—এমনি করে ওরা এসে ওদের ফিরবে।"

উৎসাহিত প্রশান্ত সীতার আনীত ডাল ভাতের মধ্যে ঢালিয়া লইয়া, প্রণবের দিকে একটা বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "তাই বটে। দেখুন দাদু, বেচারা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠে নেহাৎ বাধ্য হয়েই সব তরকারী খাচ্ছে। ওহে ভাল ছেলে, ওরকম বাধ্যতামূলক খাওয়া খেও না। এর পরে এর ফলটা হয় তো দাদুকে ভোগ করতে হবে।"

সীতা একটু হাসিয়া বলিল, "তোমারই অন্যায় দাদা, তুমি যাকে যখন ধরবে, তাকে আর আস্ত রাখবে না। সত্যি—আপনি অমন করে খাবেন না প্রণব দা, যা তা খেলে আপনার সহ্য হবে না।"

প্রণব অপ্রস্তুতের ভাবে হাসিয়া বলিল, "সহ্য হবে না কেন, বেশ সহ্য হবে।"

প্রশান্ত গম্ভীর মুখে বলিল, "দাদা, মা, আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন—আমার একটুও দোষ নেই; কেন না, আমিও সাবধান করেছি, সীতাও অনেক বললে। এর পর যদি প্রণব কোন কথা বলে—"

প্রণব তাড়া দিয়া উঠিল,—"হয়েছে,—ঢের বলেছ। এই গরীবটার কথা ছেড়ে দিয়ে এখন অন্য কথাবার্ত্তা চলুক। দাদু তোমার দিকে হলেও, মা যে আমার দিকে হবেন, এ আমি ঠিক বলে দিচ্ছি। এ জানা কথা—যে ছেলেটী দুর্ব্বল হয়, মায়ের অনুগ্রহ-দৃষ্টিটা তার ওপরেই বেশী রকম পড়ে। মায়ের স্নেহ তোমার চেয়ে আমারই বেশী পাওয়ার কথা।"

ঈশানী শান্ত হাসি হাসিলেন; তাঁহার দুইটী চোখে স্নেহ যেন উথলাইয়া উঠিতেছিল।—আজ এই মুহূর্ত্তে নিজের ছেলেটীর কথা তাঁহার মনে পড়িতেছিল। হায় রে, সেও যদি আজ এখানে থাকিত, এই স্থানটী কি মনোরমই না হইয়া উঠিত।

আহারাদি সমাপ্ত হইলে দুই বন্ধু উঠিয়া গেল।

কপট আনন্দও সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হইয়া গেল। শ্রান্ত ভাবে বিহারীলাল বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। আজ সীতা রন্ধনের ও-দিকে থাকায় আসিতে পারিল না। রাখাল আজ সীতার কাজগুলি করিয়া দিল।

জয়ন্তী সীতার ভাই এবং তাহার বন্ধু আসায় প্রথমটায় মোটেই খুসি হইতে পারেন নাই। তিনি মনশ্চক্ষে দেখিতেছিলেন, এমনই করিয়া সীতার আত্মীয়-স্বজনে এ বাড়ী পূর্ণ হইয়া যাইবে এবং তাঁহারা—এ বাড়ীর নিতান্ত আপনার লোক হইয়া নিজেদের মধ্যে নিজেরাই সঙ্কুচিত হইয়া ক্রমে অসীম হইতে নিজেদের সসীমে—অর্থাৎ আপনার বাটীর মধ্যে যেটুকু হয় প্রভুত্ব করিতে পারিবেন। আর এই সব অনাত্মীয়েরা উড়িয়া আসিয়া সারা বিশ্বটা জুড়িয়া বসিবে এবং তাঁহাদেরই উপর অযথা প্রভুত্ব করিয়া যাইবে। উঃ, এ কল্পনাও যেন অসহ্য।

যখন প্রণব ও প্রশান্ত আহার করিতে বসিয়াছিল, তখন নিজের ঘরের জ নালার ফাঁক দিয়া তিনি নিতান্ত অবহেলার ভাবে ইহাদের দেখিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম দর্শনে সে অবহেলার ভাব দূর হইয়া গিয়া অন্তরে একটা নূতন আশা জাগিয়া উঠিল। প্রশান্তের সুদীর্ঘ সরল দেহ, সুন্দর মুখ, ছোট ছেলের মত অমায়িক সুন্দর কথা ও ব্যবহার তাঁহার মনকে তাহার পানে আকৃষ্ট করিল।

বাড়ীর সকলকে আহারাদি করাইয়া সীতা রন্ধন-গৃহে নিজের আহার্য্য লইয়া বসিতেছিল, তখন জয়ন্তী নিকটে গিয়া বসিলেন।

আজ তাঁহার একাদশী ছিল। সকাল সকাল শুইয়া পড়িয়া তিনি খানিকক্ষণ ঘুমাইয়া লইয়াছিলেন; কাযেই মনটা একটু ভাল অবস্থায় ছিল। প্রণব ও প্রশান্ত যখন আহার করিতে যাইতেছিল, সেই সময় তাঁহার ঘুমটুকু দূর হইয়া গিয়াছিল। নীচে রান্নাঘরের খোঁজ তিনি কখনও নেন নাই,—কে খাইল না খাইল, সে খোঁজ তিনি কখনও রাখেন নাই।

আজ যে তিনি স্বর্গসম ত্রিতল ছাড়িয়া নরকসম রান্নাঘরে আসিয়াছেন—ইহার মূলে কারণ আছে।

যথার্থ সুপুরুষ প্রশান্তকে দেখিয়া তাঁহার মনের অতি গোপন স্থানে একটী অতি গোপন বাসনা জাগিয়া উঠিল। এই তাঁহার ইভার উপযুক্ত পাত্র। ইহার সহিত তাঁহার ইভার বিবাহ দিলে সত্যই বড় সুন্দর হয়। তিনি শুনিয়াছিলেন, এই ছেলেটী সীতার ভাই। তাই তাহার সম্বন্ধে সবিশেষ খোঁজ লইবার জন্য সীতার খোঁজ করিয়া শুনিতে পাইলেন,

সে নীচে রন্ধন-গৃহে আছে। আজ বামুন-ঠাকুরাণীর জ্বর হইয়াছে, রন্ধন ও সকলকে আহার করানোর ভার সীতার হাতে।

"এ কি সীতা, এই বেলা সাড়ে তিনটের সময় তুমি ভাত নিয়ে বসেছ যে,—এত বেলা গেল কেন?"

সীতা একটু হাসিল মাত্র।

জয়ন্তী একখানা পিঁড়ি টানিয়া লইয়া দরজার কাছে বসিয়া বলিলেন, "এত বেলা করে ভাত খেলে দেহটা যে কয় দিন থাকবে? এক দিন অনিয়মে খেলে সাত দিন তার ফল ভোগ করতে হয়।"

সীতা বলিল, "সকলকে খাওয়াতে আজ বড্ড দেরী হয়ে গেল কাকীমা। এর চেয়ে অনেক বেলাতে খাওয়াও আমার অভ্যাস আছে, ওতে আমার কিছু হয় না। আপনাদের বেলায় খাওয়া অভ্যাস নাই; তাই এক দিন এতটুকু অনিয়মের ফল আপনাদের সাত দিন ধরে ভোগ করতে হয়। কত লোক এমন আছে কাকীমা, যারা কোন দিন বেলা পাঁচটার আগে খেতে পায় না।"

জয়ন্তী মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "সেও তবু বাঁধা নিয়ম বাছা। একদিন বেলা বারোটায়, আর একদিন তিনটের সময় খাব, একে বাঁধা নিয়ম বলে না। যাক গিয়ে, তুমি খেতে বসো। নিয়েছ তো ওই কয়টী মাত্র ভাত, ওতে পেট ভরবে?"

সীতা বলিল,"—ওই আমার যথেষ্ট হবে কাকীমা, আমি ওর চেয়ে কোন দিন বেশী খাইনে। আপনার কি কোন দরকার আছে কাকীমা? তা হলে আমি সে কাজ আগে করে দিয়ে আসি।"

জয়ন্তী বলিলেন, "না বাছা, তেমন কোন দরকার নেই। তুমি খেতে বস,—ততক্ষণ দু'টো গল্প করা যাক।"

সীতা কিছু সঙ্কুচিতভাবে আহারে বসিল।

জয়ন্তী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওই যে লম্বা চওড়া শ্যামবর্ণ ছেলেটী,—ওইটী বুঝি তোমার ভাই?"

সীতা বলিল, "হ্যাঁ, ওইটীই আমার দাদা।"

জয়ন্তী বলিলেন, "আর একটী যে পাতলা ধরণের অথচ খুব সুশ্রী ছেলে এসেছে, ওটী কে?"

সীতা বলিল, "আমার দাদার বন্ধু। আমাদের বাসার পাশেই ওদের বাড়ী ছিল; ছোট বেলা হতে আসা-যাওয়া করতেন। বোনের মত ভালবাসেন; তাই আমায় দেখতে এসেছেন।"

"ও" বলিয়া জয়ন্তী চুপ করিয়া গেলেন।

সীতা বলিল, "আমার একটা কথা শুনবেন কাকীমা? আপনি ইভার বিয়ে দেবেন বলে পাত্র খুঁজছেন শুনেছি,—আমার দাদার সঙ্গে বিয়ে দিন না কেন? দাদার অবস্থা যদিও খুব ভাল নয়, তবু শিক্ষিত। আশা করা যায়—অবস্থা এককালে বেশ উন্নত করতে পারবেন।"

মুখখানা অন্ধকার করিয়া জয়ন্তী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংসারের উপস্থিত আয় কি?"

সীতা বলিল, "আয় বিশেষ কিছু নেই। মেসোমশাই কয়েক বিঘে জমী রেখে গেছেন। দাদা সেই সব জমী দেখাশোনা করেন। এতে যথেষ্ট লাভ আছে,—চাকরী করার চেয়ে অনেক ভাল। আজ কাল চাকরীজীবী বাবুদের দুর্দ্দশা তো দেখতে পাচ্ছি কাকীমা! হয় তো মাইনে বেশ বেশী পান, তখন খুব চাল দেখান। কিন্তু চাকরীটী যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতে ভিক্ষে-পাত্র নিয়ে কাউকে হয় তো গাছতলাতেও বসতে হয়। দাদা চাকরী জীবনে কখনও করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন। তিনি বলেন—জমী করে নিজে লাঙ্গল দেব, জমীতে নিজের হাতে সোনা ফলাব,—যা মাসে দেড়শো দু'শো টাকা মাইনের চেয়ে বেশী লাভকর। আমিও তাই বলি কাকীমা,—চাকরী করার চেয়ে চাষ আবাদ করে খাওয়া বেশী মানের। এতে কারও কথা শুনতে হয় না,—কথায় কথায় চাকরী যাওয়ার ভয় থাকে না,—নিজের ইচ্ছেয় যা করলে তাই ভাল।"

জয়ন্তী বিকৃত মুখে বলিলেন, "শুনেছি, তোমার দাদা এম-এ পাশ করেছে। এই এতটা লেখাপড়া শেখা হয়েছে কি মাঠে গিয়ে লাঙ্গল ঘাড়ে করবার জন্যে?"

সীতা হাসিয়া ফেলিল। তখনই সময় ও পাত্রী বুঝিয়া হাসি সামলাইয়া গম্ভীর মুখে বলিল, "আমাদের দেশের লোকের একটা ধারণা আছে কাকীমা—লেখাপড়া শেখা শুধু চাকরীর জন্যে,—চাকরী ছাড়া আর কোনও উদ্দেশ্য লেখাপড়ার মূলে নেই। শুনেছি, যে দেশের দৃষ্টান্ত আমাদের এ দেশবাসী সর্ব্বাংশে অনুকরণ করতে চায়, সেই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী অনেক ছেলে নিজের হাতে চাষ করতে পশ্চাৎপদ হয় না। আমাদের এ দেশে যে সবই বাড়াবাড়ি; তাই এ দেশের ছেলে সব তাইতেই টেক্কা দিতে চায়। শুধু ছেলেরাই নয় কাকীমা, এ দেশের মেয়েদের শিক্ষাও সেই রকম, যার মূলে কোন মহৎ লক্ষ্য নেই। দেখছি—এ দেশের ছেলেরা সামান্য একটা

জিনিস হাতে করে নিয়ে পথে চলতে দারুণ লজ্জা-বোধ করে। অথচ যাদের দৃষ্টান্ত তারা নেয়—তারা বিনা লজ্জায়, বিনা আর্নিসে প্রকাণ্ড বড় বোঝা হাতে করে নিয়ে পথ চলে। এ দেশের পনের টাকা মাইনের একটা বাবুকে দেখবেন,—তার কাপড় জামা, পায়ের জুতো, হাতের ছড়ি, আংটী, ঘড়ি কিছুরই অপ্রতুল নেই; অথচ দু'বেলা পেট ভরে হয় তো সে খেতে পায় না। আমার দাদা এমন অসার শিক্ষা পান নি, যা মানুষকে অমানুষ করে দেয়, অপদার্থ করে তোলে। তিনি যে শিক্ষা পেয়েছেন, তা তাঁকে মানুষই করেছে। এম-এ পাশ করে ঘাড়ে করে লাঙ্গল নিয়ে গিয়ে জমীতে চাষ দিতে তিনি লজ্জা বোধ করেন না; বরং এতে তিনি গৌরব অনুভব করেন। আপনি যদি ইভার সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিতে চান, আমি এখনই ঠিক করে দিতে পারি।"

জয়ন্তী গুম হইয়া বসিয়া রহিলেন। আসল কথা, এম-এ পাশ করা এই কৃষক-প্রকৃতির ছেলের হাতে কন্যা দান করিতে তাঁহার মন সরিতেছিল না।

সীতা তাঁহার মনের কথা বুঝিল, বলিল, "দাদাকে মেয়ে দিতে যদি আপনার ইচ্ছা না হয়, আপনি প্রণব-দার সঙ্গে বিয়ে দিতে পারেন। প্রণব-দাও এম-এ,—বড়লোকের ছেলে। সংসারে এক পিসিমা ছাড়া আর কেউ নেই। ইভাকে যদি প্রণব-দার হাতে দেন, তাতে ইভা যে কখনও এতটুকু কষ্ট পাবে না, এ আমি জোর করে বলে রাখছি। তাই যদি মত করেন কাকীমা, তবে এই সামনের চৈত্র মাসটা গেলেই বৈশাখ মাসে বিয়ের উৎসব পড়ে যায়।"

জয়ন্তীর মুখের উপরকার অন্ধকার ভাবটা কাটিয়া গেল। তিনি বলিলেন, "তাই কর মা। এই বেলা কর্ত্তা বর্ত্তমান থাকতে থাকতে ইভুর বিয়েটা দিয়ে যাই। এর কপালে কি ঘটবে কে জানে। আমার ওই একটী মাত্র মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই। যাতে মেয়েটা ভাল ঘরে, ভাল বরে পড়ে, আমি চিরকাল তোমার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব।"

সীতার আহার শেষ হইয়া গিয়াছে দেখিয়া তিনি উঠিলেন।

২৬

প্রশান্ত সীতাকে ডাকিয়া বলিল, "কি রে, তোর যাওয়ার সব ঠিক হয়েছে তো?"

সীতা বিমর্ষভাবে বলিল, "কিছু ঠিক হয় নি।"

রুষ্ট হইয়া বলিল, "তবে তোর জন্যে আমি এখানে এক মাস বসে থাকি—তাই বল। আমার আর কোন কাজ নেই কি না,—তোর এখানে বসে থাকলেই আমার সেখানকার কাজ আপনিই শেষ হয়ে যাবে। যাবি যদি, তবে আজকের মধ্যেই সব ঠিকঠাক করে নে,—কাল আমাদের ঠিক রওনা হওয়াই চাই।"

সীতা নতমুখে পদাঙ্গুলি দ্বারা মেঝের দাগ দিতেছিল, উত্তর দিল না।

রাগ করিয়া প্রশান্ত বলিল, "চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে, কবে যাবি তা কিছু ঠিক করে বলবি নে,—আমরা কত দিন এখানে ঠাকুর হয়ে পুজো খাবো বল দেখি। অন্য লোকের ধাতে এত ভোগ সইলেও, আমার ধাতে সয় না, তা তো জানিস। আমি নিজের হাতে নিজের কাজ করতে যাই, দশ বারোজন লোক অমনি ছুটে আসে—বাপ রে, এ রকম করলে মানুষ টেকতে পারে কখনও? আমি বড়মানুষের কুটুম্ব হয়ে দশ দিন এখানে সুখ ভোগ করতে আসি নি, এসেছি তোকে নিয়ে যেতে,—কিন্তু তোর যেন যাওয়ার ইচ্ছে নেই। কি তোর মনের কথা খুলে বল না কেন? জানিস তো—তোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কোন দিন কিছু করিনি, এখনও কিছু করব না।"

সীতা মুখ তুলিল। শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলিল,—"তবে এবারও তোমার বোনটীকে তোমায় ক্ষমা করতে হবে দাদা। বরাবর আমার সকল অপরাধ যেমন তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিয়েছ, এ অপরাধটাও তেমনি উড়িয়ে দাও। আমি যাব না দাদা, যেতে পারব না।"

অতিরিক্ত বিস্মিত হইয়া প্রশান্ত বলিল, "সে কি কথা রে, যাবি নে—যেতে পারবি নে—এ কথার মানে কি?"

সীতা সজল দুইটি চোখের দৃষ্টি দাদার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া বলিল, "এখানকার এমনি সব ব্যাপার নিজের চোখে দেখে, কাণে শুনেও কি আমায় নিয়ে যেতে চাও দাদা? ওই যে বুড়ো দাদু, উনি সব হারিয়ে আমায় পেয়ে সব ভুলে আছেন, —আমি গেলে উনি কি আর বাঁচবেন? যিনি আমার জীবনে মায়ের অভাব অনুভব করতে দেন নি, আমি গেলে কে তাঁর শোকাচ্ছন্ন হৃদয়ে ক্ষণিক সান্ত্বনাও দিতে পারবে, কে তাঁকে সংযত রাখবে? এঁর মুখ ফুটে তোমায় কিছু বলতে

পারেন নি, কেন না, তাঁরা বড় আপনার হয়েও একজনের নিষ্ঠুরতায় আজ বড় পর হয়ে গেছেন। দাদা, একবার ভাল করে দাদুর মুখপানে চেয়ে দেখ দেখি, তার পরে—"

তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল, সে মুখ ফিরাইল।

প্রশান্ত বিস্মিত নেত্রে তাহার পানে খানিক নির্ব্বাক্ ভাবে চাহিয়া রহিল; তার পর হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—"কিন্তু এঁদের সুখ স্বচ্ছন্দতা দিতে তুই যে সর্ব্বস্ব বলিদান দিলি বোন,—তোর যে আর কিছুই রইল না।"

সীতা আর্দ্র কণ্ঠে বলিল, "সে তো আজই হয় নি দাদা, আমি অনেক দিন আগেই তো আত্মবলিদান দিয়েছি। জগতে আমার সুখশান্তি চির তরেই ঘুচে গেছে,—আমি তো ইচ্ছে করেই ঐ দুঃখকে বরণ করে নিয়েছি দাদা। এর জন্যে দায়ী কাউকেই করা যায় না। তোমরা অনর্থক আমায় সুখী করবার জন্যে চেষ্টা করছ; যে হৃদয় পুড়ে শ্মশান হয়ে গেছে, সেখানে আর নূতন কিছু প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করো না।"

তাহার দুইটি চোখ দিয়া হঠাৎ খানিকটা অশ্রু-জল উপচাইয়া নিটোল আরক্তিম গণ্ড দুইটি ভাসাইয়া দিয়া গেল। অবাধ্য অশ্রু যে দাদার সম্মুখেই তাহাকে প্রকাশ করিয়া ফেলিবে, তাহা সীতা জানিত না,—অপ্রস্তুতভাবে সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইল।

"দিদি,—সীতা—"

আত্মভোলা ভাইটী বোনের অশ্রুভরা মুখখানা কোলের মধ্যে টানিয়া লইল। অভাগিনী বোনটীর অন্তরের সব খবর নিমেষে তাহার অন্তরে পৌঁছিয়া গেল; সে যে কতটা দুঃখ—কতখানি অশ্রুজল কোমল বুকখানির আড়ালে লুকাইয়া রাখিয়াছে, মুখের হাসি কতটা কষ্টে টানিয়া আনিতেছে, তাহা সে বুঝিতে পারিল। ছেলেবেলা হইতে যাহাকে কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছে, শিক্ষা দিয়াছে, তাহার এই নিদারুণ মর্ম্ম-যাতনায় সান্ত্বনা দিবার মত কথা একটা সে খুঁজিয়া পাইল না, নীরবে শুধু তাহার চোখের জল ঝরিয়া ঝরিয়া সীতার মাথায় পড়িতে লাগিল। হায় রে, সীতার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ভাবিয়া একদিন সে কতই না আনন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর দুঃখিনী সীতার পানে তাকাইয়া সে চোখের জল রাখিতে পারে নাই। আবার ধীরে ধীরে তাহার অন্তর উৎসাহে ভরিয়া উঠিতেছিল যখন সে ভাবিয়াছিল—সীতার বিবাহ সে দিতে পারিবে। সে নারী-হৃদয় চিনিত না, সে জানিত না—সীতা সেই হৃদয়হীন পাপিষ্ঠটাকেই স্বামীরূপে বরণ করিয়া লইয়াছে; সে জানিত না—সীতা ইহাদের সহিত নিবিড় বন্ধনে জড়াইয়া পড়িয়াছে—এ বন্ধন ছিন্ন করিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই।

চোখের জল ঝরিয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতির্ম্ময়ের হৃদয়হীনতার কথা মনে পড়িয়া গেল। সরলা বালিকা পাইয়া সে পাপিষ্ঠ এমন নিষ্ঠুর খেলাও করিয়া গেল,—এই কোরকটিকে অকালে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া পদদলিত করিয়া সে চলিয়া গেল? ইহার জীবনে আশা আনন্দ সবেমাত্র মুকুলিত হইয়া উঠিতেছিল। হতভাগ্য জ্যোতির্ম্ময় যে জীবনকে পূর্ণতা দিতে পারিত, সেই জীবনের সকল সুখ হরণ করিয়া রাখিয়া গেল শূন্যতা মাত্র।

"সীতা—"

সীতা অশ্রুভরা মুখখানা তুলিল, অপ্রস্তুতভাবে অঞ্চলে মুখখানা মুছিয়া ফেলিয়া সে সোজা হইয়া বসিল। সে যে কাঁদিয়াছিল—এই ব্যাপারটাকে কি করিয়া একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহাই সে ভাবিতেছিল। কিন্তু ব্যাপারটা যে এমনি ঘটিয়া গিয়াছে,—চাপা আর দেওয়া যায় না।

প্রশান্ত রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আমি সেই জন্যেই তোকে নিয়ে যেতে চাচ্ছি বোন। আমার মনে হয়—আমার কাছে গেলে তুই ভাল থাকবি।"

সীতা শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "আমার মনে হয় দাদা, আমি এখানে থাকলেই ভাল থাকবো। এই সন্তানহীনা মা ও সর্ব্বস্বহারা বুড়োর প্রাণে যে এতটুকুও শান্তি ঢেলে দিতে পারছি—সেইটুকুই আমার এ জীবনের সার্থকতা। আমার এ জীবন তোমরা ব্যর্থ হয়ে গেছে ভাবছ দাদা,—কিছুমাত্র নয় দাদা,—তোমাদের ধারণা ভুল। ভগবান আমার ভালর জন্যেই আমায় নির্দ্দিষ্ট করে কারও হাতে সমর্পণ করেন নি,—আমায় সকলের সেবা করবার অধিকার দিয়েছেন, সকলের দুঃখে সান্ত্বনা দিতে বলেছেন। আমার বড় কষ্ট হয় দাদা, যখন এখান হতে আমার অন্যত্র কোথাও যাওয়ার কথা হয়। জগতে আমায় অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার অধিকার একমাত্র তোমারই আছে,—তাই দাদা, তোমার পায়ে ধরে বলছি, আমায় আর কোথাও নিয়ে

যেয়ো না, এখানে এমনি ভাবে থাকবার অধিকার দাও।"

হঠাৎ সে প্রশান্তের পা দু'খানা জড়াইয়া ধরিয়া চোখের জলে তাহা ভিজাইয়া দিল।

ব্যস্ত প্রশান্ত সন্তর্পণে পা সরাইয়া লইয়া সীতার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল,—"ওকি পাগলামী করছিস দিদি? আমি কখনও তোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করি নি, কখনও ক'রব না—তা তো জানিস ভাই? যখন এতটুকুটী ছিলি, মাসীমা যখন তোকে এক বছরেরটি রেখে মারা গেলেন—তখন দশ বছরের আমি—যখন তোদের বাড়ী থেকে পড়াশুনা করতুম, তখন হতে প্রতিদিনকার কথা মনে কর দেখি দিদি। একটা দিন দাদাকে না দেখলে তুই যত কাঁদতিস, আমিও তার চেয়ে বড় কম কাঁদতুম না। তোকে যে কি রকম ভালবাসি, কতখানি ভালবাসি, তা তোকে কি করে জানাব বোন,—তা যে জানানো যায় না। যখন শুনতুম তোর সঙ্গে জ্যোতির বিয়ে হবে—তখন তাকে চিনতুম না। তার পর যখন তাকে আমার পাশে পেলুম, তখন আমরা একই সঙ্গে আই-এ পড়ছি। কৌশলে তার কল্পনা জেনে তারই অনুযায়ী তোকে আমি শিক্ষা দিয়েছিলুম। তখন স্বপ্নেও ভাবি নি সে একটী লঘুচিত্ত মানুষ মাত্র। তার আদর্শ কিছু বাঁধাধরার মধ্যে নেই। সে আজ যে কথা বলবে, কাল সে কথার অন্যথা করবে। নাঃ, আমার দেওয়া সব শিক্ষাই ব্যর্থ হয়ে গেল ভাই, সব ব্যর্থ হয়ে গেল।"

সীতা শুধু ওষ্ঠে শুষ্ক হাসির রেখা ফুটাইয়া তুলিয়া বলিল, "কিছু ব্যর্থ হয় নি দাদা। তুমি সসীমের জন্যে যে শিক্ষা দিয়েছিলে, সে শিক্ষা অসীমে জড়িয়ে পড়ছে···পড়বে, একে কি ব্যর্থ শিক্ষা বলতে চাও? আমি বলছি···আমার শিক্ষা যথার্থ সার্থকতা লাভ করবে। আশীর্ব্বাদ কর দাদা, আমি যেন তোমার শিক্ষা নিজের জীবনে বিকশিত করতে পারি।"

সে প্রশান্তের পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল। প্রশান্ত তাহার মাথায় হাত রাখিল, তাহার দুইটী চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া উঠিয়াছিল।

২৭

দুই দিনের জন্য বাস করিতে আসিয়া দীর্ঘ সাত আট মাস কাটিয়া গেল, জয়ন্তী আর কলিকাতায় ফিরিলেন না। ইভাকে তাহার পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টায় তিনি ঘুরিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গেল। ঘুরিয়া বর্ষা নামিল, একে একে আষাঢ় শ্রাবণ মাসও চলিয়া গেল, ভাদ্রের শেষে ঈশানী আবার ম্যালেরিয়ার আক্রান্ত হইলেন।

সীতা সংসারের খরচপত্রের দায়িত্বের বোঝা ইভার ঘাড়ে ফেলিয়া দিয়াছিল, এ সংবাদ বিহারীলাল কিছুই জানিতে পারেন নাই; সীতাও এ সংবাদ তাঁহাকে দেওয়ার আবশ্যকতা বোধ করে নাই। পূর্ব্বের মতই খরচের টাকা তাহার হাতে আসিয়া পড়িত, সে তাহা ইভার হাতে পৌঁছাইয়া দিত। প্রথম মাসের শেষে ইভা হিসাবের খাতাখানা সীতার হাতে দিল, সীতা তাহা বিহারীলালের নিকটে পৌঁছাইয়া দিল।

খাতাখানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া বিহারীলাল হঠাৎ গরম হইয়া উঠিলেন। সেখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সগর্জ্জনে তিনি বলিলেন, "আজ কি নতুন তোর হাতে খরচ পড়েছে সীতা, যে তারই জমাখরচ লিখে আমায় দেখাতে এনেছিস? আমি কোন দিন জানতে চেয়েছি কি—সংসারে কত টাকা খরচ হল,—কোন দিন বলেছি কি—কেন তুই খরচ করলি? এসব যারা দেখতে চায় তাদের দেখাস,—আমায় দেখাতে আসিস নে—এই বলে দিচ্ছি।"

কথাটা সীতা প্রকাশ করিতে পারিল না, গোপনে রাখিল; কেন না, জয়ন্তী ও ইভা ইহা শুনিতে পাইলে রাগ করিবেন—দুঃখ পাইবেন। জয়ন্তী হয় তো ইহাতে অপমান জ্ঞান করিয়া কন্যা লইয়া চলিয়া যাইবেন।

গোপন করিতে পারিল না শুধু ঈশানীর কাছে, কারণ সে কখনও তাঁহাকে কোন কথা গোপন করে নাই। ঈশানী নিঃশব্দে শুনিয়া গেলেন। বড় অভিমানিনী ছিলেন তিনি,—অসহ্য ব্যথা পাইলেও মনের কোন কথা প্রকাশ করিতে পারিতেন না। জয়ন্তী যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন, তাহা তিনি দুই দিনেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার মর্ম্মে বড় আঘাত লাগিয়াছিল। জয়ন্তী যে ভাবিয়াছেন, ঈশানী তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া একাই সমস্ত বিষয় ভোগ করিবেন, ইহাই ভাবিয়া ঈশানীর চোখ দুইটী নিমেষে সজল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি ইভাকে সত্যই ভালবাসিতেন, ইভাও তাঁহাকে ভালবাসিয়া

ছিল। এই ভালবাসা জয়ন্তীর চোখে বিষাক্ত ঠেকিয়াছিল। তিনি তাই কথায় সকলের সামনেই ইভাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন,—"মায়ের চেয়ে যে বেশী ভালবাসে, তাকেই বলি ডাইন।" কথাটা একদিন ঈশানীর শান্ত হৃদয়-সমুদ্রে তুফান তুলিয়াছিল, তিনি সেই দিন হইতে ইভার সম্বন্ধে অতিরিক্ত রকম সতর্ক হইয়া গিয়াছিলেন।

ইভা হঠাৎ তাঁহার এই পরিবর্ত্তনের কারণ বুঝিতে পারিল না; দিন দুই চার তাঁহার পাশে পাশে আগেকার মত ঘুরিল। ঈশানী তাহার সহিত ভাল করিয়া কথা কহেন না। তাহাকে নিজের কোন কাজ করিতে দেখিলে হঠাৎ তিনি এস্ত শশব্যস্ত হইয়া উঠিতেন, যাহা দেখিয়া ইভা নিজেই ভারি সঙ্কুচিতা হইয়া উঠিত। অভিমানে তাহার হৃদয়খানা পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সে ঈশানীর দিকে আর গেল না, যতদুর সম্ভব দূরে দূরে রহিল।

ইভা বুঝিতেছিল, ইহাদের এই শান্তিপূর্ণ সংসারে ধূমকেতুর মতই তাহারা মাতা কন্যা আসিয়া পড়িয়া একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছে। ইঁহারা সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে বেদনা পাইতেছিলেন বটে,—সে বেদনা, সে কষ্ট তাঁহারা ঈশ্বরের দানরূপে মাথা পাতিয়া লইতে প্রস্তুতও ছিলেন; তাহার মায়ের এখানে থাকিয়া নিত্য এক একটা নূতন কাণ্ড বাধাইয়া তোলাকে ঈশ্বরের দান বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন; কারণ, এ অশান্তি মানুষ নিজেই বহন করিয়া আনে। তাহার মায়ের অন্তরের ভাব মুখে যতই মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছিল, ইভা ততই মরমে মরিয়া আপনার মধ্যে আপনাকে গুটাইয়া লইতেছিল। সে নিজেদের অশুভ গ্রহ মনে করিতেছিল এবং তফাতে সরিয়া যাইতেছিল।

সেদিন রাত্রে মায়ের পাশে বিছানায় শুইয়া সবেমাত্র তাহার ঘুম আসিতেছিল,—জয়ন্তী নিত্যকার মতই নির্জ্জনে মনের কথা এই সময়ে ব্যক্ত করিতেছিলেন। ইভা যতই এসব প্রসঙ্গ এড়াইয়া যাইতে চাহিত, জয়ন্তী ততই যেন তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া তাহার কাণে এই গরল ঢালিয়া দিতেন। আজও ইভা একটা কাণ বালিসে চাপিয়া আর একটা কাণে হাত চাপা দিয়া ঘুমের ভাণে পড়িয়া রহিল। ভাবিয়াছিল—সে ঘুমাইয়াছে জানিলে মা চুপ করিয়া যাইবেন, কিন্তু মা নিরস্তা হইলেন না। তাহাকে নিদ্রিতা দেখিয়া তাহার গায়ে একটা ঠেলা দিয়া ডাকিলেন,—"ঘুমুলি ইভু? এখনও রাত দশটা বাজল না—এর মধ্যে এত ঘুম এল? আজ কয়দিন—যে কয়দিন তোকে সীতার সঙ্গে বেশী মিশতে বারণ করেছি—সেই কয়দিন তোর ঘুমও যেন অতিরিক্ত রকম বেড়ে উঠেছে। এই কয়টা দিন আগে রোজই রাত বারটার সময় শুয়েও তো রাত দু'টো পর্য্যন্ত ঘুমাতে পারতিস নে দেখেছি।"

অসহিষ্ণুভাবে ইভা বলিল, "ঘুমাতে তুমি দিচ্ছো কি না মা, যে খানিকটা ঘুমাব? সমস্ত দিনটা তবু একরকম করে কেটে যায়, রাত্রে কি করব তা বল। সীতাদির সঙ্গে মিশে কাজ-কর্ম্ম করতে তবু ঘুম আসত না, কাজেই এখন—"

জয়ন্তী বলিলেন, "দিনে মেসিন নিয়ে সেলাই করলে পারিস, রাতে বই-টই নিয়ে দেখলেও তো হয়।"

ইভা সবেগে মাথা নাড়িল—"না, সেলাই আর ভাল লাগে না, বই পড়লেও বিরক্তি আসে। তুমি কবে কলকাতায় যাচ্ছো বল, আমার আর এখানে থাকতে ইচ্ছা করছে না।"

অবাক হইয়া গিয়া জয়ন্তী বলিলেন, "ভাল লাগছে না বলে চলে যেতে হবে? ভাল না লাগলেও তোর যে এইখানেই থাকতে হবে রে, তা বুঝি ভুলে যাচ্ছিস? তোর দাদু জ্যোতিকে ত্যাগপত্র দিয়েছে তা জানিস তো? জ্যোতি এ সম্পত্তির একটী আধলা আর পাওয়ার দাবী করতে পারবে—না, শেষকালে সীতাই যে এই অতুল সম্পত্তি পাবে এ আমি কখনও সহ্য করতে পারব না। জ্যোতি না পাক ইভু, তুই তো সব পেতে পারিস, পাওয়ার অধিকার তোরও তো আছে। ওঁরা যদি তোকে তোর ন্যায্য অধিকার থেকে বিচ্যুত করতে চান, আমি তা হতে দেব কেন? সীতাকে বড় ভালবাসেন—বেশ কথা, তাকে দিতে ইচ্ছা করেন, সামান্য কিছু দিতে পারেন মাত্র, সব যে দেবেন তা কখনই হতে পারে না।"

উত্তেজিতা ইভা বলিল, "কে চায় সম্পত্তি মা, আমি এর একটা পয়সাও চাইনে। দাদুর যাকে ইচ্ছা হয় দিতে পারেন, আমায় দিতে এলেও আমি কিছু নেব না।"

বিকৃতমুখে জয়ন্তী বলিলেন, "ওই এক কথা শিখেছিস বাপু, তোর ওই লম্বা চওড়া কথা শুনলে আমার ইচ্ছে হয় না যে তোর সঙ্গে কোন বিষয়ে একটা কথা বলি। কলকাতায় যাওয়ার জন্যে যে ছটফট করছিস, সেখানে গিয়ে চিরটা কাল মামা-

মামীর গলগ্রহ হয়ে থাকবি না কি? ভাল ছেলে পছন্দমত না পাওয়া গেলে—"

উগ্র হইয়া উঠিয়া ইভা বলিল, "আমি বিয়েও করব না, মামা-মামীর গলগ্রহ হয়েও থাকব না।"

দীপ্ত ভাবে জয়ন্তী বলিলেন, "না—বিয়েও করবি নে, মামা-মামীর গলগ্রহ হয়েও থাকবি নে,—তবে কি চাকরী করে খাবি এখন?"

ইভা বালিসের মধ্যে মুখখানা গুঁজিয়া দিয়া চাপা সুরে বলিল, "অনেক দিন আগে তুমিই তো একবার জ্যেঠিমাকে বলেছিলে মা—ইভা চাকরী করে খাবে। আমায় শিক্ষা দেওয়ার মূলে তোমার সেই উদ্দেশ্যটাই ছিল না কি মা?"

অতিরিক্ত রকম চটিয়া উঠিয়া জয়ন্তী বলিলেন, "তুই বড্ড বাচাল হয়ে উঠেছিস ইভা; এই জন্যেই আমাদের দেশে একটা কথা চলিত আছে—মেয়েদের বেশী লেখাপড়া শিখাতে নেই,—এতে তাদের গুরুলঘু বিচার থাকে না, যা মুখে আসে তাই বলে যায়। এঁরা যখন বারণ করেছিলেন, তখন আমিই নেহাৎ জোর করে ধরে তোকে এই যে শিক্ষা দিতে পেরেছিলুম, এখন দেখছি এ শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে না দেওয়াই ভাল ছিল। এ লেখাপড়া বড্ড বেশী রকম আত্মমর্য্যাদা আর স্বাধীন ভাব তোর মনে জাগিয়ে তুলেছে। তাই আমাদের মেয়েদের যা ধর্ম্ম তা ভুলে গিয়েছিস,—অসঙ্কোচে বলছিস 'বিয়ে করব না।' বিয়ে না করে আমাদের দেশে কয়টা মেয়ে আছে দেখা দেখি, আর হাতের কাছে অগাধ বিষয় সম্পত্তি পেয়ে কয়টা লোকে সে বিষয় ঠেলে ফেলেছে, তাও দেখা দেখি। দেখ ইভু, বাড়াবাড়ি কিছুরই ভাল নয়, যা রয় সয় তাই ভাল।"

ইভা চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

জয়ন্তী উগ্র কণ্ঠস্বর কতকটা কোমল করিয়া আনিয়া বলিলেন, "বিয়ে পরের কথা, এখন তা নিয়ে মাথা গরম করার দরকার দেখছি নে। প্রণব ছেলেটী ছিল খুব ভাল, ভাবলুম—ওর সঙ্গে যদি তোর বিয়েটা দিতে পারি, কিন্তু কথাটা তুলবামাত্র সে আপত্তি তুললে—বিয়ে করবে না, চিরকুমার হয়ে দিন কাটাবে। যাক গিয়ে, ওর মত কি, ওর চেয়ে আরও ভাল ছেলে ঢের আছে। অগাধ সম্পত্তিটা হাতে পেয়ে ঠেলে দিতে চাস নে ইভা। ধর—যদি তোর ইচ্ছে না হয়—বিয়ে যদি নাই করিস—কেন না কুলীন বামুনের ঘরের মেয়েদের সেকালে মোটে বিয়েই হোতো না, সেটা বিশেষ কিছু দোষাবহ নয়,—তবুও ভবিষ্যৎটা একটু ভাবিস। তোর দাদু যদি সীতাকে সব দিয়ে যায়, এখানে তোরও কি আর স্থান হবে ইভা? জ্যোতির অধিকার আর রইল না; কেন না, সে ধর্ম্মত্যাগী, প্রায়শ্চিত্ত করেও সমাজে আর সে উঠ্‌তে পারবে না, কর্ত্তার ইচ্ছানুসারে এক পয়সাও আর সে পাবে না। অগত্যা এর পরে তোকে বাধ্য হয়ে চাকরী করতেই হবে; কেন না, মামা-মামীর সংসারে কিছু চিরজীবনটা কাটাতে পারবি নে। তার পর—চাকরী যে করবি, মাসে বড় জোর না হয় ষাট সত্তর টাকা পাবি। সে যে কতখানি পরিশ্রম করে উপার্জ্জন করা—সেইটে ভেবে দেখ। এ দেশের মেয়েরা যতই কেন না শিক্ষালাভ করুক, একমাত্র শিক্ষাবিভাগ ছাড়া তাদের কাজ আর কোথাও নেই। তাদের শিক্ষাক্ষেত্র বিস্তৃত হতে পারে, কর্ম্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। একটা জমীদারীর আয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে ও যে একটা চাকরের মাইনে রে। তোর দাদুর সংসারেই ওই বেতনে কতজন কাজ করছে, আর সেই বেতনের জন্যে তুই বুকের রক্ত মুখে তুলবি। এখনও সময় আছে, দু'দিন এখানে থেকে বুড়োর কাছ হতে সব নে। তার পর কেই বা এ পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকবে মা, কলকাতায় থাকলেই তো চলবে।"

ইভা চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল, এ সব কথার উত্তর দিবার প্রবৃত্তি তাহার ছিল না। মায়ের মতের সহিত তাহার একটা মতও মিলিত না। সে কথা প্রকাশ করিতে গেলে এখনই ঝগড়া বাধিয়া যাইবে; সুতরাং চুপ করিয়া থাকাই ভাল। দুই চোখের উপর হাতখানা লম্বালম্বী ভাবে রাখিয়া সে নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল। তাহাকে নীরব দেখিয়া জয়ন্তী চুপ করিয়া গেলেন। খানিক পরে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন, ইভা জাগিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

ঈশানীর জ্বর কমের দিকে না আসিয়া উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। একুশ দিন হইয়া গেল—জ্বর ছাড়িল না। সকালের দিকে জ্বর সামান্য লাগিয়া থাকিত, দুপুরে তাহার উপর খুব বেশী চাপিয়া আসিত। ইহার উপর একটী দুইটী করিয়া অনেকগুলা উপসর্গও আসিয়া জুটিয়া গেল। তখন ডাক্তার নৃপেন্দ্রনাথ মুখ বিকৃত করিলেন।

ঈশানীর মুখখানা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, "আমি আর বাঁচব না, না ডাক্তারবাবু?"

নৃপেন্দ্রনাথ মুখে শুষ্ক হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন, "বাঁচবেন বই কি মা। এ রকম অসুখ কত লোকের হয়, আবার সেরেও যায়।"

শ্রান্তকণ্ঠে ঈশানী বলিলেন, "না বাবা, আমি বেশ বুঝেছি—এবারে আর বাঁচব না। আজ তিন সপ্তাহ আপনি আমায় দেখছেন, এত ওষুধ দিচ্ছেন,—রোগ কমা দূরের কথা, উত্তরোত্তর বাড়ছেই। আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন—আর সকলের মত আমিও মরতে ভয় পাচ্ছি। কিন্তু না ডাক্তারবাবু, মরণে আমার কি আনন্দ তা আপনি বুঝতে পারবেন না। আমি যে মরবই তা আমি বেশ জানি। তবু যে এতদিন কেমন করে বেঁচে আছি, আমি তাই ভেবে সময় সময় আশ্চর্য্য হয়ে যাই। আমি সকল সময় শ্রীঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি—আমায় মানুষের আকাঙ্ক্ষিত যা সব দিয়েছিলে ঠাকুর, নিজের অদৃষ্টের দোষে পেয়েও সব হারিয়েছি। আমি ভিক্ষা চাচ্ছি, এখন আমায় মরণ ভিক্ষা দাও। এই দেড় বছর আমার যে কি করে কেটেছে, দিন যে কি রকম করে চলে যায়, তা আপনি বুঝতে পারছেন না—বুঝছেন অন্তর্যামী ভগবান। আপনি তবু আমায় প্রবোধ দিতে চান—আমি বাঁচব। সে কথা তাদের বলবেন ডাক্তারবাবু—যারা বাঁচতে চায়, পৃথিবীতে থেকে যাদের পাওয়ার আশা আছে।—আমার যে কিছুই পাওয়ার আশা নেই বাবা, আমি সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে আছি।"

পীড়িতার দুই চোখ দিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল, তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন।

সীতা নিকটে ছিল, ডাক্তার তাহাকে দূরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া শুষ্ক স্বরে বলিলেন, "বিপদের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত হয়ে থেকো দিদি। মায়ের যে রকম অবস্থা দেখছি, তাতে আমি কিছুতেই আশা করতে পারছিনে। যদি এমনি থাকেন তাও ভাল। কিন্তু যদি আরও দুই একটা উপসর্গ এর পরে এসে যোগ দেয়, তাহলে আমার ক্ষমতার অতীত বলে জেনো।"

সীতা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "দাদুকে কথাটা বলে' যাবেন।"

সুশীলবাবু কয়দিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রোগিনীর পার্শ্বে বসিয়া ছিলেন। ইভা মাঝে মাঝে নিকটে আসিয়া বসিত,—খানিকটা নীরবে থাকিয়া চোখের জল ফেলিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া যাইত।

সেদিন সকাল হইতে হিক্কা উঠিতে লাগিল, ডাক্তারের মুখখানা মলিন হইয়া গেল।

সীতা তাঁহার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিল, শুষ্ককণ্ঠে সে ডাকিল "ডাক্তার দাদা—"

ডাক্তার একবার মাত্র তাহার মুখের উপর চোখ দুইটী তুলিয়া তৎক্ষণাৎ বাহিরে চলিয়া গেলেন। সীতা ঈশানীর বুকের উপর মুখখানা রাখিয়া চোখের জলে ভিজাইয়া দিল।

তাহার মাথার উপর শীর্ণ দুর্ব্বল হাতখানা রাখিয়া রুদ্ধকণ্ঠে ঈশানী বলিলেন, "কাঁদছিস কেন সীতা, আমি চলে যাচ্ছি বলে তুই চোখের জল ফেলছিস মা? ওরে পাগলী, আমার যাওয়ার সময় কেন চোখের জল ফেলছিস বল দেখি? আমার সকল বাঁধন খুলে দে মা। মনে কর—আমি আনন্দধামে আনন্দময়ের পায়ের তলায় আশ্রয় নিতে যাচ্ছি; সংসারে এসে শান্তি পাইনি, মা—বড় জ্বালায় জ্বলেছি, দেখতে যাচ্ছি সেখানে শান্তি পাওয়া যায় কি না। একদিন তুইও তো সেখানে যাবি মা,—আমি অপেক্ষা করব, সেখানে তোর সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে। ওঠ সীতা, চোখের জল মুছে ফেল মা, হাসিমুখে আমায় বিদায় দে।"

"হাসিমুখে বিদায়?" সীতার বুকখানা ভাঙিয়া যাইতেছিল। সে মুখখানা বড় বিকৃত করিয়া ফেলিল—তবু সে চোখের জল মুছিল, মুখে হাসি না আসিলেও কান্নাকে সে প্রাণপণ শক্তিতে ঠেকাইল।

"যাওয়ার বেলা একবার ইভাকে আর ছোট বৌকে আমার কাছে ডেকে আন সীতা। ইভা রোজ আমায় দেখতে আসে, আমি একদিনও তার সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। সে ভেবে নিয়েছে আমি তার ওপর রাগ করে এখনও আছি। সে ছেলেমানুষ,—বুঝতে পারেনি। বড় যাতনায় আমি মূর্চ্ছিতার মত পড়ে থাকতুম, কথা বলতে আমার ভাল লাগত না। আজ শেষ একবার তার সঙ্গে কথা বলে যাই, একবার তাকে ডাক সীতা।"

অশ্রুমুখী ইভা আসিয়া ঈশানীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া পড়িল, তাঁহার বুকের মধ্যে মুখখানা লুকাইয়া ঝর ঝর করিয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিল।

তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া জয়ন্তীর পানে চাহিয়া বিকৃত কণ্ঠে ঈশানী বলিলেন, "আজ

যাওয়ার বেলায় বলে যাচ্ছি ছোটবউ, হয় তো কত সময় আমার কত ব্যবহারে ব্যথা কষ্ট পেয়েছ, আজ এ সময়ে সেজন্য আমায় ক্ষমা করো। মনে করো—শোকে দুঃখে আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, কি বলতে কি বলেছিলুম তার ঠিক নেই। আমার সব দোষ ক্ষমা কোরো।"

ইভার পানে তাকাইয়া বলিলেন, "তোকেও বড় ব্যথা দিয়েছি মা। অভিমানে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলুম; বেশ জানতুম তুই আমায় কতখানি ভালবাসিস, তবু আমি আমার কাছে আসার সুখ হতে তোকে বঞ্চিতা করেছিলুম, আমার কোন কাজে হাত দিতে দিইনি। তোরা দুই বোন রইলি, আমার সংসারে যেন বিশৃঙ্খলা না আসে, তোদের দাদুর ভার এখন হতে তোদের হাতেই রইল। আর যে কয়টা দিন তিনি বেঁচে থাকেন, সর্ব্বদা তাঁর কাছে থাকিস, দেখিস—তিনি যেন পাগল হয়ে না যান।"

মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বিহারীলাল পুত্রবধূর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শূন্য নেত্রে তাকাইয়া দেখিলেন, যাহাকে এতটুকু বয়সে গৃহে আনিয়া সংসারের কর্ত্রী-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, মা বলিয়া যাহাকে ডাকিয়া এত দুঃখেও হৃদয়ে আনন্দ পাইতেন, আজ সেও চলিয়া যাইতেছে। তাহার স্বামী গিয়াছিল, পুত্র গিয়াছিল, নারী-জীবনের সর্ব্বস্ব হারাইয়াও সে শুধু তাঁহার পানে চাহিয়া নিজের কর্ত্তব্য প্রাণপণে পালন করিয়া যাইতেছিল, আজ সেও চলিল। বৃদ্ধ আকুল ভাবে চারিদিকে চাহিলেন। ঈশানীর বিছানা ঘেরিয়া সকলে দাঁড়াইয়া, সকলের দৃষ্টি তাঁহার উপর ন্যস্ত।

ঈশানীর মুখখানা মুহূর্ত্তের তরে দীপ্ত হইয়া তখনই অন্ধকার হইয়া গেল। নিভন্ত-প্রায় চোখের কোণ বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। হাঁফাইয়া উঠিয়া তিনি বলিলেন, "বাবা, একটু পায়ের ধূলো,—"

বৃদ্ধের কাণে সে কথা গেল না, তিনি দীপ্তিহীন নেত্রে চাহিয়া দেখিতেছিলেন—তাঁহার সব কেমন করিয়া একে একে চলিয়া যায়।

সীতা রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল, "দাদু, মা পায়ের ধূলো চাচ্ছেন।"

বৃদ্ধ তথাপি নিশ্চল দেখিয়া সে তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া ঈশানীর ললাটে মুখে দিল।

একদৃষ্টে তিনি বিহারীলালের পানে চাহিয়াছিলেন,—যেন কি বলিতে চান, কিন্তু সে কথা মুখে আসে না।

সীতা ডাকিল,—"দাদু—"

বিহারীলালের বাহ্য জ্ঞান এইবার যেন ফিরিয়া আসিল; তিনি সীতার পানে চাহিলেন। সীতা তাঁহার হাতখানা ধরিয়া ঈশানীর সম্মুখে টানিয়া আনিয়া বলিল, "এখানে দাঁড়ান দাদু, মা কি বলতে চাচ্ছেন শুনুন। এর পরে এই কথাটা শুনবার জন্যে হাহাকার করলেও—"

অশ্রুর উচ্ছ্বাসে আর একটা কথাও সে বলিতে পারিল না।

"মা,—বউমা, তবে আজ যথার্থ-ই চলে যাচ্ছো কি? তোমরা সবাই একে একে আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে গেলে, আর আমি,—আমি কি শুধু তোমাদের স্মৃতি উজ্জ্বল করে রাখবার জন্যে—কেবল হাহাকার করবার জন্যেই বেঁচে থাকব মা?"

বৃদ্ধ হাহাকার করিয়া উঠিলেন।

"বাবা—জ্যোতি"।

অভাগিনী মায়ের মুখে আর কথা ফুটিতেছিল না, তবু তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মর্ম্ম-মাঝে যে কথা জাগিতেছিল, শত চেষ্টাতেও তাহা মুখে ফুটাইতে পারিলেন না।

সুশীলবাবু তাঁহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "জ্যোতির কথা এখন ভুলে যান মা, শ্রীধরের চিন্তা করুন, শ্রীধরকে ডাকুন।"

দৃষ্টিহীন চোখের পার্শ্ব দিয়া দু'টি ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল, আর একবার কথা কহিবার শেষ উদ্যমের সঙ্গে সঙ্গে সব ফুরাইয়া গেল।

ইভা কাঁদিতেছিল, সীতা তাহার চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল, "কেঁদ না ইভা,—মা বলে গেছেন, তাঁর মৃত্যুতে যেন কেউ না কাঁদে। বড় কষ্ট পাচ্ছিলেন, বড় শান্তি পেয়েছেন। ঘুমিয়ে পড়েছেন, ওঁকে ডেকো না।"

সুশীলবাবুকে উপস্থিত কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিয়া ভূলুণ্ঠিত বৃদ্ধ দাদুকে অবলীলাক্রমে বুকের উপর তুলিয়া লইয়া সীতা বাহির হইয়া গেল। খানিকটা কাঁদিতে পাইলে সে শান্তি পাইত; কিন্তু সকলেরই কাঁদিবার সময় ছিল—তাহার সময় ছিল না।

২৮

সুদীর্ঘ কয়েক বৎসর পরে জ্যোতির্ম্ময় দেশের মাটিতে পদার্পণ করিল। বিলাতে গেলে এ

দেশের ছেলেদের যতখানি পরিবর্ত্তন হয়, জ্যোতির্ম্ময়েরও ততখানি হইয়াছিল, মনের ভিতরটা তাহার তখনও কাঁচা ছিল। বিলাতে থাকিতে কলিকাতার কথা খুব কমই মনে পড়িত, —শ্যামল লতা-পাতায় ছাওয়া ক্ষুদ্র পল্লীখানির কথাই তাহার বেশী মনে পড়িত। সে তখন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িত।

সীতার কথাও যে মনে পড়িত না এমন নহে, কিন্তু সে খুবই কম। সে কল্পনায় দেখিত, এতদিন সীতার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী হিন্দুর ঘরের মেয়ে চিরকাল অবিবাহিতা থাকিতে পারে না, সীতা থাকিবে কেমন করিয়া? জ্যোতি কখনও ভাবিতে পারে নাই, সীতা এখনও অবিবাহিতা আছে,—এখনও একটী কুমারী-হৃদয়ের পবিত্র পূজা সে অহরহঃ পাইতেছে।

যাক, এ একটা শান্তির কথা। স্পর্দ্ধাও কম নয়। সীতা তাহার স্ত্রী হইবে—কথাটা মনে করিতেও হাসি পায়। কবে দুই বন্ধুর মধ্যে কথা হইয়াছিল—তাহাদের পুত্রকন্যা জন্মিলে বিবাহ দিতে হইবে। তাহার পর মেয়েটী কুৎসিত, অঙ্গহীনা হোক, মূক হোক, তবু যে তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে, জীবনের সহধর্ম্মিণী করিতে হইবে, এমন কোনও অর্থ নাই। দাদু আর মা সেই কোন্ অতীতের জের বহিয়া বেড়াইতেছেন, জ্যোতির হাতে সীতাকে দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন। সীতাকে বিবাহ করিলে সে কি কোন দিকে উন্নতি লাভ করিতে পারিত? সপ্তাহ অন্তর দেবযানীর যে দীর্ঘ পত্র আসে, তাহা পড়িয়া কতটা তৃপ্তি পাওয়া যায়। সীতা কি এমন পত্র লিখিতে পারে?

বৃদ্ধ দাদুর কথা মনে করিতে তাহার চক্ষু দুইটী অল্পে অল্পে জলে ভরিয়া উঠিত। আহা, বড় কষ্টে বড় আবেগে বৃদ্ধ ত্যাগপত্রখানা দিয়াছে, সে পত্র আজও জ্যোতির বাক্সের মধ্যে পড়িয়া আছে। যে জ্যোতি কখনও তাঁহার মুখের সম্মুখে একটা কথা বলে নাই, সে কি না তাঁহার আদেশ অবহেলা করিল, তাঁহার দান ফেলিয়া দিল, দেশ ছাড়িয়া বিদেশে চলিয়া গেল? বড় কষ্টে দুঃখে, অভিমানে বৃদ্ধের হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছে। তাই তিনি আদেশ করিয়াছেন, জ্যোতি যেন নিজেকে তাঁহার বংশধর বলিয়া কোথাও পরিচয় না দেয়, —জ্যোতি মনে করুক, সে তাঁহাদের কেহই নহে।

আর সেই চিরদুঃখিনী ব্রহ্মচারিণী মা—।

চিরসংযত চিরশান্তস্বভাব মা আমার। কখনও তাঁহার হৃদয়ের একটা কথাও তিনি প্রকাশ করেন নাই। স্বামীর মৃত্যুর পরে পাছে জ্যোতি কাঁদে এই ভয়ে তিনি চোখের জলও ফেলিতে পারেন নাই। জ্যোতির মনে পড়িত সেই দিনের কথা —যে দিন সে সকল সঙ্কোচ লজ্জা ভয় ত্যাগ করিয়া মায়ের কাছে জানাইয়াছিল, সে দেবযানীকে বিবাহ করিবে, বিলাত যাইবে। সেদিন মায়ের মুখখানা শবের মতই মলিন হইয়া উঠিয়াছিল,—তিনি কি রকম ব্যাকুল চোখে তাঁহার পানে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মুখ দিয়া কতক্ষণ একটী কথা ফুটিতে পায় নাই, কিন্তু বুকের মধ্যে যাহা করিতেছিল তাহা মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

মায়ের কথা মনে করিতে জ্যোতির চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িত।

দাদু যে এ জীবনে তাহাকে ক্ষমা করিবেন না, তাহা সে বেশই জানিত। দাদুর সম্মুখীন হইবার সাহসও তাহার ছিল না। কিন্তু তিনি না ক্ষমা করেন,—মা কি ক্ষমা করিবেন না? মা সন্তানের উপর রাগ করেন, অভিমান করেন; কিন্তু সে রাগ অভিমান তো চিরকাল থাকে না। কথাতেই যে আছে—কুপুত্র যদি বা হয়—কুমাতা কখনও নয়। সে ব্রাহ্মণ-সন্তান হইয়া কায়স্থ-কন্যা বিবাহ করিয়াছে, ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে,—দারুণ অপরাধে সে অপরাধী। সমাজ তাহাকে ক্ষমা করিবে না, দাদু তাহাকে ক্ষমা করিবেন না। কিন্তু মা—তাহার স্নেহময়ী মা,—তিনিও কি তাহাকে ক্ষমা করিবেন না?

আশার আলোকে তাহার অন্ধকার হৃদয়খানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। আছে,—মায়ের বুকে তাহার স্থান আছে। মাকে সে দেখিতে পাইবে, মায়ের বুকে সে মাথা রাখিতে পাইবে. মায়ের চোখের জলের সঙ্গে তাহার চোখের জল মিশাইতে পারিবে। মায়ের পায়ের ধুলা সে পাইবে, মায়ের আশীর্ব্বাদ সে লাভ করিবে। সে কুপুত্র হইলেও মা স্নেহহীনা নন। তিনি যে স্নেহময়ী মা।

বিলাতে এই কয়টা বৎসর সে দেশের খবর কিছুই পায় না। বন্ধুদের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করিত; তাহাতে কিছুই জানা যাইত না। এখনও বাংলা দেশের একটী পার্শ্বে এক নিভৃত পল্লীর জন্য তাহার প্রাণ কাঁদে, এ কথা শুনিলে সকলে যে হাসিবে।

দেশের বাটীতে পা দিয়া তাহার মনে হইল—এইবার সে বাড়ীর খবর পাইতে পারিবে।

শ্বশুর, শাশুড়ী, স্ত্রী, বন্ধুবান্ধব—সকলেই নূতন ব্যারিষ্টারকে যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। সুরেশবাবুর প্রিয় বন্ধু ডাক্তার এন, মিত্র বলিয়াছিলেন, জামাতার দেশে ফিরিয়া আসা উপলক্ষে সুরেশবাবুর একটী প্রীতিভোজ দেওয়া আবশ্যক।

সুরেশবাবুর স্ত্রী মাধবী বলিলেন, "ঠিক কথা বলেছেন ডাক্তার মিত্র,—সমাজে জ্যোতিকে পরিচিত করে দেওয়া চাই। কিন্তু আপনার বন্ধুটীকে বলাও যা না বলাও তাই। আপনি সময় পেলে একবার সন্ধ্যের দিকে আমাদের বাড়ী আসবেন, যা কথাবার্ত্তা আমার সঙ্গেই হবে; কেন না ওঁর নাগাল পাওয়া ভার। সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক কতটুকু তা তো আপনি বেশই জানেন।

শেষের দিকটায় তাঁহার কণ্ঠস্বর একটু আর্দ্র হইয়া উঠিল, তিনি স্বামীর পানে একটা তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

বাস্তবিকই সংসারের সঙ্গে এই লোকটার সম্পর্ক ভারি কম ছিল। তাঁহার একটা বিশেষ দোষ ছিল—সংসারের কোন জটিলতার মধ্যে কিছুতেই প্রবেশ করিতে চাহিতেন না। নিজে যেমন সাধাসিধা ধরণের লোক ছিলেন, সেইরূপ সাধাসিধা ধরণটাই পছন্দ করিতেন। যশোহর জেলার অন্তঃপাতী কোন পল্লীগ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেখানে ছিলেন তাঁহার এক বৃদ্ধা মাসীমা। ধর্ম্মত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেশের সহিত—সমাজের সহিত সকল সম্পর্ক রহিত হইয়া যায়। তথাপি তিনি বৎসরে অন্ততঃ পক্ষে একদিনের জন্যও দেশে যাইতেন, মাসীমার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া আসিতেন। তিনি যে দেশে যান, মাসীমার সহিত দেখা করেন, এ সংবাদ মাধবীর নিকট অজ্ঞাত ছিল। মাধবী পল্লীগ্রামকে আন্তরিক ঘৃণা করিতেন, কুসংস্কারান্ধ মাসীমাকে তাহাপেক্ষা অধিক ঘৃণা করিতেন। একবার মাসীমার নামটা বড় আবেগে স্ত্রীর নিকটে করিতে গিয়া সুরেশবাবু স্ত্রীরমুখে বিরক্তি-রেখা ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়াছিলেন। মাসীমা তাঁহার তিন বৎসর বয়স হইতে কি করিয়া তাঁহাকে লালন-পালন করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে গিয়াছিলেন, স্ত্রীর বিরক্তি-ভাব দেখিয়া থামিয়া গিয়াছিলেন। সেই মুহূর্ত্তে স্ত্রীর অন্তরটা তিনি স্বচ্ছ-দর্পণের ন্যায় দেখিতে পাইয়াছিলেন, আজ বাইশ তেইশ বৎসর তিনি দেশের নাম, মাসীমার নাম আর স্ত্রীর কাছে করেন নাই। তাঁহার মুখে মাসীমার অপূর্ব্ব স্নেহের কথা অনেকেই শুনিতে পাইত, কেবল মাধবীই আর কোন দিন শুনেন নাই। তাঁহার মনে অভিমান বড় প্রবল ছিল। সেই অভিমানই স্ত্রীর কাছে মাসীমার কথা গোপন করিয়া রাখিয়াছিল।

তিনি নিজের ঘরটীতে দিব্য আরামে থাকিতেন। আহারের সময়টা মাত্র স্ত্রীর সহিত দেখা হইত। সেই সময়টুকুর মধ্যে সুবিধা পাইয়া মাধবী এত কথা শুনাইয়া দিতেন যে, স্বামী বেচারা কোনক্রমে দুইটা নাকে-মুখে দিয়া উঠিয়া পড়িতে বাধ্য-হইতেন।

স্বামীটিকে লইয়া মাধবীর জ্বালা সহিতে হইত বড় কম নয়। উচ্চশিক্ষা লাভ করিলেও সুরেশ-বাবু সামাজিক আচার-ব্যবহার একটাও শিখিতে পারেন নাই। বাহিরে যেই কেন আসুক না, তিনি তাঁহার নির্জ্জন গৃহকোণ ছাড়িয়া কিছুতেই বাহির হইতেন না। চারিদিকে আলমারি ঠাসা বই, টেবিলে রাশি রাশি বই। এই বইয়ের গাদায় আসিয়া পড়িলে মাধবীর দম বন্ধ হইয়া আসিত। কিন্তু সুরেশবাবু পায়ের উপর পা তুলিয়া দিয়া ইহার মধ্যে আত্মহারাভাবে বসিয়া থাকিতেন। নিয়মিতভাবে কলেজ যাইতেন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাহিরে ঘুরিয়া আবার আসিয়া সেই বইয়ের সাগরে যে ডুব দিতেন, কেহ তাঁহার সাড়া পাইত না।

আশ্চর্য্য এই—মাধবী যাহাদের ঘৃণা করিতেন, তিনি তাহাদের ভালবাসিতেন। তাঁহার ছাত্র-গণের এই ঘরটীতে অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল; অথচ এই ছেলেগুলিকে মাধবী আদৌ দেখিতে পারিতেন না। তাঁহার ধারণা ছিল—এ দেশের ছেলেরা লেখাপড়া শিখিলেও শিষ্টাচার কাহাকে বলে তাহা শিক্ষা করে নাই। তাঁহার একমাত্র কন্যা দেবযানী যখন এই সব ছেলেদের মধ্য হইতে জ্যোতির্ম্ময়কে ভাবী স্বামীরূপে নির্ব্বাচন করিয়া লইল, তখন তিনি একেবারেই অসম্মত হইলেন। কিন্তু সুরেশবাবু এ কথা শুনিয়া ভারি সুখী হইয়া উঠিলেন, কারণ সকল ছেলের মধ্যে তিনি জ্যোতির্ম্ময়কে বেশী রকম ভালবাসিতেন। জ্যোতির্ম্ময় যে বংশের ছেলে, তাহা তিনি বেশ চিনিতেন। এককালে রাধনগরের জমীদার-পুত্র প্রতাপের সহিত তিনি

বি-এ পড়িয়াছিলেন। প্রতাপের সহিত তাঁহার খুবই আলাপ ছিল।

প্রথমটায় আনন্দিত হইয়াই তিনি বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন, মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, জ্যোতির সঙ্গে দেবযানীর বিয়ে হতে পারে না, এ একেবারেই অসম্ভব।"

যতক্ষণ তিনি সপক্ষে ছিলেন, ততক্ষণ মাধবী বিপক্ষে ছিলেন। যে মুহূর্ত্তে স্বামী অমত করিলেন, তৎক্ষণাৎ তিনি সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন—"কেন, অসম্ভব কিসে?"

সুরেশবাবু উত্তর দিলেন, "কারণ সে তার বংশের একটীমাত্র ছেলে। দেবযানীকে বিয়ে করতে তাকে শুধু ধর্ম্ম নয়—মা দাদু সমাজ সবই ত্যাগ করতে হয়। ব্রাহ্মণ-পুত্রের সঙ্গে কায়স্থ-কন্যার বিয়ে হিন্দুসমাজের পণ্ডিতেরা কখনই অনুমোদন করবেন না, এটা তো বোঝ মাধবী। এতে মা দাদুর বুক ভেঙ্গে যে দীর্ঘশ্বাস পড়বে, সে দীর্ঘশ্বাস কি এদের জীবন সুখময় করতে পারবে মনে কর?"

তাঁহাকে অমত করিতে দেখিয়া মাধবীর ঝোঁক পড়িয়া গেল—যেমন করিয়াই হোক, এ বিবাহ দিতেই হবে। হয় তো এ বিবাহ হইত না যদি না সুরেশবাবু ভবিষ্যৎ পানে চাহিয়া অমত প্রকাশ করিতেন। শেষটায় মর্ম্মাহত সুরেশবাবু সরিয়া গেলেন, বিবাহ ব্যাপারে তিনি যোগ দেন নাই। জ্যোতির বিলাত যাওয়ার প্রস্তাবে তাঁহার মত ছিল না। বিলাতে গেলে মানুষ মানুষ হয়, এ দেশীয় শিক্ষায় তাহাদের মানুষ করিতে পারে না, এমন কোন প্রমাণ তিনি এ পর্য্যন্ত পান নাই। তাঁহার অমত দেখিয়া মাধবীর ঝোঁক পড়িয়া গেল জামাতাকে বিলাতে পাঠাইতেই হইবে, না হইলে তিনি লোকের কাছে মুখ দেখাইতে পারিবেন না।

সুরেশবাবুর যাহা অপছন্দ হইত, দুই একবার মৃদু আপত্তি করিয়া ছাড়িয়া দিতেন। সেই একই বিষয় লইয়া বেশী কষাকষি করা তাঁহার স্বভাব-বহির্ভূত ছিল।

এইরূপ অবাধ্য স্বামী লইয়া মাধবীকে দিন কাটাইতে হইতেছিল। প্রতি পদে স্বামীকে সতর্ক করিয়া দিতেন, শিষ্টাচার সভ্যতাতে স্বামীকে একেবারে আনাড়ি দেখিয়া সজল-চোখে ললাটে করাঘাত করিতেন। হায় রে, যে চিরটাকাল জ্ঞানার্জ্জনে জীবন কাটাইয়া দিতেছে, সে এইটুকু জ্ঞানও কি পায় নাই।

মেয়েরা শিক্ষা পায় মায়ের নিকটে। মা যে ভাবে চলেন, মেয়েরা সেইভাবে চলিতে অনুপ্রাণিতা হয়। মাধবীর আদর্শে দেবযানী গড়িয়া উঠিয়াছিল। পিতার উপদেশ সে পায় নাই এমন নহে, কিন্তু পিতার মনোমত সে নিজেকে গঠন করিয়া লইতে পারে নাই। ইহার জন্য তাহাকে অপরাধিনী করা যায় না; কেন না, সংসারে মায়ের আধিপত্য অব্যাহত; পিতা বড় দূরে থাকিতেন। মা স্বেচ্ছামত দেবযানীকে গর্ব্বিতা প্রকৃতির বিলাসিনী রূপে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। স্বামীকে সে দেবতারূপে ভক্তি করিতে পারে নাই, মানুষ হিসাবে আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছিল এবং তাহারই হিসাব রাখিতেছিল। একমাত্র কন্যার এরূপ অধোগতি দেখিয়া সুরেশবাবু অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। পত্নীর শিক্ষা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে যখন তিনি অতি মৃদুকণ্ঠে দুই একটা কথা বলিয়াছিলেন, তখন মাধবী রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং স্পষ্টই তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন—মেয়েদের সংবাদ মেয়েরাই জানে। পুরুষে জানে না বলিয়াই তাহাদের হাতে মেয়েদের শিক্ষার ভার কোনকালে থাকিতেও পারিবে না। যদি পুত্র হইত, পিতা তাহাকে শিক্ষা দিতেন,—মাধবী তাহাতে একটা কথাও বলিতেন না। কন্যাকে তিনি যে ভাবেই গড়িয়া তুলুন না, তাহাতে কথা বলিতে আসা নিষ্প্রয়োজন।

সুরেশবাবু আর কোন দিন একটা কথাও বলেন নাই। আপনার গৃহে পরের মত তিনি বাস করিতেন। লোকে জানিত, তাঁহার স্ত্রী, তাঁহার কন্যা। তিনি জানিতেন, ইহারা কেহই তাঁহার আপনার নহে।

এই অতিরিক্ত নিরীহ সরল লোকটীর সংস্কার ও বিশ্বাসের উপর অবিশ্রান্ত আঘাত করিয়া মাধবী নিজেই যে তাঁহাকে সংসার হইতে অনেক দূরে সরাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা ভাবেন না। মনের দুঃখে স্বামীকে আরও কটুকথায় ব্যথিত করিয়া তুলিতেন, নিজেও ব্যথা বড় কম খাইতেন না। স্বামীকে তিনি যথেষ্ট ভালবাসিতেন; কিন্তু তাঁহার কথায় বা কার্য্যে একদিনও সে ভাব ফুটিতে পারে নাই। সুরেশবাবুর ধৈর্য্যশক্তি অসীম, বড় ব্যথা পাইলেও তিনি মুখ ফুটিয়া তাহা প্রকাশ করিতে পারেন নাই। মুখে কখনও বড় মলিন একটু হাসির রেখা ফুটিয়া তখনই মিলাইয়া যাইত। নির্জ্জনে হাত দু'খানা ললাটে ঠেকাইয়া তিনি

ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতেন। তাঁহার হৃদয়ের এই বিশ্বাসে মাধবী আঘাত করিলেও তাহা শিথিল না হইয়া বদ্ধমূল হইতেছিল।

২৯

কন্যা ও মাতা উভয়ে বসিয়া নিমন্ত্রিতের তালিকা প্রস্তুত করিতেছিলেন, ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই সুশিক্ষিত, বিলাত-ফেরত। বাকি যাঁহারা এই তালিকার মধ্যে স্থান পাইয়াছিলেন, তাঁহারা সম্ভ্রান্ত বড়লোক, উচ্চ কাজ করেন, কাজেই তাঁহাদেরও বাদ দেওয়া যায় না। দেবযানীর কতকগুলি অন্তরঙ্গ বন্ধুর নাম দেওয়া হইল, ইহারা দেবযানীর সহিত পড়ে। এই তালিকা হইতে বাদ পড়িল জ্যোতির্ম্ময়ের ছাত্রজীবনের বন্ধুগুলি— যাহারা তাহার উন্নতিতে যথার্থই আনন্দিত হইয়াছিল। সেদিন তাহার বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় তাহারা অভিনন্দিত করিতে না পারিলেও পরে একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া, তাহাকে ফুলের মালা পরাইয়া দিয়াছে। কৃত্রিম আদব-কায়দার মধ্য হইতে এই অকৃত্রিম স্নেহ-ভালবাসার মাঝখানে গিয়া জ্যোতির্ম্ময় যেন তাহার সুখময় বাল্যকাল ফিরিয়া পাইয়াছিল। সে ক্ষণেকের জন্য প্রচ্ছন্নতার মধ্য হইতে একেবারে বাহিরে গিয়া পড়িয়াছিল, প্রাণ ভরিয়া অনাবিল আনন্দ পান করিয়াছিল। এই সব বন্ধুর নিকটে তাহার পদে পদে শিষ্টাচার লঙ্ঘনের ভয় ছিল না, প্রত্যেক কথা সংযত ও মার্জ্জিত করিয়া বলার আবশ্যকতা ছিল না, এখানে সে স্বাধীন, মুক্ত।

তালিকার মধ্যে ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট—কেহই বাদ যায় নাই। জামাতাকে ব্যারিষ্টারী করিতে হইবে, সকলের সহিত পরিচয় করিয়া দেওয়া চাই! মাধবী তালিকা তৈয়ারী করিয়া সগর্ব্বে বলিলেন, "তোমার সঙ্গে এঁদের সকলের আলাপ করিয়ে দেওয়া দরকার বলে, একদিন এঁদের এখানে নিমন্ত্রণ করব ভেবেছি।"

নামগুলি জ্যোতির্ম্ময় দেখিয়া গেল, ইহাদের মধ্যে অর্দ্ধেক তাহার অপরিচিত।

সুরেশবাবুকে মাধবী এ ব্যাপার হইতে একেবারেই নির্লিপ্ত রাখিতেন, যদি না টাকার সংস্রব তাঁহার সহিত থাকিত। এই বিরাট অনুষ্ঠানে অনেক টাকার দরকার। অত টাকা মাধবীর ক্যাশে ছিল না; কাজেই সুরেশবাবুর নিভৃত গোপন-গৃহের নিস্তব্ধতা সেদিন তাঁহাকে ভঙ্গ করিতে হইল।

স্বামী তখন একখানা বই লইয়া নিবিষ্টচিত্ত, স্ত্রীর পায়ের শব্দ পাইয়াও তিনি জানিতে পারিলেন না, কেহ গৃহে আসিয়াছে। মাধবী খানিক অপেক্ষা করিয়াও যখন দেখিলেন, স্বামী মুখ তুলিলেন না, তখন চটিয়া উঠিলেন। তিনি ঠিক জানিতেছিলেন, এ তন্ময়তা কল্পিত মাত্র, সুরেশ বাবু তাঁহাকে দেখিয়াও দেখিতেছেন না। মাধবী তখনই ফিরিয়া আসিতেছিলেন, মনে হইল ফিরিয়া গেলে ক্ষতি তাঁহারই,—ব্যয়কুণ্ঠ স্বামী অনেকগুলি টাকা নষ্টের হাত হইতে বাঁচিয়া যাইবেন।

মাধবী অগ্রসর হইয়া স্বামীর হাত হইতে বইখানা টানিয়া লইয়া টেবলের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিলেন। বিস্মিত সুরেশ বাবু স্ত্রীর পানে বিস্ফারিত-নেত্রে তাকাইয়া রহিলেন, হঠাৎ তাঁহার এ ঘরে আসা এবং নির্দ্দোষ বইখানা টানিয়া আছড়াইয়া ফেলিবার কারণ তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না। বড় আদরের বইখানার দুর্দ্দশা দেখিয়া, তাঁহার হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিল, তিনি সেখানা তুলিয়া লইয়া পাতাগুলি সযত্নে ঠিক করিয়া দিতে দিতে মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "এই নির্দ্দোষ বইখানা কি অপরাধ করেছে মাধু? পরের ওপরে রাগ করে, এখানা এমন করে, আছড়ে ফেলে দেওয়া ভারি অন্যায়।"

দৃপ্তকণ্ঠে মাধবী বলিলেন, "ফেলব না? এই বইগুলোই হয়েছে আমার শত্রু,—তোমায় আমার কাছ হতে অনেক তফাতে টেনে নিয়ে গেছে এরাই। যদি আগুন দিয়ে সব বইগুলো পুড়িয়ে ছাই করে ফেলতে পারি, তবে আমার সকল আপদের শান্তি হয়। বইগুলো থাকার জন্যেই তো তোমায় দরকারের সময় পাশে পাই নে।"

শান্তভাবে সুরেশবাবু বলিলেন, "বইগুলো তোমার শত্রু, কিন্তু এরাই আমার প্রকৃত মিত্র মাধু। যখন মনে হয়, আমি পৃথিবীর একটা ব্যর্থ জীব, জীবনটা যখন শূন্যতায় ধীরে ধীরে পূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন সান্ত্বনা দেয় এরাই মাধবী, মানুষ সান্ত্বনা দিতে এসে আরও আঘাত দেয় মাত্র। এ কিছু নিতে চায় না, শুধু দিয়ে যায়. আর মানুষ শুধু নিয়ে যায়, কিছু দিতে চায় না।"

মাধবী নরম সুরে বলিলেন, "তা তো বলবেই তুমি; কখনও কিছু মানুষের কাছ হতে পাও নি, শুধু দিয়েই যাচ্ছো, এ রকম কথা তুমি ছাড়া

জগতে আর কেউ বলতে পারবে না। যাক ওসব কথা, আমার মোটে সময় নেই, অনর্থক কতকগুলো বাজে কথা বলতে আমি আসি নি। সেদিন যে সবাইকে নিমন্ত্রণ করার প্রস্তাব করেছিলুম, পরশু শনিবারে দিন ঠিক করেছি। এই ফর্দ্দ তৈরী করে এনেছি, দেখ—তোমার আলাপী আর কেউ যদি থাকেন, নামটা লিখে ফেল, আমি চটপট নিমন্ত্রণ করবার ব্যবস্থা করি। আর খরচ যা হবে, সেই টাকাটা আমায় আজই দিয়ে দাও, আমি নিজে পছন্দ করে, ভাল দেখে জিনিস আনবার যোগাড় দেখি। তুমি তো কিছুতেই হাত দেবে না, দায় যেন সব একলা আমারই। জামাই এল, তাকে যে সঙ্গে করে নিয়ে একটু বেড়ানো, লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া—এসব তোমার কিছু নেই।"

ফর্দ্দখানা হাতে লইয়া দেখিয়া সুরেশবাবুর মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল, তিনি বলিলেন, "উঃ, এত? এতে খরচ বড় কম পড়বে না তো।"

বিদ্রূপের সুরে মাধবী বলিলেন, "তবে কি তুমি মাত্র একশ টাকায় সারতে চাও না কি? তবে সোজাসুজি বল, যে এই সব বড়লোকদের নিমন্ত্রণ করে, তোমাদের যশোর জেলার মত ডাল-ভাত-চড়চড়ি খাওয়ান হোক,—অদ্ভুত মানুষ যা হোক,—না হয় কিছু টাকাই খরচ হবে, তাই বলে তুমি পেছিয়ে যাবে? জামাই বিলেত হতে এসেছে, বন্ধুরা আনন্দ করে ধরেছে, তাদের তুমি খাওয়াতে চাও না? ছিঃ, ছিঃ, কি রকম লোক যে তুমি, তা আমি এখনও ভেবে ঠিক করতে পারি নি। বেশ, তোমার না ইচ্ছে হয়, টাকা দিয়ো না, আমি যখন কথা দিয়েছি, তখন যেমন করেই হোক—কথা আমায় রাখতেই হবে।"

রাগভরে ফর্দ্দখানা তিনি স্বামীর হাত হইতে লইতে গেলেন; সুরেশবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "অত রাগ কর কেন মাধু! আমি কি বলছি, টাকা দেবো না? এতে খরচ বড় বেশী পড়বে, এই একটা কথা মাত্র তোমায় বলেছি; তুমি আমার স্ত্রী—তোমার যদি একটা কথা না বলতে পারলুম, তবে আর কার কাছে বলব বল দেখি?"

তাঁহার নরম সুর শুনিয়া খুসী হইয়া উঠিয়া মাধবী বলিলেন, "তা বলে আর কি করা যাবে বল। একবারই না হয় খরচ হবে, বারবার হবে না। খাওয়ানো উচিত কি না তুমিই তা বল। ওই যে সেদিন মিঃ চ্যাটার্জ্জি, তাঁর ছেলের আই-সি-এস পরীক্ষার খবর পেয়ে, মস্ত বড় একটা ভোজ দিয়ে ফেললেন। শুধু কি খাওয়ারই আয়োজনই লোকে করে, না সব লোকে খেতেই যায়? এর মূলে উদ্দেশ্য সকলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় রাখা, অপরিচিতকে সকলের সঙ্গে পরিচিত করে দিতে হবে, সবাই তাকে চিনতে জানতে পারবে। অবশ্য তোমার একটু বেশী খরচ হবে, কিন্তু তাতেই বা কি? জ্যোতির যা আছে, আর ভগবানের কৃপায় সে যা পাবে, তাতে তোমার মত দশটা প্রফেসরের মাইনে দেওয়া চলবে।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সুরেশবাবু বলিলেন, "তা যে চলবে সে আমিও জানি; কিন্তু কথাটা কি জানো,—আজকালকার দিনে নতুন ব্যারিষ্টার-দের দিন চালানোই মুস্কিল হয়ে উঠেছে। এমন অনেক ব্যারিষ্টার আছেন, দিন গেলে যাঁরা দশটা টাকা পান কি না সন্দেহ, অথচ চাল বজায় রাখতে দৈনিক কত করে ব্যয় পড়ে তার হিসাব করতে গেলে চক্ষু স্থির হয়ে যায়। এই জন্যেই আগে বলেছিলুম মাধু, দরকার নেই অত খরচ পত্র করে বিলেতে পাঠিয়ে, সেখানকার খরচ চালিয়ে। ওর চেয়ে দেশে থেকে যে কোন কাজে লাগলে ভালই হতো। বিলেতে পাঠিয়ে লাভ হয়েছে এই—এ দেশের অধিবাসী—যারা ওর ভাই, যারা ওর মা, তাদের সঙ্গে আর মিশতে পারবে না, এই পার্থক্য-জ্ঞানটা ওর মনে বিশেষ করে জেগে উঠেছে। এই তো মাধু, বার বছর আমিও তো বিলেতে ছিলুম, কিন্তু কি বেশী অর্থ উপার্জ্জন করছি? নরেনবাবু এদেশে থেকে যা পাচ্ছেন, আমিও বিলেত হতে পাশ করে এসে তাই পাচ্ছি। আমি যেটুকু পারছি, আমার জামাই তাও পারবে না।"

সগর্ব্বে মাধবী বলিলেন, "না পারলেই বা, তাতেই বা ওর কি? তোমার মত লোক তো নয়—চাকরীই যার জীবিকা, চাকরীর অভাবে শুকিয়ে মরতে হবে। ও জমীদারের ঘরের ছেলে, নিজে দু'দিন বাদে জমীদার হয়ে বসবে, তার পরে যাই কেন উপার্জ্জন করুক না—সেটা তো ওর অতিরিক্ত পাওয়া। শুনেছি ওদের জমীদারীর আয় খুব, তবে ওর ভাবনাটা কিসের?"

"ভাবনাটা কিসের?"

সুরেশবাবুর মুখে হাসি আসিল, "ভাবনাটা কিসের তা জানো না মাধু? জ্যোতির দাদু তাকে ত্যাগ করেছেন, তাঁর সম্পত্তির একটা পাই পয়সার অধিকারী আর সে নয়।"

মাধবী অবিশ্বাসের সুরে বলিলেন, ওসব কথা

রেখে দাও ; রাগের বশে অমন কথা সকলেই বলে থাকে দেখা যায়, তা বলে সত্যিই ত্যাগ করতে পারে না। তাঁদের ওই একটী মাত্র ছেলে, ওকে ত্যাগ করা কি যা তা কথা ? এর পরে তাঁরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হবেনই। কেন না—শুনেছি জ্যোতি বই তাদের আর কেউ নেই, জ্যোতির দাদু তাকে বঞ্চিত করতে চাইলেও জ্যোতির মা তা হতে দেবেন না।"

সুরেশবাবু আর সে সব কথা না তুলিয়া কাগজখানা দেখিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রিয় ছাত্রগণের মধ্যে একজনেরও নাম ছিল না। হৃদয়ে আঘাত পাইলাও সে কথা তিনি প্রকাশ করিলেন না। ধীরে ধীরে স্ত্রীর হাতে সেখানা ফিরাইয়া দিলেন।

সন্তুষ্ট মনে মাধবী বলিলেন, "তাহলে আজই কিছু টাকা দিয়ে দিয়ো, আমি কতকগুলো জিনিসের অর্ডার দিই, কিছু হয় তো আগাম চাইতেও পারে।"

"আচ্ছা" বলিয়া সুরেশবাবু পরিত্যক্ত বইখানা তুলিলেন।

এ ব্যবস্থা তাঁহার কাছে মোটেই ভাল লাগে নাই, খাপ তিনি একটা কথাও বলিলেন না। তিনি টাকার মালিক, ইহাদের কেবল টাকা লইবার জন্যই তাঁহার সহিত সম্পর্ক, তিনিও টাকা ফেলিয়া দিয়া খালাস হইবেন, তাহাতে আর কি ?

সন্ধ্যার সময় তিনি জামাতাকে লইয়া সম্মুখের বাগানে বেড়াইতেছিলেন। বিশেষ লক্ষ্য করিয়া তিনি দেখিতেছিলেন, বাড়ীতে এই আনন্দোৎসবের আয়োজনে জ্যোতির্ম্ময় যেন খুসি হইতে পারে নাই, সেও যেন বাধ্য হইয়া দেবযানী ও মাধবীর প্রস্তাবে মত দিয়া যাইতেছিল। সুরেশবাবু বুঝিতেছিলেন, এই আনন্দোৎসবে তাহার অকৃত্রিম বন্ধুদের বাদ দেওয়াতে সে মর্ম্মাহত হইয়াছে।

দেবযানী তাহার এক বন্ধুর বাড়ীতে চা-পানের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছে। জ্যোতির্ম্ময়েরও নিমন্ত্রণ ছিল, শারীরিক অসুস্থতার ওজর করিয়া সে যায় নাই।

সুরেশবাবুর ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে মাধবী ডাক্তার মিত্রকে লইয়া উৎসবের জিনিস-পত্রাদি ক্রয় করিয়া আনিতে গিয়াছেন। শ্রান্ত স্বামীর ভার দাসদাসীর উপর দিয়া গিয়াছেন।

জ্যোতির্ম্ময় একা চুপচাপ নিজের ঘরটাতে বসিয়া ছিল, সুরেশবাবু তাহাকে বেড়াইতে যাইবার জন্য ডাকিবামাত্র সে বাহির হইল।

তখন অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহ, শীতের বাতাস কেবলমাত্র মৃদুভাবে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, আকাশে ধূমের আকারে কুয়াসা ঘনাইয়া আসিয়াছে।

বাগানের মধ্যে থামিয়া সুরেশবাবু বলিলেন, "ঘরে না থেকে এ সময়টা বাগানে একটু বেড়াও জ্যোতি, তাতে শুধু যে দেহের অবসাদ ঘুচবে, তা নয়, মনের অবসাদও দূর হবে।"

বলিতে বলিতে তাঁহার দৃষ্টি জ্যোতির্ম্ময়ের মুখের উপর পড়িল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি অসুখ করেছে ?"

জ্যোতির্ম্ময় জোর করিয়া মুখে একটুকরা হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, "না, অসুখ করেনি, বেশ ভালই আছি।"

জ্যোতির্ম্ময় এই শান্ত-স্বভাব মিষ্টভাষী লোকটীকে যথার্থ ই ভালবাসিত, শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। কলেজের সব ছেলেই সুরেশবাবুকে ভক্তি করিত—ভালবাসিত। সুরেশবাবুর নাম করিতে, সকল ছেলের মাথা শ্রদ্ধায় নত হইয়া পড়িত। জ্যোতি আগে বাহির হইতে তাঁহার যেটুকু পরিচয় পাইয়াছিল, এখন এক পরিবারভুক্ত হইয়া, তদপেক্ষা অনেক বেশী পরিচয় পাইয়াছে। সে দেখিতে পাইতেছে, নিত্য এই নিতান্ত সরল ও মধুর প্রকৃতির লোকটীকে কতখানি নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়, তথাপি আশ্চর্য্য তাঁহার সহ্য-শক্তি,—কেহ তাঁহাকে দেখিয়া বুঝিতে পারে না, তিনি নিত্য কতখানি করিয়া ব্যথা পাইতেছেন ; কতখানি -ব্যথা প্রত্যহ তাঁহার বক্ষের অন্তরালে সঞ্চিত হইতেছে। একদিন এমনই ব্যথার বোঝা জমিতে জমিতে কবে তাঁহাকে ছাপাইয়া উঠিবে, তাহা সে জানে।

সুরেশবাবু বেড়াইতে বেড়াইতে অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, "কালকের ব্যাপারে তোমার বন্ধু কাউকেই বললে না কেন ?"

"আমার বন্ধু—" জ্যোতির্ম্ময় আশ্চর্য্য হইয়া সন্ধ্যার স্বল্পান্ধকারে ঈষৎদৃষ্ট সুরেশবাবুর মুখপানে তাকাইল।

সুরেশবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ তোমার সব কলেজের বন্ধু, হেমেন, কিশোর, প্রণব, প্রশান্ত—"

তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া জ্যোতির্ম্ময় অতি গোপনে একটা নিঃশ্বাস ফেলিল, বলিল, "না, তাদের কাউকে এর মধ্যে না আনার ইচ্ছা

আমায়, সেই জন্তেই কাউকে বলব না। আপনি তো জানেন, এর মধ্যে তাদের আনলে তারা তো আনন্দ পাবেই না, উপরন্তু তাদের অপদস্থ হতে হবে বড় কম নয়। তাদের মধ্যে অনেকেই গৃহস্থের ছেলে—চেয়ারে বসে, কাঁটা চামচ ধরে, টেবলে খেতে তারা একেবারেই অনভ্যস্ত। আর কেউ তাদের না জানলেও আপনি তো তাদের জানেন। আমার যদি কোন দিন ক্ষমতা হয়—দেশী ভাবে নিমন্ত্রণ করে তাদের খাওয়াব।"

সুরেশবাবু ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, প্রশংসমান চোখের দৃষ্টি তাহার মুখের উপর ফেলিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, আমারও একান্ত ইচ্ছা তাই। কাল বাড়ীতে একটা ডিনার-পার্টি আছে, এটা হয়ে যাক, তার পরে আসছে শনিবারে বাংলা মতে আমরা একটা ভোজের অনুষ্ঠান করব। সে খরচের জন্তে তোমায় ভাবতে হবে না; কারণ, যাদের আমি খাওয়াব, তারাও তোমারই মত আমার ছাত্র। এর পর যখন তোমার ইচ্ছা হবে তখন তুমি তাদের খাইয়ো।"

জ্যোতির্ম্ময়ের মুখখানা আনন্দে দীপ্ত হইয়া উঠিল। আগামী কল্যের বৃহৎ অনুষ্ঠানে তাহার বন্ধু কাহাকেও না নিমন্ত্রণ করিতে পাইয়া সে বাস্তবিকই বড় কষ্ট পাইয়াছিল।

সুরেশবাবু স্থির দৃষ্টি জামাতার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া বলিলেন, "আর একটা কথা তোমায় বলি জ্যোতি, আশা করছি সে কথা শুনে তুমি রাগ করবে না। তোমার মা ও দাদুর খোঁজ তুমি এসে পর্য্যন্ত নাওনি, কিন্তু তোমার মত শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ছেলের কাছ হতে এ রকম ব্যবহার আমি কখনও প্রত্যাশা করিনি। আমি মনে করি, মায়ের প্রতি, দাদুর প্রতি তোমার যে কর্ত্তব্য আছে, তা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য পালনের চেয়েও কঠোর। যে দাদু তোমায় পেয়ে পুত্রশোক বিস্মৃত হয়েছিলেন, যে মায়ের সংসারে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই, তাঁদের প্রতি তোমার এই ব্যাবহারটা কি উচিত বলে মনে কর? মনে কর জ্যোতি—আমি তোমায় খুব ভালবাসলেও এমন করে তাঁদের বুক হতে কেড়ে নিতে চাইনি, আমি প্রথমেও তোমার কর্ত্তব্য তোমায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলুম, আমার মেয়েকে বিয়ে করতে তোমায় মত দিইনি। তুমি যা করেছ, আজ তার কথা ভাবছ না, কিন্তু এমন একদিন আসবে, যে দিন এই ভুল শোধরানোর জন্তে অস্থির হয়ে উঠবে—কিন্তু তখন আর ভুল শোধরাবার উপায় পাবে না। এখনও আমার কথা মনে কোরো জ্যোতি, জেনো—আমি যা বলছি, তা তোমার ভালর জন্তেই বলছি।"

সন্ধ্যার অন্ধকার নিঃশব্দে আকাশের কালো কোল বাহিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, জামাতাকে সঙ্গে লইয়া সুরেশবাবু গৃহে ফিরিলেন।

সে দিন সমস্ত রাত্রি জ্যোতির্ম্ময় ঘুমাইতে পারিল না, অত্যন্ত অস্থিরভাবে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

৩০

"দিদি, একটা কথা বলি শোন।"

সীতা কি একটা কাজে ঘরের মধ্যে আসিতেছিল, দাদুকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া, সে আর তাঁহাকে ডাকিয়া বিরক্ত করিল না। কাজটা সারিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া যাইতেছিল, বিহারীলালের আহ্বান শুনিয়া ফিরিয়া আসিল।

দাদু বলিলেন, "আমার পাশে—এইখানে বস ভাই, অনেকগুলো বলবার মত কথা আছে। বউ-মা মারা যাওয়ার পর হতে আমি যে কাজগুলো করেছি, তার একটাও তোকে এখনও বলিনি, বলবার সময়ও পাইনি। জানে শুধু সুশীল, আর আমার কয়জন মাত্র বিশ্বাসী কর্ম্মচারী। তারা আমার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছে, এ বিষয়ে কোন কথা আমার জীবনকালে উত্থাপন করবে না। আচ্ছা, সে সব কথা পরে হচ্ছে, তুই ততক্ষণ এইখানটায় বসে আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দে দেখি। অনেককাল মা আমার মারা গিয়ে পর্য্যন্ত আর এ আবদার করিনি, তোকেও কাছে বসতে বলিনি, আজ একবার বস না ভাই।"

সীতা তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িল, তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমি কতবার আপনার ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে ফিরে গেছি, দাদু, আপনি এত কাজে ব্যস্ত—মুখ তুলবার অবকাশ পর্য্যন্ত পান নি। দেখতুম, প্রায় সর্ব্বক্ষণই আপনার কাছে লোকজন রয়েছে, সেই জন্তেই আমিও জোর করে আসিনি। আপনি কি কথা বলবেন দাদু বলুন।"

বিহারীলাল একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "বড় ইচ্ছা হয়েছে, একবার কিছুদিনের জন্তে তীর্থে

যাই। ধর্ম্ম কর্ম্ম তো কিছুই করিনি দিদি, জীবনের শেষ সীমায় পা দিয়ে, এখন মনে হচ্ছে, সব মিথ্যে হয়ে গেছে। মায়ের আমার তীর্থে যাওয়ার বড় সাধ ছিল, সে সাধ মিটাতে পারলুম না, বড় ক্ষোভ থেকে গেল দিদি। আমিই কি আর বেশী দিন বাঁচব রে ভাই, বেশ বুঝছি—দিন ফুরিয়ে এসেছে। নেহাৎ না কি কর্ম্মফল, তাই শেষ কালটায় কেবল ধাক্কাই পাচ্ছি। কাল রাত্রে কি স্বপ্ন দেখেছি জানিস দিদি? স্বপ্ন দেখলুম, আমি যেন কোথায় গেছি, সেখানে আমি দেখতে পেলুম, সবাইকে—কি সুন্দর, মনে করতেও আমার গা শিউরে উঠছে। সেখানে দেখলুম তোর ঠাকুর মা দুই কোলে প্রকাশ প্রতাপকে নিয়ে বসে, আর আমার মা পেছনে দাঁড়িয়ে। মায়ের আমার আয়ুষ্মতী মূর্ত্তি, সিঁথের সিঁদুর দপ দপ করে জ্বলছে। শুনলুম—প্রতাপ বলছে—বাবা, তোমার কর্ম্ম এখনও ক্ষয় হয়নি সেইজন্য আমাদের কাছে আসতে পারছ না। তীর্থ ভ্রমণে তোমার এই কর্ম্মটুকু ক্ষয় হয়ে যাবে, তখন সীতার ওপরে সব ভার দিয়ে, তুমি আমাদের কাছে আসতে পারবে। কাল সেই স্বপ্ন দেখে, আমি যেন পথ পেয়েছি, তাই তীর্থভ্রমণে যেতে চাই, আমার যা কিছু পাপ আছে, তা ক্ষয় করতে চাই। তার পর ওদের কাছে আনন্দলোকের অধিবাসী হয়ে বাস করতে পারব।"

সীতা বলিতে গেল, "আর দুই মাস গেলে ভাল হয় দাদু, এই জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসের দারুণ রোদ—"

বাধা দিয়া বিহারীলাল বলিলেন, "এ রোদে আমার কিছুই কষ্ট হবে না রে, কিছুই কষ্ট হবে না। কর্ম্ম অর্থে পাপ। সেই পাপ থাকার জন্তেই তো তাদের কাছে যেতে পারছিনে, তা তো শুনলি। দিন ক্রমে চলে যাচ্ছে,—সত্তর হতে একাত্তর, একাত্তর হতে বায়াত্তর, এমনি করে পঁচাত্তর বছর আমার পার হয়ে গেল, আরও কি বেঁচে থাকতে বলিস? হ্যাঁ, তাই তো তোদের ইচ্ছে। তোদের পরমায়ু সব আমি নিয়ে বেঁচে থাকি, তোরা তোদের সব আমায় দিয়ে, নিঃশেষ হয়ে, চলে যা। আরও বাঁচতে গেলে, আরও জ্বালা সইতে হবে তা জানিস। তোকে ঘিরে এখনও আমার শুষ্ক জীবন-নদী বয়ে যাচ্ছে, তুইও তো কোন দিন আমায় ফেলে চলে যাবি। উঁহু, তা হচ্ছে না সীতা, এতদিন পথ দেখতে পাইনি, দিশেহারা হয়ে, শুধু ঘুরেই মরেছি; আজ তারা পথ দেখিয়েছে, আমি আর তোদের কারও কথা শুনব না, কারও ছলনায় ভুলব না, এ পথ বেয়ে চলবই।"

মুখ ফিরাইয়া লইয়া তিনি মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

সীতা বলিল, "বেশ দাদু, আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। আপনার কষ্ট হবে বলেই আমি বলেছিলুম যে, এই সময় তীর্থে গিয়ে নাকাল হবেন। আপনি যাওয়ার যোগাড় করতে সুশীল দাদাকে আদেশ দিন।"

তাহার মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া, বিহারীলাল বলিলেন, "বুঝলি দিদি, এইবার আমি ঠিক মুক্তি পাব। সত্যি—তুই-ই বল দেখি, এতকাল বাদে হঠাৎ এদের সকলকে স্বপ্ন দেখার অর্থ কি? দেখলুম—ঠিক সেই আগেকার সংসার, সেখানে জ্যোতি নেই, ছোট বউ মা নেই, তুইও নেই। দেখে আমার চোখ ফেটে জল বার হয়ে পড়ল, আমি জেগেও আজ কত যে চোখের জল ফেলেছি—তা তো কেউই জানে না ভাই। আমার যাওয়ার দিন কাছে না এলে আমি তাদের দেখতে পাব কেন দিদি?"

ধীরস্বরে সীতা বলিল, "কিন্তু দাদু, অনেকে বলেন যে, স্বপ্ন মানসিক একটা ক্রিয়া মাত্র, ওর মধ্যে সত্যি কিছু নেই।"

বিরক্তভাবে বিহারীলাল বলিলেন, "অনেকের দোহাই দিস নে সীতা, আমি ওই সব কথা শুনতে চাই নে। অনেকে কি না বলে, তাই বল দেখি। তা বলে সেই সব কথা যে মানতে হবে, এমন কোন কথা নেই।"

সীতা চুপ করিয়া রহিল। সে জানিত, বিহারীলালের কথা মানিয়া লইতেই হইবে, তাহার উপরে কোন কথা বলিতে গেলে একটা মহা অনর্থ বাধিয়া যাইবে মাত্র।

বিহারীলাল পৈতা হইতে চাবিটা খুলিয়া, সীতার হাতে দিয়া বলিলেন, "এই চাবি দিয়ে আমার বাক্সটা খুলে একপাশে ফিতে দিয়ে জড়ানো যে কাগজগুলো রয়েছে, আমার কাছে নিয়ে আয় তো, দিদি, তোকে সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেই—এর পরে আর মনেও থাকবে না। বিদেশে ঘুরব, কবে ফিরব, কখন কি হবে, তার তো ঠিক নেই।"

সীতা কথাটা বুঝিতে পারিল না, চাবি লইয়া উঠিল।

বিহারীলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল হঠাৎ

একশ' টাকা চেয়ে নিলি কেন সীতা, কোন দরকার ছিল কি ?"

সীতা হঠাৎ উত্তর দিল না।

জয়ন্তীর দাদার একটী সম্বন্ধী আজ কয়দিন হইল রামনগরে আসিয়াছেন, তাঁহার সহিত জয়ন্তীর সম্পর্কীয়া এক ভগিনী আসিয়াছেন। ইনি কলিকাতায় ইভার একটী বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া আসিয়াছেন, পাত্রপক্ষীয়েরা শীঘ্রই ইভাকে দেখিতে আসিবেন। প্রথমটায় তাঁহারা এত দূর পল্লীতে মেয়ে দেখিতে আসিতে রাজি হন নাই। তাহার পর যখন শুনিলেন, পাত্রী বৃদ্ধ জমীদারের বিশাল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী, বাড়ী ঘর সবই তাহার, তখন তাঁহারা নিজেই আসিতে সম্মত হইলেন। এই ধনী লোকদের উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা জয়ন্তী করিতে পারিবেন কি না, এই জন্ম ভগিনী স্বয়ং আসিয়াছেন, সঙ্গে আসিয়াছেন জয়ন্তীর ভ্রাতার সম্বন্ধী।

জয়ন্তীর ভগিনী সুশীলা অত্যন্ত রূঢ় স্বভাবের ছিলেন। তাঁহার স্বামী, পুত্র, কন্যা কেহই ছিল না। সংসারে ছিলেন ভাসুর দেবর প্রভৃতি।

রজনীকান্ত লোকটীর গুণ অসীম ছিল। একে একে এই ত্রিশ বত্রিশ বৎসরের মধ্যে সে তিনটী স্ত্রীকে ভব-নদীর ওপারে বিশ্রাম করিতে পাঠাইয়া, সংসারে বীতস্পৃহ অবস্থায় বাস করিতেছে। অতিরিক্ত নেশা করবার জন্য—কোনকালে তাহার যে চেহারা ভাল ছিল, তাহা দেখিয়া কেহ বলিতে পারিবে না। জগতে এমন কোন মাদক দ্রব্য ছিল না, যাহার গুণ রজনীকান্ত না জানিত।

সুশীলা আসিয়াই ভগিনীর সংসারে জাঁকিয়া বসিলেন। তিনি ঠিক জানিতেছিলেন—ইভা সমস্ত বিষয় না পাউক, অর্দ্ধেক নিশ্চয়ই পাইবে।

জ্যোতিকে যদি ঠাকুরদাদা কিছু না দেন, তবে ভবিষ্যতে সবই তো ইভার। সীতার পরিচয় জয়ন্তীর মুখে পাইয়া তিনি জ্বলিয়া উঠিয়াছিলেন। তথাপি জোর করিয়া বলিয়াছিলেন, বুড়া বাঁচিয়া থাকিতেই তিনি সব বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া লইবেন, তিনি মুখচোরা জয়ন্তী নহেন।

সীতা চোরের মত এদিক ওদিক ঘুরিত, ম্লান-নেত্রে চাহিয়া দেখিত, দেবীর আসনে কে আসিয়া বসিয়াছে। ইহারা তাহার অবাধ স্বাধীনতা কাড়িয়া লইয়াছে, তাহাকে তাহার প্রাপ্য হইতে একেবারেই বঞ্চিতা করিয়াছে। ঈশানী বর্ত্তমান থাকা কালে একদিন সে এই গৃহের কর্ত্রী ছিল, আজ সে কেহ নয়, দাসীর অধম হইয়া পড়িয়া আছে। ইহারা তাহার সব লইয়াছে, লইতে পারে নাই শুধু দাদুকে। দাদু তাহার আগেও যেমন ছিলেন, এখনও তেমনি আছেন, আগেও যেমন তাহার উপর নির্ভর করিতেন, এখনও তেমনি নির্ভর করিয়া থাকেন।

এক একবার সীতার চোখে জল আসিত, আর্ত্তকণ্ঠ প্রাণপণে রুদ্ধ করিয়া রাখিত, দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের মতই একটা শব্দ বাহির হইত—"মা—"

এই শব্দটীর সঙ্গে সঙ্গে ঝর ঝর করিয়া চোখের জল ঝরিয়া পড়িত।

কোন্ কালে সে তাহার গর্ভধারিণী স্নেহময়ী মাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল, আজ তাহা মনেও পড়ে না। ভগবান তাহাকে ঠিক তেমনিই একটি স্নেহময়ী মা দিয়াছিলেন। আপনার কর্ম্মফলে সে মাকেও সে হারাইয়া ফেলিয়াছে।

এই দীর্ঘকালের মধ্যে বিহারীলাল জানিতে পারেন নাই, সীতা তাঁহার সংসার হইতে কতখানি দূরে সরিয়া গিয়াছে, জানিতে পারেন নাই—খরচ-পত্রের ভার সে জয়ন্তীর হাতে দিয়াছে। এবার খরচ শীঘ্র ফুরাইয়া গিয়াছে, সেই জন্যই সে সুশীল-বাবুর নিকট হইতে একশত টাকা লইয়া জয়ন্তীকে দিয়াছিল।

সুশীলবাবুকে সীতার আবশ্যক মত যখন তখন টাকা দিবার আদেশ দেওয়া থাকিলেও তিনি এ টাকা দিতে আপত্তি করিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, "ওদের জন্যে তোমার এত মাথা ব্যথা কেন সীতা? আমি কর্ত্তাবাবুকে জানাতে বাধ্য হব যে, তুমি আর সংসারের মধ্যে নাই, কোন ভার তোমার নেই।"

সীতা শান্তকণ্ঠে বলিয়াছিল, "মাপ করুন দাদা, এখন এ কথা তুলে একটা তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে তুলবেন না। দাদু যে প্রকৃতির লোক, তাতে কাউকেই মাপ করবেন না, এঁরা চলে যান, তার পর যা খুসী বলবেন।"

সে জানিতে পারে নাই, সুশীলবাবু স্পষ্টতঃ কর্ত্তাকে কিছু না বলিলেও, আভাসে বৃদ্ধকে সীতার কষ্টের কথা কতকটা জানাইয়াছিলেন, তাই তিনি তাহাকে এখনই সব কথা বুঝাইয়া দিতে চান। কখনও যে তিনি টাকা দিয়া কেন দিলেন, সে কারণ জানিতে চাহেন নাই, আজ সেই তিনিই কারণ জানিতে চাহিতেছেন।

সীতা চাবি দিয়া বাক্স খুলিতে খুলিতে বলিল,

"কাল হঠাৎ টাকার বড্ড দরকার পড়েছিল দাদু, সেইজন্যে—"

দাদু শুষ্ক হাসির সামান্য একটু রেখা জোর করিয়া শুষ্ক ওষ্ঠে ফুটাইয়া তুলিয়া বলিলেন, "অনর্থক মিথ্যে কথা বলে আমার চোখে ধুলো দিতে চাচ্ছিস কেন ভাই? আমি বাইরে থাকি বলে, মনে করিস, সংসারের কোন খবর আমি রাখিনে? পাগলী, সব দিকে চোখ রেখে, কাণ পেতে তবে সংসারে চলতে হয়, তা জানিস? হ্যাঁ, ওই কাগজ পত্রগুলো নিয়ে আয় আমার কাছে।"

গোলাপী ফিতায় বাঁধা কাগজপত্রগুলা সীতা তাঁহার নিকটে লইয়া আসিল।

উঠিয়া বসিয়া কাগজগুলা পাশে সরাইয়া রাখিয়া সম্মুখের স্থান দেখাইয়া দিয়া বিহারীলাল বলিলেন, "এইখানে বস দেখি ভাই, তোর সঙ্গে আমার দরকারী কথা আছে। আগে সে সব কথা হয়ে যাক, তার পর তোকে এই কাগজপত্রগুলো দেখাব।"

অনিচ্ছুক ভাবে বসিতে বসিতে সীতা বলিল, "আমার এখনও যে কাজ আছে দাদু, মাসীমার সব যোগাড় না করে দিলে, তিনি তো রান্না চড়াতে পারবেন না।"

ব্যথাভরা চোখের দৃষ্টি তাহার মুখের উপর রাখিয়া, ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বিহারীলাল বলিলেন, "সে কি তোকেই করে দিতে হবে সীতা! আর কি কেউ নেই, আমার এত বড় সংসারে, যে রান্নার যোগাড় করে দেয়? আমার হুকুম সীতা, তুই আর ওদিকে যেতে পাবিনে। পরন্তু আমি কাশী যাব, সুশীলকে বলে দিয়েছি, সব যোগাড় করতে। এ দু'দিন তোকে-আমি সংসারের কোন কাজ করতে দেব না।"

সীতা মুখ নীচু করিয়া রহিল, চোখ তুলিয়া দাদুর দিকে চাহিতে তাহার সাহস হইতেছিল না, পাছে হঠাৎ চোখে জল আসিয়া পড়ে।

বিহারীলাল তেমনি বেদনা-ভরা সুরে বলিলেন, "বড় কষ্টের কথা দিদি যে, তুই এমনি করে সব কথাই আমার গোপন করে যাস। ওরে পাগলী, তুই তো জানিসনে—তুই আমার কে? জন্মান্তরের কথা মনে করি, ভাবি সে জন্মে তুই আমার ছিলি, মায়া ছাড়তে পারিসনি, আবার আমার কাছেই ফিরে এসেছিস। দিদি আমার, তুই তো জানিসনে, তোর পায়ে একটা কাঁটা বিঁধলে মনে হয়, সেই কাঁটাটা আমারই বুকে বিঁধেছে। তুই যে নিত্য এত নির্য্যাতন সইছিস, চলতে ফিরতে অহরহঃ বাধা পাচ্ছিস, হয় তো দু'বেলা ভাল করে দু'টো খেতেও পাচ্ছিসনে—"

তাঁহার কণ্ঠস্বর বড় বেশী রকম কাঁপিতেছিল, একটু সময় নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন, "ওরে দিদি, আর কি আমাদের কেউ আছে, আর কি আমার সেই করুণাময়ী মা আছে, যে তোকে কোলে টেনে নেবে, তোর মুখে অন্ধকার জমাট বাঁধা দেখে ভাববে? এখন তুই ভোর হতে রাত বারটা পর্য্যন্ত খেটে মরলেও কেউ বলবে না—'তুই বস, বিশ্রাম কর।' তুই না খেলে, কেউ তোকে খাওয়ার কথাও বলবে না। তুই যে আমাকে—তোর এই নিতান্ত আপনার দাদুকেও সব লুকিয়ে চলছিস ভাই; আমাকেও কিছু জানতে দিসনি তো।"

বিবর্ণমুখে হাসি টানিয়া আনিয়া সীতা বলিল, "যা শুনেছেন দাদু, তা সত্যি নয়। সত্যি তেমন কিছু হলে আমি কি আপনাকে কিছু জানাতুম না?"

"হ্যাঁ, তা আমি জানি দিদি, তুই আমায় কত জানাতিস। আমি যদি তোর প্রকৃতি না জানতুম, এই আমায় যা তা বলে বুঝাতে পারতিস। আমি জানি, বুকটা ভেঙ্গে গেলেও তুই একটা কথা মুখে আনবিনে। না তুই নির্ব্বাকে সব সয়ে যেতে পারবি সীতা, আমি সইব না। আমিও সে ব্যবস্থা অনেক দিন আগে করে রেখেছি, ভেবেছিলুম, আমার জীবদ্দশায় এ কথা প্রকাশ করব না, কিন্তু এখন দেখছি, আমার মরণের অনেক আগেই এ কথা প্রকাশ করতে হবে। এই নে তো ভাই, এই দলিলখানা পড়ে দেখ।"

কম্পিত হস্তে সীতা সেখানা তুলিয়া লইল। এখানি দানপত্র, বৃদ্ধ সজ্ঞানে এই দানপত্র লিখিয়া যাইতেছেন, তাঁহার অবর্ত্তমানে যাবতীয় সম্পত্তি সবই সীতার হইবে। সীতার জীবন শেষে সে যাহাকে যোগ্য বিবেচনা করিবে, তাহাকে ইহা দান করিয়া যাইবে। ইতা বিবাহের সময় কুড়ি হাজার টাকা পাইবে, জমীদারীর আয়-ব্যয়ের সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ থাকিবে না। জয়ন্তী যতকাল বাঁচিবেন, মাসিক পঞ্চাশ টাকা হিসাবে যেখানেই থাকিবেন, পাইবেন, ইহাপেক্ষা এক পয়সাও বেশী তিনি পাইবেন না। সীতাকে এই সম্পত্তি দেখাশুনা করিতে হইবে, গ্রামের উন্নতি, প্রজাদের ভালমন্দ দেখিতে হইবে, গৃহদেবতার নিত্য পূজাপদ্ধতি পূর্ব্ববৎ থাকিবে। তাঁহার ত্যজ্য-পৌত্র

জ্যোতি এ সম্পত্তির দাবী করিতে পারিবে না। তাহাকে সামান্য কিছু সাহায্য করা না করা সীতার ইচ্ছাধীন।

সীতার কম্পিত হস্ত হইতে দানপত্র পড়িয়া গেল, আর্ত্তকণ্ঠে সে ডাকিয়া উঠিল,—"দাদু—"

দৃঢ়কণ্ঠে বিহারীলাল বলিলেন, "তুই যা বলতে চাস, তা আমি বুঝেছি, কিন্তু এ আমার দৃঢ়সঙ্কল্প। অনেক ভেবেছি, অনেক ভাবনার ফল এই দানপত্রখানি, এ কি আর বদলানো যায় ভাই? ওরা সবাই তোকে ঘৃণার চোখে দেখে, ওরা জানে না, তাদের ঘৃণার পাত্রীকেই আমি বিজয়মালা পরিয়ে দেব, তারই সিংহাসনের নীচে ওদের দাঁড়াতে হবে।"

"না না, আমি এ চাইনে—চাইনে। আপনার পায়ে পড়ি দাদু, আমার সকল রকমে, সকলের কাছে এমন অপরাধিনী করে রেখে যাবেন না, আমার মুখ দেখাবার অন্ততঃ একটা দিকও রাখুন।"

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

গম্ভীর মুখে বিহারীলাল বলিলেন, "তোর মুখ দেখানোর পথ আমি নষ্ট করিনি সীতা, আমি যা করেছি, এ লঘু-মস্তিষ্কের কাজ নয়। আমার দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই যে তোকে এ বাড়ী ত্যাগ করতে হতো, সে কথা ভেবে দেখেছিস কি? তাঁতে কি আমার বিদেহী-আত্মা শান্তিলাভ করত সীতা, আমি কি অনন্তে গিয়েও স্থির হয়ে থাকতে পারতুম? আমি যে ভগবানের নামে শপথ করে তোর বাপের কাছ হতে তোকে নিয়েছিলুম, তোর প্রতি আমার যে কর্ত্তব্য আছে। আমি তোর জন্যে কত ভেবেছি, তা তুই আর কি জানবি বল। আমার আহার ছিল না, নিদ্রা ছিল না, উইল রেজেষ্ট্রী করে, নিজের কাছে এনে তবে শান্তি পেয়েছি। কাঁদছিস কেন সীতা, তোর চোখের জল এতে কেন ঝরে পড়ছে দিদি? চোখ মোছ, এখানা তুলে রাখ, এখুনি আমি কাউকে দেখাতে চাইনে, সময়ে সবাই সব জানতে পারবে। আজ যদি মা বেঁচে থাকতেন—"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সীতা বলিল, "মা মরণের আগে জ্যোতিদাকে ক্ষমা করে গেছেন দাদু।"

বিকৃত মুখে বিহারীলাল বলিলেন, "সে কোন কাজের কথা নয়। হয় তো মরণের সময়ে আমার মাথাও তারই মত বিকৃত হয়ে যাবে, শেষে কি সেই মুহূর্ত্তে পাপিষ্ঠ ধর্ম্মত্যাগীর বিলাস-তৃপ্তির সুবিধার জন্যে, আমার বিশাল জমীদারী, আমার ভিটে, আমার শ্রীধরকে অরক্ষিত অবস্থায় রেখে যাব? আমি সেই জন্যে উইলে ধর্ম্মভীরু কয়েকটী লোককে সাক্ষী করেছি। তোর মুখ শুকিয়ে গেল কেন দিদি? তোর কিছু ভয় নেই, তুই কাউকে না বলতে পারিস, আমিই সকলকে বলে দেব। শুধু তুই এখন এগুলো আমার সিন্দুকে রেখে দে।"

সীতা উঠিল।

৩১

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ, অসহ্য গরম পড়িয়াছে। শুক্লা অষ্টমীর রাত্রি, শীতল মৃদু বাতাস মাঝে মাঝে ঝর ঝর করিয়া বহিয়া যাইতেছিল। সীতা একটা ছাদের উপর বসিয়া আকাশের পানে চাহিয়া তাহার নিজ অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছিল।

বিহারীলাল উইল দ্বারা তাহাকে সমস্ত দিয়াছেন, কথাটা শুনিয়া সে এতটুকু খুসী হইতে পারে নাই; কি দরকার তাহার এই বিশাল সম্পত্তিতে? সে একা রমণী মাত্র, ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করিয়াছে, একবেলা অন্নগ্রহণ করে, একবেলা কিছুই আহার করে না। ভোগবিলাস সে দূর করিয়াছে, দুই হাতে দুইগাছি শাঁখা তাহার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। সূক্ষ্ম বস্ত্র সে ত্যাগ করিয়াছে, বিহারীলাল পছন্দ করিয়া সুন্দর-শাড়ী আনিয়া দিতেন, সে শাড়ী সে ফেরৎ দিয়া মোটা ধুতি আনাইয়া লইত।

অতুল সম্পত্তি তাহারই এ কথা ভাবিতে সীতা আপনিই ভারি সঙ্কুচিতা হইয়া উঠিতেছিল। সে নির্দ্দোষী, এই সম্পত্তিলাভ তাহাকে সকলের সম্মুখে অপরাধিনী করিবে মাত্র। এ যেন চিরকালের জন্য তাহাকে দাসী করিয়া রাখা, তাহার যেটুকু সুখ পৃথিবীতে ছিল, তাহা ঘুচাইয়া দেওয়া।

যাহারা যথার্থ অধিকারী, তাহারা সব হইতে বঞ্চিত হইল, আর সে কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া সব জুড়িয়া বসিল। ছি, ছি, লোকে শুনিয়া বলিবে, এই সম্পত্তিটা ফাঁকি দিয়া লইবার জন্যই সে বিহারীলালের অত মন যোগাইয়া চলে। কে বিশ্বাস করিবে, তাহার আদর-যত্ন সম্পত্তি পাইবার আশায় নয়, এ নিঃস্বার্থ, শুধু মায়ার টানেই করিয়া যাওয়া।

সীতা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া জ্যোৎস্নালোকিত ছাদে শুইয়া পড়িল।

আজ তাহার সারা অন্তর জুড়িয়া হাহাকার জাগিতেছিল। প্রশান্ত কলিকাতা হইতে যে দীর্ঘ পত্রখানা আজ দিয়াছে, তাহাতে জ্যোতির্ম্ময়ের সম্বন্ধে সমস্ত খবরই লেখা ছিল। সে নানা কথার পরে লিখিয়াছে—"জ্যোতির্ম্ময় যে বিলাত হইতে ফিরিয়াছে, সে সংবাদ আমি তোমায় পূর্ব্বেই দিয়াছি। আমি দারুণ ঘৃণায় এতদিন তাহার সহিত দেখা করি নাই। সেদিন কলিকাতায় ফিরিয়া মনে করিলাম, একবার তাহার সহিত দেখা করিয়া কতকগুলি শক্ত কথা শুনাইয়া দিয়া আসি, তাহাকে জানাইয়া দিয়া আসি—সে যাহাকে পিছনে অবহেলাভরে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে, সেই অবহেলিতা তাহার মত পাপিষ্ঠকে কতখানি শ্রদ্ধাভক্তি করিত—অথবা শুধু শ্রদ্ধাভক্তি করিত বলিলেই কথাটা শেষ হয়না,—কতখানি ভালবাসিত বলাই ঠিক হয়। এবং সেই শ্রদ্ধা-ভক্তি ও ভালবাসিবার অপরাধের দণ্ড সে নিজেই নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছে ব্রহ্মচর্য্য পালন, জীবনে সে ইহাই করিবে। মনে পড়ে—একদিন এই জ্যোতির্ম্ময়ই বলিয়াছিল, এদেশের অশিক্ষিতা কুসংস্কারান্ধ মেয়েরা ভালবাসিয়া আত্মত্যাগ করিতে পারে না, তাই ভাবিয়াছিলাম, তাহার এই ধারণা যে ভুলভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াছে সেই ভিত্তির মূলে আঘাত করিয়া তাহা ধূলিসাৎ করিয়া দিব। তাহার মনের ধারণা ভালবাসিয়া আত্মদান করা শিক্ষিতা মেয়েদেরই একচেটিয়া করা জিনিস,—তাহাদের স্বাবলম্বন শক্তি আছে, তাহাদের মানুষ চিনিবার ক্ষমতা আছে। এদেশের অশিক্ষিতা মেয়েদের কিছুই নাই, বাধ্য হইয়া তাহাদের পরের উপর ভর দিতেই হইবে। সে একদিন আমার সহিত এই সব বিষয় লইয়া তর্ক করিয়াছিল। আমি বলিয়াছিলাম, আমাদের দেশঘরেও অনেক মেয়ে বিবাহ না করিয়া পরের সেবায় জীবনটা উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। সে বলিয়াছিল—কেবলমাত্র কুলীনের ঘরে কৌলীন্য প্রথা বজায় রাখার জন্যই জোর করিয়া মেয়েদের অবিবাহিতা রাখা হইত, নিজের জন্যই নিজেদের তাহারা বঞ্চনা করে নাই। সেদিন এই উদ্দেশ্য লইয়াই তাহার সহিত দেখা করিলাম। দেখিলাম, তাহাকে দেখিলে এখন চেনা ভার, সে সম্পূর্ণ নূতন হইয়া গিয়াছে। শুনিলাম, তাহার বেশ প্রতিপত্তি হইয়াছে, সে নিত্য মোটরে কোর্টে যাওয়া-আসা করে, বৈকালে স্ত্রী-সহ বেড়াইতে যায়। আমি যখন তাহার সহিত দেখা করিতে গেলাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, সেই সময়টাই তাহার মত সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত আমাদের মত লোকের দেখা করিবার সময়।

সে দেখা করিল, আমি তাহার হৃদয়হীনতার জন্য যথেষ্ট তিরস্কার করিলাম; তুমি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে, সে একটা উত্তর দিলনা, উঠিয়া গেলনা, বা আমাকে একটা কথা বলিল না; শুধু টেবলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দুই হাতের আড়ালে মুখখানা লুকাইয়া নীরবে আমার তিরস্কার শুনিয়া গেল।

যখন আমার কথা ফুরাইয়া গেল। তখন একটিমাত্র কথা শুধু জিজ্ঞাসা করিল, "মা দাদু কেমন আছেন?" আমি রাগে হিতাহিত-জ্ঞান হারাইয়াছিলাম; তাহাকে অত্যন্ত কড়া-ভাবেই শুনাইয়া দিলাম, তাহার দুর্ভাগিনী মা তাহারই জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন; দাদু যেদিন মরিবেন, সেদিন, সে সংবাদ আমিই তাহাকে দিয়া যাইব।

সে খানিক সময় আড়ষ্ট-হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। হাত দু'খানা আড়াআড়িভাবে বুকের উপর রাখিয়া খানিক সে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইল; তাহার পর আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "তুমি যা বলেছ বন্ধু, তার মধ্যে এতটুকু মিথ্যে নেই, আমি শয়তানের অধমই বটে। তোমরা আমায় ঘৃণা কর, মনে করো আমি মরে গেছি, জ্যোতি নামে তোমাদের পরিচিত কেউ নেই। দাদু সীতাকে নাকি সব বিষয় দেবেন শুনেছি, এতে আমি আনন্দের সহিত মত দিচ্ছি। যদি সীতা বিয়ে ক'রতে রাজি হ'ত, আমি নিজে প্রাণপণ চেষ্টায় তার যোগ্য স্বামী নির্ব্বাচন করে দিতুম, তার বিয়েতে উপস্থিত হতুম। আমারই জন্যে যে সে বিয়ে করলেনা, সুখী হতে পারলেনা, এর জন্যে আমি বাস্তবিক বড় কষ্ট পেয়েছি। দাদু তাকে যথাসর্ব্বস্ব দিয়েও তার ক্ষতিপূরণ যদি কিছু করতে পারেন। আমি তাতে বাধা দেব না। ভগবান সীতার মঙ্গল করুন; তাকে শান্তি দিন।"

আর একটিও কথা না বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

যথার্থ সীতা, ঠিক সেই সময়টায় আমার দুইটা চোখ তাহার মুখের উপর পড়িয়াছিল, মুহূর্ত্তের দৃষ্টিপাতে দেখিলাম, তাহার মুখখানা শবের মতই

মলিন হইয়া গিয়াছে, বোধ হইল, তাহার চোখ দুইটী জলে ভরিয়া উঠিয়াছে।

সত্যই সে হতভাগ্য,—খোঁজ করিয়াও তাহাই জানিতে পারিলাম। তাহার বিবাহিত জীবন শান্তিপ্রদ হয় নাই। কোন একটা মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠানের মূলে যদি দীর্ঘশ্বাস পড়ে, চোখের জল জমে, সে কার্য্য শুভকর হয় না; এইরূপ অশান্তিময়ই হইয়া থাকে। মা দাদুর চোখ ফাটিয়া জল ঝরিয়াছিল, বুক ভাঙ্গিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িয়াছিল, সে সব কোথায় যাইবে? সে সুখী হইবে ভাবিয়া সকলকে কাঁদাইয়া আসিয়াছে; ফল সে যথেষ্ট লাভ করিয়াছে, অর্থ সে প্রচুর উপার্জ্জন করিতেছে, কিন্তু অর্থে কি—যশে কি মানুষ তৃপ্ত হয়,—শান্তি পায়?"

পত্রখানা একবার দুইবার—দু'শবার পড়িয়াও সীতার আশা মেটে নাই,—বিবাহ করিয়া সে সুখী হইতে পারে নাই কেন? যে নারী স্বামীকে সুখী করিতে পারে নহি, সে কি প্রকৃতির নারী?

দাদা কেন তাহাকে অত কড়া কথা শুনাইতে গেলেন, কেন সীতার দুঃখের কথা তাহাকে জানাইতে গেলেন? সীতা আর তাহার সমক্ষে প্রকাশ হইতে চাহে নাই, সে নিজেকে গোপন করিয়া রাখিবার চেষ্টাই এ পর্য্যন্ত করিয়াছে। সে তো জানাইতে চায় না, সে পৃথিবীর মানুষের মধ্যে একজন হইয়া এখনও পৃথিবীতে আছে?

যখন সে পত্রখানা পাইয়াছিল, তখনও সে জানিতে পারে নাই, যথার্থ-ই বৃদ্ধ-দাদু তাহারই নামে বিষয়-সম্পত্তি সব উইল করিয়া দিয়াছেন। পত্র পাইয়া সে ভাবিয়াছিল, ইহা সম্পূর্ণ গুজবই বটে। ইভা রহিয়াছে, লোকতঃ ধর্ম্মতঃ সম্পত্তিতে তাহারও অধিকার আছে। তাহার পর জ্যোতি। বিহারীলাল ক্রোধে ও দুঃখে যাহাই বলুন না কেন, কখনই তাহাকে সব হইতে একেবারে বঞ্চিত করিতে পারিবেন না। তাঁহার ঠাকুর-সেবার আলাদা বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন, জ্যোতির্ম্ময়কে সে সম্পর্কে জড়াইবেন না। সীতা ভাবিয়াছিল সে এক সময় দাদুর কাছে ধন্না দিয়া পড়িবে, তাঁহার পা দু'খানা ধরিয়া চোখের জলে ভিজাইয়া দিয়া প্রার্থনা করিবে,—অনুরোধ করিবে —জ্যোতিকে জ্যোতির ন্যায্য প্রাপ্য দেওয়া হোক। সে ঠাকুরের সেবায় অধিকার লইয়া ঠাকুরের মহলে স্বতন্ত্রভাবে দিন কাটাইবে।

তাহার আশা পূর্ণ হইল না। সে জ্যোতির কষ্টের কথা দাদুকে জানাইবে ভাবিয়াছিল, তাহা জানান হইল না; হঠাৎ মাঝখানে উইলখানা আসিয়া পড়িয়া সকল সঙ্কল্প উল্টাইয়া দিল। এ সংবাদ আর কেহ না জানুক, জ্যোতি আগেই জানিতে পারিয়াছে, ইহাতে তাহার সন্দেহ মাত্র রহিল না। নিদারুণ যন্ত্রণায় তাহার প্রাণটা ছিঁড়িয়া পড়িতে চাহিতেছিল, তথাপি সে বিহারীলালের ইচ্ছার প্রতিবাদ করিতে পারিল না। সে জানিল, বিহারীলালের অন্তর স্নেহপূর্ণ হইলেও—যে স্নেহ মানুষের মর্য্যাদা নষ্ট করে, নিজেকে নিঃস্বভাবে বিলাইয়া দেয়, সে স্নেহ তাঁহার নাই। তাঁহার ইচ্ছাই মূলাধার, স্নেহপাত্র তাঁহার অবাধ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও অতিরিক্ত কঠিন হইয়া উঠেন। বিহারীলাল কোমলা নারী নহেন, শক্তপ্রকৃতি পুরুষ, তাঁহার হৃদয় জ্যোতি অভাবে শূন্য হইয়া গেলেও, তিনি তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিবেন না।

সীতা দুইহাত চোখের উপর চাপা দিয়া ভাবিতেছিল—এ কি হইল, কেন এমন হইল? সে যাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই, আজ তাহাই সত্যে পরিণত হইল কেমন করিয়া? সে ক্ষুদ্রা নারী, অতি অল্প তাহার জ্ঞান, সব জানিয়া শুনিয়া দাদু তাহার মাথায় এ বোঝা চাপাইয়া দিলেন কেন, সে কি এ বোঝা বহিতে পারিবে?

এখনও তিনি বর্ত্তমান আছেন, এখনও উপায় আছে। জ্যোতি যদি এখনও আসিয়া ক্ষমা চায়, তাহা হইলে ক্ষমা পাইতেও পারে; বৃদ্ধের সকল রাগ অভিমান গলিয়া জল হইয়া যায়। তাঁহাকে সব খুলিয়া একখানা পত্র লিখিলে হয় না কি?

সীতা ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পড়িল, তখনি নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল—ছিঃ, তাই কি হয় কখনও। সে ভাবিবে কি, সে বলিবে কি? যদিও তাহারই সম্পত্তি তাহাকেই লইবার কথা সীতা বলিবে,—সে যদি ভাবে, ইহা সীতার একটা কৌশল মাত্র, সেদিন দাদাকে পাঠাইয়াছিল, আজ নিজে পত্র দিতেছে? তাহার যদি ইচ্ছা থাকিত, সে নিজেই ছুটিয়া আসিত। জ্যোতির্ম্ময়ের সম্পত্তিতে এতটুকু আকর্ষণ নাই, আত্মীয় স্বজনের উপর এতটুকু স্নেহের টান নাই, তাহা না হইলে সে কি সব ফেলিয়া যাইতে পারিত? দাদু যাহা বলিয়াছেন—তাহা যথার্থ,—সে নিষ্ঠুর,—সে নিষ্ঠুর —নিষ্ঠুর হৃদয়হীন লোক সে।

সীতার চোখ দিয়া নিঃশব্দে ঝর ঝর করিয়া

জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। এমন নিষ্ঠুর—এমন হৃদয়হীন—তাহা তো সীতা আগে জানিত না। যাহার বাহির অত সুন্দর, তাহার ভিতর অত মলিন কি করিয়া, তাহা সে ভাবিয়া পায় না। এই সংসারের কিছুই তাহাকে আকর্ষণ করিতে পারিল না। সীতার অল্প শিক্ষা, জ্ঞান—সীতার তুচ্ছ সৌন্দর্য্য লইয়া সীতা দূর হইয়া যাক। মায়ের ভালবাসা, দাদুর স্নেহ, রাজার ঐশ্বর্য্য কিছুই তাহাকে আটক করিয়া রাখিতে পারিল না,—সে নিষ্ঠুর সকল বাঁধন কাটিয়া চলিয়া গেল? কিন্তু কই, তাহাতেও সে সুখী হইতে পারিল না তো,—আকাঙ্ক্ষিতা স্ত্রীকে তো সে পাইয়াছে। ভগবান, তাহার সব গেলেও তাহাকে এই শান্তিটুকু দিলে না কেন প্রভু?

"দিদি,"

হঠাৎ পার্শ্বে ইভার কণ্ঠস্বর শুনিয়াই সীতা চমকাইয়া উঠিল। স্ফুট জ্যোৎস্নালোকে তাহার চোখে জলধারা দেখিয়া ইভা বিস্মিত হইয়া গেল,—"এ কি, তুমি কাঁদছো কেন দিদি, কেউ তোমায় কিছু বলেছে কি, আমার মা—কি মাসীমা—"

সীতা তাড়াতাড়ি অঞ্চলে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "না ভাই, কেউ কিছুই বলেন নি।"

"তবে তুমি বুঝি শুধু শুধুই কাঁদছো, দিদি? না, তুমি আমায় মিছে কথা বলছো, আমায় ভুলাতে চাচ্ছো"—বলিতে বলিতে ইভা দুই হাতে সীতার গলা জড়াইয়া ধরিল।

কি অকৃত্রিম স্নেহ, কি ভালবাসা। সীতার মনে হইল, এই পৃথিবীতে থাকিয়া যথার্থ স্নেহ, ভালবাসা সে যে কয়টী মানুষের নিকট হইতে পাইয়াছে, ইভা তাহাদের অন্যতমা। ঈশানী চলিয়া গিয়াছেন, বিহারীলাল নিজের যন্ত্রণায় নিজেই অস্থির, তাঁহার কথা শুনিতে—তাঁহার চোখের জল মুছাইয়া দিতে সীতা নিজের বেদনা ভুলিয়া যায়। পৃথিবীতে তাহাকে ভালবাসে একা ইভা, আর কেহ নাই। পৃথিবীতে সীতাকে বুকের কাছে টানিয়া লইতে এখন আছে কেবলমাত্র সেই একা।

আজ কয়দিন মাসীমা আসিয়া অবধি সে সীতার দিকেও ঘেঁসিতে পায় নাই। মাকে সে কিছুমাত্র ভয় করিত না,—বাধ্য হইয়া রুক্ষপ্রকৃতি মাসীকে ভয় করিতে হইত। সুশীলা ভগিনীর মুখে মেয়েটার অবাধ্যতার কথা শুনিয়া তেলেবেগুনে জলিয়া উঠিয়াছিলেন এবং ইহাকে সংযত করিবার ভার নিজের হাতে লইয়াছিলেন। ইভা তাঁহার কঠোর শাসনে বড় জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছিল,—সর্ব্বদাই সে ফাঁক খুঁজিতেছিল কখন সে তাঁহার চোখে ধূলা দিতে পারিবে। আজ মাসীমা গল্প করিতে করিতে দ্বিতলের খোলা বারাণ্ডায় চাঁদের আলোয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন,—মা, রজনীকান্তের কাছে সগর্ব্বে জমীদারীর কত আয় তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিতেছেন,—সে সেই শুভ অবসরে পলায়ন করিয়া সীতার কাছে আসিয়াছে।

সীতা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল, বলিল "কোন পুরানো কথা মনে হলেই চোখে জল আসে ভাই,—কেউ কিছু বললেই যে কান্না আসে, তা নয়।"

ইভা ব্যথিত স্বরে বলিল, "কি পুরানো কথা ভাবছ দিদি?"

কষ্টে হাসিয়া সীতা বলিল, "সে সব শুনে তোমার কি হবে ইভা? ভাবছিলুম—আমার মত অভাগিনী খুব কমই জন্মায়। দেখ,—আমি জন্মানোর মাস চার পাঁচ পরেই আমার মা মারা যায়, আমার ভার পড়ে বাবার ঘাড়ে। তিনি মারা গেলে এখানে এসে যে স্নেহময়ী মাকে পেলুম, এ ভাঙ্গা অদৃষ্টে তিনিও তো টেঁকতে পারলেন না ভাই। দুনিয়ায় এসে আমার বলে যা কিছু ধরতে গেলুম, একে একে সবই হাত ফসকে চলে গেল,—আমার বলে কিছুই রইল না ইভু—কিছুই রইল না। যার কাছ দিয়ে এসেছি তাকে কেবল জ্বালিয়ে এসেছি, যে সংসারে এসেছি সে সংসারেও আগুন ধরিয়েছি। আমার মনে হয়—এ সর্ব্বনাশী যদি এখানে না আসত, তোমার দাদা পর হতেন না, তাঁকে ফিরতেই হতো; শুধু আমারই জন্যে ইভা"—

বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

ইভা একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "এটা তোমার মিথ্যে ধারণা দিদি,—তুমি না এলেও দাদা ঠিক যেতেন। দাদা যেদিন বিলেতে যান, আমি সেদিন দেখা করতে গিয়েছিলুম। অনেক কথা দাদা সেদিন বলেছিলেন। তুমি এখানে থাকায় তিনি ভারি শান্তি পেয়েছেন। জ্যেঠিমা আর দাদুর জন্যে তাঁর নিশ্চয়ই একটু ভাবনা ছিল, এ ঠিক কথা।"

সীতার চোখে জল, মুখে হাসি,—সে বলিল,—"তা বটে, কিন্তু আমি জানি ইভা, পাছে আমার

বিয়ে করতে হয়, এই ভয়ে তিনি তাড়াতাড়ি পালিয়েছিলেন। আমি যেন জোর করে বিয়ে করলুম না; কিন্তু যদি আমার বিয়ে হত—তাঁর মাকে দাদুকে দেখত কে? তিনি ধর্মত্যাগী,—তাঁর তো এ ঘরে আসবার অধিকার এ জীবনে নেই, এ জেনেও যে তিনি শান্তি পান, এই আশ্চর্য্য। তিনি যে মনকে প্রবোধ দিয়েছিলেন এবং তোমাকে সেই কথা বলায় তুমিও তো মেনে নিয়েছ, এ আরও আশ্চর্য্যের কথা। তোমার দাদা মন্দির হতে দেবতা তুলে নিয়ে গেছেন,—পড়ে আছে দেবতার শূন্য সিংহাসনখানা। দেবতা যে একদিন ছিল, এ তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। কিন্তু দয়া করে এই সিংহাসন রাখবার কোন দরকার ছিল না ইভা,—দেবতা নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিংহাসনটাকে দূর করে ফেলে দিয়ে, অথবা লাথি মেরে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে রেখে যেতেন, সেই যে ভাল ছিল।"

ইভা আহত হইয়া বিবর্ণ মুখে বলিল, "দাদাকে যতটা দোষী ভাবছ তুমি দিদি, বাস্তবিক অতটা দোষ তিনি করেন নি। তাঁর জীবনের মূলে ছিল প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা, যার জন্যে তিনি আত্মীয়-স্বজন, ধর্ম্ম, সব ত্যাগ করেছেন। দাদু যদি দাদার বিলেতে যাওয়ার মত দিতেন, খরচ দিতেন, তা'হলে দেবযানীকে দাদা বিয়ে করতেন না।"

সীতা মুখ ফিরাইয়া বলিল, "যা বলছো, ঠিক তার উল্টো। তোমার দাদা সকলের কাছে মিথ্যা কথা বলতে পেরেছিলেন, মায়ের কাছে মিথ্যা বলেন নি। আমি তাঁরই মুখে শুনেছি, তিনি এই খ্রীষ্টান মেয়েটীকে জীবনাপেক্ষা ভালবাসিতেন। তারই জন্যে তিনি ধর্ম্ম, সমাজ, আত্মীয়, সব ত্যাগ করেছেন।"

ইভা চুপ করিয়া রহিল। দাদাকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিবার যতখানি চেষ্টা করিবার তাহা সে করিল, আর উপায় ছিল না।

খানিক নীরব থাকিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ তোমায় কে পত্র দিয়েছে সীতাদি?"

অন্যমনস্কভাবে সীতা উত্তর দিল, "আমার দাদা।"

"তোমার দাদা,—প্রশান্ত বাবু?"

সীতা বলিল, "হ্যাঁ।"

ইভা বলিল, "তিনি বোধ হয় আমার দাদার কথাও লিখেছেন,—পত্রখানা একটু দেখতে দেবে সীতাদি?"

সীতার অঞ্চলেই সেখানা বাঁধা ছিল। সেখানা খুলিয়া ইভার কোলে ফেলিয়া দিয়া সে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল।

উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় স্পষ্ট লেখা পত্রখানা ইভা কোন একরকমে টানিয়া পড়িয়া ফেলিল। একটু হাসিয়া বলিল, "দাদার খবর তিনি মাসে মাসে নেন তাহ'লে? আমিও সব শুনেছি সীতাদি, মাসীমা এসে সেদিন সব বলেছেন। ভেবেছিলুম সময় পেলে তোমায় সব বলব। তা কয় দিন মোটে সময় পেলুম না।"

সীতা মুখ তুলিল।

ইভা আপন মনে বলিয়া চলিল, "দেবযানী কিন্তু ভারি গর্ব্বিতা মেয়ে, কাউকে সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। তার রূপের গর্ব্ব, গুণের গর্ব্ব তাকে অন্ধ করে রেখেছে—পৃথিবীর কাউকে সে পছন্দ করে না। ভেবেছিলুম, বিয়ের পরে নিশ্চয়ই তার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হবে; কিন্তু বিয়ের পরে তার সে দোষগুলো আরও যে স্ফুট হয়ে উঠবে, তা আশা করি নি। দাদাকে তুমি চেনো না, আমি চিনি; বড় অভিমানী তিনি, অতি অল্পেতে ব্যথা পান। এই নিত্যকার পাওয়া ব্যথাগুলো বুকের মধ্যে জমে জমে তাঁকে পাথর করেছে।"

সীতা উত্তর দিতে যাইতেছিল, ত্রিতল হইতে মাসীমার রুক্ষ কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল, "ইভু"—

ত্রস্তা সীতা বলিল, "যাও ইভা, মাসীমা ডাকছেন।"

অকস্মাৎ দীপ্ত হইয়া উঠিয়া ইভা বলিল, "ডাকুক,—আমি কিছুতেই যাব না তা বলে দিচ্ছি সীতাদি।"

সীতা তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "ছিঃ ইভা, মাসীমার কথার অবাধ্য হয়ো না, আমার কাছে থেকে কোন লাভ নেই,—যাও।"

ইভা অসহিষ্ণু ভাবে বলিল, "তোমার কাছে থেকে লাভ নেই, মাসীমার কাছে থেকেই বা কি লাভ হবে শুনি? তুমি আমার মা মাসীমাকে চেন না, তাই অমন কথা বলছো,—ওদের মনে সর্ব্বদাই ভয় জাগছে, পাছে আমি তোমার সঙ্গে মিশি, তোমার কথা শুনি।"

সীতা শান্তস্বরে বলিল, "যদি ওঁরা বোঝেন আমার সঙ্গে মিশলে তুমি খারাপ হয়ে যাবে, তবে মিশবার দরকার কি বোন? মা মাসীমা যা বলেন, সে তোমার ভালর জন্যেই, মন্দের জন্যে যে নয়, সে জানা কথা।"

ইভা খানিক স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, হঠাৎ

উচ্ছ্বসিত ভাবে বলিয়া উঠিল, "এর কারণ কি তা তুমি জানো না দিদি। মা মাসীমা এক বড়লোকের পোষ্যপুত্রের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা ঠিক করেছেন; আমি বলেছি—আমি বিয়ে করব না।"

সীতা বলিল, "তাঁরা হয় তো ভেবেছেন, আমার মত তুমি নিচ্ছো, অর্থাৎ আমি তোমায় শিক্ষা দিচ্ছি। তাই আমার সঙ্গে তোমায় মিশতে দিতে তাঁরা চান না, তা আমি বুঝেছি। আমার কথা বলবে,—আমি যে বাগদত্তা তাই, ধর্ম্মতঃ আমার বিয়ে হয়ে গেছে। তার পর তিনি আমায় লোকতঃ স্ত্রী বলে গ্রহণ না করলেন, তাতে কিছু আসে যায় না। আমার দাদু আমায় বিবাহিতা বলে স্বীকার করেছেন, কেবল লোকতঃ জানাতে পারলুম না। কাউকে ব্যথা দিলে সে ব্যথা আরও কঠোর হয়েই নিজের বুকে ফিরে এসে লাগে, এ কথা বেশ মনে কোরো। না ইন্তা, তুমি অমন অবুঝের মত কাজ কোরো না,—মা মাসীমা যা বলছেন, তাই কর। লক্ষ্মী দিদি, ওঁদের অবাধ্য হলে আমাকেও কষ্ট দেওয়া হবে, তা মনে করে দেখো।"

ইন্তা ব্যথিত মুখে বলিল, "না দিদি, ওঁরা হৃদয় দেখেন না, ভেতর দেখেন না, দেখেন শুধু উপরের চাকচিক্য। মনে করেন, বড়লোকের ঘরে বিয়ে হলে মানুষ সুখী হয়। সুখ অর্থ দিয়ে কেনা যায়, এঁরা তাই জানেন। কিন্তু প্রকৃত সুখ যে ধনে বিকায় না, চাষার ঘরেও থাকে, সেটা ওঁরা বুঝতে চান না, এই যা আশ্চর্য্য।"

সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

এই একটী কথায় তাহার অন্তরের কথা যেন সীতার চোখে ফুটিয়া উঠিল। "সুখ চাষার ঘরেও মিলে" এই কথার সঙ্গে সে অনেক দিনের অনেক কথা মিলাইয়া সচকিতে উঠিয়া বসিয়া ইন্তার লজ্জাযুক্ত মুখখানার পানে চাহিল। প্রশান্তের সঙ্গে ইন্তার বিবাহ দিবার কথা মনে করিয়া সে কাকীমার নিকটে একদিন যে প্রস্তাব করিয়াছিল, তাহাতে কাকীমা এমন কতকগুলি কঠিন কথা শুনাইয়াছিলেন, যাহাতে সে কল্পনাকে পর্য্যন্ত মন হইতে সে বিদায় দিয়াছিল। কাকীমা জানিতেন না—যাহাকে তিনি চাষা বলিয়া ঘৃণা করেন, তাঁহার একমাত্র কন্যা তাহাকেই পতিরূপে বরণ করিতে চায়,—সেই চাষার কাজকেই সে সম্মানের চোখে দেখে।

সীতার মনে হইল, ইন্তা অনেক কৌশলে অনেক দিন প্রশান্তের খবর জানিয়াছে। সে যে কথাগুলি অসম্বন্ধের মত বলিয়া গিয়াছে, ইন্তা সেইগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে তাহার মনোমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবতার চারিপাশে সাজাইয়া রাখিয়াছে।

রুদ্ধকণ্ঠে সীতা ডাকিল, "ইন্তা—"

"আসছি দিদি।"

ইন্তা পলাইল। এ কথাটা হঠাৎ তাহারই মুখ দিয়া এ ভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। মনের ঝোঁকে একটা কথা বলিয়া ফেলিয়া সে অত্যন্ত লজ্জিতা হইয়া উঠিয়াছিল।

৩২

আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু, এমনই করিয়া তীর্থযাত্রার দিন ক্রমেই পিছাইয়া পড়িতে লাগিল। বিহারীলালও অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ইন্তার বিবাহ আষাঢ় মাসের দশই ঠিক হইয়া গিয়াছে। সীতা বিহারীলালকে বুঝাইয়া দিয়াছে—ইন্তার বিবাহ দিয়া তবে তাঁহাকে যাইতে হইবে,—তিনি মাথার উপর থাকিতে অন্য কেহ যে তাঁহার পৌত্রীর বিবাহ দিয়া দিবে, ইহা উচিত নয়।

বিবাহের ফর্দ্দ তৈয়ারী হইতে লাগিল। সীতা নিজের হাতে এ কাজ লইতে কিছুতেই সম্মত হয় নাই। কিন্তু বুদ্ধিমতী সুশীলা মানুষ চিনিতেন, তাই তাহারই ঘাড়ে এ ভার চাপাইয়া দিয়াছেন। সীতাকে সকলেই মানিত, ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত, সীতার আদেশ পালন করিতে সকলেই উৎসুক থাকিত। সুশীলা বা জয়ন্তী ধমক দিয়া যে কাজ কাহাকেও দিয়া করাইতে পারিতেন না, সীতার মুখের একটী কথা খসিতে না খসিতে সকলেই সেই কাজ করিতে ছুটিত। ঈর্ষায় দগ্ধীভূত হইলেও সীতাকে স্পষ্ট তাঁহারা অবহেলার ভাব দেখাইতে পারেন নাই; কেন না, বিহারীলাল সীতাকে বড় ভালবাসিতেন, সীতাকে কিছু বলিয়া বিহারীলালের বিরাগভাজন হইবার দুঃসাহস কাহারও ছিল না।

ইন্তার মনের কথা সীতা বুঝিয়াছিল। সে একবার শেষ চেষ্টা করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল। কিন্তু ইন্তা তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে দুই হাতে দৃঢ় ভাবে জড়াইয়া ধরিয়া বুকের মধ্যে মুখখানা গুঁজিয়া দিয়া আর্ত্ত ভাবে বলিয়াছিল, "তোমার পায়ে পড়ি দিদি, আমার সম্বন্ধে কোন কথা মা মাসীমাকে বলতে যেয়ো না। যদি তুমি কোন কথা তাঁদের

বল, তা হলে সত্যি বলছি, আমি আত্মহত্যা করে তাঁদের বিরক্তি হতে রক্ষা পাব।"

সীতা তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়াছিল, "এমন করে নিজের জীবনটাকে ব্যর্থ করে ফেলবি ইভা? তাঁরা হয় তো এ সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়ে দাদার সঙ্গে তোর বিয়ে দিতে রাজি হতেন, যদি শুনতে পেতেন সত্যি তুই দাদাকে এতটা ভালবাসিস। একটীমাত্র সন্তানের জীবনের সুখ-শান্তি কাকীমা কখনই স্বেচ্ছায় নষ্ট করতে চাইতেন না।"

ইভা হাসিয়াছিল, বলিয়াছিল, "আমার জীবন ব্যর্থ হ'ল বা সফল হ'ল—কে তার খোঁজ রাখে সীতাদি? তুমি বলছ, তাঁরা আমার কথা শুনলে হয় তো বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে দেবেন, এ সম্পূর্ণ তোমার মিথ্যে কথা। তুমি যার কথা শোননি, তিনি যখন এই বিষয় নিয়ে আমাকে এক একটা কথা বললেন,—উঃ, তখন আমার মনে হয়, এ রকম কথা শোনার চেয়ে মরণই ভাল। না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হোক, তুমি কোনও কথা ওঁদের বলো না।"

সে হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার মুখে সে হাসি আর ছিল না। সীতা ব্যথিত নেত্রে তাহার পানে তাকাইত, কিন্তু জয়ন্তীকে কোন কথা বলিবার সাহস তাহার হয় নাই। ইহাতে শুধু যে ইভাই কথা সহ্য করিবে তাহা নহে, তাহাকেও বড় কম কথা সহ্য করিতে হইবে না, কেন না, জয়ন্তীর ধারণা জন্মিয়াছিল, সীতার উপদেশেই ইভা ক্রমেই অধঃপতনের পথে চলিয়াছে।

ইভার যে বিবাহ হইবে, বিহারীলাল তাহা জানিতেন। পাত্রপক্ষ পাঁচ হাজার টাকার দাবী করিয়াছে, জয়ন্তী তাহাও তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন। একটী ছেলের দাম শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার নিজেরও দুইটি পুত্র ছিল, তিনি একটি পয়সা পাত্রীপক্ষের নিকট হইতে গ্রহণ করেন নাই।

সেদিন রাত্রে তিনি অন্য দিনের চেয়ে একটু সকাল সকাল বাড়ীর ভিতরে গিয়াছিলেন। দুপুরের আহারের সময়ে জয়ন্তী আসিয়া কাছে বসিয়াছিলেন। অর্দ্ধাবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়া তিনি ফিস ফিস করিয়া জানাইয়াছিলেন,—তাঁহার কয়েকটা কথা আছে,—এখন যদি তাঁহার শুনিবার অবকাশ থাকে, তবে জয়ন্তী বলিতে পারেন।

বিহারীলালের তখন কথা শুনিবার অবকাশ ছিল না। আহারের পর খানিকক্ষণ না ঘুমাইলে তাঁহার শরীর ভারি অসুস্থ হয়। জয়ন্তী তাঁহার আহার শেষে উঠিবার সময় জানাইয়া গেলেন, সন্ধ্যার দিকে যদি তিনি একটু সকাল সকাল ভিতরে আসেন, তখন তিনি কথা কয়টা বলিবেন।

সেই কথাটা মনে পড়িতেই বিহারীলাল সুশীলবাবুর হাতে সেদিনকার বাকি কাজগুলা দিয়া ভিতরে আসিলেন। সীতা তখন একরাশি রজনীগন্ধা দিয়া তাঁহার গৃহের একপার্শ্বস্থিত ছোট টেবলখানার উপর যে ফটো কয়খানি ছিল তাহা সাজাইতেছিল। এই ফটো কয়খানি তাঁহারই দু'টী পুত্র ও পৌত্রের।

বিছানার উপর বসিয়া পড়িয়া সেই দিকে তাকাইয়া বিহারীলাল হাসিমুখে বলিলেন, "ও কি হচ্ছে দিদি?"

সীতা বলিল, "বাগানে আজ অনেক রজনীগন্ধা ফুটেছিল দাদু, তাই এনে এই ফটো কয়খানা সাজিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, কি সুন্দর দেখাচ্ছে।"

বৃদ্ধের দৃষ্টি যে কতখানি তীক্ষ্ণ তাহা সে জানিয়াও তাঁহার মত জানিতে চাহিল। হাসিয়া বিহারীলাল বলিলেন, "আমি কি অত স্পষ্ট দেখতে পাই রে নাতনী, যে বলব? রজনীগন্ধা দিয়ে যখন সাজাচ্ছিস, তখন জানা কথা—ভাল দেখাবেই।"

সাজান শেষ করিয়া একছড়া রজনীগন্ধার মালা বিহারীলালের বিছানার উপর রাখিয়া সীতা বলিল, "ইভা আপনার জন্যে এই মালাটা তাড়াতাড়ি গেঁথে দিয়েছে দাদু,—আরও কয়টা গেঁথে সে নিয়ে আসছে এখনই। মালাটা গলায় দিন। এমনভাবে অনাদরে ফেলে রাখলে সে সত্যই খুব রাগ করবে।"

হাসিয়া বিহারীলাল বলিলেন, "আর কি এখন ফুলের মালা গলায় দেবার দিন আছে রে দিদি? এখন—এই বয়সে আর ফুলের মালা পরার প্রবৃত্তি হয় না, লোকে দেখলেও হাসবে যে।"

"তা হাসুক দাদু, আমরা দু'জনে আপনাকে মনের মত করে সাজাব, আর তো কেউ সাজাতে আসছে না।"

সে জোর করিয়া মালাটা পরাইয়া দিল।

বিহারীলাল হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন, "এ কিন্তু একেবারেই ব্যর্থ হল দিদি। কাল শ্রীধরের পায়ে এ ফুল কেমন মানাত, একবার মনে ভেবে দেখ দেখি।"

সীতা বলিল, "তখন ফুল থাকবে দাদু, এমন গন্ধ থাকবে না।"

বিহারীলাল দু একবার নিজের গলার দিকে চাহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "তা বেশ হয়েছে। এখন ছোট-বউমাকে একবার খবর দে দেখি, কি কথা বলবেন বলেছিলেন তা এই সময় বলুন।"

সীতা বলিল, "তিনি খানিক বাদে আসবেন বলেছেন।"

একটু বাদেই জয়ন্তী আসিয়া দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইলেন।

বিহারীলাল বলিলেন, "দাঁড়িয়ে রইলে কেন মা—বসো। ওবেলা আমায় কি বলবে বলেছিলে—এখন সে কথা বলতে পার, এখন আমার কোন কাজ নেই।"

জয়ন্তী অর্দ্ধাবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে চাপা স্বরে বলিলেন, "ইভার বিয়ের কথা বলছিলুম।"

নরম সুরে বিহারীলাল বলিলেন, "কি বলবে বল।"

জয়ন্তী বলিলেন, "পাত্রপক্ষেরা দিন ঠিক করে জানিয়েছেন, আগে আষাঢ় মাসের দশই দিন করলেও বলছেন ও দিনে বিয়ে হবে না।"

বিহারীলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

"তাঁরা আরও কিছু টাকা চান।"

সোজা হইয়া বসিয়া রুক্ষকণ্ঠে বিহারীলাল বলিলেন, "আরও টাকা চায়? পাঁচ হাজার বলেছে তাতেও রাজি হয়েছি, তাতেও মন উঠছে না? আরও কত চায় তারা?"

জয়ন্তী আনত মুখে বলিলেন, "আরও হাজার দুইয়েক টাকা চায়,—আর, আর—"

"থাক বউ মা, যাদের অত আকাঙ্ক্ষা, তাদের আশা ছেড়ে দাও,—ও পাত্রে ইভার বিয়ে দেওয়া হবে না। এতদিন যখন রয়েছে, আর দু'টো দিন অপেক্ষা কর, আমি পাত্র খুঁজে অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যেই বিয়ে দেব।"

জয়ন্তী একটু বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। আজ তিন বৎসর তিনি এখানে রহিয়াছেন, মেয়ের বয়স আঠার উনিশ হইয়া গেছে, হাতে পাত্র পাইয়া ছাড়িয়া দিয়া তিনি আবার কতদিন অপেক্ষা করিবেন? তিনি স্পষ্টই বলিলেন, "হাতের কাছে পেয়ে ছেড়ে দেব বাবা? মেয়ে এদিকে আঠার উনিশ বছরের হয়ে উঠল যে, আর ঘরে রাখা কি ভাল দেখায়? শুনেছি এ ছেলেটী সব রকমে ভাল, ল পাশ করেছে।"

বিকৃত মুখে বিহারীলাল বলিলেন, "আজকাল বাজারে "ল" পাশের ছড়াছড়ি বউ মা, কেউ ওর দিকে ফিরেও চায় না। ছেলেদের এই পাশের দরকার শুধু বিয়ের সময়, আর কোন সময়ে নয়। ও সম্বন্ধ ছেড়ে দাও; নরহরি বাঁড়ুয্যের পোষ্যপুত্র সে, সব খবর আমি সুশীলের মুখে পেয়েছি। আমি এই অগ্রহায়ণ মাসেই তোমার মেয়েকে যোগ্যপাত্রের হাতে সমর্পণ করব, দেখে খুসী হয়ে যাবে।"

জয়ন্তী অন্তরের বিরাগ চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিলেন না, বলিলেন, "আপনি তো এই মাসেই তীর্থভ্রমণে বার হয়ে যাচ্ছেন, বিয়ে দেবেন কি করে?"

বৃদ্ধের মুখে বিরক্তিভাব দূর হইয়া গেল, সে মুখে স্মিতহাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন, "এর মধ্যে যদি আমি না ফিরেই আসি, তার জন্যে তো তোমার ভাবনা নেই মা। আমি পাত্র ঠিক করে দিয়ে যাব, অগ্রহায়ণ মাসে তুমি বিয়ে দিয়ে ফেল। সুশীল থাকবে, আত্মীয়-স্বজন সবাই রইল, টাকাকড়ি রইল, সব হয়ে যাবে। সম্প্রদান যে হয় করবে, আমি না থাকলেও সব চলে যাবে মা। পাত্র ঠিকই আছে, বল তো এখুনই তাকে একখানা পত্র লিখে জানান দিই।"

জয়ন্তী জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাত্র কে?"

"পাত্র আমাদের সীতার ভাই—প্রশান্ত। ছেলেটিকে দেখেছ তো বউমা,—এতটা যে লেখা-পড়া করেছে, এতটুকু গর্ব্ব নেই, কালের যোগ্য ঔদ্ধত্য নেই। এতদিন মনে হয়নি, আজ হঠাৎ মনে হয়ে গেল। প্রশান্তের সঙ্গে ইভার বিয়ে দিলে কি রকম হয়? নিশ্চয়ই ভাল হবে। শুধু শিক্ষার জন্যেই নয়, ছেলেটী যথার্থ পরিশ্রমী, ভারি শান্ত। নামের সার্থকতা তার চেহারায়, তার কথাবার্ত্তায়, চালচলনে। আমার বড় ইচ্ছে মা, প্রশান্তকে যেন আমি বাড়ীর জামাইরূপে খুব কাছে পেতে পারি।"

"প্রশান্ত?" জয়ন্তীর চোখে মুখে ঘৃণার ভাবটা ফুটিয়া উঠিল; তিনি সীতার দিকে একবার তীব্র দৃষ্টিতে তাকাইলেন। তিনি যেন স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন—এ ব্যাপারে সীতার অনেকখানি হাত আছে। সীতা তাঁহার পানে তাকায় নাই, সে নতমুখে একটা রজনীগন্ধার পাপড়ি ছিঁড়িতেছিল।

ধীরকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "প্রশান্তকে আপনি ইভার উপযুক্ত পাত্র মনে করতে পারেন বাবা, কিন্তু আমি তাকে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলে মনে করি।"

পুত্রবধূ যে এমন অসঙ্কোচে তাঁহার মুখের উপর নিজের মতামত ব্যক্ত করিতে পারিবেন,

বিহারীলাল সে কথা আদৌ ভাবেন নাই। বিস্ময়ে ক্রোধে খানিক সময় তিনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পুত্রবধূর মুখে কি ভাব ফুটিয়াছে, একবার তাহা দেখিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ক্ষীণদৃষ্টি অতদূর পৌঁছাইল না। কি একটা রুক্ষ কথা তাঁহার মুখে ভাসিয়া আসিতেছিল, চকিতে তিনি তাহা সামলাইয়া লইলেন। হায় রে, এ তো তাঁহার সে মা নয়। সে তাহার জীবনকালের মধ্যে এমন স্পষ্ট ভাবে একটী কথা তাঁহার মুখের উপর বলিতে সাহস করিতে পারে নাই। তাঁহার বক্তব্য ফুরাইয়া গেলে, যদি তাহা অনুচিত হইত, নিতান্ত অনুনয়ের সুরে তাহা বুঝাইয়া দিত, এমনভাবে স্পষ্ট জোরের সহিত তো কথা বলিতে পারিত না।

মনে হইল—এ তাঁহার শিক্ষিতা বধূ; সে ছিল একটী সরলা গ্রাম্যবালা। তাহার মধ্যে যে কোমলতা ছিল, ইহার মধ্যে তাহা পাওয়া একেবারেই অসম্ভব বলিলেও চলে।

মুহূর্ত্তে তিনি শক্ত হইয়া গেলেন, বলিলেন, "প্রশান্ত কিসের জন্যে ইভার স্বামী হওয়ার অনুপযুক্ত, তা কি আমি জানতে পারি বউমা ?"

জয়ন্তী সংযত কণ্ঠে বলিলেন, "নিশ্চয়ই জানতে পারবেন বাবা। ইভার পক্ষে তার ঘর করা ভারি মুস্কিল হবে; কারণ, সে এখনও জানে না—কোন্ গাছে ধান জন্মায়,—ঢেঁকিতে ধান ভানা অনেক পরের কথা।"

"যদিই সে জানতে পারে কোন গাছে ধান জন্মায়, যদি তাকে চেয়ার ছেড়ে রান্নাঘরে মাতৃ-মূর্ত্তিতে গিয়ে বসতে হয়, সেটা কি তুমি এতই অপমান মনে কর বউমা ?"

ক্রোধে বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল।

জয়ন্তী সে কথার উত্তর দিলেন না; মিনিট-খানেক নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আমি মানছি প্রশান্ত যথেষ্ট লেখা পড়া শিখেছে, কিন্তু তার সে শিক্ষা লাভ করে কি ফল হয়েছে বাবা ? আমি তাকে নিজের মুখে গর্ব্ব করতে শুনেছি—সে নিজে মাঠে গিয়ে লাঙ্গল দিতে লজ্জাবোধ করে না। সে এতে লজ্জাবোধ না করলেও—তার স্ত্রী যদি শিক্ষিতা হয়, সে নিশ্চয়ই এ কাজ করা গৌরবের বলে মনে করবে না,—লোকের কাছে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে লজ্জায় তার মাথা নুইয়ে পড়বে। না বাবা, আমি মনে করি, ইভাকে এমন চাষার ঘরে বিসর্জ্জন দেওয়ার চেয়ে তাকে চিরকুমারী করে রাখা ভাল। সে এখন ছেলেমানুষ নয়, তার নিজের আত্মজ্ঞান, বোধ-শক্তি জন্মেছে,—ভালমন্দ সে বিবেচনা করিতে পারে। এ রকম চাষা প্রকৃতির লোককে বিয়ে করতে সে কখনই রাজী হবে না।"

তীব্র-কণ্ঠে বিহারীলাল বলিলেন, "তুমি তোমার মেয়েকে এতটা স্বাধীনতা দিয়েছ যে, নিজের স্বামী নিজেই সে নির্ব্বাচন করবে ?"

জয়ন্তী একটু চড়া স্বরেই উত্তর দিলেন, "শিক্ষা পেলে পরে তারা নিজেরাই স্বাধীন হতে চায় বাবা, আর কারও মতামতের ধার ধারে না। আপনি যে স্বাধীনতার বিরুদ্ধবাদী; কিন্তু আপনিই কি সীতাকে অবাধ স্বাধীনতা দেন নি—যাঁতে—"

"বউমা !—"

রুদ্ধ রোষে সিংহের মতই বিহারীলাল গর্জ্জিয়া উঠিলেন। এ কণ্ঠস্বর সীতা চিনিত, তাহার হৃদয় থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, ব্যাকুলভাবে সে বিহারীলালের হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "দাদু—থামুন, আপনার পায়ে পড়ি, চুপ করে থাকুন। আপনি চলে যান কাকীমা, বাইরে যান।"

হাতখানা টানিয়া লইয়া শুষ্ক হাসিয়া বিহারীলাল বলিলেন, "তুই এত ভয় পাচ্ছিস কেন সীতা, তোর দাদুর মাথা এখনও ততদূর খারাপ হয় নি। বউমা, এতদিন আমার বড় অহঙ্কার ছিল—কেউ আমার মুখের উপর কখনও কথা বলতে পারে নি, কেউ কোন দিন পারবেও না। আমার সে জ্ঞানটা আজ তুমিই ভেঙ্গে দিলে। যাক, তোমার বেশী কথা বলতে চাইনে, শুধু এইটুকু জানিয়ে রাখছি, তোমার পছন্দমত পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে পার,—আমায় বাধ্য হয়ে বিয়ের খরচের ভারটা বইতেই হবে—এ ছাড়া তোমাদের সঙ্গে আমার আর কোনও সম্পর্ক নেই—জেনো। তুমি এ আশা কোর না—আমি তোমাদের আমার সম্পত্তি দিয়ে যাব। আমার সব উইল করে দিয়েছি,—আমার অবর্ত্তমানে আমার পৌত্রবধূ সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী। ভগবানকে সাক্ষী রেখে আমি তাকে এনেছিলুম,—আমার এই গৃহের একমাত্র অধীশ্বরী বলে তাকেই ভেবেছিলুম, আমার সে কথা আমি রেখেছি। ভেবেছিলুম, যদি প্রশান্তের সঙ্গে ইভার বিয়ে হয়, তবে বিয়ের সময় আমার একটা পরগণা তাকে যৌতুক দেব। কিন্তু না, দেখছি,—আমার সাহায্য তোমরা বিশেষ কিছু চাও না। যাক, তোমার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করেছি, সেটা

তোমায় শুনিয়ে রাখা ভাল বলে মনে করি। তুমি মাসে পঞ্চাশ টাকা সীতার কাছ হতে পাবে, এতে তোমার খরচ চলে যাবে। কাল সকাল হতে সীতাকে বাড়ীর কর্ত্তা বলে জানবে। জেনো— তারই ওপরে নির্ভর করে' তোমাদের থাকতে হবে। সীতা তোমাদের দাসী নয়, সীতার জিনিসে তোমাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হচ্ছে মনে রেখো। যাও—আমায় আর বিরক্ত কোর না।"

জয়ন্তী ক্রুদ্ধ দৃষ্টি দাদু ও সীতার উপর ফেলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

"দাদু—"

বিহারীলালের পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কান্নাভরা সুরে সীতা বলিল, "আমায় এ লজ্জার মধ্যে কেন ফেললেন দাদু,—আমি কাল হতে মুখ দেখাব কি করে?"

সস্নেহে তাহার অশ্রুজলে সিক্ত মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া বিহারীলাল বলিলেন, "খুব মুখ দেখাতে পারবি দিদি; খুব মুখ দেখাতে পারবি। ওরা যে তোকে বড় অবহেলা করে রে,—মনে ভাবে, তুই কোথা হতে উড়ে এসে পড়েছিস,— ওদের অনুগ্রহের ওপরে নির্ভর করে তোকে বেঁচে থাকতে হবে। আমি জানিয়ে দিলুম—তুই আমার পর নোস, তুই আমার পৌত্রবধূ। সে তোকে গ্রহণ না করুক, দশজনে না জানুক, আমি জানি—তুই তারই নামে উৎসৃষ্ট একটী ফুল। তোর জীবনের যে ক্ষতি আমি করেছি, সাধ্য কি আমার সে ক্ষতিপূরণ করবার। তবু কতকগুলো কাজের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছি, যাতে এই সবের মধ্যে তোর হারার ব্যথা খানিকক্ষণের জন্তেও অনুভব না করতে পারিস।"

চোখ মুছিতে মুছিতে সীতা বলিল, "আপনার নাতীকে—কেবল আপনার একটি কথা না রাখার জন্যে এত বড় দণ্ড দেবেন দাদু?"

"আবার তার কথাই এনে ফেলছিস কেন সীতা? দেখ, বড় দুঃখ হয়েছিল, শ্রীধরকে সামনে রেখে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলুম—আর তার মুখদর্শন করব না। আমার মা মরণের সময় বলতে চেয়েছিলেন, যেন সে নরাধমকে আমি ক্ষমা করি,—আজ তুইও সেই কথাই বলতে চাচ্ছিস। কিন্তু না দিদি, আমি কিছুতেই তাকে ক্ষমা করব না, করতে পারব না। দেখ দেখি বুকে হাত দিয়ে,—দেখ দেখি হাড়গুলো সব ভেঙ্গে গেছে— না, এ কি আর জোড়া দেওয়া যায়? তাকে আমি একটা পাই দেব না; তোর যদি ইচ্ছা হয় সীতা,—যদি কোনদিন সে তোরই দরজায় ভিখারীর মত হাত পেতে এসে দাঁড়ায়, তবে তাকে নগদ টাকা কিছু দিতে পারবি। আমার বাড়ী ঘর, বিষয় সম্পত্তি কিছু কাউকে দান করতে পারবি নে, এ কথা যেন মনে থাকে।"

সীতার চোখ দিয়া নিঃশব্দে অশ্রুধারা বাহিয়া পড়িতে লাগিল। তাহার হৃদয়ের ব্যথা দাদু অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন,—পাছে কোন কথা মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে, তাই অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন।

৩৩

পরদিন সকালেই সীতা দাসীর মুখে শুনিতে পাইল, জয়ন্তী আজই কলিকাতায় রওনা হইতেছেন।

সীতার মুখখানা নিমেষে বিবর্ণ হইয়া গেল। নিজেকে সকল অনর্থের মূল ভাবিয়া সে পূর্ব্ব হইতেই কুণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল,—আজ তাহার যেন মাটীর সহিত মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। ঠিক এইরূপই যে ঘটিবে, সে তাহাই ভাবিয়াছিল এবং সেই জন্যই দাদুকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার সব চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দাদুর ইচ্ছাই সত্য হইয়া দাঁড়াইল।

পায়ে পায়ে জড়াইয়া আসিতেছিল, তথাপি সে জয়ন্তীর কাছে চলিল—যদি হাতে পায়ে ধরিয়া কোনও রূপে তাঁহার কলিকাতা গমন উপস্থিত বন্ধ করিতে পারে। তাহার পর সে দাদুর পায়ের গোড়ায় হত্যা দিবে। কিন্তু যদি জয়ন্তী তাহার কথা না শুনেন? ছি—ছি, মনে করিতেও হৃদয় ঘৃণায় লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠে যে, তাহার জন্যই বাড়ীর বউ, বাড়ীর মেয়ে বাড়ী ত্যাগ করিয়া যাইবে?

জয়ন্তীর শয়নকক্ষে তখন বাক্স গুছানো, বিছানা প্রভৃতি বাঁধিবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। রজনীকান্ত একটা ভৃত্যের সাহায্যে সমস্ত বাঁধিতেছে,—জয়ন্তী, যেখানে যাহা ছিল, সব আনিয়া জড় করিতেছেন। ইভা খাটের উপর আড়ষ্ট ভাবে বসিয়া তাহাদের চিরবিদায়ের আয়োজন দেখিতেছে। এ বাড়ীতে আসিবার পূর্ব্ব হইতে বাল্যের স্মৃতি তাহার মনে এই বাড়ীর উপর একটা আকর্ষণ আনিয়া ফেলিয়াছিল।

তাহার পর এই কয় বৎসর থাকিয়া সে জড়াইয়া পড়িয়াছিল। এ বাড়ীর নিকট হইতে চিরবিদায় লওয়া তাহার কল্পনাতীত বলিয়াই মনে হইত। কাল রাত্রে মা যখন দাদুর নিকট হইতে আসিয়া মেঝেয় আছড়াইয়া পড়িয়া, স্বর্গগত স্বামীর নাম করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তখন সত্যই তাহার বড় হাসি পাইতেছিল,—দুঃখ তাহার এতটুকুও হয় নাই। পল্লী অঞ্চলের একটা প্রবাদ-কথা সে কমলার মুখে শুনিতে পাইয়াছিল,—"জীয়ন্তে দিলে না ভাত কাপড়, মরলে দেবে দানসাগর।" এই শোনা কথাটাই তাহার মনে তখন জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাহার পিতা যখন আরাধনা করিয়া জয়ন্তীকে এখানে—এই বাড়ীতে আনিতে চাহিয়াছিলেন, তখন তিনি কিছুতেই আসিতে চাহেন নাই; বরং স্বামীকে এমন কটু কথা শুনাইয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি গোপনে চোখের জল মুছিয়া সেই যে চলিয়া আসেন, সে স্মৃতি আজও ইভার মনে জাগিয়া আছে। এ সেই স্বামীর ভিটা—তখন সহস্র অনুনয়ে যিনি এখানে আসেন নাই, আজ সেই বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এই আশঙ্কায় জয়ন্তী অধীরা!

খানিক কাঁদিয়া জয়ন্তী নিজেই চুপ করিলেন; স্থির করিলেন—কালই তিনি এ বাড়ী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। কেন, তাঁহার কি থাকিবার স্থান নাই? শুধু কি দুইটা খাওয়া এবং পরার আশায় তিনি এখানে আছেন? শ্বশুরের দয়ার দান তিনি চান না,—যেমন করিয়াই হোক, তিনি কন্যার বিবাহ দিবেন। ভাল পাত্র নাই হোক, গৃহস্থের ছেলের অভাব দেশে নাই, যাহারা খুব কমে বিবাহ করিতে রাজি হইবে। শেষে সীতার হাততোলা খাইয়া তাঁহাকে জীবন ধারণ করিতে হইবে? ধিক না এমন জীবনে।

দুই ভগিনীর মধ্যে অনেক আলোচনা চলিল। রজনীকান্তও ইহাতে যোগ দিল। সে বেচারা এখানে মোটে টিঁকিতে পারিতেছিল না,—কারণ, নেশা করা অবধি এখানে পোষায় না। একদিন সে গোপনে একটু গাঁজা খাইয়াছিল। উমেশ চাকর তাহাকে সেদিন বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দিয়াছিল। নেশার কথা জানিতে পারিলে কর্ত্তাবাবু আর আস্ত রাখিবেন না, ইহা শুনিয়া রজনীকান্তের মন অত্যন্ত দমিয়া গিয়াছিল। এমন স্থানে বাস করা কি ভদ্রলোকের পোষায়? মনে মনে সে কর্ত্তাবাবুর উপর ভয়ানক চটিয়া গিয়াছিল। মুখে আর কিছু না বলিয়া, তাড়াতাড়ি এ স্থান ত্যাগ করিতে পারিলে সে এ যাত্রা বাঁচিয়া যায়।

স্থির হইল, কর্ত্তাবাবুকে যাওয়ার সময় জানাইয়া গেলেই চলিবে—তাঁহারা চলিয়া যাইতেছেন, আর এখানে আসিবেন না, আর তাঁহাকে বিরক্ত করিতে আসিবেন না।

ইভা শুষ্ক মুখে বলিতে গেল, "দাদু তো আমাদের এ বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে বলেন নি মা, শুধুই তাঁর ওপরে রাগ করে—"

ধমক দিয়া জয়ন্তী বলিলেন, "তুই চুপ করে থাক ইভা; তোর জন্যেই না আমায় এত অপমান সইতে হল? আমি আগে হতে এখানে আসতে চাই নি,—জানি, এলেই অপমান সইতে হবে। তুই-ই তো আমায় জোর করে টেনে নিয়ে এলি, তাই না আমার এখানে আসা। যেখানে যত আপদ বিপদ, সব তোর জন্যেই ঘটে, তোর জন্যে আমায় সইতে হয় কেন? বলছিস—তোর দাদু আমাদের চলে যেতে বলেন নি, আবার কি করে বলবেন—শুনি? বলিলেন, আজ সকাল হতে আমাদের জেনে রাখতে হবে—সীতা আমাদের কর্ত্রী। সে দয়া করে আমাদের যা দেবে, আমাদের তা মাথা পেতে নিতে হবে। এ কি বড় কম অপমান বলে মনে করিস ইভা? তার দয়ার দান এমনি করে হাত পেতে নেব, কুকুরের মত ডেকে দেওয়া ভাত মুখে তুলব? ভাবনা কি ইভা, আমার ভাই,—তোর মামা এখনও বর্ত্তমান। সত্যি সে ভাত দিতে ভয় পাবে না। বরং তার দয়ার দান নেব, সীতার দান নিতে পারব না। ওতে বড় লজ্জা—মাথা কাটা যায়। কে সে—তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? কার মুখের গ্রাস কে নিলে, কার জিনিস কে ভোগ করবে? নাঃ—আমায় আর বকাস নে ইভা,—আমি দেখতে পারব না—আমি সীতাকে কর্ত্রী বলে মানতে পারব না। দয়া করে তোর বিয়ের জন্যে কিছু টাকা ধরে দেবেন,—চাইনে সে টাকা। গরীব মায়ের মেয়ে তুই, নিজের অক্ষমতা জানিয়ে তোর বিয়ে দেব। না হয় কুমারী হয়ে থাকবি, সেও আমার ভাল।"

আজ বিদায়ের আয়োজন দেখিতে দেখিতে ইভার দু'টি চোখ ভরিয়া কেবল জল আসিতেছিল। কিন্তু হায় রে, তাহার যে কোন ক্ষমতা নাই,—এখনও মায়ের কাজের বিরুদ্ধে সে দাঁড়াইবার সাহস রাখে না।

সীতা আসিয়া দরজার পাশে দাঁড়াইল।

তাহার দিকে আগেই দৃষ্টি পড়িল জয়ন্তীর। তাঁহার মুখখানা অন্ধকার হইয়া উঠিল। তিনি ব্যস্ততার সঙ্গে লাগিলেন,- যেন তিনি সীতাকে দেখিতে পান নাই।

সীতা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল,—রজনীকান্ত গৃহমধ্যে রহিয়াছে বলিয়া হঠাৎ সে ঢুকিতে পারিল না।

ইভা একবার চোখ তুলিয়া চাহিতেই সীতার ব্যগ্র চোখের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল; ইভার চোখ নিমেষে সজল হইয়া উঠিল, সে মুখ নত করিল।

খানিক দাঁড়াইয়া থাকিয়া সীতা বেশ বুঝিতে পারিল, ইহারা তাহার আগমন জানিতে পারিয়াও চোখ তুলিবে না। বাধ্য হইয়া সে কথা কহিল,—ডাকিল, "কাকীমা।"

ব্যস্ত জয়ন্তী যেন শুনিতেই পাইলেন না,—একটা বোঁচকার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন, "কি করে বাঁধলি রে—এর মধ্যে কি রকম আলগা হয়ে পড়েছে দেখ দেখি? এতখানি রাস্তা গরুর গাড়ীতে যেতে যেতেই যে সব খুলে ছড়িয়ে পড়বে,—পথের মাঝে বাঁধাও তেমনি মুস্কিল হবে। রজনী এটা একটু ভাল করে বাঁধ বাবা। হ্যাঁ রে উমেশ, ক'খানা গাড়ী বলে এসেছিস,—ঠিক তিনখানা তো? আবার ঠিক সময়ে আসবে তো? কে জানে বাবু, তোদের পাড়াগাঁয়ে সবাই যে ঢিমে চালে চলে। কাজকর্ম তো বিশেষ নেই, কাজেই আস্তে চললেই হল। দেখিস বাবু, ট্রেণের সময়, দু'মিনিট দেরী করলেই সব মাটী।"

উমেশ মাথা কাত করিয়া বলিল, "ঠিক তিনখানাই বলেছি মা। ঠিক সময়েই আসবে, তার জন্যে আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না।"

সীতা এই কথাবার্ত্তার মধ্যে নিস্তব্ধতার ফাঁক পাইয়া আবার ডাকিল, "কাকীমা,—"

এবার উমেশের কাণে তাহার আহ্বান গিয়া পৌঁছিল। ব্যগ্রভাবে সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সীতাকে দেখিতে পাইল। চকিতে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "দিদিমণি যে আপনাকে ডাকছেন ছোট মা?"

অবহেলার ভাবে জয়ন্তী বলিলেন, "ডাকলেই কি আমার এখন যাওয়ার সময় আছে? তুই কি সময় দেখতে পাচ্ছিস নে? দেখছিস নে—আটটা বেলা হয়ে গেছে? যদিও বিকেলে ট্রেণ, তবু আমাদের এখান হতে বার হতে হবে ঠিক দশটায়। কি পথ বাপ—যেন আর কিছুতেই ফুরায় না। এখন ভাবছি—কি ঝকমারিই করেছি এখানে এসে। বছরগুলো এল আর সাঁ সাঁ করে কোথা দিয়ে কেমন করে কেটে গেল। দিন কমল—পথ কমল না। নে, নে উমেশ, তুই আর হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকিস নে বাপু; দিদির ওদিকে ভাতেভাত রান্না হয়ে এল—এখনি খেতে ডাকবে। দশটায় বার হতে হবে, আটটা বেজে গেল—সে খেয়াল রাখিস বাপু, ভুল যেন হায়াস নে।"

সীতা দেখিল—দরজার বাহির হইতে ডাকিয়া সে জয়ন্তীর সাক্ষাৎ তো পাইবেই না,—উপরন্তু তাহার কণ্ঠস্বর তাঁহাকে আরও কর্শিষ্ঠা করিয়া তুলিবে। সে আর ইতস্ততঃ করিল না,—দরজার ভিতরে গিয়া দাঁড়াইল। উমেশের পানে তাকাইয়া বলিল, "তুই ও-সব কি করছিস উমেশ? কাকীমার মাথার ঠিক নেই বলে তোদেরও মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে? যা—ও-সব কিছু গুছাতে হবে না,—তোর নিজের কাজ দেখ গিয়ে বাপু।"

উমেশ বোঁচকা বাঁধা স্থগিত রাখিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। রজনীকান্ত বিছানা বাঁধিতে বাঁধিতে থামিয়া অবাক হইয়া সীতার দিকে তাকাইয়া রহিল।

জয়ন্তী আর সহ্য করিতে পারিলেন না, চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "পাগল এখনও হইনি বাছা, তবে হতেও আর দেরী নেই। তুমি আমায় পাগল করবার চেষ্টায় আছ বটে। কেন বাছা, কি করেছি তোমার? এত অপমান করেও শান্তি পাওনি,—আবার গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধিয়ে বেশী রকম অপমান করতে এসেছ?"

সীতার মুখখানা মুহূর্ত্তের তরে দীপ্ত হইয়া উঠিয়া তখনই একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল। সে সোজা ভাবে দাঁড়াতে পারিল না—দেয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া শূন্য দৃষ্টিতে জয়ন্তীর মুখপানে চাহিল। ধীরকণ্ঠে বলিল, "আমি আপনাকে অপমান করতে এসেছি—আপনি এ কথা মনে ভাবছেন কাকীমা? আমি—আমি—"

তাহার কণ্ঠস্বর এরূপ ভাবে কাঁপিয়া গেল যে, আর একটা বর্ণ সে উচ্চারণ করিতে পারিল না।

উগ্র কণ্ঠ খাদে নামাইলেও জয়ন্তীর কণ্ঠস্বরের তীব্রতা দূর হইল না। তিনি বলিলেন, "অপমান

করিতে এসনি, তবে কি করতে এ ঘরে এসেছ বাছা?"

সীতা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমি আপনার পায়ে ধরে আপনার কলকাতায় যাওয়া বন্ধ করতে এসেছি।"

দীপ্ত হইয়া উঠিয়া জয়ন্তী বলিলেন, "থাক গো থাক, ঢের হয়েছে,—আর গোড়া কেটে আগায় জল ঢালতে হবে না। এ অভিনয়টুকু করবার কি দরকার ছিল বাপু। থিয়েটারের ষ্টেজে এ রকম অভিনয় মানাতে পারে, গেরস্তের ঘরে এ রকম সময়ে এ রকম অভিনয় মোটেই মানায় না। আজ কয়টা বছর অভিনয় করে আসছ,—কাল রাত্রে তার শেষ দৃশ্য অভিনীত হয়েছে। ভারি চমৎকার। অনর্থক শেষের দিকে আরও একটু অংশ যোগ না দিলেই হতো,—তোমার আসরে নামবার আর কোন দরকার ছিল না। যেটুকু করেছ, যে দৃশ্য দেখিয়েছ, তাতে আমরা খুবই পরিতৃপ্ত হয়েছি। যথেষ্ট সৌজন্য দেখিয়েছ, বিলক্ষণ আপ্যায়িত হয়েছি। এইবার আস্তে আস্তে বিদেয় হও,—আমাদের কাজে আর বাধা দিয়ো না।"

ফিরিয়া তিনি দেখিলেন, রজনীকান্ত তখনও আশ্চর্য্য ভাবে সীতার মুখখানার পানে তাকাইয়া আছে। তিরস্কারের সুরে তিনি বলিলেন, "হাঁ করে কি দেখছিস বল দেখি রজনী,—ঘড়িতে দেখ দেখি কয়টা বাজল। নাঃ,—তোদের জন্যেই দেখছি গাড়ী ফেল করতে হবে। আজ আমায় জব্দ করবার মতলব তোদের, তা আমি বুঝেছি।"

অপ্রতিভ হইয়া রজনীকান্ত চোখ ফিরাইয়া আবার কাজে মন দিল। উমেশ আবার বোঁচকা বাঁধিতে বসিল।

৩৪

সীতা সজল চোখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, অনেকক্ষণ সে কোন কথা বলিতে পারিল না।

জয়ন্তী বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, সীতা বাধা দিল,—"যাবেন না, একটু দাঁড়ান কাকীমা, কথা শুনে যান।"

শক্তমুখে জয়ন্তী বলিলেন, "কি বল?"

"আমি জানি আপনি আমায় বিশ্বাস করবেন না কাকীমা,—আমি এর কিছুই জানতাম না। ঘরে নারায়ণ আছেন, তিনি জানেন—আমি কোন দিন দাদুর কাছ হতে একটা পয়সা পাওয়ার প্রত্যাশা করেছি কি না। আমি যখন শুনতে পেলুম তিনি আমায় সব দিয়েছেন, তখন আমার মনে হল, আকাশ ভেঙ্গে আমার মাথায় পড়ল। আমি এর অধিকারিণী নই,—আমি এ ভার বইতে অসমর্থ। আমি তাঁর পা ধরে কেঁদেছিলুম—আমায় এ দায়িত্ব যেন না দেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই আমার প্রার্থনা শুনলেন না।"

"তাই,—তুমি যে জমীদার হয়েছ, সেই ক্ষমতাটা তোমার আমাদের দেখাবার জন্যই আমাদের এখানে রাখতে চাও,—কেমন? আজ হতে তোমারই সব, তুমিই কর্ত্রী, আমার শ্বশুর আমায় তাই জানতে, মনে করে রাখতে উপদেশ দিয়েছেন। আমি আমার শ্বশুরের অধীনে তাঁর বাড়ীতে বাস করতে পারি,—একজন নিঃসম্পর্কীয়া যে আমাদের তার অধীনে রাখবে,—তার আদেশে আমাদের চলতে ফিরতে হবে—এ সহ্য করতে পারি নে। তুমিও যে জান না তা নয়। পরের অধীনে থাকা যে কতখানি অপমানের, সেটা জেনেও, যাতে আমি থাকি, যাতে আমি তোমার দয়ার দান নিতে বাধ্য হই, তুমি সেই জন্যেই আমার এখানে থাকবার অনুরোধ করতে এসেছ?"

জয়ন্তীর কণ্ঠস্বরে দারুণ ঘৃণা ফুটিয়া উঠিতেছিল।

ক্ষুব্ধ সীতা বলিল, "মিছে কথা কাকীমা,—আপনি ভুল ধারণা করে রেখেছেন। দাদু দিতে চাইলেই আমি নেব, এমন নীচ মন আমার ভাববেন না। আমার কিসের দরকার কাকীমা? একবেলা ভাত খাই, আর একবেলা কিছু না খেলেও আমার দিন বেশ কেটে যায়। পরনের দু'খানা মোটা কাপড়,—তাও যেখানেই থাকি সেখানেই পাব। আমি কিছু নেব না, যার জিনিস সেই সব পাবে। আপনার বাড়ী ঘর, আপনি থাকুন কাকীমা, আমিই আজ দাদার কাছে চলে যাব।"

জয়ন্তী অবহেলার ভাবে বলিলেন, "তাঁর উইল হ'য়ে গেছে—সে কথা তোমায় মনে করিয়ে দিতে হবে না।"

সীতা বলিল, "না। কিন্তু সে উইল বদলাতে বেশীক্ষণ যাবে না তো। আমি এখনই দাদুকে ডাকতে পাঠাচ্ছি। যাতে উইল ছিঁড়ে ফেলা হয় তাই করবো। যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দিয়ে, এর ন্যায্য অধিকারিণী কে দেখিয়ে দিয়ে আমিই সরে যাব কাকীমা, আমিই চলে যাব। আর আমি তাঁর কোন কথা শুনব না, তাঁর আদেশ

মানব না। আপনার দু'খানা পায়ে পড়ি কাকীমা—"

তাহার চোখ দিয়া কয়েক বিন্দু জল উছলাইয়া পড়িল।

সুশীলা এ ঘরে গোলমাল শুনিয়া রন্ধন ফেলিয়া আসিয়া দরজার উপর দাঁড়াইলেন। সীতার শেষ কথা বেশ স্পষ্ট ভাবেই তাঁহার কাণে গেল। কথার মধ্যে বিলক্ষণ তীব্রতা ঢালিয়া দিয়া, আর দুই-পা অগ্রসর হইয়া তিনি বলিলেন, "থাক গো বাছা, ঢের হয়েছে, ঢের বলেছ। গোড়া কেটে আর মাথায় জল ঢালতে আসতে হবে না। তোমায় খুব চিনেছি বাছা, তুমি বাছা ডুবে ডুবে জল খাও, মনে ভাব—শিবের বাপও জানতে পারবে না। ভিজভিজে বেড়াল তুমি,—ইভুর মত হাঁদা মেয়েকে দু'টো নরম কথায় তুমি ভুলাতে পার, তা বলে সবাইকে ভুলানো, সকলের চোখে ধূলো দেওয়া ভারি শক্ত তা জেনো।"

সীতার চোখের জল চোখেই শুকাইয়া গেল। সে বদ্ধ দৃষ্টিতে এই নারীর পানে তাকাইয়া রহিল।

সুশীলা ভগিনীর পানে তাকাইয়া রুক্ষকণ্ঠে বলিলেন, "তুই হাঁ করে কি শুনছিস বল দেখি জয়ন্তী? এতটুকু একটা মেয়ে তোর মত বুদ্ধিমতীকে একবার আকাশের চাঁদ হাতে দেয়, আবার পায়ের তলায় ফেলে, একবার গাছে তোলে, আবার নামিয়ে নেয়,—মনে করে তোর লজ্জা পাওয়া উচিত। কাল স্পষ্ট কথা শুনে এসেও আজ আবার সেই বিষয়সম্পত্তির কথা তুলছিস্? যদি তোর মনের মধ্যে এতটুকু মনুষ্যত্ব থাকে, এতটুকু তেজ থাকে, জয়ন্তী—একটা কথা কাণে না তুলে আজ এখনই বার হয়ে পড়বি, আর জীবনে কখনও এ ভিটেয় পা দিবি নে।"

অকস্মাৎ চেতনা পাইয়া জয়ন্তী বলিলেন, "তুমি ঠিক কথাই বলেছ দিদি। আমায় কাল রাত্রে অত করে অপমান করেও এদের আশা মেটেনি, এখন পায়ে ধরে সেধে এখানে রেখে শেষকালে দুই পায়ে দলবে, এই এদের মতলব। উমেশ, বোঁচকা বেঁধে হাঁ করে কথা শুনছিস কি বল দেখি? এদিকে পোণে নয়টা বাজে। যা বাপু, দেখ, গাড়ী কয়খানা এলো কি না সদরে। যদি না এসে থাকে, তবে চট করে যা—ডেকে নিয়ে আয় গিয়ে। আগেই জানি পাড়াগাঁয়ের সবই ঢিমে চাল। এ কি সহরের লোক যে ঘড়ি ধরে কাজ করবে? রজনী, তুই বা হাঁ করে বসে আছিস কেন বল দেখি? যা—স্নান করে এসে যা পারিস দু'টো খেয়ে নে।"

উঠিতে উঠিতে রজনী বলিল, "ইভা খাবে না?"

জয়ন্তী রুক্ষকণ্ঠে বলিলেন, "না, ইভা এ বাড়ীর জলবিন্দু মুখে দেবে না।"

সীতা একবার চোখ তুলিয়া ইভার পানে চাহিল,—অধর দন্তে চাপিয়া নত-দৃষ্টিতে সে একখানি প্রস্তর-প্রতিমার মত বসিয়া আছে।

চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল, অতি কষ্টে সে পতনোন্মুখ অশ্রুজল সামলাইয়া লইল। না,—ইহাদের সম্মুখে আর না,—আর একটা ফোঁটাও চোখের জল সে ফেলিবে না।

মুহূর্ত্তে সে কঠিন হইয়া গিয়া উমেশের পানে তাকাইল, বলিল, "দাঁড়িয়ে রইলি কেন উমেশ,—গাড়ী না এসে থাকে তো ডেকে নিয়ে আয়। সঙ্গে নিয়ে একেবারে ট্রেণে তুলে দিয়ে আসবি। কাকীমা, তবে তাই ভাল, আপনারা যা বিশ্বাস করে নেন তাই সত্যি হোক। একটা কথা—যদি আপনার হাতে টাকাকড়ি কিছু না থাকে, না হয় আমি কিছু ধার স্বরূপ দেই,—কলকেতায় গিয়ে পাঠিয়ে দেবেন।"

সুশীলা নীরসকণ্ঠে বলিলেন, "অগত্যা নিতে হবে, নইলে এখন তো আর অন্য উপায় নেই। তবে বাছা, শুধু হাতে আমরা তো টাকা নেব না, —তুমি ইভার এই হার ছড়াটা রেখে দাও। আমরা যত শীগগির পারি টাকা পাঠিয়ে দেব, তুমিও হার ছড়াটা পাঠিয়ে দিয়ো।"

ইভার গলার হার যখন সীতার হাতে বন্ধকী জিনিস স্বরূপ আসিয়া পড়িল, তখন বুক ফাটিয়া গেলেও সীতা মুখে দৃঢ়তা দেখাইল; হার হাতে লইয়া সে শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, "আপনি আসুন মাসীমা, যে কয় টাকা দরকার, তা আপনার হাতে দিচ্ছি।"

ভগিনীর সহিত দৃষ্টি-বিনিময় করিয়া সুশীলা বলিল, "বেশী টাকা চাই নে, বাছা, গোটা ত্রিশেক হলেই চলবে।"

সীতা হার লইয়া চলিয়া গেল। একটু পরেই ত্রিশটি টাকা দাসীর হাত দিয়া পাঠাইয়া দিল।

সুশীলা টাকা গণিতে গণিতে বলিলেন, "কি তেজ দেখলি জয়ন্তী, অহঙ্কারটা দেখ একবার। নিজে আসতে পারলেন না, ঝির হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হল। কপাল আর কাকে বলে,—নইলে ওর হাতের টাকা নিতে হয়!"

জয়ন্তী গুম হইয়া রহিলেন।

নিজের শয়ন-গৃহে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া সীতা শুইয়া পড়িয়াছিল। বামন ঠাকুরাণী রন্ধন-গৃহ হইতে চীৎকার করিতেছিল, সীতা কথায় কাণ দিল না।

খানিক পরে কমলা আসিয়া তাহার রুদ্ধ-দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিলেন, "সীতা, ওরা সব চলে যাচ্ছে। ইভা একবার তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। একটীবার দরজাটা খোল মা।"

ইভা আসিয়াছে শুনিয়াই সীতা ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল। তখনই আবার সে মেঝেয় লুটাইয়া পড়িল। আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ওকে যেতে বল পিসীমা, আমি দেখা করতে পারব না, আমার শরীর বড় খারাপ হ'য়েছে।"

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ইভা ডাকিল,—"দিদি,—"

সীতা উত্তর দিল না।

বিকৃত কণ্ঠে ইভা ডাকিল, "একবার দরজা খুললে না দিদি, একটীবার শেষ দেখা করলে না? হয়তো আর কখনও তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না, তোমার কথা আমি শুনব না, আমার কথা তুমি শুনবে না। একটীবার দরজা খোল দিদি, তোমায় শেষ দেখা দেখে যাই।"

দুই হাতে আর্ত্ত বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে সীতা বলিয়া উঠিল, "না ইভা আমি দরজা খুলব না, আমি তোমার সঙ্গে এখন দেখা করব না। যাও বোন, আমি এখান হতে আশীর্ব্বাদ করছি—যেন তুমি সুখী হতে পার।"

কাঁদিয়া ইভা চলিয়া গেল।

সীতা খানিক চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল, তাহার পর হঠাৎ ধড়ফড় করিবা উঠিয়া পড়িয়া ক্ষিপ্রহস্তে দরজা খুলিয়া ফেলিল। সম্মুখেই ক্ষমাকে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "ওঁরা চলে গেছেন,—ইভা চলে গেছে ক্ষমা?"

তাহার আরক্ত মুখ, স্ফীত চোখ দেখিয়া ক্ষমা একটু ভয় পাইল, বলিল, "হ্যাঁ তাঁরা তো এই সবে গাড়ীতে উঠলেন দিদিমণি, গাড়ী এতক্ষণ সদর রাস্তায় উঠেছে।"

ব্যগ্রকণ্ঠে সীতা জিজ্ঞাসা করিল, "ইভা খুব কাঁদছিল?"

ক্ষমা বলিল, "এখানে দাঁড়িয়ে খুব খানিকটা কেঁদেছিলেন। মায়ের কাছে গিয়ে কি আর কাঁদবার সাধ্য আছে দিদিমণি। তিনি তো তবু কাঁদতে দেখেন নি, শুধু চোখ দু'টো রাঙ্গা দেখেছেন, তাতেই কি বকুনিটা না বকলেন। পিসীমা এত হাতে ধরলেন—একটু জল খেয়ে যাওয়ার জন্যে, কিছুতেই খেলেন না। ইভা দিদি বড় তেষ্টা পেয়েছে বলে জল চাইলেন। ছোট মা একটু জল পর্য্যন্ত খেতে দিলেন না, বললেন, 'পথের ধারে জল খাওয়ার অনেক পুকুর আছে।' পিসীমা শ্রীধরকে প্রণাম করে যেতে বললেন, 'ঠাকুর মানি নে' বলে ছোট-মা চলে গেলেন।"

সীতা আবার দরজা বন্ধ করিয়া দিল। জানালার পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। নীচে বহুদূরে ক্রমশঃ সরু পল্লীপথে প্রচুর ধূলা উড়াইয়া ক্ষুদ্রাকারে তিনখানি গরুর গাড়ী চলিয়াছে। ইহার মধ্যে কোনখানাতে ইভা আছে কে জানে।

সে যতই ইভার কথা ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। হায় রে, সে বড় হইলেও এখনও তাহার প্রকৃতি ক্ষুদ্র শিশুর মতই; সে যে শিশুর মতই পরের উপর এখনও নির্ভর করে। যদি কখনও রাগের বশে সে একটাও কথা বলিয়া বসে, তখনই দুই হাতে গলা জড়াইয়া ধরিয়া বুকের মধ্যে মুখ রাখিয়া চোখের জল ফেলিয়া সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে।

সীতা ভাবিতেছিল কেমন করিয়া সে আর এ বাড়ীতে থাকিবে। দাদুকে ধরিয়া কাল পরশু এ বাড়ী হইতে বাহির হইতেই হইবে। ইভাহীন পুরীতে সে আর থাকিতে পারিবে না।

৩৫

জয়ন্তী কলিকাতায় আসিয়াই জ্যোতির্ম্ময়ের নিকট লোক পাঠাইয়া দিলেন,—সে যেন তাহার সময় মত একবার আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়া যায়।

দেশের সংবাদ জানিবার জন্য জ্যোতির্ম্ময়ের প্রাণটাও সময় সময় বড় ছটফট্ করিত। মা যে নাই, এ সংবাদ সে প্রশান্তের মুখে পাইয়াছিল। সংবাদটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। সে কথা শুনিয়া বক্ষে সে যে আঘাত পাইয়াছিল, সেই আঘাতের বেদনা সামলাইতে তাহার বহুক্ষণ সময় লাগিয়াছিল। সে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই—কবে, কি ব্যারামে তাহার মা ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। প্রশান্তের গম্ভীর কণ্ঠস্বর কেবল তাহার বুকের মধ্যে, মাথার মধ্যে বাজিতেছিল—তুমি মাতৃহত্যাকারী, তোমার মুখ দেখাও মহাপাপ।

যেটুকু তখন সে শুনিয়াছিল, তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। আর কিছুই সে তখন শুনিতে চায় নাই—শুনিবার ক্ষমতাও তাহার ছিল না। কিন্তু তাহার পরে তাহার মনে জানিবার স্পৃহা যখন জাগিয়া উঠিল, তখন এমন কাহাকেও সে পাইল না, যাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে প্রশ্নের উত্তর সে পাইবে।

জয়ন্তী রামনগর হইতে আসিয়াছেন, তাহার সহিত দেখা করিতে চান—কথাটা শুনিবামাত্র তাহার অন্তর ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। চকিতে মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল সেই রামনগর। হায় রে, যখন যাইবার উপায় ছিল, যাইবার জন্য পত্রের উপর পত্র আসিত, তখন তো কই, যাইবার ইচ্ছা মোটেই তাহার মনে জাগিত না! কত রকম ওজর করিয়া, কত ছুটী সে এদিক ওদিক করিয়া কাটাইয়া দিয়াছে! তখন তো যাইবার জন্য প্রাণের মধ্যে এমন আকর্ষণ অনুভব করে নাই! আজ যাইবার পথ নাই বলিয়াই তাহার প্রাণটা অন্তরের মধ্যে গুমরিয়া মরিতেছিল। তখন যাহা নিতান্তই তুচ্ছ ছিল, আজ সেই অতি ক্ষুদ্রতম বস্তু, ক্ষুদ্রতম কথাও তাহার মনের মাঝে বৃহৎরূপে জাগিতেছিল।

আজ তাহার মনে হইতেছে—একবার যদি সে মুহূর্ত্তের তরেও সেখানে যাইবার অধিকার পাইত, তাহার জীবন ধন্য হইয়া যাইত। যাহা চির অবহেলার বস্তুই ছিল, আজ যে তাহাই তাহার সাধনার ধন হইবে, তাহা তো সেদিনে স্বপ্নেও সে ভাবে নাই।

বাস্তবিক তাহার বিবাহে সুধা উঠে নাই, উঠিয়াছিল প্রাণনাশী গরল। চিরদিনের চাপা প্রকৃতি তাহার অন্তরে মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইলেও কখনই তাহা সে প্রকাশ করিতে পারিত না। তাহার অভিমান জগৎবাসীর উপর, জগতের উপর জন্মিয়া গিয়াছে। জগৎ তাহাকে কাচ দিয়া ভুলাইয়াছে, রত্ন দেয় নাই। যে যাহা করিয়া যাক, সে তাহাতে একটা কথাও বলিত না,—নিজে বড় অভিমানে অনেক দূরে সরিয়া থাকিত।

অনন্তর যাহার নিয়ত আগুনে পুড়িয়া দগ্ধ হইতেছে, বাহির কিন্তু তাহার বড় শান্ত—নির্ব্বিকার। সমুদ্রের যেখানে গভীরতা বেশী, সেখানে বড় তরঙ্গ উঠে না, বেশ শান্ত—স্থির থাকে। জ্যোতির্ম্ময়ের অন্তরে যে আগুন জ্বলিত, তাহা অন্তরেই ছিল,—উপরে হাসি দিয়া সে সব ঢাকিয়া রাখিত।

জয়ন্তীর কাছে একবার যাইবার জন্য তাহার প্রাণটা ছট্‌ফট্ করিতেছিল। সেদিন সে তাই সকাল সকাল কোর্ট হইতে বাড়ীতে ফিরিল।

বেলা তখন পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। গেটের সামনে একখানা মোটর দাঁড়াইয়া ছিল। ভিতরে ছিলেন ডাক্তার দত্ত। দেবযানী সবে মাত্র উঠিতে যাইতেছিল।

জ্যোতির্ম্ময় গাড়ী হইতে নামিয়া একবার মাত্র স্ত্রীর পানে তাকাইয়া ভিতরে চলিয়া যাইতেছিল,—দেবযানী তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "এই যে তুমি এসেছ, তবে তোমাকেই বলে যাই। আমি ডাক্তার দত্তের সঙ্গে বায়স্কোপে যাচ্ছি, শীগগিরই ফিরে আসব।"

কথাটা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতির্ম্ময়ের মুখের পানে দৃষ্টিপাত করিয়া সে তাহার মনের ভাব স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। ডাক্তার দত্তকে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করিতে বলিয়া সে জ্যোতির্ম্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে গেটের ভিতরে ঢুকিল।

"বায়স্কোপে যাচ্ছি বলে রাগ করছো?"

জোর করিয়া শুষ্কমুখে হাসির রেখা ফুটাইয়া তুলিয়া জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "রাগ করব কেন দেবযানী? আমি ছুটি পাইনে যে তোমায় বায়স্কোপে নিয়ে যাই। তোমার বাপেরও আমার মত অবস্থা। আমাদের যাওয়া হয় না বলে তোমাকেও যে আটকে রাখব, এমন লোক আমি নই। ডাক্তার দত্ত তোমায় নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছেন, এতে আমি খুসীই হয়েছি।"

দেবযানী বলিল, "তুমি মুখে বলছ খুসী হয়েছি; কিন্তু মনে যে খুসী হওনি, এ আমি বেশ বুঝতে পারছি তোমার মুখ দেখে। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি—তুমি ডাক্তার দত্তকে পছন্দ কর না। কিন্তু ওঁকে না ভালবাসে এমন লোক আমি তো কাউকে দেখতে পাই না। ওঁর সুন্দর কথাবার্ত্তা, অসাধারণ হাসাবার শক্তি, সুন্দর চেহারা অনেককে যেমন ওঁর পানে আকর্ষিত করে তেমনি অনেককে—"

বলিতে বলিতে হঠাৎ সে থামিয়া গেল।

বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "আঃ, কি বাজে বকছো দেবযানী? আমি কোন দিন কি তোমার কোন কাজে বাধা দিয়েছি,—নিজের ইচ্ছামত কোন কাজ তোমায় দিয়ে করিয়েছি? মিথ্যে তুমি কতকগুলো বাজে কথা বলে যাচ্ছো

মাত্র। তোমার যা ভাল লাগবে—যা তুমি ভালোবাস—তাই করে যেয়ো, আমি তাতে একটা কথাও যদি বলি তখন বলো।"

দেবযানী খুসী হইয়া ফিরিয়া গেল।

জ্যোতির্ম্ময় একপা দুইপা চলিতে চলিতে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, ডাক্তার দত্ত তাহাকে গাড়ীতে উঠাইয়া লইলেন, ড্রাইভার মোটর চালাইল।

এই তাহার স্ত্রী—তাহার ধর্ম্মপত্নী, তাহার সুখ-দুঃখের সমানাংশ-ভাগিনী!—ছিঃ!—

জ্যোতির্ম্ময়ের সমস্ত শরীর ঘৃণায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সমস্ত দিন খাটিয়া পরিশ্রান্ত কলেবরে শান্তির আশায় লোকে ঘরে ফিরিয়া আসে,—সে কি লাভ করিতে আসিয়াছে? দিবা অবসানে ওই যে পরিশ্রান্ত কেরাণীদল, মজুরের দল, সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রমান্তে ঘরে ফিরিতেছে,—কত তাড়াতাড়ি উহারা চলিতেছে! তাহাদের মনে কত আনন্দ,—সারাদিন পরে এইবার তাহারা গৃহে ফিরিয়া শান্তিলাভ করিবে। উহাদের স্ত্রীগণ উৎসুক নেত্রে পথের পানে চাহিয়া আছে,—স্বামী আসিবামাত্র স্বামী-সেবার্থে ছুটিবে।

জ্যোতির্ম্ময়ের মানস-চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল অনেক দিন পূর্ব্বের দেখা একখানি ছবি। মনে ফুটিয়া উঠিল—তাহাদের গ্রামে বাড়ীর পাশে যে একঘর বাগ্দী বাস করিত, তাহাদের কথা। সংসারে তাহারা দুইজন—স্বামী ও স্ত্রী ছাড়া আর কেহই ছিল না। স্বামী সকাল বেলা চারটী পান্তা খাইয়া তাড়াতাড়ি করিয়া কাজে বাহির হইয়া যাইত, বাড়ী ফিরিত একেবারে বেলা শেষে। হরিদাসের স্ত্রী উৎসুক নেত্রে পথ পানে চাহিয়া দরজায় বসিয়া থাকিত। শত কর্ম্মের মাঝখানেও এ সময়ে তাহার ছুটী। যত আত্মীয়-স্বজনই আসুক, এই সময়টীতে সে সকলের সঙ্গ ছাড়িয়া আসিত! যেখানেই থাক্, এই সময়টাতে সে ফিরিয়া আসিবেই। তাহার স্বামী এই সময়ে বাড়ী ফিরিত। তাড়াতাড়ি সে স্বামীকে পিঁড়ি পাতিয়া বসাইত। নিজের হাতে তামাক সাজিয়া আনিয়া দিত, বাতাস করিত, কত গল্প করিত। তাহারা আহার করিত কি? সেই মোটা লাল চালের ভাত সামান্য শাক উপকরণ দিয়া হরিদাস আহার করিত, —না জানি তাহাতে কত তৃপ্তিই ছিল। জ্যোতির্ম্ময় তখন কেবলমাত্র দেখিয়া যাইত। তাহাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে কি মধুর ভাব ছিল, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি সেদিন তাহার ছিল না। আজ ঠেকিয়া সে বুঝিয়াছে।

এই যে সে সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া শ্রান্ত-দেহে ক্লান্ত-মনে বাড়ী ফিরিল, তাহার স্ত্রী এ সময়ে স্ত্রীর কর্ত্তব্য ভুলিয়া অনায়াসে বায়স্কোপ দেখিতে চলিয়া গেল। সে শিক্ষিতা,—সে জানে, সে পুরুষের দাসী নহে। সে স্বামীকে ভালবাসিতে পারে, সেবা করিতে পারে না; কারণ, তাহাতে তাহাকে খুবই হীন হইয়া পড়িতে হয়। যদি সে ব্যর্থ শিক্ষা না পাইত, স্বামীসেবা অর্থে যে দাসীর কাজ তাহা না জানিত—সকল আমোদ-প্রমোদের উপর সে স্বামীসেবাকে স্থান দিতে পারিত।

আজ সে মিঃ দত্তের সহিত গিয়াছে বলিয়াই যে জ্যোতির্ম্ময় হৃদয়ে আঘাত পাইল তাহা নহে। সে বাড়ী ফিরিয়া কোন দিনই স্ত্রীকে দেখিতে পায় নাই। শ্রান্ত ভাবে বাড়ীতে ফিরিয়াই সে শুইয়া পড়িত! দশটা দাস দাসী তাহার নিকট দৌড়াইয়া আসিত, কিন্তু সে তো তাহা চাহিত না। সে নিজের হাতেই নিজের কাজ সব করিয়া লইতে পারিত, যদি দেবযানী তাহার কাছে থাকিত। যদি সে তাহার ললাটে মুহূর্ত্তের জন্যও একটীবার স্নেহের স্পর্শ দিত, সে যে সকল দুঃখ, সকল কষ্ট ভুলিয়া যাইত।

কিন্তু না, এ যে দাসীর কাজ,—অন্ততঃ দেবযানীর ধারণা তাহাই। সে যাহা দিতেছে, তাহা নিক্তি ধরিয়া ওজন করিয়া। কিন্তু যাহা সে পাইতেছে, তাহা ওজন করিতে গেলে যে অপর্য্যাপ্ত হইয়া যায়, তাহা সে কোন দিনই ভাবিয়া দেখে নাই, দেখিতেও চায় না। সে জানিতে চায় না সে স্ত্রী,—জীবনের সুখ-দুঃখের সমানাংশভাগিনী,—সেই জন্যই সে বড় আপনার; সে যাহা করিবে তাহা দাসীর কাজ নহে, স্ত্রীর কাজ।

আজ জ্যোতির্ম্ময়ের মনে হইল—যদি সে গৃহের ক্ষীণ প্রদীপ-শিখাটীকে অগ্রাহ্য করিয়া উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোর পানে লক্ষ্য রাখিয়া না ছুটিত, তবে তাহাকে অন্ধ হইতে হইত না। যদি সে এই উচ্চশিক্ষিতা নারীকে জীবনের সহচারিণী না করিয়া অল্পশিক্ষিতা একটী নারীকে জীবনের সঙ্গিনী রূপে পাশে পাইত, তাহার জীবন পূর্ণতায় ভরিয়া উঠিত, সে যথার্থ সুখী হইতে পারিত।

কথাটা মনে করিতে সে চমকাইয়া উঠিল।

হাঁ, সে তো আসিয়াছিল। তাহার হৃদয় প্রেম ভক্তি অর্ঘ্যরূপে সাজাইয়া এই নিরের চরণতলে

সমর্পণ করিবার আশাতেই তো সে বসিয়া ছিল। সুখ তাহার দুয়ারে আসিয়াছিল শান্তির হাত ধরিয়া। সেই যে পদাঘাতে তাঁহাকে দূর করিয়া দিয়া স্বেচ্ছায় অশান্তি ও দুঃখকে বরণ করিয়া লইয়াছে। মা যাহা করেন তাহা সন্তানের মঙ্গলের জন্যই। তিনি তো রত্ন আহরণ করিয়া তাহার জন্য রাখিয়াছিলেন। মূঢ় সে, তাহা চিনিল না, মায়ের দান সে অবহেলা করিয়া দূরে ফেলিয়া দিল।

"মা—"

জ্যোতির্ম্ময়ের বক্ষ ফাটিয়া অনেক কাল পরে এই বড় শান্তিময়, বড় মধুর—মধুময় আহ্বানটা মুখে ভাসিয়া আসিল। সে মধুর মা নাম আর মুখে আনিতে পারে নাই। তাহার হৃদয় মা নাম হারাইয়া কেমন যেন জড়ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছিল। আজ মা শব্দটী মুখে আনিতে তাহার বুকটা যেন জুড়াইয়া গেল। সে একবার—দুইবার, বহুবার ডাকিতে লাগিল,—"মা—মা—মা"

হায়, কোথায় আজ তাহার সেই করুণার আধার মা! আজ যদি মা থাকিতেন, সে ই ব্যথা বহিয়া তাঁহার নিকট ছুটিত। আর কেহ তাহাকে মার্জ্জনা না করুক, মা তাহাকে নিশ্চয়ই মার্জ্জনা করিতেন। আর সকলে তাহাকে দেখিয়া তফাতে সরিয়া যাইত, মা তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইতেন। সে যত অপরাধই করুক, মা তাহার উপর রাগ করিয়া থাকিতে পারিতেন কতক্ষণ? আজ কোথায় সেই স্নেহময়ী জননী? বড় ব্যথায় বুক যে ফাটিয়া যাইতে চায়! এ ব্যথা প্রকাশ করিবে সে কাহার কাছে? আজ সে একটী স্নেহ-পূর্ণ হৃদয় পাইতে চায়; কিন্তু কোথায় রে, সে হৃদয় আজ সে পাইবে কোথায়?

দাদু আছেন! তিনিও একদিন তাহাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন—মুহূর্ত্ত তাহাকে চোখের আড়াল করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

সে আজ অতীতের কথা। সেদিনের পানে চোখ ফিরাইয়া চাওয়া যায় না। দাদু পুরুষসিংহ, তিনি নারী নহেন। তিনি অক্লেশে হৃদয়ের দয়া, মায়া, স্নেহ প্রভৃতি সুকোমল বৃত্তিগুলি সমূলে উচ্ছেদ করিতে পারেন,—করিয়াছেনও তাই। জ্যোতির্ম্ময় জানে, সে দাদুর স্নেহ চিরতরে হারাইছে,—দাদুর বক্ষে আর তাহার স্থান নাই।

না,—একটী স্থান তাহার আছে,—একটী নারী-হৃদয়ে তাহার জন্য এখনও সিংহাসন পাতা। সে যত বড়ই পাপিষ্ঠ, নরাধম হোক, একটী তরুণী এখনও তাহার পূজা করে। যাহার প্রেম ভক্তি অর্ঘ্য সে নিষ্ঠুর পদাঘাতে ছড়াইয়া ফেলিয়া আসিয়াছে, তাহার অন্তরে এখনও তাহার স্থান আছে। জ্যোতির্ম্ময় বেশ জানে—সীতার প্রেম মরে নাই, মরিতে পারে না। তাহার আকর্ষণ সে অনুভব করে।

দুঃখিনী সীতা,—

আহা, সে আজীবন আঘাত সহিয়া আসিয়াছে—এখনও তাহাকে নিরন্তর বেদনা সহিতে হইতেছে। একদিন সে যে গানটি গাহিয়াছিল, বহুকাল পরেও আজ তাহা জ্যোতির্ম্ময়ের অন্তরে জাগিতেছে—

"যতবার আলো জ্বালিতে চাই—
নিভে যায় বারে বারে;
আমার জীবনে তোমার আসন
গভীর অন্ধকারে।"

পূজারিণী তাহার অন্ধকার নীরব হৃদয়-মন্দিরে দেবতার প্রতিষ্ঠা করিয়া নীরবে নিত্য চোখের জলে ও বুকের বেদনা দিয়া পূজা করিয়া যাইতেছে। ওরে অন্ধা, তোর ওই মন্দির চূর্ণ করিয়া ফেল, সিংহাসনশুদ্ধ ওই পাষাণ দেবতাকে টানিয়া দূরে ফেলিয়া দে। এই নিকষকালো অন্ধকারের মধ্যে ওই পাষাণমূর্ত্তি কেন রাখিয়াছিস? তোর হৃদয় শূন্য পড়িয়া থাক, কোন দিন না কোন দিন এই জীবনের পথে চলার সময় হয় তো উজ্জ্বল হইয়াও উঠিতে পারে।

দুই হাতের মধ্যে মুখখানা ঢাকিয়া টেবিলে ভর দিয়া জ্যোতির্ম্ময় একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। পোষাকটাও তাহার খোলা হয় নাই।

কখন সন্ধ্যা হইয়া গেল, সমস্ত বাড়ীটা বৈদ্যুতিক আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, শুধু সেই ঘরটী অন্ধকারে ঢাকা পড়িয়া রহিল। সে নিজের ইচ্ছাতে আলো জ্বালিতে দিল না। আজ আলোর খেলা তাহার নিকটে পরিহাস বলিয়া ঠেকিতেছিল; কারণ, তাহার অন্তরের ক্ষুদ্রতম অন্ধকার হঠাৎ আজ বিরাট হইয়া উঠিয়াছে।

সেই নিকষ-কালো অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া জ্যোতির্ম্ময় নিজেকে নিজে ধারণা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ঠিক এমনই অন্ধকার দুর্ভাগিনী সীতার হৃদয়খানা। চারিদিকে এমনই আলোর বিকাশ, সে আলোর একটু রেখাও তাহার হৃদয়ের জমাটবাঁধা অন্ধকারের মধ্যে আসিয়া পড়িতে পারে নাই। অন্ধকারের নিবিড়তা বুঝি আলোর রেখাকে নিজের সীমানায় আসিতে দেয়

নাই। অথবা আসিতে পারিলেও, উপকথার মধ্যে সোণা যেমন কয়লার সহিত মিশিয়া কয়লার সংখ্যাই বাড়াইয়া তুলিয়াছিল, তেমনি কালোর বুকে কালো হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। এই অন্ধকারের ললাটে শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় চুম্বনের রেখা আঁকিয়া দিতে পারে নাই। আঃ, কি করিয়াই না ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে সে এই তরুণ হৃদয়টীকে! নিজেও তো সে সুখী হইতে পারে নাই। দেবযানীর মত শিক্ষিতা মেয়ে জগতে বিরল নয়; কিন্তু সে তো এ দৃশ্য দেখিতে অভ্যস্ত নয়। সে যাহা চাহিয়াছিল তাহা পাইল কই? ভগবান একজনকে সব দিয়া সর্ব্বসুখে সুখী করিতে পারেন না, সেও তাই সুখী হইতে পারে নাই। সে চাহিয়াছিল রূপ বিদ্যা,—আসল জিনিস তো সে চায় নাই। ভগবান তাই তাহাকে তাহাই দিয়াছেন,—আসল জিনিস হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। আজ সেইটী না পাওয়ার জন্যই জ্যোতির্ম্ময়ের বিদ্যা, সৌন্দর্য্য, সবই মিথ্যা হইয়া গিয়াছে। যাহা গিয়াছে, তাহা লইয়া সে কোন দিন মাথা ঘামায় নাই, সেই হৃদয়ের পানে আজ তাহার দৃষ্টি পড়িয়াছে। আজ সে ভাবিতেছে—জীবনে সে সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই, সব ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

দুই হাতের মধ্যে মুখখানা রাখিয়া সে পড়িয়া রহিল।

৩৬

"জ্যোতি, ঘরে আছ কি?"

ঘরে প্রবেশ করিতে গিয়া সুরেশবাবু থমকিয়া দাঁড়াইলেন,—"এ কি, সব যে অন্ধকার,—বেয়ারা আলোটা জ্বালিয়ে দিয়ে যায় নি বুঝি?"

সুরেশবাবুর কণ্ঠস্বর কাণে আসিবামাত্র জ্যোতির্ম্ময়ের বাহ্যজ্ঞান যেন ফিরিয়া আসিল; ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া আন্দাজে টেবলের ঠিক দক্ষিণ দেওয়ালের গায়ে হাতড়াইয়া সুইচটা টিপিয়া দিতেই ঘরখানা আলো হইয়া উঠিল। সুরেশবাবু প্রবেশ করিতে করিতে বলিলেন, "ভেবেছিলুম, তুমি বুঝি ঘরে নেই,—বেয়ারা বললে বিকেলে তুমি ফিরে এসেছ। কিন্তু এই অন্ধকারের মধ্যে চুপ করে কি করছ জ্যোতি? এ কি, এখনও কোর্টের পোষাক খোল নি দেখছি যে, ব্যাপার কি?"

জ্যোতির্ম্ময়ের তখন নিজের দিকে দৃষ্টি পড়িল—তাই তো, এখনও পোষাকটা যে খোলা হয় নাই। ইহার হেতু সে কি দর্শাইবে? অপ্রস্তুত ভাবে সে কি বলিল বুঝা গেল না। বেয়ারা তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহার পোষাক খুলিয়া দিল।

সে আবার বসিতেছিল, সুরেশবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, থাক, আগে মুখ-হাত ধুয়ে এসো, তার পরে বসো। চা আজ এইখানেই দিয়ে যাবে এখন।"

জ্যোতির্ম্ময় কোন কথা না বলিয়া বাথরুমে চলিয়া গেল। খানিক বাদে সে ফিরিয়া আসিল। তৃষ্ণায় তাহার বুক শুকাইয়া উঠিয়াছিল,—সরবতের গ্লাসটা এক নিঃশ্বাসে খালি করিয়া ফেলিল।

সে খানিকটা সুস্থ হইলে সুরেশবাবু বলিলেন, "আজ বিকেলে তোমার কাকীমা আবার লোক পাঠিয়েছিলেন। এই পত্রখানা সে দিয়ে গেছে,—নাও।"

জ্যোতির্ম্ময়ের মনে পড়িল—কাকীমা কাল সকালে লোক পাঠাইয়াছিলেন; অনুরোধ করিয়াছিলেন—যেন সে তাহার অবকাশ সময়ে একবার অর্দ্ধ ঘণ্টার জন্যও তাঁহার সহিত দেখা করে। কালই সে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিল; কিন্তু কোর্ট হইতে ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর কয়েকটী বন্ধু আসিয়া পড়ায় আর যাওয়া হয় নাই। আজ সকাল সকাল সেখানে যাইবার উদ্দেশ্যেই বাহির হইয়াছিল। পথের উপর দেবযানীকে দেখিতে পাইয়া তাহার সারা অন্তর বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এক কথা ভাবিতে দশ কথা মনে জাগিয়াছিল,—জয়ন্তীর সহিত যে দেখা করিতে যাইতে হইবে, সে কথা তাহার মোটে মনে ছিল না। কাল সে যায় নাই বলিয়া জয়ন্তী আজ আবার লোক পাঠাইয়া দিয়াছেন। পাছে সে না যায়, তাই স্বহস্তে একখানা পত্রও লিখিয়া দিয়াছেন।

পত্রখানা লইয়া পড়িতে পড়িতে অকস্মাৎ তাহার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া উঠিল। আর না পড়িয়া সে পত্রখানা মুড়িয়া এনভেলপের মধ্যে বন্ধ করিয়া পকেটে রাখিল। মুখে একটু হাসি টানিয়া আনিয়া সে সুরেশবাবুর মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, "কাকীমা কাল রাত্রেই আমায় যেতে বলেছিলেন। কাল যাইনি দেখে, আজ যেন

অবশ্য করে যাই তাই লিখেছেন। আজ আর যাওয়া হবে না। কাল রবিবার আছে, বেলা তিনটের সময় দেখা করতে যাব।

সুরেশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি এতদিন রামনগরেই ছিলেন বুঝি?"

জ্যোতির্ম্ময় উত্তর দিল,—"হ্যাঁ।"

সুরেশবাবু একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "একটা কথা শুনতে পেলুম,—তোমার দাদু নাকি সীতা নামে একটী মেয়েকে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি উইল করে দিচ্ছেন। সীতা মেয়েটীকে আমি চিনতে পারলুম না। এ কি তোমাদের কোন নিকট আত্মীয়া?"

এ বাড়ীতে সীতার নাম কেহই জানিত না; সীতার কাছে এখনও যে বৃদ্ধ দাদু এতটুকু শান্তি-লাভ করেন, তাহাও কেহ জানে না। জ্যোতির্ম্ময় প্রাণপণ যত্নে এ বাড়ীর সকলের কাছে সীতার নাম গোপন রাখিয়া গিয়াছে।

একটা ঢোঁক গিলিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "না, সে আমার আত্মীয় নয়, কিন্তু আমার দাদু—"

সে থামিয়া গেল দেখিয়া সুরেশবাবু কোমল সুরে বলিলেন, "তার পরিচয় দিতে কি বিশেষ আপত্তি আছে জ্যোতি,—তা যদি থাকে তবে থাক—আমি শুনতে চাইনে।"

কুণ্ঠিত ভাব দূর করিয়া জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "না, আপনার কাছে বলতে আমার কোনও আপত্তি নেই। সীতা আমার বাপের বন্ধু বিনয় গাঙ্গুলীর মেয়ে,—আমার বাগ্‌দত্তা। আমাদের জন্মের বহু কাল আগে—যখন আমার বাপ ও তার বাপ একত্র পড়াশুনা করতেন, তখন তাঁরা বৈবাহিক বলে পরস্পরকে ডাকতেন; প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, ছেলে মেয়ে হলে তাদের বিয়ে দিয়ে এই খেলার সম্পর্ক পাকা করে নেবেন। এর পরে তাঁদের বিয়ে হয়। প্রথমে আমি ও পরে সীতা জন্মগ্রহণ করি। আমার বাপ আগে মারা গেলেও তিনি কথাটা আমার দাদুকে বলে দিয়ে যান, ও মৃত্যুকালে সীতাকে যাতে গ্রহণ করা হয়, তার জন্যে দাদুকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে যান। সীতার বাপ মারা গেলে দাদু তাকে নিজের কাছে নিয়ে যান। আমার সঙ্গে বিয়ে দেবার সব ঠিক করেছিলেন। কিন্তু আমি বিয়ে করব না বলে চলে আসি। সেই পর্য্যন্ত সে দাদুর কাছেই আছে। দাদু তাকে সকলের চেয়ে বেশী ভালবাসেন।"

সুরেশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার বয়েস কত হল?"

জ্যোতির্ম্ময় একটু ভাবিয়া বলিল, "এখন বাইশ তেইশ হবে।"

সুরেশবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। তিনি যে কি ভাবিতেছিলেন, তাহা জ্যোতির্ম্ময় বেশ বুঝিতেছিল। সে তাই ভারি কুণ্ঠিত হইয়া উঠিতেছিল।

ধীরকণ্ঠে সুরেশবাবু বলিলেন, "বড় দুঃখের কথা জ্যোতি,—যে মেয়েটীর তরুণ জীবন তুমি পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছ, সে মেয়েটীকে আমি চিনি,—অথবা শুধু চিনি বললেই হয় না, সে আমার অন্তরে জেগে রয়েছে। তার বাপ বিনয় গাঙ্গুলী শুধু তোমার বাপেরই বন্ধু ছিলেন না, আমারও অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। এই জগতে এসে আমি যদি যথার্থ ভালবাসা—যথার্থ স্নেহ কারও কাছ হতে পেয়ে থাকি তবে তা যে বিনয়ের কাছ হতেই পেয়েছিলুম,—আর কারও কাছে, এমন কি, বড় আপনার স্ত্রী-কন্যার কাছেও পাই নি, তা নিশ্চয়ই আমায় স্বীকার করতে হবে। শুনে আশ্চর্য্য হবে—সে আমারই প্রতিবাসী; তার মা, বাপ, কেউ ছিল না, আমার করুণাময়ী মাসীমা তাঁর দুই কোলে দুইজনকে নিয়ে মানুষ করে তোলেন। সে আমার পর হলেও একই স্নেহ আমরা দুইটী পিতৃমাতৃহীন বালক উপভোগ করেছি, দু'জনে দু'পাশে ঘুমিয়েছি। আমি আজ মানুষ—কিন্তু কেমন করে হয়েছি, কে আমায় সহস্র প্রলোভন হতে ঠেকিয়ে সন্তর্পণে মায়ের মত বুকের আড়াল দিয়ে রেখেছিল, তা যদি জানতে জ্যোতি! আমি জানি, আমি মনুষ্যত্বহীন পশু,—একদিন আমার সেই উপকারী বন্ধুকে তুচ্ছ কারণে অপমান করেছিলুম, সে কথা আমি জীবনে ভুলতে পারব না। সে নিঃশব্দে চোখের জল মুছে, বুকভাঙ্গা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, সেই চলে গেল, দীর্ঘকাল তার দেখা পাই নি। অনেক কাল পরে তাকে দেখতে পেলুম পথের ধারে একটা সরু গলির মুখে; সমস্ত দিন খেটে বড় শ্রান্ত সে, ধুঁকতে ধুঁকতে ছোট্ট একটী মেয়ের হাত ধরে চলেছে। মেয়েটী রোজ এমনি সময়ে এসে পথের ওপরে ব্যগ্র ব্যাকুল দৃষ্টি রেখে দাঁড়িয়ে থাকে, তার বাপের হাত ধরে বাড়ী ফেরে। আমি তাকে আমার পরিচয় দিলুম, মোটরে করে বাড়ী নিয়ে যেতে চাইলুম। সে হয় তো আমার কথা ঠেলতে পারত না; কারণ, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর

ভালবাসা তখনও অটুট ছিল। কিন্তু তেজস্বিনী তার বালিকা মেয়ে, সে তার বাপের হাত ধরে দৃপ্ত চোখের দৃষ্টি আমার মুখের ওপরে ফেলে তেমনি গর্ব্বভরা কণ্ঠে বললে "আমার বাবা গরীব, গরীবের সঙ্গে ধনীর বন্ধুত্ব পোষায় না। ধনীর অন্নদাস হতে বাবা পারবেন না। এই খোলার ঘরই আমাদের রাজপ্রাসাদ।" সেই দিন আমি সেই ছোট্ট মেয়েটীকে চিনতে পেরেছিলুম,—মুহূর্ত্তে তার প্রথম হতে শেষ পর্য্যন্ত অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জেনে ফেলেছিলুম। এমন মেয়ের বাপকে আমি ধন্যবাদ দিয়েছিলুম। আমার মেয়ে কেন অমন হল না, এই ভেবে আমার বুক বড় ব্যথায়—বড় বেদনায় ভরে উঠেছিল। আমি সাহায্য করতে চাইলুম, মেয়েটী স্পষ্ট অস্বীকার করলে,—তার বাপের অবমাননাকারীর দান সে কিছুতেই নেবে না—নিতে পারবে না। তার বাপ তার চোখে দেবতার চেয়ে উচ্চ সম্মান পেয়েছিল, দেবতাকে সে নিজের আদর্শে রাখলে, আদর্শচ্যুত হতে দিলে না। তার পর কিছুদিন বাদে আবার খোঁজ নিতে গেলুম, আর দেখতে পেলুম না। পাছে আমি আবার যাই, দারিদ্র্য কষ্টে বিব্রত হয়ে যদি তাকে আমার দানই গ্রহণ করতে হয়, সেই ভয়ে সে তার বাপকে নিয়ে পালিয়েছে। ক্ষুদ্র বালিকা কিন্তু কি অসাধারণ তেজ তার! জীবনে আর কখনও তাদের দেখা পাই নি। কিন্তু ভগবান জানেন—জীবনে সেই ছোট্ট মেয়েটীর কথা আমি ভুলে যেতে পারব না। সে যে রত্ন,—কোহিনুর। তুমি এমন রত্ন হেলায় হারিয়ে রত্নভ্রমে কি গ্রহণ করেছ জ্যোতি?"

মাথা নত করিয়া জ্যোতির্ম্ময় বসিয়া রহিল।

শ্রান্তকণ্ঠে সুরেশবাবু বলিলেন, "অনেক কাল পরে আজ তোমার মুখে তার খবর পেলুম। বড় ইচ্ছা ছিল একবার তার সঙ্গে দেখা করবার,—ভগবান সে সুবিধা মিলিয়ে দিয়েছেন। তোমায় আমি ধিক্কার না দিয়ে থাকতে পারছি নে। অমন সুন্দর জীবনটী তুমি এমন করে ব্যর্থ করে দিলে? দেবযানীর কি আছে যা দেখে তুমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলে? আমার মেয়েকে আমি যে আদর্শে গড়তে গেলুম, তা সে নিলে না। ভিন্ন আদর্শ সামনে রেখে সে চলেছে, আমার সকল আশা ব্যর্থ করে দিয়েছে। আমার মেয়ে কেন সীতার মত হল না,—অমনই সংযম, তেজ, আত্মনিষ্ঠা কেন শিখতে পারলে না? কি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলে জ্যোতি, কি গুণে তাকে বরণ করে নিলে? রূপ—যাকে সৌন্দর্য্য বল, কিন্তু সে কি সীতার চেয়ে বেশী,—সে কি সীতার কাছে দাঁড়াতে পারে? বালিকা সীতার মধ্যে আমি যা দেখেছিলুম, আমার মেয়ের যদি তার এতটুকুও থাকত!"

গৃহিণীর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া তিনি স্তব্ধ হইয়া গেলেন। একটু থামিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "এটুকু ঠিক জেনো—রূপ স্থায়ী নয়, গুণ স্থায়ী জিনিস। কুৎসিতের মধ্যে যা থাকতে পারে, সুন্দরের মধ্যে বেশীর ভাগ তা থাকে না। যদিও দুই একজনের মধ্যে থাকে—এত কম যে, তাকে নেই বলেই উড়িয়ে দেওয়া যায়। যাই হোক, কাল অবশ্য করে তোমার কাকীমার সঙ্গে দেখা করতে যেয়ো, আবার যেন ভুলে বসে থেকো না।"

তিনি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন।

৩৭

জ্যোতির্ম্ময় যখন কাকীমার সঙ্গে দেখা করিতে গেল, তখন বেলা চারটা বাজিয়া গিয়াছে। সিঁড়িতেই দেখা হইল ইভার সঙ্গে। সে কি কাজে খুব তাড়াতাড়ি নীচে আসিতেছিল, জ্যোতির্ম্ময়কে দেখিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল; আনন্দপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"এই যে দাদা এসেছে।"

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সে যেমন ছুটিয়া আসিয়া দাদার একখানা হাত চাপিয়া ধরিত, আজও তেমনি করিয়া আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

জ্যোতির্ম্ময় অপলক দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে তাকাইল। তাহার মাথায় স্নেহপূর্ণ হাতখানা বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "এত রোগা হয়ে গেছিস কেন দিদি, দেখে যে তোকে চেনা যাচ্ছে না।"

ইভা একবার নিজের দেহের পানে তাকাইল। হাসিমুখে বলিল, "কোথায় রোগা হয়ে গেছি দাদা? অনেক দিন পরে দেখছ কি না, তাই মনে হচ্ছে বুঝি বড্ড রোগা হয়ে গেছি। আমার মনে হচ্ছে তুমিই খুব রোগা হয়ে গেছ। আগে তো তোমার চেহারা এত রোগা হয় নি। এস, এই পাশের ঘরটায় বসো, আমি মাকে খবর দেই। তিনি তো তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে একেবারে পাগল হয়ে উঠেছেন।"

সিঁড়ির পাশে ইভার শয়ন-গৃহ, সেখানে লইয়া

গিয়া একখানা চেয়ারে তাহাকে বসাইয়া সে বাহির হইয়া যাইতেছিল, জ্যোতির্ম্ময় বাধা দিয়া বলিল, "যাস্ এখন তাঁকে ডাকতে, আমি তো এখনি পালাচ্ছি নে। তোর সঙ্গে আগে কথাবার্ত্তা বলি, তার পর কাকীমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হবে এখন। তুই এই চেয়ারখানায় বস দেখি ইভা।"

ইভা টেবিলে ভর দিয়া দাঁড়াইল।

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "এত বড় হয়েছিস—আজও যে তোর বিয়ে হয় নি, আমি তাই আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি। তুই বুঝি বিয়ে করবি নে?"

ইভা হাসিল। সে হাসিতে ঝরিয়া পড়িল অন্তর্নিহিত বেদনারাশি। সে উত্তর করিল, "না দাদা, ওরকম পণ আমার সাজে না। বিয়ে হবে শীগ্‌গিরই, সব ঠিক হয়ে গেছে, আশীর্ব্বাদ পর্য্যন্ত। আমার বিয়ের দিনে তোমাদের সব নিমন্ত্রণ হবে, আসতে হবে কিন্তু, মনে রেখো।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "তা তো বুঝলুম, কিন্তু আমার ভগ্নিপতিটী কে হবে জানতে পেলে আগে হতে তার সঙ্গে আলাপ করে রেখে দেব। তুই কিছু শুনতে পেয়েছিস?"

দুইটী চোখের স্থির দৃষ্টি তাহার মুখের উপর তুলিয়া ধরিয়া ইভা বলিল, "পাত্র তোমার পরিচিত দাদা; নিত্যানন্দ গাঙ্গুলী।"

"সে কি রে, নিতাই গাঙ্গুলী?"

জ্যোতির্ম্ময় চমকাইয়া উঠিল, "সর্ব্বনাশ! তাকে না চেনে এমন লোক খুব কমই আছে—সে চরিত্রহীন, মদ্যপ,—"

ইভা আবার মলিন হাসিল, "তুমি বললে কি হবে দাদা, মা সব ঠিক করে ফেলেছেন, আর সাতদিন পরেই যে আমার বিয়ে।"

সে মুখখানার উপর বড় বেদনার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইল, কিন্তু জ্যোতির্ম্ময় তাহা দেখিয়া ফেলিল। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে বলিল, "তুই তো বড় হয়েছিস ইভা, নিজের জ্ঞানও তো তোর যথেষ্ট আছে, মা হাত পা ধরে যার তার হাতে ফেলে দেবেন, আর তুই চুপ করে থাকবি—এ কখনও হতে পারে? তোরও তো স্বাধীন-সত্তা আছে, জাগিয়ে তোল বোন,—জোর করে বল আমি বিয়ে করব না। তা হলে কেউ কি জোর করে বিয়ে দিতে পারে?"

স্থিরকণ্ঠে ইভা বলিল, "তা হয় না দাদা, আমি যে হিন্দুর মেয়ে। লেখাপড়া যথেষ্ট শিখলেও হিন্দুর মেয়ে তার সংস্কার কাটাতে পারে না।"

রাগিয়া উঠিয়া জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "ওই তোদের দোষ ইভা। হিন্দুর মেয়ে বলে সব অত্যাচার নীরবে সয়ে যেতে হবে, এমন কোনও কথা আছে কি?"

ইভা বলিল, "আছে বই কি দাদা, হিন্দুর মেয়ে যত শিক্ষাই পাক তবু তাকে এমনি করে বাপ, মা প্রভৃতি অভিভাবকের শাসনের তলায় থাকতে হয়। আমি কি বলি নি দাদা, আমি কি আপত্তি করি নি? কিন্তু আমার মা আমায় বুঝিয়েছেন—হিন্দুর মেয়ের মা-বাপ তাকে যার হাতে সমর্পণ করুন, তাকেই দেবতা বলে মেয়েটাকে পুজো করতেই হবে।"

অধীরভাবে জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "অন্যায়, ভারি অন্যায়। মা বাপ যদি কোন দুশ্চরিত্রের হাতে মেয়েকে দেন, সে যদি ভক্তি ভালবাসা নেওয়ার যোগ্য না হয়,—তার প্রহার উৎপীড়ন সয়েও যে তাকে দেবতার মত পুজো করবে, এমন মেয়ে নাই বললেই হয়। হিন্দুশাস্ত্র বলে, মেয়ের বিয়ে দাও; কিন্তু এ কথাও বলে—যদি উপযুক্ত পাত্র পাও তবে বিয়ে দাও; নচেৎ সে চিরকুমারী হয়ে থাক, তাকে ভগবানের কাজে উৎসর্গ করে দাও। অনেক মেয়ের বাপ সৎপাত্র অভাবে মেয়ের বিয়ে দেন নি, সে সব মেয়ে কৌমার্য্যব্রত পালন করে গেছেন। যাঁরা বুদ্ধিমান, তাঁরা বুঝতেন উপযুক্ত পাত্রাভাবে মেয়েকে চিরকুমারী করে রাখতে পারা যায়, চিরজীবনটা তার তিলে তিলে দগ্ধ করার চেয়ে এ ভাল। তোর মা, আমার কাকীমা তো অবুঝ নন, তিনি যথেষ্ট শিক্ষা পেয়েছেন,—তবু কেমন করে এমন অসচ্চরিত্র একটা লম্পটের হাতে তোকে দান করবেন? এ দানে কি সার্থকতা পাবেন তা তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি নে। অপাত্রে কন্যাদান করার চেয়ে তাকে হত্যা করা ভাল—এ কথাটা অন্ততঃপক্ষে তাঁর বোঝা উচিত ছিল। মেয়ের বিয়ে না দিলেই কর্ত্তব্যপালন হল না যারা ভাবে, তারা ঘোর মূর্খ। আর সেই মূর্খতার পরিচয় দেয় শক্তিহীনা মেয়েকে অপর একটা মূর্খের হাতে সম্প্রদান করে। আমি বলব ইভা, আমি তোর দিকে দাঁড়াব,—জোর করে বলব এ বিয়ে হবে না। যদি সুপাত্র না পান, তোকে চিরকুমারী করে রাখুন, আনন্দে থাকবি। কিন্তু একজনের ইচ্ছার ওপরে যেন তোকে না ফেলে দেন।"

ইভা গোপনে চোখের জল মুছিয়া ফেলিল।

শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, "আমার কথা শোন দাদা, এ রকম পাগলামী করতে যেয়ো না। আমার কথা ধরো না দাদা, আমি সব পারি,—বিয়ে তো তুচ্ছ কথা। আমি মরতে পারি দাদা, কারও কথা সইতে পারি নে—তা তো তুমি জানো। মা, মাসীমা আমার ওপরে কি রকম চটে আছেন, তা তুমি জানো না বলেই কথা বলতে চাচ্ছো। এর পরে যদি আমার সম্বন্ধে তুমি কোন কথা বলতে যাও, তাঁরা মনে ভাববেন আমিই তোমায় সব কথা বলেছি।"

উগ্রস্বরে জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "কোন কথা শোনবারই বা তোর দরকার কি? লেখাপড়া শিখেছিস, যেমন করেই হোক নিজের জীবিকা অর্জ্জন নিজেই করতে পারবি। কারও গলগ্রহ হয়ে থাকবি কেন, কারও আদেশ শুনবি কেন? তুই আজই চল আমার সঙ্গে, আমি এখনই তোর কাজ ঠিক করে দিচ্ছি।"

ইভা একটু হাসিল, "সেইটেই কি ভাল হবে দাদা? যতক্ষণ সমাজের সংস্রবে রয়েছি, ততক্ষণ অতটা স্বাধীনতা প্রকাশ করতে পারব না যে।"

জ্যোতির্ম্ময় বিদ্রূপের সুরে বলিল, "এ সমাজ রসাতলে যাক। যে সমাজ এমনই অন্ধকার, এতখানি গরল যার মধ্যে, যে সমাজের কল্যাণ হয় মেয়েকে যেমন তেমন পাত্রের হাতে দিলে, সন্তান ত্যাগ করলে, সে সমাজের ধ্বংস হোক, সে সমাজের নাম যেন ইতিহাসের পাতা হতে মুছে যায়।'

শান্তকণ্ঠে ইভা বলিল, "সে কি একটা কথা হতে পারে দাদা? সমাজ, ধর্ম্ম, এ সব হয় তো তুচ্ছ বললেও বলা যায়; কিন্তু সংস্কার, শিক্ষা, এ তো ছাড়া যায় না। আর তা যায় না বলেই এমনি করে মরণ জেনেও মরণের মুখে এগিয়ে চলি। কি শিক্ষা তবে লাভ করেছি যদি সেই শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের এতটুকু বিকাশ না করতে পারব? মানুষ হয়ে যখন জন্মেছি, এমনি কত আঘাতই যে সহ্য করতে হবে। যদি একটা আঘাতই না সহ্য করতে পারব, তবে শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ নামে পরিচয় দেওয়াই যে মিথ্যে হয়ে যাবে দাদা। আমি ভোগে তৃপ্তিলাভ করতে আসিনি দাদা, আমি এসেছি ত্যাগে যে পরমা তৃপ্তি পাওয়া যায়, যাতে সত্য মানুষ হওয়া যায়, তারই সাধনা করতে। সে সাধনার পথ সীতাদি আমায় দেখিয়েছে, সে মন্ত্র সীতাদি আমার কাণে দিয়েছে। যদি বছর কতক আগে এমনই কোন ঘটনা ঘটত, হয় তো আমি তোমার কথাই কাণে নিতুম, অসীমে লক্ষ্য না রেখে এই ভোগ-ঐশ্বর্য্যময়ী পৃথিবীতেই লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট রাখতুম, আর জন্মজন্মান্তর পাঁক ঘেঁটে বেড়াতুম। এখনও সময় সময় আমার মন লক্ষ্য হারিয়ে ফেলে, ছুটে পালাতে চায়। তখনই সীতাদির কথা মনে পড়ে। আমি চমকে উঠে আমার অবাধ্য, অসংযত মনটাকে শাসন করি। সীতাদি যে এত দিয়ে যাচ্ছে, এতে তো তার এতটুকু কষ্ট নেই। কারণ, সে জানে, তার নিজের বলে কিছু নেই,—সে নিজেকেই ভগবানকে দান করেছে যে। সে হাসিমুখে সকলের নির্য্যাতন সয়েছে, সকলের অপমান সয়েছে,—পেরেছে শুধু তার আত্মবোধশক্তি ত্যাগ করার ফলে। সে জানে যা কিছু ঘটছে কিম্বা ঘটবে, এ সবই ভগবানের দান; কাজেই তাকে মাথা পেতে সব নিতেই হবে। আমি তাই কাছ হতে উপদেশ পেয়েছি দাদা, আমার এ দেহ আমার নয়, এ দেহ মায়ের; কারণ আমি ওই মায়ের গর্ভে জন্মেছি, ওই মা আমায় বুকের রক্ত খাইয়ে মানুষ করেছেন, আমার যা কিছু সবই মায়ের কাছ হতে পাওয়া। আমার আত্মা স্বাধীন, কিন্তু দেহ পরাধীন। দেহকে মায়ের ইচ্ছায় চলতেই হবে। সীতাদি বলেছে, এক জন্মেই আমাদের সব শেষ হয়ে যায় না দাদা। কতবার আসছি, আবার যাচ্ছি। এই জন্মটার পরে আরও জন্ম আছে, আবার এই পৃথিবীর কোলেই ফিরে আসব। হ্যাঁ, বড় ভালবাসি এই পৃথিবীকে, আবার যাতে এই পৃথিবীতেই জন্মাতে পারি,—যতদিন বেঁচে থাকব এই কামনাই করব।"

"সীতাদি বলেছে" কথাটা জ্যোতির্ম্ময়ের বুকের মধ্যে, মাথার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে চুপ করিয়া অন্যমনস্ক ভাবে জানালাপথে বাহির পানে চাহিয়া রহিল। ইভার মতের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিবার মত থাকিলেও, সীতাদির মতের বিরুদ্ধে কোন যুক্তিই তাহার মাথায় জাগিল না।

ইভা আপন মনে বলিতে লাগিল, "সীতাদি বলে, সংসারে থাকা কয় দিনের জন্যে? এ দিনগুলো দেখতে দেখতে কেটে যাবে। জীবের আয়ু একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার মাঝে বদ্ধ হয়ে আছে। সে সীমা বিস্তার করার শক্তি কারও নেই। এই কয়টা দিন বই তো নয়,—যেমন করেই হোক

কেটে যাবে। যে সুখে থাকে, তাকেও সেই সীমার অতীতে মিশতে হবে, যে দুঃখে থাকে, তাকেও মিশতে হবে। সুখ দুঃখ পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েছে, পৃথিবীতেই এর লয় হয়ে যাবে। দু'দিনের জন্যে এখানে এসে এখানকার জিনিস নিয়ে ভুলে থাকলে নিজেরই ক্ষতি; কারণ, একদিন সব ছেড়েই যেতে হবে। তুমি সীতাদিকে চেনো নি, তার কথা শোন নি, তাই তার সম্বন্ধে তোমার ধারণা খুব কম। কিন্তু আমি তাকে চিনেছি, তার সংস্পর্শে এসে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি,—জেনেছি, মানুষ এমন ভাবে আত্ম জয় করতে পারে।"

"কার সঙ্গে কথা বলছিস ইভা ?"

বলিতে বলিতে দরজার উপর আসিয়াই জয়ন্তী থমকিয়া দাঁড়াইলেন, "এই যে, জ্যোতি এসেছে। তাই তো বলি, ইভা এত গল্প করছে কার সঙ্গে। বসো বাবা, তোমায় আর পায়ের ধুলো নিতে হবে না।"

ততক্ষণে জ্যোতির্ম্ময় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ফেলিয়াছে। ইভার পানে তাকাইয়া জয়ন্তী একটু বিরক্ত ভাবে বলিলেন, "তোর বেশ আক্কেল ইভা, জ্যোতি এসেছে আমায় খবরটা দিতে পারিস নি ?"

ইভার শুষ্ক মুখখানার পানে তাকাইয়া জ্যোতির্ম্ময় তাড়াতাড়ি বলিল, "ইভা আগেই ছুটে যাচ্ছিল কাকীমা, আমিই ওকে জোর করে ধরে রেখেছি।"

একখানা ইজি-চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া মুখখানা খুব ভারি করিয়া জয়ন্তী বলিলেন, "হয় তো ইভার সঙ্গে দেখা করে এদিক দিয়েই চলে যেতে যদি আমি না এসে পড়তুম। আজ তিনদিন তোমার আশায় বসে আছি, এমন একটু সময় পাওনি যে, এসে দেখা করে যাবে। কতদিন ইভাকে বলছি তোর দাদাকে একখানা পত্র লেখ,—তা ও মেয়ে এমনি—এদিক ওদিক সাত জায়গায় পত্র দেবে, তোমায় যদি একখানা পত্র দেয়।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "এতে ওর দোষ নেই কাকীমা, আমিই ওকে পত্র দিতে নিষেধ করেছিলুম।"

জয়ন্তী বলিলেন, "নিষেধ করেছ কেন? এতকাল বিলেতে ছিলে, একখানাও পত্র দাও নি। তুমি আমাদের এত পর মনে ভাব, কিন্তু আমরা পর ভাবিনে।"

জ্যোতির্ম্ময় মলিন হাসিল, "তা নয় কাকীমা, পর ভাবার জন্যে নয়। দাদু আমায় ত্যাগ করেছেন; জানিয়েছেন—ভবিষ্যতে আমার সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে আমি কোন্ সাহসে তাঁর বাড়ীতে তোমাদের পত্র দেব কাকীমা? ইভা আমায় যে পত্র দিত, নিশ্চয়ই তার উত্তর প্রত্যাশা করত; কিন্তু সেই উত্তর দাদুর হাতে পড়ত। বিলাতের ছাপ দেখে যখন তিনি খোঁজ নিতেন কে পত্র দিয়েছে, তখন আমার উপরকার সব রাগ আপনাদের উপর গিয়ে পড়ত, এতে আপনার কম অপমান সইতে হত না।"

জয়ন্তীর মুখখানা অন্ধকার হইয়া উঠিল। দৃপ্ত কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "অপমান করতে বড় বাকি রেখেছেন কি বাবা? সেই অপমান সইতে না পেরে আমার তাই এখানে চলে এসেছি। কেন, এখানে থেকে কি আমি মেয়ের বিয়ে দিতে পারব না, এখানে কি আমি দু'টো ভাত একখানা কাপড় পাব না? বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্র যখন পাবেন, তখন জানবেন—তাঁর সীতাও জানবে—আমি ইভার বিয়ে দিতে পারলুম কি না। রামনগরের প্রবল-প্রতাপ জমীদারের নাতনী বলে তার শ্বশুরবাড়ীর লোক তাকে না হয় নাই জানবে,—ডাক্তারের অনাথা ভাগনী বলেই তাকে জানবে। এত দর্প, এত তেজ, অন্য কেউ সহ্য করতে পারে, আমি তা বলে সহ্য করতে পারিনে।"

তাঁহার দুইটী চোখে যেন আগুন জ্বলিতেছিল, ক্রোধে কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল।

জ্যোতির্ম্ময় জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি কাকীমা, আপনি বুঝিয়ে না বললে কিছু বুঝতে পারছি নে।"

জয়ন্তী নিমেষে নিজেকে সংযত করিয়া লইলেন; বলিলেন, "ব্যাপার বেশ, শুনলেই সব বুঝতে পারবে। সেই সীতা—যে সীতাকে ঘৃণা করেছ, সেই আজ জমীদারীর মালিক। সেই সীতার ইচ্ছানুসারে সব কাজ হবে, এই তাঁর আদেশ। আগে কথা হয়েছিল এখানকার অ্যাটর্নি রাধাকমল বাবুর ছেলের সঙ্গে ইভার বিয়ে হবে। তারা সব সুদ্ধ হাজার আষ্টেক টাকা চায়। তাঁর মত জমীদারের একটী মাত্র নাতনী জেনেই তারা এই দাবী করেছিল। দেখতে গেলে এ দাবী তেমন অন্যায্য নয়। তিনি যে এই সামান্য টাকাও দিতে পারবেন না, নিতান্ত গরীবের মেয়ের মত তাকে খালি হাতে শ্বশুরবাড়ী পাঠাবেন, এ আমি জানতুম না। তাঁর কাছে কথাটা বলতে

যাওয়া মাত্র তিনি আগুন হয়ে উঠলেন। বললেন, এ বিয়ে ভেঙ্গে ফেলে প্রশান্তের সঙ্গে ইভার বিয়ে দেওয়া হোক।"

বিস্মিত হইয়া উঠিয়া জ্যোতির্ম্ময় জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ প্রশান্ত?"

মুখখানা বিকৃত করিয়া জয়ন্তী বলিলেন, "ওই যে সীতার মাসতুতো ভাই প্রশান্ত। তোমারই সঙ্গে সে না কি পড়েছিল। ধরছি—বিদ্যে তার যথেষ্ট আছে, কিন্তু ওই মাঠের কাজেই যে সব নষ্ট করেছে। এম-এ পাসের ফল তার এখন মাঠে গড়াচ্ছে। তাই জেনে আমি বলেছিলুম বিয়ে দেব না। তুমিই বল দেখি বাবা—আমার পাঁচটা নয়, সাতটা নয়, এই একটী মাত্র সন্তান,—ওকে এমন করে হাত পা ধরে জলে ফেলতে পারি মা হয়ে? তাঁর আর কি বল—পাছে বেশী টাকা দিতে হয়, তাই এই শিক্ষিত চাষার সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে দেওয়ার একান্ত ঝোঁক। কত আশা করেছিলুম, আমার সকল আশায়—"

তাঁহার দুইটী চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি অঞ্চলের কোণ দিয়া বার বার চক্ষু মুছিতে লাগিলেন,—কতক্ষণ আর কথা কহিতে পারিলেন না।

জ্যোতির্ম্ময় খানিক গুম হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "শুনেছি না কি দাদু সীতার নামে সব সম্পত্তি উইল করে দিয়েছেন?"

আর্দ্রকণ্ঠে জয়ন্তী বলিলেন, "তবে আর বলছি কি? এ সেই—'যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই'—সেই গোছের হয়েছে। সোণার চাঁদ ছেলে তুমি, কোথায় আজ সব তোমার হবে, তা না হয়ে তুমিই সব হতে বঞ্চিত হলে? আমার মেয়ের বিয়েতে আট হাজার টাকা জুটল না, সীতা এসে সব বিষয়-সম্পত্তির মালিক হ'ল। এ সব কি যুক্তিযুক্ত কথা হতে পারে বাবা? আমার মেয়ের জন্যে আমি আর এক পয়সা তাঁর কাছ হতে নেব না প্রতিজ্ঞা করেছি। বিয়ের দিনও ঠিক করে ফেলেছি। নিতাই গাঙ্গুলী লোক ভাল, পয়সা আছে, ইভা রাণীর হালে থাকবে, ইচ্ছে হলে অমন জমীদারী দু'খানা কিনে ফেলবে। ওর আর কি, বিয়ে হলেই ফুরিয়ে গেল। বাপের বাড়ীর সম্পত্তির আশা কোন দিন করে নি, করবেও না। তা বলে তুমি কেন ছেড়ে দেবে বাবা? তোমার মুখের গ্রাস অপরে খাবে, তুমি কি তাই সহ্য করে যাবে?"

নিতান্ত উপায়হীন ভাবে জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "এতে আমি কি করব বলুন? দাদু আমায় ত্যাগ করেছেন। তাঁর যাকে খুসি বিষয় দিয়ে যেতে পারেন। তাতে কিছু করবার বা বলবার অধিকার আমার নেই।"

দাঁতের উপর দাঁত চাপিয়া জয়ন্তী বলিলেন, "তোমার অধিকার নেই, এ কথা বলো না জ্যোতি। ক্ষমতা তোমার যথেষ্ট আছে। কেবল সাহসের অভাবে কর্‌তে পার্‌ছ না। চেষ্টা কর্‌লে আজ না হোক দু' বছর বাদেও তোমার সম্পত্তি তুমি অনায়াসে পেতে পার, সেটা জানো?"

আশ্চর্য্য হইয়া জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "কি করে?"

জয়ন্তী বলিল, "দাদু কিছু চিরকাল বাঁচবেন না। যে রকম দেখে এসেছি তাতে আর ছয় মাস বাঁচা যথেষ্ট মনে করি। তাঁর অন্তে তুমি সম্পত্তি অধিকার করতে গেলেই সীতা তার উইল বার করবে। তুমি অনায়াসে তখন প্রতিপন্ন করাতে পারবে—এ উইল জাল। কেন না, বংশধর বেঁচে থাকতে একজন পরনারীকে তিনি কখনই সম্পত্তি দান করে যেতে পারেন না। সে তাঁর সেবা করেছে, তারই পুরস্কার স্বরূপ সে বড় জোর দু'চার হাজার টাকা পেতে পারে। তাই তার পক্ষে পর্য্যাপ্ত।"

বিস্ময়ে আত্মহারা জ্যোতির্ম্ময় অসীম বুদ্ধিশালিনী কাকীমার দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার মত শিক্ষিত ব্যারিষ্টার—যে সর্ব্বদা এইসব ব্যাপার লইয়াই মাথা ঘামায়—তাহার মাথায় যে বুদ্ধিটা জাগিতে পারিল না, একটী নারীর মাথায় তাহা জাগিল কিরূপে?

জয়ন্তী স্থিরকণ্ঠে বলিলেন, "তুমি বুঝে দেখ—ঠিক এই রকমেই তুমি তোমার পূর্ব্বপুরুষের সম্পত্তি পেতে পার; নচেৎ এ একেবারেই চলে গেল। তোমাদের বংশের এতবড় অপমান একজন বিকৃতমস্তিষ্ক বৃদ্ধের দ্বারা ঘটতে দিয়ো না। বার্দ্ধক্যে তাঁর মাথা খারাপ না হয়ে গেলে তিনি তাঁর বংশকে এমন করে উচ্ছেদ করতে চাইতেন না। তুমি ছাড়া আরও তাঁর উত্তরাধিকারী আছে। তাদের কাউকে দান করে যেতে পারতেন। আমি শুনেছি, এই উইলে সীতার এমন ইচ্ছার কথাও আছে—সে যাকে খুসি দান করতে পারবে। আরও একটা কথা এই,—আজও যে সীতা কাউকে বিয়ে করতে চায় না, আমার মনে হয় এও তার সম্পত্তিলাভের একটা কৌশলমাত্র।

বুড়ো এতে তার আরও ভক্ত হয়ে পড়বে জেনে, সে কাউকে এখনও বিয়ে করে নি। এ জানা-কথা—বিয়ে করলে এ সম্পত্তি সে পেত না—বাধ্য হয়েই তোমাদের তাঁর সব দিয়ে যেতে হতো। সীতার চালাকি আর কেউ বুঝতে না পারুক, আমি পেরেছি। সে আমার এই বোকা মেয়ে আর সেই বুড়োর চোখে ধুলো দিতে পারলেও, আমার চোখে ধুলো দিতে পারে নি,—আমি তার ছলনায় ভুলি নি। এও জেনো—বুড়ো মারা যাওয়া মাত্র সে বিয়ে করবে,—তোমাদের ন্যায্য পাওনা হতে তোমরাই শুধু চিরতরে বঞ্চিত হয়ে থাকবে।"

জ্যোতির্ম্ময় তথাপি চুপ করিয়া রহিল। ইভা অস্ফুটস্বরে কি বলিতে যাইতেছিল; মা তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তুই থাম ইভা, সীতার পক্ষ টেনে কথা বলতে আমি তোকে ডাকি নি। আমি তাকে যতটা চিনেছি—তুই যদি ততটা চিনতিস, তা হলে মানুষ হয়ে যেতিস,—তোকে শিক্ষা দেওয়া সার্থক হতো। আমি সীতাকে অশিক্ষিত গ্রাম্য একটা মেয়ে বলে উড়িয়ে দিতুম। তার অমার্জ্জিত বুদ্ধিতে যে এতটা চতুরতা আছে, তা স্বপ্নেও ভাবি নি।"

মায়ের নিষেধ না মানিয়া ইভা ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিল, "সীতাদি স্কলারশিপ নিয়ে ম্যাট্রিক পাস করেছে দাদা। মা তাকে অশিক্ষিতা বলছেন, কিন্তু আমি জানি—সে আমার চেয়ে অনেক জানে।"

রুদ্ধকণ্ঠে জয়ন্তী বলিলেন, "ফের কথা বলছিস ইভা! বারণ করলেও কথা বুঝি শুনবি নে?"

ইভা শুষ্কমুখে বাহির হইয়া গেল।

জয়ন্তী ডাকিয়া বলিলেন, "তোর দাদার জন্যে চা, খাবার নিয়ে আয়, দেরী করিসনে।"

ত্রস্তভাবে জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "আমি খেয়ে এসেছি। আজ আমি উঠি, রাত হয়ে এল।"

সে উঠিল। জয়ন্তী বলিলেন, "আমার কথা বুঝতে পারলে কি কিছু?"

একটু হাসিয়া জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "বুঝেছি কাকীমা। কিন্তু দাদুর আগে দেহত্যাগ হোক, নইলে কিছু হবে না। এখন চুপচাপ থাকাই উচিত।"

"বিয়ের দিনে এসো বাবা—।"

"হ্যাঁ—দেখব যদি পারি।"

জ্যোতির্ম্ময় বিদায় লইল।

৩৮

কাশী পৌঁছাইবার দিন চার পাঁচ পরে সীতা ইভার একখানি সুদীর্ঘ পত্র পাইল।

সুদীর্ঘ একটা বৎসর দেশভ্রমণে কাটিয়া গিয়াছে, সীতা শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু অতিবৃদ্ধ বিহারীলাল শ্রান্ত হন নাই। যে বয়সে মানুষ স্থবির হইয়া যায়, সেই বয়সে তিনি যেন যুবকের বল ও প্রচুর উৎসাহ ফিরিয়া পাইয়াছেন। মাঝে দিনকতক তিনি শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন,—উঠিতে গেলে, হাঁটিতে গেলে হাঁটু ভাঙ্গিয়া পড়িত। সে দুর্ব্বলতা আর তাঁহার নাই।

কাশী হইতে কলিকাতায় যাইবার কথা আছে। কালীঘাট, তারকেশ্বর প্রভৃতি দেখিয়া তাঁহারা রামনগরে ফিরিবেন। আনন্দে বৃদ্ধের বুক ভরিয়া উঠিয়াছিল। তিনি বারবার শুধু বলিতেছিলেন "এইবার আমার সকল পাপ কেটে গেল রে দিদি—এবার আমি তাদের কাছে যেতে পারব।"

তিনি যতটা আনন্দ পাইতেন, সীতার অন্তর ততই বিষাদে ভরিয়া উঠিত। স্বপ্ন না বিশ্বাস করিলেও সময় সময় বৃদ্ধের দৃঢ়তাপূর্ণ কথা শুনিয়া তাহার মনে হইত, স্বপ্ন সত্য হইলেও হইতে পারে,—স্বপ্নে ভবিষ্যৎ হয় তো প্রত্যক্ষরূপে আসিয়া দেখা দেয়।

কাশীতে আসিয়া বিহারীলাল মহানন্দে বেড়াইতেছিলেন। সঙ্গে আসিয়াছিল রাখাল, সরকার মোহিনী গুপ্ত, দুইজন পুরাতন দাসী গৌরী ও ক্ষমা। দশাশ্বমেধ ঘাটের খুব কাছেই বাসা লওয়া হইয়াছিল। সেইখানেই থাকিতেন।

ইভা রামনগরে পত্র দিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল সীতা এতদিনে রামনগরে ফিরিয়াছে। কর্ত্তাবাবু কাশী আসিয়াছেন সংবাদ পাইয়া সুশীলবাবু সে পত্র কাশীর ঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়াছেন।

এনভেলাপের উপর ইভার হস্তাক্ষর দেখিয়াই সীতা চিনিতে পারিল। দীর্ঘ কাল পরে ইভার পত্র আজ সে পাইয়াছে। রামনগর ত্যাগ করিয়া অবধি সে ইভার পত্র পায় নাই। এজন্য তাহার উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না। সে সুশীলবাবুর কাছে অনুযোগপূর্ণ পত্র দিয়াছিল—হয় তো পত্র রামনগরে আসে; কিন্তু তাহাকে তাহা পাঠানো হয় না। সুশীলবাবু জানাইয়াছিলেন, ইভার পত্র আসে নাই।

সীতা ইভার জন্য ভাবিত। না জানি সেই

কুসুমকোমলা মেয়েটির উপর কত অত্যাচার চলিতেছে। সেই অত্যাচারের কল্পনা করিয়া তাহার হৃদয় উদ্বেগে ভরিয়া উঠিত। সে ইভার একটী সংবাদ পাইবার জন্য ছটফট করিত। কিন্তু হায় রে, কে সেই সংবাদটী তাহাকে আনিয়া দিবে!

আজ তাহার পত্রখানা পাইয়া সীতার উদ্বেগ অর্দ্ধেক কমিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি পত্রখানা খুলিয়া ফেলিল। ইভা লিখিয়াছে—

'দিদি আমার, অনেক কাল পরে আজ তোমায় একখানা পত্র লিখতে বসেছি। ভেবেছিলুম, আর পত্র দেব না, তোমায় বিরক্ত করব না; কিন্তু তা পারলুম না দিদি,—থাকতে পারলুম না বলে আজ তোমায় পত্র লিখতে বসেছি। আমার কথা যদি তোমার কাছেও বলতে না পাই, তবে আর কার কাছে বলব? আমার কথা শুনতে তুমি বই আর যে কেউ নেই।

"আমার বিয়ে হয়ে গেছে। সে আজ সাত মাসের কথা, আমি বাংলার বিবাহিতা নারী, শ্রেণীভুক্ত হয়েছি। ওখান হতে চলে আসার পরে মা একান্ত জেদের বশবর্ত্তিনী হয়ে খুব তাড়াতাড়ি আমার বিয়ে দিয়ে ফেলেছেন; দেখিয়েছেন তাঁর মেয়ের বিয়ে তিনি দিতে পারেন কি না। বিয়েতে তোমাদেরও নিমন্ত্রণ-পত্র দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু তোমরা তার আগেই তীর্থভ্রমণে গেছ;—নিশ্চয়ই সে পত্র তোমরা পাও নি। নিমন্ত্রণপত্র তোমাদের পাঠানো নিষ্প্রয়োজন ভেবেই সুশীলদাদা তোমাদের পাঠান নি।

"এখন নিশ্চয়ই শুনতে চাইবে, যে আমার স্বামী হয়েছে,—মা যাকে তাঁর বড় আদরিণী মেয়ে ইভার যোগ্য বলে মনে করেছিলেন—সে কি রকম? দিদি, আমার যে চাষার ঘরও ভাল ছিল। এই ত্রিতল অট্টালিকার চেয়ে, দৈহিক সামান্য কষ্টকে আমি কোন দিন কষ্ট বলে গ্রাহ্য করতুম না। এ যে বড় কষ্ট দিদি! আমার বুকের ঠিক মাঝখানটা কে যেন হাতুড়ি দিয়ে ঘা মেরে বসিয়ে দিয়েছে।

বলবে—আমি বালিকা নই, কেন অমত জানাই নি; কিন্তু তা নয় দিদি। রামনগরে থাকতে একদিন মায়ের পা জড়িয়ে কেঁদে পড়েছিলুম,—আমায় যেন এমন ভাবে বিসর্জ্জন না দেওয়া হয়, এই অনুরোধ করেছিলুম! স্নেহময়ী মা আমার খানিক রক্তচোখে আমার পানে তাকিয়ে রইলেন। তার পর জোর করে পা ছাড়িয়ে চলে গেলেন। তাঁর লাথি যে আমার গায়ে লাগল, বুঝলুম এই তাঁর উত্তর। এ উত্তর তিরস্কারের বাড়া,—এই-ই তাঁর কথা বলে দিয়েছে। আমি প্রতিজ্ঞা করলুম—তিনি যা খুসি করে যান, আমি তাতে আপত্তি করব না।

তোমার উপদেশ মনে হত দিদি,—সন্তানের ওপরে জোর করার অধিকার মায়ের আছে। কেন আমার মনে সে ভাবটা বদ্ধমূল করে দিয়েছিলে দিদি? আজ মনে ভাবছি—যদি তোমার সে উপদেশ কাণে না নিতুম, তা হলে আজ এই দেহ মন নিয়ে এমন ধারা ছিনিমিনি লিখতে তো হতো না।

যখন বিয়ে হচ্ছিল, তখন স্বামীর পানে চোখ তুলে চাইতে পারি নি। কেমন তখন মনে হচ্ছিল—এ কে, কোথা হতে এসে আমার ওপরে চিরকালের অধিকার স্থাপন করছে? কার জন্যে আসন পাতা ছিল, কার জন্যে অর্ঘ্য সাজানো ছিল, কে সেই আসনে এসে বসল, কার অর্ঘ্য কে নিলে? মন বুঝি গর্জ্জে উঠতে চাচ্ছিল; কিন্তু তখনি মনে হল তোমার উপদেশ,—মা যা করেন তা সন্তানের মঙ্গলের জন্যই।

মঙ্গলের জন্যে? হায় রে, আজ যে চীৎকার করে কেঁদে বলতে ইচ্ছা করছে—'ওগো কল্যাণময়ী মা আমার, কি মঙ্গল করলে তুমি? মনে হচ্ছে ছুটে যার কাছে যাই,—তাঁর গলাটা দুই হাতে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে মুখখানা রেখে জিজ্ঞাসা করি—মা গো, এই বুকের মধ্যে সন্তানের জন্যে যে মঙ্গল কামনা নিহিত ছিল, কই মা, তা তোমার কাজে ফুটে উঠল না তো।'

মা জেনেছেন—ধনীর স্ত্রী হওয়া যে-কোন মেয়ের আন্তরিক কামনা। কিন্তু নারী যে প্রার্থনা করে সৎচরিত্র, তা বুঝি তিনি জানেন না। আমার স্বামী ধনী, তার সব দোষ ঢেকে গেছে। সে স্বেচ্ছাচারী, বিলাসমত্ত, চরিত্রভ্রষ্ট মাতাল। ওঃ, এই লম্পট মাতালের হাতে দেহটাকে ছেড়ে দিয়েছি একটা পণ্যদ্রব্যের মতই। সে জানে—নারী বিলাসের উপকরণ মাত্র। সে জানে—নারীকে দূর করে তাড়িয়ে দেবে, ডাকলেই নারী আবার ছুটে আসবে। এর চেয়ে আমার যে চাষার ঘর ভাল ছিল দিদি! চাষা যতখানি নারীর সম্মান রাখতে জানে, এই সহরের অধিবাসী ধনী ভদ্র যে তার কিছুই জানে না।

"আমার মুক্তি কই? একমাত্র আত্মহত্যা

ছাড়া আর উপায় কোথায়? এই যে আত্মহত্যা দিদি,—নিজেকে নিজে হত্যা তো করেইছি। শুনেছি মানুষ মরলেও তার কিছুই ফুরায় না,—তার সূক্ষ্ম আত্মা সমানভাবে সুখ দুঃখ অনুভব করে। আমিও মরেছি, কিন্তু বোধশক্তি তো যায় নি দিদি,—তাই আমি সুখ দুঃখ সমানভাবে এখনও অনুভব করছি। ওগুলোকে কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারছি নে।

"আমার মনে হয়—সুখ যদি থাকে ত সে দরিদ্রের ঘরে,—ধনীর ঘরে সুখ নেই। পথে দেখতে পাই—ভিখারিণীরা ভিক্ষা চেয়ে যায়,—মনে হয়, যদি আমার অবস্থা ওদের সঙ্গে পরিবর্ত্তন করতেও পারতুম।

"বলতে পার দিদি, কেন আমি জন্মালুম, জন্মালুম যদি—কেন মরলুম না। উঃ, আমার কথা যে কাউকে বলতে পারি নে ভাই,—আমার ব্যথা আমারই বুকে গাঁথা থাকবে, চিতায় পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

"আমার মনে কি হয় জানো? মনে হয়, কুক্ষণে আমি রামনগরে গিয়েছিলুম। আমার অন্তর ছিল দর্পণের মত স্বচ্ছ, নির্ম্মল; আমি তখন ছিলুম উগ্র প্রকৃতির, নিজের মনে যা ভাল লাগত তাই করে যেতুম; মায়ের অন্যায় দেখলে দশ কথা অসঙ্কোচে শুনিয়ে দিতুম।

"দিদি আমার, অনেক কথাই বলে যাচ্ছি, কিছু মনে কর না। আমি ভাবছি আমার মাথা বুঝি খারাপ হয়ে গেছে। সত্যিই তাই। নইলে, তোমাকে যে আমি এত ভালবাসি, তোমাকেই সকল দোষের মূল বলে ভাবছি কেন?

"মা যখন আমায় উপদেশ দিয়েছিলেন, তখন বাস্তবিকই আমার বড় হাসি পেয়েছিল। মা বলেছিলেন, তোমার সঙ্গে মিশে আমি না কি একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছিলুম। তিনি আমায় কলকাতায় না আনলে আমার ভবিষ্যৎ খুবই খারাপ হতো। তিনি বলেছিলেন—সীতার ভারি ইচ্ছা ছিল প্রশান্তের সঙ্গে ইভার বিয়ে দিতে। এতে তার যে কতখানি স্বার্থ আছে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। প্রশান্ত সীতার ভাই,—ইভার বিয়েতে যা কিছু দেওয়া হতো, সবই প্রশান্ত পেতো—শুনে হাসি এল। হায় রে, দুনিয়ায় কেউ ভালকে চিনতে চায় না। তাই যারা সৎ, তারা পেছনে পড়ে থাকে,—অসৎ সকলের সামনে দাঁড়ায়,—প্রচুর যশ উপার্জ্জন করে যায় তারাই,—অন্ততঃ আমার তো তাই বলেই মনে হয়। ধনীর বাগানের অতি তুচ্ছ ফুল—যার শুধু রূপ আছে গুণ নেই,—তারই প্রশংসা লোকে করে। কিন্তু বনে যে কত ফুল ফুটে সৌরভ বিলায়, অসীম সৌন্দর্য্য বিকাশ করে, সে খবর তো কেউ রাখে না। তারা আপনি ফোটে, আপনি ঝরে পড়ে, আপনি বাতাসে খেলা করে।

"এ সংসারে যথার্থ সৎ যে, সে নিজের পরিচয় নিজে দিতে পারে না—অনেক সময় কেউ তাকে মন্দ বলে গেলেও সে প্রতিবাদ করতে পারে না,—নীরবে সকল অপবাদ সয়ে যায়।

"এখানেই বিদায় নিচ্ছি, দিদি,—দীর্ঘ পত্রখানা পড়তে বিরক্ত হয়ে উঠো না। খবর পাওনি বলে বিয়ের খবর দিতে গিয়ে অনেক কথাই এসে পড়ল। আমায় অন্য কোন আশীর্ব্বাদ করো না;—এই আশীর্ব্বাদ কর—আমায় যেন বেশী দিন বেঁচে থেকে এ অপূর্ব্ব সুখ ভোগ করতে না হয়। আমায় মুক্তি দিতে পারে কেবল মৃত্যু, আর কেউ না। প্রাণপণে আমি ঝুঁকেছি মরণের দিকে। এ আহ্বান ব্যর্থ করতে সে পারবে না। আমার মত দুর্ভাগিনী মেয়ে যারা—তারা সবাই আমার মতই তাকে ডাকে,—সেও তো আসে দিদি।

"দিদি, আমায় কেবল এই আশীর্ব্বাদ কর, আমার জীবনের বাঁধন শিথিল হোক, আমি মরণকে বরণ করে জীবন লাভ করি।

"ফাঁকির জীবন বয়ে চললুম, মনে এই বড় কষ্ট রইল—কিছু পেলুম না, আমার সব ব্যর্থ হয়ে গেল। সংসার তার প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় আদায় করলে, আমায় দিলে শুধু ছাই।

"আমার প্রণাম নিয়ো, দাদুকেও দিয়ো।

তোমার স্নেহের ইভা।"

সীতা শুম হইয়া বসিয়া রহিল। সম্মুখে সেই পত্রখানা খোলা পড়িয়া রহিল। বাতাস আসিয়া পত্রখানাকে কাঁপাইয়া, একটু করিয়া সরাইতে সরাইতে কখন দূরে লইয়া গিয়া ফেলিল, সীতা তাহা জানিতে পারে নাই। সে তখন ভারি অন্যমনস্ক, ইভার কথাগুলি সে ভাবিতেছিল।

আহা, কত দুঃখই না তাহাকে সহ্য করিতে হইতেছে,—কি নিদারুণ মনঃকষ্ট সে পাইতেছে। জগতে কেহ কাহারও পানে ফিরিয়া চায় না। মাতাও সন্তানের দুঃখ দেখিতে উদাসীনা। অসীম স্নেহ ও বুদ্ধি তাঁহার আজ ফুরাইয়া গিয়াছে।

"সীতা দিদি—"

বিহারীলাল কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পা লাগিয়া যে জলের গ্লাস উল্টাইয়া গেল, সে দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। তাঁহার মুখখানা আনন্দে উজ্জ্বল,—ক্ষীণ-দৃষ্টি চক্ষু দুইটী দীপ্ত।

"আহা, কি সুন্দর দৃশ্যই দেখলুম আজ সীতা। সেই ছোট সন্ন্যাসীটিকে পেয়ে আমার তাকে আর ছাড়তে ইচ্ছা করছিল না। কি তার মুখখানি —যদি একবার দেখতিস সীতা, তুই তাকে কখনো ছাড়তিস নে।"

সীতা নীরবে আনন্দোজ্জ্বল মুখখানার পানে শুধু চাহিয়াই রহিল। তাহার এই উদাসীনতা প্রথমে বিহারীলালের চোখে পড়ে নাই। এক নিঃশ্বাসে কথা কয়টী বলিয়া তিনি সীতার মুখের পানে তাকাইয়া হঠাৎ চুপ করিয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইল, কই, সীতা তো আগ্রহভরে সন্ন্যাসীর কথা জানিতে চাহিল না,—সে নীরবে শুধু যে চাহিয়া আছে। ভাল করিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া দেখিলেন, সে মুখ বড় মলিন, আনন্দের রেখা তাহাতে নাই।

আজ আবার কি হইল ভাবিয়া তিনি ঠিক করিতে পারিলেন না। সুদীর্ঘ দিনগুলা আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়া কি সুন্দরভাবে বহিয়া যাইতেছে। নিত্য নূতন দেশ দেখা, নিত্য ঠাকুর দেখা, নিত্য নূতন লোকের সঙ্গে পরিচয়—বৃদ্ধের নবযৌবন যেন ফিরিয়া আসিয়াছিল,—সীতার মনের বিষাদও কাটিয়া গিয়াছিল।

খানিক উদাসভাবে এদিক ওদিক তাকাইয়া তিনি বলিলেন, "আজ যে তুই কথা বলছিস নে, কি হয়েছে দিদি?"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সীতা বলিল, "তেমন কিছু হয় নি দাদু,—ইভার একখানা পত্র পেয়ে মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেছে, কিছু ভাল লাগছে না।"

বিহারীলাল পার্শ্বে পতিত আসনখানার উপর বসিয়া পড়িয়া ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইভা পত্র দিয়েছে? কি লিখেছে সে,—বিশেষ কিছু—"

তাঁহার মনের মধ্যে কি একটা কথা জাগিয়া উঠিল। তাই তাঁহার কণ্ঠস্বরটা কাঁপিয়া উঠিয়া থামিয়া গেল।

"কাকীমা তার বিয়ে দিয়েছেন দাদু।"

একটা শান্তিপূর্ণ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিহারীলাল বলিলেন, "ওঃ—তাই বুঝি সে তোকে লিখেছে? বিয়ে হয়েছে—ভালই, তার মা যে নিজের পছন্দমত সৎপাত্রে তাকে সমর্পণ করতে পেরেছেন, এ যথার্থই আনন্দের কথা।"

মাথা নাড়িয়া ক্ষুব্ধকণ্ঠে সীতা বলিল, "আনন্দের কথা নয় বলেই সে একটী বছর পরে সে খবরটা আমায় জানিয়েছে দাদু। তার মা আপনার ওপরে রাগ করে নিজের মেয়ের সর্ব্বনাশ করেছেন, একটী অসৎপাত্রের হাতে তাকে সমর্পণ করেছেন। আপনি পত্রখানা একবার শুনুন দাদু, শুনলে তার অবস্থা বুঝতে পারবেন।"

বিহারীলাল বলিলেন, "দরকার নেই দিদি, আমি ও পত্র শুনতে চাই নে।"

মনের মধ্যে গোপনে স্থিত কতখানি অভিমান নাড়া পাইয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহা সীতা বেশ বুঝিল। সে বলিল, "তা বললে হবে না দাদু, এ পত্র আপনাকেও শুনতে হবে। দাদু, সে যথার্থই বড় অভাগিনী যে। আহা, তার দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করতে আর যে কেউ নেই। মায়ের প্রতি সন্তানের কর্ত্তব্য পালন করতে সে নিজেকে বিসর্জ্জন দিয়েছে,—মা তবু তার ব্যথা বোঝেন নি, তার দিকে তাকাতে উদাসীনা। সে যে জীবনব্যাপী ব্যর্থতাকে সাথী করে নিয়েছে, মৃত্যুকে সাদরে বরণ করতে এগিয়ে দাঁড়িয়েছে। বড় কষ্টেই মুখ ফুটে সে আজ অনেক কথা বলেছে। আপনাকে এ কথা শুনতে হবে বই কি দাদু,—না শুনলে তো চলবে না।"

সে পত্রখানা আগাগোড়া পড়িয়া গেল, বিহারীলাল নিস্তব্ধে শুধু শুনিয়া গেলেন।

পত্র পড়া শেষ হইয়া গেল। সীতা সেখানা মুড়িয়া রাখিতে রাখিতে ব্যথাভরা স্বরে বলিল, "কাকীমা রোখের বশে বুঝতে পারলেন না, তার কি সর্ব্বনাশই করলেন,—তাকে জলন্ত আগুনে ফেলে দিলেন। কিন্তু দাদু, সকল ভুল একদিন ধরা পড়ে। কিন্তু তখন আর শোধরানোর পথ থাকে না। সেই ভুলের জের আজীবন টেনে চলে। কাকীমার এই ভুলও একদিন ভাঙ্গবে—কিন্তু সেদিন এ ভুল আর শোধরানো যাবে না।"

বিহারীলাল অন্যমনস্ক ভাবে কি ভাবিতেছিলেন, একটাও কথা বলিলেন না।

তাঁহার মুখের আনন্দ মিলাইয়া গিয়া ধীরে ধীরে অন্ধকার ভাসিয়া উঠিতেছিল। সীতা তাঁহার মুখের পানে একবার তাকাইয়া বলিল, "চলুন দাদু, বেলা অনেক হয়ে গেছে, খাওয়ার সময় বয়ে গেল।"

"হুঁ, চল,—"

বিহারীলাল উঠিতে উঠিতে অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন, "চল, কাল কলকাতায় রওনা হতে হবে, জিনিসপত্রগুলো আজই গুছিয়ে ফেলিস দিদি।"

বিস্মিতা সীতা বলিল, "কালই দাদু,—এই যে বলেছিলেন এখানে মাসখানেক থাকবেন?"

মলিন হাসিয়া বিহারীলাল বলিলেন, "বাবা বিশ্বনাথকে দেখা হয়েছে এই ঢের,—অনর্থক আর বেশী দিন থেকে কি লাভ হবে ভাই? এবার কালীঘাট আর তারকেশ্বর দেখে বাড়ী যেতে পারলে বাঁচি। অনেক দিন বাড়ী ছাড়া,—কে জানে কেন বাড়ী যাওয়ার জন্যে প্রাণটা বড় ছটফট করছে। মরি যদি ভিটেয় মরব, আর কোথাও মরতে পারব না।"

৩৯

কলিকাতায় রসারোডে বাসা লওয়া হইয়াছিল। এখান হইতে কালীঘাট কাছে, নিত্য কালীদর্শন হইতেছিল।

সীতার খুব ইচ্ছা ছিল ইভার শ্বশুরালয়ে গিয়া সে একবার তাহার সহিত দেখা করিবে। কিন্তু পত্রে ইভা ইচ্ছা করিয়াই ঠিকানা দেয় নাই, পাছে সীতা পত্র দেয় সেই জন্য। ঠিকানা না পাওয়ায় সীতা ইভার সহিত দেখা করিতে পারিল না।

তারকেশ্বর, কালীঘাট দেখা শেষ হইয়া গেল। সীতার আরও দুই দিন থাকিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু বিহারীলাল রাজি হইলেন না। তাঁহার প্রাণটা রামনগরের দিকে ছুটিতেছিল। তিনি আর মুহূর্ত্তমাত্র কোথাও থাকিতে পারিতেছিলেন না।

সরকার সুশীলবাবুকে টেলিগ্রাফ করিয়া দিল—দু'খানি পালকি যেন উপযুক্ত বেহারা দিয়া ষ্টেশনে রাখা হয়,—জমীদারবাবু ফিরিয়া যাইতেছেন।

দু'পুরে যে ট্রেণখানা ছাড়ে বিহারীলাল সেইখানি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। একদিন সীতা ও দাস-দাসীদিগকে লইয়া তিনি সেই ট্রেণে উঠিয়া বসিলেন।

ট্রেণ ছাড়িতে তখনও খানিক বিলম্ব ছিল। সম্মুখের প্ল্যাটফর্ম্মে অনেক লোক যাওয়া আসা করিতেছিল। সীতা বিষণ্ণ নেত্রে শুধু চাহিয়া ছিল। কত লোক যে তাহার ফুটগোলাপতুল্য অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানার পানে চাহিয়া গেল, সে দিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না। সে শুধু ভাবিতেছিল—হতভাগিনী ইভার সহিত তাহার দেখা হইল না,—আর যে হইবে সে আশাও নাই। কলিকাতায় আসার সময়ে আনন্দ তাহার হৃদয়ে ধরিতেছিল না; সে ভাবিয়াছিল, ইভার সহিত তাহার দেখা হইবে। এখন তেমনই বিষাদে তাহার হৃদয়খানা পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

অন্যমনস্কভাবে সে লোকজনের গতিবিধি দেখিতেছিল,—হঠাৎ একজনের পানে তাকাইয়া সে চমকাইয়া বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া একটা অস্পষ্ট শব্দ বাহির হইতে হইতে সে তাহা চাপিয়া গেল। বিস্ময়ে সে আবার সম্মুখপানে তাকাইল।

হ্যাঁ, এ সেই বটে। কোট-প্যাণ্ট-হ্যাটে সুশোভিত হইলেও সীতা তাহাকে দেখিয়াই চিনিল,—এ জ্যোতির্ম্ময় ছাড়া আর কেহ নহে। তাহার পার্শ্বে ওই সুন্দরী যুবতীটি কে? ওই যে হাসিতে হাসিতে পার্শ্ববর্ত্তী আর একটী যুবকের সহিত গল্প করিতে করিতে চলিয়াছে!

সীতা বিস্ফারিত নেত্রে তাকাইয়া রহিল। এই কি জ্যোতির্ম্ময়ের স্ত্রী? হ্যাঁ—নিশ্চয়ই তাই। ইভার মুখে সে যে দেবযানীর কথা শুনিয়াছিল, এই সেই দেবযানী।

হ্যাঁ, যোগ্যা পত্নী তাহার,—জ্যোতির্ম্ময়ের পার্শ্বে এমন সুন্দরীকে মানায়। সীতার ঔদ্ধত্য বই কি,—সে ওই স্থান অধিকার করিতে চাহিয়াছিল। অন্যায় স্পর্দ্ধা তাহার। কি আছে তাহার? কোন্ গুণে সে অগ্রসর হইতে চাহিয়াছিল? লজ্জায় সীতার সুগৌর মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। ছিঃ, জ্যোতির্ম্ময় তাহাকে কতখানি হীন ভাবিয়াছিল! সে নিশ্চয়ই ভাবিয়াছিল—সীতা তাহাকে পাইবার জন্য অধীরা হইয়া উঠিয়াছে। এখন হয় তো স্ত্রীর কাছে সেই সব গল্প সে করে। দু'জনে হয় তো তাহার কথা লইয়া কত হাসে। মেয়েটী হয় তো দারুণ অভিমানে পূর্ণ হইয়া উঠিয়া বলে—"তবে তুমি তাকেই বিয়ে করলে না কেন, কারণ সে তোমায় ভালবাসে।" জ্যোতির্ম্ময় নিশ্চয়ই জোর করে; বলে—সীতাকে সে আন্তরিক ঘৃণা করে।

সীতার সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছিল। সে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিতেছিল না। কিন্তু না, আজ তাহার অদৃষ্টে যে সুযোগটুকু আসিয়াছে, এ সুযোগ সে হারাইবে না। ভগবান অপ্রত্যাশিতরূপে যাহা সম্মুখে আনিয়া দিয়াছেন, তাহা সে

সার্থক করিয়াই লইবে। জীবনে আর কখনও জ্যোতির্ম্ময়কে দেখিতে পাইবে কি না তাহা কে জানে।

জ্যোতির্ম্ময় একটু আগে দূরে দূরে চলিতেছিল। দেবযানী ও ডাক্তার দত্ত খানিকটা পিছনে গল্প করিতে করিতে যাইতেছিল। পূজার বন্ধ আসিয়াছে। ডাক্তার দত্ত কয়েক দিনের জন্য দেবযানী ও জ্যোতির্ম্ময়কে নিজের দেশ বরিশালে লইয়া যাইতেছিলেন। ইচ্ছা না থাকিলেও দেবযানীর একান্ত আগ্রহে জ্যোতির্ম্ময়কে বাহির হইতে হইয়াছিল।

সীতা চাহিয়া ছিল জ্যোতির্ম্ময়ের মুখখানার পানে। সে মুখে বুকভরা আনন্দের বিকাশ সে দেখিতে পায় নাই। সীতার মনে হইতেছিল—জ্যোতির্ম্ময়ের প্রশস্ত রেখাশূন্য ললাটে চিন্তার রেখা পড়িয়াছে। আয়ত নেত্রে দীপ্তি ফুটিয়া উঠিতে পায় নাই। সে নয়নের সম্মুখে অন্ধকার দেখিয়া যেন মুসড়িয়া পড়িয়াছে।

অন্যমনস্ক ভাবে কামরাগুলির পানে চাহিতে চাহিতে জ্যোতির্ম্ময় চলিয়াছিল। হঠাৎ সীতার পানে চোখ পড়িতেই সে বজ্রাহতের মত থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। আর একবার চোখ তুলিয়া চাহিতে, সীতা পাশে সরিয়া গিয়া আত্ম-গোপন করিয়া ফেলিল।

জ্যোতির্ম্ময় পরবর্ত্তী কামরার পানে তাকাইয়া যে মুখখানা দেখিতে পাইল, তাহাতে আর সে এদিকে মুখ ফিরাইয়া রাখিতে সমর্থ হইল না,—হ্যাটটা একেবারে চোখের উপর টানিয়া দিয়া সে দ্রুত ছুটিয়া চলিল। কত পিছনে যে দেবযানী রহিয়া গেল, তাহা দেখার ক্ষমতা তাহার ছিল না। তাহার সমস্ত দেহ তখন দারুণ উত্তেজনায় থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

ট্রেণ ছাড়িবার ঘণ্টা যখন বাজিল, তখন সীতা সরিয়া আসিয়া সম্মুখ পানে চাহিল; জ্যোতির্ম্ময় তখন ফাষ্ট ক্লাসের মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছিল, তাহাকে আর দেখা গেল না। সীতা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। বুকের মধ্যে কি রকম অবর্ণনীয় যন্ত্রণা ধরিয়াছিল,—একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িয়া দারুণ ভার অনেকটা হালকা হইয়া গেল।

ট্রেণ ষ্টেশন ত্যাগ করিল।

দুপাশে কত লোকালয়, কত ধানে-ভরা মাঠ, কত সুন্দর গাছ, জলভরা নদী, পুষ্করিণী আসিল চলিয়া গেল,—সীতা চাহিয়াও দেখিল না। অসীম আকাশের এক কোণে একখানা ছোট মেঘ দুপুরের রৌদ্রকিরণে জ্বলিতেছিল; তাহারই পানে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল।

একটা ষ্টেশনে ট্রেণ থামিল। সরকারের আহ্বানে সীতা চমকাইয়া উঠিল। তাই তো, এইখানেই যে তাহাদের নামিতে হইবে। আপনার চিন্তায় সে এতই বিভোর হইয়া পড়িয়াছে যে, কোথায় নামিতে হইবে তাহাও তাহার মনে নাই। এই যে একটা বৎসর সে পথে পথে বেড়াইয়া আসিল, এমন ভুল তো তাহার এক দিনও হয় নাই। আজ আগে দাদু কখন নামিয়া পড়িয়াছেন,—কিন্তু সকলের আগে সেই তো নামিয়া পড়ে।

তাড়াতাড়ি চাদরখানা দিয়া আগাগোড়া ঢাকিয়া সে নামিয়া পড়িল। এমন ভাবে জড়সড় হইয়া আগাগোড়া ঢাকিয়া সে কখনও কোথাও উঠা-নামা করে নাই; কেন না, সে কখনও লজ্জার ধার ধারিত না। আজ তাহার মনে হইতেছিল ফাষ্ট ক্লাসের একটী আরোহীর কথা। সে হয় তো জানালাপথে তাহার চির-পরিচিত এই ষ্টেশনটীর পানে তাকাইয়া আছে,—এখনই সীতা তাহার চোখে পড়িয়া যাইবে।

প.ল্কী প্লাটফর্ম্মের পাশে অপেক্ষা করিতেছিল। দাদু আগেই একখানিতে উঠিয়া পড়িয়াছিলেন। সীতা উঠিবার সময় শেষ একবার মুখ তুলিয়া চাহিতেই, সেই দুইটী চোখের ব্যগ্র দৃষ্টি তাহার অনাবৃত মুখখানির উপর আসিয়া পড়িল। সঙ্কুচিতা হইয়া উঠিয়া সীতা তাড়াতাড়ি পাল্কীর মধ্যে উঠিয়া পড়িল।

ট্রেণ চলিতে আরম্ভ করিল। সীতা চোখ তুলিয়া দেখিল, জ্যোতির্ম্ময় তখনও ঝুঁকিয়া পড়িয়া চাহিয়া আছে।

বাড়ী পৌঁছিয়াও সে সেই কথাটা বিহারীলালের কাছে বলিতে পারিল না। তাহার অন্তর যেন মুসড়াইয়া পড়িয়াছিল। বিহারীলাল জ্যোতির্ম্ময়কে দেখেন নাই, অথবা দেখিলেও চিনিতে পারেন নাই; কারণ, জ্যোতির্ম্ময়ের চেহারা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার উপর সে হ্যাট মাথায় দিয়াছিল, প্যান্ট-কোট পরিয়াছিল।

জ্যোতির্ম্ময়ের মলিন মুখখানা ভাবিয়া সে বড় অন্যমনস্ক হইয়া পড়িত। তাহার মনে হয়—হয় তো জ্যোতির্ম্ময় সুখী হইতে পারে নাই, হয় তো—

তখনই তাহার মুখে একটু হাসি ফুটিয়া উঠিত। তাই কি হইতে পারে, এ তাহার কল্পনা মাত্র।

দেবযানীর মত শিক্ষিতা সুন্দরী নারীকে যে জীবনের সঙ্গিনী করিতে পারিয়াছে, সে সুখী নয়, এও কি একটা কথা? জ্যোতির্ম্ময় যাহা চাহিয়াছিল, যে আদর্শ সে মনের মধ্যে গড়িয়া তুলিয়াছিল, তেমনই স্ত্রী সে পাইয়াছে, দেবযানী বাঞ্ছিত স্বামী পাইয়াছে। হা ভগবান, সীতা আজন্ম তোমার পূজাই করিয়া গেল, তোমায় হাত ভরিয়া অর্ঘ্যই সে দিয়া গেল, জীবস্বরূপে তোমার পূজা করিতে পাইল না। তুমি পাথরের মূর্ত্তিতে ফাঁকি দিয়া মিথ্যা পূজাই লইলে, সত্যকার পূজা তাহার অসম্পূর্ণ থাকিয়া গেল যে।

আজীবন পূজার ফল সে পাইল কি—ব্যর্থতা! যাহা কিছু সে স্পর্শ করে, তাহাই ব্যর্থ করিয়া তোলে। ভগবান—পৃথিবীর ঈশ্বর—

সীতার দুই চোখ অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিত, কখন নিঃশব্দে তাহা ঝরিয়া পড়িত। সীতা গলায় অঞ্চল জড়াইয়া দুই হাত ললাটে রাখিত, গভীর সুরে বলিয়া উঠিত—তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক প্রভু; তুমি যা কিছু করছ সবই মঙ্গলের জন্যে, কেবল এই কথাটাই মনে করিয়ে দিয়ো।

৪০

সে দিন বিহারীলাল নিতান্ত অসময়ে বাহির হইতে ভিতরে চলিয়া আসিলেন। দাসী গিয়া সীতাকে সংবাদ দিল—কর্ত্তাবাবু ভিতরে আসিয়াছেন ও সীতাকে এখনই ডাকিতেছেন।

সীতা তখন প্রাত্যহিক শিবপূজা সমাপনান্তে গলবস্ত্রে মাটীতে লুটাইয়া প্রণাম করিতেছিল। তাহার দীর্ঘ কেশরাশি মাটীতে লুটাইতেছিল। দাসীর আহ্বান শুনিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে আসিল। সংবাদ লইয়া জানিল—দাদুর শরীর ভাল নাই, তিনি আসিয়াই নিজের গৃহে গিয়া শুইয়া পড়িয়াছেন।

উৎকণ্ঠিতা সীতা তাড়াতাড়ি তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিল। বিহারীলাল দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া চক্ষু মুদিয়া শুইয়া ছিলেন, সীতার পদশব্দ শুনিয়া মুখ ফিরাইলেন।

ব্যগ্রভাবে সীতা বলিল, "আপনার মুখখানা এ রকম দেখাচ্ছে কেন দাদু, অসুখ করেছে না কি?"

বলিতে বলিতে সে তাঁহার ললাটে হাত দিল।

শুষ্ক হাসিয়া বিহারীলাল বলিলেন, "আর দেখছিস কি দিদি, তোর দাদু এবার সংসারের সঙ্গে দেনা পাওনা চুকিয়ে চলবার পথে পা বাড়িয়েছে রে, আর সে থাকছে না। এবার আমার সব শেষ ভাই। তোর দাদু এবার বড় জ্বালা-যন্ত্রণার হাত হতে পরিত্রাণ পাবে।"

তাঁহার সে হাসি সীতার চোখে জলধারা বহাইয়া দিল। পাছে দাদু দেখিতে পান, সে তাই মুখ ফিরাইয়া গোপনে চোখ দু'টী মুছিয়া ফেলিল। আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "এ রকম অসুখ আরও কতবারই তো হয়েছে দাদু, অত ভাবছেন কেন বলুন তো? অসুখ হয়েছে—সেরে যাবে।"

"সেরে যাবে?"

বৃদ্ধ দুই কনুইয়ের উপর ভর দিয়া উঁচু হইয়া উঠিলেন। দৃপ্তনেত্রে চাহিয়া দৃপ্তকণ্ঠে বলিলেন, "কি—সেরে যাবে? এখনও তুই আমার সারার প্রার্থনা করিস সীতা? ওরে না, আর সে কামনা করিস নে, আমায় এখন যেতে দে। আমার যাওয়ার পথে তুই আর বাধা হয়ে দাঁড়াস নে। প্রার্থনা কর সীতা, প্রার্থনা কর—যেন এই শোওয়াই আমার শেষ শোওয়া হয়, আমায় যেন আর উঠতে না হয়।"

বাস্তবিক হইলও তাহাই।

বৃদ্ধের ব্যারাম কঠিন হইয়া দাঁড়াইল; শেষকালে চিকিৎসক জবাব দিয়ে গেলেন।

বৃদ্ধের মুখে বড় তৃপ্তির হাসি ফুটিয়া উঠিল। সুশীলবাবুর পানে তাকাইয়া তিনি বলিলেন, "বাঁচলুম, আর আমায় ওষুধ গিলতে হবে না। এত বললেও সীতা কথা শোনে না সুশীল,—কেঁদে-কেটে হাতে-পায়ে ধরে যেমন করে হোক, ওষুধ খাওয়াবেই। বেশ জানছি—এবার আমার সব শেষ। আমার যেটুকু পাপ ছিল, তীর্থে তা ক্ষয় করে এসেছি। এবার আমায় যেতেই হবে। কবিরাজ, ডাক্তার দেখিয়ে, কতকগুলো ওষুধ খাইয়ে, আমার ব্যথাতুর প্রাণটাকে এই জীর্ণদেহ খাঁচায় আর কি আটক করে রাখতে পারে? আমার ওষুধ গঙ্গাজল, আমার ওষুধ ঈশ্বরের নামগান। আমায় সেই নাম শুনাও, গঙ্গাজল দাও।"

তিনি হাঁ করিলেন, সীতা চোখ মুছিতে মুছিতে মুখে গঙ্গাজল দিল।

প্রাণ ভরিয়া জল পান করিয়া তিনি শান্তিপূর্ণ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আঃ বাঁচলুম; যে কতক্ষণ বেঁচে আছি ভাই, আমায় আশা মিটিয়ে গঙ্গাজল খেতে দিস। সকলকে খবর দাও সুশীল, আমি সকলকে একবার শেষ দেখা দেখে যাই।"

তখনও কথা কহিবার শক্তি তাঁহার বেশ ছিল। তাঁহার আসন্ন মৃত্যু শ্রবণে যে যেখানে ছিল সকলে আসিয়া পড়িল। করুণ বিলাপ ধ্বনিতে চারিদিক ভরিয়া উঠিল।

মুমূর্ষু অতি কষ্টে একখানা হাত তুলিয়া বলিলেন, "চুপ।"

সীতা বিকৃতকণ্ঠে বলিল, "ওদের এখন চুপ করতে বলুন দাদা,—দাদু কি বলতে চান আগে শুনুন।"

বিহারীলাল হাঁ করিতে সীতা মুখে আবার গঙ্গাজল দিল। জল খাইয়া একটু জোর পাইয়া তিনি সুশীলবাবুর পানে চাহিলেন। কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "তোমায় বড় বিশ্বাস করে রেখে গেলুম সুশীল—আমার সব রইল, তুমি দেখো।"

সুশীলবাবু তাঁহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিলেন, "আমি আপনার বিশ্বাসের উপযুক্ত কাজ করব,—আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না, আমি সব ভার নিচ্ছি।"

মৃত্যুমলিন মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি মাথা ফিরাইবার চেষ্টা করিলেন, "সীতা—"

উপাধান হইতে মাথা সরিয়া গিয়াছিল। সীতা সযত্নে তাহা উপাধানে তুলিয়া দিতে দিতে উত্তর দিল, "এই যে, আপনার পাশেই রয়েছি দাদু।"

"দিদি, আমার শ্রীধর রইলেন, আর অতিথি-সেবা—"

হাঁপাইতে হাঁপাইতে বিহারীলাল কোনমতে এই কয়টি কথা বলিতে পারিলেন।

সীতা তাঁহার কাণের কাছে মুখখানা আনিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "শ্রীধরের ভার আমার ওপরে, অতিথিসেবার ভারও আমার হাতে—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ভগবানের নাম করুন, আমাদের ভাবনা ছেড়ে দিন।"

সীতার হাতখানা বুকের উপর রাখিয়া মুমূর্ষু স্থিরনেত্রে তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার দুই চোখের পাশ দিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

"কাঁদছেন কেন দাদু, কাঁদছেন কেন? আপনি যে ছেলেদের কাছে যাচ্ছেন। সেখানে তাঁরা সকলে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। তবে আপনি কেঁদে যাচ্ছেন কেন দাদু?"

বৃদ্ধের চোখের জল মুছাইতে গিয়া সে নিজেই কাঁদিয়া আকুল হইল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় কম্পিতকণ্ঠে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন "গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম,—গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম,—"

"দাদু,—দাদু—"

রুদ্ধকণ্ঠে সুশীলবাবু বলিলেন, "এখন ডেক না সীতা, উনি এখন অনন্তের পথে যাত্রা করেছেন,—দেখুন না, বড় ঘুম আসছে, চোখ মুদে এসেছে,—আর ডেক না।"

আর্ত্তকণ্ঠে সীতা বলিয়া উঠিল, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে দাও। এতক্ষণ আসল কথা জিজ্ঞাসা করা হয়নি, আর সময় পাব না।"

সে আবার ডাকিতে লাগিল, "দাদু, একটা কথা শুনে যান,—একটা কথা—"

বৃদ্ধের স্তিমিত ভাবটা হঠাৎ যেন কাটিয়া আসিল, নিমীলিতপ্রায় চোখ দু'টী প্রাণপণে বিস্ফারিত করিয়া তিনি তাকাইলেন।

"দাদু, যদি জ্যোতিদা ফিরে আসে, যদি সে সৎভাবে সম্পত্তি নিতে চায়, তার সম্পত্তি তাকে দেব তো,—শুধু এই কথাটি বলে দিয়ে যান।"

বৃদ্ধের দুই চোখে আবার জলধারা গড়াইয়া পড়িল। সীতা বেশ বুঝিতে পারিল, আজ এই অন্তিম-শয্যায় শুইয়া তিনি দুর্ব্বিনীত পৌত্রের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন। আজ চলার পথে পা বাড়াইয়া, উপস্থিত সকলের পানে তাকাইয়া, সেই পৌত্রের জন্যই তাঁহার হৃদয় হাহাকার করিয়া মরিতেছে।

তাঁহার শুষ্ক অধরোষ্ঠ কাঁপিতেছিল। সীতা ওষ্ঠে গঙ্গাজল দিতে দিতে ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "বলুন দাদু, বলে যান, আপনার নাতি যদি আসেন, যদি নিতে চান,—আমি সব দিতে পারব তো?"

"দি—য়ো—"

শব্দটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা উপাধান হইতে গড়াইয়া পড়িয়া গেল, হৃৎকম্পন থামিয়া গেল। সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল। ভট্টাচার্য্য-মহাশয় চোখের জল মুছিতে মুছিতে তখনও বলিতেছিলেন,—গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম,—গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম।

সীতা মৃতের মুখখানার পানে তাকাইয়া নিঃশব্দে চোখের জল মুছিতে লাগিল। আঃ বড় শান্তি যাওয়ার মুহূর্ত্তে দিয়া গেলে দাদু, বড় শান্তি দিয়া গেলে। সীতা এ ভার মাথায় লইয়া পাগল হইয়া গিয়াছিল, তোমার অনুমতি না পাইলে সে এ ভার কোথায় নামাইত,—কাহাকেও তো এ ভার দিতে পারিত না।

কি শান্ত মুখখানা! পাঁচ মিনিট আগে এই মুখখানা অসহ্য যন্ত্রণায় বিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল,—নিশ্চয়ই যে কথা সীতার হৃদয়ে জাগিয়াছিল, সেই কথা তাঁহার হৃদয়েও জাগিয়াছিল। সীতা কথা জিজ্ঞাসা করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চোখ দুইটী দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কতখানি বেদনা তাঁহার—'দিয়ো'—কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া গেল। কেবলমাত্র এই কথাটীর জন্যই তিনি কিছুতেই পৃথিবী ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছিলেন না।

সব ফুরাইয়া গেল। এমন করিয়া যে সবই ফুরাইয়া যায়—সীতা তাহা বরাবর দেখিয়া আসিতেছে। তাহার যে স্নেহময়ী মাতা শৈশবে তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন, তাঁহার কথা আজও স্বপ্নের মত তাহার মনে পড়ে। তাহার পর পিতা, কল্যাণময়ী ঈশানী, অবশেষে দাদা। স্নেহময় হৃদয় যাঁহাদের ছিল, যাঁহাদের অযাচিত করুণা সে পাইয়া আসিয়াছে—আজ তাঁহারা কেহ নাই, সকলে চলিয়া গিয়াছেন।

হায় রে, এমন করিয়া সীতারও সব শেষ হইবে কবে, সীতা শান্তি লাভ করিবে কবে? ওগো প্রিয়তম মৃত্যু, তোমার আশায় চাহিয়া সেও যে বসিয়া আছে। যেমন করিয়া এইমাত্র একজনের সকল ব্যথা যন্ত্রণার ক্লেদ ধুইয়া মুছিয়া নিজের পবিত্র নির্ম্মল কোলে টানিয়া লইলে, সীতাকেও তেমনি করিয়া টানিয়া লইবে কবে? এ ব্যর্থ জীবন সফলতালাভ করিবে তোমারই স্পর্শে—এই শুষ্ক মরুতে তখন অমিয় উৎসব ছুটিবে।—আসিবে কি গো প্রিয়তম, আসিবে কি?—ব্যর্থতাকে সফলতায় পূর্ণ করিয়া তুলিতে,—তপ্ত, জ্বালাময় হৃদয় শীতল করিয়া দিতে কবে আসিবে নাথ?"

ভট্টাচার্য্য-মহাশয় শব তুলিবার বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া সীতার কাছে ফিরিয়া আসিলেন। সীতা তখন মেঝেয় শুইয়া পড়িয়াছিল, কয়েকটী স্ত্রীলোক তাহার কাছে বসিয়া সান্ত্বনা দিতেছিল।

চিন্তিতভাবে ভট্টাচার্য্য-মহাশয় বলিলেন, "বড় ভাবনায় পড়েছি মা, মুখ-অগ্নি কে করবে—"

সীতা উঠিয়া বসিল, অঞ্চলে মুখ মুছিয়া আর্দ্র-কণ্ঠে বলিল, "আমিই করব ভশ্চাযি্যি-মশাই।"

"তুমি—তুমি করবে সীতা—?"

ভট্টাচার্য্য-মহাশয় আশ্চর্য্য হইয়া তাকাইয়া রহিলেন।

সীতা হাসিল,—কিন্তু তাহাকে হাসি বলা যায় না, সে কান্নারই একটা আকৃতি মাত্র। সে বলিল, "ভশ্চাযি্যি-মশাই, আপনি জানেন না—আমি তাঁর পৌত্রবধূ। লোকচক্ষে আমার বিয়ে না হলেও ধর্ম্মতঃ আমার বিয়ে হয়ে গেছে। সম্প্রদানকর্ত্তা, পুরোহিত দাদুই ছিলেন। তিনি জানতেন, আমার বিয়ে হয়ে গেছে, আমি তাঁর পৌত্রবধূ। তিনি তাই উইল করে তাঁর সব সম্পত্তি আমায় দিয়ে গেছেন। আপনি জানেন, তাঁর মৃত্যুকালে আমি জিজ্ঞাসা করলুম,—"

বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। সে অন্যদিকে তাকাইয়া খানিক চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে ফিরিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "এতে আপত্তি করবেন না ভশ্চাযি্যি-মশাই, ধর্ম্মসঙ্গত আমি তাঁর মুখাগ্নির—তাঁর শ্রাদ্ধের অধিকারিণী;—কেন না, আমি তাঁর পৌত্রবধূ। আপনি উদ্যোগ করুন, আমি শ্মশানে যাব।"

"মা—" বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্যের দুই চোখ দিয়া খানিকটা জল উপছাইয়া পড়িল,—"তবে এস মা, দাদুর মুখাগ্নি তুমিই কর, শ্রাদ্ধও তোমায় করতে হবে।"

"কিন্তু তাঁদের তো খবর দিতে হবে ভশ্চযি্যি-মশাই, নিয়ম পালন করুন, অশৌচ নিন বা না নিন, জানাতে হবে।"

ভট্টাচার্য্য-মহাশয় বলিলেন, "অবশ্য দিতে হবে, কিন্তু শ্রাদ্ধের অধিকারী তুমি ছাড়া আর কেউ হতে পারবে না মা। পৌত্রকে তিনি ধর্ম্মত্যাগী বলে ত্যাগ করেছেন,—তার হাতের কিছু নেবেন না বলেই তোমায় সব বিষয়-সম্পত্তির অধিকারিণী করে গেছেন। কিন্তু থাক—সে পরের কথা পরে হবে, এখনকার যা তাই করবে এসো।"

সীতা উঠিল।

৪১

সীতার স্বাক্ষরিত পত্রে দাদুর মৃত্যুসংবাদ পাইয়া জ্যোতির্ম্ময় অকস্মাৎ হৃদয়ে একটা ভীষণ ধাক্কা খাইয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার মনে হইল, তাহার পায়ের তলা হইতে পৃথিবী সরিয়া যাইতেছে। তাড়াতাড়ি সে বসিয়া পড়িল। তাহার চোখের সামনে কিছুই যেন নাই, সব শূন্য হইয়া গেল। রূপ-রস-গন্ধ-শব্দপূর্ণ পৃথিবী নিমেষে রূপ-গন্ধ-শব্দহীন হইয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ পরে তাহার বাহ্য জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। পত্রখানা কখন হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছিল,—সেখানার দিকে দৃষ্টি পড়িল। সেখানা কুড়াইয়া লইয়া আবার সে পড়িতে লাগিল।

না, সংবাদ তো মিথ্যা নয়। এই যে সীতার হাতের লেখা—পূজ্যপাদ দাদু আমাদের সকলকে রেখে অনন্ত স্বর্গে বিশ্রামলাভ করিতে গিয়েছেন,—এই যে তাঁহার মৃত্যু তারিখ, সময়, সব লেখা; আগামী সোমবার তাঁহার শ্রাদ্ধ হইবে, সীতা তাহাও জানাইয়াছে।

"দাদু, দাদু, মা আমার,—তোমরা কেউ আমায় মার্জ্জনা করে গেলে না,—দু'জনেই আমায় অপরাধী করে গেলে?"

হতভাগ্য জ্যোতির্ম্ময় আত্মসম্বরণে অসমর্থ হইয়া, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া একবার উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদিতে গিয়া নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

কাঁদিবে সে,—কাঁদিবার কি অধিকার আছে তাহার? না,—কাঁদিলে যে শান্তি পাওয়া যায়, হৃদয়ের দারুণ যন্ত্রণায় সান্ত্বনার প্রলেপ পড়ে,—তবে সে কাঁদিবে কি করিয়া? কাঁদিবে সে—যে কাঁদিবার অধিকার পাইয়াছে। তাহার সে অধিকার কই? সে যে নিজের ইচ্ছায় নিষ্ঠুর হাতে সকল বাঁধন কাটিয়া দিয়াছে। মা জানিয়া গিয়াছেন—তাঁহার পুত্র ধর্ম্মত্যাগী, স্বজনত্যাগী, পাপিষ্ঠ,—দাদুও তাহাই জানিয়া গেলেন।

"দাদু,—মা—"

হতভাগ্য কাঁদিতে পারিল না, নিদারুণ মর্ম্ম-বেদনায় ছটফট্ করিতে লাগিল। হায় রে, কেহ তাহাকে ক্ষমা চাহিবার অবকাশ দিল না? সে যে একটী আহ্বানের অপেক্ষা করিয়াছিল,—কেহ তাহাকে ডাকিল না? সে বড় আশায় ছিল, একদিন দাদু তাহাকে ডাকিবেন, সে তখন ছুটিয়া যাইবে,—হায় রে, তাহার আশা শূন্যে মিলাইয়া গেল,—দাদু তাহাকে ডাকিলেন না তো?

প্রভু, তুমি তো শুভ অবসর আনিয়া দিয়াছিলে, সম্মুখে আনিয়া ফেলিলে,—কেন সে অগ্রসর হইতে পারিল না? কিসের কুণ্ঠা, কিসের লজ্জা তাহার মনে জাগাইয়া রাখিয়াছিলে নাথ? সে দিনে মুখ তুলিয়া সে দেখিতে পাইয়াছিল, সম্মুখে একটী কামরার জানালায় দাদুর শুভ্র মস্তক, দাদুর প্রশান্ত মুখখানি,—হায় রে, কেন সে আর একবার দেখিল না, কেন চোখ নত করিয়া সে চোরের মত ছুটিয়া পলাইল? কেন সে তখন দাদুর পা দু'খানা জড়াইয়া ধরিল না,—কেন বলিল না, "দাদু, আমি বড় ভুল করেছি, সেই ভুলের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করছি, আমায় ক্ষমা করুন,"—তাহা হইলে দাদু আর তো শক্ত হইয়া থাকিতে পারিতেন না,—তাঁহাকে নরম হইয়া পড়িতেই হইত। পৌত্রের সকল দোষ ক্ষমা করিয়া তিনি তাহাকে তাঁহার শান্তিময় বুকে নিশ্চয়ই টানিয়া লইতেন।

ওরে অভাগা,—হাঁ, তুই অভাগা বই কি,—কেন, ওরে কেন,—কেন তুই ছুটিয়া গেলি না? তখন কেন তুই তোর কুণ্ঠাটুকু দূর করিয়া একবার দাদু বলিয়া ডাকিলি না,—দেখিতে পাইতিস, সেই শীর্ণ কম্পিত হাত দুইটী তোকে সেই আবেগভরা শীর্ণ বুকের উপর দৃঢ়ভাবে চাপিয়া ধরিত কিনা,—দেখিতে পাইতিস,—তোর ললাটে তাঁহার শুষ্ক অধরোষ্ঠ স্থাপিত হইত কি না;—দৃষ্টিহীন চোখ দুইটী দিয়া অজস্র স্নেহধারা ঝরিয়া পড়িয়া তোকে অমৃতে সিঞ্চিত করিত কি না। হেলায় রত্ন হারাইলি অভাগা,—তোর সর্ব্বস্ব এমন করিয়া বিসর্জ্জন দিলি?

অধীর জ্যোতির্ম্ময় সোফায় পড়িয়া খানিকক্ষণ ছটফট্ করিয়া উঠিয়া বসিল। শুষ্ক চক্ষু তাহার, এত জোরে সে অধর দন্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিল যে, কাটিয়া রক্ত বাহির হইয়া পড়িল।

একে একে অতীতের কথা আজ তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল। যে সব কথা সে কোন দিন ভাবে নাই, সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথাগুলিও আজ খুব বড় হইয়া তাহার মনে জাগিতেছিল। অন্যমনস্ক জ্যোতির্ম্ময় উদাস নেত্রে সম্মুখের পানে চাহিয়া ছিল। কোন কথা, কোন শব্দ তাহার কাণে আসিয়া পৌঁছায় নাই,—দাদুর মৃত্যু-সংবাদ তাহাকে এমন চেতনাহীন করিয়া তুলিয়াছিল।

দেবযানী কখন আসিয়াছিল,—স্বামীর সম্মুখে পত্রখানা পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তুলিয়া লইয়া পড়িল,—জ্যোতির্ম্ময় তাহা জানিতে পারে নাই। সে যখন তাহার স্কন্ধে একখানা হাত রাখিল, তখন হঠাৎ জ্যোতির্ম্ময় চমকাইয়া একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল।

একটু হাসিয়া দেবযানী বলিল, "হঠাৎ এ রকম চমকে উঠে শাদা হয়ে গেছ কেন? ভূত দেখেছ?"

"ওঃ তুমি—আমি ভেবেছিলুম—"

বলিতে বলিতে জ্যোতির্ম্ময় চুপ করিয়া গেল,

—মুখখানা অন্য দিকে ফিরাইয়া সে আবার কি ভাবিতে লাগিল।

হাতের পত্রখানা দেখাইয়া দেবযানী বলিল, "পত্রখানা বুঝি এখনই এল ?"

জ্যোতির্ম্ময় উত্তর দিল না, মাথা কাত করিয়া জানাইল, "হ্যাঁ।"

দেবযানী পত্রখানার পানে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "এই বুঝি সীতার লেখা ? মেয়েটার হাতের লেখা ভারী সুন্দর—ঠিক মুক্তার মত সাজানো। আমি কাকীমার মুখে শুনেছি, সে না কি অনেকটা লেখাপড়া জানে।

জ্যোতির্ম্ময় অধর দংশন করিয়া মুখ ফিরাইল। দেবযানী তাহার সে ভাব লক্ষ্য করিল না, বলিল, "যাই হোক, এখন তোমার একবার সেখানে যাওয়া উচিত।"

কথা কহিবে না সঙ্কল্প করিলেও জ্যোতির্ম্ময়কে কথা কহিতে হইল, জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

একটু উত্তেজিত হইয়া দেবযানী বলিল,— "কেন কি রকম ? যাওয়া উচিত কি না তা তুমি বুঝতে পারছ না ? তোমার দাদু সম্পত্তির কি রকম ব্যবস্থা করে গেলেন,—"

বাধা দিয়া জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "সম্পত্তির ব্যবস্থা যা করেছেন তা তো শোনা গেছে। তুমিও বেশ জানো—তিনি উইল করে সীতাকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে গেছেন। আজ আর নূতন করে কি শুনতে চাও, বল ?"

রুষ্ট হইয়া দেবযানী বলিল, "শোনা কথায় বিশ্বাস করে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, মূর্খের কাজ। আর যদিও তিনি উইল করে দিয়ে থাকেন, এত সহজে তা মেনে নেওয়া যায় না। সে কোথাকার কে,—কোথা হতে এসে তোমার অগাধ বিষয়-সম্পত্তি ভোগ করবে, আর তুমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জ্জন করে এনে তবে খেতে পাবে। এত সহজে তুমি ছেড়ে দিতে চাও, আমি ছাড়তে পারিনে। কাকীমা সে দিন বেড়াতে এসে যা বললেন তা ঠিক কথা,—এখন শুধু তোমার একটু চেষ্টায় সমস্ত বিষয় পাওয়া যায়, তোমায় সে চেষ্টা নিশ্চয়ই করতে হবে।"

জ্যোতির্ম্ময় মুখ তুলিয়া পত্নীর পানে চাহিল। অন্তর তাহার দুঃখে, ক্ষোভে, ক্রোধে বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। হায় রে, এই তাহার পত্নী, সমসুখ-দুঃখভাগিনী ? আজ তাহার কি গিয়াছে,—তাহার হৃদয় কতখানি ব্যর্থতায়, কতখানি হাহাকারে ভরিয়া গিয়াছে, এ একবার তাহা ভাবিল না। কি গেল, তাহা সে দেখিল না, চাহিল শুধু অর্থের পানে।

এই হৃদয়হীনা নারীকে সে সহধর্ম্মিণী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। এখন সে চাহিতেছে এতটুকু সমবেদনা, এতটুকু সহানুভূতি, কোথায় তাহা পাইবে ? এই হৃদয়হীনার কাছে সমবেদনা যাচ্ঞা করা,—ছিঃ, না,—জ্যোতির্ম্ময় তাহা পারিবে না।

তাহাকে নীরব দেখিয়া দেবযানী জানিয়া লইল সে তাহার কথা ভাবিতেছে। দৃপ্তমুখে সে বলিল, "আমায় তুমি কিছুর মধ্যেই টানতে চাও না, এ তোমার ভারি অন্যায়। আমি আগেই সকলকে বলেছি, ব্যারিষ্টার জে, মিত্র, মিঃ মল্লিক, সকলকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, সকলেই বললেন, একটু চাপ দিলেই সে মেয়েটা সব ফেলে পালাবার পথ পাবে না। তাতেও যদি না যায়, জাল উইল প্রতিপন্ন করতে কতক্ষণ দেরী লাগবে ? তোমার মত লোক বলেই পেছিয়ে যায়। ডাক্তার দত্তের মত সাহসী লোক যদি হত দেখতে—তাহ'লে—"

তীক্ষ্ণ সুরে জ্যোতির্ম্ময় বলিয়া উঠিল, "আমায় ক্ষমা কর দেবযানী, ঘণ্টাখানেক আমায় অনুগ্রহ করে একা থাকতে দাও। এই একঘণ্টা সময় আমি ভেবে ঠিক করে নিই—কি করব।"

দেবযানী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বেশ, আমি যাচ্ছি, আমারও বেশীক্ষণ এখানে থাকবার দরকার নেই। তোমার কিন্তু এ সময় একা থাকা উচিত নয়,—কারও তোমার কাছে থাকা, সান্ত্বনা দেওয়া দরকার। আমি মাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তিনি ততক্ষণ তোমার কাছে থাকুন।"

জ্যোতির্ম্ময় আপত্তি করিবার আগেই সে চলিয়া গেল।

"দাদু !—"

দুই হাত বুকে চাপা দিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে জ্যোতির্ম্ময় ডাকিল, "দাদু, এরা আমায় এতটুকু সময় দেবে না, তোমায় ভাববার এতটুকু অবকাশ দেবে না। বড় ভুল করেছি আমি, আমার সে ভুলের প্রায়শ্চিত্তও তো বড় কঠিন রকমেই হচ্ছে।"

তাহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িল। প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া সে বাঁচিল, তাহার বুকের জমাট ব্যথা যেন পাতলা হইয়া আসিল।

বাড়ীময় রাষ্ট্র হইয়া গেল—জ্যোতির্ম্ময়ের ঠাকুরদাদা, রামনগরের প্রসিদ্ধ জমীদার বিহারীলাল ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। জ্যোতির্ম্ময়ের

শোকসন্তপ্ত চিত্তে অযাচিত সান্ত্বনার ধারা অনেক ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, বড় দুঃখেও জ্যোতির্ম্ময়ের মুখে হাসি আসিল।

মাধবী চিন্তিত মুখে বলিলেন, "সোমবারে শ্রাদ্ধ, এর মধ্যে জ্যোতির একবার সেখানে যাওয়া উচিত। এই তো সোমবার, কাল বাদে পরশু পড়বে।"

সুরেশবাবু ভাল ভাবে বলিলেন, "হ্যাঁ, এ সময় যাওয়া উচিত বই কি, সীতা একা স্ত্রীলোক, বিপদে আত্মহারা হয়ে পড়েছে বলেই খবর দিয়েছে।"

বিরক্ত হইয়া উঠিয়া মাধবী বলিলেন, "সে জন্যে আমাদের ভেবে মাথা গরম করবার দরকার বিশেষ নেই, কি বল জ্যোতি? আমি বলি, এই সময়ে গিয়ে সম্পত্তির ব্যবস্থা করে নেওয়া ভাল!"

হতবুদ্ধিপ্রায় সুরেশবাবু বলিলেন, "সম্পত্তির ব্যবস্থা আবার কি করবে?"

ক্রুদ্ধা মাধবী বলিলেন, "সে আর তুমি কি বুঝবে বল? তোমার কাজ ছেলে ঠেঙানো, তাই কর গিয়ে। সংসারের কিছুই যখন বোঝ না, তখন এর মধ্যে তোমার এসেও দরকার নেই।"

প্রশান্তভাবে সুরেশবাবু বলিলেন, "ছেলে ঠেঙানো বড় সহজ কাজ মনে করো না। তোমাদের মত সাংসারিক জ্ঞান যে আমার নেই, তাতে আমি এতটুকু লজ্জাবোধ করিনে, বরং গর্ব্ব বলে মনে করি। ভগবান আমায় সে রকম বুদ্ধি যে দেন নি, এর জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ দিই।"

কথা শেষ করিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সহাস্য মুখে, প্রশান্ত চোখে সকলের পানে একবার তাকাইয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

মাধবী রাগে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার ঠোঁট দু'খানা কাঁপিতেছিল। দীপ্ত চোখে তিনি স্বামীর দিকে শুধু তাকাইয়া ছিলেন। তাঁহাকে আর একটী কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া সুরেশবাবু বা হির হইয়া গেলেন, বাধ্য হইয়া মাধবীকে রাগ সামলাইতে হইল।

জামাতার দিকে মুখ ফিরাইয়া রুদ্ধকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "দেখলে,—তুমি দেখলে জ্যোতি, কথা বলবার শ্রীটা দেখলে একবার? লোকে বলে ওঁর আমার সঙ্গে কেন এত ঝগড়া হয়,—তারা কি করে' জানবে কেন ঝগড়া হয়। তুমি দিনরাত রয়েছ, কাজেই সব কথা কতকটা জানতে পারছ। আমি কখনও মন্দ কথা বলিনে, কিন্তু অদৃষ্টটা আমার এমনি,—যা বলব তাই মন্দ হয়ে যাবে। কথা বুঝতে পারেন না অথচ সব কথা শোনবার আগ্রহ-টুকু বেশ আছে।"

জ্যোতির্ম্ময় উত্তর দেওয়া শোভন মনে করিল না, মুখ ফিরাইয়া অন্যমনস্ক ভাবে অন্য দিকে চাহিয়া রহিল।

দেবযানী বলিল, "কাকেই বা বলছো মা, সবাই সমান বুঝতে পারে।"

মাধবী বলিলেন, "এ কথা আমি বিশ্বাস করিনে যানী; যে জ্ঞানে পাগল নিজের ভাল বুঝতে পারে—সেই জ্ঞানে জ্যোতিও নিজের ভাল বুঝতে পারবে। আমি জানি,—জ্যোতি হেলায় এত সম্পত্তি হারাবে না। এরই জন্যে এই সোমবারের মধ্যে আমি জ্যোতিকে সেখানে যেতে বলছি। জ্যোতি বলতে পারে, তার দাদু সীতার নামে সমস্ত বিষয় উইল করে দিয়ে গেছেন, কিন্তু কে বলতে পারে,—মরণের আগে তাঁর মত বদলায় নি, তিনি ওই উইল বদলে যান নি? আমি জানি এ রকম ব্যাপার ঘটে থাকে। রাগ মানুষের সব সময়ে সমান থাকে না—হঠাৎ কোন সময়ে উগ্র প্রকৃতিও নরম হয়ে পড়ে।"

জ্যোতির্ম্ময় মাথা নাড়িল, ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, "আপনারা কেউ দাদুকে আমার চাইতে চেনেন না, তাই এ কথা বলতে পারছেন। দাদু যখন যা জেদ করেছেন তা শেষ পর্য্যন্ত অটুট রেখেছেন। আমি অস্বীকার করিনে তাঁর অন্তরে দয়া মায়া প্রভৃতি স্বাভাবিক বৃত্তিগুলো ছিল, কিন্তু এ গুলোকেও তিনি একটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছিলেন; কখনও সীমা ছাড়িয়ে উঠতে দেন নি। এ কখনও বিশ্বাস করবেন না আমি যা হারিয়েছি, আবার তা পেয়েছি—তিনি যা সীতাকে দিয়ে গেছেন, তা আবার ফিরিয়ে নিয়েছেন। তাঁর সকলের চেয়ে ধর্ম্ম বড় ছিল। এই ধর্ম্মের পায়ে তিনি আপনার সর্ব্বস্ব দান করে চলে গেছেন।"

বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর বিকৃত হইয়া উঠিল, সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে মাধবী বলিলেন, "তাই না হয় মেনে নিলুম, তা বলে তিনি বার্দ্ধক্যে যে বুদ্ধিভ্রংশ হন নি, এ কথা মেনে নিতে পারব না। তুমিও কখনও মানতে পারবে না। বুদ্ধিহীনতা বশতঃ তিনি যা করে গেছেন তাই সত্য,—অটুট হয়ে তাই থাকবে। তুমি কি মনে করেছ—অল্পশিক্ষিতা সীতা এত বড় জমীদারীটা

বশে রাখতে পারবে? শুনেছি সে সুন্দরী যুবতী; তার ওপরে সে অভিভাবকহীনা,—কে বলতে পারে সে অসংযতভাবে চলে এই বিশাল জমীদারী দু'দিনে উড়িয়ে দেবে না? বছর দুই বাদে তুমি দেখতে পাবে জ্যোতি, তোমার পূর্ব্বপুরুষের ওই বিশাল সম্পত্তি কি হয়ে গেছে। অভিভাবকহীনা সুন্দরী যুবতীকে বিপথে নিয়ে যেতে কাউকে বেশী কষ্ট সহ্য করতে হবে না।"

অধীর ভাবে জ্যোতির্ম্ময় বলিয়া উঠিল, "থাক, ও সব কথা এখনকার উপযুক্ত নয়। আপনি সেখানে আমায় যেতে বলছেন শুধু সম্পত্তি পাওয়ার জন্যেই তো?"

মাধবী জামাতার কণ্ঠস্বরে রূঢ়তা লক্ষ্য করিলেন; অন্তর তাঁহার তিক্ত হইয়া উঠিল; তিনি বলিলেন, "আমি তোমার বিষয়ের শেষ দিকটা দেখিয়ে দিলুম মাত্র। তোমার সম্পত্তি,—তুমি যা খুসি তাই করতে পার, আমার তাতে আপত্তি নেই।"

জ্যোতির্ম্ময় দুই হাতের মধ্যে মুখখানা রাখিয়া টেবলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি ভাবিতে লাগিল। দেবযানী অবহেলার চোখে একবার স্বামীর পানে তাকাইয়া চলিয়া গেল। মাধবীও উঠিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, চেয়ার সরানোর শব্দে ত্রস্তভাবে জ্যোতির্ম্ময় মুখ তুলিল।

"একটু বসুন, একটা কথা আছে।

মাধবী উদাসভাবে বলিলেন, "আমার কাজ আছে।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "আমি বুঝতে পেরেছি, আপনারা আমার ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কিন্তু কেন যে আমি ওখানে যেতে চাচ্ছিনে, তা আপনারা বুঝতে পারছেন না। শুনেছি, দাদু নিষেধ করে গেছেন ধর্ম্মত্যাগী পৌত্র যেন তাঁর বাড়ীতে পদার্পণ করতে না পারে। সেই জন্যেই তাঁর শ্রাদ্ধের সময় আমি সেখানে যেতে চাইনে। শ্রাদ্ধ মিটে যাক, তার পরে যদি দরকার হয়—"

দৃপ্ত হইয়া উঠিয়া মাধবী বলিলেন, "যদি দরকার হয়, এর মানে—"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "আমি প্রথমে সীতাকে একখানা পত্র লিখতে চাই। যদি সে সহজে দিতে রাজি না হয়, তখন যে-কোন রকমে আদায় করবার চেষ্টা করব। উইল জাল প্রতিপন্ন করতে বেশী কষ্ট পেতে হবে না।"

মাধবী একটু ভাবিয়া বলিলেন, "সেটা মন্দ হয় না। তবে তুমি আজই তাকে একখানা পত্র লিখে দাও, দেখ, সহজে তোমার জিনিস তোমায় ফিরিয়ে দিতে রাজি হয় কি না। যদি না হয়, তবে যাতে উইলখানা উড়িয়ে দিতে পারা যায়, তার চেষ্টা করতে হবে। কাজটা বিশেষ যে কঠিন নয় তা আমি জানি। এ বিষয়ে তোমার কাকীমার মতের সঙ্গে আমার মতের খুব মিল আছে। তিনি যা বলেছেন তা যথার্থ।"

সেই দিনই জ্যোতির্ম্ময় একখানি পত্র লিখিয়া পোষ্ট করিয়া দিল।

৪২

দাদুর মৃত্যু-সংবাদ সীতা সকলকেই দিয়াছিল। জয়ন্তী পত্র পাইয়াই রামনগরে চলিয়া আসিলেন।

চোখের জল মুছিতে মুছিতে তিনি বলিলেন, "আগে খবরটা দিতে হয় সীতা—মরার পরে খবর দিয়ে কোন লাভ নেই। স্বহস্তে তাঁর সেবা করবার যে আশা ছিল, তুমিই সে আশা আমার পূর্ণ হতে দিলে না।"

অপরাধিনীর মতই সীতা চুপ করিয়া রহিল। সে বলিতে পারিল না, বিহারীলালের মৃত্যুশয্যায় সে সকলকেই সংবাদ দিতে চাহিয়াছিল, সে প্রস্তাবে তিনি সম্মত হন নাই। আত্মীয় আত্মীয়া যে যেখানে ছিলেন, সকলেই সংবাদ পাইয়া আসিলেন। সকলকে শুনাইয়া সীতার সমক্ষে জয়ন্তী সজলনেত্রে রুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—কর্ত্তার এত আত্মস্বজন থাকতেও মৃত্যুকালে কেহই তাঁর সেবা করতে পারল না, খবরটা পর্য্যন্ত কেহ পায় নাই। সীতার ছলনাতেই এরূপ ঘটিয়াছে। তাহার উদ্দেশ্য ছিল—যেন মৃত্যু-সময়টায় কেহই কর্ত্তার নিকটে না থাকে, পাছে উইল লইয়া কোন গোলমাল হয়, পাছে কর্ত্তা কাহাকেও কিছু দিয়া যান বা উইল বদলাইয়া দেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

অনেক আক্ষেপ করিয়া শেষকালে সীতার মুখের উপর জলন্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া তিনি বলিলেন, "কিন্তু সে ভয় তোমার ছিল না সীতা। কর্ত্তার আত্মীয়স্বজন কারও এমন নীচ মন নয় যে, ওই সম্পত্তি হতে একটা পয়সা নিতে চাইবে। তোমার মন নিতান্ত ছোট,—ছোট বংশে জন্ম বলেই এত সহজে এই ধারণা করতে পেরেছিলে; যদি সৎ বংশে জন্ম হতো, এমন ধারণা কখনই করতে পারতে না।"

তাঁহার কথার মধ্যে মিষ্টতা এতটুকু ছিল না যদিও কথাগুলি বেশ যোলায়েম করিয়া বলিতেছিলেন। সীতা নীরবে সবই সহিয়া যাইতে লাগিল, একটা কথার প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করিল না। তাহার নীরবতা লক্ষ্য করিয়া সকলেই বলিতে লাগিল, "সীতা ভারি চালাক, তাই কর্ত্তার মৃত্যুর সময় কাহাকেও সংবাদ দেয় নাই।"

প্রশান্তও আসিয়াছিল। সীতাকে লক্ষ্য করিয়া যে যাহা বলিতেছিল, সবই তাহার কাণে আসিয়া পৌছিতেছিল। মনে মনে সে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেও, কাহাকেও একটা কথা বলিতে পারিল না; কারণ সে সীতার ভাই।

কাল বাদে পরশু শ্রাদ্ধের দিন; সীতা ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। দাদুর শ্রাদ্ধকার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপে যাহাতে হয় এই তাহার একমাত্র বাসনা। যত অর্থ-ই ব্যয় হোক, সীতা তাহাতে কাতর নহে।

একা সে সকল দিক সামলাইতে বিব্রত হইয়া উঠিয়াছিল। বাহিরের ভার সুশীলবাবু ও প্রশান্ত লইয়াছিলেন। সীতা জয়ন্তীকে বলিল, "আপনি বাড়ীর ভেতরের ভার নিন কাকীমা। আপনি এদিকে থাকলে আমি নিশ্চিন্ত ভাবে অন্য দিকে যেতে পারি।"

তারস্বরে চেঁচাইয়া উঠিয়া জয়ন্তী বলিলেন, "আমি ওসব কিছু পারি না বাপু, আমায় কেন জড়াতে এসো? নেহাৎ না এলে লোকে কি বলবে তাই এই অসার্থকের আসাও আসতে হয়েছে, নইলে আসতুম কি? দরকার কি বাপু ও সব পরের ভেজাল নিয়ে পরের খরচপত্র হাতে করার? একে আমি বেহিসেবী মানুষ, দু'পয়সার যায়গায় চার পয়সা খরচ করে বসব, তখনি বলে বসবে—কাকীমা চুরি করেছে। রক্ষে কর বাপু, সবই তো হয়েছে, এখন পরের ধনে পোদ্দারী করে চোর অপবাদ না মাথায় নিতে হয়।"

সীতা তাঁহার মুখের উপর দুইটী বেদনাভরা চোখের দৃষ্টি বারেকের তরে তুলিয়া ধরিল। হৃদয়ে তুফান উঠিয়াছিল, মুখে তাহার একটুও ভাবান্তর দেখা গেল না।

শ্লথপদে সে নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজা ভেজাইয়া দিয়া জানালার কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সে বেশ বুঝিতেছিল, দাদু যে তাহাকে তাঁহার বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, শুধু সেই জন্যই সে সকলের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছে। ইহারা বুঝিবে না—এই বিষয় তাহার বুকের উপর ভারী যাঁতার ন্যায় বসিয়া আছে। যাহার জিনিস তাহাকে ইহা দিতে পারিলে সে এখন শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে। প্রকৃত অধিকারী যে মুহূর্ত্তে আসিবে, সেই মুহূর্ত্তে সে সব তাহাকে বুঝাইয়া দিয়া সরিয়া যাইবে। সে নিঃসম্বল,—একবস্ত্রে এ বাড়ীতে আসিয়াছিল, তেমনি একবস্ত্রেই চলিয়া যাইবে,—এখানকার এতটুকু কিছু সে লইয়া যাইবে না। প্রকৃত অধিকারী কবে আসিবে, সে যে সেই প্রত্যাশায় রহিয়াছে, তাহা জানিবে কে?

এখন কোন ক্রমে শ্রাদ্ধের ব্যাপারটা মিটিয়া গেলে সে নিজেই জ্যোতির্ম্ময়কে এখানে আসিবার জন্য পত্র দিবে, জ্যোতির্ম্ময়কে সব দিয়া সে সরিয়া যাইবে। দাদুর অনুমতি সে পাইয়াছে, আর কি চাই।

নিমন্ত্রিতগণ যে ভাবে সীতার কার্য্যের সমালোচনা করিতেছিলেন, তাহা বাড়ীর দাস-দাসীদের পর্য্যন্ত অসহ্য বোধ হইতেছিল। সীতাকে নির্জ্জনে পাইয়া রুদ্ধকণ্ঠে ক্ষমা বলিল, "আপনি এত কথা সয়ে যাচ্ছেন কি করে দিদিমণি? আপনাকে এঁরা যা না তাই বলছেন, আমরা যে তা সহ্য করতে পারছিনে।"

হাসিমুখে সীতা বলিল, "বলুন না—বললে পরে আমার এমন কিছু ক্ষতি তো হবে না ক্ষমা। বলে ওঁরা শান্তি পাচ্ছেন, আমি চুপ করে সয়ে যাব। যদি এইটুকুই না সহ্য করতে পারব, তবে মানুষ হয়ে জন্মেছি কেন বল তো?"

ক্ষমা বলিল "কথাগুলো যে বড় খারাপ দিদিমণি?"

সীতা বলিল, "আমার কাছে কিছুই খারাপ নয়, কিছু অসহ্য নয়। আমি যেদিন জেনেছি দাদু আমার নামে বিষয় উইল করে দিয়ে গেছেন, সেইদিনই বুঝেছি আমায় এর জন্যে ঢের সইতে হবে। যতদিন না জের মেটে আমার কর্ম্মফলের—ততদিন আমায় এই সংসারে এমনিভাবে বদ্ধ হয়ে থাকতে হবে। যাঁর জিনিষ তিনি যেদিন আসবেন তাঁর সব তাঁকে বুঝিয়ে দিয়ে সেইদিনে মুক্তি নিয়ে যাব।"

বিস্ময়ে ক্ষমা বলিল, "কে আসবে দিদিমণি? দাদাবাবুকে কর্ত্তাদাদা যে,—"

বাধা দিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে সীতা বলিল, "আমি সে অনুমতি নিয়েছি ক্ষমা? দাদু আমায় বলে গেছেন,

যদি তিনি আসেন, তাঁকে আমি সব দিয়ে মুক্তি পেতে পারব। আমি সেইদিনের প্রতীক্ষায় আছি,—খবর দিয়েছি, আবার খবর দেব। এতটা সম্পত্তির লোভ কেউ সামলিয়ে থাকতে পারে না, তাঁকে আসতেই হবে।"

ক্ষমা বলিয়া উঠিল, "এত সম্পত্তি আপনি হাতে পেয়ে ছেড়ে দেবেন দিদিমণি?"

সীতা হাসিল,—"আমি কে ক্ষমা? আমি কোন দিন এ ভার বইতে চাইনি—প্রস্তুতও হইনি,—দাদু জোর করে আমার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে গেছেন। আমি কে,—আমার কি আছে যার জন্যে আমার অর্থের দরকার হবে? আমার কোন দরকার নেই, সামান্য কিছু পেলেই আমার পর্য্যাপ্ত হয়ে যায়, এত বড় জমীদারী নিয়ে আমি কি করব?"

মহা ধুমধামে বিহারীলালের শ্রাদ্ধ সমাপ্ত হইয়া গেল। কাশী, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে অধ্যাপকগণ আসিয়াছিলেন, তাঁহারা আশাতীত অর্থ পাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন। আত্মীয় আত্মীয়াগণ একে একে বিদায় লইলেন। জয়ন্তী বিদায়ের পূর্ব্বে মাটীতে আছড়াইয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া খানিক কাঁদিলেন; পরের হাতে সব দিয়া নিজের বাড়ী হইতে আজ যে তাঁহাকে পরের মত বিদায় লইতে হইতেছে, তাঁহার বিলাপের বিষয় ইহাই ছিল।

সীতা দ্বিতলের রেলিংয়ে ভর দিয়া আড়ষ্টভাবে তাঁহার পানে চাহিয়া ছিল। জয়ন্তী বক্ষে করাঘাত করিয়া কাঁদিয়া বলিয়া গেলেন,—"ধর্ম্মে সইবে না, ধর্ম্মে সইবে না। ফাঁকি দিয়ে পরের জিনিস নেওয়া, মানুষে সইলেও ধর্ম্মে সইতে পারবে না। ও উইল জাল,—আমি শুনেছি বাবা মরবার আগে আসল উইল করে গেছেন; সে উইল লুকিয়ে ফেলেছে। দেখে নেব, আমরাও অমে ছাড়ব না। যে কয়টা দিন হেস্তনেস্ত না করতে পারি, সেই কয়দিন হেসে খেলে বিষয় ভোগ করে নাও, তার পর এক কাপড়ে বার হতেই হবে। শ্রীধর যদি সত্য হন, তবে নিজের পূজারীর বংশধরের হাতের পুজোই নেবেন, পরের পুজো কখনই নেবেন না। বুড়ো মানুষ পেয়ে ডাইনীর মায়ায় ভুলিয়ে সকলের সর্ব্বনাশ করা—ধর্ম্মে সইবে না।"

সীতার মুখে একটা কি কথা আসিয়াছিল, কিন্তু সে তাহা চাপিয়া গেল, একটু হাসি শুধু তাহার ওষ্ঠাধরে ভাসিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল।

যাক, দাদুর শ্রাদ্ধ যে সে ভালরূপে সমাধা করিতে পারিয়াছে, এই বড় আনন্দের কথা, শ্রীধরের যাহা ইচ্ছা তাহা পূর্ণ হোক। সে কে,—সামান্য মানুষ বই তো নয়; তাহার ক্ষমতা কি, যে সে দেবতার অভিপ্রায় বুঝিবে? তাঁহার যদি ইচ্ছা হয়, জ্যোতির্ম্ময়ের হাতের পূজা তিনি গ্রহণ করিবেন। নারায়ণ, তাহাই যেন হয়, যে চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া তাহার হাতের পূজা তুমি গ্রহণ কর।

৪৩

জ্যোতির্ম্ময়ের পত্র আসিয়া পৌছিল।

স্ত্রীর উপর অত্যন্ত রাগ করিয়া জ্যোতির্ম্ময় সেই রাগ সীতার উপরে ঝাড়িয়াছিল। পত্রখানা কটূক্তিতে পূর্ণ। দুর্ভাগ্য—সীতা তাহার অন্তরের প্রকৃত ভাব বুঝিতে পারিল না; পত্রখানা পাইয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

হাঁ, এই উচিত প্রাপ্য তাহার। জ্যোতির্ম্ময় স্পষ্টই তাহাকে প্রতারিকা বলিয়াছে, ছলনাময়ী রাক্ষসী বলিয়াছে,—এই তাহার সম্মাননীয় পদ বটে। নিষ্ঠুর,—নিষ্ঠুর, কেমন করিয়া এ কথা বলিলে গো,—কেমন করিয়া তুমিও ভাবিলে সীতা বৃদ্ধ দাদুকে মোহজালে আচ্ছন্ন করিয়া সমস্ত বিষয় নিজের নামে লিখাইয়া লইয়াছে? ওগো, তুমি জানো না, সীতা তোমার সম্পত্তি যক্ষের মত আগলাইয়া বসিয়া আছে; তোমার এ পত্র পাওয়ার অনেক আগেই সে ভাবিয়াছে তোমার জিনিস তোমাকেই সে অর্পণ করিবে।

না, সীতা আর ভাবিতে পারে না, আর ভাবিবার শক্তি তাহার নাই। শ্রীধর, তোমার উপযুক্ত সেবা হয় তো হইবে না, সে অপরাধ তো সীতার নয় প্রভু। তুমি নিজেই নিজকে পূজা হইতে বঞ্চিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছ, নহিলে বহুকাল আগে জ্যোতির্ম্ময় কেন চলিয়া যাইবে, কেন ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবে?

জগতে সকলের উপেক্ষা সহ্য করা যায়, যায় না তাহার—যাহাকে যথার্থ ভালবাসা যায়। যে জন্য মাতা সন্তানের উপেক্ষা সহিতে পারেন না; স্ত্রী স্বামীর উপেক্ষা সহিতে পারে না; সেই কারণে সীতাও জ্যোতির্ম্ময়ের উপেক্ষা সহিতে পারিল না।

সে তখনই জ্যোতির্ম্ময়কে পত্র লিখিতে বসিল।

দৃঢ়তার সহিত জানাইল, সে মায়াবিনী নহে, মায়াতে বশ করিয়া বৃদ্ধকে দিয়া নিজের নামে সম্পত্তি লিখাইয়া লয় নাই। তিনি পৌত্রের ব্যবহারে নিরতিশয় ব্যথিত হইয়াই সীতার নামে স্বইচ্ছায় সমস্ত সম্পত্তি লিখিয়া দিয়াছিলেন। একমাত্র ভগবান ছাড়া আর কেহ জানে না, সীতা স্বইচ্ছায় ইহা লইয়াছে কি না। সে এ ভার বহিতে পারিবে না বলিয়াই দাদুর মৃত্যুসময়ে তাঁহার অনুমতি চাহিয়া লইয়াছে,—জ্যোতির্ম্ময়ের সম্পত্তি জ্যোতির্ম্ময়কে ফিরাইয়া দিবে। শ্রাদ্ধ সে করিয়াছে। এখন এক সপ্তাহের মধ্যে সে চলিয়া যাইবে। জ্যোতির্ম্ময় যেন সত্বর আসিয়া তাহার সম্পত্তি গ্রহণ করে। তাহার বিশেষ অনুরোধ, দাদুর শেষ ইচ্ছা শ্রীধরের সেবার যেন হানি না হয়।

পত্রখানা তখনই পোষ্ট করিতে পাঠাইয়া সে প্রশান্তকে ডাকিয়া পাঠাইল।

"দাদা আমায় নিয়ে যেতে হবে সঙ্গে করে। তুমি আজই যাবে বলছ, আর দু'দিন থাক, আমি এদিককার বন্দোবস্ত কতকটা ঠিক করে ফেলি।"

অবাক হইয়া গিয়া প্রশান্ত বলিল, "সে কি রে, তুই কোথায় যাবি?"

উদ্গতপ্রায় অশ্রু অতি কষ্টে চাপিয়া জোর করিয়া মুখে হাসি ফুটাইবার বৃথা চেষ্টা করিয়া সীতা বিকৃত স্বরে বলিল, "কেন তোমার সঙ্গে—তোমার কাছে থাকব। কেন দাদা! একদিন তো নিয়ে যাওয়ার জন্যেই এসেছিলে—আজ নিয়ে যেতে পারবে না? তোমার ক্ষেতে সোণা ফলে—তোমার বোন কি দু'টো ভাত খেতে পাবে না? তোমার বোন চরকায় সুতো কাটবে, তোমার তাঁতে তার কি একখানা কাপড় বোনা হবে না? জগতে সবাই তোমার বোনকে মায়াবিনী বলে ঘৃণা করবে, তুমি কি তোমার বোনকে সত্যি বলে কোলে টেনে নেবে না?"

অশ্রু আর গোপন রহিল না, উছলাইয়া আরক্ত গণ্ড ভাসাইয়া হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিল।

"সীতা—সীতা,—"

আত্মহারা প্রশান্ত বোনকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইল। তাহার কোলের মধ্যে মুখখানা লুকাইয়া সীতা ক্ষুদ্র বালিকার মতই ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

এতদিনকার এত ঝড় তুফান তাহার উপর দিয়া চলিয়া গেলেও যে অটুট দাঁড়াইয়া ছিল, আজ সে ভাঙ্গিয়া পড়িল কেন, তাহা প্রশান্ত বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সে ব্যাকুল ভাবে সীতার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কি হয়েছে ভাই, তুই এমন করছিস কেন?"

সীতা চোখ মুছিয়া মুখ তুলিল, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "আর সইতে পারলুম না দাদা, বড় অসহ্য হয়ে উঠেছে, তাই সব ছেড়ে পালিয়ে যেতে চাচ্ছি। আর কারও কথা সইতে পারছি নে দাদা—"

বলিতে বলিতে আবার সে মুখ লুকাইল।

পত্রখানা তাহার হাতের মধ্যে ছিল, সেখানা প্রশান্তের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া সে নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল। তাহাকে দেখিবার জন্য সীতা যে পত্রখানা ফেলিয়া দিল, তাহা প্রশান্ত বেশ বুঝিল। কৌতূহলাক্রান্ত ভাবে সে পত্রখানা তুলিয়া লইল।

পড়িতে পড়িতে তাহার মুখখানা অন্ধকার হইয়া উঠিল, চোখ দুইটি আগুনের মত জ্বলিতে লাগিল। তাহার এমন বোনের এত অপমান? কেহ সীতাকে চিনিল না, সকলেই তাহাকে যাহা না বলিবার তাহাই বলিয়া গেল? কেহই বুঝিল না, সে কতখানি ত্যাগ করিয়া গেল,—সর্ব্বস্ব দিয়াও সে পরের জিনিস রক্ষা করিতেছে?

"সীতা!—"

তাহার সেই কর্কশ কণ্ঠস্বরে চমকাইয়া সীতা মুখ তুলিল, তখনই সে আবার মুখ লুকাইল।

প্রশান্ত বলিল, "বুঝেছি—তুই যেতে চাচ্ছিস কেন। সকলের সব কথা তুই সহ্য করে গেছিস, এর কথা তুই সহ্য করতে পারছিসনে? কিন্তু না বোন, সকলের কথা যেমন করে হেসে উড়িয়ে দিয়ে এসেছিস, এর কথাও তেমনি করে উড়িয়ে দিতে হবে। সে যা খুসি তাই বলে যাক,—মনে করে রাখিস—এখনও সে আরও অনেক কথা বলতে পারে। সে তোকে মোটে সহ্য করতে পারছে না, কারণ তুই তার সম্পত্তির অধিকারিণী হয়েছিস। এই একখানা পত্র পেয়ে ভয় পেয়ে তুই পেছিয়ে যাবি,—না, তা হ'তে পারে না সীতা, আমি তা হ'তে দেব না।"

সীতা চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল; দুই হাতে এলায়িত বিপুল কেশরাশি জড়াইয়া শান্ত দৃষ্টি প্রশান্তের মুখের উপর ফেলিয়া শান্তকণ্ঠে সে বলিল, "না দাদা, তোমারই বোন আমি, এতটুকু আত্মমর্য্যাদা বোধ আমার আছে—যাতে এ সব কথা

যথেষ্ট অপমানকর বলেই মনে হয়। কেন ওদের এত কথা বলতে অবকাশ দেব দাদা? মুক্ত জীব আমি, এ বাঁধন আমার একেবারেই অসহ্য। এ বোঝা আমি বইতে পারব না বলেই দাদুর মৃত্যু-শয্যায় তাঁর অনুমতি নিয়েছি—তাঁর পৌত্র যদি ফিরে আসে, তবে তাঁর সব তাঁকে দিয়ে দেব। এ পত্র যদি না-ও আসত, আমি তাঁকে আসতে পত্র দিতুম। আমার তো কিছুই দরকার নেই দাদা, দু'খানা কাপড়, একবেলা চারটী ভাত—এ যেখানেই থাকব সেখানেই পাব। আমি কেন এ ভূতের বোঝা বয়ে মরি বল তো?"

"সীতা,—"

বাধা দিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে সীতা বলিল, "না দাদা, এর পরে আর কোন কথা বলো না। আমি কথা বলবার কোন পথ রাখিনি,—পত্র পাওয়া মাত্র পত্র লিখে দিয়েছি যেন তিনি শীঘ্র চলে আসেন, এসে তাঁর সব বুঝে নেন। আমি জানিয়েছি—সাত দিনের মধ্যে যে কোন দিন আমি চলে যাব।"

"দিদি,—সীতা,"

দীপ্ত চোখের দৃষ্টি ধীরে ধীরে কোমল হইয়া আসিল। আর্দ্রকণ্ঠে প্রশান্ত বলিল, "বেশ করেছিস বোন! তুই চিরমুক্ত—বন্ধনে জড়াবার জন্যে তুই সৃজিত হোস নি। সত্যই ভাল কাজ করেছিস তুই,—দরকার কি পরের বোঝা ঘাড়ে করে আজীবনকাল বয়ে বেড়াবার? তোর দাদার ঘরে যথেষ্ট জায়গা আছে ভাই, ধান চালেরও অভাব নেই। গরীবের ছেলেমেয়ে আমরা, খাটতে এসেছি—খেটে নিজেদের জীবিকার্জ্জন করব, পরের দেওয়া ধনে ধনী হতে চাইনে। তোর দাদার ঘরে অনেক কাজ আছে। মা থাকতে তিনি সব করতেন। তিনি গিয়ে এই একটা বছর আমি যে কি কষ্টে দিন কাটাচ্ছি, তা মুখ ফুটে কোন দিন তোকে না বললেও আজ বলে ফেলছি। তুই আমার ঘরে চল বোন, আমরা দুই ভাই বোনে কাজ করব। ভগবানের পবিত্র আশীর্ব্বাদ তুই—তোকে যে আমি এমন করে কুড়িয়ে পাব তা কোনদিন ভাবিনি।"

উৎসাহের সঙ্গে সীতা যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিল। সীতা সমস্ত অধিকার ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে—সংবাদটা বিদ্যুৎবেগে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। হাঁফাইতে হাঁফাইতে ছুটিয়া আসিয়া সুশীলবাবু বলিলেন, "এ কি কথা শুনতে পাচ্ছি সীতা, তুমি না কি সব ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছো? এ কুমতি তোমার কেন হল?"

সীতা হাসিল, "কুমতি নয় দাদা, সুমতি বলুন। কুমতি হলে এত বিষয় নিয়ে তা আবার ছেড়ে দিতে পারতুম না। আশীর্ব্বাদ করুন, শেষ পর্য্যন্ত আমার মন যেন এমনি অনাসক্ত থাকে, লোভে পড়ে যেন আপনার ইহকাল পরকাল নষ্ট করে ফেলিনে।"

হতবুদ্ধিপ্রায় সুশীলবাবু তাহার উজ্জ্বল মুখখানার পানে তাকাইয়া রহিলেন; একটু থামিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "যাকে তিনি অযোগ্য বলে ত্যাগ করে গেছেন, তুমি আবার তাকেই সব দিয়ে যাচ্ছো সীতা? আপনার যা কিছু, তা এমন করে নষ্ট করছো?"

শান্ত কণ্ঠে সীতা বলিল, "আমার কি দাদা; আমি নিজেই নিজের নই, তখন নিজের কি বলব। আমার বলতে সংসারে কিছুই যে নেই, তা তো জানছেন দাদা। যা আসছে আসুক, যাচ্ছে যাক—আমি তাতে বাধা দিতে এতটুকু চেষ্টা করব না; কারণ, সবই ভগবানের ইচ্ছায় হ'চ্ছে,—মানুষের রোধ করবার ক্ষমতা নেই। আপনি তো জানেন, দাদু তাঁকে শেষ সময়ে ক্ষমা করে গেছেন। আমি তাঁর জিনিস তাঁকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যাই।"

হতাশ ভাবে সুশীলবাবু বলিলেন, "তবে আমারও তো থাকা হয় না,—আমিও কাজে জবাব দেব।"

সীতা বলিল, "আপনি কেন কাজে জবাব দেবেন দাদা? তিনি জমীদারীর ভার হাতে নিয়েও আপনাকে ছাড়বেন না; কারণ, আপনি অনেক কাল সুশৃঙ্খলতার সঙ্গে এই জমীদারীর কাজ চালাচ্ছেন। আপনাকে ছাড়লে তাঁর যে অনেক ক্ষতি হবে, তা তিনি বেশ বুঝবেন।"

সুশীলবাবু বলিলেন, "না সীতা, স্বেচ্ছাচারীর কাজে আমি থাকতে পারব না। যে সংসারে একদিন ধর্ম্মের আসন ছিল, সেই সংসার পাপে ভরে উঠবে, আমি তা দেখতে পারব না। স্বর্গীয় কর্ত্তা কোন দিনই আমায় চাকর বলে ভাবেন নি, নিজের ছেলের মত আমায় দেখেছেন; জ্যোতির্ম্ময়বাবু আমায় যে তেমন চোখে দেখবেন না, এ জানা কথা। অতখানি কুণ্ঠিত ভাবে আমি থাকতে পারব না; কাজেই আমি জবাব দেব।"

সীতা বলিল, "গেলেও, তিনি এসে সব বুঝে না নিলে আপনি যেতে পারবেন না। তাঁর আয়-ব্যয়, হিসাবপত্র সব বুঝিয়ে দিয়ে তবে আপনাকে যেতে

হবে। আমি চলে গেলেই তিনি আসবেন। আমি থাকতে তিনি আসবেন না; কারণ তিনি আমায় এড়িয়ে চলতে চান।"

দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ সীতার কাছে আসিতে লাগিল। সকলেই কাতর কণ্ঠে তাহাকে থাকিবার অনুরোধ করিতে লাগিল। সে হঠাৎ কেন চলিয়া যাইতেছে, তাহা জানিবার জন্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল। সীতা তাহাদের মিষ্ট কথায় বুঝাইল, যে তাহাদের প্রভু, সে আসিতেছে, তাঁহাদের ভাবনার কোন কারণ নাই। জ্যোতির্ম্ময় এই বংশেরই ছেলে, পিতামহের নিকট সে নীতিশিক্ষা করিয়াছে, প্রজাদের উপর অত্যাচার করিতে সে কখনই পারিবে না। সীতাও মাঝে মাঝে আসিয়া দেখিয়া যাইবে।

চোখের জলে ভাসিয়া সকলে সীতাকে বিদায় দিল। সীতাও চোখের জল ফেলিয়া শ্রীধরের ভার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মাথায় চাপাইয়া প্রশান্তের সহিত রামনগর ত্যাগ করিল।

সীতা যেদিন গেল, সেই দিন বৈকালে জ্যোতির্ম্ময়ের টেলিগ্রাম আসিয়া পৌছিল। জ্যোতির্ম্ময় আগামী কল্য আসিতেছে,—ষ্টেশনে যেন পাল্কী-বেহারা রাখা হয়। সে দুই দিনের বেশী থাকিতে পারিবে না। এই দুই দিনের মধ্যে যাহাতে প্রজাদের সহিত তাহার পরিচয় হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিবার জন্য সে ম্যানেজারকে আদেশ করিয়া পাঠাইয়াছে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সুশীলবাবু তাহার আদেশ পালন করিতে তৎপর হইলেন।

৪৪

নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে জ্যোতির্ম্ময় দেশের বাটীতে পদার্পণ করিল।

সে যে এই সম্পত্তি লইতে কতটা কুণ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা কেহই বুঝে নাই। যখন সীতাকে সে পত্রখানা লিখিয়াছিল, তখন সীতার উপর তাহার যথেষ্ট ক্রোধ হইয়াছিল। সে কে, কোথা হইতে আসিয়া দাদুর সারা বুকখানা জুড়িয়া বসিল, —তাই না দাদু তাহাকেই যথাসর্ব্বস্ব দিয়া গেলেন! সে যদি না লইত, তবে দাদু হয় তো তাঁহার বিশাল সম্পত্তি দেশের ও দশের উপকারার্থ দান করিয়া যাইতেন। সেই ভাল হইত।

সীতার পত্রখানা যখন তাহার হাতে আসিয়া পড়িল, তখন তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। ছি ছি, সে করিয়াছে কি,—এই সীতাকে সে কি লিখিয়াছিল? এমন উন্নত-হৃদয় যাহার, তাহাকে সে কত কি না বলিয়াছে!

সীতা লিখিয়াছে, সাত দিনের মধ্যে সে রামনগর ত্যাগ করিবে,—জ্যোতির্ম্ময় যেন আসিয়া তাহার সম্পত্তি গ্রহণ করে।

এ জমীদারী লইয়া জ্যোতির্ম্ময় করিবে কি,—কি প্রয়োজন তাহার ইহাতে? সীতা দাদুর কাছে জমীদারী চালনা যাহা শিখিয়াছে, জ্যোতির্ম্ময় তো কিছুই শিখিতে পারে নাই। দাদু সীতাকে সব দিয়া গিয়াছেন, জ্যোতির্ম্ময় মৃতের অবমাননা করিবে—তাঁহার দান কাড়িয়া লইবে? দাদু যাহাকে সিংহাসনে বসাইয়া গিয়াছেন, সে তাহাকে কঠিন ধাক্কা দিয়া ধূলায় ফেলিয়া দিবে? দাদু—স্নেহময় দাদু, উপর হইতে তুমি জ্যোতির্ম্ময়ের এই নিষ্ঠুর আচরণ দেখিতেছ,—তোমার অন্তর ফাটিয়া যাইতেছে। না, জ্যোতির্ম্ময় জোর করিয়া তোমার দান কাড়িয়া লইবে না, লইতে পারিবে না! সে রামনগরে যাইবে, সীতাকে সব কথা বলিয়া তাহার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। সে কি সব জানিয়া ক্ষমা করিবে না? নিশ্চয়ই ক্ষমা করিবে। তাহার মন নীচ নয়, সে দেবী,—জ্যোতির্ম্ময়ের দোষ সে লইবে না—লইতে পারিবে না।

ঠিক এই উদ্দেশ্য লইয়াই জ্যোতির্ম্ময় রামনগরে পদার্পণ করিল। নূতন জমীদারের সম্বর্দ্ধনা করিতে দেশের ছোট বড় সকলেই আসিয়াছিল। তাহারা পূর্ব্ব হইতে বিলাতফেরত জ্যোতির্ম্ময়ের আকৃতি প্রকৃতি কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল। যখন দেখিল, সে হ্যাট-কোট-প্যাণ্টে সুশোভিত নহে,—তাহাদের মধ্যে কাহাকেও প্রণাম করিল, কাহাকেও আলিঙ্গন করিল, ছোটদের মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিল, তখন সকলের মন আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল। সুশীল বাবু প্রথমে সঙ্কুচিতভাবে একটু তফাতে সরিয়া ছিলেন। জ্যোতির্ম্ময় তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল।

বাড়ীর মঙ্গল-সংবাদ সে লইল। পৃথক ভাবে সীতার কথা সে কিছুতেই জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না; সে কথা তুলিতে গিয়া সঙ্কোচে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। মনে পড়িল, যে সীতাকে সে অপমান করিয়াছে, সুশীলবাবু সেই সীতারই আত্মীয়।

জমীদারবাটী বড় সুন্দর রূপে সাজান হইয়া-

ছিল। দেবদারুপাতায় ও নানা জাতীয় ফুলে প্রকাণ্ড গেট ঝলমল করিতেছিল। গেটের দুই পার্শ্বে বন্দুকধারী দ্বারবানগণ দাঁড়াইয়া ছিল,—জমীদার বাটীতে পদার্পণ করিবামাত্র সকল বন্দুক হইতে একত্রে আওয়াজ হইল।

সুশীলবাবুর দিকে মুখ ফিরাইয়া বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "এ সব কি কাণ্ড সুশীল বাবু, এতটা বাড়াবাড়ি করা আপনার পক্ষে উচিত হয় নি।"

মাথা চুলকাইয়া সুশীলবাবু বলিলেন, "সীতার আদেশমত এ সব হয়েছে জ্যোতিবাবু,—আপনি আসচেন জেনে সে যা আদেশ করেছে সেই মত কাজ হচ্ছে।"

সীতার কথা উঠিবামাত্র জ্যোতির্ম্ময় চুপ করিয়া গেল।

বহির্ব্বাটী অতিক্রম করিয়া সে যখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল, তখন পূর্ব্বস্মৃতিতে তাহার সারা অন্তর পূর্ণ হইয়া গিয়াছে,—তাহার চোখের পাতা চকচক করিতেছে।

দাদুর ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া সে ভিতর পানে চাহিল। শূন্য ঘর হা হা করিতেছে। সবই রহিয়াছে; দাদুর সেই খাট পাতা, পার্শ্বে ছোট চৌকিটীর উপর আগেকার মতই গড়গড়া পড়িয়া আছে; আলনায় দাদুর কাপড় জামা আগে যেমন থাকিত, এখনও তেমনই সাজান রহিয়াছে। এক কোণে টিপয়ের উপর পরিবারের কয়খানি ফটো রহিয়াছে,—মাঝখানে দাদুর বৃহৎ অয়েলপেন্টিংখানি দেয়ালের গায়ে শোভা পাইতেছে। কোন একদিন সীতা আধফুটন্ত গোলাপের মালা গাঁথিয়া চিত্রটীকে সুশোভিত করিয়াছিল, আজ সে মালা শুকাইয়া গিয়াছে। দাদুর খড়ম জোড়াটা পার্শ্বেই একখানা ছোট চৌকির উপর সযত্নে রক্ষিত;—এখনও শুষ্ক ফুল তাহার উপর পড়িয়া, চন্দনের দাগ লাগিয়া আছে। দেখিয়া জানা যায়—পূজারিণী কেহ আছে, নিভৃতে থাকিয়া সে পূজা করিয়া যায়।

সবই পড়িয়া আছে, নাই শুধু দাদু। শূন্য বাতাস দক্ষিণের জানালা দিয়া আসিয়া ঘরের মাঝে ব্যর্থতায় লুটাপুটি খাইয়া কাঁদিয়া যাইতেছে—কেহ নাই, ওগো কেহ নাই।

জ্যোতির্ম্ময় ভক্তিভরে নতজানু হইয়া বসিল। মাথা নত করিয়া প্রণাম করিল। দু' ফোঁটা চোখের জল সঙ্গে সঙ্গে ঝরিয়া পড়িল।

হৃদয়ের আবেগ প্রশমিত হইলে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। সুশীলবাবুর পানে তাকাইয়া মলিন হাসিয়া বিকৃত কণ্ঠে বলিল, "ঘরে ঢোকবার অধিকার আমার নেই; তাই দরজার কাছ হতে প্রণাম করলুম। চলুন, মায়ের ঘরে যাব।"

মায়ের ঘরের দরজা বন্ধ ছিল, সুশীলবাবু খুলিয়া দিলেন। জুতা বাহিরে খুলিয়া রাখিয়া ভক্ত যেমন নত মস্তকে দেবমন্দিরে প্রবেশ করে, তেমনই করিয়া জ্যোতির্ম্ময় প্রবেশ করিল।

সেই ঘর,—এই ঘরেই সে মায়ের কোলে মাথা দিয়া শুইয়া থাকিত। কি শান্তিময় মায়ের কোল! আজ জ্যোতির্ম্ময়ের মনে হইতেছে যদি মা থাকিতেন। সে বহু কাল পরে বাড়ী ফিরিয়াছে,—আজ সেই স্নেহশীলা মা কই! যখন সে কলিকাতায় থাকিত, যখন বাড়ী আসিবার কথা হইত, মা তখন কত আগ্রহে এই দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিতেন,—ওই পথের উপর তাঁহার ব্যাকুল দুইটী চোখের দৃষ্টি পড়িয়া থাকিত। পুত্র আসিবামাত্র তাহাকে তিনি গভীর স্নেহে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিতেন,—তাঁহার আনন্দাশ্রু ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পুত্রের মাথার উপর পড়িত। সে বড় হইয়াও মায়ের বুকের মধ্যে মুখখানা রাখিয়া যে তৃপ্তি, যে শান্তি পাইয়াছিল, সে তৃপ্তি সে শান্তি আর পাইল না।

হতভাগ্য সন্তান ধৈর্য্য রাখিতে পারিল না, যে স্থানটীতে মা শুইতেন, সেই স্থানে লুটাইয়া পড়িল।

কোথায় আজ তৃপ্তিদায়িনী জননি! কোথায় আছ তুমি, একবার এসো মা! তোমার অপরাধী পুত্র বহু কাল পরে ফিরিয়া আসিয়াছে মা, আজ তুমি কোথায় লুকাইয়াছ? তোমার জ্যোতির মুখ একটু মলিন দেখিলে তুমিও ব্যাকুল হইয়া উঠিতে,—কিসে তাহার মুখে হাসি ফুটাইতে পারিবে, তাহাই ভাবিতে। আজ সে হৃদয়ে দুঃসহ বেদনার বোঝা লইয়া অধীর হইয়া উঠিয়াছে,—মনের কথা তাহার শুনিতে আজ কেহ নাই। কোথায় রহিলে মা! তোমার শান্তিমাখা হাত দু'খানি জ্যোতির জ্বালাপূর্ণ বুকে একবার রাখ, তাহার বুক শীতল হইয়া যাক।

দুই হাতের মধ্যে মুখখানা রাখিয়া ক্ষুদ্র বালকের মত উচ্ছ্বসিত হইয়া জ্যোতির্ম্ময় কাঁদিতেছিল। এখানে তাহাকে বিদ্রূপ করিতে কেহ নাই,—এখানে সে শিক্ষিত সমাজবাসী নয়, গোপনতার আড়ালে তাহাকে লুকাইয়া থাকিতে হইবে না।

সুশীলবাবু সরিয়া গিয়া বারাণ্ডার ধারে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহার মনটাও বড় উদাস হইয়া গিয়াছিল।

অনেকক্ষণ পরে জ্যোতির্ম্ময়ের আহ্বান শুনিতে পাইলেন, "সুশীলবাবু—"

সরিয়া আসিয়া সুশীলবাবু দরজার উপর দাঁড়াইলেন।

কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "সীতা কোথায়; তাকে একবার ডাকুন তো।"

সুশীলবাবু বলিলেন, "সীতা? সে তো চলে গেছে।"

"চলে গেছে?" বিস্ময়ে নির্ব্বাক জ্যোতির্ম্ময় খানিক সুশীলবাবুর পানে তাকাইয়া রহিল। কি একটা কথা তাহার মুখে আসিতেছিল, সে তাহা সামলাইয়া গেল।

সুশীলবাবু বলিলেন, "সীতা কাল সকালে এ বাড়ী হতে চলে গেছে।"

"তবে যে আপনি তখন বলছিলেন—আমার অভ্যর্থনার যোগাড় সীতা করেছে?"

সুশীলবাবু বলিলেন, "সে কথা মিথ্যে নয়। আপনি আসবেন জেনে সীতা আমায় অভ্যর্থনার আয়োজন করতে বলেছে, সেই কথা অনুসারে কাজ করেছি। তার দাদা প্রশান্তের সঙ্গে সে কাল সকালে চলে গেছে।"

জ্যোতির্ম্ময় অধর দংশন করিল। সমস্ত মনটা তাহার চিন্তায় ভরিয়া উঠিল।

চলিয়া গেল,—সত্যই সে চলিয়া গেল, জ্যোতির্ম্ময়ের আসার অপেক্ষা পর্য্যন্ত করিল না! হৃদয়ে যতটা দুঃখ হইল, সবটা সে ক্রোধের আকারে পরিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিল।—সে কথার উপরে জোর দিয়া বলিল, "আমায় সব বুঝিয়ে না দিয়ে চলে যাওয়া তার উচিত কাজ হয় নি সুশীলবাবু! তার হাতে যখন সবই ছিল, তখন,—"

বাধা দিয়া সুশীলবাবু বলিলেন, "তার জন্মে কিছু বাধবে না জ্যোতিবাবু, সে আমায় সব বুঝিয়ে দিয়ে গেছে।"

তাঁহাকে সীতার পক্ষ সমর্থন করিতে দেখিয়া জ্যোতির্ম্ময়ের রোখ চড়িয়া গেল। সে মাথা দুলাইয়া বলিল, "সে কথা বললেই সব ফুরিয়ে গেল না সুশীলবাবু! যাওয়ার বেলায় সে কিছু নিয়ে গেল কি না, তা দেখা তো আমার দরকার।"

সুশীলবাবুর চোখ দুইটী দীপ্ত হইয়া উঠিল। একটু তীব্র স্বরে তিনি বলিলেন, "আপনি বুঝে কথা বলবেন জ্যোতিবাবু,—যা মনে আসবে, তাই মুখে বলে ফেলবেন না। আপনার কোন জিনিস নেওয়া যদি তার ইচ্ছা হতো, আপনাকে ডেকে সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবার তার দরকার কি ছিল? কর্ত্তাবাবুর উইল যতক্ষণ বর্ত্তমান থাকত, ততক্ষণ আপনার একটা কথা বলার অধিকার থাকত না জ্যোতিবাবু, এ কথা আপনাকে বুঝিয়ে আমায় বলতে হবে না। সীতা সে উইল ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। সে যেমন রিক্ত হস্তে এসেছিল, তেমনি রিক্ত হস্তে চলে গেল। এইটাই বড় দুর্ভাগ্য তার—সে যেমন অমল শুভ্র মনখানি নিয়ে এ সংসারে এসেছিল, তেমনটী নিয়ে যেতে পারে নি,—তার মনে অনেকখানি ক্লেদ নিয়ে সে চলে গেছে। এ ক্লেদ তার জীবন-কালের মধ্যে লক্ষবার ধুয়ে ফেললেও যাবে না।"

লজ্জায় জ্যোতির্ম্ময়ের মাথা একেবারে নুইয়া পড়িল। তাহার মন যে এত নীচ হইয়া গিয়াছে—এই প্রথম যেন সে তাহা ধারণায় আনিতে পারিল। সত্যই সে কথা,—সীতা নিজের জিনিস, তাহাকে সাধিয়া ডাকিয়া দিয়া গেল। তাহার যদি লইবার ইচ্ছা থাকিত, জ্যোতিকে সব দিয়া যাইত না। জ্যোতির্ম্ময়ের মুখখানা আরক্ত হইয়া উঠিল। সে অনেকক্ষণ কথা বলিতে পারিল না।

তাহার মনের বাসনা সবই অপূর্ণ রহিয়া গেল। সীতাকে সে যদি সব দিয়া যাইতে পারিত, তাহা হইলে যথার্থ তৃপ্তি পাইত। সীতাকে জয়ের মুকুট মাথায় পরিয়া যাইতে হইত না, জ্যোতিই সগর্ব্বে চলিয়া যাইতে পারিত। জ্যোতি যাহা ভাবিয়াছিল, তাহার কিছুই হইল না, সীতাকে সে সব রকমে পরাজিত করিতে পারিলেও, এইখানে সর্ব্বতোভাবে সে নিজেই পরাজিত হইয়া গেল।

অন্ধকার-বিবর্ণ মুখে জ্যোতি অন্যমনস্ক ভাবে এক দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

৪৫

দুই দিন বাড়ীতে থাকিয়া জ্যোতির্ম্ময় বুঝিতে পারিল—সীতা এখানে কতখানি আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। শুধু বাড়ীতে নহে, সমস্ত গ্রামে নহে, ভিন্ন দেশ হইতে যে সব প্রজারা জমীদারকে প্রণাম করিতে আসিল, তাহারাও সীতা নাই শুনিয়া চোখের জল ফেলিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "মা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ছিল। যেখানে

মায়ের পা পড়বে, সে যায়গা আপনিই ভরে উঠবে।"

জ্যোতির্ম্ময় রামনগরে আর থাকিতে পারিতেছিল না। যাহার জন্ত আসা, যে উদ্দেশ্তে আসা, তাহা ফুরাইয়া গিয়াছে; মিথ্যা আর এখানে পড়িয়া থাকা। দেশে আর কোন আকর্ষণ নাই। চিরপুরাতন যাহা একদিন তাহার নিকট লোভনীয় ছিল, তাহার আকর্ষণী শক্তি চলিয়া গিয়াছে।

সুশীলবাবু প্রথম দিন অপেক্ষা করিতেছিলেন; ভাবিয়াছিলেন, সে নিজেই হিসাব-নিকাশ, আয়-ব্যয় দেখিতে চাহিবে,—কোথায় কি আছে না আছে, সে জানিতে চাহিবে। দ্বিতীয় দিনেও সে সম্বন্ধে কোন কথা জ্যোতির্ম্ময়ের মুখে শুনিতে না পাইয়া তিনি নিজেই সব বিষয় তাহাকে জানাইয়া বুঝাইয়া দিবার জন্ত উত্তোগী হইলেন।

বেলা তখন শেষ হইয়া আসিয়াছে। অস্তগামী-প্রায় সূর্য্যের শেষ আলোটুকু ঘরের জানালা-পথে মেঝেয় ভাসিয়া পড়িয়াছিল। জ্যোতির্ম্ময় জানালার পার্শ্বে চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া গিয়া বসিয়াছিল। একটা সিগারেট ধরাইয়া ধূম পান করিতে করিতে সবুজ লতা-পাতায়-ছাওয়া পল্লীর পানে তাকাইয়া অতীত ও বর্ত্তমানের কথা ভাবিতেছিল।

মনে পড়িতেছিল সেই অতীতের কথা;—সে আজ আট বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। শেষ যে দিন সে মায়ের নিকট হইতে এক-রকম প্রায় বিবাদ করিয়া চলিয়া যায়, সে দিন সে এই স্থানটীতেই বসিয়া ছিল, এই জানালা-পথে ওই লতাপাতায় ঘেরা পল্লীখানির পানে তাকাইয়া ছিল। সেদিন সে এই সৌন্দর্য্য দেখে নাই, অথবা দেখিলেও মুগ্ধ হয় নাই।

জ্যোতির্ম্ময় একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। সেদিন যাহা সে চাহিয়াছিল,—যাহা না পাইলে তাহার জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইবে ভাবিয়াছিল, আজ সে তাহা পাইয়াছে। কিন্তু ইহা একেবারেই অসার, ইহার মধ্যে কিছু নাই। সে শান্তি পাইবে ভাবিয়াছিল,—শান্তি পায় নাই। অমৃত পান করিবে ভাবিয়া পান করিয়াছে গরল, এখন যাহা তাহাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার আনন্দের জীবনকে একেবারে নিরানন্দ করিয়া দিয়াছে। হায় রে, পিপাসার্ত্ত হইয়া সে মরীচিকা দেখিয়া ছুটিয়াছিল, পিছনে সুশীতল বারিপূর্ণ তড়াগ পড়িয়াছিল, তাহা সে দেখে নাই। এখনও সে মরীচিকার-পিছনে ছুটিয়া বেড়াইতেছে,—সুশীতল বারি থাকিতেও পান করিবার অধিকার তাহার নাই।

অন্তমনস্ক ভাবে দূরের পানে চাহিতে চাহিতে চোখ দুইটী তাহার সবেমাত্র সজল হইয়া উঠিতেছিল, সেই সময় বাহির হইতে সুশীলবাবু ডাকিলেন, "জ্যোতি বাবু—"

চমকাইয়া উঠিয়া জ্যোতির্ম্ময় চোখের জল মুছিয়া ফেলিল। মুখখানার উপর শান্ত ভাব আনিয়া উত্তর দিল, "এ ঘরে আসুন।"

একখানা বড় বাঁধানো খাতা হাতে সুশীলবাবু প্রবেশ করিলেন। জ্যোতির্ম্ময় একখানা চেয়ার দেখাইয়া দিয়া বলিল, "বসুন।"

সে জানালার ধারে বসিয়া রহিল, উঠিল না।

সুশীলবাবু খাতাখানা সমীপবর্ত্তী টিপয়ের উপর রাখিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। জ্যোতির্ম্ময় সিগারেট টানিতে টানিতে অন্তমনস্কভাবে বাহিরের পানে তাকাইয়া ছিল। তখন সূর্য্যের শেষ আলোটুকু বিলীন হইয়া গিয়াছে, পশ্চিমাকাশ আরক্ত হইয়া রহিয়াছে।

জ্যোতির্ম্ময় আর কথা বলে না দেখিয়া সুশীলবাবু নিজেই কথা বলিলেন। খাতাখানি নাড়াচাড়া করিতে করিতে তিনি বলিলেন, "শুনছি, আপনি কাল সকালেই কলকাতায় চলে যাবেন; অথচ যা করতে এসেছেন তার কিছুই করলেন না। আজ রাতটা হাতে আছে, খাতাপত্রগুলো কতক দেখা শেষ করুন। তার পর সামনেই গরমের বন্ধ আসছে, সেই সময়ে এসে মহালগুলো দেখে শুনে ঠিক করে নেবেন! এখন হতে খাতাপত্র দেখলে,—"

জ্যোতির্ম্ময় অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেট জানালা-পথে বাহিরে ফেলিয়া দিয়া তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইল; খাতাখানার দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এইখানা উপস্থিত দেখাতে এনেছেন বুঝি?"

তাহার মুখে যে হাসির রেখা চকিতের মত ভাসিয়া উঠিয়া তৎক্ষণাৎ মিলাইয়া গেল, সে হাসি যে কিসের, তাহা সুশীলবাবু ঠিক করিতে পারিলেন না।

তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ, এখানা আজই দেখা শেষ হয়ে যাবে এখন। কাছারি-ঘরে সব কাগজপত্র রয়েছে, দেখলে সব বুঝতে পারবেন। চা এখানে নিয়ে আসছে, চা খেতে খেতে দেখা হবে এখন, তার পর আপনাকে কাছারী-ঘরে গিয়ে

বলতে হবে। যত রাতই হোক না কেন, কতক কতক কাগজ আপনাকে আজ দেখতে হবে।"

"তা বটে—"

জ্যোতির্ম্ময় উঠিয়া আসিয়া টীপয়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইল। খাতাখানি টানিয়া লইয়া তাহার পাতাগুলি ক্ষিপ্রহস্তে উল্টাইয়া গেল। আবার একটু হাসি তাহার মুখে ভাসিয়া উঠিল। খাতাখানি সুশীলবাবুর দিকে ঠেলিয়া দিয়া সে বলিল, "এ সব আপনিই দেখুন সুশীলবাবু; আমি যা বুঝতে পারি নে, তা আমায় দেখতে বা করতে দেওয়া উচিত নয়। জানেন তো—একটা কথা আছে, যার কাজ তারেই সাজে;—এ সব কি আমাদের পোষায়? কোথায় কোন মহাল রয়েছে, কোন নায়েব কোথায় অত্যাচার করেছে, কোন প্রজা খাজনা দিলে না—নালিশ কর,—এ সব করবে তারা—যারা সব জানে। আমি এসব ব্যাপারের কিচ্ছু বুঝি নে, কিছু জানি নে, অতএব আমায় ক্ষমা করুন, আমি এসব দেখতে পারব না

সুশীলবাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জ্যোতির্ম্ময়ের পানে চাহিয়া রহিলেন। লোকটার চালাকি দেখিয়া তাঁহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া যাইতেছিল। সীতাকে সে যে কদর্য্য পত্রখানা লিখিয়াছিল, স্বচক্ষে তাহা তিনি না দেখিলেও, প্রশান্তের মুখে বিশদভাবে শুনিয়াছিলেন। সেই অপমানকর পত্র লেখার মূলে এই সম্পত্তিই ছিল না কি? জ্যোতির্ম্ময় যদি সেরূপভাবে পত্র না দিত, তাহা হইলে সীতা অতখানি আঘাত পাইয়া ক্ষুদ্র বালিকার মত কাঁদিয়া চলিয়া যাইত না। এখন জ্যোতির্ম্ময় বেশ জানিতেছে, সীতা সব দিয়া গিয়াছে, আর আসিবে না। এখন সে দেখাইতে চায়—সম্পত্তির লোভে সে লুব্ধের মত কলিকাতা হইতে ছুটিয়া আসে নাই। তাহার এই নিরীহ ভালমানুষী একটা চাল মাত্র।

বেশ দৃঢ়কণ্ঠে সুশীলবাবু বলিলেন, "আপনি জানেন না বললেই তো চলবে না জ্যোতি বাবু। না জানলেও এখন আপনাকে জানতে হবে—সব শিখতে হবে, নইলে আর তো পথ নেই

জ্যোতির্ম্ময় তাঁহার কণ্ঠস্বরে মৃদু রূঢ়তা লক্ষ্য করিল, সংযতকণ্ঠে বলিল, "পথ যথেষ্ট আছে সুশীলবাবু, একজন অন্ধ হলে দুনিয়াশুদ্ধ লোকই তো অন্ধ হয় না—যদিও অন্ধ ধারণা করে দুনিয়ার সকলেই তার মত অন্ধ। যে বধির, সে মনে করে দুনিয়ার সবাই তার মত বধির হয়ে গেছে। সে তাই কথা বলবার সময় ভীষণ রকম চীৎকার করে' লোককে আরও বেশী রকম অস্থির করে তোলে। আমি বরাবরই পথ দেখতে পেয়েছিলুম। ভগবান আমায় এতটুকু বুদ্ধি দিতে কার্পণ্য করেন নি, যাতে করে আমি বুঝতে পেরেছিলুম এ কাজ আমার নয়,—আর সেই জন্যেই চুপচাপ বসে ছিলুম। কিন্তু আমার পেছনে যে সংসার অহরহঃ সচেতন হয়ে রয়েছে, সে আমায় চুপ করে থাকতে দিলে কই? সে এই জড়ের হাতে অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করতে পাঠিয়ে দিলে। জড় তো জানে তার এতটুকু ক্ষমতা নেই—যুদ্ধের প্রারম্ভেই তার হাত হতে অস্ত্র খসে পড়েছে। জড় এখন বিপক্ষের এতটুকু করুণা লাভাশায় চেয়ে রয়েছে। আমি সীতাকে সব বুঝিয়ে বলব বলেই এখানে এসেছিলুম সুশীলবাবু, সম্পত্তি অধিকার করতে আসি নি। কত বড় কষ্ট পেয়ে আমি সে পত্রখানা যে হঠাৎ লিখে ফেলেছিলুম, তাই বুঝাতেই আমার এখানে আসা। কিন্তু এসে দেখছি সে চলে গেছে, আমায় চির অপরাধী করে রেখে গেছে। না, সে তো জানে না—কেন আমি লিখেছি, কার উত্তেজনায় লিখেছি। তার আত্মমর্য্যাদাবোধশক্তি আছে, সে তাই আমার সেই পত্রখানা পেয়েই চলে গেল, আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এতটুকু অপেক্ষা করল না। আজ তাই ভাবছি সুশীলবাবু, যদি আমার মা থাকতেন—"

তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল, আপনাকে সামলাইতে সে বাহিরের পানে তাকাইল।

একটু পরে মুখ ফিরাইয়া আবার বলিল, "আজ যদি আমার মা থাকতেন সুশীলবাবু,—তিনি আমার ব্যথা বুঝতেন, তিনি আমায় ক্ষমা করতেন। তিনি ছাড়া আর কেউ আমার দিকে চাইবে না। আমার এই বুকের মধ্যে স্তরে স্তরে ব্যথার রাশি জমে উঠেছে। কেউ নেই, যার কাছে দু'টো কথা বলে' আমার জমাট ব্যথা এতটুকু হালকা করতে পারি। সংসার চায় আমার বাইরের দিকে, অন্তরের দিকে কেউ চায় না। সুশীলবাবু, আমি বড় অভাগা,—হ্যাঁ, সত্যিই আমি বড় অভাগা। আপনারা আমায় সুখী ভাবছেন, কিন্তু আমি সুখী নই, আমি স্বেচ্ছায় দুঃখকে বরণ করে নিয়েছি।"

একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া সে উদাস ব্যথাপূর্ণ চোখ দু'টি সুশীবাবুর মুখের উপর তুলিয়া ধরিল। অনেকক্ষণ সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, সুশীলবাবুও কোন কথা বলিতে পারিলেন না।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "জগতে যে ছিল, আমার বড় আপনার, আমার মুখ দেখে যিনি যথার্থ সুখী হতেন, দুঃখ দেখলে যাঁর চোখ দিয়ে জল বার হয়ে পড়ত, আমার সকল আপদ বিপদ হতে বাঁচাতে যাঁর অপরিসীম ব্যগ্রতা ছিল, আজ আমার সেই করুণাময়ী মা নেই। সীতার ওপরে একবার বড় রাগ হয়েছিল সুশীলবাবু, যখন দেখেছিলুম, সে আমার দাদুকে কেড়ে নিয়েছে, দাদু তাকে পেয়ে আমার নাম আর মুখে আনেন না। মনে ভাবলুম, হয় তো ক্ষমা পেতুম, হয় তো দাদু আবার আমায় ডাকতেন, তাঁর স্নেহময় বুকে আবার আমায় জড়িয়ে ধরতেন,—কিছু হ'ল না শুধু সীতার জন্যে। সীতাকে পেয়ে দাদু আমায় চিরকালের মত নির্ব্বাসিত করলেন,—দাদু আর আমায় ডাকলেন না। এখন আর আমার সে রাগ নেই, রাগ আমার মিটে গেছে; কারণ, আমার দাদু আর জগতে নেই। যাক এসব কথা, যা হয়ে গেছে তা নিয়ে আলোচনা করা বৃথা। আমি যে কাল সকালেই চলে যাব, এ কথা ঠিক। আপনি যেমন করে পারেন সীতাকে ফিরিয়ে আনবেন; বলবেন—ভুল সকল মানুষেরই হয়ে থাকে। আমি তার কাছে কত অপরাধ করেছি, তার জীবনটা যে পুড়িয়ে শ্মশান করে দিয়েছি, সে অপরাধ ক্ষমা করেও তো সে এখানে ছিল,—এ অপরাধটাকেও তেমনি ক্ষমা করতে বলবেন। বলবেন সুশীলবাবু, আমি তার কাছে আগে যে অপরাধ করেছি, তার তুলনায় এ অপরাধ সামান্য; তাকে আরও বলবেন, আমি সব বুঝেছি, আমি মানুষ, আমারও জ্ঞান আছে। মুহূর্ত্তের ভুলে আমি যে হলাহল পান করেছি, তার বিষে জর্জ্জরিত হ'য়ে গেছি,—আমার বিবেক-বুদ্ধিকেও সব সময়ে আমি সংযত রাখতে পারিনে। তার ভার সে এসে নিক,—আমার যতখানি তফাতে থাকবার কথা ততখানি তফাতে থাকব। আমি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেছি, দেব সেবার অধিকার আমার নেই।"

দুই হাতের মধ্যে মুখখানা লুকাইয়া সে সামনে ঝুঁকিয়া পড়িল।

ঘরের ভিতর তখন অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে।

৪৬

সীতার দিন বেশ সুখে কাটিয়া যাইতেছিল। প্রশান্তের স্নেহ আদর ভালবাসা সে যথেষ্ট পাইতেছিল। ক্ষুদ্র গ্রামখানার মধ্যে সে ইহারই মধ্যে স্থায়িভাবে আসন করিয়া লইয়াছে।

সুশীলবাবু তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিলেন। তিনি জানাইলেন, জ্যোতির্ম্ময় কিছু গ্রহণ করিল না। সে সব সীতার নামে রেজেষ্ট্রী করিয়া দিয়া গিয়াছে। সীতাকে আবার রামনগরে যাইতে হইবে, নহিলে সেখানকার সব নষ্ট হইয়া যাইবে।

সীতা নীরবে তাঁহার কথা শুনিয়া গেল। প্রশান্ত গর্জ্জিয়া উঠিল, "না, সীতাকে আর সেখানে যেতে দেব না। আপনি ভুলে যাচ্ছেন, কিন্তু আমি ভুলি নি—জ্যোতি কি রকম করে সীতাকে অপমান করেছে। সীতার কেউ নেই, তাকে অপমান করলেও সে নীরবে সয়ে যাবে,—তাই সে পত্রখানা দেওয়ার মত সাহস তার হয়েছিল। আপনি তাকে জানিয়ে দেবেন সুশীলবাবু—সীতা এমন হীন বংশে জন্ম গ্রহণ করেনি, এমন নীচ প্রবৃত্তি তার নয় যে, তাড়িয়ে দিয়ে আবার ডাকলে সে ছুটে যাবে। সম্পত্তি তুচ্ছ কথা,—স্বর্গও সীতার কাছে তুচ্ছ, এমন অপমানের দান সীতা চায় না।"

সীতা শান্তকণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ, আপনি তাই বলবেন দাদা। আপনি তো জানেন, দাদু মৃত্যুকালে বলে গেছেন—যদি তিনি ফেরেন, তাঁকে সব ফিরিয়ে দিতে পারব। তিনি ফিরেছেন, আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করেছি। যতদিন তিনি আসেন নি, আমি যক্ষের মত ওই বিষয়-সম্পত্তি আগলিয়ে রেখেছিলুম। এখানে আমি খুব শান্তিতে আছি, যথেষ্ট সময় পেয়েছি, দিনরাত বুকে পাষাণ চাপিয়ে থাকতে হয় না। সমস্ত দিন আমি কৃষকের কুটীরে কুটীরে ফিরি, ওদের শিক্ষা দিই। এতে আমার যত শান্তি, রামনগরে তার এতটুকু কোন দিন পাই নি।"

সুশীলবাবু বলিলেন, "কেন পাও নি সীতা, ইচ্ছা করলে এখনও তো তুমি পেতে পার। অগাধ সম্পত্তি রয়েছে, তোমায় তার কিছু করতে হবে না, আমিই সব করব, তুমি শুধু মাঝে মাঝে দেখবে মাত্র। সম্পত্তি তুমি দশের জন্য ব্যয় করবে, দরিদ্র নিরক্ষরদের শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত করবে। ঠাকুরবাড়ীর দালান ভেঙে পড়ছে। কর্ত্তাবাবু ইদানীং এসব কিছু দেখেন নি, তুমিও কোন দিন দেখ নি। এখন যদি না সারান যায়, সব ভেঙে পড়বে। তুমি চল সীতা, তুমি না গেলে সব নষ্ট হয়ে যাবে।"

সীতা দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "আমায় মাপ করবেন, আমি আর সংসারের দেনা-পাওনার মধ্যে জড়িয়ে পড়বার ইচ্ছা করিনে। নিত্য নানা ফেঁসাদ, নিত্য নানা উপদ্রব,—অত সহ্য করবার শক্তি আর আমার নেই।"

সুশীলবাবু বলিলেন, "নেই বললে শুনব না সীতা। তোমার সে শক্তি যথেষ্ট আছে জেনে দাদু অসঙ্কোচে তোমার মাথায় ভার চাপিয়ে গেছেন। তিনি জেনে গেছেন, তুমি ভোগবিলাস-বঞ্চিতা। তুমি যা করবে, তাতে নিজের স্বার্থ এতটুকু থাকবে না, পরের উন্নতি প্রাণপণে করে যাবে। নিজেকে তুমি জয় করতে পেরেছ; তাই দশের বুকে তোমার আসন। তুমি হয় তো বুঝবে না সীতা, যে তোমায় অপমান করেছে, তোমার মহত্ত্বের কাছে সেও মাথা নত করেছে। সে ক্ষমা চেয়েছে; সে বলেছে সীতাকে বলবেন, আমি বহু কাল আগে তার কাছে যে অপরাধ করেছি, এ অপরাধ তার তুলনায় অতি সামান্য—এই ভেবেই যেন সে আমায় ক্ষমা করে। সে আরও বলেছে—সে মানুষ, বোধশক্তি তারও আছে; অতীত মোহের বশে সে যা করে ফেলেছে, তারই ফলে তার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ গরলময়—জ্বালাপ্রদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাস্তবিক সীতা, আমি দেখলুম, জ্যোতির্ম্ময় আর আগের মত নেই; তার মুখে চোখে এমন একটা করুণ ভাব ফুটে উঠেছে, যা দেখলে মানুষের মনে স্বতঃই বড় আঘাত লাগে। সে দিনে আমি তার নিন্দা করেছিলুম; কিন্তু আজ আমি তার কথা ভেবে যথার্থ-ই কষ্ট পাচ্ছি। আজ বলছি সে যথার্থ-ই অভাগা, জগতে তার সব থেকেও কিছু নেই। আজ যারা বন্ধুরূপে তার পাশে দাঁড়িয়েছে, তারা নিজেদের স্বার্থের দিকটাই দেখছে, তার দিকে কেউ দেখছে না।"

সীতার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, সে মুখ নত করিয়া রহিল।

প্রশান্তের চোখে এ দৃশ্য এড়াইল না। সে অন্যমনস্ক ভাবে অন্য দিকে চাহিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রশান্ত বলিল, "তবে তুই সেইখানে যা সীতা; সেখানে তোকে দিয়ে অনেক কাজ হবে,—এখানে থেকে কি কাজ করতে পারবি বোন?"

সীতা মলিন দুইটী চোখের দৃষ্টি প্রশান্তের মুখের উপর তুলিয়া ধরিয়া করুণ কণ্ঠে বলিল, "আমায় তুমি তাড়িয়ে দিতে চাও দাদা?"

"তাড়িয়ে দেব,—তোকে? তুই কি বলছিস সীতা, আমি তোকে তাড়িয়ে দেব? জানিস নে বোন, তোর দাদার ঘরে তোর জন্যে কতখানি জায়গা আছে; আর কারও কাছে না হলেও তোর দাদার কাছে তুই কতখানি আদরের পাত্রী। আমারই বা কে আছে সীতা,—নিজের জন্যে আলাদা সংসারের সৃষ্টি কোন দিন করব না বলেই আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি, তা তো জানিস বোন। আমরা দুইটী ভাই বোনে জগতের সেবায় আত্মোৎসর্গ করতে এসেছি, নিজেদের স্বার্থ নিয়ে ভুলে থাকতে আসি নি। তুই যে আমার বোন, এই কথা ভাবতে কতখানি গর্ব্বে আমার বুক ভরে ওঠে, তা যদি তুই জানতিস বোন,—"

গভীর আবেগে প্রশান্তের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। সে নিঃশব্দে সীতার একখানা হাত তুলিয়া লইল।

সীতা সুশীলবাবুর দিকে ফিরিল,—"তবে আপনি ফিরে যান দাদা, কলকাতায় গিয়ে তাঁকে জানাবেন—আমি যা দিয়ে এসেছি—যে জোয়াল ঘাড় হ'তে নামাতে সমর্থ হয়েছি, আর সেই জোয়াল ঘাড়ে নিতে যাবো না। আমার অর্থে দরকার নেই। জীবের সেবা করে যে তৃপ্তি, তা আমি এখানে পেয়েছি। সীমাবদ্ধ ভাবে আমি থাকতে পারব না, আমি অসীমের মাঝে নিজেকে বিস্তার করে দিতে চাই। আমায় আর কেন ডাকছেন দাদা, আমার জীবনের সব আশা মিটে গেছে, সব সাধ শেষ হয়েছে। আমার সন্ন্যাসী দাদা, আমি তাঁর সন্ন্যাসিনী বোন,—ভাই-বোনে এমনি করে জীবন কাটিয়ে দেব।"

সুশীলবাবু একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন মাত্র। বাধ্য হইয়া তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হইল।

অন্যমনস্ক ভাবে প্রশান্ত বলিল, "গেলেই ভাল হতো।"

সীতা শান্ত সুরে বলিল, "না দাদা, গেলে আরও অপমান সইতে হতো, আবার কোন্ দিন কি বলে বসে তার ঠিক কি। কেন দাদা, এখানে আমি বেশ আছি, এখানে সকলের উপরে আসন পেয়েছি, ওদের সঙ্গে সমান ভাবে মিশতে পেয়েছি। সেখানে সকলের লক্ষ্য হয়ে আমি দাঁড়াতে পারব না, আমি এইখানে সকলের সঙ্গে মিশে থাকতে চাই।"

প্রশান্ত তাহার মাথায় হাতখানা রাখিল, কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "আশীর্ব্বাদ করি, তোর সাধনার ফল যেন তুই পাস, তোর ব্রত সার্থকতা লাভ করুক।"

৪৭

সীতা তখন পূজা করিতে বসিয়াছিল। সম্মুখে সিংহাসনে নারায়ণ-শিলা, কিন্তু নারায়ণ পূজা করিবার অধিকার তাহার নাই। সে শিবলিঙ্গ গড়াইয়া পূজা করিতেছিল।

পিছনে বারাণ্ডার উপরে কে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহা সে জানিতে পারিল না,—তাহার তখন সে অনুভব-শক্তি ছিল না। সমস্ত মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়া সে পূজা করিতেছিল।

বাহিরে সেদিন আকাশ মেঘে ঢাকা, ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছিল। মাঘ মাস শেষ হইয়া আসিয়াছে, শীত অনেক কমিয়া আসিলেও আজিকার এই ঠাণ্ডা বাতাসে বেশ শীত বোধ হইতেছিল।

ভোর হইতে প্রশান্ত কৃষাণদের সঙ্গে লইয়া মাঠের কাজে গিয়াছে। সীতা প্রতিদিনকার মত স্নান করিয়া ফুল বিল্বপত্র আনিয়া পূজা করিতে বসিয়াছে।

তাহার মুখখানা তখন দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। আয়ত চোখ দুইটী ভক্তিভরে নিমীলিত। সেই নিমীলিত চোখের প্রান্ত দিয়া জলধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। সিক্ত কেশদাম মাটিতে লুটাইতেছে, কতক বিশৃঙ্খলভাবে বুকের উপর—বাহুর উপর পড়িয়াছিল—

পূজা শেষ হইয়া গেল, গলদেশে অঞ্চল জড়াইয়া সে প্রণাম করিল।—তাহার কণ্ঠোচ্চারিত প্রণাম-মন্ত্র নিস্তব্ধ ঘরখানিকে পূর্ণ করিয়া তুলিল।

শিব বিসর্জ্জন দিয়া সে আবার প্রণাম করিল।

"ওগো ঠাকুর, আমায় শুধু ভক্তি দিয়ে দেওয়ার শেষ করলে চলবে না। আমি মুক্তি চাই নে, স্বর্গ চাই নে,—আমায় শুধু বল দাও, সাহস দাও, আমি যেন সকল আঘাত ঠেকাতে পারি, মানুষ নামে পরিচয় দেবার স্পর্দ্ধা করতে পারি। মুক্তি চাইবে তারা—যারা সংসারে থেকেও থাকতে চায় না, যারা সংসারের লোকের সঙ্গে মিশেও মিশতে পারে না—অনেক তফাতে থাকে—তারাই চাইবে; আমি তো তা চাইব না ঠাকুর,—আমি যে এই রূপ-রস-গন্ধে ভরা পৃথিবীকে বড় ভালবাসি, এর বুকে যা কিছু তুমি সৃষ্টি করেছ, তাদের নিজের চেয়েও বেশী ভালবাসি। আমি মুক্তি চাই নে, কোনদিন চাইব না, চাচ্ছি শুধু সাহস ও শক্তি। আমায় শক্ত কর, আমায় সহনশীলতা দাও, আমায় সাহস দাও। এ বককে পাষাণের মত শক্ত কর, স্নেহ-মমতা সব মুছে দাও।"

মাটিতে মাথা রাখিয়া অনেকক্ষণ সে পড়িয়া রহিল। কেন গো—কেন চোখে জল আসে, কেন অসহ্য যাতনায় বুকখানা ভাঙিয়া যাইতে চায়? প্রভু, রক্ষা করিয়ো, তুমি পথ দেখাইয়ো,—চোখে যেন জল না আসে, তাহা তুমিই দেখিয়ো।

সে যখন মাথা তুলিল, তখন অশ্রুজলে মাটি অনেকখানি ভিজিয়া গিয়াছে। গলা হইতে অঞ্চল খুলিয়া সে মুখ মুছিতে লাগিল।

"সীতা—"

কে ডাকিল? প্রশান্ত ছাড়া আর কেহই এখানে তাহার নাম ধরিয়া ডাকে না তো? এ কণ্ঠস্বর তো তাহার অপরিচিত নহে। বহুকাল পূর্ব্বে—আজ নয় দশ বৎসরের কথা সে এই কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিল, আজও তাহা ভুলিতে পারে নাই। স্তম্ভিতভাবে সীতা সম্মুখস্থ নারায়ণ-শিলার পানে তাকাইল।

আবার সেই আহ্বান ভাসিয়া আসিল—"সীতা—"

মুখ ফিরাইয়া সে দেখিল, দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া জ্যোতির্ম্ময়।

সীতা বিবর্ণ হইয়া উঠিল, আত্মহারা প্রায় নিষ্পলকে সে তাকাইয়া রহিল। নিজের চোখকেও সে যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না।

শান্ত কণ্ঠে জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "বাইরে এসো সীতা,—তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে, তাই আমি এখানে এসেছি। ও-ঘরে যাওয়ার অধিকার আমার নেই, তা হয় তো তুমি অস্বীকার করবে না।"

মন্ত্রমুগ্ধার মত সীতা বাহিরে আসিল। চলিতে তাহার পা দু'খানা থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। কোন মতে সে দেহখানাকে টানিয়া আনিল।

বাহিরের আলো মুক্ত ভাবে তাহার দেহের উপর, মুখের উপর ছড়াইয়া পড়িল। কি উজ্জ্বল তেজপূর্ণ মূর্ত্তি তাহার! শ্রদ্ধায় মাথা আপনিই ইহার সম্মুখে নত হইয়া পড়ে। এ যেন মহামহিমময়ী দেবীমূর্ত্তি।

জ্যোতির্ম্ময় এক পলকের দৃষ্টি তাহার মুখের উপর তুলিয়া ধরিল, তখনই সে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল।

দেয়ালে ঠেস দিয়া সীতা নত দৃষ্টিতে দাঁড়াইল। তাহার কম্পিত ওষ্ঠ ভেদ করিয়া বাহির হইল, "দাদা বাড়ী নেই।"

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "তার কাছে আমার দরকার নেই সীতা, দরকার আমার তোমার কাছে। সুশীলবাবুর মুখে খবর পাওয়া মাত্র সেই দরকার মিটানোর জন্যে আমি এখানে তোমার কাছে এসেছি। অবশ্য তুমি বুঝতে পারছ, আমার উদ্দেশ্য কি। আমি কাল রাত দু'টোর সময় ষ্টেশনে এসেছি। তার পর এই নয় মাইল পথ গরুর গাড়ীতে এসেছি। তোমার সঙ্গে কথা কয়টা বলে, তোমার একটা শেষ উত্তর নিয়ে আমি এখনই চলে যাব। সেইজন্যে গাড়ী আমি ফেরত দেই নি।"

সীতা চকিত দৃষ্টি তুলিয়া দেখিল, সে বাস্তবিকই বড় শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। অনিদ্রায়, গাড়ীর কষ্টে তাহার মুখখানা শুকাইয়া গিয়াছে। চোখ দুইটী অস্বাভাবিক দীপ্ত, তেমনই আরক্তিম। মাথার চুলগুলা রুক্ষ, বিশৃঙ্খল ভাবে প্রশস্ত সুগৌর ললাটে পড়িয়াছে।

জ্যোতির্ম্ময় বারাণ্ডার ধারে মাটির উপর বসিয়া পড়িল। এতক্ষণে সীতার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। সে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর হইতে একখানা কুশাসন আনিয়া পাতিয়া দিতে গেল। শুষ্ক হাসিয়া জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "আসনের কিছু দরকার নেই সীতা, এই আমি বেশ বসেছি। তোমরা আমাকে অনেকখানি দূরে রেখে চলতে চাও, আমিও তোমাদের কাছ হ'তে অনেকখানি দূরে থাকতেই ভালবাসি।"

তাহার কথার মধ্যে কতখানি বেদনা ঝরিয়া পড়িতেছিল, তাহা সীতা বেশ বুঝিতেছিল; কিন্তু সে একটা কথাও আর বলিল না, আসনখানা ফেলিয়া রাখিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

জ্যোতির্ম্ময় কি ভাবিতেছিল। খানিকক্ষণ পরে সে বলিল, "আমি আগে তোমার কাছ হ'তে একটা উত্তর চাই,—তুমি কার ওপরে সব ভার ছেড়ে দিয়ে এখানে চলে এসেছ, আগে তাই বল সীতা। আমি জানতে চাই, মৃত দাদু তোমায় যে আদেশ দিয়ে গেছেন, তা তুমি ঠিক ভাবে পালন করেছ কি না। আশা করছি, এর উত্তর তুমি নিশ্চয়ই দেবে।"

সীতা মুখ তুলিল। স্থির চোখের দৃষ্টি জ্যোতির্ম্ময়ের মুখের উপর স্থাপন করিয়া সে বলিল, "হ্যাঁ, এর উত্তর আমি নিশ্চয়ই দেব। আপনি বোধ হয় শুনেছেন, তিনি যখন ইহলোক ত্যাগ করেন, তখন আমি জানতে চেয়েছিলুম—তাঁর ধর্ম্মত্যাগী পৌত্র যদি ফিরে আসেন, তাঁকে সব দিতে পারব কি না? তিনি বলে গেছেন দিতে পারব। যতদিন আপনি আসেন নি, আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তাঁর কাজ করেছিলুম। আপনি আসছেন জেনে আমি সব কাজ সুশীলবাবুকে বুঝিয়ে দিয়ে চলে এসেছি। আমার কর্ত্তব্য আমি যথাসাধ্য পালন করেছি, আমি সে বিশ্বাস করি।"

অধীর ভাবে মাথার চুলগুলা দুই হাতে ধরিয়া জ্যোতির্ম্ময় বিকৃত মুখে বলিল, "কিন্তু আমি যদি বলি—তুমি কর্ত্তব্য পালন যথাযথরূপে করতে পার নি, সেটা নিশ্চয়ই অন্যায় হবে না সীতা।"

সীতা ধীরভাবে বলিল, "আপনি কিসে আমার ত্রুটী দেখতে পেলেন?"

তেমনি বিকৃত কণ্ঠে জ্যোতির্ম্ময় বলিল, 'তোমার যে গোড়াতেই ভুল র'য়ে গেছে। তুমি দাদুকে বলেছিলে যদি তাঁর ধর্ম্মত্যাগী পৌত্র ফিরে আসেন, তবে তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য তাঁকে দিয়ে তুমি মুক্তিলাভ করবে। কিন্তু তাঁর ধর্ম্মত্যাগী পৌত্র ফিরলেন কি না, তা না দেখেই তুমি চলে এলে কি ক'রে?"

সীতা তাহার কথা বুঝিতে পারিল না; বিস্ফারিত নেত্রে শুধু তাকাইয়া রহিল।

জ্যোতির্ম্ময় রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "তুমি বলবে আমি ফিরে এসেছি। কিন্তু কই আমি ফিরেছি সীতা? ধর্ম্মত্যাগী পৌত্র যদি ফেরে,—অর্থাৎ যদি আমার স্বধর্ম্মে নিষ্ঠা ফেরে,—যদি আমি শ্রীধরের পূজা করবার যোগ্য পাত্র হ'তে পারি,—সেই ত' আমার প্রত্যাবর্ত্তন, সীতা। আমি ফিরলুম কই? আমি স্বধর্ম্মত্যাগী। আমার পূজা করা দূরে থাক,—আমি পূজার ঘরে প্রবেশ করবার অধিকার-চ্যুত। আমি ফিরলুম কি করে সীতা? মন্দিরের দরজার বাইরে দাঁড়ানোর অধিকার আমার আছে, কিন্তু ভেতরের অধিকার তো পেলুম না সীতা—?"

তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল, আত্মগোপন করিবার ইচ্ছায় সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

সীতা বলিল, "কিন্তু আপনি—"

"না, আজ তুমি নির্ব্বাক থাক, আমার কথা-

গুলো আগে শেষ করতে দাও। মনের সব কথা আজ নিঃশেষে তোমার সামনে উজাড় করে দিয়ে যাব। তার পর তুমি বসে থেকে তোমার এখনকার কর্ত্তব্য ঠিক করে নিয়ো। আমি নিজেই বুঝতে পারছি, আমার কি ছিল, কি আমি হারিয়েছি। কিন্তু সে কথা বলে—সে দুঃখ জানিয়ে আমি তোমার মনে করুণার উদ্রেক করতে আসি নি সীতা। আমি তো জানি, আমার জীবন এমনি এলোমেলো, এমনিই ছন্নছাড়া ভাবে চলবে, গাঁথতে গিয়ে আমার মালা গাঁথা হবে না। বড় কষ্ট হয় এই ভেবে—ভগবান আমায় সব দিয়েছিলেন, কিন্তু স্বেচ্ছায় আমি সব হারিয়েছি। লোকে দেখে ভাবে, আমার কিছুরই অভাব নেই, আমার সব আছে; কিন্তু বিশ্বাস কর সীতা, আমার কিছু নেই, আমার কেউ নেই,—আমি বড় হতভাগা। জগৎ চায় আমায় দিয়ে নিজের বাসনা পূর্ণ করিয়ে নিতে,—সেই জন্যে আমায় হাসতে হবে, আমায় খাটতে হবে, আমায় বাঁচতে হবে,—কিন্তু আমার পানে কেউ চাইবে না।”

দুই হাতে ললাট চাপিয়া ধরিয়া সে অন্যমনস্ক ভাবে এক দিকে চাহিয়া রহিল।

আজ সকাল পর্য্যন্ত সীতার মনে ধারণা ছিল, জ্যোতির্ম্ময় সুখী; এই মুহূর্ত্তে সে বুঝিল;—না, সে বাস্তবিকই বড় দুঃখী, সীতার চেয়েও সে কষ্ট পাইয়াছে বেশী। সীতার কখনও কিছু ছিল যাঁহাদের কাছে সে গিয়াছে, তাঁহারা বাস্তবিকই তাহাকে যাহা দিয়াছেন তাহা নিঃস্বার্থ ভাবে; কিন্তু জ্যোতির্ম্ময় আলেয়ার পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইল যে। তৃষ্ণায় প্রপীড়িত হইয়া সে ছুটিয়াছিল মরীচিকার পিছনে,—তৃষ্ণা মিটিল না, তৃষ্ণা আরও বাড়িল।

আজ এই হতভাগ্যের দুঃখ কল্পনা করিয়া সীতার সমস্ত চিত্তটা ব্যথায় ভরিয়া উঠিল, সে নিজের কথা ভুলিয়া গেল। কিন্তু কি বলিবে তাহা সে ভাবিয়া পাইল না।

জ্যোতির্ম্ময় মুখ ফিরাইয়া চাহিল। এবার সীতা চোখ নামাইল না, করুণ নেত্র স্থির করিয়া রাখিল।

জ্যোতির্ম্ময় বলিল, “সে যাই হোক,—আমি মোট এই কথা বলতে এসেছি—তোমায় রামনগরে যেতেই হ'বে। তুমি না গেলে কিছুতেই চলবে না,—তোমার কাজ আর কেউ চালাতে পারবে না। আমি তবু ইভার খোঁজ করেছিলুম, কিন্তু সে আর আমাদের মধ্যে নেই, পৃথিবীর মধ্যে বাস করে বড় জ্বালা পেয়ে, বড় বেদনা পেয়ে পৃথিবীর বাইরে জুড়াতে গেছে অভাগিনী বোনটী আমার—”

অশ্রুজল তাহার কথা সেই স্থানেই বন্ধ করিয়া দিল। জ্যোতির্ম্ময় রুমালে মুখ ঢাকিয়া নিঃশব্দে কয়েক ফোঁটা অশ্রুজল ফেলিল।

ইভা নাই—সীতা একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। চকিতে তাহার মনে জাগিয়া উঠিল ইভার সে সুদীর্ঘ দেহ, অনিন্দ্য-সুন্দর মুখ,—সর্ব্বোপরি তাহার সেই সরল বালিকার মত কত গল্প। সেই ইভা, জলে ধোওয়া যুঁই ফুলটীর মতই সুন্দর ও পবিত্র,—সেই ইভার অবশেষে কি শোচনীয় পরিণাম!

মনে পড়িল ইভার সে সুদীর্ঘ পত্রখানির কথা। ইভার এই অকাল মৃত্যুর জন্য দায়ী কে? তাহার স্নেহময়ী জননী নহেন কি? এক চরিত্রহীন মদ্যপ ধনীর হস্তে তিনি কন্যাকে দান করিয়াছিলেন। কন্যার দিকে চাহেন নাই,—চাহিয়াছিলেন অর্থের পানে, মর্য্যাদার পানে,—তাই তাহার ফলও তেমনি কঠিন ভাবে লাভ করিলেন।

জ্যোতির্ম্ময় প্রকৃতিস্থ হইয়া সীতার পানে চাহিল। তখন সীতার বাহ্যজ্ঞান ছিল না বলিলেই চলে; সে তখন অভাগিনী ইভার কথা ভাবিতেছিল। জ্যোতির্ম্ময় শান্ত কণ্ঠে বলিল, “আমি জানি, তুমি তাকে বড় ভালবাসতে, সে আমায় তা বলেছিল। বড় জ্বালা পেয়েছিল সে। আমিও তার মুক্তিদাতা মরণকেই প্রার্থনা করেছিলুম; কারণ, মরণ ভিন্ন আর কেউ তাকে মুক্তি দিতে পারতো না। সে বেঁচেছে সীতা; তার সকল জ্বালার শান্তি হয়েছে। কাকীমা আছেন, কিন্তু সে মরে বেঁচে থাকা। এখন তিনি যে অবস্থায় আছেন, এর চেয়ে তাঁর মরণই ভাল ছিল।”

সীতা জ্যোতির্ম্ময়ের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বহমান চোখের জল মুছিতে লাগিল।

বাহির হইতে গাড়ী-চালক চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, “বাবু আসুন, এর পরে বিকেলের ট্রেণ ধরা যাবে না।”

জ্যোতির্ম্ময় উঠিয়া পড়িল,—কথা রইল সীতা, তোমায় দু'দিনের মধ্যে রামনগরে যেতেই হবে। আমি যেখানেই থাকি সে খবর পাব। আর যদি নাই থাকতে চাও সেখানে—তোমার সম্পত্তি তুমি যা খুসি ব্যবস্থা করবে, আমার ওপরে নির্ভর করলে চলবে না। জেনো, আমি কেউই নই। তোমার সম্পত্তি তুমি ইচ্ছে করলে বিলিয়ে দিতে পার; আমার তাতে কথা বলবার অধিকার নেই।”

"আমি—"

বাধা দিয়া জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "না, আমি তোমার কোন কথা শুনব না সীতা; যদি তাও না মানতে চাও,—তবে মনে কর আমি তোমায় আদেশ দিচ্ছি।"

"আপনি—আপনি আদেশ দিচ্ছেন?"

সীতা বিস্ফারিত নেত্রে জ্যোতির্ম্ময়ের পানে চাহিল। জ্যোতির্ম্ময় অগ্রসর হইয়া আসিল, ঠিক সীতার সম্মুখে দাঁড়াইল। স্থির কণ্ঠে বলিল, "হাঁ, আমি আদেশ দিচ্ছি সীতা। তুমি জানো,—হ্যাঁ, ধর্ম্মতঃ দাদু তোমায় আমার হাতে অর্পণ করেছিলেন। লৌকিক না হ'লেও মেনে নিয়েছ তুমি আমার স্ত্রী। কোন দিন না মানলেও আজ আমি সেই স্বামিত্বের অধিকারে বলছি—"

সে সীতার শ্লথ, কম্পিত হাত দু'খানি দুই হাতে টানিয়া লইল—"তুমি আমার স্ত্রী, তুমি আমার আদেশ পালন করবেই। সীতা, চাও আমার দিকে—দাদুর আশীর্ব্বাদ,—চাও—"

সীতা তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িল, মুখখানি মাটির উপর রাখিয়া, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমি যাব,—আমি যাব সেখানে।"

কিয়ৎক্ষণ পরে সে যখন মুখ তুলিল, তখন জ্যোতির্ম্ময় চলিয়া গিয়াছে। দূরে গ্রাম্য পথে একখানি গরুর গাড়ীর পিছনের দিকটা দেখা গেল।

৪৮

সীতা আবার যখন রামনগরের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল, তখন ছোট বড় সকলেই ভারী খুসী হইয়া উঠিল। ক্ষ্যান্ত দাসী সীতার পায়ের ধূলা লইয়া উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদিয়া বলিল, "দেখ দেখি দিদিমণি, সোণার সংসার কি রকম ছন্নছাড়া হয়ে গেছে। এ যেন ভূতের বাড়ী হয়েছে,—যার যা খুসী সে তাই করছে,—কেউ কথা বলবারও নেই, কেউ শাসন করবার লোক নেই। বাড়ীতে সবাই, আছে, অথচ বাড়ীর লোক নেই। দেখুন দেখি, ঘরদোরগুলোর কি অবস্থা হয়েছে।"

সীতা শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, "আমি থেকেই বা কি করতে পারব, ক্ষ্যান্ত; যাদের যা স্বভাব, তা কি সহজে যায়?"

ক্ষ্যান্ত বলিল, "ওই ত' আপনার দোষ, দিদিমণি। নিজে কর্ত্রী হয়ে চোরের মত থাকেন বলেই ত লোকে এতটা প্রশ্রয় পায়। আপনি সকল ভার হাতে নিয়ে কর্ত্রী হয়ে থাকুন দেখি, কে এ রকম করতে সাহস পায় তাই দেখব। আমি অনেক কাল এ বাড়ীতে আছি, দিদিমণি, খোকাবাবুকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি; এ সংসার কি ছিল তাও দেখেছি, আজ কি হয়েছে তাও দেখছি। দিদিমণি, যে ঠাকুরের জন্যে বুড়ো কর্ত্তা প্রাণপাত করতেন, সেই ঠাকুরের দুর্দ্দশা দেখুন, তার পর আর কথা বলবেন। ম্যানেজারবাবু আগেকার মতই ঠাকুরের নৈবেদ্যের জন্যে ফল বাজার হতে কিনে পাঠান, বা বাগান হতে দেন; সে নৈবেদ্য আর কি আছে, দিদিমণি! কোন দিন একটু কিছু জুটলে তাই যে যথেষ্ট। ভশ্চায্‌মশাই নিত্যি বাঁ হাতে চোখের জল মুছে ডান হাতে পূজো করে যান। আপনি এসেছেন, ঠাকুরের ভার নিজের হাতে নিন্। সংসারের ভার নিন্, আমরা দেখে শুনে সুখী হই।"

শ্রীধরের পূজার এই ব্যবস্থা? সীতার মনে হইল, এই শ্রীধর ছিলেন দাদুর জীবন। দাদু সব ত্যাগ করিয়া এই শ্রীধরকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। সীতার দুই চোখ মুহূর্ত্তের তরে দীপ্ত হইয়া উঠিল।

বৃদ্ধা বামুন ঠাকুরাণী সীতার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল। এইরূপে যে যে প্রণাম বা আশীর্ব্বাদ করিতে আসিল, সকলেই চোখের জল ফেলিল।

সকলেই আসিলেন—আসিলেন না কেবল জয়ন্তী। তিনি নিজের ঘরে মেঝেয় উপুড় হইয়া পড়িয়া, দুই হাতের মধ্যে মুখখানি রাখিয়া নিঃশব্দে চোখের জলে মেঝে আর্দ্র করিয়া দিতেছিলেন।

সীতা পূর্ব্বেই সংবাদ লইয়াছিল জয়ন্তী এখানে আছেন। এখন খোঁজ লইয়া জানিল, তিনি নিজের ঘরে পড়িয়া কাঁদিতেছেন।

সীতা উপরে উঠিয়া গেল। জয়ন্তী মেঝেয় তখনও পড়িয়া ছিলেন। তিনি ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিলেন। তাঁহার সমস্ত দেহখানি রোদনাবেগে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। সীতা ভেজানো দরজা ঠেলিয়া প্রবেশ করিল; তাঁহার পার্শ্বে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, জয়ন্তী তাহা কিছুই জানিতে পারিলেন না।

এই শোকাচ্ছন্না জননীর ব্যথা সীতা বুঝিয়াছিল; কারণ, সেও ইভাকে বড় ভালবাসিয়াছিল। সে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বসিয়া পড়িল।

জয়ন্তী এইবার তাহার আসা জানিতে

পারিলেন। তথাপি তিনি মুখ তুলিলেন না, তাঁহার অশ্রুজল আরও বাড়িল।

কখন সীতার অজ্ঞাতসারে দুই ফোঁটা উষ্ণ চোখের জল জয়ন্তীর বাহুর উপর পড়িল, জয়ন্তী অশ্রুসিক্ত মুখখানি এইবার উঁচু করিলেন। সীতার চোখে অশ্রু দেখিয়া তাঁহার অশ্রুধারা আবার ঝরিতে লাগিল।

চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সীতা ডাকিল,—"মা, উঠুন; উঠে বসুন,—দেখুন, আমি এসেছি।"

"ওরে আমায় আর মা বলে ডাকিস নে, সীতা! আমি মা ডাক আর যে সইতে পারছি নে।"

জয়ন্তী এইবার হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সীতা তাঁহাকে জোর করিয়া টানিয়া উঠাইয়া বসাইল। আপন অঞ্চলে তাঁহার চোখের জল মুছাইয়া দিতে দিতে কান্নাভরা সুরে বলিল, "আপনার একটী মেয়ে গেছে, আর একটী মেয়ে যে আছে, মা। আপনি মা ডাক সইতে পারবেন না বললেই কি চলবে? এই মা ডাকই যে আপনার বুকের ক্ষততে প্রলেপ দেবে মা?"

জয়ন্তী দুই হাতে সীতার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার স্কন্ধের উপর মুখখানা রাখিয়া উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদিয়া বলিলেন, "আমি যে মনকে প্রবোধ দিতে পারছি নে, সীতা! আমি যে মা হয়ে তাকে নিশ্চিন্ত মরণের মুখে ঠেলে দিলুম! আমি যে তার মুখে বিষের পাত্র ধরলুম, মা! সে বলেছিল, আগে আমায় জানিয়েছিল, কেন আমি তার কথা কাণে নিলুম না। জোর করে তাকে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য করলুম। সীতা, অনেক সন্তানহারা মা আছে, তাদের সন্তান রোগে মারা যায়; আমার ইভু যে বড় জ্বালায় জ্বলে অবশেষে আত্মহত্যা করে সকল জ্বালা জুড়ালে, সীতা! আমায় যে শান্তি দেবার মত কিছু রেখে গেল না।"

সীতার চোখের জল জয়ন্তীর চোখের জলের সঙ্গে মিশিয়া গেল। জয়ন্তী জানিতেন, সীতা ইভাকে কতখানি ভালবাসিত; ইভার মৃত্যু সীতার বুকে কতখানি আঘাত দিয়াছে। এতদিন তিনি কাঁদেন নাই, ব্যথার ব্যথী কাহাকেও পান নাই,—আজ সীতাকে পাইয়া তাঁহার রুদ্ধ রোদনের উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

সন্তান-হীনা মায়ের মুখেই সীতা ইভার মৃত্যুর ব্যাপার জানিতে পারিল।

নিত্য প্রহার, নিত্য উৎপীড়ন অভাগিনী সহ্য করিতে পারে নাই। মা তাহার ঐশ্বর্য্য দেখিয়াছিলেন, স্বামীর নাম, বংশগৌরব, সবই দেখিয়াছিলেন,—চাহেন নাই কন্যার সুখ-অসুখের পানে। বড় ব্যথা পাইয়া, বড় ব্যথায় জ্বলিয়া সে দু'দিন মায়ের কাছে আসিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু মা তাহাকে আনিতে পারেন নাই, তাহার স্বামীর অনুমতি পান নাই। অভাগিনী ইভা আর সহ্য করিতে পারে নাই, তাহার যন্ত্রণা সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল; সে আত্মহত্যা করিয়া বাঁচিল। জীবনে সে শান্তি পাইল না, মরিয়া শান্তিলাভ করিতে গিয়াছে।

সীতা জয়ন্তীর বুকের মধ্যে মুখখানা রাখিয়া আর্দ্র কণ্ঠে বলিল, "আমায় মেয়ে বলে মনে ভাবুন, মা; আপনার ইভু নেই, আমারও যে কেউ নেই মা। দুনিয়ায় আমিও সব-হারাদের দলে পড়ে গেছি। ব্যর্থ জীবন নিয়ে দুনিয়ায় এসেছি, ঘুরেই বেড়ালুম মা; দুনিয়া আমার কাছ হতে সব নিলে, আমায় এতটুকু কিছু দিলে না, যা আমায় ক্ষণিকের শান্তি দিতে পারে। আমার অতীত দিনের দিকে তাকিয়ে দেখি সব শূন্য, কিছু নেই। ভবিষ্যৎ তেমনি অন্ধকারে ঢাকা। তবু বেঁচে আছি মা, তবু কর্ত্তব্য পালন করে যাচ্ছি, ক'রেও যাব। তবু একটা আশ্রয় চাই মা,—বড় শ্রান্ত হয়ে এক-জনের কোলে মাথাটা রেখে ক্ষণিকের বিশ্রামও ত' নিতে চাই মা।"

জয়ন্তী আর্দ্র কণ্ঠে বলিলেন, "তবে আমার বুকেই আয় মা, সীতা। আজ মনে পড়ছে, সেই আমি আর সেই তুই। তোকে ত' চিনতে পারি নি মা, তোকে কি ভেবেছিলুম, কি বলেছিলুম, আজ সেই সব কথা মনে করতে আমার মুখ দেখাতে ইচ্ছা হচ্ছে না। সে তোকে চিনেছিল, সে বলেছিল—মা, সীতা দি'কে চিনতে পারলে না, কিন্তু একদিন চিনবে। আজ চিনেছি সীতা, কিন্তু সে আমার আজ কোথায় গেল?"

আবার তাঁহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

৪৯

"ধীরে ধীরে এসো—আরও আস্তে এসো;—অত তাড়াতাড়ি করছ কেন?—যাবে এখনই—?—না, অত সহজে—অত তাড়াতাড়ি তোমায় তো যেতে দেবো না, সীতা!—কি?—তুমি কে?—কি চাও?—সীতাকে তুমি তাড়িয়ে দিতে এসেছ—

ওকে আমার কাছে থাকতে দেবে না?—উঃ, কে তুমি, রাক্ষসী?—কি ভীষণ তোমার ওই চোখ! —নরকের আগুন ছুটে আসছে!—চিনেছি, তোমায় চিনেছি,—তুমি,—দেবযানী!—তুমি আমার সীতাকে দূর করে তাড়িয়ে দিতে চাও?—"

জ্যোতির্ম্ময় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল,—আজ চার দিন তাহার প্রবল জ্বর, ঠিক একই ভাবে রহিয়া গিয়াছে। জ্বরের প্রাবল্যে সে কত কি বলিতেছে; কখনও জোর করিয়া উঠিয়া বসিতে চাহিতেছে। তাহার সুগৌর মুখখানি আরক্তিম হইয়াছে, চক্ষু দুইটী অতিরিক্ত লাল হইয়া উঠিয়াছে।

সাত আট মাস দেবযানী ঢাকায় ছিল। স্বামীর মনের ভাব বুঝিয়া কিছুদিন সে দূরে সরিয়া স্বামীকে তাহার অভাবটা বিশেষ করিয়া অনুভব করাইয়া দিবার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাহার,—তাহার অভাবে জ্যোতির্ম্ময় এই দীর্ঘ-কালেও কষ্ট অনুভব করে নাই।

মর্ম্মবেদনায় অস্থির হইয়া দেবযানী না ডাকিতেই ফিরিয়া আসিল। ফিরিয়া আসিল বটে, কিন্তু এবার সম্পত্তি সম্বন্ধে একটা বিহিত ব্যবস্থা করিয়া আসিল।

দশ বার দিন আগে এই বিষয়-সম্পত্তি লইয়াই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভীষণ বিবাদ হইয়া গিয়াছে। বিবাদের পরে দেবযানী আর স্বামীর সহিত কথা বলে নাই,—জ্যোতির্ম্ময়ও প্রাণপণে তাহার সঙ্গ পরিহার করিয়া চলিয়াছে। মাধবী জামাতার ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন,—তিনিও জামাতার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। একমাত্র সুরেশবাবু ছাড়া এ বাড়ীতে জ্যোতির্ম্ময়ের যথার্থ বন্ধু কেহ ছিল না।

স্ত্রী-কন্যার ব্যবহারে সুরেশবাবু অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। তিনি সাধারণতঃ অল্প-ভাষী ছিলেন—এই সকল ব্যবহারে তিনি বাক্যালাপ একেবারেই বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

জ্যোতির্ম্ময় এ বাড়ীতে থাকা অসহ্য বোধ করিয়া আর একটি বাসা ঠিক করিয়া যখন উঠিয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিতেছিল, ঠিক সেই সময়েই তাহার জ্বর আসিল।

কুপিতা দেবযানী বা মাধবী কেহই আসেন নাই; সুরেশবাবু অতিশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া ডাক্তার লইয়া আসিলেন। সেদিন অসুখের তৃতীয় দিন, জ্বর তখনও সমানই রহিয়াছে; রোগী অসহ্য যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, প্রলাপ বকিতেছে।

ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বিকৃত মুখে জানাইলেন, রোগীর অবস্থা যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে "পক্স" বাহির হইবার সম্ভাবনা।

তিনি ঔষধ না দিয়া বিদায় লইলেন।

সুরেশবাবু জ্যোতির্ম্ময়ের পার্শ্বে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তিনি এ অবস্থায় কি করিবেন তাহা ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না।

নিজের ঘরে অন্যমনস্কা দেবযানী একখানা বইয়ের পাতা উল্টাইতেছিল; দাসী হেম, তাহার কাছে গিয়া শুষ্ক মুখে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "ওমা কি হবে গো দিদিমণি, ডাক্তার বলে গেল, জামাইবাবুর না কি বসন্ত হবে, তাই তিনি এত ছট্‌ফট্‌ করছেন, জ্বরও কম পড়ছে না। মা গো! ও রোগের নাম শুনলে আমাদের গাঁয়ে সে পথ দিয়ে কেউ হাঁটে না; সেই রোগ বাড়ীতে এলো! এখন কি হবে গা দিদিমণি?"

দেবযানী বিস্ফারিত নেত্রে শুধু তাহার পানে তাকাইয়া রহিল, একটা কথাও তাহার মুখে ফুটিল না।

হেম তাহার মুখের ভাব না দেখিয়া বলিল, "তা আপনারা সবাই কেন জড়িয়ে পড়বেন, দিদিমণি? ও রোগের চিকিৎসা ত' নেই জানি, কেউ সেবা করতেও চাইবে না। শুনেছি, এখানে হাসপাতাল আছে, সেখানে পাঠিয়ে দিলে"—

"হেম!"

দেবযানীর দুই চোখ জ্বলিয়া উঠিল। সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তুই কি মনে করিস, তাঁকে আমরা হাসপাতালে পাঠিয়ে দেব? তাঁর জীবনটা এত ছোট, আর আমাদের জীবন এতই বড়? তুই যে এ কথা মুখে আনতে পেরেছিস,—কিন্তু না, তোকেই বা এ কথা বলি কেন? আমরা যে রকম ব্যবহার ওঁর সঙ্গে করেছি, তাতে শুধু তুই কেন? জগতের লোক বলবে, এ অবস্থায় উনি ঠিক এই উপকার,—হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া,—ছাড়া আর কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা আমাদের কাছে করতে পারেন না।"

সে চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল। তাহার করাঙ্গুলী ভেদ করিয়া ফোঁটা

ফোঁটা অশ্রুজল ঝরিয়া কোলে পড়িতে লাগিল। ব্যাপার দেখিয়া হেম আস্তে আস্তে পলাইল।

মাধবী যখন শুনিলেন জামাতার বসন্ত হইবে, তখন তাঁহার ফিটের মত অবস্থা হইল। অনেক কষ্টে সে ভাব সামলাইয়া লইলেন। তিনিও প্রস্তাব করিলেন, জ্যোতির্ম্ময়কে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হউক।

দেবযানী জ্বালাময় দু'টী চোখের দৃষ্টি মায়ের মুখের উপর তুলিয়া ধরিয়া শান্ত কণ্ঠে বলিল, "এ রোগে হাসপাতালে তেমন ক'রে সেবা করবে কে মা?"

মাধবী বলিলেন, "বাড়ীতেই বা কে সেবা করবে? ও কি যে-সে রোগ যে, যে-কেউ ওর সেবা করতে আসবে? বরং হাসপাতালে গেলেই ভাল, বাড়ীতে কে দেখবে?"

দৃঢ়কণ্ঠে দেবযানী বলিল, "আমি দেখব, আমি সেবা করব।"

"তুই! বলছিস কি যানী?" শিহরিয়া উঠিয়া মাধবী দেবযানীর পানে চাহিলেন। এ কথা যে দেবযানীর মুখ হইতে বহির্গত হইল, ইহা যেন তিনি বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। তিনি জানিতেন, দেবযানী জ্যোতির্ম্ময়কে কোন দিনই ভালবাসিতে পারে নাই। যে বিবাহ শুধু চোখের আকর্ষণেই ঘটিয়া গিয়াছে, প্রেম যাহাদের অন্তরে স্থান পায় নাই, তাহারা যে পরস্পরের জন্য কোন দিন ব্যাকুল হইয়া উঠিতে পারে, ইহা তিনি কোন দিন ধারণা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। যে দেবযানীর সহিত জ্যোতির্ম্ময়ের সম্বন্ধ নাই বলিলেও হয়, সেই দেবযানী আজ স্বেচ্ছায় জ্যোতির্ম্ময়ের সেবা করিতে যাইতেছে, এই রোগের সংক্রামকতা, ভীষণতা, কিছুই সে ভাবিল না।

দেবযানী দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ, মা, আমিই সেবা করব। মা, যতদিন ভাল ছিলেন, ততদিন ঝগড়া করেছি, রাগ ক'রে চলে গেছি; তুমি ভেবেছ, আমি তাঁকে দেখতে পারি নে, আমি তাঁকে ভালবা'সতে পারি নি। কোন্‌খানে তাঁকে আসন দিয়েছি। আজ মনে হচ্ছে, কতখানি নিঃসহায় উনি, দুনিয়ার সকল আত্মীয়-স্বজনের বুক হ'তে ওঁকে আমি ছিনিয়ে এনেছি। মনে কর মা, আমার জন্য যিনি মা ত্যাগ ক'রেছেন, দাদুকে ত্যাগ ক'রেছেন, অতুল সম্পত্তি ত্যাগ ক'রেছেন, তিনি কে? তাঁকে কতখানি শ্রদ্ধা করতে পারা যায়? কোন দিন তাঁর এই ত্যাগের দিকটা দেখেছ কি মা? তুচ্ছ এই নারীর জন্যে তিনি যে কি ছেড়ে এলেন, তা কি একবার ভেবেছ মা? আমিও ভাবি নি, তাই না তাঁকে অহোরাত্র আঘাত দিয়েছি। কত সময় কত চোখের জল তিনি গোপনে মুছে ফেলেছেন, সে জল কি রকম বেদনায় ঝরে প'ড়েছে মা? আজ আমি, তাঁর স্ত্রী,—তাঁর ধর্ম্মপত্নী, তাঁর সেবা করব না, নিজের জীবনের ভয়ে তাঁকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেব, এমনিই কি আমায় ভেবেছ, মা? তাই কি হ'তে পারে? পাশ্চাত্য শিক্ষায় আমায় শিক্ষিতা করেছ, নিজের ঘরের কথা কখনও আমার কাণে তুলে দাও নি, তবু আমার মনে যে সত্য জেগে উঠেছে, তাকে তো আমি সেই পাশ্চাত্যের মোহে ডুবাতে পারছি নে। আমি জানছি, আমি যাই-ই হই, যত শিক্ষাই পাই, তবু আমি নারী, ভারতে আমার জন্ম। ভারতীয় নারীর আদর্শ আমি তো চাপা দিতে পারি নি, মা; এ যে আমার স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান। আমার বুকের মধ্যে বিবেক হাহাকার করে কেঁদে বলছে,—নারীর লক্ষ্য পতির চরণ, নারীর সাধনা পতির সেবা, নারীর শিক্ষা একনিষ্ঠ প্রেম,—এ সবই যে এ দেশের মেয়ের জীবনের ভিত্তি। আমায় নারীর কর্ত্তব্য পালন করতে বাধা দিও না,—সন্তানের ভক্তিচ্যুতা হ'য়ো না। আমায় উৎসাহ দাও, আমায় মানুষ হ'তে দাও। আমার জীবনকে সার্থকতায় ভ'রে দাও।"

দুই হাতের মধ্যে সে মুখখানি লুকাইল। মাধবীর মুখখানি লাল হইয়া উঠিল। লজ্জায় ঘৃণায় তিনি আর কন্যার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিলেন না।

সুরেশবাবু আশু বিপদে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন। কাহার হস্তে জামাতার ভার অর্পণ করিবেন ভাবিয়া অবশেষে সীতাকেই 'টেলিগ্রাফ' করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, সীতা জ্যোতির্ম্ময়কে কতখানি ভক্তি করে, কতখানি ভালবাসে। জ্যোতির্ম্ময়ের পীড়ার সংবাদ পাইলে সীতা যে মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিতে পারিবে না, ইহা তিনি নিশ্চিত জানিতেন।

জ্যোতির্ম্ময় যখন যন্ত্রণায় অতিশয় ছটফট্ করিতেছিল, তখন দেবযানী আসিয়া মূর্ত্তিমতী দেবীর ন্যায় তাহার পার্শ্বে বসিল। সুরেশবাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া প্রথমে কিয়ৎক্ষণ কন্যার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার অন্তরের কঠিনতা ধীরে ধীরে কোমল পর্দ্দায় নামিয়া আসিল। দেবযানীর মুখে তিনি এরূপ একটি ভাবের আভাস

পাইলেন যে, তাঁহার অন্তর শ্রদ্ধায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

রুদ্ধকণ্ঠে তিনি ডাকিলেন,—"যানী, এ কি মা?"

তৃষ্ণার্ত্ত স্বামীর মুখে চামচ করিয়া জল দিয়া রুমাল দ্বারা সযত্নে মুখ মুছাইয়া দিতে দিতে দেবযানী উত্তর করিল, "আমার কাজ করতে এসেছি বাবা। যদিও আমি সুখে দুঃখে সব সময়েই স্বামীর সহধর্ম্মিণী পত্নী, তবুও সুদিনে শুধু মিছে ঝগড়া করে বড় বেদনা দিয়েছি। আজ এই দুর্দ্দিনে মনে পড়ল আমি এঁর স্ত্রী। আমার জন্যে যিনি সব ত্যাগ করে আসতে পেরেছেন, তাঁর যদি আমি এতটুকু সেবাই না করতে পারি, বাবা, জানব আমি মানুষ নই, জানব আমার শিক্ষাদীক্ষা সবই ব্যর্থ।"

সুরেশবাবুর চক্ষু দুইটি অকস্মাৎ জলে ভরিয়া উঠিল। তাঁহার পুত্রাধিক প্রিয় জ্যোতির্ম্ময়,—সেই জ্যোতির্ম্ময়কে পাইয়া তাঁহার স্ত্রী, কন্যা, তাহাকে চিনিতে পারে নাই, এই ক্ষোভ তাঁহার অন্তরে বড় বেদনা দিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে জ্যোতির্ম্ময়ের মস্তকে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে তিনি ভাবিতেছিলেন,—সংসারে কিছুই সত্য নয়,—নারীর সতীত্ব বোধ হয় একেবারেই মিথ্যা;—'সতীত্ব' কথাটা সম্পূর্ণ অমূলক। জীবনে তাঁহার এই প্রথম মনে হইতেছিল, বোধ হয় নারী ভালবাসিতে জানে না,—ভালবাসার অভিনয় করিয়া যায় মাত্র।

কিন্তু, নাঃ;—ভগবান অকরুণ নহেন। নারীর বাহির কঠিন করিলেও, অন্তর নারীজন-সুলভ কোমলতায় স্নিগ্ধ। অন্তরের স্নেহ-উৎস নারীর শুকায় নাই। যতই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হউক,—এ দেশের নারীর প্রাণ এ দেশের মতই থাকিবে;—এই প্রকার বিপদকালেই তাহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইবে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, কয়েক দিন পরে আজ সুরেশবাবু নিশ্চিন্ত হইয়া জ্যোতির্ম্ময়ের শয্যা ত্যাগ করিলেন।

৫০

সীতাকে টেলিগ্রাফ করা হইয়াছে,—বাড়ীর আর কেহ এ কথা জানিত না;—জানিতেন কেবল সুরেশ বাবু। এ কথা বাড়ীর আর কাহাকেও তিনি বলেন নাই।

দেবযানী জ্যোতির্ম্ময়ের নিকটে যে দিন হইতে আসিয়া বসিয়াছিল, তাহার পর আর নড়ে নাই। সুরেশ বাবুর বিশেষ পীড়াপীড়িতে—তাঁহাকে সেখানে বসাইয়া,—সে অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া আসিত। পূর্ব্বকৃত কার্য্যের অনুশোচনায় ও বর্ত্তমান দুশ্চিন্তায়, এবং অত্যন্ত পরিশ্রমে সে একেবারে শুকাইয়া উঠিতেছিল। জ্যোতির্ম্ময়ের জ্ঞান প্রায় ছিল না বলিলেই চলে; তাহার জ্ঞান হইল বসন্ত ফুটিয়া বাহির হইবার পরে।

সে চোখ মেলিয়া চাহিতেই পার্শ্বে দেবযানীকে দেখিয়া প্রথমে স্তম্ভিত হইয়া গেল—বিশ্বাস করিতে পারিল না যে, দেবযানী তাহার পার্শ্বে এরূপভাবে বসিয়া থাকিতে পারে।

পাশ ফিরিয়া শুইতে গিয়া সর্ব্বাঙ্গে দারুণ বেদনা অনুভব করিয়া সে একপ্রকার অস্ফুট ধ্বনি করিয়া উঠিল। দেবযানী ব্যথাভরা কণ্ঠে বলিল "বেশী নড়ো না। যখন পাশ ফেরার দরকার হবে, বলো,—আমি পাশ ফিরিয়ে দেবো।"

ক্ষীণকণ্ঠে জ্যোতির্ম্ময় জিজ্ঞাসা করিল,—"আমার কি হয়েছে?"

"বসন্ত—।"

"বসন্ত?" জ্যোতির্ম্ময় শিহরিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। দেবযানী সস্নেহে তাহার মস্তকে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল, "ভয় কি? দু'দিনেই সেরে উঠবে।"

জ্যোতির্ম্ময়ের কম্পিত ওষ্ঠ ভেদ করিয়া একটী মাত্র শব্দ বাহির হইয়া আসিল,—"মা—!" সঙ্গে সঙ্গে তাহার আরক্তিম চক্ষু দিয়া দর দর অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল।

দেবযানী সন্তর্পণে তাহার অশ্রুজল মুছাইয়া দিতে দিতে আর্দ্র কণ্ঠে বলিল, "বসন্ত হয়েছে শুনে তুমি এত মুসড়ে পড়ছ কেন? ভয় কি? আমার জীবন-পণ,—আমি তোমায় রক্ষা করব। তুমি একদিন আমায় বলেছিলে, 'সতী স্ত্রী তার স্বামীকে মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা রাখে।' আমিও তোমার সেই স্ত্রী; আমি তোমায় আমার প্রাণ দিয়েও বাঁচাব, তোমার এতটুকু ক্ষতি হ'তে দেবো না।"

এই কি সেই দেবযানী? কিছুকাল পূর্ব্বে যে স্বামীর সহিত বিবাদ করিয়া মুখদর্শন করিবে না বলিয়া অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছিল, এই কি সেই? জ্যোতির্ম্ময় ক্ষণিকের জন্য বিস্ফারিত নেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর চক্ষু মুদ্রিত

করিয়া মাথা নাড়িয়া ধীর কণ্ঠে বলিল, "আমার এই রোগশয্যার পাশে এটুকু ছলনায় অভিনয় করার কোন দরকার নেই দেবযানী ; আমার—"

"ছলনা ?—ওগো, না, না ; আমি সত্য ব'লছি, ভগবানের নামে বলছি—"

দেবযানী জ্যোতির্ম্ময়ের বুকের উপর মুখখানি রাখিয়া—ঝর ঝর করিয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিল,—"আমি অনেক অপরাধ করেছি, আমায় মাপ কর। আমি ভুলে গিয়েছিলুম, তুমি আমার সর্ব্বস্ব, তুমি আমার অর্থ সম্পদ, সকলের উপরে,—অথচ তোমায় সামান্য অর্থের জন্য কত কথাই না বলেছি !—তোমার বুকে কত ব্যথাই না দিয়েছি ! আজ আমার সকল দোষ মার্জ্জনা কর গো, শুধু তোমার স্ত্রী-রূপে তোমার পাশে আমায় থাকবার অধিকার দাও, তোমার সেবা করবার অধিকার দাও।"

"দেবযানী—"জ্যোতির্ম্ময় আর কথা বলিতে পারিল না। দুইটী হাতে শুধু সে তাহার মুখখানি উঁচু করিয়া ধরিল। আজ দেবযানীর মনের ক্লেদ অশ্রুজলে ধুইয়া গিয়া তাহাকে যে পবিত্র সৌন্দর্য্য দান করিয়াছিল, তাহা অপূর্ব্ব। জ্যোতির্ম্ময় সেই মুখখানি নিজের মুখের উপর টানিয়া আনিল। পতি-পত্নীর প্রকৃত মিলন এতদিন পরে ঘটিল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দরজার সবুজ পর্দ্দা দুই হাতে দুই পার্শ্বে সরাইয়া মধ্যস্থলে দাঁড়াইল সীতা। হঠাৎ স্বামী-স্ত্রীর পানে দৃষ্টি পড়িতেই সে পর্দ্দা ছাড়িয়া অন্তরালে সরিয়া গেল। বাহিরে অন্যমনস্ক সুরেশবাবু সীতার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "ঘরে চল মা, এই ঘরে জ্যোতি রয়েছে।"

টেলিগ্রাম পাইবামাত্র সীতা প্রশান্তকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া আসিয়াছিল। এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিতে পারে নাই।

সীতার মুখখানি মুহূর্ত্তের জন্য বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু, তৎক্ষণাৎ সে আপনাকে সামলাইয়া লইল।—ছিঃ, কেন তাহার মনে এ ভাব জাগিয়া উঠিল,—সে যে সন্ন্যাসিনী। এক-জনকে ভালবাসিয়া সে জগৎকে ভালবাসিয়াছে ; সকলের শুভ তাহার কামনা। আত্মবিস্মরণ হইলে ত' তাহার চলিবে না।

ধীর পদে সে কক্ষে প্রবেশ করিল ; সুরেশবাবু তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন।

তাহার প্রথম প্রবেশ সময়ে জ্যোতির্ম্ময় বা দেবযানী—কেহই তাহাকে দেখিতে পায় নাই। পুনরায় প্রবেশ কালে তাহার পানে দৃষ্টি পড়িতেই জ্যোতির্ম্ময়ের মুখমণ্ডল রাঙা হইয়া উঠিল। সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। বিস্মিতা দেবযানী অনিন্দ্যসুন্দরী সাক্ষাৎ দেবীমূর্ত্তি সম্মুখে দেখিয়া ত্রস্তে বিছানা ছাড়িয়া নীচে দাঁড়াইল।

সুরেশবাবু পরিচয় করাইয়া দিলেন—"যানী, যে সীতার নাম তুমি পূর্ব্বাপর শুনে আসছ,—চোখে যাকে আজও দেখতে পাওনি, এই সেই সীতা।" সীতার দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন, "মা, এটী আমার মেয়ে, তোমার বোন দেবযানী,—জ্যোতির স্ত্রী।"

সীতার পানে তাকাইয়া দেবযানীর সমস্ত অন্তর শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। এমন সুন্দর রূপ হয় তো আর কাহারও থাকিতে পারে, কিন্তু যে জ্যোতিঃ সে সীতার মুখে, সীতার সর্ব্বাঙ্গে বিকশিত হইতে দেখিল, এমন জ্যোতিঃ পৃথিবীর অধিবাসী, সংসারের সুখদুঃখে জড়িত মানুষের মুখে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। সীতার পরিধানে অতি সূক্ষ্ম পাড়-যুক্ত সূক্ষ্ম ধুতি, দুইটী প্রকোষ্ঠে শঙ্খ বলয়, রুক্ষ চুলগুলি তাহার ভোগ-স্পৃহাশূন্যতার সাক্ষ্য দিতেছিল। তাহার চোখে-মুখে একটা আন্তরিক উৎকণ্ঠা ফুটিয়া উঠিতেছিল।

যৎসামান্য দুই একটী কথায় দেবযানীর সহিত আলাপ করিয়া সীতা ধীরে ধীরে জ্যোতির্ম্ময়ের পার্শ্বে বসিল। সেই সময়ে দেবযানীর মনে হইল,—মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিয়া যদি কেহ তাহার স্বামীকে ফিরাইয়া আনিতে পারে, তবে সে সীতা ব্যতীত আর কেহ নহে।

দেবযানীর শুষ্ক মুখের পানে তাকাইয়া মৃদুকণ্ঠে সীতা বলিল, "শুনলুম, আজ কয় দিন তুমি এ যায়গা ছেড়ে ওঠ নি। স্ত্রীর উপযুক্ত কাজই ক'রেছ। আজ আমি এসেছি, তোমায় তেমন ভাবে আর একা বসে থাকতে হবে না ; আমরা দুই বোনে রোগীর সেবা করব।"

দেবযানীর শুষ্ক মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

৫১

অবিরত রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া দেবযানী শ্রান্ত হইয়া পড়িল ; কিন্তু, সীতা শ্রান্ত হইল না। তাহার কার্য্য, ধীরতা, হৃদয়ের মহত্ত্ব দেবযানীকে তাহার পানে অত্যন্ত আকর্ষণ করিল। দেবযানী তাহার কাছে আপনাকে নত করিয়া ফেলিল।

ধীরে ধীরে জ্যোতির্ম্ময় আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইল। সে যে দিন পথ্য করিল, তাহার পরদিন সীতা দেশে ফিরিবার প্রস্তাব করিল।

দেবযানী তাহার হাত দু'খানি নিজের হাতে টানিয়া লইয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আর দু'দিন থেকে যাও, দিদি। আমার বড় ইচ্ছা, তোমায় এখানে আরও দু'দিন রাখি,—তোমার বুকে মাথাটা রেখে বড় শান্তি পাই।"

সীতা তাহার মুখখানি বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া, তাহার ললাটোপরি পতিত অসংযত চুলগুলি সরাইয়া দিতে দিতে একটু হাসিয়া বলিল, "অনেক দিন এসেছি ভাই, আর থাকা চলে না। ও দিকে কি সব হচ্ছে তার ঠিক নেই। আমি না থাকলে কেউ কিছু করে না, সবাই কাজে ফাঁকি দিয়ে চলতে চায়। বিশেষ শ্রীধরের বন্দোবস্ত করে আসি নি, ম্যানেজার দাদাকে বলে এসেছি—কি হচ্ছে কি জানি।

দেবযানী বলিল, "তা' জানি দিদি, তুমি না থাকলে কিছু হয় না। তোমায় আমি জোর করে রাখতে চাই নে, কারণ সত্যই শ্রীধরের সেবা ভাল ক'রে হবে না। তুমি মনে করো না, আমি সেখানকার খবরই নিই নে। যদিও কখনও সেখানে যাই নি, তবুও সব শুনে আমার মনের মধ্যে এমন একটা ছবি এঁকে রেখেছি যে, তুমি যদি জিজ্ঞাসা কর কোথায় কি আছে—তা সবই হয় তো বলে দিতে পারব।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিল, "সত্যি, ভাই দিদি, আমার বড় ইচ্ছা করে একবার সেখানে যেতে। ওঁকে বললুম কাল,—কিন্তু, উনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। দিদি, আমাদের সে বাড়ীতে যাবারও কি অধিকার নেই? কেন, দিদি! দেবতা সেখানে আছেন বলেই যদি সেখানে যাওয়ার অধিকার আমাদের না থাকে, তবে যে দেবতা একই হাতে সকলকে সৃষ্টি ক'রেছেন, তিনি কেন আমাদের তাঁর সৃষ্টির মধ্যে পাঠিয়েছেন, দিদি? তুমি একটার মধ্যে সীমাবদ্ধভাবে যাঁকে পূজা কর, তিনি কি এতই ক্ষুদ্র যে সারা দুনিয়ার মালিক হয়ে, জগৎসংসার ত্যাগ ক'রে তিনি আপনার স্থান ঐ ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই ঠিক ক'রে নিয়েছেন, দিদি! কিন্তু, সত্যই যদি তাঁর স্থান শুধু ঐ ক্ষুদ্র গণ্ডীটুকুর মধ্যেই না থাকে, যদি তিনি—"

সীতা মৃদু হাসিয়া বাধা দিয়া তাহাকে বলিল,—"ভুল করছ ভাই! দেবতা যে সীমাবদ্ধ স্থানেই আবদ্ধ নন, সে কথা খুবই সত্য। কিন্তু, তার জন্যেই যে তোমাদের সেখানে যাবার কোন অধিকার নেই, এ কথা কে বলেছে বোন? দাদু বলে গেছেন,—'যদি ইনি ফিরতে চান, তবে ফিরতে পারেন।' যদি সত্য জ্ঞান,—সত্য আকর্ষণ থাকে, কেন যেতে পারবে না ভাই?"

দেবযানীর মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল;—"তবে অনুমতি দাও দিদি, ইনি একটু বল পেলেই আমি ওঁর সঙ্গে ওখানে যাব।"

সীতা একটু হাসিয়া বলিল,—"অনুমতি কিসের ভাই! তোমার যখনই ইচ্ছা তুমি যাবে। তোমার ঘরে তুমি যাবে তাতে কার অনুমতি চাচ্ছ, দিদিমণি? আমি তোমার সম্পত্তি রক্ষা করছি, তোমার ঘর রক্ষা করছি—"

দেবযানী তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল,—"না, না,—ও কথা যদি মুখে আনো দিদি, তা হ'লে আমি যাব না। উনি যদি শুনতে পান তোমার এই কথা, তা'হলে কক্ষনো যাবেন না।"

সীতা বলিল, "না—না, আর বলব না। তোমরা যেদিন খুসি আমার বাড়ীতে যেয়ো, দেখে শুনে এসো।"

দেবযানী তাহার উদার মুখখানির পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তাহার পর, তাহার বুকের মধ্যে মুখখানি লুকাইয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "জানো ভাই, তোমার সম্বন্ধে আমি কি কুৎসিত ধারণা ক'রেই রেখেছিলুম। আজ সেই সব কথা মনে করতে আমার সমস্ত বুকটা যে বিষিয়ে উঠছে। আমি ভেবেছিলুম—"

সীতা সস্নেহে বলিল, "সে আমি কতক জানি। তোমার আর সে সব পুরানো কথা তুলতে হবে না। যা অতীতে মিশে গেছে,—তা অতীতেই থাক দিদি, তাকে আর টেনে তুলে কাজ নেই।"

দেবযানী সীতার উজ্জ্বল মুখখানির পানে আবার মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিল। দুই হাতে তাহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল,—"তুমি দেবী—"

সীতা হাসিল,—"না, আমি মানুষ; দেবী হওয়ার যোগ্যতা এখনও পাই নি ভাই; তবে পাওয়ার সাধনা করছি মাত্র।"

* * * *

বিদায়-মুহূর্ত্তে সীতা জ্যোতির্ম্ময়ের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সে একখানি সোফার চুপ করিয়া পড়িয়া আছে। কি একটা অজানা ব্যথায় তাহার

সমস্ত বুকখানি তখন ভরিয়া গিয়াছিল। আজ সীতা চলিয়া যাইতেছে ; তাহার আশা, আনন্দ,—সবই যেন সীতার সহিত চলিয়া যাইতেছে।

গলায় অঞ্চল জড়াইয়া সীতা নতজানু হইয়া তাহার পায়ের কাছে ঢিপ করিয়া প্রণাম করিতেই, সে চমকিয়া উঠিয়া, সীতার উপর দৃষ্টি অবনত করিল।

পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া সীতা সংযত কণ্ঠে বলিল, "আমি এখন চলে যাচ্ছি, আপনি দেবযানীকে নিয়ে একদিন যাবেন।"

"চলে যাচ্ছ, সীতা ?—"

তাহার বিকৃত কণ্ঠস্বরে চমকাইয়া সীতা তাহার মুখের উপর দৃষ্টি রাখিল। জ্যোতির্ম্ময়ের ব্যগ্র, ব্যাকুল দুইটী চোখের দৃষ্টির সহিত আপনার দৃষ্টি মিশিয়া যাইতেই সে তৎক্ষণাৎ চোখ নামাইল।

শান্ত কণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি।"

"সীতা।" আত্মসম্বরণে অসমর্থ জ্যোতির্ম্ময় তাহার একখানি হাত ধরিয়া নিজের ললাটে রাখিল। "অসুস্থ অবস্থায় এই কপালে হাত দিয়েছ সীতা, আজ সুস্থ অবস্থায় শেষ একবার হাতখানা দিয়ে যাও।"

সীতার মুখখানি বিবর্ণ হইয়া গেল। সে হাতখানি টানিয়া লইতে গেল,—পারিল না।

জ্যোতির্ম্ময় হাত ছাড়িয়া দিল,—"ভুল হ'য়েছে সীতা, না, তুমি যাও, আমি তোমার যাওয়ায় বাধা দেবো না। সীতা, তুমি দেবী, আমার মত মানুষকে কেন তোমার পাশে আবার ডাকছো, সীতা! তুমি কতখানি ওপরে উঠেছ, আমি তোমার নাগাল পাওয়ার যোগ্য নই ; তোমায় হয় তো আমার বাসনাপূর্ণ আকর্ষণে কতটা নেমে পড়তে হবে। আমায় মাপ কর সীতা, আমি তোমার কাছে আর যাব না ; আমি শয়তান, আমায় তফাতে রাখো।"

সে দুই হাতে মুখ ঢাকা দিল।

ধীর পদে সীতা অগ্রসর হইয়া আসিল, তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার স্কন্ধে হাত দিল। স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, "তুমি আমায় আমার স্থান হ'তে সরাতে পারবে না, সে শক্তি আমার আছে ; আমি তোমায় টেনে তুলব, এ সাহস আমার আছে। একটী আলো জ্বললে অনেকখানি অন্ধকারকে তাড়াতে পারে। আমি যে আলো পেয়েছি, এই আলো দিয়ে তোমাদের পথ দেখাব। তুমি যত বড়ই শয়তান হও, তোমায় সাধু হতেই হবে,—তুমি যে আমার স্বামী। স্ত্রী তার স্বামীকে যদি মরণের মুখ হতে টেনে আনতে পারে, পাপ-পথ হতে কেন ফেরাতে পারবে না।—তুমি চমকে উঠলে।—সে দিন স্বামীত্বের দাবীতে যে আদেশ দিয়ে এসেছিলে, তার অনেক আগেই যে আমার এই বুকখানা জুড়ে ব'সে আছ। জন্ম-জন্মান্তর হতে আমি তোমার স্ত্রী, তুমি আমার স্বামী। কত জন্ম হ'তে আমরা এমনিই আসা-যাওয়া করছি ; হয় তো, গত জন্মের আমার কোন ত্রুটীতে আজ কাছছাড়া হয়ে পড়েছি। কিন্তু, তাতে ত আমার কোন কষ্ট নেই। সংসার যখন তার রঙীন আলো আমার সামনে ফুটিয়ে তুলেছিলো, তখন বড় ব্যথা পেয়েছিলুম, কারণ, ভেতরের প্রাণে ত' তখন চাই নি। চেয়েছিলুম, সংসারের জীব রূপেই শুধু উপভোগ করে যেতে। সে ভুল ভেঙেছে, এই সব দেওয়ার মাঝে আমি যা পেয়েছি তা' কেউ পায় না, দেবযানীও তা' পায় নি। আজ ভাবি যদি তোমায় স্বামী রূপে বড় কাছে—একেবারে পাশে পেতুম, তাতে আমার কি লাভ হ'তো ? আজ মনে ভাবি—তাতে আমি কিছু পেতুম না। আমি যা পেয়েছি তা' অপূর্ব্ব,—তা শ্রেষ্ঠ জিনিস। আমি তোমায় পাই নি, তাই জগৎকে পেয়েছি। তোমায় ভালবেসে সকলকে ভালবাসতে পেরেছি। আশীর্ব্বাদ কর, যেন এই পথে সকলকে ভালবেসে চলতে পারি ; আমার লক্ষ্য যেন তোমারই ওপরে থাকে।"

সে আবার নত হইয়া পায়ের ধুলা লইল।

"সীতা, সীতা—"

জ্যোতির্ম্ময় হাত দুইখানি বাড়াইয়া দিল। সীতা দূরে সরিয়া গেল ; বলিল,—"আমায় কাছে পেতে চেয়ো না, এ জন্মে তুমি দেবযানীর স্বামী ; স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য পালন কর।"

একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া জ্যোতির্ম্ময় বলিল, "তাই করব সীতা। তুমিও তোমার পতিত স্বামীর জন্ত ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর। তোমার প্রার্থনা আমায় পথ দেখাবে সীতা, আমায় আলো দেবে।"

"ওখানে যাবে ত' দেবযানীকে নিয়ে ?"

জ্যোতির্ম্ময় উত্তর দিল, "তুমি যখন বলবে তখনই যাব।"

সীতা বলিল, "আমি পত্র দেবো।"

ধীরে ধীরে সে চলিয়া গেল। দুই হাতে কপাল টিপিয়া জ্যোতির্ম্ময় পড়িয়া রহিল।

সমাপ্ত

আপ টু ডেট

অতি আপ-টু-ডেট মেয়ে শাশ্বতী রায়—

কলেজে কোন মেয়ে তার নাগাল পায় না। নিত্য দেখা যাবে তার নূতন ষ্টাইল এবং ষ্টাইল যে সত্যই অনবদ্য সুন্দর, এ কথা কোন মেয়েই অস্বীকার করতে পারবে না। তার ষ্টাইল অনুকরণ করার চেষ্টা বৃথা, আজ যা করবে, কাল আর একরকম করে আসবে। তা ছাড়া তার অনুকরণ করাটাকে সে বিশেষ অনুকম্পা-মিশ্রিত ঘৃণার চোখেই দেখে।

কেবল কলেজেই নয় কলেজের বাইরেও সে খ্যাত, তার রূপ তার নিত্য নূতন ষ্টাইলের জন্য সে বিশেষ পরিচিতা। তার পিতা মিঃ বি, রায় অর্থাৎ বিনোদ রায় সহরের মধ্যে বিখ্যাত ধনী, একটি মাত্র মেয়ে—তার ওপর সে মাতৃহারা, তার মনস্তুষ্টির জন্য তিনি অকাতরে জলের মত অর্থ ব্যয় করে থাকেন।

ষ্টাইল যতই করুক—কাজে সে ঠিক আছে। কলেজে—সে খুব ভাল মেয়ে, পড়াশুনায় সে সকলের প্রথমই হয় বরাবর; এদিকে ব্যাডমিণ্টন, টেনিস, সাঁতার, সাইকেল, সব কিছুতেই তার পারদর্শিতা আছে।

অত্যন্ত খেয়ালী মেয়ে, যখনই যা ধরবে তখনই তা করা চাই। বাড়ীতে পিতা ছাড়া দেখতে কেউ নাই, বাধা সে জীবনে কোন দিনই পায়নি। আগে বরাবর মেম গভর্ণেস ছিলেন, হঠাৎ একদিন তার স্বদেশী-প্রীতি জন্মে গিয়েছিল, সে স্পষ্টই জানালে মেয়ের কাছে সে আর পড়বে না—বাঙ্গালীর মেয়ে অনেক আছেন যাঁরা অনায়াসে তাকে শিক্ষা দিতে পারবেন—তবে অনর্থক মেম রেখে লাভ কি?

পিতা প্রথমে একটু আপত্তি করেন কিন্তু মেয়ে যা খেয়াল ধরেছে তার ব্যতিক্রম হয় না, স্পষ্টই সে বললে—"তবে থাক বাবা, আমি আর পড়ব না।"

অগত্যা মিঃ রায়কে রাজি হতে হয়।

রাজি না হয়েই বা উপায় কি—মেয়েকে তাঁর রীতিমত ভয়ও করতে হয়।

২

এই সংসারে হঠাৎ হয়ে গেল সব উলট-পালট, যার ধাক্কা সামলাতে মিঃ রায়কে রীতিমত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তে হল।

কিছুদিন পরের কথা—

একদিন একটা কুলির মাথায় একটা রংচটা টিনের বাক্স ও একটা ময়লা ছিন্ন সতরঞ্চি জড়ানো বিছানা চাপিয়ে যে ছেলেটি সন্ত্রস্তভাবে গেটের ভিতর প্রবেশ করলে—তাকে শাশ্বতী চিনতো না, চিনতেন মিঃ রায়।

ছেলেটাকে দেখেই তিনি মহাব্যস্ত হয়ে উঠলেন "তাই তো, আমাদের পতিন এসে পড়েছে যে। এসো এসো বাবাজি, আমি তোমার জন্যে আজ কয়দিন অপেক্ষা করছি।"

পুরা সাহেব মিঃ রায়কে এমন খাঁটি বাঙ্গালীর ভাবে শাশ্বতী কোনদিন দেখেনি, এ তার কাছে এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার, তাই সে পরম বিস্ময়ে পিতার পানে তাকিয়ে রইলো।

ছেলেটিকে দেখে সে মোটের উপর মোটেই খুসি হতে পারলো না। হাঁটুর উপর উঠেছে কাপড় খানা,—সরু লালপাড়, মোটা যেন চট,—গায়েও ঠিক তেমনি একটা জামা। মাথার চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা, তাতে না আছে শ্রী, না আছে কোন ছাঁদ; পায়ে অতি সাধারণ একজোড়া স্যাণ্ডেল। এ যেন কাল-বৈশাখীর ঝড়—তাদের পিতা-পুত্রীর সাজানো সংসারে এক মুহূর্ত্তে এসে পড়ে সব উলট পালট করে দিলে।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে শাশ্বতী পাতঞ্জলের পানে চেয়ে থাকে। তার সে রুক্ষ কর্কশ দৃষ্টির সামনে বেচারা পাতঞ্জল ভীষণ রকম সঙ্কুচিত, লজ্জিত

হয়ে পড়ে, সে ভীত শশক-শিশুর মত মাটীর পানে দৃষ্টি রাখে।

শাশ্বতী পিতার পানে তাকায়, একটু রুক্ষ কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করে—"কই বাবা, এর আসার কথা তুমি তো আমার কিছু জানাওনি,—তার মানে?"

পিতা যেন একটু থতমত খেয়ে যান, পর মুহূর্ত্তে তিনি সশব্দে হেসে ওঠেন,—"তোকে জানাব কি,—তুই সবসময় বাড়ী থাকিস? কলেজ আছে, নানা জায়গায় পার্টি, সভা সমিতি—ঐই সব নিয়েই তো ব্যস্ত থাকিস, জানাব কখন তাই বল।"

কলেজ, পার্টি, সভাসমিতি—

কথাগুলো পাতঞ্জলের মনে বেশ একটু দোলা দেয়, আস্তে আস্তে চোখ তুলে সে শাশ্বতীর পানে তাকায়—

বাবা, রীতিমত মেমসাহেব,—শাড়ি খানা যা পরেছে, তাও অতি বিচিত্র। পাতঞ্জলের গাঁয়ে কোন মেয়েকে এমন অদ্ভুত বেশে সাজতে পাতঞ্জল কখনও দেখেনি। চুলগুলা আবার বাবরি করা,—বাবরি চুল তো পুরুষ মানুষেই রাখে, মেয়েরাও আবার রাখে নাকি?

দেখা যায়—শাশ্বতী একেবারে এতটুকু খুসি হয়না, সে জিজ্ঞাসা করে, "এখানে থাকবে বুঝি—সে সব কথাবার্ত্তাও হয়ে গেছে?"

পিতা কেমন যেন নিজেকে বিপন্ন মনে করেন, বললেন—"এইখানেই থাকবে বই কি, কলকাতায় চেনা কেউ তো নেই—যাবেই বা কোথায়? তা ছাড়া পাড়াগাঁয়ের ছেলে, কলকাতা তো কখনও দেখেনি, এই তো সবে নতুন এসেছে। আচ্ছা, কি আক্কেল তোমার পতিন, তুমি যে আজ এই ট্রেণে আসবে, আমায় একবার লিখে জানাতে হয়, না হয় গাড়ীখানা ষ্টেশনে পাঠাতুম। কখনও কলকাতায় এসোনি, যদি এদিক ওদিক গিয়ে পড়তে—যদি হারিয়ে যেতে—কি হতো তাহলে।"

পিতা যে শাশ্বতীকে এড়িয়ে যেতে চান তা সে বেশ বোঝে; মুখখানা তাই তার কালো হয়ে ওঠে, একটা কাজের অছিলায় সে ঘর হতে চলে যায়।

৩

শাশ্বতী দেখলে পিতা পাতঞ্জলের এখানে থাকবার পাকাপাকি ব্যবস্থাও করে ফেললেন। ও-ধারের পূব-দক্ষিণ খোলা চমৎকার সাজানো বড় ঘরখানা পাতঞ্জলের বাসস্থান রূপে পরিগণিত হল।

না, আর চুপ করে থাকা অসম্ভব,—এর পরে পিতা পাতঞ্জলের উপর অসীম করুণা দেখাতে গিয়ে আরও কি করে বসবেন, তাই বা কে জানে।

অসহিষ্ণু কণ্ঠে শাশ্বতী বললে, "আরও তো অনেক ঘর আছে বাবা, ও-ঘর খানা দিচ্ছো কেন? ও-ঘর না হলে আমার চলবে না, বন্ধুরা এলে কোথায় বসতে দেব বল দেখি?"

মিঃ রায় একেবারে মিইয়ে পড়েন, চিঁ চিঁ করে বলেন, "তার চেয়ে তুই ঐ এ পাশের ঘরখানা নেনা শতী। তোর বন্ধুরা কতক্ষণই বা থাকে বল, আর পতিনকে যে সারাদিন রাত ওইখানে থাকতে হবে। সেই জন্যেই ওর স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে ওই ঘর খানা ওকে দিচ্ছি। অবিশ্যি ওকে আমি চাকরদের ঘরে দিলেও ও যে একটি কথাও কখনও বলতো না তা জানা কথা। তবে আমার আবার চক্ষুলজ্জা আছে তো, এর পর দেশে ফিরে আমাকেই দোষ দেবে যদি কোন ব্যারাম হয়।"

মিঃ রায়ের চক্ষুলজ্জা—

এ জিনিষটার বালাই কোনদিনই মিঃ রায়ের ছিল না, আজ সেই তাঁকে চক্ষুলজ্জায় পীড়িত হতে দেখে শাশ্বতী আশ্চর্য্য হয়ে যায়।

এর পর সে শোনে পাতঞ্জলের পরিচয়—

আজই প্রথম পিতার মুখে শাশ্বতী শুনতে পায় তাঁর ছেলেবেলার কাহিনী, জানতে পারে—বিখ্যাত ধনী ব্যাবসায়ী মিঃ রায় বৈদেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও তিনি ছিলেন বাংলার একটা অজ্ঞাতনামা গ্রামেরই ছেলে। তাঁর সেই গ্রামের বন্ধু পতিরাম ভট্টাচার্য্যের ছেলে এই পাতঞ্জল। অনেক কাজের ভিড়ে ছোটবেলায় কোথায় হারিয়ে গেছে,—বিনু নামটা পর্য্যন্ত মনে পড়ে না, অনবরত স্ত্রীর সম্বোধন শুনে শুনে, আজ পাতঞ্জলকে দেখে মনে পড়ে গেল তিনি ধনী মিঃ রায় ছিলেন না, ছিলেন গ্রামের ছেলে বিনু।

মনে পড়ে যায় খড়ে ছাওয়া ঘরে তিনি জন্মেছিলেন, তাঁরও বাপ ছিলেন মা ছিলেন, তাঁরও বন্ধুবান্ধব ছিল।

আজ সেই স্মৃতিই তাঁকে মুখর করে তোলে—

"তারপর শোন মা শাশ্বতী,—কি যে দুষ্ট ছিলুম আমরা, সে কথা আজ তোরা কেউ কল্পনাও করতে পারবি নে। বুঝলে পতিন, এই কলকাতায় আসবার দুদিন আগে হঠাৎ ঝোঁক চাপলো

মৈত্রিয়দের গাছের নারকেল পেড়ে খেতে হবে। সেদিন সেই নারকেল চুরি করে পাড়তে গিয়ে—"

আঃ বাবার বুদ্ধিশুদ্ধি যেন বিকৃত হয়ে গেছে; কোন্ ছোট বেলায় পাড়াগাঁয়ের একটা ছেলে চুরি করে নারকেল পেড়ে খেয়েছে, লোকের গাছের আম, জাম, পেয়ারা, শশা চুরি করেছে, আজকের দিনে মাননীয় মিঃ রায়ের মুখে সে সব কথা কি মানায়? বাবা নিজের বর্ত্তমান অবস্থা একেবারেই ভুলে যাচ্ছেন,—ওঁর নিজের মর্য্যাদা মনে রাখা উচিত।

শাশ্বতী উঠে পড়ে, বাবার পাগলামীর প্রশ্রয় না দেওয়াই উচিত। বাধা দিতে গেলেও যে মানুষ শুনবেন না, আরও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবেন,—তাঁকে বাধা না দিয়ে সরে যাওয়াই ভালো। এই সব কথা যদি লাবণ্য, রজতেশ, নীলিমা, অলি, পবিত্র প্রভৃতি ছেলেমেয়েরা শোনে, কোথায় থাকবে শাশ্বতীর মর্য্যাদা?

শাশ্বতী রাগে ফেটে পড়ে।

যত রাগ পড়ে পাতঞ্জলের উপর। ওই পাতঞ্জলটাকে দূর না করতে পারলে বাবার এ অসুখ সারবে না। এই যে অবসর কালে বসে পাতঞ্জলের সঙ্গে সেই সব ছোটবেলাকার আবল তাবল গল্প, এ সব শুনে পাতঞ্জল খুসি হবে সন্দেহ নাই, কিন্তু চাকর বাকরেরাই বা ভাববে কি—কি তারা মনে করবে তাদের সাহেবকে?

ওরা আবার এই সব গল্প করবে ওদের বন্ধুদের মহলে, জানাবে আজকের দিনের রাশভারি গম্ভীর-মুখ মিঃ রায়ের নাম ছিল বিষ্টু, তিনিও গাছে উঠে আম, জাম, নারকেল চুরি করে খেয়েছেন,—দুর্দ্দান্তপনায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়—

শাশ্বতীর কান গলা পর্য্যন্ত আরক্ত হয়ে ওঠে—

না, যেমন করেই হোক, ওই পাতঞ্জলটাকে সরানো চাই, ওটাকে এ বাড়ীর ত্রিসীমানায় রাখা হবেনা।

৪

বেচারা পাতঞ্জল—

দোষ তার নিজের এতটুকু নাই, দোষ তার অদৃষ্টের। অত্যন্ত নির্ব্বিরোধ ভাল মানুষ সে, সাত চড়েও তার মুখে রা শব্দ নাই; বেশী কথা সে কোন দিনই বলতে পারে না;—সব কিছুই এড়িয়ে যেতে পারলে বাঁচে। সংসার সম্বন্ধে এতটুকু জ্ঞান তার নাই, একুশ বাইশ বৎসর বয়সেও সে শিশুর মত সরল নির্ব্বিকার।

গ্রামের স্কুলে কোন রকমে খানিকদূর সে পড়েছিল, ম্যাট্রিকের টেষ্ট দিয়েছিল, ফাইন্যাল দেওয়া আর হয়নি। তার পিতা হঠাৎ পড়ে গিয়ে প্যারালেসিসে আক্রান্ত হওয়ার পর বাধ্য হয়ে পড়ার বই শিকায় তুলে সে পিতার পরিত্যক্ত পুরোহিতের কাজ নিয়েছে।

উচ্চাশা একদিন তারও ছিল, সে মানুষ হবে—জগতে উন্নতি করবে, নাম রাখবে, কিন্তু কিছুই তার হল না। যে ঘণ্টা-নাড়া পেশাকে সে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল, সে পেশাই তাকে নিতে হল।

কিন্তু তাই কি সহজে হয়? বাঁ হাতে ঘণ্টা নাড়াতে ডান হাত অচল হয়ে পড়ে, পূজার মন্ত্র প্রতি ছত্রে ভুল হয়। পাড়াগাঁয়ের অনেক আনাড়ি লোক ধরতে পারে না, যারা ধরে তারা করুণা পরবশ হয়ে তার ভুল শুধরে দেয়, তার ছোটো খাটো ভুল ত্রুটী ক্ষমার চোখে দেখে যায়।

মিঃ রায় এই ঐশ্বর্য্য ও জাঁকজমকের মধ্যে থেকেও বাল্য বন্ধুকে বিস্মৃত হতে পারেন নি। বন্ধুর শেষ পত্রখানা পেয়ে কন্যাকে কিছু না জানিয়েই তিনি নিজের গ্রামে গিয়েছিলেন, তাঁর হাতে পুত্রের ভবিষ্যৎ ভার অর্পণ করে বন্ধু ইহলোক ত্যাগ করেন।

ভাবি জামাতা পাতঞ্জল—

উঃ মনে করতেও শাশ্বতীর দম বন্ধ হয়ে আসে, সমস্ত দেহের মধ্যে জীবন-প্রবাহ অবশ হয়ে যায়। তাদের জন্মেরও অনেক আগে পিতা নাকি সত্যবদ্ধ হয়েছেন—তাঁর মেয়ে হলে বন্ধুর পুত্রের সঙ্গে তার বিবাহ দেবেন। উঃ, আজকের দিনে পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী মিঃ রায়ের কথা শুনলে লোকে বলবেই বা কি? সে—শাশ্বতী রায় সমাজের শীর্ষস্থানীয়া, কলেজে সে ফোর্থ ইয়ারে পড়ে, তার ষ্টাইল সকলের আদর্শস্থানীয়, মেয়েরা তাকে তার আশ্চর্য্য রূপের জন্য, তার অগাধ অর্থ ও শিক্ষার জন্য, তার নিত্য নূতন ফ্যাসানের জন্য রীতিমত ঈর্ষা করে।

সেই শাশ্বতী তার জন্মের পূর্ব্ব হতে নাকি বাগদত্তা আর তার স্বামী হবে যে সে ওই পাতঞ্জল? কথাটা যেদিন সে জানতে পেরেছিল সেদিন শাশ্বতী যেন অনেক উপর হতে মাটীতে আছাড় খেয়ে পড়েছিল।

বাপের কাছে গিয়ে সে কেঁদে পড়লো—"এই

যদি তোমার ইচ্ছাই ছিল বাবা, আমায় লেখাপড়া শিখালে কেন, আমায় কেন এ রকম ভাবে মানুষ করলে? তুমি কেন আমায় অনেক আগেই জানাওনি বাবা—আমায় ওই পাতঞ্জলকে বিয়ে করতে হবে। ওর স্ত্রী হওয়ার আগে আমি আত্মহত্যা করে মরব, তা আমি তোমায় ঠিক বলে রাখছি।"

পিতা সস্নেহে কন্যার মাথায় হাত বুলান, হাসি মুখে বলেন, "তাই কি হতে পারে মা—পাতঞ্জলের হাতে তোকে আমি কখনও দিতে পারি? ওই একটা গেঁয়ো মূর্খ, শিক্ষা কৃষ্টি যার মধ্যে নেই, আমার জামাই হতে স্পর্দ্ধা করতে পারে সে কোনদিন?"

আশ্বস্ত হল শাশ্বতী।

বললে, "তবে ওকে বাড়ী হতে বিদায় কর বাবা, ও যদি এ বাড়ীতে থাকে, আমি আর কোথাও চলে যাবো।"

পিতা বিব্রত হ'য়ে বলেন, "কত লোকই তো তোমার বাড়ীতে আছে মা, তাদেরই একজন হয়ে ও ছেলেটা থাকলেই বা তোমার কি ক্ষতি হবে বল?"

শাশ্বতী মনে প্রচুর শান্তি শুধু নয় গৌরবও অনুভব করে।

পাতঞ্জল কোনদিনই তার সামনে আসে না—শাশ্বতীকে অত্যন্ত ভয় করে সে, যে দিকে শাশ্বতী থাকে, সে দিক দিয়ে সে হাঁটে না। শাশ্বতীকে দেখলে ভয়ে তার বুক ঢিপ ঢিপ করে, তার মুখ শুকিয়ে যায়।

সেদিন এই শাশ্বতীই তার ঘরের বারাণ্ডা হতে ডেকে বললে, এখান হতে পাততাড়ি গুটাও পণ্ডিত পাবন,—তুমি এখানে থাকলে আমাদের মুখ দেখানো দুষ্কর হয়ে ওঠে।"

পাতঞ্জল অত্যন্ত শশব্যস্ত হয়ে ওঠে; একটী কথাও সে জানতে চায় না, নিজের জিনিষপত্র বিছানা সে গুছিয়ে নেয়।

দেখে দয়াও হয়—

বড় ভালোমানুষ বেচারা; শাশ্বতী স্পষ্টই দেখছে সবাই তাকে অবজ্ঞা করে। পিতা আর তাকে ডাকেন না—হঠাৎ তিনি যেন অত্যন্ত সচেতন হয়ে উঠেছেন। দাসদাসীরা পর্য্যন্ত পাতঞ্জলকে অনায়াসে কথা শুনায়, তাকে হুকুম করে কাজ করায়।

মনে কেমন হঠাৎ একটা আঘাত লাগে—

নতমুখে বিনীত কণ্ঠে পাতঞ্জল বললে, "আমি আজই চলে যাব এখন, আমায় জন্যে আপনাদের কষ্ট হয়—"

অত্যন্ত দয়া করে শাশ্বতী বললে, "আজই যেতে হবে না—থাকো আর চারটা দিন, তারপর যা হোক একটা নিজের কিছু ব্যবস্থা করে আর কোথাও চলে যেয়ো; মোটের উপর এ ঘরে থাকা তোমার পোষাবে না।"

সে দিন সন্ধ্যায় টেনিস খেলে এসে শাশ্বতী দেখলে পাতঞ্জলকে তার নিজের সামান্য বিছানা ও রং-চটা টিনের ছোট বাক্সটা নিয়ে নিচে চাকরদের ঘরের পাশে যে অন্ধকার ছোট কুঠরীটা আছে, সেইটাতেই আশ্রয় নিয়েছে। হয়তো ঘরে সাপ আছে, বিছা আছে, মাকড়সা, আরসুলা নিশ্চয়ই আছে। অন্ধকার স্যাঁতানে ঘর, তারই মেঝের সে নিঃসঙ্কোচে সতরঞ্চিটা পেতে তারপরে জীর্ণ কাঁথা বিছিয়েছে, ওয়াড়-বিহীন লাল রংয়ের ছোট বালিশটা সেই বিছনার শোভা বর্দ্ধন করছে।

উঁকি দিয়ে শাশ্বতী দেখে গেল একবার—

খুসি সে হতে গেল, কিন্তু এ কথা সত্য যে সে খুসি হতে পারলে না।

৫

সেই পাতঞ্জলের চিন্তাই যে শাশ্বতীকে করতে হবে তা শাশ্বতীই জানত না।

অদ্ভুত মানুষের প্রকৃতি—

একদিন যাকে এড়িয়ে চলতো শাশ্বতী, আজ তাকেই সে ভাবে। অকারণেই সে নিচের চাকরদের খবরদারী করতে যায়, সঙ্গে সঙ্গে পাতঞ্জলেরও।

"এঃ, এই স্যাঁৎসেঁতে ঘরে এই সতরঞ্চি পেতে শোওয়া হয়—দুদিনে যে নিউমোনিয়া ধরবে, তারপর সব শেষ হয়ে যাবে।"

সে থমকে দাঁড়ায়, তারপর গম্ভীর মুখে বলে, "বিষ নেই কুলোপানা চক্র যে আছে ঠাকুরের, খুব ফোঁস করতে শিখেছো যা হোক। একদিন কি বলেছি কি না-বলেছি, অমনি অমন দোতালার সুন্দর ঘর রাগ করে ছেড়ে নেমে আসা হয়েছে এইসব চোর খারাপ জঘন্য ঘরখানায়। তাই তো বলি, পেটে বিদ্যে থাকলে এটি হতো না, মূর্খের অশেষ দোষ কিনা—"

পাতঞ্জল মাথা নিচু করে নীরবে বইয়ের পাতা উল্টায়, চোখ তুলে তাকায় না পর্য্যন্ত।

এ জয় না অবহেলা শাশ্বতী তা বুঝতে পারে না—সে আরও রুখে উঠে, "আর শিষ্টাচারই বা শিখবে কোথা হতে; পাড়াগাঁয়ের ভূত তো; শিখেছো শুধু ঘণ্টা নাড়তে আর বোবা পুতুলের পুজো করতে, তাতে অং বং হু একটা যাতা জুড়ে দিলেই হল। কই রাখো দেখি আমার কথা, বল তো আমার সঙ্গে সুন্দর করে দেখি।"

তবু পাতঞ্জল মুখ তোলে না, শুধু গলদঘর্ম হয়ে উঠে। এ মেয়েটী আবার এখানে এসে কেন যে—যা না তাই বলতে সুরু করেছে, তার অর্থ খুঁজে পায় না সে, তার মাথা ক্রমে আরও নিচু হয়ে পড়ে।

শাশ্বতী রাগ সামলাতে পারে না—

ক্ষিপ্রপদে এগিয়ে গিয়ে তার সামনেই বই-খানা টেনে নিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, রুক্ষ কণ্ঠে বলে, "রাখো তোমার পুঁথিপত্র, এই ঘরে থেকে একটা অসুখ বাধিয়ে বসলে দেখবে কে শুনি? তারপর দেশের লোকের কাছে আমরা আর মুখ দেখতে পারব না—যেমন না তেমন করে আমাদের অপদস্থ করবার চেষ্টাই তো তোমার।"

পাতঞ্জল এবার মুখ তোলে—শিশুর মত সরল মুখ, অসহায়ের মতই জিজ্ঞাসা করে, "আমি এখন কি করব, এখান হতে চলে যাব—কিন্তু কোথায় যাব, আমি যে কাউকে চিনিনে?"

শাশ্বতী একমুহূর্তে দুর্বল মনে করে নিজেকে, বললে, "বেশ যা হোক, আমি কি তোমায় যেতে বলছি? তোমার নিজের ঘরে চল বাপু, আমার মুখ রক্ষা কর। যা হোক আমারও তো একটা চক্ষুলজ্জা আছে; বাবার বন্ধুর ছেলে তুমি, তোমার বাবা তোমায় আমার বাবার হাতে দিয়ে গেছেন, আমরা তোমার ভার না বইলে বইবে কে? তোমার বোঝা যখন মাথায় চেপেছে, চিরকাল এ বোঝা থাকবে বই কি। মাথা কিনতে এসেছো আমাদের, মাথা কেনো—"

একজন চাকরকে শাশ্বতী ডাকে, তারই মাথায় বিছানা বাক্স দিয়ে উপরে পাঠিয়ে শাশ্বতী পাতঞ্জলের দিকে ফেরে—

"দয়া করে এবার একটু হাঁটো, ওপরে নিজের ঘরে চল—লজ্জা দিয়ো না আর। যা করেছি তার জন্যে না হয় নাক কান মলছি, আর কখনও এমন কাজ করব না। কথা দিচ্ছি।"

পাতঞ্জল উত্তর করে না, কেবল চোখ মোছে, শাশ্বতীর পিছনে পিছনে চলতে চলতে বার বার চোখ নাক মুছতে মুছতে তার স্বাভাবিক সুন্দর মুখখানা লাল হয়ে উঠলো।

পাতঞ্জলের ঘরের মেঝেয় মূল্যবান গালিচা, বই রাখবার কাঁচের আলমারি, টেবিল চেয়ার এবং সর্বোপরি স্প্রিংয়ের খাটে গদী পাতা।

শাশ্বতী আদেশের সুরে বলে—"মাটিতে বসে আর পড়াশুনা করবে না, ওই চেয়ারে বসে টেবলে বই রেখে পড়বে; আমি কাল হতে তোমায় রোজ একঘণ্টা করে পড়িয়ে যাব। যাতে দুইমাস পরেই ম্যাট্রিকটা দিতে পারো তার জন্যে এখন হতেই খাটতে হবে। বই রাখবে ওই আলমারীতে, আর শোবে ওই খাটে, মাটিতে শুতে যদি দেখি ভালো হবে না।"

পাতঞ্জল চোখ তুলে তার পানে তাকাবার চেষ্টা করে—তাকাতে পারে না।

৬

সেদিন কয়েকটী বন্ধুসহ নিতান্ত অসময়ে বাড়ীতে ফিরে শাশ্বতী দেখতে পেলে পাতঞ্জল তার পড়ার ঘরখানা সুন্দর করে গুছিয়ে রাখছে। হয় তো প্রতিদিনই দুপুরে এসে সে বই পড়ে, যাওয়ার সময় গুছিয়েই শুধু রেখে যায় না,—ফুল দিয়ে কোন কোন দিন সাজিয়েও দেয়। আজও কতকগুলো ম্যাগনোলিয়া এনে সে টেবলে সাজাচ্ছিল, শাশ্বতীর সাড়া পেয়েই সে তাড়াতাড়ি সরে গেল।

বন্ধুরা হাসে—

জনশ্রুতি পাতঞ্জলের সম্বন্ধে অনেক কথাই বয়ে নিয়ে গেছে চারিদিকে, বন্ধুরাও শুনেছে।

রজতেশ চৌধুরী উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, "দি আইডিয়া—একে দেখতেই আমার আজ এখানে আসা। কাল বিকেলে কলকাতায় ফিরেই এ কথা শুনে আমি একেবারে আকাশ হতে পড়েছি—মিঃ রায় এর সঙ্গেই আপনার বিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।'

বীণা দত্ত ধপাস করে একখানা চেয়ারে বসে পড়ে বললে, "লোকটাকে এখনও সব কথা শুনেও তোমার বাড়ীতে রেখেছো শাশ্বতী? তোমায় আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি শাশ্বতী—তোমার অসাধারণ সহ্য শক্তির জন্যে—ওকে অবিলম্বে বার করে দেওয়া উচিত।"

রজনী দাস বিকৃত মুখে বললে, "একেবারে

জংলী গেঁয়ো ভূত, লেখাপড়ার নাম মাত্র জানে না বললেন সংস্কৃত জানে—কাজ করতো পুরুতের। ছিঃ ছিঃ, একটা কথা সে দিন বলতে পারলে না শুধু ক্যাল ক্যাল করে তাকিয়ে রইলো।"

সুধীন মজুমদার সম্প্রতি বিলেত হতে ফিরেছে—

রুক্ষভাবে টেবলে একটা মুষ্ট্যাঘাত করে চেঁচিয়ে উঠলো,—"তুমি শুধু হুকুম কর শশ্বতী, তোমার বিনানুমতিতে তোমার ঘরে আসা আর ফুল দিয়ে সাজানোর ধৃষ্টতার অপরাধে ওকে শাস্তি দেই। এমন শাস্তি দেব যা ও জীবনে ভুলতে পারবে না। উঃ,—কি স্পর্দ্ধা বল দেখি—আবার ফুল দিয়ে সাজানো?—"

বলতে বলতে সে ফুলগুলো তুলে নিয়ে দরজাপথে বাইরের দিকে ছুঁড়ে ফেললে।

আশা তারই অপরিমিত, এ ঘর এবং মালিকের সর্ব্বময় কর্ত্তা হওয়ার সম্ভাবনা তার পনরো আনা, এ কথা শুধু সে নয়—সবাই জানে।

শাশ্বতী মুখ তুললে—

দেখা গেল আরদালী পাতঞ্জলকে দরজার কাছে নিয়ে এসেছে। কত বড় অপরাধ করেছে তার গুরুত্ব বুঝে পাতঞ্জল একেবারে শুকিয়ে উঠেছে।

"এই শুকদেও, বাবুর হাত ছোড় দিজিয়ে জলদি—"

শাশ্বতীর কণ্ঠস্বর দৃঢ়, তার দুটি চোখে আগুন জলে—

সভয়ে পাতঞ্জলের হাত ছেড়ে আরদালী সরে দাঁড়ায়।

শাশ্বতী পাতঞ্জলের পানে তাকিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে, "এই টাকাটা নিয়ে তুমি চট করে তোমার পায়ের একজোড়া জুতো কিনে নিয়ে এসো ও স্যাণ্ডালটা বড় ছিঁড়ে গেছে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ফিরে আসা চাই মনে থাকে যেন, ঠিক ছটার ট্রিপে আমার সঙ্গে মেট্রোয় যেতে হবে, বাবা এখনি টিকিট পাঠিয়ে দেবেন বলে গেছেন—"

দুখানা নোট সে পাতঞ্জলের হাতে দিলে।

বেচারা পাতঞ্জল হেঁয়ালী বুঝতে পারে না, টাকা সে হাতে করে নেয় মুচের মত, খানিকটা ক্যাল ক্যাল করে তাকিয়ে থাকে, তারপর আস্তে আস্তে চলে যায়।

ঘরের প্রত্যেকেই যেন শুকিয়ে ওঠে—

শাশ্বতী ফিরে এসে দুহাতে টেবলে ভর দিয়ে দাঁড়ায়, "সত্যি বেচারা বড় গরীব, জুতোটা ছিঁড়ে গেছে, খালি পায়ে বেড়ায়। বাবা আমার দামী সুট কিনে দিয়েছেন, ও বেচারা কোনদিন তো পরেনি আজও তাই পরতে পারছে না। বলেছি রোজ একবার করে পরে আমার সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে যেতে হবে—এতে করে লজ্জাটাও ভাঙবে, অভ্যাসটাও হবে। দুদিন বাদে তো পরতেই হবে—এই সেপ্টেম্বরেই তো বাবা পাঠাচ্ছেন বিলেত, ব্যবসা সম্বন্ধে শেখা তো দরকার, নইলে এ সব দেখবে কে? আমিই এখন পড়াচ্ছি, ওর আবার অন্য লোকের কাছে পড়তে ভারি লজ্জা করে কিনা, তাই বাবা আমার ওপর ওর পড়ার ভার দিয়েছেন। ইংলিসে একটু কাঁচা ছিল কিন্তু এই দু তিন মাসে এমন চমৎকার প্রগ্রেস করেছে যা দেখে আমি পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। আজ আমি ওকে হোমটাস্ক দিয়ে গিয়েছিলুম, আমার বই দেখে পড়ছিল বেচারা, জানতো না তো অসময়ে আমরা এসে পড়ব, আর ওকেও লাঞ্ছনা সইতে হবে।"

এক মুহূর্ত্তে থেমে সে মুখ তুললো—

লজ্জার হাসি তার মুখে ফোটে—

"হ্যাঁ, আপনাদের একটা নতুন খবর দিচ্ছি, কথাটা বলব বলেই আজ আপনাদের এনেছি। বিয়ে আমায় করতেই হবে—বিয়ে করবনা, এ পণ আমি করিনি। বিয়ে আমি ওঁকেই করব—বাবার সত্য রক্ষা হবে—সব চেয়ে বড় কাজ একটা মানুষকে আমি মানুষ করে গড়ে তুলতে পারব।"

"সে কি—ওকি কথা বলছো শশ্বতি—ওকি কথা—"

সুধীন মজুমদার আর্ত্তনাদ করে ওঠে, মাথা ঘুরে সে পড়ে যায় আর কি।

দৃঢ়কণ্ঠে শাশ্বতী বললে, "হ্যাঁ, এই আমার সত্য কথা, আমি মানুষ খুঁজে বেড়িয়েছি মিঃ মজুমদার, মানুষ আমি পাইনি, দেখেছি অপনাদেরই মত স্তাবকদের— যারা আমার প্রশংসায় মুখর—সে সত্যি আমার জন্যেই নয়—আমার অর্থের জন্যে, মিঃ রায়ের জামাতৃপদের সঙ্গে সঙ্গে বিপুল সম্পত্তির মালিকত্ব লাভ করার জন্যে। যাক, আজকের দিনে কটু কথা বলব না—বিয়ের নিমন্ত্রণ পেলে দয়া করে সবাই আসবেন।

৭

মেয়ের মাথায় হাতখানা রেখে রুদ্ধ কণ্ঠে পিতা বললেন, "একি করলি মা—আমার সত্য হতে

রক্ষা করতে তুই আত্মবিসর্জ্জন করবি, শেষকালে ওই পাতঞ্জলকে বিয়ে করবি।"

শাশ্বতী মুখ নিচু করে হাসে—

"আমায় আশীর্ব্বাদ কর বাবা, ওকেই যেন মানুষ করে গড়ে তুলতে পারি—ওকে যেন সত্যিকার পাতঞ্জল করতে পারি—লোকে যেন ওকে বড় বলে সম্মান দিতে পারে। একদিন ও কুড়িয়েছে লোকের শুধু নয়, আমার ঘৃণা, তোমার তাচ্ছল্য, আজ যেন আমাদের স্নেহ, আমাদের ভালোবাসাই ওকে মানুষ করতে পারে। তুমি আশীর্ব্বাদ কর বাবা—ওকে আমি তোমার যোগ্য জামাই নামে পরিচিত করব। সামনের সেপ্টেম্বরে আমরা বিলেতে যাব, এক বছর পরে ফিরে তোমার পাতঞ্জলকে তুমি সম্পূর্ণ নূতন রূপেই পাবে, আমার এ কামনা যেন সার্থক হয়।"

পিতার দুই চোখ দিয়ে নিঃশব্দে অশ্রুজল ঝরে পড়ে, আজ মেয়ের মুখে তিনি ফুটতে দেখেন তাঁর সাধ্বী সতী পতিব্রতা স্ত্রীর প্রতিবিম্ব।

"আমি আশীর্ব্বাদ করছি—আমি আশীর্ব্বাদ করছি খাতি তুই পারবি মা ওকে মানুষ করতে—"

শাশ্বতী পিছন পানে তাকায়—

"এদিকে এসো, বাবাকে প্রণাম কর—"

কম্পিত পদে পাতঞ্জল এগিয়ে আসে—

আজও সে শাশ্বতীকে চিনতে পারছে না।

শাশ্বতীর বিবাহ—

ফাল্গুন মাসের ত্রিশ তারিখ—

নিমন্ত্রণ পেলে রজতেশ চৌধুরী, নবনীতা হালদার, বীণা দত্ত, রজনী দাস; সুধীন মজুমদার—

কেউ না এলেও বিবাহ অসম্পূর্ণ রইলো না। বিয়ের বাসরে শাশ্বতী স্বামীকে লক্ষ্য করে বলছিল —"মনে রেখো তোমায় মানুষ হতে হবে—আমার কথা রাখবে তো—আমার মুখ রাখবে?"

পাতঞ্জল মাথা কাত করে।

বিবাহের কয়দিন বাদে যে শাশ্বতী আবার কলেজে এলো, তাকে দেখে অনেকে আশ্চর্য্য হয়ে গেল, অনেকেই জানতো না তার বিবাহ হয়েছে।

সিঁথায় সিঁদুর, ললাটে সিঁদুর টিপ, লাল পাড় শাড়ী পরণে—

মেয়েরা ঠোঁট উলটে বললে, "এও একটা ষ্টাইল।"

প্রিয়ের উদ্দেশে

১

সতীশ ছিল নব্য তন্ত্রের ছেলে।

রুচি তার বড় চমৎকার—অন্ততঃ পক্ষে নিজের সম্বন্ধে এবং ভবিষ্যতে যে তাহার গৃহলক্ষ্মীরূপে আসিবে, তাহার সম্বন্ধে।

নিজে সে এম, এ, পড়িতেছিল; সুতরাং চোখে কিছু যে কম দেখিবেই এবং সে জন্য চশমা লইতে বাধ্য, এ জানা কথা। মোটের উপর ছেলেটী ছিল ভারি কল্পনা-প্রবণ, বাস্তবটা তাহার চোখে কিছুতেই সুন্দর বোধ হইত না।

নিখিল আসিয়া বলিল, "ওহে, শুনছ, আমাদের রেণুর যে বিয়ে হচ্ছে, পাত্রী দেখে এলুম, চমৎকার মেয়ে, যেমন সুশ্রী তেমনি শিক্ষিতা। লেখা পড়া গান বাজনা—সব তাতেই চৌখশ মেয়ে।"

উদাসভাবে সতীশ বলিল, "ভালো, দেখা যাবে।"

তাহার উদাসভাবে নিখিল বাস্তবিকই খুসি হইতে পারিল না। সতীশের প্রকৃতি বোর্ডিংয়ের সব ছেলেরাই জানিত এবং সে জন্য অনেকে তাহাকে এড়াইয়াও চলিত।

নিখিল রাগ করিয়া বলিল, "বিশ্বাস না হয় তুমি বরং নিজের চোখে একদিন দেখো; আমার বিশ্বাস, একদিন দেখলে তোমার মনের ভুল ধারণা দূর হয়ে যাবে।"

বাস্তবিকই সে দিন আসিল, বন্ধু রেণুভূষণ বউ-ভাতে সকল বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করিল। নববধূকে দেখিয়া সকলেই শত মুখে প্রশংসা করিল, শুধু নির্বাক রহিল সতীশ।

উদর পূরিয়া আহার করিয়া আসিয়া খোলা ছাদে জ্যোৎস্নালোকে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়া নিখিল সতীশকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেমন বউ দেখলে?"

গম্ভীর মুখে সতীশ বলিল, "হ্যাঁ, ভাল নয় তা আমি বলতে পারিনে, তবে যতটা বলেছ ততটা যে কিছুতেই নয়, তা আমি বেশ বলতে পারি।"

প্রকাশ চটিয়া উঠিয়া বলিল, "তোমার কোন পাত্রীকেই পছন্দ হয়না, আচ্ছা মানুষ তুমি।"

সতীশ একটু শুধু হাসিল মাত্র।

কল্পনা যাহাকে ঘেরিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে, সে আজ নাগালের বাহিরে।

মনে পড়ে বহুকাল আগের কথা, তখন সে ছিল বালক মাত্র। হিন্দোল তাহারই সমবয়স্কা একটী মেয়ে, তাহার পিতা রেভারেণ্ড অমলকৃষ্ণ সেন। বাড়ীর পাশের বাড়ীটায় মিঃ সেন বাসা লইয়াছিলেন।

বড় সুন্দর মেয়েটী, অস্ফুটন্ত কুঁড়ির তোড়া। মাথা ভরা কোঁকড়া কালো চুল পদ্ম ফুলের মত সুন্দর মুখখানিকে ঘেরিয়া থাকিত। অস্থির চরণে চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত, মিসেস সেন এই দুর্দ্দান্ত মেয়েটীকে কিছুতেই বশে আনিতে পারিতেন না।

বালক বালিকার মধ্যে পরিচয় অচিরেই হইয়া গেল, বন্ধুত্বও জন্মিল, এ বাড়ীর লোকেরা কেহ তাহা জানিলেন না। সতীশ অসঙ্কোচে মিঃ সেনের বাড়ীতে যাইত, তাঁহারা তাহাকে খুবই আদর যত্ন করিতেন।

গোঁড়া হিন্দু সতীশের বাড়ীতে হিন্দোলের প্রবেশাধিকার ছিল না। সতীশের মা দিনে তিন-বার সন্ধ্যাহ্নিক করিতেন, দুবার করিয়া গঙ্গাজল ছিটাইয়া সমস্ত বাড়ীর অপবিত্রতা নষ্ট করিতেন। হিন্দু কেহ বাড়ীতে আসিলেও তিনি কতকটা তফাতে সরিয়া থাকিতেন—যেন ছোঁওয়া না যায়, সে অবস্থায় হিন্দোলের সে বাড়ীতে প্রবেশের অধিকার একেবারেই অসম্ভব।

দিন যাইতেছিল—সতীশ ও হিন্দোল বড় হইয়া উঠিল, সতীশ ম্যাট্রিক পাশ করিয়া কলেজে প্রবেশ করিল, হিন্দোলও কলেজে প্রবেশ করিল। তখনও তাহারা পরস্পর বন্ধু—হিন্দোলের বাড়ীতে সতীশের তখনও অবাধ গতি।

বালক বালিকার স্নেহ ক্রমে গভীর প্রেমে পরিণত হইয়াছিল, পরস্পর পরস্পরের নিকট কথা

দিয়াছিল—যদি বিবাহ করিতে হয় উভয়ে বিবাহিত হইবে, সমাজ ধর্ম্ম তাহারা কেহই মানিবে না।

ফলে কিন্তু কিছুই হইল না—তাহাদের কথা কথাই থাকিয়া গেল। সতীশের পিতার কানে যখন কথাটা পৌছিল, তখন তিনি আগুন হইয়া উঠিলেন। পুত্রকে যৎপরোনাস্তি ভৎ'সনা করিলেন, তাহার পর মিঃ সেনকে ডাকিয়া তাঁহার কন্যার ব্যবহারের কথা জানাইয়া বলিলেন, মিস সেনের মত শিক্ষিতা মেয়ের নিকট হইতে এরূপ ব্যবহার পাঁওয়ার আশা তিনি করেন নাই। তাঁহার একটী মাত্র পুত্র, ইহাকে ধর্ম্মত্যাগ করাইয়া মিঃ সেনের কি লাভ হইবে?

মিঃ সেন যথেষ্ট অপমান বোধ করিয়াছিলেন, তাহার পরেই তিনি সপরিবারে বম্বে চলিয়া যান, বাংলার সহিত আর সম্পর্ক রাখেন নাই।

তাহার পর পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, কে কোথায় তাহার ঠিক নাই। সতীশ পিতার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে—সে হিন্দোলের সন্ধান লইবে না। সবই করিয়াছে—বিবাহ করে নাই। পিতা মাতার অনুনয় বিনয়, তিরস্কার লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াও সে অটল অচল রহিয়াছে।

দুনিয়ায় যা কিছু সুন্দর—সব ছিল সেই মুখখানিতে, সতীশের চোখে আর যা কিছু সব সৌন্দর্য্যহীন।

আজও সতীশ গোপনে সেই মুখখানিই ভাবে, রূপ বলিতে যাহা কিছু সবই তাহার চোখে ছায়া হইয়া গিয়াছে।

কেহই তাহার অন্তরের সন্ধান রাখে না, লোকে বিরক্ত হয়,—তাহার অদ্ভুত স্বভাবের কথা ভাবে, সতীশ ভ্রূক্ষেপও করে না।

২

বাসের প্রত্যাশায় কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের ফুটপাতে সতীশ দাঁড়াইয়াছিল, বিশেষ আবশ্যকে তাহাকে একবার টালায় যাইতে হইবে।

অদূরে দাঁড়াইয়া একটী তরুণী, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ছিল—। অস্থিরভাবে সেও বাসের আশায় দূরের পানে চাহিতেছিল।

একবার সে মুখ ফিরাইতেই সতীশ অকস্মাৎ চমকাইয়া উঠিল। এ মুখ না তাহার পরিচিত—যদিও বহুদিন দেখা নাই তথাপি সে মুখ সে ভুলে নাই।

তরুণী অন্যদিকে আবার মুখ ফিরাইল, সতীশ সেই সময়টুকুর মধ্যে তাহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া লইল।

না, এ সে নয়। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যে তাহার অতি নিকটে ছিল, এ সে নয়। মুখ যদিও প্রায় একই সমান, তবু এ সে নয়। সে ছিল বিলাসিনী হিন্দোল,—এ যে সর্ব্বত্যাগিণী একটী নারীমূর্ত্তি। ইহার পরণে মূল্যবান পোষাক নাই, পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত যাহা কিছু সবই পৃথক। হিন্দোল গাউন পরিত, এ-নারীর পরণে মোটা শাড়ী,—পায়ে হিল উঁচু জুতা নাই, অল্প মূল্যের একজোড়া জুতা। সিঁথাটী পর্য্যন্ত চোখে পড়িল—তাহা বাঁকা নয়—সোজা। যদিও মুখ হিন্দোলের, তবু এ যে হিন্দোল নয়, তাহা আগেই চোখে পড়ে।

অস্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সতীশ এবার ভালভাবেই তাহার পানে চাহিল। তরুণীর মুখে ব্যস্ততা, বড় বড় দুইটী চোখে ব্যাকুলতা জাগিয়া।

এমনই সময়ে বেলগেছিয়াগামী বাস আসিয়া পড়িল। সতীশ উঠিতে যাইতেছিল, তরুণী তাহার পার্শ্বে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া উঠিতে যাইবামাত্র বাস ছাড়িয়া দিল। সতীশ রুখিয়া উঠিল—চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল—"রাখো রাখো—" পরমুহূর্ত্তে লাফাইয়া উঠিয়া কণ্ডাক্টরের হাত চাপিয়া ধরিল।

"বাস থামিয়া গেল—সতীশ ডাকিল, আপনি আস্তে আস্তে উঠুন, তাড়াতাড়ি করবার দরকার নেই।"

তরুণী অস্ফুটে ধন্যবাদ দিয়া উঠিয়া পড়িল।

বাসের মধ্যে কোন কথাই হইল না, তরুণী একটীবারের জন্য মুখ তুলিয়াও চাহিল না। তাহার হাতে যে বইখানা ছিল, সে তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিল। সতীশের মনে যে টুকু সংশয় ছিল, ঘুচিয়া গেল।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য—মানুষের মত মানুষও থাকে? এই যে তরুণীটি—আকৃতি দেখিলে কেহই বিশ্বাস করিবে না—এ হিন্দোল নহে, কিন্তু প্রকৃতি ও চালচলনে এ একেবারেই পৃথক, এইটুকুই সতীশকে আজ দারুণ লজ্জা হইতে রক্ষা করিয়াছে।

বেলগেছিয়ায় হসপিটালের সামনে বাস থামিতেই তরুণী নামিয়া পড়িল। সতীশও নামিল, তাহাকে এইখান হইতেই পথ ধরিতে হইবে।

তরুণী বরাবর হসপিটালের মধ্যে প্রবেশ করিল।

সতীশ বেশ বুঝিল হসপিটালে ইহার কোন আত্মীয় আছে, সেই জন্য এ হসপিটালে এই সময় দেখা করিতে আসিয়াছে।

নিজের কাজ ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সারিয়া আসিয়া সে আবার সেইখানেই যখন ফিরিয়া আসিল, তখন হসপিটালের ঘণ্টা বাজিয়া গেল। রোগীদের যাহারা দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা একে একে ফিরিতে লাগিল।

অদূরে দেখা গেল সেই তরুণীটীকে,—সে মুখ ফিরাইয়া অন্য কেহ না দেখিতে পায় এইরূপ ভাবে চোখ মুছিতে মুছিতে আসিতেছিল, এক একবার ফিরিয়া চাহিতেছিল।

আবার তাহারা একই বাসে উঠিল। তরুণী এবারও কাহারও পানে চাহিল না, বইখানা কোলে পড়িয়া রহিল, সে বাহিরের পানে তাকাইয়া রহিল।

৩

টালায় যাইবার পথে প্রায়ই দেখা হয়, তরুণী যায় কলেজ হসপিটালে, সতীশ যায় টালায় মাসীমার কাছে। মাসীমার বিষয় সম্পত্তি লইয়া মোকর্দ্দমা বাধিয়াছে, তাঁহার কিশোর পুত্রটীর উপর ভার দিয়া তিনি থাকিতে পারেন না, সতীশকে সেই জন্যই বিশেষ আবশ্যক।

প্রত্যহই দেখা হয়—কেহ কাহারও সহিত কথা বলে না। সতীশ সাহসে ভর করিয়া অগ্রসর হয়, তরুণীর গম্ভীর অথচ বিমর্ষ মুখ দেখিয়া সরিয়া যায়।

সে দিন ফিরিবার সময় সতীশ ঘণ্টা পড়িবার পরও তরুণীকে দেখিতে পাইল না। বিস্মিত হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। কত বাস আসিল, চলিয়া গেল, সে দিকে তাহার খেয়াল ছিল না।

অনেকক্ষণ পরে সে তরুণীকে দেখিতে পাইল। আজ যেন সে চলিতে পারিতেছে না, তার পা যেন ক্ষীণ দেহভার বহন করিতে অক্ষম। অতটুকু পথ চলিতে সে কতবার বসিল, কতবার উঠিল—সতীশ তাহাই দেখিল।

বেশ বুঝা যাইতেছিল—হসপিটালে যে আছে, তাহার জীবনের কোন আশা নাই, তাহা আজ সে জানিয়াছে। সে যেই হোক—মেয়েটীর পৃথিবীতে সে ছাড়া আর কেহই নাই,—তাহার বিয়োগাশঙ্কায় সেই জন্যই সে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

বাসে উঠিতে গিয়া পা কাঁপিয়া সে পড়িয়া যাইতেছিল, পিছন হইতে সতীশ তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। পিছন ফিরিয়া সে চাহিল, শুষ্ককণ্ঠে একটা কথাও তাহার ফুটিল না।

সতীশ তাহার হাতখানা ধরিয়া সিটে বসাইয়া দিল, সান্ত্বনার সুরে বলিল, "এখানে বসুন, আপনি তাড়াতাড়ি নামতে উঠতে যাবেন না, আমি নামবার সময়ে আপনাকে সাহায্য করব এখন।"

তরুণী মুখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিল, বড় বড় দুটি চোখ ছাপাইয়া হঠাৎ ঝর ঝর করিয়া জল পড়িল, সে কিছুতেই আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না।

নির্ব্বাক সতীশ শুধু তাকাইয়া রহিল, প্রবোধ সে কি দিবে? ইহার পরিচয় সে জানে না, হসপিটালে তাহার কে আছে, তাহা সে জানে না, পথের দেখা মাত্র,—ইহার এই বুকফাটা দুঃখে সে কি সান্ত্বনা দিবে?

নামিবার সময় সে তরুণীর হাত ধরিয়া নামাইয়া দিয়া নিজেও নামিয়া পড়িল। জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার সঙ্গে যাব কি?"

তরুণী রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "না, আপনাকে আর আসতে হবে না; এই তো তিন নম্বরের বাড়ী; আমি একাই যাচ্ছি।'

গলিটা সেইস্থান হইতেই আরম্ভ। দক্ষিণে তিন নম্বর বাড়ী। তরুণী শ্রান্ত চরণে চলিয়া গেল, সতীশও ফিরিল।

পরদিন সে যে-বাসে টালায় গেল, তাহাতে তরুণী আসিল না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সে শেষে উঠিয়া পড়িল, তখন প্রায় ছয়টা বাজে।

মাসীমার কাছে মিনিট পনের থাকিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল।

হসপিটালের সম্মুখের গ্রাউণ্ডে তখন জনকত লোক কি ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে। পাশের পথ দিয়া চলিতে চলিতে লোক দাঁড়াইতেছে, একবার 'আহা' বলিয়া চলিয়া যাইতেছে।

মনটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল—তরুণীটির আত্মীয়েরই কিছু হয় নাই তো?

এক পা দুই পা চলিতে চলিতে সে সেইস্থানে আসিয়া দাঁড়াইল।

লাইট পোষ্টের পার্শ্বে মৃতদেহ পড়িয়া, তাহারই বুকের উপর পড়িয়া একটী তরুণী। দর্শকেরা দুই একজন প্রবোধ দিতেছে। একজন বলিতেছে—"এঁর কি আর কেউ নেই যে, এঁকে তুলে নিয়ে যায়?"

আর একজন উত্তর দিল, "নিশ্চয়ই কেউ নেই—নইলে,......সে থামিয়া গেল।

সতীশ আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল এ সেই মেয়েটী, শোকে একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে।

সতীশ ডাকিল—"একটা কথা শুনুন, আমার দিকে একবার তাকান—"

মেয়েটী মুখ তুলিল, উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদিয়া উঠিল, "সতীশ বাবু; আপনি এসেছেন? আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে যে—দেখতে পাচ্ছেন তো?"

সতীশ সান্ত্বনার সুরে বলিল, "তা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আপনাকে এখন উঠতে হবে যে, এখনকার যা কাজ তা করতে দিন—আপনি উঠুন।"

মেয়েটী দ্বিরুক্তি করিল না, উঠিল—তাহার সর্ব্বাঙ্গ তখন থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমার স্বামীর সৎকার—ও আমি করতে পারব না সতীশ বাবু?"

সতীশ বলিল, "পারবেন—কিন্তু আপনার কোন আত্মীয়স্বজন—"

"কেউ নেই, কেউ নেই সতীশ বাবু—স্বামী ভিন্ন জগতে আমার কেউ নেই—বলিতে বলিতে সে দুই হাতে মুখ ঢাকিল; তখনই নিজেকে সংযত করিয়া শান্ত কণ্ঠে বলিল, "আপনি রেভারেণ্ড, মিঃ মজুমদারকে চেনেন?"

সতীশ উত্তর দিল, "চিনি।"

মেয়েটী একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "তাঁকে একবার খবর দিন যে, মিঃ সেনের মেয়ে আপনার সাহায্য চাইছে।—"

"হিন্দোল—"

সতীশ বিবর্ণ হইয়া পিছনে সরিয়া গেল:—

সেই হিন্দোল—

কিন্তু কতকাল কাটিয়া গিয়াছে। কতদিন কতমাস—কতবর্ষ কাটিয়া গিয়াছে, হিন্দোলেরও আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আজ তাহাকে দেখিয়া কেহই চিনিতে পারিবে না, হয় তো তাহার পিতামাতাও তাহাকে এখন চিনিতে পারিতেন না।

বোডিংয়ে নিজের ঘরটীর মধ্যে একা বিছানায় পড়িয়া সতীশ হিন্দোলের কথাই ভাবিতেছিল।

সেই বিলাসিনী হিন্দোল, তাহার এ কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। হিন্দোলের বিবাহ হইয়াছিল, হিন্দোল তাহার স্বামীকে এতখানি ভাল বাসিয়াছিল, ইহা মনে করিতেও সতীশের বুকে ব্যথা বাজিতেছিল।

সে-দিন হিন্দোলকে কোনক্রমে তাহার বাসায় পৌছিয়া দিয়া সে বোর্ডিংয়ে ফিরিয়া আসিয়াছিল। পরদিন দুবার গিয়াছিল কিন্তু হিন্দোলের দেখা পায় নাই। দাসী জানাইয়াছিল সে এখন কাহারও সহিত দেখা করিতে পারিবে না, দুই একদিন পরে দেখা হইবে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস সতীশ কোনমতেই চাপিয়া রাখিতে পারিল না। তাহার প্রেমের পরিণাম এই, তাহার জীবন তো পূর্ব্বেই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, হিন্দোল সুখী হইয়াছিল, তাহার সে সুখে বাদ সাধিল কে?

সেই দিন বৈকালে সে যখন হিন্দোলের সহিত দেখা করিতে গেল, তখন হিন্দোল উপরের বারাণ্ডায় রেলিংয়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার দৃষ্টি উপরের আকাশের কোন্ এক কোণে পড়িয়া।

দাসী ডাকিল, "দিদি সাহেব"—

চমকাইয়া হিন্দোল মুখ ফিরাইল। সম্মুখে সতীশকে দেখিয়া সে শুষ্ক মুখে হাসি ফুটাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "এই যে, আপনি আজও এসেছেন। আপনি কয়দিন এসেছিলেন, আমার ঝি আপনাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে দেয় নি জানতে পেরে আমি ওকে বলে দিয়েছি, আপনি এলে যেন আমার কাছে নিয়ে আসে।"

সতীশ ব্যথিতনেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল।

এই কয়দিনের মধ্যে হিন্দোলের একেবারেই পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। তাহার পরিধানে শুভ্র থান, মাথার চুল সে কাটিয়া ফেলিয়াছে, হাতে সে চুড়ি দুইগাছিও নাই।

সামান্য কয়েকটা বৎসর, এই কয়েক বৎসরের মধ্যে সতীশ হিন্দোলের মধ্যে কতখানি পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইল। কুমারী হিন্দোলকে সে দেখিয়াছিল বিলাসিনী হাস্যময়ীরূপে, তাহার সে হাসি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়া চারিদিক জ্বালাইয়া দিত। বিবাহিতা হিন্দোলকে সে দেখিয়াছিল একটী পূর্ণ নারীরূপে; তাহার মধ্যে বিলাসিতা ছিল না, তাহার পানে তাকাইয়া সম্ভ্রমে মাথা নত হইয়া পড়িত। আবার সম্মুখে এই বেদনার প্রতিমূর্ত্তি সদ্যো বিধবা রূপে সেই হিন্দোলই দাঁড়াইয়া আছে।

"হিন্দোল—"

তাহার মুখ দিয়া আর কথা ফুটিল না।

হিন্দোল অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়াছিল, পূর্ব্বস্মৃতি তাহার মনের মধ্যে দোলা দিয়া যাইতেছিল।

সতীশ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "প্রথম একদিন তোমায় দেখেছিলুম, আমার মনে সন্দেহ জেগেছিল; কিন্তু সাহস করে কিছু বলতে পারিনি।"

শুষ্ককণ্ঠে হিন্দোল বলিল, "আমিও আপনাকে চিন্‌তে পেরেছিলুম সতীশবাবু।"

সতীশ অন্যমনস্ক ভাবে বলিল, "ছয় বছর আগে তুমি যা ছিলে, আজ তো তার কিছুই নেই হিন্দোল।"

ধীরকণ্ঠে হিন্দোল বলিল, "সে সব বদল হয়ে গেছে, আমি সব ভুলে গেছি সতীশবাবু—"

সতীশ বলিল, "কিন্তু আমি তো ভুলতে পারি নি।"

হিন্দোল একটু হাসিল,—"ভোলাটাই যে দরকার ছিল সতীশবাবু, সেইটাই যে স্বাভাবিক। মানুষের ছোট বুকে সে কত দাগ এঁকে রাখতে পারে বলুন দেখি?"

সতীশ খানিক চুপ করিয়া রহিল,—একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "যত দাগই হোক মানুষের মনে সব আঁকা থাকে, একটাও বিলীন হয়ে যায় না, হিন্দোল। একদিন যা ছেলে-খেলা থাকে, জীবনে তাই সত্য হয়ে দাঁড়াতে পারে, তা জানো কি?"

হিন্দোল মুখ ফিরাইল, ধীরকণ্ঠে বলিল, "সত্য নয়, আমি বলি তা মিথ্যা। সত্য যা, তা গোপনেই থেকে যায়, স্বয়ং প্রকাশ হতে চায় না, কাল তাকে প্রকাশ করে দেয়। মানুষ জীবনে অনেক আশাই করে থাকে, কোনটা তার পূর্ণ হয় কি?"

হিন্দোল খানিক চুপ করিয়া অন্যমনস্কভাবে আকাশের পানে তাকাইয়া রহিল, তাহার পর মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আমি কালই পাঞ্জাব চলে যাচ্ছি, সতীশবাবু।"

সতীশ অকস্মাৎ চমকাইয়া উঠিল, "কেন, সেখানে কি?"

হিন্দোল বলিল, "সেখানে আমার মা আছেন, তিনি আজ পত্র দিয়েছেন—আমি যেন পত্রপাঠ সেখানে চলে যাই, একা এখানে আর থাকি নে।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ব্যথিত কণ্ঠে সে আবার বলিল, "যাঁর সঙ্গে এসেছিলুম, তিনি চলে গেছেন, একটীবার ভাবলেন না—ধর্ম্ম সাক্ষী করে যাকে গ্রহণ করেছেন, তাকে কোথায় কার হাতে দিয়ে গেলেন। বড় দুঃখ রইল—তাঁর শেষ কথাটা শুনতে পেলুম না, আমার যাওয়ার আগেই সব শেষ হয়ে গেছে।"

সে দিন সতীশ যখন বাড়ী ফিরিল, তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছিল। আশ্চর্য্য হইয়া সে ভাবিতেছিল মানুষের এতখানি পরিবর্ত্তনও হইতে পারে; শুধু দেহের নয়, মনেরও আমূল পরিবর্ত্তন হয়।

ছয় বৎসর পূর্ব্বের কথা মনে হইল; হিন্দোল বলিয়াছিল—তাহাকে ছাড়া আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না। সেটা নেহাতই চোখের নেশা মাত্র। সেই হিন্দোল—সে বিবাহ করিয়াছে, স্বামীকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিয়াছে, স্বামীর অভাবে তাহার জীবনটাই মিথ্যা হইয়া গিয়াছে, মনে করিতেছে।

আত্মবিস্মৃত সতীশ বলিয়া উঠিল, "তাই হোক, সে তার স্বামীর স্মৃতি নিয়ে থাক, আমি তার স্মৃতি পূজা করে দিন কাটিয়ে দেব।"

পরদিন খোঁজ করিয়া সে জানিতে পারিল, হিন্দোল পাঞ্জাব রওনা হইয়া গিয়াছে।

ছায়ার মায়া

গ্রামের নাম মধুসূদন কাঠি—

এ রকম অদ্ভুত নাম কে রেখেছিল, কেন রেখেছিল, তা আজ কেউ ভাবেও না। গ্রামের নামটা অথচ নিত্যই ক্রমে অপভ্রংশ হয়ে "মৌনকাঠি" নামে লোকের মুখে মুখে ঘোরে।

এই গ্রামেরই একপাশে জীর্ণ একখানা চালাঘর দেখা যায়, সেইটাই গ্রামের পাঠশালা। বেড়ার দেয়াল মাটি দিয়ে এককালে লেপা ছিল, এখন সে মাটি খসে পড়েছে অনেক জায়গায়, অনেক জায়গার বেড়া দুষ্ট ছেলেরা ফাঁক করে ফেলে পড়ার অবকাশে বাইরের দৃশ্য দেখে নেয়; তবু সেটা পাঠশালা, একদিনের নয়—দুদিনের নয় বহু পুরাতন পাঠশালা।

এই পাঠশালার গুরুমশাই বিহারীকে নিয়েই আমাদের গল্প—।

আজ তার বয়স বড় কম নয়। মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেছে। চোখে তার আগের মত দৃষ্টিশক্তি নাই; প্রথম একচোখে দৃষ্টি কমেছিল, এখন দুইচোখেই সে ঝাপসা দেখে।

বছরখানেক আগে চোখে সে প্রথম যখন ঝাপসা দেখেছিল, তখন ছেলেদের পোয়াবারো হলেও তার হল মহা মুস্কিল। বইয়ের লেখা প্রথম হল চেরা চেরা, ক্রমে অক্ষর আর দেখাই যেত না, সব কালো, সব অন্ধকার।

গ্রামের বাবুদের বাড়ীর সঙ্গে বরাবর একটা সম্পর্ক পাতানো। বিহারী গুরু প্রথম গ্রামে এসে বাবুদের বাড়ীতেই আশ্রয় নিয়েছিল, বাবুরাই গ্রামের ছেলেদের উদ্দেশ্যে এই পাঠশালাটী স্থাপন করেছিলেন।

বিহারীর চোখ খারাপ হলে বাবুরা তাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ভালো ডাক্তার দিয়ে চোখ দেখিয়েছিলেন, চশমা দিয়েছিলেন। সেই চশমার সাহায্যে সে আজ কোন রকমে পাঠশালার কাজটা চালিয়ে যেতে পারে। বড় ছেলেরা তাকে যথেষ্ট সাহায্য করে, নচেৎ খুটিনাটি সব কাজ গুছিয়ে করা তার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হতো, এ কথা সত্য।

লোক সে দেখতে পায়, চিনতে অনেক সময় পারে না। সব সময় চোখে চশমা দেওয়া যায় না, দীর্ঘ দিনের ব্যবহারে চশমার একদিককার ফ্রেম ভেঙ্গে গেছে, সুতো বেঁধে কোন রকমে কাজ চালানো হয়। লেখাপড়ার কাজটা কোন রকমে করা চলে, কিন্তু সব সময় চশমা ব্যবহার করা চলে না—যদি কাঁচ ভেঙ্গে যায়।

যুদ্ধের বাজারে অন্য জিনিসের সঙ্গে সঙ্গে চশমার দামও বেড়েছে কম নয়। সেদিন গ্রামের অপূর্ব্ব চক্রবর্ত্তী চশমা করে এসেছে, দাম পড়েছে নাকি পঁচাত্তর টাকা।

শুনে বিহারী চমকে ওঠে। পঁচাত্তর টাকা— তিনকুড়ি পনেরো টাকা, আর পাঁচটা টাকা ওর সঙ্গে জুড়লেই চার কুড়ি পুরে যেত। এক আঁচলায় ধরে না এত টাকা। গরীব বিহারীর ক্ষমতা কি অত টাকা ঢেলে নূতন চশমা গড়ানোর, যা আছে এতেই তার বাকি জীবনটা কেটে যাবে স্বচ্ছন্দভাবে।

বিহারীর দিন এমনই ভাবে কেটে যায়।

গ্রামের সবাই তাকে গুরুমশাই বলে ডাকে, সকলেই বিশেষ সম্মান দেখায়। করবেনাই বা কেন—গ্রামের কানু, হিরে, অছিমুদ্দিন, করিম, রববানী প্রভৃতি একদিন সবাই ছিল গুরুমশাইয়ের ছাত্র। আজ তারা গ্রামের মাতব্বর লোক হলেও গুরুমশায়ের ঋণ তারা কেউই অস্বীকার করতে পারবে না।

তারাও একদিন পাততাড়ি বগলে দোয়াতে মসীকালী আর খাকের কলম হাতে নিয়ে গুরু মশায়ের পাঠশালায় গেছে, যে যার আনা চেটাই বিছিয়ে নিজের স্থানে বসেছে,—আজকের-ছেলেদের মতই দেহ দুলিয়ে সুর করে পড়া মুখস্ত করেছে। তালপাতা অথবা কলাপাতায় বড় বড় অক্ষরে ক ব র লেখা সুরু করেছে। আজ তারাই হয়েছে গ্রামের মাতব্বর লোক,—গাঁয়ের মোড়ল, সমাজের কর্ত্তা। তারাই ব্যবসা করে, মাঠে

সোনা ফলায়, কেউ কেউ কলকাতায় চাকরী করে, মাঝে মাঝে বাড়ী এসে গ্রামোন্নতির পরিকল্পনা করে বৈঠক বসিয়ে।

সকলেই মানুষ হল অথচ যে তাদের মানুষ করলে, সেই বিহারীই রয়ে গেল অমানুষ। হাঁটুর উপর আটহাতি কাপড় তুলে তালপাতার ছেঁড়া চটি জোড়ায় হাজার জায়গায় তালি লাগিয়ে সেই বিকৃত ও ভারি জুতা পরে গায়ে একখানা চাদর দিয়ে সে পাঠশালায় যায়, বাবুদের বাজার করে।

আজও পাঠশালা বসে—

পাঠশালায় আসে গ্রামের ছেলেরা, চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী তারা চেটাই নিয়ে এসে নিজের নিজের জায়গায় বিছিয়ে বসে, মসীকালিতে খাকের কলম ডুবিয়ে তালপাতা কলাপাতায় বড় বড় অক্ষরে লেখে। গরীবদের ঘরে দামী শ্লেট আসে না, যা তাদের বাপ ঠাকুরদা করে এসেছে—তারা তাই করে।

বিহারীর দিন এই পাঠশালা উপলক্ষ করেই কাটে।

অভাব তার নিয়েনন্বইয়ের ধাক্কায় বারোমাস পৌঁছে আছে, তা নিয়ে সে কারো কাছে কোনদিন অভাব অভিযোগ জানায় না,—কারও কাছে কোনদিন হাত পাতে না। তার প্রাপ্য যেটুকু তাই নিয়ে সে পরম খুসি হয়ে থাকে।

পরম শান্তিতে থাকে সে—দিন তার স্বচ্ছন্দে কেটে যায়। ছেলেরা তাদের গুরুমশাইকে ভালোবাসে,—শ্রদ্ধা করে—ভক্তি করে। তাড়না নাই, শাসন নাই,—আছে শুধু সান্ত্বনা—আছে শুধু ভালোবাসা। প্রাণপণ খাটে সে তার পাঠশালার জন্য—এ যেন তারই পাঠশালা, এতে কেউ কোনদিন হাত দেবে না, তার সম্বন্ধে কেউ কোনদিন কথা বলবে না এই তার ধারণা।

কিন্তু অভিভাবকেরা খুসি হতে পারে না।

নূতন এনে দিয়েছে নূতন ভাবধারা, বর্ত্তমান শতাব্দী এনেছে শিক্ষার নূতন প্রণালী, সে যুগের সে শিক্ষাধারা বর্ত্তমান দিনে প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। চেটাই পেতে বসে শিকালি দিয়ে তালপাতায় লেখা অভিভাবকেরা পছন্দ করে না। তারা স্পষ্টই বলে, আমাদের কালে যা হয়েছে, এখনকার দিনে আর তা চলতে পারে না গুরুমশাই, ও সব পালটে দিতে হবে না? দেখুন না, পাশেই তো বেড়ো গাঁ রয়েছে, ওখানকার গুরুমশাই কেমন পাঠশালা করেছে, ছেলেরা সেখানে কত তাড়াতাড়ি আর কত বেশী লেখাপড়া করছে, ওখান হতে পাশ করে হাই ইস্কুলে পড়তে যাচ্ছে—একি যা তা কথা? আমাদের গাঁ কত পেছিয়ে পড়লো বলুন দেখি—ছেলেরা একটা ইংরিজী জানে না, ওদের মত ইংরিজী অঙ্ক কষতে পারে না। এতে কি করে চলবে বলুন।"

বিহারী মাথা চুলকায়—

কিন্তু কোন উপায়ই তার নাই। নিজের ত্রুটি সে বুঝতে পারে কিন্তু সংশোধনের কোন পথ সে খুঁজে পায় না। নিজের দীনতায় সে মাটিতে মিশিয়ে যায়, মাথা সে তুলতে পারে না।

এরই মধ্যে পাঠশালায় একখানা ইংরাজীতে লেখা পত্র এসে পৌঁছালো গুরুমহাশয়ের নামে,—খাম খুলে কয়েকবার উলটে পালটে দেখে বিহারী পত্রের মর্ম্মোদ্ধার করতে পারলে না।

মজিদকে ডেকে তাকে দিয়ে পত্র পড়িয়ে বিহারী জানতে পারলে—ইনেস্পেক্টার সাহেব পাঠশালা পরিদর্শনে আসছেন।

অন্ততঃপক্ষে যতদিন পাঠশালা স্থাপিত হয়েছে, ততদিন কেউ পাঠশালা দেখতে আসে নি। ইনেস্পেক্টার আসছেন কথাটা মুখে মুখে গ্রামের মধ্যে ছড়িয়েও পড়লো—অনেক ভীতিজনক গল্পও শোনা যেতে লাগলো। শুষ্ক মুখে বিহারী কেবল মাথায় হাত বুলাতে লাগলো।

মজিদ একদিন ছিল এই পাঠশালারই পড়ুয়া, আজ সে কলেজের উচ্চডিগ্রিধারী, বড় কাজ করে গভর্ণমেণ্ট অফিসে। সে সান্ত্বনা দিলে, ভয় পাবেন না গুরুমশাই,—আমরা তো আছি। এ সব আপনার কোনও শত্রুর কাণ্ড, তারাই এই পাঠশালায় আপনার শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে উপরে জানিয়েছে। নইলে এই পাঠশালা এতকাল কেউ দেখতে এলোনা, সেখানে হঠাৎ ইনেস্পেক্টর আসছেন কেন? আপনি মোটেই ভয় পাবেন না গুরুমশাই, যা সত্যি তাই জানাবেন।

ইনেস্পেক্টার একদিন সত্যই এসে পৌঁছালেন।

বিহারী প্রস্তুত হয়েছিল, ছেলেদেরকে সে যথাসাধ্য প্রস্তুত করেই রেখেছিল। পাঠশালার ছেলে হাফেজ, মধু, বেণী, মহম্মদ—এরা যে তার মুখ রাখবে, এ আশা সে করেছিল।

ইনেস্পেক্টার এলেন, চারিদিক দেখলেন, ছেলেদের পরীক্ষা করলেন। খুসি তিনি মোটেই হন নি, তা তাঁর মুখ দেখেই বোঝা গেল।

স্পষ্টই তিনি বললেন, "আজিকালের পাঠশালা

এখনকার দিনে চলতে পারে না, এখনকার দিনে গভর্ণমেন্টের সাহায্য নিতে গেলে এখনকার উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া দরকার। সেকাল চলে গেছে, মনে রাখতে হবে এটা একাল, বিংশ শতাব্দী চলছে। বর্ত্তমানের সঙ্গে পা ফেলে চলতে গেলে তার উপযুক্ত হওয়া চাই।"

তিনি চলে গেলেন।

তাঁর শতকরা নব্বইটা ইংরাজী শব্দের সঙ্গে মিশানো দশটা বাংলা শব্দের মধ্যেই বিহারী বুঝলো তার অন্ন এখান হতে উঠলো, সে এখানে অচল হয়ে গেল।

রাগ সে করলে না কারও পরে,—কারণ সত্যই মানুষ আজ ঠকতে চায় না, পেছিয়ে থাকতে চায় না। এগিয়ে যাওয়ার দিন এসেছে, মানুষকে আজ এগিয়ে চলতে হবে।

আজ সে হিসাব করে, কতদিন হল এখানে এসেছে সে। পঁচিশ বৎসর কবে পার হয়ে গেছে' তখন ওই ওরা ছিল এতটুকু, কারও বয়স ছিল দশ, কারও পাঁচ, কারও সাত। এখন ওদের মধ্যে যারা ছিল ছোট, তাদের কোলে করে বয়ে আনতে হতো, খাবার দিয়ে ভুলিয়ে পড়াতে হতো, বড় ছেলেদের পাহারা রাখতে হতো। ওই মজিদ, নবীন, সনাতন, হাফেজ—ওরা সব তখন ছিল এতটুকু, ওদের ধরে আনবার সময় কি হাত পাই না ছুড়তো ওরা, আঁচড়ে কামড়ে সকলকে অস্থির করে তুলতো। আজ ওরা কত বড় কাজ করছে,—আজ তারা গ্রামের উন্নতি করতে চায়। তারা বুঝেছে কি ভাল, কি মন্দ, তারা আজ এই পাঠশালা ভেঙ্গে চুরে নূতন করে স্কুল নাম দিয়ে গড়তে চায়—যেখানে আধুনিক শিক্ষাধারা প্রবর্ত্তিত হবে, ছেলেরা মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে।

অন্যায় নয়—অসঙ্গত নয়। দেশের প্রত্যেক ছেলেরই কাজ দেশের উন্নতি করা ঃ ক্ষুদ্র গুরু-মশাইয়ের স্বার্থ রাখতে গিয়ে দেশকে তারা নষ্ট করতে পারে না।

মজিদ বললে, নাই বা রইলো পাঠশালা, নাই বা রইলো আপনার কাজ গুরুমশাই, আপনি তাই বলে কোথাও যাবেন না, আমাদের এখানেই থাকুন। আপনার জীবিকার জন্যে কিছু ভাবতে হবে না, আমরা আপনাকে দেখব।"

যারা নূতন শিক্ষালয় স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হয়েছিল, তারাও বললে, "আপনি আর কোথাও যাবেন না গুরুমশাই, আমরা সবাই মিলে আপনাকে দেখব—এ বয়সে কোথাও যাবেন না।"

বিহারী হাসলো—

বড় মলিন, বড় করুণ তার হাসি। একটি কথাও সে বললে না, নিঃশব্দে সেখান হতে সে চলে এলো, তখন তার পা দুখানা থর থর করে কাঁপছিল। তবু পুরাতনের প্রতি আকর্ষণে সে পরদিনও গেল পাঠশালায়।

ছেলেরা কেউ আসে নি, শূন্য ঘরখানা হাহাকার করে। বিহারী স্খলিত চরণে ঘরখানায় বেড়ালে—স্থান নির্দ্দেশ করে—এখানে বসতো মতি, ওখানে জলিল, ওপাশে সফি, তার পাশে মনা, সর্ব্বাজ, ওসমান, পাশাপাশি এই লাইনে বসতো কুড়িটী ছেলে; ওদিকে বসতো পাঁচজন, এদিকে তিনজন—

চোখের সামনে ফোটে ছেলেগুলোর মুখ, স্বপ্ন যেন সত্য হয়ে ওঠে।

তখনই চমক ভেঙ্গে যায়, শূন্যঘরে একা বেড়াচ্ছে বিহারী, আজ কোন ছেলেই পাঠশালায় আসে নি—স্মৃতিই মনের মধ্যে দপ দপ করে। তারা কে কোথায় গেল, যারা কাল পর্য্যন্ত একান্ত বাধ্য ছাত্র ছিল?

বিহারী কাঁপতে কাঁপতে ফিরলো নিজের বাসস্থানে, সেই দিনই এলো তার প্রবল জ্বর, তার একেলা ঘরে জীর্ণ কাঁথাখানা মুড়ি দিয়ে পড়ে রইলো, কেউ একবার তাকে দেখলে না।

অবশেষে সত্যই একদিন ডিগ্রিধারী নূতন মাষ্টার এলো। দিব্য সুপুরুষ চেহারা, অল্প বয়স, ঝরঝরে পরিষ্কার কাপড় জামা, পায়ে চকচকে পাম সু। তার জন্য নির্দ্দিষ্ট হল বাবুর বাড়ীর সেরা ঘর খানা, সে ঘরে রইলো টেবিল, চেয়ার, দেওয়া হল আয়না, ড্রয়ার প্রভৃতি।

বিহারী যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হ'ল।

এবার তাকে বিদায় হতেই হবে, আর তার এখানে থাকা চলবে না। এই নূতন মাষ্টারের পাশে সেকালের গুরুমশাইকে মানাচ্ছে না,—সেকালকে আজ বিদায় নিতে হবে।

ছাত্রদের কাছে সে শেষ বিদায় নিতে গিয়ে সত্যই কেঁদে ফেললে—বড় অভিমানেই সে কাঁদলো। চোখ মুদে রুদ্ধ কণ্ঠে বললে, "আমি আজ চলে যাচ্ছি তোমাদের কাছ হতে; আশা করছি তোমরা নূতন মাষ্টার মশাইয়ের কাছে নূতন ইস্কুলে পড়ে মানুষ হতে পারবে। হয় তো

পুরাণো গুরুমশাইকে তোমরা ভুলে যাবে, মনে রাখবে কিনা তা জানিনে, আমি তোমাদের চিরদিন মনে রাখব। যখনি যেখানে যে অবস্থাতেই থাকি, তোমাদের কোনদিনই আমি ভুলব না।"

সে বিদায় নিলে।

ছাত্রেরা কেউ একবার বললে না—আমরা তোমায় চাই, তুমি আমাদের কাছেই থাকো। ওই হাপলা, কেনা, হাফেজ, করিম—এরাই না একদিন তার মন রাখবার জন্যে কিই না করতে পারতো। তারা কেউ মনে না হোক—মুখেও অন্ততঃ একটী বার এ কথাটীও বলতো।

অন্তরে বড় আঘাত লাগে।

নিমকহারাম, মানুষ বড় নিমকহারাম। ওরে, তোরা একটীবার যদি এই কথাটীও বলতিস—তাই যে হতো বিহারীর জীবনের একমাত্র সম্বল—।

বিহারীর ঝাপসা চোখ চোখের জলে অধিকতর ঝাপসা হয়ে ওঠে।

গ্রামের কেউ জানলো না বিহারী চলে গেল।

অপরিচিত একটী প্রৌঢ় একদিন এসে দাঁড়িয়েছিল এই গ্রামের ধূলায় ভরা পথে, সসঙ্কোচে সেদিন সে জনসাধারণের শিক্ষার তার নেওয়ার ভিক্ষা চেয়েছিল। সে চেয়েছিল জ্ঞান দান করতে, অন্ধের চোখ ফুটাতে, মধুসূদন কাঠি তার কাছ হতে অনেক পেয়েও ঋণ স্বীকার করলো না, নিষ্ঠুর আঘাত দিয়ে তাকে বিদায় দিলে।

এই গ্রামের সকলের সুখ-দুঃখের ভাগি হয়ে পঁচিশ বৎসরের বেশী এখানে কাটিয়ে জরাজীর্ণ যে বৃদ্ধ বিদায় নিলে, কেউ তার খোঁজও নিলে না।

তারা নূতন ডিগ্রিধারী নূতন মাষ্টারের সম্বর্দ্ধনায় মহাব্যস্ত।

পথ চলতে বিহারী ভাবছিল পঁচিশ বৎসর আগেকার কথা।

তারও কি ঘর ছিল না,—মায়াময় সুন্দর পরিপাটী সাজানো সংসার! কি না ছিল তার,—সুন্দরী স্ত্রী, ঘর বাড়ী জমীজমা—এমন কি বাগান পুকুর পর্য্যন্ত।

গাঁয়ের লোকে তার সুখসৌভাগ্য দেখে হিংসা করতো, ঈর্ষায় জলতো।

স্ত্রী নীলা—

তার গৃহের গৃহিনী। চারিদিকে ছিল তার সতর্ক দৃষ্টি, সংসারে এতটুকু বিশৃঙ্খলা ঘটাবার যো ছিল না, পরম সুখ ও শান্তিতে বিহারীর দিন কাটতো।

সারাদিন বাইরের কাজ সেরে সন্ধ্যায় সে ফিরতো নিজের ঘরে—কোনদিন রামায়ণ মহাভারত পাঠ চলতো, কোনোদিন কীর্ত্তন গান হতো। পাড়ার কত লোকেই না আসতো তাদের বাড়ীতে।

সে দিন কোথায় গেল হারিয়ে!

কি করে কি যে হয়ে গেল তা বিহারী আজও বুঝতে পারে না। নীলা আস্তে আস্তে একেবারে বদলে গেল,—সাজানো সংসারে আগুন ধরে উঠলো। সন্দেহ বিহারীর হয়েছিল, কিন্তু নিজের অপারগতার কথা সে জানতো; নীলার খেয়ালমত জিনিস যোগানোর ক্ষমতা তার ছিল না। সামান্য চাষী গৃহস্থ মাত্র, কোন রকমে স্বচ্ছন্দে জীবিকার্জ্জনই করতে পারে,—বিলাসিতা তার কাছে স্বপ্ন মাত্র।

একদিন গিয়েছিল সে কাছাকাছি মেলায়,—নীলার জন্য সেদিন সে অনেক কিছুই কিনেছিল—স্নো, পমেটম, পাউডার, আলতা, আর কিনেছিল একখানা রঙীন শাড়ী, একটা সুন্দর সেমিজ। এক বিঘা জমিই সে দিয়েছিল বিক্রয় করে—নীলাকে সে কিছুই জানায় নি। এইগুলি নিয়ে সে যখন নীলার সামনে দাঁড়াবে—আনন্দে তার মুখখানা কি রকম দৃপ্ত হয়ে উঠবে, তাই কল্পনা করে তার বুকটা ভরে উঠেছিল।

ফিরলো সে বাড়ীতে।

কিন্তু কোথায় নীলা—?

বাড়ীতে না খেয়ে সে পাড়ায় খোঁজ করেছিল, সারা গ্রামে খুঁজেছিল, নীলার সন্ধান সে পেলে না—। বজ্রাহতের মত বিহারী দাঁড়িয়ে গেল, তার হাত হতে উপহারের জিনিস গুলা মাটিতে পড়ে ধূলা মাখা হয়ে গেল।

কোথাও পাওয়া গেল না নীলাকে—পৃথিবীর বিশাল জনারণ্যে নীলা গেল হারিয়ে। খোঁজ করে জানা গেল, জমী জরীপ করতে যে দলটি এসেছে, তাদের বড়বাবুও সেই দিন হতে অদৃশ্য হয়েছেন।

দুই হাতে মাথা চেপে ধরলো বিহারী।

পাড়া প্রতিবেশীরা সান্ত্বনা দিলে, "ওতে আর কি হয়েছে বিহারী, তুমি আবার বিয়ে থাওয়া কর—আবার সংসার পাতো। জগতে অমন কত হয়, কত যায় মরে—কত যায় হারিয়ে। পুরুষ মানুষ তুমি, শোকে অধীর হয়ে পড়লে কি তোমার চলবে—?"

ঠিক কথা, শোকে অধীর হওয়া পুরুষ মানুষের মানায় না।

নীলা হারিয়ে গেছে, যারা হারিয়ে যায় তাদেরই একজন নীলা, নীলাও গেল হারিয়ে।

বিহারী দেশে থাকতে পারল না—বিবাহও সে করতে পারলে না। সে জানে—বিবাহ একবারই হয়ে থাকে, দুবার হয় না।

একদিন এমনই নিঃশব্দে দেশত্যাগ করেছে বিহারী, ঘর, জমা জমি, বাগান পুকুর ফেলে একা সে বার হয়েছিল পথে, সে আজ পঁচিশ বৎসর আগের কথা। সে দিনকার বিহারীর বয়স চল্লিশ বৎসর হলেও—সে ছিল স্বাস্থ্যবান, সুস্থ সবল, আজকের বিহারীর চোখে দৃষ্টি নাই, চলতে পা দুখানা থর থর করে কাঁপে। সেদিন সব হারিয়েও সামনে ছিল উদ্দেশ্য, আজ তার কিছু নেই, সম্পূর্ণ নিঃস্ব, পঁয়ষট্টি বৎসরের বৃদ্ধ বিহারী আজ একা বার হয়েছে পথে।

নীলাকে একদিন সে দেখেছিল।

কলকাতায় গিয়েছিল সে, সেই যেবার বাবুরা তার চোখ দেখাতে কলকাতায় নিয়ে যান। বাবুর বন্ধুর বাড়ীতে বিবাহের উৎসবে বাবুর সঙ্গে গিয়েছিল বিহারী।

বিখ্যাত বাইজী রত্না তখন নেমেছিল আসরে, তার গান চলছিল—

'বাদল গরজে বিজলী চমকে
দাদুল মাচাওয়ে সই—
সেঁইয়া নেহি আওয়ে মোর—'

অনেক টাকা মুজরা দিল বাইজীকে লক্ষ্ণৌ হতে আনা হয়েছে। প্রথমে সে কিছুতেই আসতে চায় নি, তারপর কেন যে হঠাৎ রাজি হয়ে গেল, তা কেউ জানে না।

ওস্তাদ গুণীতে আসর ভর্ত্তি; একপাশে দাঁড়িয়ে ঝাপসা চোখের দৃষ্টি মেলে বিহারী বাইজীকে দেখে, তার গান শোনে—

'বরখা লাগি মেরে গুঁইয়া
সেঁইয়া নেহি আওয়ে মোর—।

হিন্দী গান বিহারী বোঝে না—তবু সুরটা তার বড় ভালো লাগে, নিজের মনে সে গুণ গুণ করে—

'সেঁইয়া নেহি আওয়ে মোর—
বরখা লাগি মেরে গুঁইয়া—'

বাইজী কাছে আসে—

বিহারী ভালো করে তার পানে চায়।

বড় পরিচিতা বলেই মনে হয় না?

তার গায়ে বহুমূল্য রত্নালঙ্কার, পরণে মূল্যবান পোষাক, লম্বা বেণী লতিয়ে পড়েছে পিঠের উপর দিয়ে, মুক্তার মালা জড়ানো, তবু মনে হয়—ওই মুখ তার বড় পরিচিত। গতজন্মের নয়, এই জন্মেই—হ্যাঁ, এই জন্মেই সে ছিল বিহারীর বড় আপনার জন—।

নীলা—"

তার নিজের অজ্ঞাতেই সে চেঁচিয়ে উঠেই স্তব্ধ হয়ে যায়।

বাইজী চমকে উঠে তার পানে তাকায়; তার গান থেমে যায়; চঞ্চল চরণ মুহূর্ত্তে অচঞ্চল হয়ে পড়ে।

সারেঙ্গী সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে—"হুসিয়ার—"

প্রায় তারই সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতারা কলরব করে ওঠে,—"নিকাল দেও, শূয়ারকো নিকাল দেও"—তারা বিহারীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, মারতে মারতে তাকে আসরের বার করে দেয়।

বহুদিন আগেকার সেই দিনটাই আজ বিহারীর মনে পড়ে, চোখের সামনে বাইজীকে সে দেখতে পায়, তার গান কানে আসে—

'বাদল গরজে বিজলী চমকে—'

বিজলী চমকাচ্ছে কিন্তু সে আলোয় পথ দেখা যায় কই,—পথিক যে পথ হারিয়ে ফেলে।

ট্রেণের প্রত্যাশায় সে চার পাঁচ মাইল তফাতে ষ্টেশনে ক্লান্ত দেহে এক পাশে বসে পড়ে।

কে জানে কখন আসবে ট্রেণ, বসে থাকে—অপেক্ষা করে।

কোথায় যাবে সে—সে নিজেই জানে না। তবু তাকে যেতে হবে, সে তাই জানে। তার সকল কাজ ফুরিয়েছে, সংসারে তার কোন আকর্ষণ নেই, কোন বন্ধন নেই,—সে মুক্ত—চির মুক্ত।

বিহারী ট্রেণের আগমন-আশায় পথ পানে চেয়ে থাকে। তার মনের মধ্যে একটা হারানো সুর বাজে—

'সেঁইয়া নেহি আওয়ে মোর—
বরখা লাগি মেরে গুঁইয়া—'

সম্পূর্ণ